আশাপূর্ণা দেবী

পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প

ভূমিকা

আশাপূর্ণা দেবীর জন্মশত বর্ষ যেন এক জোয়ার এনে দিয়েছে—কি পাঠক সমাজে কি প্রকাশনার জগতে। এই জোয়ার উদ্বুদ্ধ করেছে লেখিকাকে নতুন করে জানার প্রয়াসকে, তাঁর রচনার মূল্যায়ন করার আবেগকে। আশাপূর্ণা-সাহিত্য যেন এক সমৃদ্ধ খনি যা সাজানো হচ্ছে অন্য দূরদৃষ্টির আলোকে।

ছোটগল্প রচনা সম্পর্কে আশাপূর্ণা দেবীর সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অনুভূতি ছিল। মনের কোণে যেন এক দুর্বলতা। তাঁর স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প প্রকাশকালে তিনি এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখেন যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে লিখে চলেছি একটানা প্রায় অবিশ্রাম, এখনো লিখছি। কাজেই অন্য সব লেখা বাদ দিলেও—'শুধু ছোটগল্পের সংখ্যাই যে অসংখ্য' হয়ে উঠেছে তা উল্লেখ না করে উপায় নেই।"

"কলমের ওপর দিয়ে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের হাওয়াটিও তো বয়ে চলেছে। সেই হাওয়ার ঝাপটায় এবং দাপটে, সমাজের অনেক বদল ঘটেছে, বদল ঘটেছে সমাজ মানসিকতার। বদল ঘটেছে চিরন্তন মূল্যবোধগুলির। আবার সে হাওয়ায় লেখকের কলমেরও ভাষার বদল ঘটে, বদল ঘটে আঙ্গিকের, প্রয়োগ বিধির, সর্বোপরি দৃষ্টিভঙ্গীর।"

'সাহিত্যম্' প্রকাশনা আশাপূর্ণা দেবীর জন্মশতবর্ষে তাঁর পঞ্চাশটি ছোটগল্প নিয়ে যে "প্রিয় গল্প" খণ্ডটি প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন তা সত্যিই ধন্যবাদার্হ। গল্পগুলি কালানুযায়ী বাছাই করা হয়নি তবে একটি কথা উল্লেখ করতে ইচ্ছে করি। গল্পগুলির মধ্যে 'পত্নী ও প্রেয়সী' গল্পটি আশাপূর্ণা দেবীর সর্বপ্রথম প্রকাশিত বড়দের গল্প যা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে আনন্দবাজারের শারদীয় সংখ্যাতে।

এতগুলি গল্প নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয় তবে একথা নিশ্চিত করে বলা যাবে যে প্রত্যেকটিই এক একটি উজ্জ্বল রত্নের মতো যা পাঠকের হৃদয় জয় করতে বাধ্য। যদিও গল্পগুলি পাঠকের মনে হতে পারে একটু নির্মম, কঠোর সত্যের তীব্রতায় একটু রুক্ষ।

আবার লেখিকার নিজের কথায় আসি।

"চিরদিনই আমার লেখার উপজীব্য গৃহগন্ডীবদ্ধ কিছু সাধারণ মানুষ। আমার কলমের বিচরণ ক্ষেত্রের সীমানাও সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। তাই এইসব গল্পের কাঠামোয় 'গল্প' জিনিসটা স্বল্পই আছে। তবু সেখানেও কত

বিচিত্র রং বিচিত্র স্বাদ। কত বৈচিত্র্য আর জটিলতা, বিশালতা আর ক্ষুদ্রতার টানাপোড়েন। এমনও হয় একটি ক্ষণমুহূর্ত জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। .... আর এইগুলি যখন ধরা পড়ে যায় তখন অনুভবে আসে মানুষ কত অসহায়। সে অসহায়তা হয়তো আপন হৃদয়ের কাছেই। লোভের কাছে, বাসনার কাছে অন্ধ আবেগের কাছেই।"

ছোট গল্পের কাজ তো সেই ক্ষণ উন্মোচনকে ধরে রাখা যা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে নাড়া দিয়ে যাবে, জাগাবে এক সহমর্মিতা।

ছোট গল্প সব লেখকেরই প্রিয় বিষয়—কি বিদেশে কি দেশে। লেখিকাকে অনুসরণ করে সে কথা দিয়েই শেষ করি। "ছোটগল্পই আমার ভালোবাসার জন। একটি ছোটগল্প লিখতে পেরে যে আনন্দ, একখনি বৃহৎ উপন্যাস সমাপ্ত করে ফেলেও তেমন নয়। বৃহতে যদি নির্মাণের সাফল্য তো ছোট্টটিতে 'সৃষ্টির' আনন্দ"।

১৯.১.০৯

১৭ কানুনগো পার্ক **নূপুর গুপ্ত**

গড়িয়া

কোলকাতা—৮৪

গল্পসূচি

অজানিত ৯
অর্থহীন ২০
অপরাধ ২৮
অবিনশ্বর ৩৮
অবোধ্য পৃথিবী ৪৫
অসতর্ক ৫২
আত্মসর্বস্ব ৫৯
আদিম ৬৭
আমায় ক্ষমা করো ৭৫
আহত ফণা ৮২
ঈর্ষা ৯৬
উচিৎ জবাব ১০১
এক প্রেমিক পুরুষের ইতিবৃত্ত ১০৮
একটি অমোঘ মৃত্যু ১১৬
একটি করুণ কাহিনি ১২৫
এখনও নেভেনি আগুন ১৩০
কঙ্কন ১৪১
কসাই ১৫৪
কার্বন কপি ১৫৮
ক্যাকটাস ১৬৭
গোড়েমালা ১৮২
চাপরাশি ১৮৯
ছুটি নাকচ ১৯৬
তাসের ঘর ২০৬
ত্রাণকর্তা ২১২
নীলকণ্ঠ ২২০
নীল ছায়া ২৩৩
নেশা ২৩৭
পত্নী ও প্রেয়সী ২৪৬
পৃথিবী চিরন্তনী ২৫৪
ফল্গুধারা ২৬৭
রাহু ২৭৫
রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা ২৮৩
রুদ্ধকপাট ২৯০
বাকি খাজনা ২৯৬
বেহায়া ৩০৩
ভালবাসার নাম প্রতারণা ৩১৫
ভীষ্ম ৩২৪
মফস্বল-বার্তা ৩৩২
মনের গহনে ৩৪৩
স্বস্তি ৩৫২
মৃত্যুবাণ ৩৬০
রাজি ৩৬৭
শোক ৩৭৬
সব দিক বজায় রেখে ৩৮৪
সমাধান ৩৯৪
স্বপ্নভঙ্গ ৪০২
স্টিলের আলমারি ৪১৫
হাতিয়ার ৪২৫
বৈরাগ্যের রং ৪৩৪

অজানিত

গাড়ি থেকে নেমে করবী একবার বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়াল। বাড়িটা থমথমে নিস্তব্ধ! রোগিণীকে বোধ হয় ব্রোমাইড্ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আর বাড়ির প্রত্যেকটি লোক হাঁটছে পর্যন্ত নিঃশব্দে।

গেটে ঢোকবার আগে করবী ড্রাইভারকে বলল—আচ্ছা শরৎ, তুমি তাহলে বিকেল চারটের মধ্যেই এস! দেরি করে ফেল না, বাবুর, ফেরার আগেই ফিরব।

ড্রাইভার ছোকরা মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে গাড়ি ঘোরাল!... আর করবী—মুখে যেটুকু বা ঔজ্জ্বল্য ছিল সেটুকুকে বিষাদের তুলি বুলিয়ে মুছে নিয়ে ধীর পায়ে বাড়ি ঢুকল।

ঢুকেই সোজা উঠে গেল তিন তলায়। মাকে দেখতেই সংসার ফেলে চলে আসা, তবু করবী দোতলায় মায়ের ঘরের পাশ কাটিয়ে তিন তলায় বাপের কাছেই আগে গেল।

পুরন্দরবাবু যথারীতি বই-কাগজের সমুদ্রে ডুবে বসেছিলেন, মেয়েকে দেখে মুখ তুলে চাইলেন। চশমাটা নাক থেকে খুলে টেবিলে রেখে বললেন—এসেছ?

গলার স্বর শুনলেই বোঝা যায় আসাটা অপ্রত্যাশিত নয়, দুর্লভও নয়। নিত্য নিয়মিতই হয়তো। সত্যিই করবী প্রায় রোজই আসে। মায়ের কোলের মেয়ে বলেই শুধু নয়, সংসারে তার সুবিধেও আছে। ছেলেপুলে নেই, গাড়ি আছে।

—ওঁকে দেখে এলে?

—না বাবা, এসেই আপনার কাছে চলে এসেছি। মা বোধ হয় ঘুমোচ্ছেন।

—ঘুম নয়—অজ্ঞান। সকালবেলাই ব্রোমাইড্ দিতে হয়েছে।

—ওতে—মানে খালি খালি ব্রোমাইড দিলে জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে যায় না বাবা?

পুরন্দরবাবু মুখ তুলে একটু হাসলেন। চশমাটা তুলে নিয়ে রুমালে মুছতে মুছতে বললেন—যায় বই কী!

—তবে?

—কী আর করা যাবে বল? এ ছাড়া উপায় কি?

উপায় নেই, সে কথা করবীও জানে। তবু অনাবশ্যক এই কথোপকথন চালাতেও হয়, নইলে কি কথা কইবে বাপের সঙ্গে! সময়োপযোগী আর কোন্ কথা খুঁজে পাবে?

মায়ের অসুখের আগের কথা মনে পড়ল। কোলের মেয়ে হলেও একার সংসার বলে এসে থাকতে করবী কখনই পারত না, কিন্তু বেড়াতে প্রায়ই আসত। বাপের জন্য হয়তো নতুন কোনও খাবার তৈরি করে, কি ভাইদের জন্য রকমারি কিছু তরকারি রান্না করে টিফিন ক্যারিয়ারে ভরতি করে হাসতে হাসতে এসে ঢুকত! আর হই হই পড়ে যেত বাড়িতে। দাদারা যে যে বাড়িতে উপস্থিত থাকত, সামনে এসে সহাস্য প্রশ্ন করত—কী, আজকে আবার, কী বানানো হয়েছে? 'ডিমের আকাশকুসুম'? 'মুরগির মোহেন-জো-দাড়ো'?

মা হয়তো ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাসি-হাসি অথচ বকুনি-বকুনি স্বরে বলে উঠতেন—গাড়ির সিটে বসিয়ে এনেছিস্ তো? নাঃ তোর গাড়িতে বাপু আমার আর কোনওদিন বসা চলবে না।

করবী সজোর-প্রতিবাদে প্রমাণ করতে বসত, সারা পথ সে গাড়ি আর শাড়ি বাঁচিয়ে কী ভাবে হাতে করে শূন্যে ধরে এনেছে টিফিন কৌটোটাকে।

বাপের কথা তখন কে বা মনে করত। কতক্ষণ পরে মনে পড়ত .... তাই তো—বাবার কাছে তো যাওয়া হয়নি, প্রণাম করা হয়নি বাবাকে। তখন ছুটত ত্রুটি সংশোধন করতে।

এইভাবেই বসে থাকতেন পুরন্দরবাবু। কাগজের সমুদ্রে ডুবে। মেয়েকে দেখে একটু হেসে বলতেন—এসেছ? আজ আবার নতুন কিছু রান্না করা হয়েছে বুঝি?

তারপর আবার ডুবে যেতেন আপন গভীরতায়, ভুলে যেতেন মেয়েকে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টুপ করে এক সময় পালিয়ে আসত করবী।

ঘর নয়, সংগ্রহশালা!

মানবজাতির মনস্তত্ত্বের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ হচ্ছে দিনের পর দিন ধরে। অজস্র বই, অজস্র পত্রপত্রিকা। এ সমস্তই পুরন্দরবাবুর দরকার, সব তাঁর নখদর্পণে।

বিরাট এক ইতিহাস লিখছেন পুরন্দরবাবু, "মানবজাতির মনোন্মেষের ইতিহাস"। বছর পাঁচেক ধরে লিখছেন, হয়তো আরও পাঁচ সাত দশ বছর ধরে লিখবেন। কোটি কোটি বছর আগেকার পটভূমিকায় যার শুরু আর শেষ হবে যার ভবিষ্যৎ যুগের দরজার সামনে। এ হেন বিরাট গ্রন্থ কি দু-চার দিনে লেখা যায়?

অবিশ্যি যে শান্তি-স্নিগ্ধ মন আর স্বচ্ছন্দ পরিবেশ নিয়ে লেখা শুরু করেছিলেন পুরন্দর মল্লিক, ঠিক তেমনটি বজায় থাকলে হয়তো—অনেক দ্রুত কাজ এগোত। কিন্তু সে জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে পুরন্দর মল্লিকের। পুরন্দর মল্লিকের স্ত্রী পাগল হয়ে গেছেন। বদ্ধ পাগল!

বছর দুই আগে হঠাৎ একদিন তিনতলার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগে দেখা দিয়েছিল মস্তিষ্ক বিকৃতির সূচনা। সেই থেকে নীরজা পরিণত হয়েছেন উন্মাদিনীতে।

নীরজা পাগল হয়ে যেতে পারেন, এ কেউ কোনওদিন ভাবেনি। আনন্দময়ী হাস্যমুখরা একটি উজ্জ্বল মহিলা ছিলেন নীরজা, ছিলেন স্বামী ও সন্তানদের প্রতি অপরিসীম স্নেহশীলা। আপন গৃহগণ্ডীর বাইরে আর যে কোনও একটি জগৎ আছে, অথবা সে জগৎ থাকার প্রয়োজন আছে, এ কোনওদিন অনুভব করতেন না নীরজা। এই গণ্ডির মধ্যেই তিনি সুখী, এই গণ্ডি-কাটা

জগতের তিনিই মধ্যমণি—এ-ই তাঁর আনন্দ ছিল।

পাঁচ বছর আগে—যখন একটি বিখ্যাত কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক স্বামী পুরন্দর মল্লিক বলা-কওয়া নেই হঠাৎ তাঁর অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিলেন, বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অদম্য উৎসাহে লিখতে শুরু করলেন এই "মানবজাতির মনোন্মেষের ইতিহাস", তখনও নীরজা হাসি মুখেই মেনে নিয়েছিলেন স্বামীর এই খামখেয়াল! প্রতিবাদ করেননি।

অবিশ্যি টাকার অভাব তাঁকে পেতে হয়নি। শ্বশুরের—অর্থাৎ পুরন্দরের বাবার দরুন টাকা ছিল বিস্তর। তবু—সহজ সুস্থ মানুষটা চাকরি ছেড়ে দেবে এ কোন্ স্ত্রী বরদাস্ত করে?

কিন্তু নীরজা করেছিলেন। অম্লান মুখেই করেছিলেন। সেই নীরজা হঠাৎ মাথায় একটু ধাক্কা খেয়ে পাগল হয়ে গেলেন!

পুরন্দরের পক্ষে এর চাইতে মর্মান্তিক কষ্ট আর কি আছে!

—মার চাইতেও বাবার জন্যেই আমার বেশি কষ্ট হয় রে ছোড়দা! ম্লান উদাস মুখে বললে করবী।

কমল সায় দিলে—তা সত্যি!... অথচ দেখ, আগে বাবার কাছে আর কতটুকুই বা ঘেঁষতাম আমরা?

—বাবার সহ্যশক্তিটা কী অসাধারণ ভাব? এই যে আজ দু-বছর ধরে কী কাণ্ডই না করে চলেছেন মা, একদিনের জন্যে একটু অসহিষ্ণুতা দেখিনি।.... করবী বলে।

—আমরা তো মাঝে মাঝে কত অতিষ্ঠ হয়ে যাই—বললে বিমল।

তিন ভাই তিন বোন জমায়েত হয়েছে এক জায়গায়। গল্প চলছিল—বহুবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে, আপাতত এসেছে মায়ের অসুখের প্রসঙ্গ।

ছজনে একত্র হওয়া সচরাচর বড় ঘটে না, আজ ঘটেছে।

ভাইরা অবশ্য বাড়িতেই থাকে, কমল আর বিমল এখনও পড়ুয়া, বড় নির্মল সম্প্রতি কী একটা কাজে ঢুকেছে। তবে বিয়ে হয়নি এখনও, তাই ভাইবোনদের মজলিশ থেকে উস্‌খুস করে উঠে যাবার চেষ্টার কারণ কিছু নেই।

করবী প্রায়ই আসে, পূরবী আর সুরভি তেমন আসতে পারে না। তবু সুবিধে পেলেই আসে।

নীরজা কত আনা-নেওয়া করতেন, কত আদর-যত্ন করতেন মেয়েদের, কত দেওয়া-থোওয়া করতেন, আজ তিনি অপারগ হয়েছেন বলে কি মেয়েরা বাপের বাড়ি আসা ছেড়ে দেবে? না, এত অকৃতজ্ঞ তারা নয়।

—আজ এখনও ঘুমোচ্ছেন—শান্ত গলায় বললে সুরভি—এসে অবধি ঘরে ঢুকিইনি!

—ঢুকেই বা কি করবি? পূরবী বলল—গেল দিনে আমি যেদিন এসেছিলাম জেগেই তো ছিলেন, চেঁচামেচিও করছিলেন না, খোকাটাকে সামনে নিয়ে গেলাম। কত করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম—'মা এই তোমার সেই টুটুল সোনা, একবার একে দেখ, কোলে নাও না একটু, গ্রাহ্যই করলেন না। হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন—নিয়ে চলে যাও। অথচ আমার টুটুলকে কী ভালোইবাসতেন!

এই এক স্বভাব পূরবীর, কেবল নিজের ছেলেমেয়েদেরকে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করবে

মায়ের কাছে। যদিও তার এ চেষ্টাকে এরা কেউ সমর্থন করে না, তবু এখন আর কেউ প্রতিবাদ করে উঠল না। গত দিনের কথা, সে নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি?

এখন সকলেরই মন বিষণ্ণ ব্যথাতুর! মায়ের জ্ঞানশূন্যতা তো পীড়াদায়ক বটেই, আরও পীড়াদায়ক নীরজার বিকৃত চিত্তের বিকৃতির প্রকাশটা। চিরদিনের ভক্তিমতী নীরজার আজ স্বামীর প্রতি কি অদ্ভুত মনোভাবই গড়ে উঠেছে! আশ্চর্য! তাঁর ধারণা তাঁর অসুখের জন্য পুরন্দরই দায়ী!

তাই বিজাতীয় এক আক্রোশ তাঁর পুরন্দরের ওপর।

ডাক্তারেরা অবশ্য বলেন—এইটাই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক মস্তিষ্কের স্বভাবই এই—সবচেয়ে প্রিয়জনকেই সন্দেহ করা! সব থেকে আপন ব্যক্তির ওপরই আক্রোশপরায়ণ হয়ে ওঠা।

কিন্তু ডাক্তারদের এ থিয়োরি পুরন্দরের ছেলেমেয়েকে প্রবোধ দিতে পারে না, তারা তবুও ভাবে মায়ের এটা অন্যায়, অন্যায় আর নিষ্ঠুর অবিচার! ভাবে যতই পাগল হোন তবু তো মানুষ! কি করে ভুলবেন পুরন্দরের স্নেহ প্রেম দরদ?

তারা তো জানে!

তারা তো সবই জানে!

তাই সবাই মিলে যখন আলোচনা করে এ নিয়ে, তখন বাপের দুঃখ ভেবেই মন তাদের বেশি ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। অবিশ্যি মায়ের এই দুঃখাবহ অবস্থা কি তাদের মনকে ক্লিষ্ট করে না? করে—খুবই করে, কিন্তু একটা চৈতন্যহীন জীবের ওপর—যার সঙ্গে মনের আদান-প্রদান হচ্ছে না,—তার ওপর কতক্ষণ সহানুভূতি রাখা যায়?

অনেক সময়ই তাই রাগ আসে মায়ের ওপর। আর শ্রদ্ধায় মন অবনত হয়ে আসে বাপের প্রতি।

সত্যি, একটি বারের জন্যে রেগে উঠতে দেখল না তারা পুরন্দরকে।

—কতক্ষণ এ রকম আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন? প্রশ্ন করল সুরভি। সে আসে সবচেয়ে কম, তাই সবচেয়ে অনবহিত।

নির্মল বলল—সকাল সাতটায় দেওয়া হয়েছে, এই খানিক পরেই আবার চেঁচাতে শুরু করবেন।

—এখন তো আর ওষুধ খাওয়ানো যায় না?

—নাঃ! ওই—জোর করে ফুঁড়ে দেওয়া!

—দেওয়া যায়?

—সহজে কি আর দেওয়া যায়?.... নির্মল সামান্য হাসে—চিহ্ন থেকে যায়! ...এই দেখ না। বাহুমূলে ছোট্ট একটু ছড়ের দাগ দেখায় নির্মল।

—কী সর্বনাশ! দাদা! পাগলের নখের বিষ রক্তে মিশে গেলে কি না হতে পারে দাদা?

—হতে তো অনেক কিছুই পারে, করা যাবে কি?

—ডাক্তার এসেছিল?

—আজকাল শশী বলে ছোকরাটা আসছে।

শশী এদের ডাক্তারের কম্পাউন্ডার!

—ডাক্তাররা কী বলেন?

বলেন তো—এরকম কেস সারে। বংশে যখন কোনও হিস্ট্রি নেই, চোট্ লেগে ব্রেনটা ইয়ে হয়ে গেছে, তখন সারার আশা ছাড়া যায় না।

—কিন্তু এভাবে অনবরত ঘুম পাড়িয়ে রাখলে জীবনীশক্তি কমে যাবে না?

করবী আর একবার তার সন্দেহ ব্যক্ত করে।

—তা হয়তো যাবে, তবে সাধারণত এসব 'কেস'-এ জীবনীশক্তি খানিকটা বেড়ে যায়।

সবজান্তার ভূমিকা গ্রহণ করে উপরোক্ত মন্তব্যটি প্রকাশ করে নির্মল।

বামুন ঠাকুর এসে দরজায় দাঁড়ায়। রান্না প্রস্তুত হয়েছে তার সঙ্কেত।

—চল্, মা না-জাগতে খেয়ে আসি।

—আমি খেয়ে এসেছি। করবী বলে।

—রবিবারে এত সকাল সকাল খেয়ে এসেছিস্?

—আমার আবার রবিবার! আজও তো 'ও' কাজে বেরিয়েছে!

পূরবী ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে— 'পয়সা' 'পয়সা' করেই লোকটা গেল।

কথা কেউ গায়ে রাখে না। দশ বছরের ছোট বোনও না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় করবী—তা বড়দি, বাড়ি বসে থাকার চাইতে ভালো।

পূরবীর বর নামে উকিল, বাড়িতেই বসে থাকে।

পূরবী কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থাকে।

মনের গলদ কেটে যায় খাবার ঘরে গিয়ে, আহারের আয়োজন-প্রাচুর্যে। পূরবীই নিজে থেকে ডাকে—আয় না রুবি, কিছু না খাস মাছ খা একটু।

—কিছুই পারব না বড়দি!

—খুব পারবি!... উঃ কত রকম রেঁধেছে ঠাকুর?

বিমল হাসে—আমি আজ নিজে বাজার গিয়েছিলাম, তোমরা আসবে বলে!

অতঃপর মাছের গুণাগুণ বর্ণনার সঙ্গে উঠেছিল সিনেমার প্রসঙ্গ, হঠাৎ একটা চিৎকার উঠল।... বন্য জন্তুর আর্তনাদের মতো তীব্র চিৎকার।

দীর্ঘ দু-বছর ধরে পরিচিত আছে এরা এ চিৎকারের সঙ্গে।

—সর্বনাশ করেছে!

—তোমরা থাক, আমি যাচ্ছি। করবী বলল। ও খাচ্ছিল না, বসেছিল।

—তুই একা পারবি সামলাতে?

—বাবা নিশ্চয়ই নেমে এসেছেন!

কথাটা ঠিক!

পুরন্দর নিশ্চয় নেমে এসেছেন। এ চিৎকার শুনে তিনি স্থির থাকতে পারেন না।

ওপরে উঠে গিয়ে দেখল ঠিক তাই। পুরন্দর এসে কাতর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে, আর নীরজা নিজের কপালে করাঘাত করে চেঁচাচ্ছেন—তবু মরছি না আমি! তবু মরছি না! হে ভগবান, তবু মরছি না!... দূর হয়ে যাও! আমি তো তোমার সামনে আর যেতে চাই না, তুমি আস কী করতে? লজ্জা করে না? মুখ দেখাতে লজ্জা করে না?

করবী বাপের পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। পাখার রেগুলেটারটা শেষ প্রান্তে টেনে দিয়ে আদরের সুরে বলে—মা—ওমা, ওসব কি কথা হচ্ছে? দেখ না—আমরা এসেছি যে! সব্বাই এসেছি। বড়দি, মেজদি, আমি! তোমার পূরবী, সুরভি আর করবী। বুঝতে পারছ না?

—পারছি!

ঘাড় কাৎ করলেন নীরজা আচ্ছন্নের মতো!

—আমরা তোমায় দেখতে এসেছি মা!

—দেখতে এসেছ? দেখতে এসেছ কেন?

—তোমার যে অসুখ করেছে মা!

—অসুখ করেছে? কে বলেছে অসুখ করেছে?

হঠাৎ বিপরীত ফল ফলে। স্তিমিত ভাব বদলে ফের উগ্র হয়ে ওঠেন নীরজা।

—মিথ্যে কথা! বানানো কথা! অসুখ নয়—অসুখ নয়—তোরা জানিস না, আসল কথা জানিস না।

সহসা ঠাঁই ঠাঁই করে খাটের বাজুতে মাথা ঠুকতে থাকেন নীরজা।

করবীর সাধ্য নয় সামলায়।

পুরন্দর এগিয়ে আসেন, স্ত্রীর মাথাটা তুলে ধরে কোমলকণ্ঠে বলেন—ছি, কি হচ্ছে? দেখ তো কি রকম লাগল?

—দরদ দেখান হচ্ছে?

তীব্র একটা হাসির ঢেউ খেলে যায় ঘরে—হাসির সঙ্গে কথা—ও রুবি, দেখ দেখ দরদ দেখান হচ্ছে। কত ভেকই জানে, মিন্‌সে।

লজ্জায় মাথা হেঁট করে করবী।.... বাপের দিকে চাইতে পারে না। অবাক হয়ে ভাবে সুস্থ অবস্থায় জীবনে তো কখনও একটি অরুচিকর শব্দ উচ্চারণ করেননি নীরজা, এখন রসনায় এমন শৈথিল্য এল কী করে? অনভ্যস্ত ভাষা মুখে জোগায় কোথা থেকে?

পুরন্দর এই দু'বছরে চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকটা আয়ত্ত করেছেন বই কী! এবার আর কোমল গলা নয়, ধমকের সুরে বলেন—কী হচ্ছে কী? ছেলেমেয়েদের সামনে এই সব খারাপ কথা বলছ?

ব্যস, কেঁদে ফেললেন নীরজা।

ডুকরে কেঁদে উঠে বলেন—বলব না কেন? আমি যে পাগল হয়ে গেছি!

ততক্ষণে আরও পাঁচ ছেলেমেয়ে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। বিমল এগিয়ে গিয়ে মার গায়ে হাত রেখে বলে—কে বলল তুমি পাগল হয়ে গেছ? ছিঃ। মাথায় চোট লেগে সব ভুলে যাচ্ছিলে কিছুদিন। এখন তো ভালো হয়ে গেছ মা!

—ভালো হয়ে গেছি? নীরজা ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন—ভালো হয়ে গেছি? তোরা বলছিস?

—বলছিই তো! এই তো এখন কি আর কিছু ভুলে যাচ্ছ? দেখ না—চিনতে পারছ না আমাদের?

—চিনতে পারব না তোদের?

সহজ মানুষের মতো স্বাভাবিক একটু হাসি হেসে ফেললেন নীরজা!

হাসি ফুটল ছেলেমেয়েদের মুখে—বল তো আমরা কে? নাম বল তো সকলের?

—কি যে বলে! সত্যি পাগল পেলি না কি আমায়?

পূরবী এগিয়ে আসে, বলে—মা তোমার টুটুল এবার অভিমান করে আসেনি।

আবার টুটুল।

সাত বছরের ধাড়ি ছেলেকে নিয়ে দিদির এই আদিখ্যেতা কারুরই ভালো লাগে না।

নীরজাও বিরক্তি-কুটিল দৃষ্টিতে তাকান মেয়ের দিকে।

—তুমি সেবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তাই টুটুলের অভিমান হয়েছে।

—অভিমান হয়েছে? নীরজা মুখ ভেঙিয়ে বলে ওঠেন—তা তোমারই বা মান-অভিমান নেই কেন? আবার আস কোন্ লজ্জায়? তোমাকেও তো দূর করে দিয়েছিলাম সেদিন।

ছেলে-মেয়েরা হতাশ দৃষ্টিতে তাকায়।

নাঃ! আশার আর কিছুই নেই। বিদ্যুৎবিকাশের মতো এক এক সময় যেটুকু সুস্থতা দেখা যায় তাতেই বেচারারা আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কিন্তু মুহূর্তেই সে আশা বিলুপ্ত হয়।

নীরজার মুখে এই কথা! ধারণাই করা যায় না।

পূরবী আরক্ত-মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যত পাগলই হোন নীরজা, তবু বিশেষ করে তার ওপরই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাবটা সহ্য হয় না পূরবীর।

—বড়দিও একটা পাগল।... সুরভি বলে নিচু গলায়।

হঠাৎ আবার একবার হেসে ওঠেন নীরজা। হেসে উঠে বলেন—হুঁ, ধরা পড়েছে রাইরাধা!

তারপরই চাপা গলায় বলেন—ওঁকে এ-ঘর থেকে চলে যেতে বল।

—কেন মা, বাবা থাকুন না!

—আঃ! যা বলছি কর না! দেখছ না—উনি কী রকম অতিষ্ঠ হচ্ছেন!... বই লিখতে হবে যে, বই! মহাভারতের মতন মোটা বই! মানুষের রোগ অসুখ দেখবার সময় আছে? দূর করে দে, দূর করে দে!...

করবী বাবার মুখের দিকে তাকায়... মুখ দেখতে পায় না, জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন পুরন্দর।...

মমতায় মনটা ভরে যায় করবীর। ভাবে বড়দি এতটুকু কথার এদিক-ওদিকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, আমরাও অনেক সময় কত অসহিষ্ণু হয়ে উঠি, আর বাবা কি সহ্যটাই করেন।

—তবু গেল না? তবু দাঁড়িয়ে রইল?

উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন নীরজা।

নির্মল বাবাকে চোখের ইশারা করে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান পুরন্দর কেমন একটা স্খলিত ভঙ্গিতে। করবী মায়ের প্রাণে করুণা সঞ্চারের আশায় বিষণ্ণ গলায় বলে—বাবাকে এমন কর কেন মা?

—কেন করি?... নীরজা সহসা উঠে বসেন, বলেন—বলব, তোকেই বলব। এদের সব চলে

যেতে বল। শুধু তুই থাক একা। তুই আমার বড় ভালো মেয়ে! ... যা, তোরা সবাই পালা দিকি একটু।

নীরজার এ ভঙ্গি ওদের সকলেরই অতি পরিচিত।... এক এক সময় এক একজনকে 'ভালো' বলে মনে হয় নীরজার। অন্তরঙ্গ মনে হয়। তখন শুধু তার কাছেই আসল কথা বলতে বসেন।

নীরজার আসল কথাও এদের মুখস্থ।

চুপি চুপি নীরজা এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করবেন—পাগল নীরজা হয়নি, আসলে পাগল হয়ে গেছেন পুরন্দর। নীরজাকে শুধু সকলে মিলে 'পাগল' বানিয়ে রেখেছে।

তারপর কাকুতি-মিনতি করতে থাকবেন—ডাক্তারের হাত ছাড়িয়ে, আর এ বাড়ির গণ্ডি কাটিয়ে, নীরজাকে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যেতে। দূর কোন বিদেশে।... অন্তত এ বাড়ি ছাড়া আর কোথাও।...

প্রতিশ্রুতি চাইবেন, কিন্তু যদি দেখেন ছেলে-ভুলোনোর মতো "আচ্ছা নিয়ে যাব" বলে স্তোক দেওয়া হচ্ছে তাঁকে, তাহলেই যাবেন ক্ষেপে।... সেই ক্ষ্যাপাটা এরা জানে, তাই তর্ক করে, প্রতিবাদ করে, তবু আচ্ছা বলে না সহজে।

এরা চলে যেতেই নীরজা বলে ওঠেন—এখনও তোরা তোদের বাপের স্বরূপ চিনতে পারলি না?

—পেরেছি। করবী বলে।

—কী চিনলি?

—খুব ভালো।

—তাহলে ছাই চিনেছিস্। একের নম্বরের বদমাইস, বুঝলি? ওর ওই বই লেখার সুবিধের জন্যে ও একদিন সক্কলকে মারবে, বুঝেছিস? সক্কলকে খুন করবে।... কী, চুপ করে রইলি যে?

—কী বলব?

—কেন, হক্ কথা বলতে পারিস না?... আচ্ছা বদমাইস যদি না হয়, তাহলে নিশ্চয় পাগল? হ্যাঁ, নিশ্চয় পাগল!

—তাই হবে!

—তবে আমাকে তোরা এমন জব্দ করে রেখেছিস কেন? আমায় ছেড়ে দে? একজনের বদলে আর একজনকে পাগল বলবি?... আমি তো ঠিকই আছি, আমার কেন তবে—

করবী বলে—আচ্ছা মা, তুমি যদি ঠিক আছ তাহলে অত চেঁচাও কেন? বুঝতে পার তো চেঁচাও? আগে এমন করতে?

অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে নীরজার মুখে। ফিস্ ফিস্ করে বলেন—আহা বুঝছিস না, শান্ত মানুষের পার্ট করেই জীবন গেল, চেঁচাতে তো কখনও পাইনি, তাই এই ছুতোয় চেঁচিয়ে নিচ্ছি। তোরা রাগ করতে পারবি না, বলবি 'মা পাগল' কেমন মজা? হি-হি-হি!

করবী হতাশ হয়ে বাইরের দিকে তাকায়।... রাস্তার ওদিকে একটা তিনতলা বাড়ি—জানলায় পর্দা দুলছে।...

ওরা কেমন সুখী!

করবীদের সুখের সংসারে কে আগুন লাগাল!

নীরজা এক মিনিট অপেক্ষা করেই আবার অন্য প্রসঙ্গে এসে যান—জামাইকে বলেছিলি?

আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ওঠে নীরজার মুখ। জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে দুই চোখ।

করবী মলিন গলায় বলে—বলেছিলাম!

সত্যিই বলেছিল সে বরকে। বলেছিল মাকে নিয়ে বিদেশ যাবার কথা। ... বলেছিল—আচ্ছা একটিবার মার কথা শুনেই দেখ না? উপকার হতেও তো পারে।

করবীর বর উড়িয়ে দিয়েছিল সে-কথা। উত্তর দিয়েছিল—"পাগলের কথামতো চললে যদি তার উপকার হত, তাহলে আর ভাবনা ছিল না। তাছাড়া আমি কোন্ ভরসায় এ রকম এক পাগলের দায়িত্ব নেব?"

—নিয়ে গেলে মা সেরে যাবেন!

—ওই আনন্দেই থাকো।

—ডাক্তার তো বলেছে রক্তে কিছু দোষ পায়নি।

—ডাক্তার অমন অনেক কিছু বলে।

করবীর 'বলেছিলাম' শুনেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন নীরজা, বলেন—কবে নিয়ে যাবে বলেছে?

—তা তো কিছু বলেনি, বলেছে এখন বড্ড কাজ!

—হুঁ হুঁ বুঝেছি! নীরজা আবার শুয়ে পড়েন। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বলেন—সব হারামজাদাকেই চিনলাম!... যা বেরো। বেরিয়ে যা ঘর থেকে!

করবী পুরবীর মতো রাগ করে না।

শুধু হতাশ নিশ্বাস ফেলে।... আর আশা করবার কী আছে? এতদিন হয়ে গেল, বাড়ছে বই কমছে না।

জামাইয়ের সম্বন্ধে এই কটূক্তি নীরজার মুখে?... সভ্য ভদ্র মার্জিতরুচি সেই নীরজা? নাঃ ধারণাই করা যায় না। নীরজা অবশ্য নিজের কাজের কৈফিয়ৎ দেন। কোনও একজনকে ডেকে হেসে হেসে ভারি যেন একটা কৌতুককর কথা এই ভাবে চোখ টিপে টিপে বলেন—যাকে যা বলবার ইচ্ছে ছিল, এইবেলা বলে নিচ্ছি, বুঝলি না? মজা মন্দ নয়, কি বলিস?

এক এক সময় মনে হয় বুঝি কথাগুলো সত্যি। যাকে বলেন তার বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু তারপরই সব ভেস্তে যায়।

হয়তো হি হি করে হেসে ওঠেন নীরজা, নয় তো বা ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

সেই নীরজা! স্বামীতে ভক্তিমতী, সন্তান স্নেহবতী নম্রস্বভাবা নীরজা!

কিন্তু ধারণা করা যায় না, এমন কত ঘটনাই ঘটে জগতে। কে জানত পুরন্দর মল্লিকের বাড়ি এমন ঘটনা ঘটবে! শুধু ডাক্তারেই বাড়ি ভরতি হয়ে উঠবে তা নয়, ডাক্তারের সঙ্গে আসবে পুলিস!

পাগলে আত্মহত্যা করে?

করে বই কী—ডাক্তার বলে,—নিশ্চর করে! পাগলেই তো করে।

পুলিসকে বোঝাতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল, তবু বুঝল শেষ পর্যন্ত। সত্যি মাঝ-রাত্রে নীরজাকে তিনতলার ছাদে তুলে নিয়ে গিয়ে কেউ ঠেলে ফুটপাথে ফেলে দিয়েছে এমন কথা তো বিশ্বাসযোগ্য নয়?

ডাক্তার বলে—মাথায় চোট লেগে উনি অপ্রকৃতিস্থ হয়েই হয়তো সিঁড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একেবারে নিচেয়।... যেমন আজ পড়লেন ছাদ থেকে। ওইটাই ঝোঁক!

স্তব্ধ হয়ে গেছে বাড়ি।

স্তব্ধ হয়ে গেছেন পুরন্দর।

বাপের মুখের দিকে তাকাতে পারে না ছেলেমেয়েরা।... নীরজা যে তাঁর কী ছিলেন, তা তো জানে এরা। আজ দুটো বছরই না হয় এ রকম হয়েছে।

তাও—বিছানায় পড়ে থেকেও—বুঝি নীরজা প্রাণটা ভরে রেখেছিলেন পুরন্দরের।

এ কী হল!

এ কী শোচনীয় পরিণতি ছিল নীরজার কপালে!

আবার তিন বোন একত্র হয়েছে।

শুধু বোনেরাই নয়, তাদের স্বামীপুত্র, এবং আরও যে যেখানে আছে।... এসেছেন পুরন্দরের যত আত্মীয়-আত্মীয়া।

'গোলমাল' করবার নিষেধ ঘুচে গেছে, আর আসবেন না কেন? পাগলিনী নীরজার পারলৌকিক কাজ কীভাবে হবে সেটা জানবার কৌতূহলকে তাঁরা ঠেকাবেন কী করে?

কিন্তু পুরন্দর যে আর মোটেই নীচে নামছেন না! বারণ করে দিয়েছেন সক্কলকে, কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। অনবরত লিখে চলেছেন পাতার পর পাতা।... মানবজাতির আদিম ইতিহাস! যে যুগে মানুষে আর পশুতে প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য ছিল না।... লিখছেন—প্রামাণ্য পুঁথি উল্টোচ্ছেন... খাতাপত্র খুঁজে না পেলে তচ্‌নচ্‌ করে ফেলছেন, আবার—আবার ডুবে যাচ্ছেন কাগজের সমুদ্রে।

—এখনও আলো জ্বলছে বাবার ঘরে। দাদার দরজায় টোকা দিয়ে বলল করবী। নির্মল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। রাত তিনটে।

—বাবাকেও কি আমরা হারাব দাদা?

—কী করব বল? বারণ করে দিয়েছেন—

—বাবার বারণটা কি তাঁর প্রাণের চাইতে বড় হল দাদা? আজ তিনবেলা খাননি। তুমি জোর করে বলোগে খেতে ঘুমোতে।

—আমি?

নির্মল কেমন অসহায়ের মতো বলে—আমার সাহস হচ্ছে না। মা গিয়ে অবধি বাবার সঙ্গে কথাই কইতে পারিনি আমি।

—সে তো কেউই পারছি না। তবু বাঁচাতে তো হবে বাবাকে। কিছু না কিছু খাওয়াতে হবেই।

—সেই তো ভাবছি।

—তুমি না পার আমিই যাচ্ছি।

—তাই বরং যা। দেখ যদি তোর কথায় কিছু খান।

দুটো সন্দেশ আর এক গ্লাস জল নিয়ে উঠে যায় করবী।

কতক্ষণ?

কতক্ষণ হল ওপরে উঠে গিয়েছিল করবী? কয়েক মিনিট, না কয়েক যুগ?....

হঠাৎ কী ভূমিকম্প হল? যে ভূমিকম্পে বাড়ির ভিত নড়ে ওঠে।... হ্যাঁ ভয়ঙ্কর একটা গর্জন শোনা গেল, তার সঙ্গে থালা-বাসন পড়ার একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দ।

এ আওয়াজে সবাই উঠে এসেছে বিছানা থেকে। বোকার মতো এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কারুর যে কিছু করণীয় আছে, তা আর মনে পড়ছে না।

মাঝ-রাতে উঠে এ-দৃশ্য দেখতে হবে, এ-কথা কে ভেবেছিল।...কে ভেবেছিল ঠিক তেমনি করে সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকবে করবী, যেমন করে নীরজা পড়েছিলেন দুবছর আগে রাত দুটোর সময়।

তফাতের মধ্যে সেদিন পুরন্দরও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিলেন তিনতলা থেকে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে দেখেছিলেন নীরজার তালগোল পাকানো দেহটার দিকে!

আজ তিনি নেমে আসেন নি, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে গর্জন করছেন—সহ্য করব না, কিছুতেই সহ্য করব না। আমার কাজে ব্যাঘাত আমি সহ্য করব না। যে বাধা দিতে আসবে, তাকেই ফুটবলের মতো স্যুট্ করব, টুঁটি ধরে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেব।... শেকড় সুদ্ধু উপড়ে ফেলে দিয়েছি, তবু ভীড় বাড়াচ্ছে! সহ্য করব না, বেশিদিন সহ্য করব না।... মায়া, মমতা, দরদ! বুজরুকির জায়গা পায়নি! সব বাজে, সব বোগাস্!

অর্থহীন

ওদের দুজনকে পাশাপাশি 'সিটে' বসে সিনেমা দেখতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আশ্চর্য, লোকে কত গুজবই রটাতে পারে।

যদিও আমি শুধু ওদের পিঠই দেখতে পাচ্ছি, তবুও চিনতে ভুল করেছি এ হতেই পারে না। ওদের সঙ্গে চার পাঁচটা বছর একই বাড়িতে বাস করেছি।

সেটা বোধ হয় বছর দশেক আগের কথা না ওরই কাছাকাছি, নতুন বিয়ে হয়ে আসা আনাড়ি এই দম্পতিটি আমাদেরই নীচের তলার দু'খানা ঘরের রাজ্যে সংসার পেতে বসেছিল। ঘর দুটো ভাড়া দেওয়া, সত্যি বলতে আমাদের দরকারে নয়, ওদেরই দরকারে। আমার ভাইপো বিনুর সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে কেমন করে যেন জেনে ফেলেছিল ওরা, নীচতলার ওই দক্ষিণ চাপা ঘর দুটো আমাদের এমনিই পড়ে থাকে, ব্যবহারে লাগে না। এসে ধরে পড়ল ছেলেটি দিতেই হবে, ঘরণী জুটেছে ঘর জোটেনি, প্রায় একটা বেসামাল অবস্থায় কাটাচ্ছে।

প্রেমঘটিত বিয়ের ভাগ্যে প্রায়শই যা হয় আমাদের সমাজে। এ কুলে ওকুলে কোনও কুলেই তেমন সমাদর সম্ভ্রমের ঠাঁই জোটে না। অতএব মান বাঁচানোর দায়ে ঘর করবার জন্যে ঘর খুঁজে বেড়ানো।

ঘর দুটো দক্ষিণ চাপা?

হোক হোক তাই যথেষ্ট। ওদের কাছে আপাতত ওই স্বর্গ। দক্ষিণা হাওয়া তো তাদের নিজেদের মধ্যেই প্রচুর রয়েছে।

তবে অনুভা ওই নীচতলাটায় খুব কমই থাকত, যতক্ষণ অমলেশ বাড়িতে থাকত শুধু ততক্ষণই। পালিয়ে আসত দোতলায়। হয়তো সংসারের কোনও কাজ হাতে নিয়েই সেলাই নিয়ে, বোনা নিয়ে, কোটবার জন্যে কুটনো নিয়ে, কাঁকর বাছতে চাল নিয়ে।

বলত 'একা একা ভয় করে বাবা।'

আসলে বুঝতাম আমাদের এই সাজানো গোছানো দোতলাটা ওকে টানে। সুন্দরভাবে থাকবার ইচ্ছেটা ওর প্রবল। সেটা খুব স্বাভাবিকও, কারণ অনুভা বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। কথায় কথায় প্রায়ই ওর মুখে সে কথা এসে পড়ত।

'বাবার ভীষণ ঘর সাজানো বাতিক, ওই নিয়ে মার সঙ্গে লাঠালাঠি। মা সব সময় বলবে,

"এত কী দরকার? এই তো বেশ সোফা সেটটি ছিল, আবার সে সব বদলে নতুন কেন? গেরস্থ ঘরে ডানলোপিলোর গদিতে কী দরকার? দরজা জানালায় এত দামি দামি পর্দা ঝুলিয়ে কী স্বর্গলাভ হবে তোমার? ও টাকা জমিয়ে রাখলে মেয়ের বিয়েতে কাজে লাগত'—ফিকে ফিকে একটু হাসত অনুভা এরকম সময়, বলত—বাবা বলত, 'তোমার মেয়ের বিয়ের টাকা কি আমি রাখিনি ভেবেছ? দেখো কী ঘটাটি করি!—অনুর বিয়েতে এমন ফার্নিচার দেব, জামাই ব্যাটার তাক্ লেগে যাবে।' ওই রকমই কথা বাবার—' তারপর আবার একটু হেসে উঠত, 'তা এমন বিয়ে ঘটল মেয়ের, বাবার কাছ থেকে লবডঙ্কা।'

এ হাসিটা যেন চেষ্টা করে জোরালো করা।

আমি বলতাম, 'তা হোক গে—তোমার নিজেরই সব হবে। বাবার জামাই-ই করবে সব কিছু। বাড়ি, গাড়ি দামি ফার্নিচার।'

তাতে কিন্তু অনুভা অবিশ্বাসের হাসিও হাসত না, হতাশার কথাও বলত না, বরং সোৎসাহেই বলত, 'আমিও তো তাই বলি ওকে, না হবার কী আছে? মানুষই তো করে এসব। আমার বাবা কী? একেবারে সেল্ফ-মেড ম্যান। বাবার, বাবার তো কিছু ছিল না। ও কেবল হেসে উড়িয়ে দেয়। আমি কিন্তু বিশ্বাস রাখি। তা ছাড়া আমি নিজেও কিছু করব, বি-এ-টা অবিশ্যি পাস করা হয়ে ওঠেনি। তাতে কী? কত রকমের চাকরি আছে জগতে। মেয়েদের জন্যে আজ-কাল অনেক দরজা খোলা।'

অবিশ্যি অনুভার সামনে চট করে তেমন কোনও দরজা খুলে যায়নি, খোলার কথা বললে একটু ঘুরঘুলি বলা যায়।

পাড়ার একটা সেলাই স্কুলে সেলাই শিক্ষিকার চাকরি জুটিয়েছিল একটা, যার মাইনের অঙ্কটা মুখে বলতে বাধে। তবু অনুভা তাতেই খুশি। তবু তো কিছু বাড়তি।

সেই 'বাড়তি' টুকুর খেয়া নৌকায় সে তার ইচ্ছেয় সমুদ্র পাড়ি দেবার সাধনা চালিয়ে চলেছিল। অনুভার সাধনায় তাদের সেই দক্ষিণা চাপা ছোট ঘর দু'খানিই 'দিব্যরূপ' ধারণ করেছিল। প্রথমেই একখানা পাখা ভাড়া করে ফেলেছিল অনুভা, তারপর সেই পাখার পিছন পিছন যেন পাখা মেলে উড়ে উড়ে এসে পড়ছিল, হালকা বেতের চেয়ার টেবিল, সুন্দর ছাপের ছিটের পর্দা, রং লাগিয়ে ভব্যসভ্য করা প্যাকিং কাঠের জাল আলমারি, বইয়ের র‍্যাক, ছোট টুকটুক সৌখিন জিনিস।

অনুভার হাতের গুণে সামান্য উপকরণেই ঘরের চেহারা মনোরম হয়ে উঠেছিল।

মনে আছে, একদিন আমি হেসে বললাম, 'তোমাদের এই সংসারের একটা নামকরণ করে ফেলো।'

অনুভা মহোৎসাহে বলে উঠল, 'বেশ আপনিই একটা নামকরণ করে দিন।'

বললাম, 'ধরো—সুখনীড়।' কিম্বা 'ভালোবাসার ঘর।'

'শেষেরটা, শেষেরটাই সুন্দর।' বলল অনুভা।

অমলেশ হেসে বলল, 'ঠিক আছে কালই তাহলে একটা সাইন বোর্ডের অর্ডার দিই, নামটা লিখিয়ে নিয়ে এসে দরজার মাথায় ঝুলিয়ে দেব।'

অনুভা রাগ দেখিয়ে বলল, 'সাইন বোর্ড? এ কী দোকান নাকি? নেমপ্লেট বলবে তো? 'ওই হল' বলে হো হো করে হাসল অমলেশ।

ভারি সুন্দর হাসিটা অমলেশের।

কদিন পরে একদিন তেমনি হাসির সঙ্গে বলল, 'নাঃ নেমপ্লেটটার নাম বদল করতে হবে।'

অনুভা ঝলসে ওঠে, 'হল কই? তাই বদল?

'আহা একেবারে সঠিক নাম রাখাই তো ভালো। আমার তো মনে হয় নাম রাখা উচিত 'চাহিদা ঘর।'

'তার মানে?' অনুভার চোখ গোলাকার।

'মানে খুব সোজা। এ ঘরের চাহিদা তো ফুরোতে দেখছি না, একটা মিটলেই আর একটা কিছুর বায়না।

অতএব—'

চাহিদাটা অবশ্যই ঘরের জন্যে কিন্তু আসামি তো ঘরণি, কাজেই অনুভা রেগে রসাতল করে। বলে, 'সাজিয়ে গুছিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না তোমার? আশ্চর্য।'

অমলেশ বলে, 'ইচ্ছে কেন করবে না? কিন্তু কোথাও তো থামতে হবে? এই তো বেশ সাজানো গোছানো হয়েছে, আবার তোমার ঘরের টেবল ফ্যানের বায়না।'

অনুভার যুক্তি সেই তো একটা লড়বড়ে শব্দ ঘ্যান ঘেনে পাখার জন্যে মাস মাস এক মুঠো করে টাকা ভাড়া যাচ্ছে, অথচ গোড়ায় একটু খরচ করলেই ইনস্টলমেন্টে পাখাটা কিনে ফেলা যায়।

যুক্তিটা ফেলনা নয়, কিন্তু অমলেশ বলে অবিরত যদি চাহিদার তালিকা বাড়াতে থাকো তুমি, আর তার পিছনে—সর্বশক্তি নিয়োগ করতে থাকো তো 'সুখনীড়'টা আর হল কখন? তাহলে বলো কর্মক্ষেত্র। অথবা রণক্ষেত্র।

'আমার ওতেই সুখ', বলে শেষ রায় দেয় অনুভা। অতএব মাস পড়লেই দেখা যায়, মাস কাবারি বাজারের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভা অমলেশ ঘরের জন্য কিছু একটা কিনে এনে হাজির করছে। আর দেখা যেত উৎসাহটা অমলেশের বেশি।

তার মানে মতান্তরটা ওদের সুখের বিলাস, কথা কাটাকাটিটা আহ্লাদের বিকাশ। ওদের ঘিরে সর্বদাই যেন একটু সুখ আর আহ্লাদের পরিমণ্ডল।

নীচের তলার ওই তুচ্ছ ঘর দুটোকে স্বর্গ তুল্য করেই যাপন করে ছিল ওরা চার পাঁচটা বছর, তারপর অমলেশের চাকরিতে প্রমোশন হল, আর অনুভা নিজেই একটা সেলাই শিক্ষণ কেন্দ্র খুলল, অতএব ওরা দক্ষিণ খোলা দোতলার ফ্ল্যাটে উঠে গেল।

কিন্তু আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়ে দেয়নি, যখন তখন বেড়াতে আসত সময় পেলেই। হাসি গল্পে খানিকটা সময় হালকা করে দিয়ে যেত।

আমিও গিয়েছি মাঝে মাঝে। দেখেছি, আরও কত কী করেছে অনুভা। ওদের ফ্রিজ হয়েছে, গডরেজের আলমারি হয়েছে, জোড়া খাট হয়েছে। গ্যাসের স্টোভ, প্রেসার কুকার। অমলেশ বলত, 'অনু ওর বাবার অপরাধের জরিমানা দিচ্ছে বুঝলেন? ওর বাবার জামাইকে যা যা দেওয়া উচিত ছিল, ও তার সবই প্রায় দিয়ে চলেছে আমায়।'

অনুভা বলত, 'আহা রে আমি যেন সবই নিজের টাকা থেকে করেছি। দু'জনের আয় থেকে গুছিয়ে সংসার চালিয়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে করেছি।'

আমি বলতাম, 'সেটাও তোমারই দেওয়া। গুছিয়ে সংসার করে টাকা বাঁচানো কি সোজা ক্রেডিট?'

অনুভা হাসত। সাফল্যের হাসি।

মনে হত এবার ওদের সংসারের নামকরণ করা যায় 'সুখনীড়।'

কিন্তু অনুভার ওই সাফল্যের আর সুখের অন্তরালে যে আর একটি পিপাসা আর একটি শূন্যতা জন্ম নিয়েছিল সেটাও টের পাচ্ছিলাম। এতদিন বিয়ে হয়েছে অনুভার, সে মা হয়নি।

হঠাৎ একদিন বলে বসল, 'এত সব করে আর কী-ই-বা লাভ হল? মানে হয় না।'

আমি বুঝতে পারলেও সেদিকে না গিয়ে হালকা গলায় বললাম, 'কেন, আবার কীসের চাহিদা তোমার চাহিদা ঘরের?'

অমলেশ স্ত্রীর দিকে একটু কৌতুক কটাক্ষ করে বলল, 'এখন চাহিদা—দোলনাখাটের আর পেরাম্বলেটারের।'

অনুভা রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর আমাকে দীর্ঘদিনের জন্যে চলে যেতে হল রাজস্থানে, নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি, সম্প্রতি আবার ফিরেছি।

ফিরে এসে চেনা জানা জগতের সবাইয়ের খোঁজ নিচ্ছিলাম বিনুর কাছে, অনুভা অমলেশের খবর জিজ্ঞেস করতেই পাজিটা কিনা বলে দিল, 'ওদের কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না। নাম করতে ইচ্ছে করে না ওদের।'

'সে কী? কেন?'

'ওরা ডিভোর্স করেছে। আর শুনতে কিছু যেও না। কেলেঙ্কারির চরম।'

বিশ্বাস করতে সময় লেগেছিল। কিন্তু বিনু খামোকা কেন বাজে কথা বলতে যাবে? এই ভেবেই শেষ অবধি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম। ভাবলাম জগতে কী না ঘটতে পারে।

কিন্তু এখন দেখছি বাজে কথাই বলেছে বিনু। হয়তো নিজেই যোগাযোগ আর রাখতে পারে না, কোথাকার কোন শোনা কথায় উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছে।

ওদের পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখতে দেখে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

আমি পিছনে বসে আছি, ওরা সামনে, অন্ধকারের সুযোগে অমলেশের কোলের ওপর অনুভার হাতখানি। মনে মনে হাসলাম। এখুনি সাড়া দিয়ে রসভঙ্গ করতে চাই না বাবা। তা ছাড়া—সাড়া দেওয়া মানেই অন্তত দুটো চারটে কথা কওয়া তো। এক্ষণে পার্শ্ববর্তীরা বিরক্তি প্রকাশ করবেন, সিনেমা হলটা যে কথা বলার জায়গা নয়, এইটি বোঝাতে একশোটি কথা বলবেন, তীক্ষ্ণ মন্তব্য করবেন।

অতএব ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকাই ভালো। হল থেকে বেরিয়ে কথা হবে।

যথাসময়ে ছবি শেষ হল, 'জন-গণমন' ও সমাধা হল, হল থেকে বেরোবার সময় ঠিক নজর রেখেছি, সিঁড়িতে নেমেই ডেকে উঠলাম অনুভা—'

অনুভা চমকে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, আবার ডাকলাম, হঠাৎ দেখি অনুভা আর কোনও দিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে।

ব্যাপার কী, অনুভা ঠিক বুঝতে পারেনি ডাকটা পিছন থেকে আসছে? সামনের দিক ভেবে সামনেই এগোচ্ছে।

অগত্যা আমাকেও দ্রুত এগোতে হল এবং ধরেও ফেললাম।

হেসে বললাম, "ডাকটা কোন দিক থেকে এল বুঝতে পারনি বুঝি?"

অনুভার মুখে আমার উৎফুল্ল হাসির প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম না, একটু ফিকে হাসি হেসে বলল, 'বুঝতে পেরেছিলাম।'

অনুভার মুখটা শুকনো, রংটা মলিন, চোখ দুটো নিষ্প্রভ।

কোনও শোকের ব্যাপার ট্যাপার নয়তো? বেচারির বাবা কি মা হয়তো—

বললাম, 'কোথায় আছ এখন? সেই ফ্ল্যাটটাতেই? না, আবার বাসা বদল?'

অনুভা একটু ইতস্তত করে বলল, 'না, সেখানেই আছি।'

তবে চলো পৌঁছে দিই। উঠে এস আমার গাড়িতে। যেতে যেতে গল্প হবে। কতদিন পরে কলকাতায় ফিরলাম। কই, অমলেশ কই? কোন দিক দিয়ে বেরোল? দেখো দেখো আবার না ট্যাক্সি ধরতে ছোটে।'

ভীড় ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে আসছিলাম।

তাকাচ্ছিলাম এদিক-ওদিক, অমলেশ হঠাৎ চোখ ছাড়া হয়ে কোন দিকে গেল?

অনুভা কিন্তু চলেছে নির্বিকার।

আমার গাড়ির কাছে এসে পড়ে ব্যস্তভাবে বললাম, 'কোন দিকে গেল বলতো?'

আমি সেই ট্যাক্সি ধরার কথাই ভাবছিলাম।

অনুভা গাড়ির দরজায় হাত রেখে আমার চোখে চোখ না ফেলে অদ্ভুত একটা বর্ণহীন স্বরে বলল, 'ও ওর বাসায় চলে গেছে।'

আমার সারা শরীরটা হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠল। আমার বিনুর কথা মনে পড়ে গেল।

কিন্তু তা হলে?

এই একত্রে সিনেমা দেখা?

অন্ধকারের সুযোগে কোলের ওপর হাত রাখা? এটা কী রহস্য?

রহস্য ভেদ হল আস্তে আস্তে। অনুভাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ওর ফ্ল্যাটেই এলাম। সেই দক্ষিণ খোলা দোতলার ফ্ল্যাট। সেই খাট, আলমারি, ফ্রিজ, গ্যাস, প্রেসার কুকার, আলগা সেলফ সম্বলিত দু ঘরের সংসার। যেখানে যেমন সাজানো ছিল ঠিক তাই রয়েছে। শুধু সব কিছুর ওপর ধুলো শুধু পর্দা কুশান বেড কভার ময়লা ময়লা। শুধু সংসারে দু'জনের মধ্যে একজন মাত্র।

'হ্যাঁ বিনুদার কথাই ঠিক—' বলল অনুভা, 'আমরা আর এক নেই।'

রুদ্ধশ্বাসে বলি, 'কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হল অনুভা?'

অনুভা আস্তে বলল, 'আমিও এখন তাই ভাবি কী করে সম্ভব হল। অথচ হয়েও গেল।'

'কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপারের কারণ তো কিছু থাকবে?'

'কারণ ছিল না, 'কারণ' সৃষ্টি করা হল—' অনুভা কেমন এক রকম হেসে বলল, 'আইনও যেমন আছে, তেমনি আইনের ফাঁকও আছে ইচ্ছে করে চেষ্টা করে ও দোষী সাজল, অথচ—' অনুভা মাথা হেঁট করে বলল, 'সব দোষ আমারই।'

হঠাৎ একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল। আমিও চুপ, অনুভাও চুপ।

কিছুক্ষণ পরে অনুভাই আবার কথা বলল, 'ভূতে পাওয়া' কথাটা হাসির বলেই জানতাম, দেখলাম কথাটা হেসে ওড়াবার নয়, নিজের জীবনেই দেখলাম। ভূতেই পেয়েছিল আমায়। এখন ভাবি কি নির্লজ্জতাই করেছি। অথচ তখন মনে হয়েছিল বাচ্চা কাচ্চাহীন সংসার একেবারে অর্থহীন। আমার মনে হয়েছিল—এই না হওয়াটার জন্যে ওই দায়ী। ওর ত্রুটির জন্যে আমার জীবনের সম্পূর্ণতা এল না। অন্ধের মতো ওই ভাবনাটার মধ্যেই নিজেকে একেবারে সমর্পণ করে বসলাম, আর কী যে এক নিষ্ঠুরতায় পেয়ে বসল আমায়, উঠতে বসতে অভিযোগ অসন্তোষ শুরু করে দিলাম তারপর—

অনুভা ম্লান হাসির সঙ্গে বলল, 'আপনি হয়তো আমাকে খুবই নির্লজ্জ ভাবছেন। আর সত্যি তো তাই। নির্লজ্জ না হলে ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করি।—ও কেবলই বলেছে ঈশ্বর

আমাদের যা দেননি, তাই নিয়ে এত অশান্তি পাও কেন? যা দিয়েছেন, সেটাই কি কম? আমাদের দু'জনকে তো দিয়েছেন দু'জনের জন্যে।'—কিন্তু আমার তখন ওই কথাগুলো খুব ছেঁদো মনে হত। রাগ করে বলতাম, নিজের ত্রুটি ঈশ্বরের ওপর চাপালে অনেক সুবিধে। বেশ প্রমাণিত হোক ঈশ্বর আমাকেই দেননি। তোমার তো চাহিদা নেই, আমারই চাহিদা অতএব জানা দরকার।'

আমি ওর সিঁদুরবিহীন সিঁথি সম্বলিত হেঁট করা মাথাটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'থাক, অনুভা, তোমার বলতে কষ্ট হচ্ছে।'

সিঁদুর পরাটা অনুভার একটা আর্ট ছিল। খুব সরু অথচ অনেকটা টানা। কপালের ওপর থেকে একেবারে প্রায় মাথার পিছন পর্যন্ত। যেন সিঁথিটাই প্রায় অস্পষ্ট।

অনুভা আবার কুমারী জীবনে ফিরে গেছে।

অনুভা আস্তে বলল, 'প্রকৃত কথাটা কাউকে বলতে না পারা আরও কষ্ট। নিজের অপরাধের ভার বহে বহে'—থামল একটু। তারপর আবার বলতে লাগল, 'সে যাক, ডাক্তারের কাছে যাওয়া হল, ডাক্তার বলল, ত্রুটি আমারই মধ্যে। 'মা' হওয়ার যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। ওই রায় শুনে, লজ্জায় দুঃখে অপমানে হঠাৎ ক্ষেপে উঠলাম আমি। এতদিন ধরে ওকে যা কিছু বলেছি, যত কিছু অভিযোগ করেছি, তার ধিক্কার আর গ্লানি যেন বুকের মধ্যে হাতুড়ি বসাতে লাগল, সেই আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলাম না, জ্বালায় ছটফটিয়ে বলে বসলাম, 'ডাক্তারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতেই বা অসুবিধে কি? ঘুষ দিতে পারলে সবাইকে কেনা যায়'—শুনে ও হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল। কতদিন কত নিষ্ঠুর কথা বলেছি। কত রূঢ় ব্যবহার করেছি, এ রকম মুখ কোনওদিন দেখিনি।'—অনেকক্ষণ ওইভাবে বসে থেকে শুধু বলল, 'বিশ্বাস চলে গেলে আর কী থাকে?'

তারপর থেকে ও একেবারে আমার সংস্রব ত্যাগ করল, কোথায় থাকে, কোথায় খায়, মাঝে মাঝে এসে টেবিলের ওপর কিছু টাকা রেখে চলে যায়, কথা বলে না। সেই অপমানের টাকা আমিই বা নেব কেন? আর নিয়েই বা করব কী? আমি কি রাঁধছি খাচ্ছি? দিনের পর দিন শুধু চা খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।—ভয়ানক একটা অভিমানে আমিও পাথর। না হয় মুখ ফস্কে একটা কথা বলেই ফেলেছি, তার কি ক্ষমা নেই?—কিন্তু ক্ষমা তো দূরের কথা, ও অন্য পথ ধরল। অর্থাৎ উচ্ছন্নের পথ ধরল। আমারই সেলাই স্কুলের একটা বাচাল বিধবা মেয়ের সঙ্গে এমন বাড়াবাড়ি মেলামেশা করতে শুরু করল যে, লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার হল। মেয়েটাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু সে উল্টো চাপ দিয়ে শাসিয়ে গেল নালিশ করবে। কারণ—কারণ না সেকথা মুখে আনতে পারছি না আপনার সামনে। হ্যাঁ, এইভাবেই শোধ নিল অমলেশ। নিজেকে ধ্বংস করে প্রমাণ করল সে খাঁটি।—কিন্তু আমি তখন মরিয়া।

'ও যে এভাবে শোধ নিতে পারে এ আমার ধারণার বাইরে ছিল, কিন্তু এখন ভাবি কেনই বা তা' ছিল? অমলেশও রক্তমাংসের মানুষ ওকে আমি যে 'অপমান করেছি, তার তো পরিমাপ হয় না। কিংবা ওরও আর ফেরার পথ ছিল না—তারপর সে অনেক নির্লজ্জ কাহিনী, নিজের চরিত্রহীনতা প্রমাণ করে নিজেই ও আমাকে দিয়ে ডিভোর্সের মামলা আনাতে বাধ্য করল, সম্ভবত সেই মেয়েটা তখন ওকে বিয়ে করতে বাধ্য করাচ্ছে। তারপর আর কি? এই তো দেখছেন? সেলাই স্কুলটা ভালোই চলছে, কাজেই আমারও চলে যাচ্ছে।'

'আর অমলেশ?'

বলে ফেলি আমি।

অনুভা আস্তে বলে, 'সেই তার সঙ্গেই আছে। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে, অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল তাই শূন্যতা কমাতে সেলাই শিখতে এসেছিল, এখন তো আবার সধবা হয়েছে। স্বামী পুত্তুর নিয়ে সুখে আছে।

অনুভার কথার ভঙ্গিতে যেন অঙ্ক মিলিয়ে ফেলার নিশ্চিন্ততা।—কিন্তু অঙ্কটা মিলল কই? এ যে একটা ধাঁধার অঙ্ক হয়ে খোঁচা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণে যা শুনলাম তার মধ্যে এই দুজনে সিনেমা দেখতে আসাটা আসে কোথা থেকে?

সেটা?

সেটা নাকি দৈবের ঘটনা মাত্র।

মানে, শুরুটা—

থেমে থেমে আস্তে আস্তে অনুভা যা বলল, তার সারমর্ম—একা বাড়িতে সন্ধেবেলাটা অসহ্য লাগে বলে মাঝে মাঝেই সিনেমায় চলে আসত অনুভা, হঠাৎ একদিন দেখতে পেল, পাশের সিটের লোকটা অমলেশ!

বুঝতে পেরে ছুটে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল অনুভা, তারপরই ভাবল, কেন যাব? ওকে তো তাহলে অনেকটা মূল্য দেওয়া হয়, চেপে বসে থাকব শেষ পর্যন্ত, দেখি ও কী করে।

কিছুই করেনি অমলেশ। বুঝতে পেরেছে, এমনও বোঝা যায়নি। শুধু উঠে দাঁড়িয়ে পড়ার আগে একটু আস্তে আস্তে করে বলেছিল, কত আজে বাজে লোকই তো পাশে বসে—

অনুভা কিছু বলতে পারেনি, ঠিক সেই সময়েই অনুভার গলাটা কেমন বুজে গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে অনুভা ঠিক করল, আর কোনওদিন সিনেমা যাবে না। কিন্তু ক'দিন পরেই ডাকের খামে এক লাইন চিঠির সঙ্গে মেট্রোর টিকিট একখানা। বেশ দামি সিটের। চিঠিটায় লেখা, 'খুব কি অসম্ভব? ক্ষতি কী?'

অনুভার সর্বশরীর প্রথমটা হিম হয়ে গেল, তারপর আগুনের মতো জ্বলে উঠল। ভাবল টিকিটটা টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়। তারপর চিন্তা করে দেখল ওতে কোনও ফল হবে না; অমলেশ হয়তো ভাববে ডাকের গোলযোগ, ভাববে অনুভার শরীর খারাপ, ওর সামনে গিয়েই ছিঁড়তে হবে।

সেটার জন্য অতএব যেতেই হল।

কিন্তু হল-এর দরজার কাছেই অমলেশ অনুভাকে দেখে তার ভার মুখটা এত উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে, ঠিক সেই মুহূর্তে চিঠিটা ছেঁড়া যেন বোকার মতো দেখতে লাগবে, এটাই মনে হচ্ছে অনুভার। কোনও কথাবার্তা নেই দেখে আসা।

তারপর আবার।

তারপর আবার! সেই একই পদ্ধতি চিঠির ভাষাটার অদল বদল।

হয়তো কোনও দিন, 'ছবিটা শুনেছি অপূর্ব, না দেখাটা লোকশান।—হয়তো ছবিটার দুটো কাগজে দুরকম সমালোচনা বেরিয়েছে, আসলে কী দেখা দরকার।' হয়তো বা 'তোমার' ফেভারিট নায়কের ছবি, তাই ফাস্ট শোতেই ব্যবস্থা—

ক্রমশই ব্যাপারটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

ক্রমশ কলকাতার সব হলই চেনা হয়ে যাচ্ছে, অনুভার দেখা হয়ে যাচ্ছে সব ছবি; ইংরিজি বাংলা। তবে অনুভার বাসা থেকে খুব দূরের পাড়ায় অথবা গোলমেলে পাড়ায় হলে, চিঠিতে

থাকে, গড়িয়াহাট ব্রিজের ডানদিকে অপেক্ষা কোরো, এ হলটা খুঁজে বার করা তোমার পক্ষে শক্ত।

গড়িয়াহাট ব্রিজটা অনুভাদের বাসার নিতান্ত নিকটে। নতুন কোনও ছবির সন্ধান না পেলে মাঝে মাঝে উত্তর কলকাতায় চলে যায় থিয়েটারে। ঐ অঞ্চলে চেনা-জানা কেউ তেমন নেই বলে বেশ নিশ্চিন্তেই বসে। দামি সিটে বসে। অমলেশের এখন চাকরিতে অনেক উন্নতি হয়েছে।

প্রথম প্রথম ফেরবার সময় অমলেশ খানিকটা পথ একসঙ্গে এসে কোনও একখানে ছেড়ে দিত। অনুভাকে এখন প্রায়ই দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়। অবশ্য বাড়ির মধ্যে ঢোকে না কোনওদিনই। এখন অমলেশ কোম্পানি থেকে একটা ছোট গাড়ি পেয়েছে নিজের ব্যবহারের জন্যে। অফিস ফেরত নিজস্ব জগতের পর্ব সেরে রাত করে বাড়ি ফেরাই ওর রীতি। ড্রাইভার নেয়নি, নিজেই চালায়, অতএব ওর গতিবিধির খবর ওর নিজেরই হাতে।

কিন্তু আজ?

'আজ আপনাকে দেখে তাড়াতাড়ি পালাল—' একটু হাসির মতো করে বলল, অনুভা। যেন কোনও ছোট ছেলের দুষ্টুমির কথা বলল কৌতুকের ভঙ্গিতে।

আমি ওর মুখটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম না, ওর ঘাড়টা জানালার দিকে ঘোরানো ছিল।

আমি ওর সেই অলঙ্কারবিহীন ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললাম, কিন্তু এখন, আর এর মূল্যই বা কী, মানেই বা কী?

অনুভা হঠাৎ খুব হালকা গলায় বলে উঠল, 'মানেও কিছু নেই, মূল্যও কিছু নেই, এখন! মাঝে মাঝে এক একটা সন্ধে একটু ভালো কাটে। এই আর কি।'

এখন আমি অনুভার মুখটা দেখতে পেলাম না।

বৈশাখ ১৩৭৯

অপরাধ

কাণ্ড দেখেছো! নীরেন কী লিখেছে!

চায়ের পেয়ালাটা টেবিলে নামাইয়া দিয়া কল্যাণী বিস্মিত সুরে প্রশ্ন করে—

—নীরেন? রাঙা ঠাকুরপো? সে আবার তোমাকে চিঠি লিখেছে নাকি? কী লিখেছে?

—যা লিখেছে তা পড়ে তো চোখে সর্ষেফুল দেখছি।

—ওমা কেন গো, কী এমন লিখল?

—আর কি লিখেছে! এখানে ওঁদের 'সাহিত্য-সম্মিলনী' না কি ঘোড়ার ডিম হবে, তাই আসছেন। কিন্তু 'নিজেদের বাড়ি থাকতে পরের বাড়িতে থাকবেন কি দুঃখে', তাই দয়া করে এই গরিবের কুঁড়েয় পদার্পণ করবেন।

কল্যাণী পরেশের রাগের কারণ বুঝিয়াও হাসিয়া ফেলে, বলে আপনার লোক আসবে সে তো আনন্দের কথা, এতে রাগ কেন তোমার?

—যাও যাও বাজে বোকো না—পরেশ চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া আবার টেবিলে বসাইয়া দেয়—মাসের আজ তেইশ তারিখ তা জানো, না কি জানো না?

—খুব জানি। হাড়ে হাড়ে জানি।

—তবে?

—তা বলে কী হবে? আসবে বলেছে—বারণ করতে তো পারো না?

—কেন পারবো না? গরিবের অনেক কিছুই পারতে হয়। আমি লিখে দিচ্ছি সোজাসুজি, দলছাড়া হয়ে এত দূরে থাকার চাইতে তোমারও খাঁটি কলকাতাতে থাকাই সুবিধে।

—ধ্যেৎ, তাই কখনও বলা যায়! ওর নিজের সুবিধে-অসুবিধে না ভেবে কী আর লিখেছে? তাহলে বুঝতে পারবে তোমার ইচ্ছে নেই।

—পারলে আর করা যাবে কি? চালাবো কি করে তাই বল? যদি আমাদের মতো অবস্থার লোক হত—আলাদা কথা ছিল। ওরা কী চালে চলে, তা জানো না তুমি। দুনিয়ায় যে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ আছে; সে কথা যেন মানতেই চায় না।

—হ্যাঁ—জানি, ও বাড়ির কাকার বাড়ি গিয়েছি তো দু'একবার—নতুন বৌ ছিলাম যখন। কি সুন্দর বাড়ি! কী চমৎকার সাজানো! কত গয়না খুড়িমার!

—তেমনি কী সুন্দর অহঙ্কার! কী চমৎকার লম্বা চাল! নতুন খুড়ি আমাদের মা-জেঠিমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলতেন না, বুঝলে?

কল্যাণী হাসিয়া বলে—সেই রাগ আছে এখনও?

—রাগ মোটেই নয়। তবে মনে আছে এই পর্যন্ত। অবিশ্যি নীরেন-সুরেন বরাবরই ভালোবাসে আমাদের, কিন্তু ওই যা বললাম—দারিদ্র্য জিনিসটা কী, সেটা জানে না বলেই বোধহয় নেহাৎ অবুঝ। আমাদের খাওয়া-পরা চাল-চলন দেখলে মিনিটে মিনিটে অবাক হবে—এই আর কি।

কল্যাণী মিনিট খানেক চুপচাপ থাকিয়া বলে—ক'দিন থাকবে?

—কে জানে ক'দিন। তবে সপ্তাহখানেকের কম কি আর?...

এতক্ষণ পরে, সর পড়িয়া যাওয়া ঠাণ্ডা চা-টা তুলিয়া লইয়া এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলে পরেশ।

মুখ দেখিয়া মনে হয় নিমের পাঁচন গিলিয়াছে বুঝি।

কল্যাণী খানিক পরে ঘুরিয়া আসিয়া আবার বলে—দেখ, বারণ করে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? যতই হোক, জ্ঞাতি। এই নিন্দেটুকু চিরদিন রয়ে যাবে। লোকলজ্জা বলে একটা কথা আছে তো?

আছে তা পরেশও জানে না এমন নয়, কিন্তু নিজের পকেটের অবস্থা কল্পনা করিলেই যে হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে তার। মাসের শেষের সাতটা আটটা দিন যে কীভাবে চলে, একমাত্র ভগবান জানেন। কল্যাণী তো লোকলজ্জার দোহাই পাড়িয়া নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রমাণ দিল, কিন্তু বিবেচনার আরও একটা দিক কি নাই?

পরেশের সারা মাসের সমগ্র সংসারের খরচ, নীরেনের এক মাসের সিগারেটের খরচা হওয়াও বিচিত্র নয়, হয়তো আরও বেশি। তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সাত দিন চালানোই কি সোজা?.... কিছুটা অন্তত সৌষ্ঠব করিয়া চালানো? সৌষ্ঠব করিতে গেলে—

নিজেদের পরণ-পরিচ্ছদ, বিছানা-বালিশ, সব কিছুর উপরই সাময়িক একটু প্রলেপ লাগাইতে হয়। অতিথির জন্য আহার-আয়োজনে যেটুকু বৈচিত্র্য বা আড়ম্বর, অতিথির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও ভাগ পাইতে হয় তার। মাথার তেল, দাঁতের মাজন হইতে শুরু করিয়া চায়ের পেয়ালা পিরিচ পর্যন্ত সব কিছুরই উপর হইতে দারিদ্র্যের জীর্ণ বিবর্ণতা দূর করিতে গেলে কোথায় গিয়া ডুবিতে হয় তার কি হিসাব আছে?

আর যদি দৈন্যের চরম রূপকে গোপন করার চেষ্টা মাত্র না করিয়া ভিক্ষুকের বেশে দাঁড়াও তো সে আলাদা কথা। হয়তো করুণার বশে উপহারের ছদ্মবেশ পরাইয়া কিছু সাহায্য করিয়া যাইতেও পারে নীরেন।

কিন্তু কেন? চক্ষুলজ্জা জিনিসটা কি এত প্রবলপরাক্রমশালী?

কল্যাণীর তাই মত।

পরেশই যে একেবারে চোখের-চামড়া হীন, তা'ও তো নয়। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াই সে এমন অভদ্রের মতো প্রস্তাবটা করিতে চাহিতেছিল। কিন্তু—

আর কিন্তু—

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অনেক খসড়া, অনেক মুসাবিদার পর—"লাঠি বজায় রাখিয়া সাপ মারা"—কৌশলসম্বলিত একখানি চিঠি খাড়া করিয়া কলমটি সবে নামাইয়া কল্যাণীকে ডাক দিয়াছে পরেশ, হঠাৎ উঠানের দরজার কাছে বহুদিন পূর্বে শ্রুত পরিচিত কণ্ঠটি বাজিয়া ওঠে :

—"কই নতুনদা, খবর কী? বাড়িতে আছো-টাহো তো?"

মুহূর্তের মধ্যে চিঠিখানা বিছানার তলায় চালান করিয়া দিয়া বিবর্ণ মুখে হাসি টানিয়া আনিতে আনিতে পরেশ ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।...

আরে তুমি? আজকেই এসে পড়লে যে? এই তোমাকে চিঠি লিখতে বসছিলাম—

নীরেন পিছনের কুলিটার হাতে খুচরা গণিয়া পয়সা দিতে দিতে সহাস্যে বলে—"কী লিখছিলে? ভাষা, যদিও তুমি আসিবে শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম—কিন্তু...ইত্যাদি। অতএব..."?

কুলি-বাহিত চকচকে চামড়ার সুটকেসটা এবং নীরেনের গায়ের ঝকঝকে গরদের পাঞ্জাবিটার পানে চকিত দৃষ্টি ফেলিয়া পরেশ হো হো শব্দে হাসিয়া ওঠে—তা কেন? সোজাসুজি বলেই দিচ্ছিলাম—"এসো না হে ভায়া; আমার এখানে জায়গা হবে না। তোমার বৌদি আবার নিজেদের নিভৃত কুঞ্জে বাইরের লোকের ভীড় পছন্দ করেন না কিনা—"

যে সুরে বলা হয় কথাটা, তাতে অবশ্য সন্দেহ থাকে না যে নিতান্তই পরিহাস এটা।

বলা বাহুল্য কল্যাণীও আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মিথ্যা রাগের ভান দেখাইয়া বলে—দেখছো রাঙাঠাকুরপো, দেখ। খামোকা ভদ্রমহিলার নামে কী রকম মিথ্যে অপবাদ দেওয়া।

—মান-হানির মামলা আনুন।—বলিয়া উঠিয়া আসে নীরেন—কই ছেলেমেয়েদের দেখতে পাচ্ছি না যে?

—গেছে খেলা করতে, আসবে এক্ষুনি। তারপর—তোমার খবর কী?

—আমাদের খবরের জন্যে তো ঘুম হচ্ছে না আপনার! নেহাৎ প্রাণের টানে এসে পড়লাম, তাই—

—ইস্! নিজের কাজ না পড়লে আসতেন যে।

—হয়েছে হয়েছে, ঝগড়া-টগড়া সব তোলা থাক—এখন সকলের আগে এক পেয়ালা চা আনুন দিকি।

চা! একপেয়ালা চা!

আকাশ হইতে আছাড় খাইলে কেমন লাগে?

হিরের আংটি, গরদের পাঞ্জাবি, আর বাহান্ন ইঞ্চির ফরাসডাঙ্গার ধুতি-পরা এই সুকান্তি ভদ্রলোককে কোন্ পেয়ালায় চা দিবে কল্যাণী? মোটা মোটা যে গোটা তিনচার পেয়ালা আছে বাড়িতে, তার সবগুলোই যে হাতলভাঙা। পিরিচই বা কই?...

প্রস্তুত হইবার অবকাশমাত্র না দিয়া এ রকম অভব্যের মতো আসিবার কি প্রয়োজন ছিল নীরেনের?...

ছেলেমেয়েরা বেড়াইয়া ফিরিবে এক্ষুনি।... সন্তুর পরনে কী আছে? নীল ডোরাকাটা সেই হাফ্-শার্টটা না? কলারটা কবে যেন ছিঁড়িয়া উধাও হইয়া গিয়াছে যার?... মিনুর গায়ে কল্যাণীর কোন্ জন্মের পুরানো একখানা ভয়েল শাড়ি কাটা ফ্রক।...

পাশের বাড়ির লতিকার কাছ হইতে শ্বেত পাথরের মতো দেখিতে সেই পেয়ালা একটা চাহিয়া আনা যায়, কিন্তু ছেলেমেয়েদের জামা জুতা? নিজের শ্রীহীন শাড়িখানাও কি কিছুই পীড়াদায়ক নয়?...

চিন্তা বাতাসের চাইতেও নাকি দ্রুতগামী। পলকের মধ্যে কত কী-ই তো ভাবিয়া ফেলিল কল্যাণী, তবু—কত অজস্রই বাকি থাকিল।... হিরের আংটি আর বাহান্ন ইঞ্চি ধুতির মালিকটি রহিয়াই গেল যখন।

মিনিটে মিনিটে নতুন নতুন বিপদ আসিয়া দেখা দেয়,—দেখা দেয় নতুনতর দুশ্চিন্তা।

প্রতি পদক্ষেপে... প্রতিটি আচরণে কী নিদারুণ লজ্জা!

নীরেন অবশ্য 'চাল' ফলায় না, কিন্তু তার স্বাভাবিকত্বটুকুও যে পরেশের চোখে রীতিমতো চাল। গায়ের রক্ত নিংড়াইয়া প্রাণপাত করিয়া যে আয়োজনটুকু করিয়া আনে পরেশ, সংসারের হাড়ভাঙা খাটুনির মধ্যে কত কষ্টে কত যত্নে কল্যাণী যা পাতে তুলিয়া দেয়, সেই মহামূল্য জিনিসগুলো কী অনায়াস অবহেলাতেই পাতের নীচেয় ফেলিয়া দেয় নীরেন!... সন্দেশ রসগোল্লার মতো দুর্লভ বস্তুই কিনা আধখানা খাইয়া বাকিটা জলের গ্লাসে ডুবাইয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না নীরেন!

এই চারদিনের মধ্যে তিন দিন এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিতে হইয়াছে পরেশকে। অসহ্য হইয়া আজ সকালে তো বলিয়াই ফেলিল পরেশ—"ফেলিবার প্রয়োজন কি? ছেলেমেয়েরা কি আর কাকার পাতে খাইতে পারে না?"

নীরেন তাহার উত্তরে 'পাতে' খাওয়ার অপকারিতা সম্বন্ধে লম্বা এক লেকচার দিয়া বসিল।

অবশ্য নীরেনের সামনে মান বাঁচাইতে—ছেলেমেয়েদের ভাগ্যেও উক্ত দুর্লভবস্তু এক আধটা যে না জুটিতেছে এমন নয়, কিন্তু সে তো "তাতল সৈকতে বারিবিন্দু" মাত্র। তাছাড়া একমুঠো পয়সা দিয়া কেনা জিনিস ফেলিয়া দেওয়া!

মিষ্টান্ন যে আবার অতিমিষ্টত্বের অপরাধে পরিত্যাজ্য হইতে পারে, একথা পরেশের ধারণার অতীত নয় কি?

নোনতা খাবার কল্যাণী নিজের হাতে ভাজিয়া দিল—"এ একদম দালদার ব্যাপার দেখছি!"—বলিয়া একেবারে উঠানে!

যতই হোক, পশ্চিম হইতে আসিয়াছে নীরেন, কাজেই কলকাতার সবই ভেজাল মনে হয় তার কাছে। ফেলিয়া দিয়া অবশ্য ক্ষোভ করিল বিস্তর, কিন্তু সে ক্ষোভটা নিতান্তই সমাজ-জীবনের দুর্নীতি-জনিত ক্ষোভ। খাইতে না পাওয়ার জন্য তো নয়ই, অপচয়ের জন্যও নয়।

চার দিন পার হইয়াছে—চার বৎসরের দৈর্ঘ্য লইয়া। আরও ছয় দিন নাকি থাকিতে হইবে নীরেনকে।—সবে ছাব্বিশ তারিখ আজ, এখনও আরও কত দিন! এবারে আবার একত্রিশে মাস!

সভ্য সামাজিক, আর চক্ষুলজ্জাসম্বলিত কল্যাণী, এইমাত্র ফর্দ দিয়ে গেল বাজারের।... লিখিবার মুখে যা খুশি লিখিয়াছে,—না কি মাথা-টাথা খারাপ হইয়া গেল তার!...

শ্রাবণ মাস শেষ হয় নাই এখন, বলে কি না ফুলকপি আর মটরশুঁটি! ইঁচড় আর সজনে ডাঁটাই বা নয় কেন তবে? মাংস, ডিম, ফুলকপি, মটরশুঁটি, বড় কইমাছ, অনেকগুলা বাগ্‌দা চিংড়ি, লাউ আর নারিকেল, কিশমিশ, আলুবখরা—কত ফিরিস্তি!

এখানে এই শহরতলির বাজারে পাওয়া যাইবে না জানা কথা, কিন্তু কলিকাতার বাজারে লোক পাঠাইলে ঠিকই পাওয়া যায়। কিছু বক্‌শিশ দিলে লতিকার চাকরই আনিয়া দিতে পারে। অমনি তার সঙ্গে চিনিপাতা দই ও সামান্য কিছু রাবড়ি।

—এটা কী হয়েছে?

পরেশের কণ্ঠস্বর যতই চাপা হোক, ক্রোধটা ধরা পড়ে।

শঙ্কিত কল্যাণী বলে—কী?

—এই ফর্দ! একি আমার শ্রাদ্ধের ভোজের ফর্দ হয়েছে?

চমকাইয়া মুখ তোলে কল্যাণী, এ কী! এমন রূঢ় কথা তো জীবনে উচ্চারণ করে না পরেশ।

ম্লান মুখে বলে—ক'দিনই তো সোজাসুজি মাছ ভাত খাওয়ানো হল, যাবার আগে দু'একদিন একটু বিশেষ না করলে—

সোজাসুজি! সোজাসুজি মাছভাত করতেই এই চারদিনে তেরো টাকা ধার হয়েছে আমার, তা জানো? ধার মনে করলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়, আর একটি পয়সাও ধার করতে পারব না, ব্যস্।

কল্যাণী ছলছল চোখে বলে—আর এই যে রাঙা ঠাকুরপো সন্তু মিনুকে কত টাকার খেলনা এনে দিল কাল কলকাতা থেকে, ছবির বই দিল তিন চারখানা, কোন্ না কুড়ি পঁচিশ টাকার জিনিস হবে—

—বেশিও হতে পারে বুঝলাম, কিন্তু আমার তাতে কি সাশ্রয় হল? খেলনা বেচে তোমার কপি-মটরশুঁটি আনা যাবে?

ছলছল চোখের কোণ বাহিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে।

কী ভয়ানক কটু কথা বলিতে শুরু করিয়াছে পরেশ।... ও কেন বোঝে না, কল্যাণীর এ আবদার সখের আবদার নয়, নিতান্তই সম্মান বজায় রাখার প্রশ্ন।

কার সম্মান? পরেশেরই নয় কি?

পাঁচ টাকার ডাল-ভাত খাইয়া নীরেন যদি পঁচিশ টাকার শোধ দিয়া যায়, খুব কি মুখ উজ্জ্বল হইবে পরেশের? তবু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনটা তেমন ভালো করিতে পারিলে, 'যত্ন-আত্তি'র ভাব বেশি দেখাইলে কিছুটা মান থাকে তো! কে জানে হয়তো যাওয়ার আগে আরও কিছু দিয়া যাইতে পারে, তখন কোন্ মুখে মুখ দেখাইবে কল্যাণী?

কল্যাণী কে? নীরেন তো তার বাপের বাড়ির দিকের লোক নয়, মান-সম্মান যা কিছু সবই তো পরেশের। অথচ এই সাদা কথাটুকু কিছুতেই বুঝিবে না পরেশ? ধার করা খুব খারাপ নিশ্চয়ই, কিন্তু নীরেন তো বারে বারে আসিবে না? জীবনে আর কোনওদিনই হয়তো সুযোগ মিলিবে না তার আত্মীয়তার—উপহারের শোধ দিবার।

পরের মাসে না হয় আরো কষ্ট করিয়া চালানো যাইবে, এখনকার মতো তো মানরক্ষা হোক!

কিন্তু না, পরেশ যেন বুনো ঘোড়ার মতো জেদ ধরিয়া বসিয়া আছে। অনেক তর্কের পরও ধার আর একপয়সাও করিতে রাজি হয় না সে।... হ্যাঁ ভালো ভালো দামি জিনিস আনিয়া দিবে না কেন, কল্যাণী দিক টাকা—যদি তেমন সঞ্চিত অর্থ তার থাকে কোথাও।

হায় ভগবান! পরেশ কি জানে না কল্যাণীর কোথায় কী আছে!

একটি ফুটো পয়সাই কি কল্যাণীর নিজের বলিয়া তোলা আছে কোথাও?

সোনা বলিতে একছিটে তাই কি বজায় আছে? সন্তুর টাইফয়েডে সেবার—রাংরত্তিটুকুও গেছে যে।

তবু রাগে দুঃখে একটা অবিমৃষ্যকারিতা করিয়া বসে কল্যাণী।

বলে—বেশ তুমি ধার করে কর এখন, শোধ দেব আমি।

—বটে নাকি? তা বেশ, ভালো ভালো! বেশি করে কিছু নাও না, বরং যাবার সময় নীরেনের বৌ-ছেলের নাম করে এক হাঁড়ি মিষ্টিও দেওয়া যাবে দশ টাকা দিয়ে।

কুটিল একটু হাসি হাসিয়া পরেশ ফর্দটা হাতে বাহির হইয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরে নীরেন আসে।

যা ভয় করিয়াছে কল্যাণী, ঠিক তাই। কলিকাতা হইতে কল্যাণীর জন্য দামি একখানা শাড়ি আনিয়া হাজির করিয়াছে নীরেন।

—ছি ছি এ কি কাণ্ড রাঙা ঠাকুরপো। না ভাই না, কক্খনো না, এ শাড়ি নিতে পারব না আমি। শুধু শুধু কেন তুমি এত খরচা করবে।

নীরেনকে কথায় হারানো সহজ নয়। রাগ করে না, হেসে বলে—শুধু শুধু মানে কী? অর্থের সার্থকতা তো নারীর অঙ্গে। ধরুন, এই টাকার যদি আমি ট্রাউজার করিয়ে আনতাম, তাকিয়ে দেখতো কেউ? আর শাড়ি কিনে শুধু নিজের চোখের সুখই নয়, পছন্দর তারিফটা উপরি পাওয়া। আচ্ছা বলুন, পছন্দ আছে কি না আমার?

—খুব আছে। কিন্তু যাকে মানায়, তাকেই দেওয়া উচিত। আমি কখন কোথায় বা যাচ্ছি, দামি শাড়ি নিয়ে করবো কী? এ তুমি রাঙা বৌয়ের জন্যে নিয়ে যাও।

—আহা তোমার রাঙা বৌকে তো জীবনে একখানিও ভালো শাড়ি দিইনি।

শত দুঃখেও হাসি পায় কল্যাণীর। বলে—দেবেই তো, জীবনভোরই দেবে।

—আরে বাপু, সে তো বলা বাহুল্য। তাই বলে—সাধ হলে জীবনেও আর কারুর জন্যে একখানি শাড়ি কিনতে পাব না,—এ রকম কোনো লেখাপড়া আছে?

—কিন্তু সত্যি রাঙা ঠাকুরপো, এটা নিতে মোটে মন সরছে না। তাই না হয় সাধারণ আটপৌরে শাড়িই দিতে একটা—

—দায় পড়েছে। নাই দিলাম।

—তোমার দাদা কিন্তু রাগ করবেন—

—না কি? তা ভালোই তো, দু মুঠো চাল বেশি নেবেন।

এ মানুষের সঙ্গে কে তর্ক করিবে?

—তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না, গছাবে তবে ছাড়বে, আর কি।

—এই, এতক্ষণে যে চিনতে পেরেছেন আমায়, এর জন্যে ধন্যবাদ।

রাত্রে কল্যাণী পরেশকে দেখায় শাড়িখানা। সোনালি জরির তাবিজপাড় টাঙাইল শাড়ি।

ভাবিয়াছিল পরেশ রাগ করিবে, কত তর্ক করিতে হইবে, কিন্তু ব্যাপারটা হইল অন্য রকম।

—বাঃ বেশ কাপড়— বলিয়া এক মিনিটের মধ্যে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল পরেশ। যেন কল্যাণী শাড়ি পাইয়া আনন্দে গদগদ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব তাহার আর গ্রাহ্য করিবার কিছু নাই।

কল্যাণী সামনে যাই করুক, দয়া করিয়া যে নীরেনের সামনে বিরক্তি প্রকাশ করে না পরেশ, এই ঢের। বরং খুব হাসি-খুশি করিয়াই কটা দিন কাটে। কল্যাণীর মনের মতো করিয়াই আয়োজন করিয়া আনে পরেশ। দিব্য হই চই করিয়া খাওয়া-দাওয়া হয়, সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নায় বেড়াইতে যাওয়া হয় সপরিবারে। শহরতলীর এই অঞ্চলটা কলকারখানা-বহুল হইলেও রাত্রে মনোরম দেখায়।

পুলকিতা কল্যাণী বলে—এত দিন রয়েছি এখানে— রাত্রে যে বেড়ানো যায়, এ কিন্তু ভাই কখনও জানি না।

—আশ্চর্য! আচ্ছা নতুনদা, এতে তো আর পয়সা খরচ হয় না? বেরোলেই পারো।

'কিপ্টে' বলিয়া পরেশকে যখন-তখন ঠাট্টা করে নীরেন। সংসারের যা কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে—সবই পরেশের কুঁড়েমি আর কিপ্টেমির ফল বলিয়াই ধরিয়া লইয়া হাসাহাসি করে কল্যাণীর সঙ্গে।

পরেশ যা উত্তর দেয়, সেটাও সরস।

যাইবার আগের দিন কিন্তু কিছুতেই আর কল্যাণীকে হাসান গেল না। কি যেন এক মামলায় হারিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে সে,—এমনি ভাব। বাক্‌পটু নীরেনের সদা তৎপর সরস পরিহাসগুলাও যেন অকেজো হইয়া ফিরিয়া আসে।

শেষ পর্যন্ত পরেশকে বলিতে হয়—কি গো, তোমার যে দস্তুরমতো বিরহ লেগে গেল?

পরিহাস বটে, তবু—কিছু কি ঈর্ষা জড়ানো আছে?

কিন্তু কথাটা কি নিতান্তই পরিহাসের?

রুক্ষ একঘেয়ে জীবনে এতটুকু সরসতার প্রলেপই কি কম মূল্যবান? যাক, তাই বলিয়া বিরহটা এত জোরালো হওয়া উচিত নয় যে, মানুষটা উপস্থিত থাকিতে থাকিতেই বিরহের বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া কথাই বন্ধ করিয়া দিবে?... এটা যেন নিতান্তই বাড়াবাড়ি!

একে মন খারাপ রহিয়াছে কল্যাণীর, পরদিন আবার ঘটিল একটা বিশ্রী ঘটনা। সোনার বোতাম সুদ্ধ সিল্কের শার্টটা পরশু না কবে যেন দালানের আলনায় রাখিয়াছিল নীরেন, এমন তো প্রতিদিনই রাখে, খোঁজ করিতে গিয়া দেখে—জামা আছে বোতাম নাই!

অথচ ঝি চাকর বলিতে কিছুই নাই কল্যাণীর সংসারে।

খোয়া গেল বোতাম জোড়াটা।

আর ঠিক সেইটাই যেটা নীরেনের বিবাহের আশীর্বাদী জিনিস।

সারা সকাল সারা বাড়ি তোলপাড় করিয়া বেড়ায় পরেশ, সম্ভব অসম্ভব সকল জায়গায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইয়া পড়ে।... পরেশের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইল নীরেন, এটা যেন পরেশেরই কী এক অপরাধ!...

কল্যাণীও চিন্তাক্লিষ্ট ম্লান মুখে নীরবে কাজকর্ম করিয়া যায়।

নীরেন নিজে কিন্তু খোঁজাখুঁজির মধ্যে যায় না, গুম্ হইয়া থাকে! বড় বেশি যেন বিচলিত দেখায় তাকে।... কী যেন অগাধ ক্ষতি হইয়াছে তার, অথচ সামান্য এক জোড়া বোতাম, ভরি দেড়েকের বেশি সোনা নাই যাহাতে। এটুকু ক্ষতি সত্যিই কিছু আমার মারাত্মক নয় নীরেনের পক্ষে।

বিবাহে পাওয়া জিনিস বলিয়াই কি?

খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়িয়া দেয় পরেশ।

প্রায় কাহিল হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলে—নাঃ কোথাও পাওয়া গেল না। আশ্চর্য!

—আশ্চর্য হবার কিছুই নেই—নীরেন গম্ভীর মুখে বলে—জানতাম পাওয়া যাবে না, মিথ্যে খাটলে।

—তার মানে কী নীরেন? আহত স্বরে পরেশ বলে—তোমার কথার 'টোন'টা তো ভালো নয়? তোমার কি কোনও সন্দেহ হচ্ছে?

—সন্দেহের কথা হচ্ছে না। জামায় পরানো বোতাম রাতারাতি উড়ে গেলে খাটের তলা, ট্রাঙ্কের পিছনে খুঁজে বেড়ানো নেহাৎ বাজে খাটুনি—এই কথাই শুধু বলেছি আমি।

পরেশ ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলে—দেখ নীরেন, গরিব হলেই ইতর হয় না। যাক্, খুব শিক্ষা হল!

—শিক্ষা আমারও কিছু কম হল না নতুনদা, তবে দুঃখের শিক্ষা। যাক্, অভিজ্ঞতার মূল্যও সর্বদা দিতে হয় বই কী। কিন্তু অনুরোধ করছি আর অনর্থক খোঁজাখুঁজি করে বেশি 'শো'কোরো না।

—তুমি কি তাহলে বলতে চাও—

—আমি? আর এক তিলও কিছু বলতে চাই না। দয়া করে এ আলোচনা বন্ধ করো নতুনদা, আর ভালো লাগছে না।

দ্বিতীয় আর কোনো কথা না বলিয়া কোথায় যেন বাহির হইয়া যায় নীরেন।

নীরেন বাহির হইবামাত্র পরেশ রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া ভীষণ মুখে বলে—তোমার সঙ্গে কথা আছে, শুনে যাও।

—কী কথা?

ভারি ক্ষীণ লাগে কল্যাণীর কণ্ঠস্বর।

—কাল যে বত্রিশ টাকা দিলে,—কোথায় পেয়েছো সে টাকা?

—ছিল।

—ছিল? কিন্তু এমন কোথায় ছিল বলতে পারো যে এতদিন ধরে এই সংসার-রাক্ষুসীর হাঁ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছো?

—লতিকার কাছে রেখে দিয়েছিলাম—

—কল্যাণী! তাকাও আমার দিকে। মুখ তোলো—তোলো মুখ—ছিঃ ছিঃ কল্যাণী, এত ইতর হয়ে যেত পারো তুমি, এ যে কল্পনার বাইরে!... উঃ!... এই মাত্র বড় মুখ করে বলে এলাম নীরেনকে 'গরিব হলেই ইতর হয় না'!...

দুই হাতে চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিয়া টানতে থাকে পরেশ, রগের শিরা-ওঠা রক্তচক্ষু ভীষণদর্শন মুখখানা দেখিয়া পরেশ বলিয়া চেনা শক্ত।

—তুমি কি মনে করছো আমিই—

আবেগে থরথর করিয়া পাংশু ঠোঁট দুইখানা কাঁপিয়া ওঠে কল্যাণীর।

—আমি? হাঃ হাঃ হাঃ। শুধু আমি? যার জিনিস চুরি গেছে, সেও কি মনে করতে বাকি রেখেছে? উঃ ভগবান। কী মনে হচ্ছে জানো কল্যাণী, কারখানা থেকে আর যেন ফিরতে না হয়; মেশিনের দাঁতে আটকে, বয়লারের মধ্যে পড়ে গিয়ে যেমন করে হোক এই ঘৃণ্য জীবনের শেষ হয়ে যায় যেন।

বলিতে বলিতে যেন নিজেকে আর সামলাইতে পারে না পরেশ। ঘৃণ্য ও ধিক্কারের তীব্র তিক্ত কটু কথায় যত কিছু ভাষা জানা ছিল তাহার সবগুলি উচ্চারণের পর অবশেষে ঊর্ধ্বশ্বাসে কারখানায় ছোটে।...

কলের বাঁশী বাজিয়াছে কি আজ?

পরেশ তো চলিয়া গেল—

নীরেন সেই গেল আর ফিরিল না, না কি?

ফিরিল বই কী। যাত্রার আয়োজন করিতেও তো আসার প্রয়োজন আছে কিছু। তা ছাড়া আরও একটা প্রয়োজন কি নাই? বিদ্রূপের ছলে কল্যাণীকে দু একটা কথা শুনাইয়া দিবার ইচ্ছাটাকে দমন করিতে পারে না কিছুতেই। বেশি কথা নয়—শুধু এইটুকু—শ্রদ্ধা করিয়া ভালোবাসিয়া কেউ একখানি শাড়ি উপহার দিলে তোমার গ্রহণ করিতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে—কেমন? লাগে না শুধু এইভাবে উঞ্ছবৃত্তি করিতে?

স্ত্রীলোক মাত্রেই কি অভিনেত্রী?

কল্যাণী! কিশোরী বালিকার মতো সরল সহজ কল্যাণী! অন্তত নীরেনের ধারণা ছিল তাই। সেই কল্যাণী যেন আকাশ হইতে আছাড় মারিয়াছে নীরেনকে। চোখ বুজিয়া অস্বীকার করিবারও পথ রাখে নাই যে।... 'সরল' শব্দটার অপব্যবহার করিয়া কাজ নাই, ঘরের মেঝেয় অপরাধের প্রমাণপত্র ফেলিয়া রাখিয়া যে নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে, মূর্খ বলাই উচিত তাহাকে।...

মূর্খ কল্যাণী রাতারাতি স্যাকরা ডাকিয়া বোতাম জোড়াটা বিক্রয় করিয়া ফেলিবার মতো বুদ্ধি খরচ করিতে পারিল, পারিল না স্যাকরার হাতে লেখা রসিদটুকু লুকাইতে?... রাবণ রাজার মতো নিজের মৃত্যুবাণ সযত্নে তুলিয়া রাখিল নিজেরই ঘরে?

অবশ্য 'সযত্নে' রাখা ছাড়া উপায় ছিল না, আপাতত পুরা টাকাটা শোধ করে নাই বলিয়াই বোধ করি স্যাকরা মহোদয় এটুকু কল্যাণীর কাছে রাখিয়া গিয়াছিল—পরেশের খোঁজাখুঁজির তচনচ কাণ্ডে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।....

পকেট হইতে সেই প্রমাণ-পত্রটুকু বাহির করিয়া লয় নীরেন।...

কিছু না—কেবলমাত্র কাগজটুকু কল্যাণীর সামনে মেলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিবে, 'এ বস্তুটা কী?'

দেখা যাক কল্যাণীর দিক হইতে বলিবার মতো কী আছে।

জিভের আগায় কয়েকটা শ্লেষমিশ্রিত কঠিন ভাষা সাজাইয়া লইয়া রান্না ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় নীরেন।

দাঁড়ায়—না দাঁড়াইয়া পড়ে।

কই, সে সব কথা কই?

অতিবাক্-পটু নীরেনের বাক্য হরণ করিয়া লইল কে? 'শুনাইয়া' দিবার মতো তীক্ষ্ণ ভাষা দূরে থাক, ডাকিবার মতো কণ্ঠস্বরও থাকে না যে।

ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া অমন নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে কেন ঘরের ভিতরে অবস্থিত ব্যক্তিটির মুখ পানে?... কী আছে সে মুখে?

লজ্জা? অপমান? ভয়?

হয়তো তাই, কিন্তু শুধুই কি তাই?

মুখের ভাষা পাঠ করিবার মতো বিদ্যা আছে নীরেনের? না থাকিলে অতক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে কেন? চাহিয়া চাহিয়া এক সময় হঠাৎ হেঁট হইয়া একটি প্রণাম রাখে দরজার বাহিরে।....

জ্বলন্ত উনানের সামনে বসিয়া আছে কল্যাণী—এপাশ হইতে মুখের অর্ধাংশটুকুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে মাত্র।...অর্ধাংশই বা কোথায়? আগুনের আভায় আলোছায়ার খেলা।... বিশীর্ণ গালের একটু কোণ... চোয়ালের হাড়ের একটা কঠিন রেখা... একটিমাত্র অবনমিত আঁখিপল্লব, ... রগের কাছ-ঘেঁষা উড়ন্ত কয়গাছি রুক্ষ কেশ...। এইটুকু।

ইহার উপরেই কি লেখা রহিয়াছে কল্যাণীর সারা জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস? ধ্বংসের ইতিহাস? আঁকা রহিয়াছে—নিরুপায় মনুষ্যত্বের গ্লানি?

নীরেন পাঠোদ্ধার করিয়াছে সেই প্রস্তরীভূত অনুক্ত কাহিনীর?

কিন্তু করিলেই বা কি? সভ্য সামাজিক মানুষ মাত্রেই নিরুপায় নয়? নীরেনেরই কি উপায় আছে সেটুকু জানাইয়া যাইবার?

যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া যায় নীরেন, সুটকেসটা নিজের হাতে লইয়া।... কুলি ডাকিয়া হৈ চৈ করিতে ইচ্ছা হয় না যেন।

—শুনেছো কাণ্ড? নীরেন কী বলে গেল?

কারখানা হইতে হৈ হৈ করিয়া বাড়ি ফেরে পরেশ। কল্যাণীকে ডাকিয়া বলে, আরে শোনো না ছাই। দেখেছো—বড়লোকের বড় কাণ্ড! জামার ইন্‌সাইড পকেটে বোতাম পুরে রেখে বাবু রব তুলে দিলেন—'চুরি গিয়াছে'। আরে বাবা, ঝি নেই চাকর নেই বাড়িতে, চুরি অমনি গেলেই হল? নেহাৎ আমি ভালোমানুষ, তাই এযাত্রা তরে গেলেন বাছাধন, অন্য লোকের পাল্লায় পড়লে আজ লাঠালাঠি হয়ে যেত। অবিশ্যি—মিথ্যে বলব না, ক্ষমাও চেয়ে গেল বিস্তর। স্টেশনে যাবার আগে দেখা করে গেল কিনা কারখানায় গিয়ে।... সকাল বেলার সেই সন্দেহের ভাবটা প্রকাশ করার দরুন খুবই মুষড়ে গেছে দেখলাম। বারবার করে ক্ষমা চেয়ে গেল,... জুতো মেরে গরু দান আর কি—

আপন খেয়ালে বকিয়া যায় পরেশ, কল্যাণীর নীরবতা লক্ষই করে না কিংবা ইচ্ছা করিয়াই করে না। নিজের কঠিন ব্যবহারের স্মৃতিটা ভুলাইয়া দিতে চায়... কতকগুলো মুখের কথা কহিয়া।

লক্ষ করিলে দেখিতে পাইত,—কিন্তু কী জানি পাইত কি না।

দেখিবার চোখ সকলের থাকে কি?...সকলের ক্ষমতা থাকে মুখের ভাষা পাঠ করিবার?

অবিনশ্বর

পথ আর পথ।

সভ্যতার শতবাহু প্রসারিত হচ্ছে দিকে দিগন্তরে। পথ তৈরি হচ্ছে পাহাড়ের বুক চিরে। অরণ্যের বুক চিরে, সমাজ আর শৃঙ্খলার বুক চিরে। পথই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এখানে তৈরি হচ্ছে মালবাহী লরির পথ। বন-সম্পদকে নিঃশেষ করে নিয়ে যেতে পারবার তোড়জোড়। অমিতচারী যুগ, জননী বসুন্ধরার সমস্ত সঞ্চয় দু'হাতে উড়িয়ে দিয়ে যাবে, ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য কিছু রেখে যাবে না। মাটির উপরে নয়, মাটির গহ্বরে নয়, কোথাও কিছু রাখবে না... কে জানে কী করবে সেই হতভাগা আগামীকাল, এই ফাঁপা সভ্যতা আর ফোঁপ্‌রা পৃথিবীকে নিয়ে?

বিদ্যুৎযন্ত্র বসিয়ে কাটা হচ্ছে জঙ্গল। মানুষের হাতের লোহার টুকুরোগুলো এখন যেন ছেলেমানুষের খেলনা হয়ে গেছে। ওরা এখন শুধু জঞ্জাল সরায়। কুড়ুল কোদাল করাত! একদা ওরা জীবন্ত ছিল, অসাধ্য সাধন করতে পারত। কোটি বছরের পৃথিবীর গায়ে ওরাও ঢের পথ বানিয়েছে। কিন্তু এখন ওরা হাস্যকর। কালো পাথরের পুতুলের মতো যে মানুষগুলো কোদাল হাতে এগিয়ে আসছে, ওরা শুধু জঞ্জাল সরাবে। ওর চাইতে বেশি ভূমিকা আর ওদের নেই।

ভারতবর্ষে আর ভারতবর্ষের বাইরে; ভূগোলকের এ-পিঠে আর ও-পিঠে; কোথাও কোনওখানে আর ওদের জন্য কোনও মহান্ ভূমিকা রচিত হবে না। ওদেরই পূর্বপুরুষের হাতের যে বিশাল বিশাল কীর্তির নমুনা হাজার হাজার বছরের রোদ-জলকে অবহেলা ক'রে আজও আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ইরানে আর চীনে, মিশরে আর রোমে, এখানে আর সেখানে, তার দিকে চোখ তুলে তাকাবারও আর সময় নেই এদের। এরা শুধু প্রপিতামহের সেই যন্ত্র হাতে নিয়ে প্রাণপণে জঞ্জাল সরাচ্ছে।

জঙ্গলের মাঝে মাঝে তাঁবু পড়েছে গোটাকতক,—ছোট, বড় সস্তা, দামি! ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় রেখে অধস্তনের।... তাঁবুর সামনে খুঁটি পুঁতে পুঁতে বসানো হয়েছে আলো। পাম্পলাইটের তীব্র শিখা রাতের নিঃসীম পটে যেন বাঘের চোখের মতো জ্বলে।... রাতে বোঝা যায় না—এই অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ালে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, আর সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত মস্তিষ্কের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।—হ্যাঁ, রাতে ওকথা বিশ্বাস করা শক্ত। রাতে ওই প্রখর আলোগুলোকে অরণ্যচারী হিংস্র জন্তুর চোখ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

ওই আলোর পিছনে পিছনে যে জমাট অন্ধকার, সে যেন ঘন শ্যাওলা রঙের তাঁবুগুলো নয়, জমাট হয়ে রয়েছে আদিম পৃথিবীর নির্লজ্জ বর্বরতা।

সাব্‌ওভারসীয়ার হরিপদ দাস জরীপবাবু মুকুন্দ বিশ্বাসের গ্রামের লোক। তাই সন্ধ্যাটা দু'জনে এক তাঁবুতেই কাটান।... এঁর ঘরে উনি, অথবা ওঁর ঘরে ইনি। বোতলের *ঠুনঠান* ওঠে; হাসির হর্‌রা ওঠে। কাছে পিঠে রান্নাঘর থেকে উত্থিত সদ্য নিহত কোনও পশু অথবা পাখির মাংস সিদ্ধ হওয়ার গন্ধ অরণ্যকে সচেতন করে দেয় মানুষের উপস্থিতি সম্বন্ধে।

আজ কিন্তু শব্দ গন্ধ দুটোই অনুপস্থিত। আজ ওদের মনে সুখ নেই।

—সাহেব এসে গেল তাহলে? বলল মুকুন্দ বিশ্বাস।

হরিপদ দাস নিশ্বাস ফেলে বলে—হ্যাঁ।

মুকুন্দ ছিল নিজের তাঁবুতে, দূর থেকে ছুটে আসা মোটরখানার হেড্ লাইটটাই শুধু দেখছে! হরিপদ দাসকে যেতে হয়েছিল অভ্যর্থনা করতে। এইমাত্র ফিরেছে সে 'সাহেব'কে তাঁর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে এসে!

মুকুন্দ নড়েচড়ে বলে—কী বলল-টলল?

—বলবে আবার কী?

—মানে আর কি, ভাবভঙ্গি কীরকম বুঝলে? সুবিধে হবে?

—খোদা জানে!

হরিপদর উত্তরগুলো অনিচ্ছুক, কিন্তু মুকুন্দর কৌতূহল প্রবল। হরিপদর মনমরা ভাবের কারণ একটা কিছু আন্দাজ করে বলে—খুব দুঁদে বলে মনে হল না কি?

দুঁদে? ফোঃ!.... এ প্রশ্নে হরিপদ যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বলে—দুঁদে লোক হরিপদ দাস ঢের দেখেছে মুকুন্দ, হরিপদ তার জন্যে ভয় খায় না। দুঁদে লোককে ক্ষুদে ক'রে ফেলবার মন্তর হরিপদর জানা আছে। ব্যাপারটা তো তা' নয়। কথা হচ্ছে একেবারে ছোকরা!... এদের কাছে কাজ করতে যেন প্রেস্টিজে বাধে।

কাজেরও কিছু জানে না তা'হলে?

তা' বললে কী হবে,... হরিপদ মুখটা বিকৃত ক'রে বলে—ডাঁট্ তো ঠিক থাকবে? জানি তো? দুটো ধমক-চমক গালমন্দ বুঝি বাবা, ওই যে 'আপনি'র মধ্যে দিয়ে মিছরির ছুরি মারে, ওই অসহ্য। ছোকরা অফিসারগুলো বড় নাক উঁচু হয়!

—নাক উঁচু!... মুকুন্দ বিশ্বাস অনেক অভিজ্ঞতার মুচকি হাসি হাসে—সংসার সমাজের বাইরে এই জঙ্গলে এসে অনেক উঁচু নাকই খ্যাঁদা হ'তে দেখলাম দাদা!... কলকাঠি তো আমাদেরই হাতে!

এবার একটা রহস্যময় হাসি হাসে মুকুন্দ বিশ্বাস।

এ রহস্য হরিপদ দাসের অজ্ঞাত নয়।... কিন্তু আজ হরিপদ দাসের মনে সুখ নেই। তাই বলে,—ঠিক বুঝতে পারলাম না লোকটাকে।

একঘণ্টাতেই কি আর বোঝা যায় হরিপদ্‌দা? প্রথম প্রথম এমন সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলে।... যতই হোক, চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস তো আছে? সে-বার পার্বতীপুরের ওদিকে যখন কাজ হচ্ছিল মনে নেই? ও, তুমি তো তখন ছুটিতে ছিলে! ছিলাম আমি আর অভিলাষ ভট্‌চায্!... সেও এলো এক ছোকরা সাহেব; মিত্তির না কি যেন। প্রথমে এমন ভাব দেখাল, বুঝলে হরিপদ্‌দা, যেন ভীষ্মদেবের পুষ্যিপুত্তুর।... তারপর—হুঁ!... দাবার চাল চালতে হয় দাদা, দাবার চাল। জায়গা বুঝে বোড়েটি টিপে দিতে হয়।

এবার যেন হরিপদকে কিঞ্চিৎ উৎসাহিত দেখায়। বলে—ভেঁজে রেখেছিস নাকি কিছু?

—না রেখে আর মুকুন্দ বিশ্বেস নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছে?... ওদিকে 'ঘাল' ক'রে ফেলতে পারলেই, দেখবে আপনি নাক থেব্‌ড়ে যাবে।... আর যাই হোক—দুর্বলতার সাক্ষীর ওপর চোখ রাঙাতে থতমত খাবেই। এই স্বভাব মানুষের।

নরচরিত্রে অভিজ্ঞ মুকুন্দ বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হাসে।

পর্ণকুটিরও নয়, কাপড়ের টুকরোর ছাউনি মাত্র। ইচ্ছে হলেই চোখের নিমিষে এখান থেকে ওখানে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়। তবু—তার ভিতরেই আরাম আয়েসের উপকরণের অভাব নেই।...পদমর্যাদা এমন জিনিস, ঘন অরণ্যের অন্তরালে, সভ্যজগতের অনেক, অনেক যোজন দূরেও রাত পোহাতেই সোনালি পেয়ালায় চা জোটে।

তাঁবুর বাইরে টেবিল বার করিয়ে নিয়ে চা খাচ্ছিলেন সাহেব। মুকুন্দ তাক্ বুঝে এসে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগল।.... ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন সাহেব, অবশ্য স্রেফ্ ভদ্রতার খাতিরেই।

—ওরে এই, একটা চেয়ার বার করে দে।

মুকুন্দ হাঁ হাঁ করে ওঠে—চেয়ার থাক স্যার, চেয়ার থাক। আপনার সামনে চেয়ারে বসবো কি?

সাহেবের মুখে একটু হাসির আভাস দেখা দেয়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন নাকি? বসুন। আপনাদের আশ্রয়ে এলাম, কাজটাজ বুঝিয়ে দেবেন তো।

বেয়ারা একটা বেতের চেয়ার এনে বসিয়ে দেয়।

মুকুন্দ যেন অগত্যাই বসে। আড়চোখে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।... রং ফরসা নয়, কিন্তু ঔজ্জ্বল্য আছে, একেই বোধহয় 'উজ্জ্বলশ্যাম' বলে। সকালের আলো প'ড়ে আরও একটু জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে। পাতলা নাক, চশমাঢাকা চোখ, চিবুকে আর চোয়ালে কেমন একটু নমনীয়তা। যা বয়েস, তাই চাইতেও যেন কম দেখায়।

মুকুন্দ মনে মনে হাসে... গলা টিপলে দুধ বেরোয় এখনও! পেড়ে ফেলতে আর কতক্ষণ?... যে লাভের ব্যাবসা চলছে তাদের, যে চোরা পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে হাজার হাজার টাকার হিসেব, সে আর এই খোকাবাবুর ধরবার সাধ্য নেই।... তবে চালাক আছে, বলছে কিনা 'আপনাদের আশ্রয়ে এসে পড়লাম'!...

সিকি মিনিটে এসব ভেবে নিয়ে কথা শুরু করে—আসতে কোনও কষ্ট হয়নি তো স্যার?

সাহেব মৃদু হেসে বলেন—কষ্ট কীসের?

—এই জঙ্গুলে রাস্তা!...ইয়ে—এ কি আর আপনাদের যুগ্যি স্যার।

—আমাদের যুগ্যি নয়?...সাহেব গলা ছেড়ে হেসে ওঠেন—বাবার পয়সা খরচ ক'রে এতদিন তবে শিখলাম কি মিস্টার—

—বিশ্বাস।

—মিস্টার বিশ্বাস? জঙ্গলেই তো কাজ আমাদের।

অতঃপর কাজ সংক্রান্ত খানিকটা কথাবার্তা হয়।... এবং বোধ করি মুকুন্দর অতি বিনয় আর হাতকচলানির জ্বালায় অস্থির হয়েই উঠে পড়েন সাহেব। বলেন—উঠি, একটু বেড়িয়ে নিই আপনাদের দেশটা।

—বিলক্ষণ! বিলক্ষণ!... বিনয়ে নুয়ে পড়ে মুকুন্দ—কিন্তু সাবধানে চলাফেরা করবেন স্যার, বুনো জন্তুর উৎপাত চারিদিকে!

—সে উৎপাত দিনের বেলাতেও আছে নাকি?

কৌতূহলী প্রশ্ন করেন সাহেব।... ভয়ের চিহ্ন দেখা যায় না মুখে।

একটু আশ্চর্য হয় বিশ্বাস। ... এই ভয় দেখালে তো সাহেবরা প্রথমেই ঘাবড়ান! এবং সেই ঘাবড়ানির সুযোগেই মুকুন্দ দেহরক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ করে সঙ্গ নেয়। যত বাজে কথা বোঝানোর সময় তো তখনি। কিন্তু সে সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না। তবু চোখ গোল গোল ক'রে বলে—জন্তু-জানোয়ারকে বিশ্বাস কি স্যার? বিশেষ ক'রে বুনোজন্তু! সঙ্গে যাই বরং।

মৃদু হেসে প্রত্যাখ্যান করেন সাহেব—নাঃ! লাগবে না! সকালবেলা!

মুকুন্দ আর একবার মনে মনে হাসে।.... তা সত্যি! সকালবেলা ভয় নেই। ভয়ঙ্কর হচ্ছে রেতের জানোয়ার! মুখে বলে—বলছিলাম কি স্যার, কাজের লোক-টোক কী রকম লাগবে?

—লোক? কুলির কথা বলছেন?... সাহেব একটু অবাক হ'ল।

—না, না, কুলির কথা বলছি না, মানে আপনার বাড়ির জন্যে।

—বাড়ি?... ও হো হো। ভারি সুন্দর হাসিটা। বাড়ি তো এই কাপড়ের ছাউনি।

—আজ্ঞে যতই হোক—রান্না-টান্না ঘরগেরস্থী কাজের জন্যে? কুলিদের মেয়েগুলো—

—না না! সে সব কিছু লাগবে না। সাহেব আত্মস্থভাবে বলেন—আমার চাপরাশিই আমার পক্ষে এনাফ্!

—তা'হলেও স্যার, আপনাদের ঘরে দু' পাঁচটা লোক না খাটলে মানাবে কেন? অবিশ্যি এখেনে সকলেই আপনার চাকর, তবু—

—না না। মেলা লোক নিয়ে আমার কী হবে?

—লোকগুলো আশা ক'রে থাকে স্যার! যখনি যে সাহেব আসেন ওরা কাজ পায় কি না? বখশিস্-টখশিস্ মেলে। ওই আশায় হাঁ ক'রে—

এবার সাহেবের মুখে একটু চিন্তার ভাব দেখা দেয়।...কী মুশকিল...কাজ যে নেই।...তার চাইতে আপনি এক কাজ করবেন মিস্টার বিশ্বাস, যারা প্রত্যাশা করে থাকে, এমন লোকদের পাঠিয়ে দেবেন, এমনিই কিছু বখশিস্ দিয়ে দেব!

হাতে চাঁদ পায় মুকুন্দ বিশ্বাস। নিজের কথার ফাঁদেই নিজে পড়ে গেছে সাহেব।

—তাই করব স্যার, আজ্ঞে তাই করব। বড় গরিব এরা স্যার। পয়সার জন্যে এরা গুলি খেয়ে মরতে পারে।

তুলনা শুনে সাহেব আর একবার হেসে ওঠেন।

তাঁবুর সামনে পাঞ্চলাইটের তীব্র আলো, পিছনে নিঃসীম অন্ধকার। সেখানে আলোর প্রবেশ নেই!

সাব্ ওভারসীয়ার আর জরীপবাবু, কেরানি আর চাপরাশি, যে যার আপন তাঁবুতে নিয়েছে আশ্রয়। কে জানে তার মধ্যে কে বেছে নিয়েছে নিশ্চিন্ত নিদ্রার শান্তি, আর কে আপনাকে ঘিরে পাপের বৃত্ত রচনা ক'রে চলেছে।

হাতকাটা গেঞ্জি, পাতলা পায়জামা, আর কোথাও নেই কোনো বাহুল্য। টেবিল ল্যাম্পটার সামনে মাথা নিচু করে বই পড়ছেন সেনসাহেব। সকালের রোদের মতো, ল্যাম্পের আলোটাও যেন উজ্জ্বলশ্যামকে আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে।

হঠাৎ বইয়ের উপর একটা ছায়া পড়ল। চম্‌কে তাকালেন। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—কে?

ছায়া কথা বলল না, শুধু টেবিলটা চেপে ধ'রে দাঁড়াল।

মাজা-ঘষা স্বাস্থ্যসম্পন্ন গঠন, গ্রাম্য চেহারার উপর বিকৃত আধুনিক সজ্জার পালিশ লাগাবার ব্যর্থ চেষ্টা। মুখে চোখে একটা দুঃসাহসের ছাপ।

—কে তুমি?

—কেউ না! ব'লে মেয়েটা মুখ নিচু ক'রে ফিক্ ক'রে একটু হাসল।

সেনসাহেব চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন।... কোথাও নেই জনমানবের সাড়া। বুকের ভিতরটা কি হিম হয়ে গেল তাঁর? বোঝা গেল না। স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠেই বললেন—তাঁবুর দরজা তো বন্ধ ছিল, ঢুকল কী ক'রে?

—পেছনে আর একটা দরজা আছে, বাইরে থেকে খোলা যায়।

ব'লে মেয়েটা এদিক ওদিক তাকাতে লাগল, বোধহয় বসবার জায়গার আশায়। সে ইশারায় দৃষ্টিপাত করলেন না সেনসাহেব, শুধু চিবুক আর চোয়ালের নমনীয় গড়নটা বদলে গেল।

—তোমাকে পাঠিয়েছে কে?

মেয়েটার মুখের চটুলভাবটা একটু কুঁকড়ে গেল, টেবিলের উপর নখের দাগ কাটতে কাটতে বলল—কেউ না!...আমি নিজেই এসেছি।

—ওঃ। কিন্তু কেন?

—কেন?... হঠাৎ আবার ফিক্ করে একটু হাসল মেয়েটা সরাসরি মুখের দিকে তাকিয়ে।... ঠোঁটের কোণে হাসির জেরটা রেখেই বললে—শুনলাম আপনি গরিবদের ডেকেছেন বখশিস্ দেবেন ব'লে।... তাই!

এটা নিশ্চিত, অনধিকারপ্রবেশকারী মেয়ে না হয়ে যদি পুরুষ হ'ত তা'হলে একটি কথা বলারও সুযোগ পেত না, বিনা বাক্যব্যয়েই বিতাড়িত হ'ত। বক্তব্য তার যাই থাক। কিন্তু একটা তরুণী মেয়েকে বিনা-বাক্যব্যয়ে দূর করা শক্ত।... বিশেষত মেয়েটাকে ঠিক কুলি মজুরদের বলেও মনে হচ্ছে না।

সেনসাহেব গম্ভীর গলায় বলেন—এইটা কি বখশিস্ নেবার সময়?

যে সপ্রতিভকে 'বাচাল' বলে, মেয়েটা বোধ হয় সেই পর্যায়ের, তাই চটপট জবাব দেয়—সাহেবরা তো তাই দেন!

—ও!

সেনসাহেব তাঁবুর ও দেয়ালের দিকে চলে যান, আঙটায় ঝোলানো কী একটা নিয়ে আসেন। মেয়েটার সামনে তুলে বলেন—এটা কী জিনিস চেনো?

মেয়েটার মুখে এবার ভয়ের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জঙ্গলের বাসিন্দারা এ জিনিসকে চেনে। পথে বেরোনোর সময় প্রায়ই সাহেব-সুবোর হাতে থাকে। কাঁটা লাগান চাবুক! ... বুনো কুকুর আর কুলি শায়েস্তা করবার অস্ত্র।

—চেনো এটা?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা হঠাৎ কেঁদে ফেলে—মারবেন না বাবু,...আমাকে পাঠিয়েছে, আমি ইচ্ছে ক'রে আসিনি। দোহাই বাবু মারবেন না!

চাবুকটা নামিয়ে সেনসাহেব, ভ্রূকুটির সঙ্গে একটি হাসি মিশিয়ে বলেন—নাঃ, তোমাকে মারব না! মারব তাদের যারা তোমাকে পাঠিয়েছে! চল আমার সঙ্গে। দেখি কে—

মেয়েটা চোখ মুছে বলে—ওদের দোষ নেই বাবু!

—ওদেরও দোষ নেই? দোষটা তাহলে কার?

স্পষ্ট আর উচিত উত্তর একটা বোধহয় মুখের আগায় এসেছিল, সামলে নিয়ে মেয়েটা মাথা নিচু ক'রে বলে—অন্য অন্য সাহেবরা যখন আসেন তাঁরা—

—আচ্ছা থাক, বুঝেছি। আলনায় ঝোলানো শার্টের পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট নিয়ে মেয়েটার সামনে ফেলে দিয়ে সেনসাহেব বলেন—এই নাও। যাও।

মেয়েটা নেয়ও না, নড়েও না।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলে যাও।... ধমকের মতো শুনতে লাগে কথাটা!

—এক্ষুনি চলে গেলে ওরা বকবে!

—ওঃ! চলো আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।—পৌঁছে দেব। কোথায় বাড়ি তোমার?

মেয়েটা যে কী বলে, বোঝা যায় না।

সেনসাহেব গেঞ্জির উপর একটা ঢিলে গাউন চাপিয়ে চাবুকটা হাতে নিয়ে তাঁবুর দরজা খুলতে থাকেন।

—আমি একলাই যাচ্ছি—মেয়েটার কণ্ঠে অস্বস্তি।

—না, আমি পৌঁছে দিয়ে আসব। টাকাটা তুলে নাও... আদেশের ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয় কথাটা!

—না! মেয়েটা জিদের সুরে আপত্তি করল!

—না কেন? তোমরা তো গরিব, টাকার দরকার নেই?

—ভিক্ষে নেব কেন?

—ওঃ! তা' ভালো! বেশ থাক।

খোলা মাঠে নেমে পড়েন সেন সাহেব। বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলোটা যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

পাশাপাশি চলতে থাকে দুজনে।

—এভাবে খাটতে তোমার লজ্জা করে না?

মেয়েটা রুদ্ধকণ্ঠে বলে—ও কথা আমাকে কেউ কোনওদিন শেখায়নি বাবু! জরীপবাবু আমাদের দেশের লোক। সে-বারে বন্যের সময় মা বাপ সব গেল, মুকুন্দদা নিয়ে এল, বলল—চাকরি ক'রে দেবে। তখন তো বুঝিনি, তখন বয়েস কম— চুপ করে যায় মেয়েটা।

অনেক জেরা আর অনেক আক্ষেপোক্তির পর মুকুন্দ আবার একবার প্রশ্ন করে—তাঁবুর দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল? এ্যাঁ...ভাবছি আর মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে যে হরিপদ্দা!

পদ্মা মুকুন্দ আর হরিপদর রাতের আহার এখানেই সারা হয়েছে, একপাশে তিনখানা এনামেলের সান্‌কিতে তিনজনের ভুক্তাবশিষ্ট প'ড়ে...এ-ধারে দুই বন্ধু বোতল নিয়ে বসে।

পদ্মা দাঁড়িয়ে আছে ভগ্নদূতের ভূমিকা নিয়ে।

হরিপদ দুই হাত উল্টে বলে—তাজ্জব বটে!

মুকুন্দ প্রায় মেয়েমানুষের মতো কাঁদো কাঁদো গলায় বলে—তুমি তো 'তাজ্জব' বলে গা হাল্‌কা করে ফেলছ হরিপদ্দা, এখন আমার কী হবে? ... চাকরিটাই খসবে, না পাঁচজনের সামনে চাবুক খাব?

হরিপদ বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বলে—সে সব কিছু হবে না হে মুকুন্দ, সে তুমি 'সিওর' থাক। দিনের আলোয় ওই ছেঁড়া কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করবে না সাহেব।... কিন্তু তুই কী ব'লে ফেল্ মেরে চলে এলি বল্ তো পদ্মা? তোর ওপর আমরা এত ভরসা রাখি, আর ওই একফোঁট্টা ছোঁড়াকে—

হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে পদ্মা। আর সেই জ্বলন্ত চোখ তুলে বলে—মানুষ তো কখনও দেখনি হরিপদদা, দেখেছ খালি জানোয়ার!

ওব্ বাবা—! ও মুকুন্দ, এ বিদ্যেবতী বলে কী! জগাই মাধাইয়ের মতন হঠাৎ উদ্ধার হয়ে গেল নাকি? টাকাটা সুদ্ধু ফেলে রেখে এল! পাঁচ পাঁচটা টাকা!... নাঃ পদ্মা, তুইও বাবা তাজ্জব বানালি।

—আমি যাচ্ছি।

নিজের আস্তানার উদ্দেশে পা বাড়ায় পদ্মা!

—আহা-হা এখ্খুনি যাবি কেন? এই তো সবে এগারোটা।

মুকুন্দ খপ্ ক'রে ওর একটা হাত চেপে ধ'রে বলে—মেজাজটা বিগড়ে দিলি, বোস্ না দুটো গল্পগাছা করি।

—আঃ ছাড়ো—।

হাতের উপর একটা কেঁচো বা কেন্নো উঠলে যেভাবে হাত আছড়ায় লোকে, সেইভাবে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পদ্মা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—ছুঁয়ো না বলছি, মুকুন্দদা, ভালো হবে না।

—ভালো হবে না। একেবারে 'ভাল্লো' হবে না। ওরে ব্যস্! আমাদের পদ্মরানি যে—

—খবরদার মুকুন্দদা, ছোটলোকমি কোরো না।...তোমাদের আমি ঘেন্না করি বুঝলে? কুকুর শেয়ালের মতো ঘেন্না করি!

মুকুন্দর রোষদৃষ্টি পড়লে যে ভবিষ্যতে কোথায় দাঁড়াবে, সে কথা না ভেবেই গটগটিয়ে বেরিয়ে যায় মেয়েটা। আর পথে পড়েই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। রাতচরা পাখি, বুনোজন্তুকেও ভয় নেই ওর।

নিজের বুদ্ধিতে আস্থাওয়ালা ধড়িবাজ দুটো লোক হাঁ করে খানিক তাকিয়ে থেকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলে—হঠাৎ ব্যাপারটা কী হ'ল বলো তো?

—খোদা জানে।

মুকুন্দর আশ্রিত, মুকুন্দর হাতের পুতুল, আর মুকুন্দর ভয়ে তটস্থ পদ্মা, হঠাৎ এত সাহস পেল কোথা থেকে এই ভেবে অবাক হয়ে যায় ওরা। তাও যদি সাহেবের সুনজরে পড়ত, তো—আস্পর্ধার একটা মানে পাওয়া যেত। কিন্তু এটা কী ক'রে হ'ল? অন্নদাতার মুখের উপর স্পষ্ট ব'লে গেল, 'তোমাকে আমি ঘেন্না করি।'

কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগেও পদ্মা নিজেই কি জানত, মুকুন্দ হরিপদদের এত ঘৃণা করে সে? এই তো খানিক আগেই এক সঙ্গে বসে খেয়ে গেছে, হেসে হেসে আর রান্নার তারিফ ক'রে।

মুকুন্দ আর হরিপদ। কে জানে হয়তো বা এরাও কোনওদিন নিজেরাই নিজেদেরকে ঘৃণা করতে শিখবে।

তা'হলে কি পৃথিবীও কোনওদিন একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবে না? মানুষ লোভের হাত বাড়িয়ে যতই নিঃশেষ করে ফেলতে চাক তাকে, অবিনশ্বর থাকবে তার প্রাণের সঞ্চয়।

অবোধ্য পৃথিবী

নোটের গোছাটা হাতে নিয়ে গুণতে গুণতে আরাধনা ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেন— কম যে?

বীরেশ্বর আকাশ থেকে পড়েন—কম? কম না কি? কত কম?

—কুড়ি টাকা।

বীরেশ্বর যেন অথই জলে—কুড়ি টাকা কম? বল কি? তাই তো—কী করল বুঝতে পারছি না তো। কী একটা কথা উঠেছিল বটে, প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকা নাকি আরও বেশি হারে কাটবে, সে কি এই মাস থেকেই—

আরাধনা বিরক্তভাবে বলেন—ন্যাকা-বোকার মতো কথা বলছ কেন? আপিসের ফণ্ডে টাকা বেশি কেটে নিল কি না, তা জানতে পার নি?

—আহা! অতটা কান দিয়ে শুনিনি আর কি! কাল খোঁজ নেব!

আরাধনা মুখে যতটা বিরক্তি ফোটানো সম্ভব, তা ফুটিয়ে বলেন—খোঁজ নিয়ে তো আমার মাথা কিনবে। কুড়ি-কুড়িটা টাকা কমে গেলে, আমি চালাব কী করে?

বীরেশ্বর পরম সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলেন—হয়ে যাবে এক রকম করে। তোমার বাজেটে কুড়িটা আইটেম কি আর নেই? সব থেকে একটা করে টাকা বাঁচালেই—

একেই কুড়ি টাকা ঘাটতির বিরক্তি, তার উপর এই হাড়জ্বালানো সান্ত্বনা! আরাধনা রেগে বলেন—বাঁচানোর ভারটা তুমিই নিও তাহলে। ঠাকুরের মাইনে থেকে এক টাকা, ঝিয়ের মাইনে থেকে এক টাকা, বাড়ি-ভাড়া, ইলেকট্রিক বিল, কাবুলের কলেজের আর উমা ঊষার স্কুলে মাইনে, তোমার পিসির মাসোহারা, সব থেকে কাটো এক টাকা করে, জমে যাবে!

বীরেশ্বর অপ্রতিভভাবে বলেন—আহা ওসব থেকে কি আর সম্ভব? ধরো তোমাদের গিয়ে শাড়ি, জুতো, জামা, স্নো, সাবান, পাউডার এই সব থেকে—

—শাড়ি জুতো জামা প্রত্যেক মাসে কিনছি?

আরাধনার স্বরে ভীষণতা।

—আহা তাই কি আর বলছি?

—বলছই তো। বলতে আর বাকি রাখছ কোথা? স্নো সাবান থেকে বাঁচিয়ে কুড়ি টাকা বেরোবে? মাসে কত টাকার কেনা হয় ওসব?

উঃ! উকিল কেন হওনি তাই ভাবি। বলে সরে পড়েন বীরেশ্বর।

এ কথাটা বীরেশ্বরবাবুর মুদ্রাদোষের সামিল।

স্ত্রীর জেরার মুখে দাঁড়াতে না পারলেই, ওই কথাটি বলে রণে ভঙ্গ দেন।

কিন্তু আরাধনা এমন প্রখর না হবেন বা কেন? স্বামীকে অধঃপাতের পাতাল হতে টেনে তুলে, এখন যে দশের একজন করে দাঁড় করিয়েছেন সে কীসের জোরে? ঘরে বসে শুধু ওই জেরার জোরে আর কথার জোরেই তো!

নইলে কী যে হত!

কম বয়সে তো রীতিমতো পান-দোষ ছিল বীরেশ্বরের। বেপরোয়াই ছিলেন।

লজ্জা-সরমের ধার বড় ধারতেন না বীরেশ্বর। স্বচ্ছন্দে বলতেন—মদ খাওয়ায় দোষটা যে কী, তা তো বুঝি না। খাবার জন্যেই তো জিনিসটা সৃষ্টি হয়েছে? না কি? সারা পৃথিবীতে বছরে কত কোটি টাকার মদ বিক্রি হয় তা জানো? লোকে খাচ্ছে বলেই তো? মদ আছে তাই দুনিয়া টিঁকে আছে, বুঝলে?

আরাধনা কেঁদে-কেটে এক করলে হতাশ হয়ে বলতেন—বেশ! তাহলে আর খাব না! একটা জিনিস একটু খেতে ভালোবাসি, সেইটাতেই তোমার যত নজর। আচ্ছা এই যে তুমি ইলিশ মাছ খেতে ভালোবাস, কই আমি তো বাগড়া দিতে যাই না?

—ইলিশ মাছ আর মদ এক হল?

রান্না ভুলে ছিটকে উঠতেন আরাধনা।

—কেন নয়? বীরেশ্বরের যুক্তি জোরালো—মদ পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, ইলিশ মাছও রাস্তায় বিলোয় না! মদের আফটার এফেক্ট খারাপ, ইলিশ মাছেরও তাই। মাতালের মদের বোতল দেখলে রসনার যে অবস্থা হয়, মহিলাদেরও গঙ্গার ইলিশটি দেখলে রসনার সেই অবস্থাই ঘটে! বলো সত্যি কি না? এই যে তুমি আমাকে মদ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে এত লাঠালাঠি করছ, কারণ কি? পাছে লিভার পেকে মরে যাই, কেমন? কিন্তু সমাপ্তির পর উপসংহারটা কী? আমি আমি মলে তোমার ইলিশ মাছটি বন্ধ হবে এই তো?

এই সব যুক্তি তর্ক ছিল বীরেশ্বরের।

তা সে যত জোরালো যুক্তিই থাক, শেষ পর্যন্ত আরাধনারই জয় ঘটেছে। মদ ছেড়েছেন বীরেশ্বর, সুন্দরী মহিলা দেখলে চাঞ্চল্যপ্রকাশ, সেটাও ছেড়েছেন। অবিশ্যি উল্লেখযোগ্য স্বভাবদোষ তাঁর ছিল না, কিন্তু পথে-ঘাটে, ঘরে-সংসারে, সুন্দরী তরুণী দেখলেই চোখ ট্যারা হয়ে যেত বীরেশ্বরের। আর আরাধনার শত ধিক্কারে এবং গালাগালেও অবিচলিত চিত্তে বলতেন—ভালো জিনিস চোখে পড়লে তাকিয়ে দেখব না? মানুষের তৈরি যান্ত্রিক শিল্প নয়, স্বয়ং বিধাতা পুরুষের হাতে শিল্পকলার নমুনা! এও যদি হাঁ করে না দেখব তো দেখব কী? ফুল দেখে মোহিত হও না তোমরা? পাখি পক্ষি নদী পাহাড় দেখ না বিভোর হয়ে?

আরাধনা চটে লাল হতেন, রেগে মাথার চুল ছিঁড়তেন, বলতেন—দেখি! হাঁ ভগবানের হাতের কারুকার্য দেখি! তোমার মতন চোখ দিয়ে গিলি না।

—তার মানে হচ্ছে আমার রসবোধ তোমাদের চেয়ে বেশি! আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখি। কথায় হেরে অবশেষে আরাধনা অনশন ধর্মঘট শুরু করতেন।

যাক ও-সব তো অনেক দিনের কথা!

সুশীল সুবোধ বীরেশ্বর আরাধনাতে সমর্পিত প্রাণ হয়ে বসে আছেন সেও অনেকদিন হয়ে গেছে। এখন তো বড় ছেলে কাবুল থার্ড ইয়ারে পড়ছে, দুই মেয়ের প্রবেশিকা দেব-দেবর বয়স। তারা বরং বাবার উপর মায়ের শাসনের বাড়াবাড়িতেই দুঃখিত।

কিন্তু আরাধনার শাসকমনোবৃত্তিটা রয়েই গেল কেন? তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে নিশ্চিন্ততা

নেই কেন? এতদিনের অনভ্যাসেও সন্দেহ করার অভ্যাসটা ভিতরে টিকে আছে কেন? তাই না আজ সামান্য এই কুড়িটা টাকার ঘাটতি, সেই সন্দেহকে এতটা উস্কে জাগিয়ে তোলে। শান্তি পান না আরাধনা, রেহাই পান না সন্দেহের হাত থেকে।

কেবলই তাঁর মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন আনাগোনা করতে থাকে, আবার মতিচ্ছন্ন ধরল না তো? কে জানে বুড়ো বয়সে আবার পুরনো কোনো বন্ধুরূপী শয়তানের পাল্লায় পড়লেন কি না। কে জানে বা নতুন কোন ক্লাব-টাবের আওতায় গিয়ে পড়েছেন কি না!

সন্দেহই সন্দেহের পৃষ্ঠপোষক।

ভাবতে ভাবতে মনে হয় আরাধনার, কদিন থেকেই যেন লক্ষ করছেন, আপিস থেকে এসে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছেন বীরেশ্বর। রাত করে ফিরছেন। নিজে তিনি সন্ধ্যাবেলাটা পূজার্চনায় কাটান বলেই, কদিন খেয়াল করেননি।

কিছুদিন হল গুরুমন্ত্র হয়েছে আরাধনার!

কিন্তু গুরুমন্ত্র হয়েছে, আর নতুন পূজাহ্নিকের নেশায় মেতেছেন বলেই তো আর স্বামীকে পুরনো উচ্ছন্নের পথে যেতে দিতে পারেন না। ভাবলেন দু-দিন পুজো সংক্ষিপ্ত করে বীরেশ্বরের গতিবিধি ধরতে হবে!

ঠিক! ঠিক! যা ভেবেছেন তাই! বীরেশ্বর চলেছেন গুটি গুটি!

তাড়াতাড়ি পুজো সেরে তিনতলার ঠাকুর ঘর থেকে নেমে এসেই খপ করে স্বামীকে ধরলেন আরাধনা।

—যাচ্ছ কোথায়?

বীরেশ্বর এইমাত্র ঠাকুরঘরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি শুনেছেন, চিত্ত নিঃশঙ্ক! তাই এই অতর্কিত আক্রমণে চমকে উঠলেন। আমতা আমতা করে বললেন—যাব আবার কোথায়? এমনি!

—এমনি মানে? এমনিটা কি? লক্ষ্য একটা কিছু আছে তো?

বীরেশ্বর পরিহাসের পথ ধরেন—লক্ষ্য তো কিছু নেই। এ যাত্রা মোর লক্ষ্যহীন নিরুদ্দেশের পথে—!

আরাধনা এ পরিহাসে গললেন না, মুখ ঘুরিয়ে বলেন—বুঝেছি, কোন নিরুদ্দেশের পথ! বুড়ো বয়সে আবার মতিচ্ছন্ন ধরেছে!

বীরেশ্বর মৃদু হেসে বলেন—পাগল হয়েছ? যে মতি তোমাতে অর্পিত হয়েছে সে কি আর উচ্ছন্নে যেতে পারে?

—চিরদিনই মুখে জগৎ মারলে! আচ্ছা দেখব দুদিন তোমার মতি গতি!

তথাপি বীরেশ্বর বেরিয়ে গেলেন গুটি গুটি এবং ফিরলেন রাত দশটায়।

আরাধনা গুম্ হয়ে রইলেন।

ভেবেছিলেন পরদিন বোধ হয় আর বেরোতে সাহস করবেন না বীরেশ্বর, কিন্তু নাঃ! যথা কল্য তথা অদ্য! পুজো প্রায় না করেই ছুটে নেমে এসেছেন আরাধনা ; এসেই দেখেন বীরেশ্বর চুলে চিরুনি চালাচ্ছেন।

দেখে আপাদমস্তক জ্বলে যাবে না—এ হতে পারে না।

—আবার? আবার আজ ছুটছ?

—কি মুশকিল! বীরেশ্বর বিব্রতভাবে বলেন—তুমি যে সি. আই. ডি হয়ে উঠলে! বাড়ি থেকে বেরোব না?

—কই এতদিন কি বেরোচ্ছিলে?

—এতদিন বেরোচ্ছিলাম না বলে কোনওদিন বেরোব না, এটা যুক্তি নয়।

—আজ তুমি বেরোবে না! ব্যস।

—আমার যে না বেরোলেই নয় গো!

—নয় তা তো দেখতেই পাচ্ছি—দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করেন আরাধনা—কিন্তু আমি এই দিব্যি দিচ্ছি যদি যাবে!

—আঃ কি বিপদ। কেন দিব্যি-দিলেশা দিচ্ছ। বলছি—তুমি মিথ্যে সন্দেহ পুষে কষ্ট পেও না। আমি ভালো জায়গাতেই যাচ্ছি।

—মাতালের ভালো জায়গা শুঁড়িখানা! বুড়ো বয়সে আবার তুমি এই কেলেঙ্কারি ধরলে? কাবুল টের পেলে মুখখানা কোথায় থাকবে তোমার?

বীরেশ্বর এবার চটে ওঠেন। বিরক্ত স্বরে বলেন,—মাতালদের মুখ যেখানে থাকে। জগতে কি মাতাল নেই? না তাদের ছেলেমেয়ে নেই? আবার যদি আমি মদ ধরি, আটকাতে পারবে তুমি?

—পারব বই কী। পারতেই হবে! জোয়ান বয়সের নেশা ছাড়িয়েছি, আর বুড়ো বয়সের পারব না?

—তুমি ছাড়িয়েছ? হঠাৎ হা হা করে হেসে ওঠেন বীরেশ্বর! হাসতে হাসতে বলেন—সেই আত্মপ্রসাদেই বুঝি এত অহঙ্কার? ছেড়েছে বীরেশ্বর সেন নিজে! বুঝলে? খেয়াল হল, দিলাম ছেড়ে। ভাবলাম জলজ্যান্ত আস্ত একটা মানুষ যখন তোমার পছন্দ নয়, তখন নাও একটা হাবাগোবা ভালোমানুষ। তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। নইলে বীরেশ্বর সেনকে মদ ছাড়ানো তোমার সাধ্যি?

আরাধনা পুজোর তসর পরেই খাটের উপর বসে পড়ে বলেন—তাহলে নিজে মুখে স্বীকার করছ?

—অস্বীকার করলেও যখন তুমি বিশ্বাস করবে না, তখন স্বীকার করায় ক্ষতি কি?

এ বয়সে আর চোখে জল ঝরে না, ঝরে আগুন! আরাধনা রাগে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন—তুমি যদি আজ যাও তো, এসে দেখবে যে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছি!

বীরেশ্বর আর একবার হেসে ওঠেন। হেসে হেসে বলেন—পাগল হয়েছ? সকালে বড়ি দেবে বলে ডাল ভিজিয়ে রেখেছ না?

—বটে? তুমি ভেবেছ তুচ্ছ বস্তুতে এমনই আসক্তি আমার যে মরতে পারি না?

—আহা হা, তাই কি বলছি? আসক্তিটা আরও উচ্চ বস্তুতে রক্ষিত আছে, তাই কি আমি জানি না? আমি শুধু বলছি—বড়িবিহীন মাছের ঝোল যে আমার মুখে রোচে না, সে কথা বিস্মৃত হয়ে তুমি কি—?

—আচ্ছা। তোমার দৌড় আমি দেখছি। মরব কেন? মরলে তো তোমার সুবিধেই। বেঁচে থেকেই তোমার জীবন অতিষ্ঠ করছি, রোসো।

—জীবন অতিষ্ঠ? বীরেশ্বরের ওষ্ঠপ্রান্তে একটু বঙ্কিম হাসি দেখা দেয়। সেই বঙ্কিম রেখার খাঁজ থেকেই উচ্চারিত হয়—তার অবকাশ এখনও আছে নাকি?

—কী? কী বললে? আমি তোমার জীবন অতিষ্ঠ করেছি!

—কই? বললাম না কী ওকথা? না-বলা কথাও বুঝে ফেল? আশ্চর্য তো।

কথার মাঝখানেই খাটের তলা থেকে চটিজোড়াটা বার করে তাতে পা গলিয়ে নেন বীরেশ্বর।

—তবু যাচ্ছো?

—কী মুশকিল! যাচ্ছিই তো!

—কিছুতেই যেতে পাবে না তুমি আজ!

—এই দেখ ছেলেমানুষের মতো বায়না ধরছ কেন? বলছি যে—না গেলেই নয়!

বেরিয়ে যান বীরেশ্বর!

বিছে কামড়ানোর মতো ছটফট করতে থাকেন আরাধনা, ভেবে পান না কী করবেন। এক একবার মনে হয় সত্যিই একগাছা দড়ি নিয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়েন। মোক্ষম রকম জব্দ হয়ে যাক লোকটা। কিন্তু সত্যিই তো আর সেটা সম্ভব নয়!

খানিক পরে বামুন ঠাকুর এসে ডাকে—মা, দাদাবাবু খেতে বসেছেন।

অগত্যাই উঠতে হয় আরাধনাকে।

অন্যমনস্কের মতো একটুক্ষণ বসে থেকে বলেন—হ্যাঁরে কাবুল, তোর বাবা রোজ সন্ধ্যাবেলা কোথায় যায় রে?

কাবুল বিস্ময়ে মুখ তুলে বলে—জানি না তো? রোজ যান নাকি?

—তাই তো যাচ্ছে দেখছি!

মার তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক সুরে কাবুল কিছুটা চমকিত হয়। মুহূর্তে একটা সন্দেহের বিদ্যুৎ খেলে যায় তারও মনের মধ্যে। ছেলেবেলার স্মৃতি লুপ্ত হয়নি তার, অনেক অশান্তি, অনেক অশ্রুজল দেখেছে সে।

ছেলের গুম্ হয়ে যাওয়া মুখের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে আরাধনা বলেন—আর দু একটা দিন দেখি, তারপর—এই তোকে ভার দিচ্ছি,—কোথায় যায় সন্ধান নিয়ে আমাকে একদিন নিয়ে যাবি সেখানে।

—তোমাকে?

—হ্যাঁ আমাকে! চমকাচ্ছিস কেন? আমি বেঁচে থাকতে, বুড়ো বয়সে ওকে লোক হাসাতে দেব না!

দু একদিন কেন, পর পর চারদিন দেখেন আরাধনা!

হতাশের আশায় ভাবতে চেষ্টা করেন—হয়তো তাঁর নিজের ভুল! হয়তো সত্যি সেরকম কোনও কাজ পড়েছিল বীরেশ্বরের!

কিন্তু না!

আরাধনার ভাগ্যদেবতা বড় নির্দয়। পর পর চারদিন কোনও ব্যতিক্রম নেই, যথানিয়মে পুজো করে নামেন তিনি, যথানিয়মে দেখেন স্বামী বেরোবার জন্য তোড়জোড় করছেন।

আর নিষেধ করেন না আরাধনা, শুধু গুম্ হয়ে থাকেন!

বার বার চারবার।

পঞ্চম দিনে কর্তা বেরোতে না বেরোতে ছেলেকে কাছে ডাকেন আরাধনা। ভারী মুখে বলেন—চট্ করে একটা রিক্স ডাক দিকিন। ঝটপট। কোথায় যায় ও, ধরবই আমি আজ!

কাবুল আড়ষ্ট হয়ে বলে—রিক্স করে?

—এখন তো তাই বেরোই! পায়ে হেঁটে গেছে, ধরতে অবিশ্যিই পারা যাবে। বাসে চড়ে, বাসে চড়ব! ট্যাক্সি নেয়, ট্যাক্সি নেব!

কাবুল ভয়ে ভয়ে বলে—গিয়ে কী করবে?

—কী করব? কী করব সে কথা এখন এখানে বসে গল্প করবার সময় নেই। এখনও গলির ভেতর আছে, বড় রাস্তায় পড়লে আর ধরতে পারা যাবে না।

কাবুল কাতরভাবে বলে—তার চাইতে আজকে আমিই যাই না মা!

—দাঁড়িয়ে তর্ক করবার সময় আমার নেই কাবুল! বেশ—তুই নিয়ে যেতে না পারিস, আমি একাই যাচ্ছি। ...পথে বেরিয়ে পড়েন আরাধনা!

অগত্যাই কাবুলকে যেতে হয় পিছন পিছন।

না, চোখ ছাড়া হয়ে যাননি বীরেশ্বর!

অনেকটা পথ একটানা চলেছেন হাঁটতে হাঁটতে! রিক্‌স নিয়ে অনুসরণ করবার আদায় আছে। রিক্‌সর সামনের কদর্য কুশ্রী চটের পর্দাটা মুখের সামনে ঝুলিয়ে দেন আরাধনা, কাবুলের আর নিজের পা দু জোড়া পর্যন্ত কাপড় টেনে টেনে দিয়ে ঢাকা দেন! কোণের দিকে ইঞ্চিখানেক ফাঁক, সেইখানে একটি চক্ষু স্থাপিত!

চোখ না আগুনের ফুলকি!

ম্রিয়মান কাবুল কোণে মাথা হেলিয়ে বসে থাকে নিরুপায়ের ভঙ্গিতে।

রিক্‌সওয়ালা আরোহিণীর নির্দেশ অনুসারে গজ কয়েক তফাত থেকে 'বাবুকে ফলো' করে।

গলি রাস্তা থেকে বড় রাস্তায়....বড় রাস্তা থেকে আবার গলি! আঁকাবাঁকা কুৎসিত পথ। কোথাও পথেই স্তূপীকৃত জঞ্জাল, কোথাও মরচে-পড়া ডাস্টবিনটা উপচে উঠেছে! কোথাও পাশের দোতলার খোলা নর্দমা দিয়ে জল পড়ছে ছরছর করে।

আরাধনা মরীয়া। বাড়ি গিয়ে স্নান করবেন নিশ্চিত, অতএব হেস্তনেস্ত দেখতেই হবে। শরীর মন ক্রমশই যেন অবশ হয়ে আসছে! এই আস্তাকুঁড়ে প্রত্যহ গতায়াত বীরেশ্বরের!

তাহলে শুধু মদই নয়, দ্বিতীয় 'ম' কারও! হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

রাগেও নয় দুঃখেও নয় অপমানে চোখ ফেটে জল আসে আরাধনার।

হায় গুরুদেব!

আরাধনার স্বামী এমনি নরকের কীট! ইতর হতে হলে কী এমনি ইতরই হতে হয়!

হঠাৎ কাবুল বলে—মা ফিরে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে রিক্‌সওয়ালাটাও বলে—হাঁ হাঁ, গাড়ি আর যাবে না।

আরাধনার নিজের মনেই দ্বিধা এসেছিল—ভাবছিলেন এগোই কি ফিরে যাই, কিন্তু চিরস্বভাব অনুযায়ী দুজনের বিরুদ্ধ মতে তাঁর জিদ চাপে। বলেন—আচ্ছা দাঁড়া তোরা এখানে! বলে নেমে পড়েন।

কাবুল ব্যাকুলভাবে হাতটা ধরে ফেলে বলে—ওই পচা গলির মধ্যে তোমার আর গিয়ে কাজ নেই মা!

আরাধনা হাত ছাড়িয়ে নেন, বিদ্বেষ-কুটিলমুখে বলে—কেন তোদের বাপ রোজ আসতে পারে—আমি গেলেই দোষ?

এ রণচণ্ডী মূর্তির সামনে কাবুল শিশুমাত্র! গুটি গুটি অগ্রসর হয় মায়ের পিছন পিছন।...বীরেশ্বর ততক্ষণে চোখছাড়া হয়ে গেছেন। তা হোন, আরাধনার হাত ছাড়াতে পারবেন না!

ছেঁড়া মাদুর, কাচভাঙা লণ্ঠন, নড়বড়ে জলচৌকি। স্কুলের আসবাব এই। বিদ্যার্থীদের চেহারাও তথৈবচ! কালো, রোগা, খালি পা, খালি গা। লজ্জা নিবারণার্থে মাত্র একটা করে

হাফপ্যান্ট! কিন্তু পরিবেশ যাই হোক উৎসাহের অভাব নেই।

বীরেশ্বরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সেই গুটি কুড়ি-বাইশ মানবশিশু সমস্বরে কলরোল তোলে—লেট্! লেট্! মাস্টার মশাই আজকেও লেট্!

নড়বড়ে জলচৌকিটির উপর আসন পরিগ্রহ করে বীরেশ্বর ফুল্লমুখে বলেন—হুঁ! মাস্টারমশাই একেবারে লেট্ লতিফ!

হাসির আর ঠেলাঠেলির ধুম পড়ে যায় ছাত্রদের মধ্যে।

বাতাসে কম্পিত ভাঙা লণ্ঠনের নিষ্প্রভ আলোটুকুতেও তাদের ছায়াগুলো অনেক বড় হয়ে হয়ে কাঁপতে থাকে পিছনের বিবর্ণ প্রাচীরটার গায়ে। ...কাঁপতে থাকে পৃথিবী, লজ্জায় কাঁপতে থাকে অদূরবর্তিনীর পা দুখানা।

ছেলে রয়েছে সঙ্গে। আরাধনার নীচতার সাক্ষী হয়ে গেল—চিরদিনের মতো!

প্রয়োজন ছিল না, তবু এবারেও কদর্য কুশ্রী সেই চটের পর্দাটা সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছেন আরাধনা। একলাই চলেছেন। কারণ চটটা ঝোলাবার সঙ্গে সঙ্গেই—"তুমি ওঠ, আমি হেঁটে যাচ্ছি—" বলে কাবুল লাফিয়ে নেমে পড়েছে রিক্স থেকে!

চলতে চলতে আকস্মিক সেই লজ্জাবোধটাও চলে গেছে আরাধনার, জেগেছে শুধু বিস্ময়! হ্যাঁ, অবাক হয়ে ভাবছেন আরাধনা—যে ব্যক্তি মদ খাওয়ার মতো গর্হিত কাজ করতে কখনও এতটুকু লজ্জিত হয়নি, লুকোচুরির ধার দিয়ে যায়নি, সে একটা সৎকাজ করতে বসে এত লজ্জিত কেন, যে এমন করে লুকোচুরির দরকার হয়?

ছায়াচ্ছন্ন মনোলোক! সেখানে কখন কোন্ ঘটনা ঘটছে, আর কেন ঘটছে, এ তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

অসতর্ক

যাত্রার আয়োজন চলছে।

তোড়জোড় করে নয়, ঢিমে চালে। প্রয়োজনটা প্রবল, ইচ্ছেটা দুর্বল। কিন্তু প্রয়োজন নিয়েই জগৎ, ইচ্ছেকে নিয়ে কে কোথায় ঘরকন্না করছে?

শেষরাত্রে ট্রেন।

শেষবারের মতো রাত্রের খাওয়াটা একসঙ্গে খেতে বসে সরোজকান্তি আপশোষের ভঙ্গিতে বলে ওঠে—বেশ থাকা গিয়েছিল একটা মাস। সত্যি নিরু, তোমার কাছে এসে যে এতটা অভ্যর্থনা আর সমাদর পাব মোটেই ভেবে আসিনি। আসবার আগে বরং একটু ভয়ই করছিল।

জলের গ্লাসটা মুখে তুলেছিল বলেই বোধহয় বন্ধুর কথাটা শেষ পর্যন্ত শেষ করতে দিল নিরুপম। শেষ হতেই চাপা হাসির গাম্ভীর্যে প্রশ্ন করল—ভয়টা কীসের? পাছে বাড়ি ঢুকতে না দিই?

—অতটা না হোক—সরোজকান্তি হাসতে থাকে—পাছে বিব্রত ভাবটা প্রকাশ করে বসে।

নিরুপম মুচকে হেসে বলে—ভাগ্যিস! ভাগ্যিস মনের ভাব অপ্রকাশ রাখবার আর্টটা আয়ত্ত আছে।

যদিও আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তিন ব্যক্তিই ভিতরে ভিতরে ম্রিয়মান, তবু আজকের এই সামান্য ক্ষণটুকুই বা সেই বিষাদের বাষ্পে স্যাঁতসেতে করে ফেলবে কেন? সুদীর্ঘ তিরিশটি দিন যেমন কেটেছে আলো-ঝলমল শরৎ সকালের মতো, তেমনি কাটুক শেষের দিনটি। অক্ষয় হয়ে থাকুক এই আনন্দের স্মৃতি তিনজনের জীবনেই।

প্রবাসী বন্ধু নিরুপম, আর অতিথি দম্পতি শুভ্রা-সরোজ।

আনন্দ সৃষ্টি করতে পারাও একটা ক্ষমতা বই কী, সে ক্ষমতা সকলের থাকে না।

শুভ্রা খিলখিল করে হেসে ওঠে, বলে—মনের ভাব অপ্রকাশ? মিথ্যে অহঙ্কার করতে হবে না মশাই, যথার্থ মনের ভাব মুখেচোখে উপচে উঠেছিল বুঝলেন?

নিরুপম মৃদু হেসে বলে—সেটা অভিনয়! অতিথি দর্শনে আনন্দের ভান সজ্জনের রীতি।

—হয়েছে, আর রীতিনীতির মহিমা আওড়াতে হবে না। কোনটা অভিনয়, আর কোনটা অভিনয় নয়, সেটা বুঝে ফেলবার দক্ষতা মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ।

—হতভাগা নির্বোধ পুরুষ জাতির যে সে ক্ষমতা একেবারেই নেই তাও নয়—সরোজকান্তি হেসে উঠে বলে—কিন্তু আজকে বোধহয় যবনিকাটা একটু তাড়াতাড়িই টানা উচিত। রাত দুটোয় উঠতে হবে।

নিরুপম একটু অগ্রাহ্যের সুরে বলে—হ্যাঁ, রাত দুটোয় উঠতে হবে না আর কিছু। সাড়ে তিনটের ট্রেন তিনটেয় উঠলেই যথেষ্ট। গাড়ি বলা আছে, কতক্ষণ লাগবে পৌঁছতে?

—আর তোমার বান্ধবী যে বলে রেখেছেন চা না খেয়ে "পাদমেকং ন গচ্ছামি"।

শুভ্রা বলে—তা তো নয়ই। ট্রেনে চড়বার আগে চা একপেয়ালা চাই-ই আমার। যে টাইমই হোক। ...তবু তো শুধু চায়ের আবদারটাই করেছি, "বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য" বলিনি তো গো!

খাবার টেবিল ছেড়ে একতলার খোলা বারান্দায় এসে বসেছে ওরা। উঠেছে ঝোড়ো হাওয়া। ...বাইরের গাছপালাগুলো অন্ধকারে হাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালাচ্ছে। বাতাসের আস্ফালন শব্দের সঙ্গে গাছেদের আর্তনাদ মিশে গেছে। ...থেকে থেকে আছড়ে এসে পড়ছে সে শব্দ। 'উঠি' 'উঠি' করেও ওদের একান্ত প্রিয় এই মনোরম জায়গাটুকুর আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারছে না। তিনবন্ধুর অনেক সুখের স্মৃতি বিজড়িত আছে এখানে।

চেয়ারটাকে বাতাসের উল্টোমুখে ঘুরিয়ে নিয়ে সরোজ বলে—বলো নি ওইটুকুই আমার কপালের জোর! কিন্তু এও বলে রাখি, যাওয়া না যাওয়া তোমাদের হাত। যথাসময়ে ঘুমভাঙা সম্বন্ধে আমার ওপর কোনও ভরসা রেখ না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে, আর আমাকে ঠেঙিয়ে তোলা ছাড়া—

থামিয়ে দিয়ে নিরুপম বলে—ঠিক আছে বন্ধু, ঠিক আছে। নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাওগে। আমার সেই বিখ্যাত টাইমপীসটিকে এ্যালার্ম দিয়ে রেখে এসেছি তোমার ঘরে। সে একবার ডাকতে শুরু করলে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হতে বাধ্য।...বলিনি বুঝি কোনওদিন ওর গল্পটা? এখানে আসছি, দাদা ওটিকে প্রেজেন্ট করে বললেন—"বিদেশে যাচ্ছিস, একা থাকবি, নতুন চাকরি। ঠিক সময়ে উঠতে পারবি কি না, এইটা নে। রোজ রাত্রে অ্যালার্ম দিয়ে রাখবি।'

প্রথম এসে দুদিন কিছু করিনি, কাজে 'জয়েন' করবার আগের রাত্রে রেখেছি এ্যালার্ম দিয়ে। সময় হাতে রেখে ভোর পাঁচটাতেই দিয়েছি।...আরে ভাই, যথাসময়ে নিজস্ব কালোয়াতি গলায় ডাকতে শুরু করলেন উনি। ডিসেম্বরের পাঁচটা, সে একরকম রাতই, রীতিমতো অন্ধকার। হঠাৎ সেই অন্ধকারের বুক চিরে ঘড়ির শব্দ ছাপিয়ে আরও একটা বিকট শব্দ! ঠিক যেন একটা বন্যজন্তুর আর্তনাদ। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম—একটা বন্য জন্তুরই নিবিড় আলিঙ্গন! ...কী কষ্টে যে ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম ঈশ্বর জানেন। আলো জ্বালিয়ে দেখি—নেকড়ে নয়, ভালুক নয়, শ্রীমান বুধন! নাকি সাইরেনের শব্দ শুনে বোমার আতঙ্কে ছুটে এসেছে, আমাকে বুক দিয়ে রক্ষে করতে।

হেসে উঠল তিনজনেই। কেবল সরোজ সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে বলে—আমরা হাসছি বটে, কিন্তু ভাবো তো কতখানি আন্তরিকতা, কতখানি বিশ্বস্ততা, কী সহজভাবে মিশে থাকে ওদের মধ্যে? তখন তো মাত্র তোমার দিনতিনেকের পুরোনো চাকর।

—তা তো বটেই। এই কোয়ার্টার্সের কাজ করত বরাবর। যে ভদ্রলোক আমার আগে এখানে ছিলেন, তাঁর নাকি নিতান্ত সুন্দর একটি "বাচ্চা বেবিলোগ" ছিল, সেটিকে স্মরণ করে বসে বসে চোখের জল ফেলছিল। আমার সঙ্গে 'বেবিলোগে'র কোনও চিহ্ন না দেখে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বললে—'দিল নেহি লাগতা'। বললাম—দেখিস বাবা, পরে বুঝবি আমিও তার চাইতে খুব বেশি মাতব্বর নই। সেই থেকে রয়েই গেল।

—সভ্যসমাজের ভালোবাসা আর অসভ্যদের ভালোবাসার অনেক তফাত নিরু! অনেক উঁচুদরের!

শুভ্রা বিদ্রুপহাস্যে বলে—থামো বাবু, এখন আর তোমার নীতিকথা আওড়াতে বসো না। প্রভুভক্ত কুকুরের নজীর তো চিরদিনই আছে। তাই বলে কে আর সেই উঁচুদরের প্রেমকে নিয়ে অত হৈচৈ করছে? ওদের ভালোবাসা সেই ক্লাসের।

—আমার মতে সেই ক্লাসটাই হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস।

—তোমার মত শুনলে মাঝে মাঝে 'ভিমরি' যেতে ইচ্ছে হয় আমার।...কিন্তু নিরুপমবাবু, আমি বলি কি ঘড়িতে এ্যালার্ম দেবার শ্রম স্বীকার করার চাইতে এ ক'ঘণ্টা সময় এইভাবে গল্প করে কাটিয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি?

নিরুপম কিছু বলবার আগেই সরোজ বলে ওঠে—যথেষ্ট ক্ষতি। তা'হলে কালকে সারাদিন নিরু অফিসে বসে ঢুলবে, আর আমি ট্রেনে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যথাসময়ে গাড়ি চেঞ্জ করতে ভুলব। ঘুম বন্ধ করে—

শুভ্রা উচ্ছল কণ্ঠে বলে—তোমার আর কি চিন্তা, শুধু ওই ঘুমের তালেই আছ। বেশ যাও না তুমি, নিশ্চিন্ত সুখে ঘুমোওগে। আমরাও পরমানন্দে আড্ডা দিই বসে।...কি বলেন নিরুপমবাবু?

প্রশ্ন শুনে নিরুপম যতটা না অস্বস্তি বোধ করে, বিস্মিত হয় তার চাইতে বেশি। এ আবার কী বেপরোয়া প্রস্তাব শুভ্রার? ঠিক এতটা উচ্ছলিত ভাব ওর ব্যবহারে দেখেছে কি কোনওদিন? তিনটি প্রাণীতে রাত্রির আহারপর্ব চুকিয়ে আড্ডা দিয়েছে বটে অনেকদিন। তাস খেলেছে, তর্ক করেছে, এমনকি গানও গেয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু সেটা তিনটি প্রাণীতে। ...বন্ধুকে বাদ দিয়ে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে রসালাপ? তাও এই নির্জন রাত্রে? রাত্রির গভীরতার দিকে তাকিয়ে বুকটা যেন থর থর করে ওঠে নিরুপমের। এত স্পর্ধা কীসের শুভ্রার?...স্বামীর নিশ্চিন্ততার? না নিজের বিশ্বস্ততার?

কিন্তু সরোজ নিজস্ব পরিহাসের হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় সব সঙ্কোচ। মৃদু হেসে বলে—তোমাদের আড্ডাটা পরমানন্দের হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ঘুমটা কি ঠিক নিশ্চিন্ত সুখের হবে? তোমার কি মনে হয় নিরুপম?

নিরুপমের হয়ে শুভ্রাই উত্তর দেয়—হিংসুটেদের নিশ্চিন্ত ঘুম কোনওদিন হয় না। কিন্তু যাই বলো তুমি, কাঁচাঘুমে উঠে সিল্কের শাড়ি জড়াতে বসার চেয়ে বসে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া অনেক আরামের।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সরোজ।

নিতান্ত সহজভাবে বলে—ও, তাহলে সত্যিই এখন জাগতে চাও তুমি? আমি ভাবছিলাম ঠাট্টা করছ। আচ্ছা, তাহলে বোসো তোমরা। গুড্‌নাইট নিরুপম!

ক্ষণকাল ওর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে থেকেই নিজেকে সামলে নিয়ে নিরুপম ত্রস্তভাবে বলে—দিলেন তো ক্ষেপিয়ে? কি হল আপনার আজ? অমন বেপরোয়া ঠাট্টা করতে শুরু করলেন কেন? যান এখন মান ভাঙান গিয়ে।

সরোজের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুভ্রা একটু পাংশু হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু নিরুপমের এই সাবধান বাণীতে উল্টো উৎপত্তি হল। আরও বেপরোয়া জেদের ভঙ্গিতে বললে—ইস্, মান ভাঙাতে দায় পড়েছে আমার। ঘুমোক না ও পড়ে পড়ে। ...আমাদের কালকের সেই কমিউনিজ্‌মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে মূলতুবি তর্কটা শেষ করা যাক আজ।

নিরুপম নিঃশব্দে চোখ তুলে ওর বিদ্যুতালোকে উদ্‌ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। ...কোনও 'ইজমের'ই মূলতত্ত্ব বুঝতে উদ্‌গ্রীব মুখ সে নয়। কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত আস্তর ভাব। কোথায় যেন রয়েছে হঠাৎ জ্বলে-ওঠা আগুনের আশঙ্কা!

এই দীর্ঘ সাহচর্যের মাঝখানে, বহু চকিত মুহূর্তে এ মুখে এমনি একটা অপরিচিত দীপ্তি ঝলসে উঠতে দেখেছে সে, কিন্তু আজকের মতো এত প্রখর, এত স্পষ্ট কি? এর দায়িত্ব নেওয়া কি সহজ?

বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ বস্তুকে চোখ বুজে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কি করতে পারা যায়? তাই নিরুপম জোর করে হেসে বলে—শেষ বেলাটুকু আর তর্কের কচকচিতে নীরস করে তুলে লাভ কি?

আর বলেই বুঝতে পারে অসাবধানে কী সর্বনেশে কথা বলে বসেছে সে!...

কথা শেষের সঙ্গেই নিরুপমের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি অসাড় করে দিল একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ! স্পর্শ আর স্বর।

যে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছিল শুভ্রার সুর্মাটানা চোখের তারায়, সেটা কি নেমে এসেছে ওর আঙুলের ক'টি ডগায়? নয় তো শুভ্রার হাতখানা যদি এসেই পড়ে থাকে নিরুপমের হাতের ওপর, এমন আত্মবিস্মৃত হচ্ছে কেন সে? ও কি বুঝতে চেষ্টা করছে—এ স্পর্শ কার? এ স্বর শুভ্রার কি না? ও কি বুঝতে পারছে না, একবার উচ্চারিত কথা সহস্রবার উচ্চারিত হচ্ছে কেন! অবিরত কে বলে চলেছে নিরুপমের কানের কাছে—"সময়কে সরস করে তোলবার ক্ষমতা তোমার আছে?" "সময়কে— ?..."সময়কে— ?"

বাতাসে উড়ছে শুভ্রার হাতের শিল্পচাতুর্যে সমৃদ্ধ টেবিলক্লথের কোণ, উড়ছে পিছনের ঘরের দরজা জানলার পর্দাগুলো...উড়ছে শুভ্রার দুই রগের পাশের ঝুরো চুলের গোছা।

কাঁপছে নিরুপমের আঙুলের ডগা, আশঙ্কিত হৃৎপিণ্ড।

কাঁপছে শুভ্রার পাতলা ঠোঁট, ঘন আঁখিপল্লব।

শুধু নীরব প্রহরীর মহিমায় নিষ্কম্প শিখায় জ্বলছে পঁচাত্তর পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্‌বটা। ...কিন্তু—

নিষ্কম্প দৃষ্টিতে পাহারা দিচ্ছে কি শুধু ওই বাল্‌বটাই? আর কোনো দৃষ্টি নয়?

দূরে শহরের বিখ্যাত ঘড়িঘরে একটা একটা করে বাজল বারোটা ঘণ্টা! —হাত সরিয়ে নিয়ে নিরুপম স্নিগ্ধস্বরে বললে—শুতে যাও শুভ্রা, সরোজ বেচারাকে মিথ্যে উৎকণ্ঠিত করে লাভ কি?

—উৎকণ্ঠিত হবার জন্যে জেগে বসে থাকবার ক্ষমতা থাকলে তো! শুভ্রা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—বিছানায় পড়তে না পড়তে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোয়।

নিরুপম মৃদু হেসে বলে—আজ ঘুমোয় নি। যাও।

—যদি না যাই?

—নিতান্তই যদি না যাও, বসেই কাটাতে হবে রাতটা। উপায় কি?

ক্রমশ নিজেকে ফিরে পাচ্ছে নিরুপম।

—শুধু এইটুকুই? শুধু উপায়হীনতা? আর কিছু নয়?

সর্বনাশের ছায়া শুভ্রার সুর্মাটানা কালো চোখে। সর্বনাশের ইশারা ওর চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে।

কিন্তু নিরুপম আর ভয় পাচ্ছে না ওতে। আরও সহজ পরিহাসের সুর নকল করে বলে—'আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়। ...বহে যাহা মর্ম্মমাঝে—' কিন্তু দুপুর রাতে এখন রবীন্দ্রকাব্য আওড়াতে বসলে কাব্যবোধহীন বুধন হতভাগাটার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠবে। ঘুম বলে মরে যায় হতভাগা, ঘুমোতে পাচ্ছে না!

সচকিত হয়ে ওঠে শুভ্রা। স্থান কাল পাত্রের জ্ঞান ফিরে পায় বুঝি বা। বিস্ময় উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করে—বুধন? কেন তার আবার ঘুমোতে কী হল? কোথায় আছে সে?

চোখের ইশারায় সামনের অন্ধকার মাঠের একটা জায়গার দিকে শুভ্রাকে অবহিত করে দিয়ে নিরুপম বলে—ওই নীচে, গাছতলায় বসে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে।

আরও উদ্বিগ্ন শোনায় শুভ্রার গলা—কেন! রাতদুপুরে ঝড়ের মুখে ওরকম মাঠের মাঝখানে বসে আছে কেন ও?

—খুব সম্ভব আমাদের পাহারা দিতে ওই জায়গাটাই ও দৃষ্টিক্ষেপণের পক্ষে সুবিধে বলে মনে করেছে।

—জানতে তুমি?

—আন্দাজ করছিলাম, দেখতে পেলাম। ভয়ঙ্কর ভীতু লোকটা, ঘড়ির এ্যালার্মকে বোমার সাইরেন বলে ভুল করে বুক দিয়ে রক্ষা করতে ছুটে আসে!

অপমানের কালো মুখে ঠিকরে উঠে দাঁড়ায় শুভ্রা, চলে যেতে যেতে বলে—ওঃ। সেই রক্ষাকবচের ভরসাতেই বুঝি এতক্ষণ তুমি এত নিশ্চিন্ত ছিলে?

চলে যাওয়ার অধৈর্য ব্যস্ততায় বেতের চেয়ারটা গেল উল্টে পড়ে।

মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে আস্তে আস্তে চেয়ারটা তুলে সোজা করে দিয়ে পিছনের পর্দা ঠেলে নিজের ঘরে ঢুকে যায় নিরুপম!

কে জানে শুয়ে পড়ল না বসেই থাকল। ঘর অন্ধকার, বোঝার উপায় নেই।

কিন্তু যতরকম নাটকীয় ঘটনার একত্র সমাবেশ কি এই রাত্রিটুকুর জন্যেই তোলা ছিল?

আবার যে শুভ্রা এরকম উন্মত্ত অধীরতায় নিরুপমের ঘরে এসে আছড়ে পড়বে তা কে ভেবেছিল? রক্ষে এই এসেই আলোটা জ্বেলে দিয়েছে।

—নিরুপম! জব্দ করে দাও ওকে, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট করে দাও ওর। পালিয়ে চলো আমাকে নিয়ে। একলা ফিরে যাক ও।

বিছানার একাংশে বসেছে শুভ্রা, জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে নিরুপম।

—কী পাগলামি করছ শুভ্রা? হলো কি?

—ঘরে খিল আটকে রেখেছে ও। নিশ্চয় জানি জেগে আছে, তবু খুলল না। বারবার ধাক্কা দিলাম, তবু থাকল চুপ করে!

—কিন্তু জেগে আছে কে বললে তোমায়? তুমিই তো বলো ওর অজ্ঞান ঘুম! চলো দেখি—

—না না কখনও যেতে পাবে না তুমি। ঘুমোয় নি ও আমি জানি। ঘুমোলে খিল লাগাত না। ইচ্ছে করে, শুধু আমায় অপমান করবার জন্যেই .... আমি এত রাত অবধি বাইরে থাকলাম, তাই ও...ওর কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে যাও নিরুপম।

কান্নায় ভেঙে পড়ে শুভ্রা।

নিরুপম যেন ভাবতে পারছে না ঘটনাটা কী ঘটে যাচ্ছে।

কোনও নাটকের অভিনয় দেখছে না তো? এ রকম অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটে সত্যিকার জীবনে? নিরুপায় নিশ্চেষ্টতায় শুভ্রার কান্নাটাই দেখতে থাকে সে।

* * *

কিন্তু সাধে বলছিলাম—'একত্র সমাবেশ!'

অকস্মাৎ সমস্ত বাড়িটাই শুধু নয়, বোধকরি শহরটাই কেঁপে ওঠে দরজা ঠেলার প্রচণ্ড শব্দে। ধাক্কার পর ধাক্কা, নিবৃত্ত হতে চায় না। গভীর রাত্রের শব্দ কী ভয়ানক!

এ আবার কী!

এ শুনে বাড়ির সব ক'টা লোক এক জায়গায় জড়ো না হয়ে করবে কী? এ হেন আকস্মিকতায়, যে বিষ খেয়ে মরতে বসেছে সেও বিষের পাত্রটা হাত থেকে নামিয়ে একবার অকুস্থলে উঁকি না দিয়ে পারে না—যে গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছে সেও বোধ করি দড়িগাছটা হাতে করে রঙ্গস্থলে এসে হাজির হয়।

আর—এর পরও ঘুমের ভান টিকিয়ে রাখবে এমন পাগলই বা কে আছে?

অথচ—

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। 'বহু মাইজীর' মৃদু করাঘাতে 'বন্ধুবাবুর' ঘুম ছুটল না দেখে, হতভাগা বুধন কোথা থেকে এসে ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।...

এবার শুভ্রার সরোজের ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়বার পালা।

কেন সরোজ খামোকা এমন অপদস্থ করল শুভ্রাকে? চাকরবাকর আড়ালে হাসবে, এ কি বিশ্রী বিদ্‌ঘুটে ঠাট্টা? কি না কি ভাবল ওরা কে জানে! দরজা ঠেলে ঠেলে ফিরে যেতে হল শুভ্রাকে! এর চাইতে অপমান আর কি আছে জগতে? অন্য মেয়ে হলে, অকারণ এমন অপমানে, রাগে অভিমানে গলায় দড়ি দেয়।

শেষ কথাটারই শুধু উত্তর দেয় সরোজ—তুমিও দিলে না কী বলে, তাই ভেবেই তো অবাক হয়ে যাচ্ছি।

অথচ—

এ অপমানও হজম করতে হয় শুভ্রাকে।

সত্যি তো আর এখন দড়ি খুঁজে বেড়াবে না সে? তবে একমিনিটও আর তিষ্ঠোবে না এ বাড়িতে, স্টেশনে বসে থাকবে বরং দু' ঘণ্টা, এদের সামনে মুখ দেখাবে না আর। সরোজ না যায় নিজেই চলে যাবে সে। ছি, ছি, বুধনটা পর্যন্ত কি না বুঝতে পারল?

সেই থেকে মৌনব্রতই নিয়েছিল নিরুপম। এই দণ্ডে চলে যাওয়ার প্রস্তাবে একবার শুধু আড়াল খুঁজে বলে—যেতেই তো হত? কিছুক্ষণের জন্যে এভাবে 'শো' করে চলে যাওয়ার কোনও অর্থ হয় না শুভ্রা।

চাপা তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দেয় শুভ্রা—আর বেশিক্ষণ থাকলে তোমার পোষা কুকুরটাকে লেলিয়ে দিতে কি না, তারই বা নিশ্চয়তা কি!

বলবে না তো কি? প্রত্যাখ্যাত নারীহৃদয়ের মতো এমন ভয়ঙ্কর হিংস্র আর কি আছে জগতে?

যাবার সময় সরোজের কাঁধে একটা হাত রেখে নিরুপম ক্ষুব্ধ হাসির সঙ্গে বলে—যাও এখন দু'ঘণ্টা স্টেশনে বসে থাকো গে! বোকার মতো দরজায় খিল লাগাতে গেলে কেন?

কাঁধের ওপর রাখা বন্ধুর হাতখানার ওপর নিজের অপর হাতটা রেখে একটা মৃদু গভীর চাপ দিয়ে সরোজ হেসেই উত্তর করল—তাই ভাবছি। নেহাৎ বোকামিই হয়ে গেছে। দরজার খিল কতকাল আটকে রাখা যায় বলো? খিল আটকে 'জেগে বসে থাকব' ভাবার মতো হাস্যকর বোকামি আর কি আছে।

ভাবশূন্য নীরেট মুখে ওদের প্রত্যেকটি মালপত্র সযত্নে গাড়িতে তুলে দিয়ে ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত দেখে ফিরে এসেছে বুধন। হয়তো এতক্ষণে শুতেই গেল নিশ্চিন্ত হয়ে।

বারান্দায় তেমনি পাতা রয়েছে বেতের টেবিল চেয়ারগুলো। তেমনি বাতাসে উড়ছে টেবিলক্লথের ফুলকাটা কোণ, উড়ছে জানলা দরজার পর্দা।

সারারাত ধরেই ঝড় বইছে আজ।

ভোর হয়ে আসছে, তবু আলোটা নিভিয়ে দেবার কথা মনে পড়েনি, মনিব চাকর কারুর। অনর্থক জ্বলেই যাচ্ছে সমান তেজে।

বিছানায় পড়ে পড়ে কী ভাবছে নিরুপম কে জানে।

বিকেল পাঁচটায় যাবার কথা ছিল ওদের, নিরুপমই আটকেছিল।

আটকেছিল শেষ রাত্রের ট্রেনখানার অজস্র গুণকীর্তন করে করে। কিন্তু কোন্ সাহসেই বা করেছিল? অসংখ্যবার পায়নি কি বিপদের সঙ্কেত?

আচ্ছা সরোজই কি পায়নি?

ঘড়ির এ্যালার্মকে বোমার সঙ্কেত ভেবে আতঙ্কিত হওয়াটা যেমন হাস্যকর, তেমনি হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা নয় কি সত্যিকার 'সাইরেন' শুনেও অসতর্ক থাকা? অন্ধ আত্মবিশ্বাস, অর্থহীন উদারতা আর মূঢ় অসতর্কতায় প্রভেদ কতটুকু?

আগের ট্রেনখানা ধরলে হয়তো বন্ধু আর বন্ধু-পত্নীকে সসম্মান স্নেহে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবার সময়ে নিরুপম জানিয়ে রাখতে পারত পরবর্তী ছুটির জন্য সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ।

ট্রেনের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে শুভ্রা সরোজ দিত সহাস্য প্রতিশ্রুতি।

কে খোঁজ করতে যেত কোন নির্জনতায় চিরদিনের জন্য জেগে রইল এক অন্তহীন নিরুত্তর প্রশ্ন।

কে জানে চলন্ত ট্রেনের জানলায় মুখ রেখে আসন্ন ভোরের আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সরোজও ওই একই কথা ভাবছে কি না। কোনটা শ্রেয়—অন্তহীন নিরুত্তর প্রশ্ন না সন্দেহহীন নির্মম উত্তর?

[১৩৫৭]

আত্মসর্বস্ব

মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন বসু দম্পতি।
ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তার কুমারী-জীবনের স্নিগ্ধ পরিবেশে। সেই তার ছোট্ট ঘরখানি, সেই তার একটি দেয়াল ঘেঁষে সরু একহারা খাট আর ধবধবে বিছানা, সেই ও-দেয়ালে আলনা আর বইয়ের র‍্যাক, এ-দেয়ালে নিচু টেবিল আর ছোট্ট চেয়ারখানা, বরাবর যাতে বসে পড়ে এসেছে শর্বরী।

আর বেশি কিছু ধরে না এ ঘরে, তবু ভারি সুন্দর লাগে।

ছিম্‌ছাম পরিষ্কার পবিত্র!

মেয়ের বিয়ের পর ঘরের চেহারাটা পাল্টে ফেলেছিলেন সুজাতা, সংসারের অবান্তর জিনিসগুলো ভরে ফেলেছিলেন এ ঘরে! শ্বশুরবাড়ি থেকে যা দু-চার বার এসেছে শর্বরী, শুয়েছে মার কাছেই। অস্থায়ী সেই আসায় স্থায়ী জায়গা পাবার প্রশ্ন ওঠেও নি।

কিন্তু এবারে তো দু-চার দিনের জন্য বেড়াতে আসা নয়, চিরদিনের মতো ফিরে আসা! আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠার বেদী রচনা না করে রাখলে, ও বুঝবে কী করে যে, বরাবরের মতো এসে আশ্রয় নিতে হলেও সমাদরের ত্রুটি থাকবে না তার।

কী করে টের পাবে স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ের আকুলতার পরিচয়?

মা বাপ দুজনে গিয়ে নিয়ে এসেছেন। গাড়ি থেকে নেমে একেবারে সোজা এখানে তুললেন। বললেন—এই তোমার ঘর, আবার এ ঘর ফিরে পেলে তুমি। মনে কর যেমন ছিলে তেমনিই আছ। মাঝখানের কটা দিন কিছু নয়, স্বপ্ন, ছায়া।

বলতে বলতে স্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল অনাদিপ্রসাদের।

শর্বরী কথা বলছে না, কাঁদছেও না, শুধু বসে আছে মুখ নিচু করে। কেশের ঘন অরণ্যের মাঝখানে পায়ে-চলা-পথের মতো যে সরু রেখাটি শুভ্রতায় প্রখর হয়ে উঠেছে, উজ্জ্বল বিদ্যুত-আলোকে আরও প্রখর দেখাচ্ছে সেটা! মুখ নিচু করায় রেখাটা বড়ো বেশি করে চোখে পড়ছে। সেই দিকে তাকিয়ে সুজাতা সহসা হাহাকার করে উঠলেন—আবার তোর বিয়ে দেব আমি। এ বেশ আমি দেখতে পারব না!

শর্বরী সামান্যতম নড়ে চড়ে বসল। প্রকৃত পক্ষে বেশভূষার খুব-কিছু পরিবর্তন ঘটে নি। কুমারী মেয়ের মতোই দেখাচ্ছে তাকে। তবু অবুঝ মাতৃহৃদয়!

অনাদি প্রসাদের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন সুজাতা—হিন্দুর মেয়ে হয়ে একথা মুখে আনছি বলে রাগ কোরো না গো! ও তো আমার যেমন আইবুড়ো মেয়ে ছিল, তেমনি আইবুড়োটিই আছে।

—রাগ! অনাদিপ্রসাদ একটু বিষাদের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন—যাক এখন ওকে শুতে দাও। কি একটু খাবে-টাবে—

এইবার কথা বলল শর্বরী, শান্তভাবে বলল—খিদে কিছু পায় নি বাবা!

—তা হোক! সামান্য কিছু যা হোক খেতে হবে বই কী। বলে দাঁড়িয়ে উঠলেন অনাদিপ্রসাদ। ট্রেনের গরমে এসেছেন, স্নান করতে ইচ্ছে করছে।

সুজাতা মেয়ের হাত ধরে দৃঢ়স্বরে বললেন—খিদে নেই বলে পাশ কাটালে চলবে না, চল খাবি যা পারিস। আমাদের সঙ্গে বসে খেতে হবে।

আমাদের সঙ্গে বসে খেতে হবে!

এ কীসের ইঙ্গিত? সকলের সঙ্গে বসে খাবার অনুরোধের মধ্যে সুজাতার কাতর মাতৃহৃদয়ের আর একটু অবুঝপনা প্রকাশ হল কি?

মুহূর্তের জন্য কেঁপে ওঠে শর্বরী! তারপর শান্তভাবে বলে—আজ থাক মা!

—আচ্ছা! আজ যদি নিতান্ত না পারিস, থাক। কাল থেকে কিন্তু তোর কোনও ওজর আপত্তি শুনব না আমি, তা—বলে রাখছি! এখন রেলের কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেল। একটু চা কি জল খা।

শর্বরী অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে—এমনিই শুয়ে পড়ি না মা! আজ আর কিছুই ইচ্ছে করছে না, বড্ড মাথা ধরেছে।

একটু চাও খাবি না?

—এত রাতে?

রাত আর কি, নটাই তো বেজেছে মোটে। আমিও তো ভাবছি—আগেই একটু চা—দেখি, উনি কী করেন। সতীশটা এই দুদিনে যে কী করে রেখেছে সে-ই জানে।

ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠে পড়েন সুজাতা। কাল ভোর থেকে সংসারে অনুপস্থিত রয়েছেন, ইতিমধ্যে কী কী অঘটন ঘটেছে কে জানে।

শর্বরী বিছানায় শুয়ে পড়ে বলে—আচ্ছা একটু চা দিও। —আলোটা নিভিয়ে দেবে মা?

সুজাতা দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, আলো নিভোলে ঘুমিয়ে পড়বি না তো? চা আনছি।

—তুমি আনবে? তুমি আবার আনবে কেন? সতীশ নেই?

—আছে। তা হোক আজ আমিই হাতে করে—

শেষ কথাটা কান্নায় বুজে যায়, আলো নিভিয়ে ধীরে ধীরে চলে যান সুজাতা।

অন্ধকার ঘরে একা চুপচাপ পড়ে থাকে শর্বরী।

ঘুম? না, ঘুমিয়ে পড়বার মতো চোখ এখন নেই। শুকনো খট্‌খটে পরিষ্কার। একটু যেন বেশিই শুকনো। সদ্য বিধবার পক্ষে এত শুকনো চোখ, এত স্থির ভাব একটু আশ্চর্য বই কী! কাঁদুক না কাঁদুক, মাঝে মাঝে দীর্ঘ-নিশ্বাসটাও তো ফেলবে?

একা শুয়েও নিশ্বাস ফেলল না শর্বরী, শুধু একটু যেন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—মা বাপ তার জন্যে এত আকুল হয়ে উঠেছেন, এত ব্যস্ত হচ্ছেন তার একটু স্বস্তির জন্য, কিন্তু সে স্নেহ-স্পর্শ শর্বরীর মন পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না কেন? ও যেন শার্সি-বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে ওগুলো শুধু দেখতে পাচ্ছে।

তবে কি খুব শোক হয়েছে শর্বরীর? তাই এমন হচ্ছে?

শোক!

খুব তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে শর্বরী।

শোক কাকে বলে? প্রিয়জনকে হারিয়ে যে হাহাকার ওঠে অন্তরের অন্তস্তলে, তার নামই না শোক? কিন্তু কই? সে হাহাকার কোথায় শর্বরীর?

শুধু খানিকটা অস্বস্তি!

শুধু সাদা দেওয়ালের মতো খানিকটা ফাঁকা ফাঁকা শূন্যতা।

প্রিয়জন?

কে সে?

কদিন আগে যার মৃত্যু-সংবাদ এসেছিল? শর্বরীর সঙ্গে তার হৃদয়ের যোগ ঘটল কবে? বরং যে কদিন সেই লোকটাকে উপলক্ষ করে শর্বরীকে নিয়ে শোকের সমারোহ চলছিল—রীতিমতো বিরক্তিই বোধ করছিল শর্বরী। বাপ মা গিয়ে পড়ে সে বিরক্তি থেকে উদ্ধার করেছেন। হ্যাঁ, এর জন্যে মা বাপের ওপর কৃতজ্ঞ সে।

শর্বরীর ভাগ্যে ঘটেছিল এক পৌরাণিক যুগের কাহিনী। মুক্তিকামী পুত্র পালিয়ে গিয়েছিল সংসার ছেড়ে, মা বাপ গিয়ে কেঁদে কেটে মঠ থেকে ফিরিয়ে আনলেন ছেলেকে, এবং একটি বন্ধন-রজ্জু সংগ্রহ করে বাঁধতে চাইলেন তাকে।

কিন্তু সে চেষ্টা হল সমুদ্রে বালির বাঁধ!

ফুলশয্যায় হাতের সুতো খোলার মতোই বৈরাগী কুমার অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল সেই বন্ধন-রজ্জু, ফুলশয্যারই রাতে।

ব্যাপারটা অতীব শোচনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু একেবারে পচা পুরনো প্লট।

তবু বিয়ের পর এই দেড়টা বছর শ্বশুরবাড়িতেই ছিল শর্বরী। ছেলেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে চেষ্টার কসুর করেন নি তাঁরা। কিন্তু শর্বরীর ভাগ্যে নেই। পালিয়ে-যাওয়া-লোকটা, এমন জায়গায় পালাল যে ধরে আনবার আশাটুকুও গেল।

মঠের কর্মাধ্যক্ষের হাতে লেখা দু লাইনের একখানি পোস্টকার্ড!

সেই দু লাইনের মধ্যেই লেখা হয়ে গেছে শর্বরীর ভবিষ্যৎ জীবনের ভাগ্যলিপি।

অন্ধকারে বাইরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় বলেই কি, ভিতরের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে?

নিজেকে সম্পূর্ণ তফাত রেখে সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে ভাবতে চেষ্টা করে শর্বরী। ভাগ্যলিপি কি শিলালিপির মতোই খোদাই করা? পুরনো লেখা মুছে ফেলে আর একবার নতুন করে লেখা যায় না? যে লেখা লেখবার জন্যে সুজাতা কলম ধরতে চাইছেন!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজেকে সচেতন করে তোলে শর্বরী।

নাঃ, ভেঙে পড়লে চলবে না, নিজেকে অপরের করুণার পাত্রী হতে দিতে রাজি নয় সে!

খুট্ করে একটু শব্দ, পরক্ষণে আলোর জোয়ার।

—চা টুকু খেয়ে ফেল মা! সুইচটা নামিয়ে দিয়ে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ জানাচ্ছেন সুজাতা।

শর্বরী উঠে বসে সহজ গলায় বলে—দাও! আর শোন, কি আছে তোমার? হঠাৎ দেখছি বেশ খিদে পেয়ে গেছে।

ও-ঘরে গিয়ে সুজাতা নিচু গলায় বলেন—যতটা মুষড়ে পড়েছে ভেবেছিলাম, তেমন মনে হচ্ছে না। সামলে নিয়েছে!

অনাদিপ্রসাদ বোধ করি উত্তরের অভাবেই চুপ করে থাকেন।

সুজাতা জেদের সুরে বলেন—এখন তো সব রকম আইনই হয়েছে, তবে কেন আমরা ওর আবার বিয়ে দেব না, বল তো তুমি?

—বিধবা বিয়ের আইন আজকে হয়নি সুজাতা, ও-আইনের বয়েস অনেক।

—ওকে বিধবা বোলো না গো! সুজাতা কেঁদে ফেলেন—ভাবলে প্রাণটা ফেটে যায়! একদিনের জন্যেও জানল না স্বামী কি বস্তু।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন সুজাতা। আর ব্যস্ত অনাদিপ্রসাদ তাঁর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন?

দুজনের একই শোক।

পরস্পরের সান্নিধ্যই সান্ত্বনা।

কিন্তু মেয়ে মা-বাপকে তাজ্জব বানিয়ে দিচ্ছে।

ঠিক এ রকমটা আশা করেননি তাঁরা!

সুজাতা চোখের জলে ভেসে মেয়েকে অনুরোধ করতে গেলেন তাঁদের সঙ্গে 'একসঙ্গে' খেতে, অর্থাৎ একই খাদ্য গ্রহণ করতে, যদিও মনে নিশ্চিত ছিলেন খাবে না সে। খাবে না বটে তবে শোকাবহ একটি করুণ দৃশ্যের অবতারণা অবশ্যই হবে। কিন্তু শর্বরী কি না মায়ের প্রস্তাবের উত্তরে দিব্যি কর-কর করে হেসে উঠে বলল—রক্ষে কর মা, আবার ওসব ঝামেলা কেন? বিধাতা দয়া করে যখন নিষ্কণ্টক করে দিয়েছেন তখন আর তোমার ওই ইলিশ মাছের কাঁটার ফেরে পড়তে চাই না। কষে ঘি-দুধ খাওয়াও না, খেদ মিটে যাবে।

পরার বেলাতেও দেখা যায় শুধু সাদা শাড়িগুলোই পরে। না কুলোলে অম্লান বদনে বাবার ধুতিগুলো টেনে জড়ায়।

হাতে অনেকগুলো চুড়ি বালা নাকি ওর ভয়ানক অসুবিধাকর, কানের গহনা নাকি ভীষণ ফোটে। আর গলার হার? সে তো গলায় ঠেকলেই ঘামাচি অনিবার্য। হেসে হেসে গা পাতলা করে এই সব বলবে শর্বরী। তবে কোন্ অবকাশে কাঁদবেন সুজাতা?

অথচ এত বড় একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও কাঁদতে না পেয়ে হার্টের অসুখ ধরে যাচ্ছে তাঁর। সান্ত্বনা দিতে বাড়িতে যারা আসে তাদের কাছেও সেই কথাই বলেন সুজাতা—কাঁদতে না পেয়ে পেয়ে বুকের ব্যামো জন্মে গেল ভাই। ভয়ে কাঠ হয়ে আছি, ও-হতভাগীও হঠাৎ একটা শক্ত রোগ না বাধিয়ে বসে। এত চেপে চেপে থাকলে—

আগন্তুক আগন্তুকা হয় তো সসঙ্কোচে বলেন—অবিশ্যি ভাব-ভালোবাসা তো জন্মায়নি তার সঙ্গে, মনে ততটা—

সুজাতা ক্ষোভের হাসি হেসে বলেছেন—সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু ওর জীবনটা যে ছারখারে গেল, তা কি বুঝছে না ও? নিজের ভবিষ্যৎ যে শূন্য হয়ে গেল তা কি ভাবছে না তলে তলে? খুব চাপা মেয়ে তাই!

বলাবাহুল্য অপর ব্যক্তি সঙ্কোচে নত-বদন হন।

একটু বিশেষ অন্তরঙ্গ কেউ এলে চুপি চুপি তার কাছে গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করেন সুজাতা। বলেন—ওর এই যোগিনীমূর্তি আমি আর দেখতে পারছি না ভাই। আবার যদি আমি ওকে সংসারী করতে চাই তোমরা কি আমায় সমাজে ঠেলবে?

'ঠেলব' একথা অবশ্য বলে না কেউ। অতঃপর তাদের কাছেই আবেদন জানান সুজাতা একটি হৃদয়বান উদারচিত্ত পাত্রের সন্ধান দিতে।

হিতৈষী আত্মীয়েরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার, অথবা 'পাত্র-পাত্রী'র কলম খুলে দেখবার পরামর্শ দেন।

শেষেরটা হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু অনাদিপ্রসাদের অজ্ঞতার ফলে প্রথমটা আর হয়ে ওঠে না। তিনি জানেন না খবরের কাগজের অফিস কোনমুখো, আর তার কোন দরজা দিয়ে ঢুকতে হয় বিজ্ঞাপন দিতে।

আর দরকারটাও যেন ফিকে মেরে আসছে ক্রমশ। শর্বরীর জীবনের শূন্যতাটা ধরাই পড়ে না। হেসেই আছে মেয়ে।

এদিকে আবার মেয়ের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় কেঁদে কেঁদে আর কাঁদতে না পেয়ে পেয়ে সুজাতার হার্টে যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রকোপ বেড়েই চলে। কাজেই শর্বরীর শূন্য দিন-রাত্রির অনেকখানিটা পূর্ণ হয় মাতৃসেবায়।

দিন কাটতে থাকে।

আছে মায়ের সেবা, আছে সংসারের কাজ, চাকর পালায়, ঝি ছাড়ে। সেই অদৃশ্য শূন্যস্থানগুলো, এক অমোঘ অলিখিত আইনের বলে ক্রমশ পূর্ণ হয়ে যায় শর্বরীকে দিয়ে।

মাঝে মাঝে মেয়ের কৃশ মুখের পানে চেয়ে পুরনো শোক উথলে ওঠে সুজাতার। মেয়ের হাত ধরে বলেন—তুই আমার যে সেবা করছিস মা, আমি আশীর্বাদ করছি তোর ভালো হবে।

পাত্রের খোঁজ আর করেন না, বরং কেউ সে ইশারা দিলে নিশ্বাস ফেলে বলেন—আমার কপাল, আর ওর কপাল। যখন ব্যস্ত হলাম, তখন জুটল না, এখন আর সে খোঁজে লাভ? এখন ওকে নইলে আমার যে এক দণ্ড চলে না!

তা সত্যিই চলে না।

মা-বাপ চক্ষেহারা হন। তাঁদের অবিরত জপমন্ত্র 'শবু শবু শবু'! 'শবু কোথায় গেল?' 'শবু কী করছে?'

ভোরবেলা ছোট ভাই দুটোর মুখ ধোওয়াবে 'শবু', জলখাবার দেবে আর জামা-জুতো পরাবে শবু, বাপের জন্যে ডিমের পোচ আর কফি বানাবে শবু, কুটনো কুটবে ভাঁড়ার বার করবে, আর রান্নার ডিরেকশন দেবে শবু, জলখাবার তৈরি করবে শবু, মায়ের বাক্স, আলমারি, বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় সব কিছু রক্ষা করবে আর সুসজ্জিত রাখবে শবু, এ ছাড়া উদয়াস্ত মায়ের 'হাতে হাতে মুখে মুখে' শবু!

স্ত্রীর স্বাস্থ্যহীনতায় অনাদিপ্রসাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে, ত্রুটি দেখলে রাগ চাপতে পারেন না, তাই প্রায়শই তার বহিপ্রকাশ ঘটে। যখন তখনই সরবে চিৎকার করেন—এটুকুও হয়ে ওঠেনি? সারাদিন কি রাজকার্য হচ্ছে বাড়িতে? চব্বিশ ঘণ্টা নাটক নভেল নিয়ে পড়ে না থেকে, সংসারের এদিক-ওদিক একটু দেখলে ভালো হয়।

বই ফেলে তড়বড় করে উঠে পড়ে শবু।

ভাইরা নালিশ করে—'দিদি খাতায় রুল টেনে দিচ্ছে না', 'দিদি প্যান্টে বোতাম লাগিয়ে দিচ্ছে না—', 'দিদি শুধু শুধু বকছে।'

সুজাতা কপালে করাঘাত করে বলেন—"আমারও যেমন অদৃষ্ট! বয়েস থাকতে অথর্ব হয়ে রইলাম, নইলে সংসারের এই অবস্থা হয়, না তোমাদের এত দুর্গতি হয়? খাচ্ছি দাচ্ছি মোটা হচ্ছি, 'রোগ' বললে লোকে হাসবে, অথচ হাতে পায়ে একবিন্দু বল নেই। ওদের হল মন-মর্জির কাজ, ইচ্ছে হল করল, ইচ্ছে হল না করল না। কী বলব বল?"

'দের'টা অবশ্য গৌরবে বহুবচন।

ছোট্ট সুন্দর ছিমছাম সেই ঘরখানি অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়। জানলা দিয়ে আসে ভোরের রোদ, আসে দুপুরের উদাসী ঝোড়ো হাওয়া, আসে পড়ন্ত বেলার সোনালি আলো।

তারপরও আসে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাস। অন্ধকার ঘরের শূন্য পরিমণ্ডলে সে বাতাস দীর্ঘশ্বাসের মতো সঞ্চরণ করে বেড়ায়!

শর্বরী শুতে আসে প্রায় মধ্য রাত্রির কাছ ঘেঁষে।

তখন বাতাস নিথর হয়ে যায়, সমস্ত দিনের প্রতীক্ষারত ঘরখানা যেন অভিমানে মূক হয়ে বসে থাকে। সাড়া দেয় না, আহ্বান জানায় না। কর্মক্লান্ত শীর্ণ দেহখানি নিয়ে ছোট্ট হয়ে শুয়ে পড়ে শর্বরী। কোনও দিন পড়ে আর ঘুমোয়, কোনও কোনও দিন কী একটা অস্বস্তিকর গন্ধে ঘুম আসতে চায় না। কীসের গন্ধ অনুসন্ধান করতে বসে মনে পড়ে যায় বিছানাটা প্রায় মাসখানেক হল ফর্সা করা হয়নি। ভোরের অন্ধকার থাকতে উঠে যায়, দুপুররাতের অন্ধকারে শুতে আসে, ময়লা হয়েছে চোখেই পড়ে না।

বালিশের ওয়াড়টা টান মেরে ফেলে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকে।

ইতিমধ্যে একদিন সতীশ এসে আবেদন জানাল এক মাসের ছুটি চাই। দেশে যাবে ছেলের বিয়ে দিতে। প্রথমটায় অবশ্য আবেদন করেছিল দিদিমণির কাছেই, কারণ হাতের কাছেই তাকে পাওয়া যায়। দিদিমণি উঠল ঝঙ্কার দিয়ে—এক মাস! একমাস ধরে ছেলের বিয়ে দেবে তুমি? অত আহ্লাদে কাজ নেই!

— একমাস ধরে কি আর বিয়ে দেব দিদিমণি? মেয়ে খুঁজতে হবে তো?

—ও বাবা—শর্বরী চোখ কপালে তুলে বলে—এখনও পাত্রীই খোঁজা হয়নি? তবেই হয়েছে! রেখে দাও ওসব কথা। তোমার ছেলে নিজে বৌ খুঁজে জোগাড় করে রাখুক, তুমি গিয়ে বিয়ে দিও।

সতীশ গম্ভীরভাবে বলল—আমাদের ওখেনে ওসব শহরে চাল চলে না দিদিমণি, মাসখানেক ছুটি আমাকে দিতেই হবে।

—হবে তো রাঁধবে কে? আমি এই এত কাজের মধ্যে সময় পাব কখন?

—কষ্ট-মষ্ট করে চালিয়ে নেবেন।

—হবে না আমার দ্বারা! যাবে তো একেবারেই যাও। মনের সুখে দেশে বসে বৌমার হাতের রান্না খাওগে। আর আসতে হবে না। অন্য লোক রাখা হবে।

অতঃপর সতীশ গিয়ে প্রকৃত মনিব-মনিবানীর কাছে কেঁদে পড়ল—দিদিমণি তাকে জবাব দিয়েছে।

সুজাতা তখন নিজের ঘরে পা ছড়িয়ে বসে পান সাজছিলেন, আর স্বামীর কাছে খেদ করছিলেন ঘরে অত বড় মেয়ে থাকতে দুটো সাজা-পান পাবার পিত্যেশও তাঁর নেই। সেই মুখে এই বার্তা।

—দিদিমণি! অনাদিপ্রসাদ গম্ভীর ভাবে বলেন—দিদিমণি জবাব দেবার মালিক নয় সতীশ!

সতীশ গামছার কোণে চোখ মুছল, কথা কইল না!

সুজাতা বললেন—কেন কী অপরাধ হল হঠাৎ?

সতীশ কিছু রেখে-ঢেকে ইতিহাসটা ব্যক্ত করল, এবং শেষ মন্তব্য করল আপনাদের বড়লোকের বাড়ি তাই, আমাদের দেশে-ঘরে অমন ভারী বয়েসের বেধবা মেয়ে সংসারের জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সমস্ত করে বাবু! এ বয়সে বসে খেলে কি আর রক্ষে আছে?

কথাটা শেষ হতে না হতেই শর্বরী ঢুকল ঘরে, মায়ের দুধের বাটি হাতে। সতীশের কথা শেষ হতেই তীক্ষ্ণ গম্ভীর স্বরে বলল—তোমার জামাকাপড় কি আছে নিয়ে বেরিয়ে যাও সতীশ! বেরিয়ে যাও বলছি—এক মিনিট দেরি নয়। ওঠ!

থতমত সতীশকে থো করে অনাদিপ্রসাদ বলেন—যাও বললেই কী আর যাওয়া হয়?

—হয় বই কী বাবা! সতীশ আর এক মিনিট নয়। শর্বরী বলে।

সুজাতা ভারী মুখে বলেন—তেজ দেখালেই তো হয় না। তোমার তো ওই গতর। লোক এখন জোগাড় করে কে?

শর্বরী আশ্চর্য রকম শান্তভাবে বলে—জোগাড় করতে আর হবে না মা! ও কাজটা আমিই চালিয়ে নেব ভাবছি। সত্যি বসে খেয়ে খেয়ে একসারসাইজের অভাবে স্বাস্থ্যটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সতীশ তুমি ওঠ! তুমি না গেলে আমাকেই যেতে হবে কোথাও।

সতীশ উঠল, শর্বরীও বিদায় হল ঘর থেকে।

সুজাতা স্বামীর মুখের দিকে হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, দেখলে মেয়ের মেজাজ?

—দেখলাম বই কী!

—আমার যেমন অদৃষ্ট তাই মুখ বুজে এই মেজাজ সহ্য করছি। ও যা তেজি মেয়ে, সতীশকে আর ঢুকতে দেবে বলে মনে হয় না।

—না দেয় তো আর কী করা যাবে। সতীশও তো বলেছে মিথ্যে নয়! গেরস্থ ঘরে কে কজন বিধবা মেয়েকে বসিয়ে খাওয়াতে পারে? নিষ্কর্মা হয়ে শুধু নাটক নভেল পড়ে লাভই বা কি? আমিও তো খরচ-পত্রে ডুবতে বসেছি।

অতঃপর ডোবার হাত থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পান অনাদিপ্রসাদ, আর শর্বরীরও ব্যায়ামের ফলে স্বাস্থ্য ভালো হতে থাকে।

সাধে কী আর বলে—ভগবান যা করেন ভালোর জন্যে!

দেহ-যন্ত্রের একটায় কোনও কসুর দেখা দিলে অপর কোনও যন্ত্র না কি বেশি কার্যকরী হয়। কথাটা বোধ করি সত্য। সুজাতার হাতে-পায়ের বল গেছে, কিন্তু অনুমান-শক্তিটা ক্রমশই জোরালো হচ্ছে। দোতলার ঘরে শুয়ে বসে থেকেও তিনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছেন বিকেলের দিকে প্রায়ই নীচের তলায় রান্নাঘরে আর ভাঁড়ার ঘরে নিতান্ত নির্বান্ধব অবস্থায় কাটছে না শর্বরীর। কেবলই যেন হাসি-গল্প-কথার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

ছেলে-দুটোও কি তেমনি পাজি! ঠিক একসঙ্গে দুজনের বেড়াতে যাওয়া চাই। অনাদিপ্রসাদেরও ফিরতে প্রায় রাত্তির। সুজাতাকে যে ডাক্তার ওপর-নীচে করতে বারণ করেছেন—সে কথা কি ভুলেই গেছেন অনাদিপ্রসাদ? ভুলে গেছেন ঘরে বিধবা মেয়ে!

—নীচে কে এসেছিল? জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না, তবু একদিন না করে পারেন না সুজাতা—বিরস স্বরে বলেন—খুব হাসি-গল্পের সাড়া পাচ্ছিলাম? আজ বলে নয়, রোজই পাই।

শর্বরী নিজস্ব সুস্থির গলায় বলে—হ্যাঁ প্রায়ই তো আসে। এসেছিল নন্তুদা।

—নন্তুদা?

—হ্যাঁ গো। ছোট পিসির ভাসুরপো। ভুলে গেলে? আগে তো কত আসত। গল্প ধরলে তো আর রক্ষে নেই!

—আসে তো—এসে নীচে থেকেই আড্ডা দিয়ে চলে যায়? সুজাতার কণ্ঠ হতে যে রস ঝরে, সেটা আর যাই হোক—মধুর সমগোত্র নয়।

শর্বরী মুচকে হেসে বলে—বলি তো! বলে—ওরও নাকি হার্টের অসুখ, নীচে থেকে ওপরে উঠতে ইচ্ছে করে না।

—তা রোজ আসবার দরকারই বা কি? তোমার সঙ্গে এত কীসের কথা?

শর্বরী নিজস্ব ভঙ্গিতে ঝর ঝর করে হেসে ওঠে। শীর্ণ মুখে হাসিটা আর তেমন সুন্দর দেখায় না, তবে হাসির সুরটা এখনও বাজনার মতো বাজে। হেসে হেসে বলে—ওর কথার কি আর মাথামুণ্ডু আছে? চিরকেলে পাগল। বলে, 'তোমারও বর নেই, আমারও এখনও বৌ জুটলো না, জোড়াতালি দিয়ে একটা সংসার গেঁথে ফেললে কেমন হয়?'

সুজাতা হার্টের অসুখ ভুলে দাঁড়িয়ে উঠে বলেন—কী বললি? এই কথা বলেছে ও?

—শুধু আজ কেন, রোজই বলছে তো!

—সেই অপমান হজম করে তুই হেসে হেসে বলছিস সেই কথা?

—অপমান আবার কি! শর্বরী মাকে ধরে আবার খাটে বসিয়ে দিয়ে বলে —উত্তেজিত হচ্ছ কেন শুধু শুধু। অসুখ বাড়বে যে। এতে অপমানের কি আছে? আমার হাতের রান্নার সুগন্ধে নাকি ওর মন অস্থির হয়ে ওঠে। তাই—

—ওঃ! ভেতরে ভেতরে তোমার এই? ওপরে ভিজে বেড়ালের মতো হাত শুধু করে থান পরে বেড়াচ্ছ! লজ্জা করল না। লজ্জা করল না সেই হতচ্ছাড়া বজ্জাতের ইয়ার্কির কথাটা মুখে আনতে! হা ভগবান। এই তোমার মনের ভাব! আর তোমাকে আমি বিশ্বাস করে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছি?

—কী মুশকিল! শর্বরী বসে পড়ে বলে—ও তো আর আমাকে নিয়ে পালাতে চায় নি! ভদ্রলোকের মতো বিয়ের প্রস্তাব করেছে। আমিও ভেবে দেখলাম রাজি হতে দোষ কি? তোমরাও তো খুঁজেছিলে এমনি একটি উদারচিত্ত হৃদয়বান পাত্র! এতদিনে যখন জুটেই যাচ্ছে—

সুজাতা ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলেন—মেয়ে-সন্তান এমনি অকৃতজ্ঞই বটে! আত্মসর্বস্ব, স্বার্থপর!

শর্বরী অমায়িক হাস্যে বলে—সে কথা ঠিক মা! শুধু মেয়ে-সন্তান কেন, মেয়ে-জাতটাই!

আদিম

দুটো বেণী দিয়ে গড়া প্রকাণ্ড খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো, হাতে ভারী ওজনের মোটা মোটা কঙ্কণ, মিহি ক্রেপের শাড়ির জমকালো টিসুর আঁচলাটা অবহেলায় পিঠে ফেলা, পায়ের জুতোয় আর হাতের ভ্যানিটি ব্যাগে শ্রীনিকেতনী শিল্পচাতুর্য্য—অতি আধুনিকার একখণ্ড নিখুঁৎ নমুনা কৃশাঙ্গ কস্তুরী, গাড়ি থেকে নেমে যেন হালকা হাওয়ার মতো ভেসে বাড়িতে উঠে এল।

উঠেই আসতে হয়, রাস্তা থেকে বাড়িটা উঁচু।

প্রদীপ বলে "বাইশতলা দেশ"।

মিথ্যে বলে না। উপরে নীচে এখানে ওখানে পথ আর বাড়ির যেন গোলকধাঁধা।

কস্তুরীকে দেখে প্রদীপের একাধারে গৃহরক্ষক সেবক পালক সব কিছু, পাহাড়ি বালক নানকুটা হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে। তা'র চাকরিদশায় এহেন অপরূপ আবির্ভাব কখনও ঘটেনি।

কস্তুরী ওর স্তম্ভিত ভাবটা উপভোগ করে আরও যেন ঝড় বইয়ে দেয়—ঘরে আবার চাবি লাগান কেন রে? কী মুশকিল! খোল খোল।

বলা বাহুল্য এমন দরাজ হুকুমের পর ইতস্তত করা সম্ভব নয়। নানকু সসম্ভ্রমে দোরটা খুলে দেয়।

ভ্যানিটি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে দিব্য সপ্রতিভভাবে ঘরে ঢুকে পড়ে কস্তুরী।

আর ঢুকেই প্রদীপের টেবিলের কাগজপত্র উল্টে-পাল্টে তচ্নচ্ করতে থাকে। কবি কোথাও কিছু লিখে ছড়িয়ে রেখে গেছে কি না।

ও বাবা! প্যাডের মধ্যে এ যে চিঠি! কস্তুরীকে মনে আছে তা'হলে! আজ মাস দুই আড়াই তো প্রায় চিঠিপত্র বন্ধ। মাঝে মাঝে দু'এক ছত্র যা পাঠায় সে আর চিঠি নয় নেহাৎই দায়সারা কুশলবার্তা।

আরে এ যে রীতিমতো সাহিত্য!...চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে প্যাডটা খুলে ধরে কস্তুরী, তর্ সয়না।

বাস্‌রে, এসব আবার কী লিখছে প্রদীপ!

"—রাত জেগে তোমায় চিঠিটা লিখছি কস্তুরী—রাত্রে আজকাল জেগেই থাকি প্রায়, কিছুতেই কেন জানি না ঘুম আসতে চায় না। তবু এই জেগে থাকা আমার খারাপ লাগে না। মনে হয় রাতে ঘুমিয়ে থেকে ভারি ভুল করি আমরা। ঘুমিয়ে থাকি তাই পৃথিবীর সমস্ত রহস্য আমাদের অজানা থেকে যায়। আমরা যখন সারাদিন স্থূল প্রয়োজনের তাগিদে ছুটোছুটি করে

মরি, তখন ঘৃণায় করুণায় বোবা পৃথিবী নিশ্চল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। রাত্রে যদি ঘুমিয়ে না পড়ে আমার মতো জানলায় এসে বসো কস্তুরী, তা'হলে অনেক কিছু জানতে পারবে। জ্ঞানের পরিধি কত বেড়ে যাবে তোমার। ভারি আশ্চর্য্য লাগবে সুদীর্ঘকাল ধরে রাত্রিটা ঘুমিয়ে নষ্ট করে এসেছ বলে।

তুমি কি জানো কস্তুরী, রাত্রির অন্ধকারে অরণ্যে যে মর্মরধ্বনি ওঠে সে ধ্বনি কীসের? তুমি হয়তো আজও জানো না সেকথা, আমি জানি।.... পাতায় পাতায় বাতাসের লীলামৃগয়ার মুখর চপলতা সে নয়, সে ধ্বনি কোটি কোটি অশরীরী আত্মার বিক্ষুব্ধ আর্তনাদ। প্রতিদিন প্রতিরাত্রে মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্ঠুর নিয়মের নিষ্করুণ আকর্ষণে যেসব হতভাগ্যরা আশা-আকাঙ্ক্ষার ভরাপাত্র নামিয়ে রেখে এই শোভাসম্পদময়ী ধরনি থেকে অসময়ে স্খলিত হয়ে পড়ে যাচ্ছে—অনন্ত শূন্যের ক্ষুধার্ত জঠরে দলে দলে উঠে আসে তারা, অন্ধকারের অসাবধান অবসরে। উঠে আসে—ছেড়ে যাওয়া পুরানো পৃথিবীর বুকে। উঠে এসে অবাক হয়ে যায় তারা। বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে যায়। ধিক্কারে স্তম্ভিত হয়ে যায় পৃথিবীর দুর্ব্যবহারে।.... এসে চিনতে পারে না কিছু, খুঁজে পায় না নিজের পুরানো জায়গাটাকে। বুঝতে পারে না—কোথায় হারিয়ে গেল, তা'কে হারিয়ে ফেলার গভীর ক্ষতচিহ্নটা? জানত না—মমতাহীন পৃথিবী হারিয়ে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষে মুছে ফেলে ক্ষতির সকল চিহ্ন। নতুন করে নিজেকে সাজিয়ে নেয় আগামী নতুনের জন্য।...

কাউকে হারিয়ে ফেলে হাহাকার করতে বসবে এত সময় পৃথিবীর হাতে নেই।....

বুঝতে পেরে ওরা ক্ষুব্ধ অপমানে দলে দলে গিয়ে জড়ো হয় অরণ্যে অরণ্যে। পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ওদের হতাশ হাহাকার। যেন মাথা কুটে কুটে সাড়া তুলতে চায় মমতাহীনার প্রস্তরীভূত বক্ষপঞ্জরে। বুঝি মনে পড়িয়ে দিতে চায়... "আমি ছিলাম" "আমি ছিলাম"...."একদা তোমার এই শোভাসম্পদের উপর ষোলো আনা অধিকার ছিল আমার, এমন নির্মম ঔদাসীন্যে আমাকে ভুলে যেও না।" এক সময় ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়ে ওঠে নিজেরা নিজেরা। নিশ্বাস ফেলে বলে—"ভুলে গেছে আমাদের!" ... "আমরা নেই!" তখন হয়তো ক্ষণকালের জন্যে অরণ্যানী স্তব্ধ হয়ে যায়, শুধু একটা অনুচ্চারিত 'হায় হায়' স্থির হয়ে থাকে।

আবার আছড়ে এসে পড়ে নতুন দল।

আবার তাদের ভারাক্রান্ত নিশ্বাসে পাতায় পাতায় ওঠে মর্মর শিহরণ। সারারাত্রি ধরে চলে এই আনাগোনা, এই মাতামাতি।

নিরুপায় অরণ্যকে সমস্ত রাত ধরে সহ্য করতে হয় অশরীরী আত্মাদের এই অদ্ভুত আক্রমণ। ঊষার আলো ফুটলে তবে অরণ্যের মুক্তি, তখন সে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। প্রেত আত্মারা আলোর আভাসে সচকিত হয়ে ওঠে, বুঝতে পারে জীবিত প্রাণীর রাজ্যে এ তা'দের অনধিকার প্রবেশ। বুঝতে পেরে ম্লানমুখে বিদায় নেয় তারা।

... ...

আমার এই অদ্ভুত কল্পনার খবর পেয়ে তুমি কি হাস্ছো কস্তুরী?...ভাবছ দিনের আলোয় কি অরণ্যে মর্মরধ্বনি ওঠে না?...

ওঠে বই কী। ওঠে!

সে ধ্বনি শাখাপত্রে বাতাসের লীলাচাপল্যের। তখন কেউ ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়ে ওঠে না।...কস্তুরী, দিনের আলোয় তুমি যদি অরণ্যের জটিলতায় ঘুরে বেড়াতে চাও, তখন যে শব্দ তুমি শুনতে পাবে, সে নিতান্তই তোমার নিজেরই পায়ের চাপে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। তখন রহস্যহীন মৌন অরণ্য গম্ভীর মুখে চেয়ে থাকবে তোমার দিকে। সারারাত্রির মাতামাতির ইতিহাস দেখতে পাবে না তার মুখের কোনও রেখায়।

কস্তুরী, অরণ্যের এত কাছাকাছি কখনও থেকেছ তুমি, যেখান থেকে জানালা খুললেই বনের গন্ধ পাওয়া যায়? গভীর রাত্রে বিছানা থেকে উঠে এসে জানালায় দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করেছ অরণ্য-মর্মরের সত্যকার ইতিহাস?

না না !!

নিশ্চয় তুমি এসব দেখনি কস্তুরী, নিশ্চয় শোনোনি এ সব! যদি শুনতে পেতে—তা'হলে পরীক্ষায় একটা বাড়তি ডিগ্রি আর কিছু পরিমাণ বেশি নম্বর আহরণের আশায় ইটকাঠের অরণ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থেকে অমন দুরূহ তপস্যায় মগ্ন থাকতে পারতে না। তোমার এই তপস্যাটা কি হাস্যকরই আজ লাগছে আমার কাছে! আকাঙ্ক্ষার পরিধি কত ছোট হয়ে গেছে আমাদের, ভাবলে তোমার বিস্ময় লাগে না কস্তুরী?

পড়ে হাসছ?

কিন্তু সত্যি বলছি, কেন জানি না, রোজ রাত হলেই এই অদ্ভুত কল্পনায় যেন পেয়ে বসে আমাকে। কী হাস্যকর লাগে নিজেদেরকে!...কী তুচ্ছ লাগে দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের সহস্র খুঁটিনাটি!...

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে গেল এখানে—চিঠিতে খুলে লেখবার উপায় নেই। দেখা হলে বলব। আমার মনে হয়, হয়তো এ সমস্ত সেই ঘটনারই প্রতিক্রিয়া। সত্যকার একটা পরীক্ষা না এলে—"

প্যাডটা উল্টেপাল্টে দেখে কস্তুরী। নাঃ, আর কোথাও কিছু লেখা নেই। নিশ্চয় রাত্রে লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কবি, তারপর ভোর না হ'তেই ছুটেছেন চাকরি বজায় রাখবার কঠোর তপস্যায়।

মৃদু একটু হাসি ফুটে ওঠে কস্তুরীর ঠোঁটের কোণে।

আহা বেচারা! ও কি জানত সাড়ে তিনশো মাইল দূর থেকে হঠাৎ এসে পড়ে কস্তুরী ওর কাব্যির ওপর হানা দেবে?...নিশ্চয় আবার আজ রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে দু'চারটে সিগারেট ধ্বংস করে নিয়ে মৌজ করে বসে অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ করত কথার জাল বুনে বুনে। মধুর রসের প্লাবন বইয়ে ফেলেও কস্তুরীকে ভাসিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি বলেই বোধহয় এবারে অদ্ভুত রসের আমদানি করতে শুরু করেছে প্রদীপ!

'অরণ্য মর্মরের সত্য ইতিহাস'।

রৌদ্রদগ্ধ বহির্প্রকৃতির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে আর একবার হেসে ওঠে কস্তুরী। আহা বেচারা রে! শক্তি-সামর্থ্যওয়ালা এতখানি লম্বাচওড়া পুরুষ জাতটাকে 'বিরহ' জিনিসটা কী কাবুই না করে ফেলে!....তা' নয়তো সমস্ত দিন খেটেপিটে এসে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কি না মাঝরাত্রে জানলা খুলে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বঞ্চিত আত্মাদের অতৃপ্ত হাহাকার শুনতে বসেন!

মাথা খারাপ! কিন্তু "ঘটে যাওয়া ঘটনাটা" কী?

প্যাড্টা চাপা দিয়ে রেখে ভ্যানিটি ব্যাগটা লুফতে লুফতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে কস্তুরী। বাচ্চা চাকরটাকে ডাক দিয়ে প্রশ্ন করে—ওহে বীরভদ্র, তোমার 'সাহেব' কখন ফিরবেন জান?

পাহাড়ি ছেলেটার ভাগ্যে এমন একটি গরীয়সী প্রশ্নকারিণী কখনও জুটেছে কি না সন্দেহ। তবে সে বিগলিত কৃতার্থে একগাল হেসে ভাঙা বাংলায় যা বলে সেটা কস্তুরীর পক্ষে খুব হৃদয়গ্রাহী হয় না। সন্ধ্যার আগে প্রদীপের ফেরবার কোনও আশাই নেই নাকি।

আর এখন সবে বেলা এগারোটা।

অর্থাৎ কমপক্ষে এখনও ঘণ্টা সাতেক একা থাকতে হবে কস্তুরীকে। ট্রেনে এলে এইটি হত না। যথারীতি খবর দিয়ে বেরিয়ে, অধীর আগ্রহে স্টেশনে অপেক্ষমান প্রদীপের কাছে এসে নেমে পড়তে পারলেই হয়ে যেত। অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে দিশেহারা প্রদীপের সেই চেহারা কল্পনা করতে পারছে কস্তুরী।

তা নিজেই বা সে কি কম কবিত্বটা করে বসেছে? যেই ইচ্ছে হল আকাশে উড়ে চলে এল! হঠাৎ এসে পড়ার মজাটাই মনে রেখেছে, অসুবিধেটা ভেবে দেখেনি তো!

এতক্ষণ কী করবে সে? স্নান আহার সেরে নিয়ে দিব্যি নিটোল একটি ঘুম দেবে?

আরে ছিঃ, অসম্ভব!

তবে?

জুতোর চাপে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে বনের ধারে ধারে?

উঁহু, রক্ষে করো বাবা।

তা' হলে?

প্রদীপের ঘরসংসার তচ্‌নচ্‌ করে নতুন করে গোছাতে বসবে? 'পুঁথিগতপ্রাণা' হলেও কস্তুরী যে গৃহিণীপনার অযোগ্য নয়, একথা প্রমাণ করে দেবে প্রদীপের কাছে?...থাকগে যাক, কে অকারণ অত খাটে! সংসার করতে যখন আসবে, দেখিয়ে দেবে একেবারে।...তবে কি ওর খাতাপত্র বই কাগজ তল্লাস করবে বসে বসে? আরও কী কী উদ্ভট পাগলামির নমুনা সংগ্রহ করতে পারা যায় তাই দেখতে?

দূর! মজুরি পোষাবে না!

সব থেকে ভালো, যত ইচ্ছে আলিস্যি করে স্নানাহারপর্ব সেরে এই চাকরটার সঙ্গে গল্প জমানো।....হোক না বালক মাত্র, তবু কৃতার্থ হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। শিথিল ভঙ্গিতে খোঁপাটা খুলতে খুলতে ভ্রূভঙ্গি করে বলে—এই হাঁদারাম, তোর সাহেবের ঘরবাড়ি সব তো এক কথায় আমার হাতে ছেড়ে দিলি, বল দিকিন আমি কে?

'হাঁদারাম' ঘাড় হেলিয়ে বলল—জানি, মেমসাহেব!

—চমৎকার! কে তোকে বলল শুনি?

—কেউ বলল না। আমি বুঝছি।

—বেশ করেছ। যাও এখন চানের জল দাও দিকি? হুঁ, তা'পর তোদের এখানে কিছু খেতেটেতে পাওয়া যাবে তো?

—খুব!—যতটা সম্ভব ঘাড় হেলিয়ে জবাব দেয় নানকু।

ভারি আশ্বাসের সুর ছেলেটার কণ্ঠে।

কস্তুরী হেসে ফেলে বলে—শুনে বাঁচলাম। তা' কি খেতে দিবি, একেবারে জেনেই প্রাণ শীতল করে যাই। কী আছে তোদের ভাঁড়ারে?

কথার সুখেই কথা কওয়া। খুশির পাত্র উপ্‌চে পড়লে এমনই হয় বোধ হয়। পাহাড়ি ছেলেটা কস্তুরীর কৌতুক-কথার অর্থ বুঝুক না বুঝুক, তবু উপযুক্ত শ্রোতার অভাবে ওর সামনেই নিজেকে ঝলসে তুলবে কস্তুরী। ...গানের সুরের মতো হেসে উঠবে অকারণ, গেয়ে উঠবে এক লাইন গান। কথা বলবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

প্রদীপ অনুপস্থিত। তবু সারাবাড়িতে তো তার উপস্থিতির বাতাস বইছে! এ বাড়ি কস্তুরীর, এ সংসারের ওপর যথেচ্ছ কর্ত্রীদের দাবি কস্তুরীর, ভাবতে কী অপূর্ব রোমাঞ্চ!

সত্যি! বইখাতা নিয়ে তখন চলে এলেই হত প্রদীপের সঙ্গে। ...নাই বা অনার্স নিত, নাই বা হত ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

কী লাভ হবে তাতে? কী ক্ষতি হত এম-এ-টা যদি নাই দিত? প্রদীপ 'বেচারা', না কস্তুরী নিজেই 'বেচারি'?

খোলাচুল আঙুলে জড়াতে জড়াতে কস্তুরী হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে—কই বল শুনি?

ছেলেটা মহোৎসাহে জানায়—চালডাল আলু পিঁয়াজ ডিম মাখন ঘি আটা—কোনও বস্তুরই অভাব নেই সাহেবের ভাঁড়ারে। তবে যদি মেমসাহেবের মুরগির মাংস খাবার বাসনা থাকে, কিঞ্চিৎ সবুর করতে হবে।...অবিশ্যি বেশি নয়, ছুটে গিয়ে ওই বনের ধারে মনিহারীর বৌকে খবর দিয়ে আসতে যা দেরি।

—মনিহারীর বৌ? সে আবার কে?

সাধারণ কৌতূহলে প্রশ্ন করে কস্তুরী। কিন্তু উত্তর শুনে কৌতূহল আর সাধারণ থাকে না, ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

মনিহারীর বৌ!

সেই যে মনিহারী, সাহেবের 'টুরে' বেরনোর সময় তলপি বইত, সাহেবের গাড়ি আর বন্দুক সাফ্ করত, যে মারা পড়ল সাহেবেরই সেই বন্দুকের গুলিতে! তারই বৌ!...সাহেবের প্রাণ বাঁচাতে পুলিসের কাছে মিছে কথা বলেছে বলে ওর আত্মীয়-কুটুমেরা ওকে একঘরে করে দিয়েছে কিনা।...ওই বনের একটা চালা তুলে নিয়ে একলা থাকে সে এখন—মুরগি পোষে, ডিম বেচে, বেতের চুপড়ি বোনে।

তা'কে একবার খবর দিতে পারলেই কস্তুরীর বাসনা পূর্ণ হয়।....এমনকি ও এসে মাংস রান্না করে দিয়ে যেতেও পারে পর্যন্ত। খুব ভালো রাঁধে ও। কতদিন রান্না মাংস চুপি চুপি রেখে যায় সাহেবের জন্যে, সাহেব না জেনে তারিফ করেন এই আনাড়ি ভূত নানকুকে।

... ...

আঙ্গুলের আগায় খোলাচুলের গোছা এঁটে এঁটে বসেছে, লাল হয়ে উঠেছে আঙুলের ডগা।... কিন্তু মুখটা? মুখটা অমন লাল হয়ে উঠেছে কেন কস্তুরী? অদৃশ্য কোনও রজ্জুতে কেউ ওর কণ্ঠনালিটা কি জড়িয়ে জড়িয়ে পাক দিচ্ছে? ও বসে পড়েছে—উঠোনে পড়ে থাকা তেলচিটে খাটিয়াটার ওপর! ধুলোয় লুটোচ্ছে দামি শাড়ির ঝক্‌ঝকে আঁচলটা।...এই তবে 'ঘটনা'?

অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বরকে এইটুকু মুক্তি দিতে পারে কস্তুরী—ও—ওই মনিহারী গুলি খেলো কেন?

ছেলেটা অকপট সরলতায় ব্যক্ত করে, যদিও অপরের কাছে বলতে মানা কিন্তু কস্তুরী যখন নিতান্তই সাহেবের নিজের মেমসাহেব, তখন বলতে বাধা নেই। পুলিস জানে বটে বন্দুক সাফ করতে গিয়ে হঠাৎ ভুলক্রমে গুলি ছুটে মারা গেছে মনিহারী, ওর বৌও বলেছে সেই কথা পুলিসের কাছে! কিন্তু আসল কথা তা নয়! রাতের অন্ধকারে সাহেব ওর চোখ দেখে বনবিড়াল ভেবে ভয় খেয়ে গুলি করেছেন।

—ভয়? কীসের ভয়! মানুষকে বনবিড়াল ভাববার মানে?

আর্ত চিৎকার করে ওঠে কস্তুরী।

ছেলেটা হতাশভাবে দুইহাত উল্টে বলে—কী জানি মেমসাহেব! ও পাগলাটা কেন যে রাতভোর জেগে জেগে সাহেবের জানলায় চোখ রেখে ঘর পাহারা দিত কে জানে! ওর চোখ দুটো ছিল ঠিক বনবিড়ালের মতো। রাতে আগুনের মতো জ্বলত। ...ঘুমের ঘোরে উঠে সাহেব হঠাৎ ভয় খেয়ে—

ধীরে ধীরে ধাতস্থ হচ্ছে কস্তুরী।

গম্ভীরভাবে বলে—তা' ওর বৌ পুলিসের কাছে মিছে কথা বলতে গেল কেন?

ছেলেটা যেন কস্তুরীর অজ্ঞতায় অবাক হয়ে যায়। নিজে নিতান্ত বিজ্ঞের মতো বলে—না বললে সাহেবের নামে কেস্ হত না?

—হতই বা! উদ্ধত স্বরে বলে কস্তুরী—সাহেবের ফাঁসি হলে ওর কি লোকসান ছিল? ওর নিজের স্বামী খুন হয়ে গেল—

ছেলেটা নিজের ঠোঁটের উপর একটা আঙুল ঠেকিয়ে কণ্ঠস্বর খাটো করবার ইঙ্গিত জানায় কস্তুরীকে। চুপি চুপি প্রতিপ্রশ্ন করে—সাহেবের ফাঁসি হলে ওর আদমি বেঁচে উঠত?

এতবড় মহৎ প্রশ্নের উত্তর সাধারণ মানুষের কাছে থাকে না। কিন্তু কস্তুরী কেন সেই মহানুভব নারীর কাছে কৃতজ্ঞ হচ্ছে না? যার একটিমাত্র কথায় ফাঁসি হয়ে যেতে পারত কস্তুরীর স্বামীর! সে সুযোগ গ্রহণ না করে যে নিজের স্বামীহন্তার প্রাণরক্ষা করেছে!

বরং আরও রুক্ষ আর ক্রুদ্ধ স্বরে মন্তব্য করে বসে কস্তুরী—নাই বা বাঁচল—মানুষ খুন করলে ফাঁসি হওয়াই তো উচিত!

পাহাড়ি ছেলেটা চমকে মুখ তুলে এক নিমেষ তাকিয়ে থাকে কস্তুরীর মুখের দিকে। তারপর গম্ভীরভাবে বলে চলে যায়—গোসলখানায় জল দিচ্ছি।

সাতঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না, বেলা তিনটের মধ্যেই এসে পড়ে প্রদীপ। এরোড্রোমের এক ছোকরা কর্মচারী কী সূত্রে যেন চিনত কস্তুরীকে, সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খবর দিয়েছে প্রদীপকে।

ছুটে এসেছে গাড়িখানার 'হাওয়া গাড়ি' নাম সার্থক ক'রে। ছুটে এসেছে বিস্ময় আনন্দ আর উৎসাহে জ্বল-জ্বল করতে করতে। নাঃ, নিজেকে আর আটকে রাখতে রাজি নয় সে, ছোকরা চাকরটার সামনেই কস্তুরীকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আর কি!

কিন্তু আশ্চর্য!

কস্তুরী কী কঠিন আর কী নিরুত্তাপ!

জমাট কঠিন হিমশীতল একখণ্ড বরফ স্বামীকে উপহার দেবে বলেই কি এই হিমপাহাড়ের দেশে ছুটে এসেছে কস্তুরী? রোদপড়া বরফের মতোই কী ভয়ানক ঝকঝক করছে ওর সাদা উজ্জ্বল চোখ দুটো!

—কী হল কস্তুরী? শরীর খারাপ লাগছে?

—শরীর? হেসে ওঠে কস্তুরী—আশ্চর্য রকমের ভালো লাগছে। পাহাড়ে হাওয়ায় এখুনি খিদে বেড়ে যাচ্ছে!

প্রদীপ ব্যথিত স্বরে বলে—এলে যদি তো অমন দূরে কেন কস্তুরী? কী অদ্ভুত লাগছে তোমাকে! 'তুমি' বলে যেন চেনাই যাচ্ছে না।

কস্তুরী আর একবার হাসির ঝিলিক দিয়ে ওঠে—রাত জেগে 'ক্ষুদিত আত্মা'র নিশ্বাস শুনে শুনে তোমার পার্থিব দৃষ্টিটা কিছু খাটো হয়ে গেছে বোধহয়।

—ওঃ! তুমি আমার চিঠিটা পড়েছ বুঝি?...চমকে ওটে প্রদীপ।...ও সব আমার অর্থহীন পাগলামি! দেখলে কেন? লিখেছিলাম তোমাকে, কিন্তু পাঠাতাম না। তুমি এসেই সব দেখে ফেললে?

—অন্যায় হয়ে গেছে, না?

কস্তুরী বাঁকা কটাক্ষে বলে—হঠাৎ বড় অসুবিধেয় পড়ে যেতে হল, কেমন? যাক্ কালই ফিরছি, বেশি অসুবিধে বাড়াব না।

ব্যাকুল প্রদীপ এ রহস্যের মীমাংসা করতে পারে না।

এমন হঠাৎ এসে পড়ল কেন কস্তুরী? এসেছে যদি তো এমন দূরত্বের আবরণে ঘিরে রেখেছে কেন নিজেকে? কেন ওর স্বভাবসিদ্ধ প্রগল্ভতায় বেপরোয়াভাবে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে ঝুলে পড়ে বলছে না—'কী মজা করলাম বলো তো? কেমন জব্দ! চিঠি না দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে আর?'

যাক গে। এখন আর রহস্যভেদের চেষ্টা করে লাভ নেই।

রাত্রিটা তো হাতে আছে—সমস্ত দ্বন্দ্ব সমস্ত বাধা, যত কিছু অভিমান আর ভুল বোঝার মধুর পরিসমাপ্তির আশ্বাস নিয়ে! এখন চলুক সাধারণ আতিথ্যের পালা।

তা' সেটা উভয় পক্ষেই চলে। ভদ্রতা আর সৌজন্যের কে কত নিখুঁৎ অভিনয় করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলে যেন।...চা খাওয়া সারা হতে বেলা পড়ে যায়।

প্রদীপ বলে—চলো কস্তুরী, বেড়িয়ে আসা যাক একটু।

—বেড়াতে? কোথায়?

—বনে জঙ্গলে যেখানে তোমার খুশি। আজ সব তোমার ইচ্ছেয়—

কস্তুরী তীক্ষ্ণ হেসে বলে ওঠে—বনের পথটা তোমাকে ভীষণভাবে টানে, তাই না?

প্রদীপ একটু থতমত খেয়ে ওর দিকে তাকায়, তারপর অবাক হয়ে বলে—ঠিক বলেছ কস্তুরী! সত্যিই অরণ্য যেন অবিরত আমাকে আকর্ষণ করতে থাকে। কেন বলো তো?...নিজেই বুঝতে পারি না আমি কেন এমন হয়। কতদিন মাঝরাতে ইচ্ছে করে, বেরিয়ে পড়ে দেখি কি রহস্য লুকোনো আছে ওখানে! কেন কিছুতেই ওকে ভুলে থাকতে পারি না আমি! তুমি বলতে পারো কস্তুরী, কেন এমন হয়?

—পারি। গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় কস্তুরী—বুনো পাহাড়ি মেয়েরা অনেক কিছু মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক জানে।

—এর মানে? এ আবার কি একটা যা খুশি উত্তর হল? ওকথা বললে যে—

—বললাম এমনি। চলো চলো। দেখে আসি—তোমার অরণ্যের আত্মাকে।

—দুরছাই! প্রদীপ চেষ্টাকৃত লঘুস্বরে বলে—কী দুপাতা ছাইপাঁশ বাজে কথা লিখে রেখে তোমার মাথাটাকেই বিগড়ে দিয়েছি দেখছি।

বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায়।

কৃষ্ণপক্ষের মৃদু জ্যোৎস্না গাছের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও হালকা কোথাও ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।...পায়ের চাপে চাপে শব্দ উঠেছে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাওয়ার।

আগে কিছু কিছু কথা হচ্ছিল, ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেছে। নির্বাক দুটি প্রাণী যেন কোণে অমোঘ বন্ধনে বন্দি হয়ে যন্ত্রের মতো চলছে পাশাপাশি।...

হঠাৎ এক সময় মৃদু একটু হেসে কস্তুরী বলে ওঠে—দেখো অরণ্যের জটিলতায় পথ হারিয়ে ফেলবে না তো?

প্রদীপ দাঁড়িয়ে পড়ে। একটু চুপ করে থেকে স্থির স্বরে বলে—বোধ করি অমনি কোনও সন্দেহ তোমার পথকে জটিল করে তুলছে কস্তুরী। কিন্তু নিশ্চিত থেকো, আমার পথ হারাবে না। আমার ধ্রুবতারা আছে।

—কই? কোথায়?

একটু দুর্বল আর ফ্যাকাসে শোনায় কস্তুরীর গলা।

—বাঃ, বলে খেলো হব কেন? সে হল নিজের জিনিস।

উত্তর দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কস্তুরী। সভয়ে বলে—বনের ভেতর ওখানে আলো কীসের?

—আলো নয়, আগুন। শুকনো পাতা জ্বেলে ভাত রাঁধছে...ওকি ওকি, পাথর ছুড়ছ কেন? ...কী সর্বনাশ!—হঠাৎ একি—

পথ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া ভারী পাথরের টুকরোটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে কস্তুরী প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—দেখতে পাচ্ছ না! ওখানে কী যেন একটা বুনো জানোয়ার বসে রয়েছে?

—কী ভয়ানক! ও যে মনিহারীর বৌ! ওই তো পাতা জ্বেলে ভাত রাঁধছে। কিম্ভূত মতো বিশ্রী জোব্বাজাব্বা পরে আছে বলে ওই রকম দেখাচ্ছে। ওর গল্প করব তোমার কাছে।...এখন বলছ জানোয়ার, শুনে বলবে দেবতা।...ও আমার প্রাণদাত্রী, তা জান? আচ্ছা—এখন পরিচয় করিয়ে দিই, পরে সব বলব!...ওরে এই বৌ! এ—মনিয়ার বৌ রে—

পায়ে পায়ে দু'জনেই বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে গেছে ততক্ষণে।

সাড়া পেয়ে আগুনের কাছ থেকে উঠে আসে মানুষটা। উঠে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। কথার উত্তর দেয় না, নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুটো মানুষের দিকে।...

গাছের সারি এখানে পাতলা, জ্যোৎস্না যেন খানিকটা হাঁফ ফেলে বেঁচেছে। সেই মৃদু জ্যোৎস্নায় সামনাসামনি স্থির হয়ে থাকে দু'জোড়া চোখ।

খুব স্পষ্ট কিছুই দেখা না।...অস্পষ্ট হয়ে গেছে শিফন শাড়ি, ওমেগা ঘড়ি, জয়পুরী কঙ্কণ আর শান্তিনিকেতনী বটুয়া...অস্পষ্ট হয়ে গেছে বহু ব্যবহৃত ঘাগরার গায়ে বেরঙা ছিটের তালি, দড়াদড়া সেলাই! অস্পষ্ট হয়ে আছে সমস্ত পরিবেশ!

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শুধু দু'জোড়া চোখ।

কী আছে সে চোখে?

প্রভুপত্নীর প্রতি সসম্ভ্রম সমীহ?

স্বামীর প্রাণদাত্রীর প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতা?

না। সে চোখে আছে শুধু আদিম অরণ্যের নিবিড় ছায়া, অথবা ছায়া নয় আগুন। আগুন যারা জ্বালাতে জানত না সেই গুহাবাসিনী আদিম প্রপিতামহীদের চোখে যে আগুন ঝিলিক্ মারত সেই আগুন!

পরিবেশটা সহনীয় করে তুলতে প্রদীপ বুঝি বলতে চেষ্টা করে—'কী রে, রান্না করছিস?' কিন্তু গলা দিয়ে ওর স্বর ফোটে না। যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে যায় মনিহারীর বৌ, শুধু অবহেলার একটা সেলাম জানিয়ে।

ফেরার পথে হালকা ভঙ্গিতে কস্তুরী বলে—উঃ, কী ভয়ানক চোখ দুটো ওর! যেন জ্বলছিল! ভাগ্যিস তোমার বন্দুকটা সঙ্গে ছিল না! থাকলে—হয়তো বা বনবিড়াল ভেবে গুলি করে বসতাম!

চমকে ওঠে প্রদীপ। ...কে বলল ওকে?

মুহূর্তে সব স্পষ্ট হয়ে যায় ওর কাছে। ওঃ, তাই। তাই এই ভাবান্তর কস্তুরীর! কিন্তু বেশ স্থির কৌতুকের ভঙ্গিতেই বলে—তবু ওর বাঁচাটা নিতান্তই ভাগ্য বলতে হবে, নইলে অস্ত্রের অভাব তো ছিল না কস্তুরী! আদিম পৃথিবী সেই আদিম বর্বর যুগ থেকে এই সভ্যভব্য আণবিক যুগ পর্যন্ত মানুষের হাতের কাছে পাথরের টুকরোর জোগান ঠিকই রেখেছে।...প্রস্তরযুগ শেষ হয়ে গেছে বলে যে সে অস্ত্রে কাজ হয় না, তা তো নয়?

[১৩৫৪]

আমায় ক্ষমা করো

প্রায় আধখানা গ্রাম জুড়িয়া যে ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদশ্রেণি বহিয়া ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো ইতস্তত ছড়াইয়া আছে, আজও তাহারা দর্শকের মনে একটা সকরুণ শ্রদ্ধা জাগাইয়াতোলে। মজুমদার বংশের অতীত মহিমার মূক সাক্ষী।

একদিন নাকি ইঁহাদের 'রাজা' বলিয়া খ্যাতি ছিল।

'বারমহল', 'অন্দরমহল', 'কাছারিঘর', 'নাটমন্দির', 'দুর্গাদালান', 'ভোগমণ্ডপ', 'রান্নাবাড়ি' ইত্যাদি নামের আড়ালে ভাঙা ইঁটের স্তূপের ভিতর যে অস্পষ্ট ছবি ভাসিয়া ওঠে তাহার সামনে মাথাটা আপনিই কেমন নত হইয়া আসে, আর আসে একটা 'হায় হায়' ভাব... কেমন ছিল সেই বিচিত্র সমারোহের কোলাহলময় দিনগুলি... কেমনই বা ছিল ইহাদের অধিবাসীরা... যাহারা এখানে একদিন জন্ম-মৃত্যু হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের অংশ অভিনয় করিয়া গিয়াছে! ভাঙা দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে এখনও কি তাহাদের অতৃপ্ত নিশ্বাস জড়াইয়া আছে? ভোগের এই অজস্র উপকরণ ফেলিয়া যাওয়ায় অতৃপ্তি?

চৈত্র-বৈশাখের এলোমেলো সন্ধ্যায় কপাট-খসা জানলার ফোকরে ফোকরে যে আর্তস্বর হাহাকার করিয়া ফিরে—সে কি তাহাদেরই সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস?

চামচিকা ও গোলাপায়রার ঝাঁক ছাড়া এখানে অন্য কোন্ জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব বাহির হইত বিশ্বাস করা শক্ত—বরং বেশি সহজ ভূতের অস্তিত্ব কল্পনা। তবু আছে সে অস্তিত্ব।

হয়তো নেহাৎ নিরুপায় বলিয়াই আছে।

অন্দরমহলের মধ্যে যে ঘরগুলো এখনও কোনও প্রকারে টিঁকিয়া আছে তাহারই একখানিতে থাকেন 'নতুনগিন্নি'। নবদ্বীপ মজুমদারের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। সত্তরের কাছাকাছি বয়স, মাজাভাঙা খুনখুনে বুড়ি, চোখের চাহনি নিষ্প্রভ, শুধুই গলার জোর আছে সমান।

দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার হোঁচট্ খাইতে খাইতে কোনও গতিকে বুড়ি নিজের পেটের ব্যবস্থা করিয়া লয়, আর ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ হইতে শুরু করিয়া পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ দেব-দানব সকলের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে থাকে।

বিশ্বসংসারে সকলের উপর ওর অদ্ভুত এক বিজাতীয় ক্রোধ। পৃথিবীটাকেই দাঁতে পিষিয়া ফেলিতে পারিলে যেন ওর শান্তি হয়।

গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের তাপ অসহ্য হইলে ভাঙা কোমর সোজা করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া চোখের উপর হাত আড়াল করিয়া আকাশমুখী হইয়া তীব্রস্বরে বলে—'মরছ

আগুন জ্বেলে? পুড়িয়ে মারছ পৃথিবীকে? তোমার মরণ হয় না অনামুখো? ভর্ দুপুরে শাপ দিই তোমায়—জ্বলে পুড়ে মরো, জ্বলে পুড়ে মরো।'

অবশ্য সূর্য্যদেবের গায়ে ব্রাহ্মণকন্যার অভিসম্পাতের আগুন স্পর্শ করে কি না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু বুড়ির এই অযথা শক্তিক্ষয়ে আলস্য নাই।

আবার বর্ষার দিনে একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ ছাপাইয়া অসন্তোষ মুখর হইয়া ওঠে—'ঝাঁটাখেকো দেবতা, কেঁদে মরছেন, কোন্ যমে ধরেছে তোমায়?

কাক চিল ইঁদুর আরশোলা সকলের সঙ্গেই প্রতিপক্ষের ভঙ্গিতে বাক্যবাণ বর্ষিত হয়।

উঠানের ওপারে শ্যামাকে দেখা গেল...দুই হাতে একগোছা সজিনা ডাঁটা ও একটা পোকা বেল, কোঁচড়ে কয়েকটা পাতিলেবু। নতুনগিন্নিকে দেখিয়া অপ্রতিভের ফিকা হাসি হাসে... সাধ্যপক্ষে ইহার সামনে পড়িতে চায় না সে।

শ্যামাকে দেখিয়াই তেলেবেগুনে জ্বলিয়া ওঠে বুড়ি—এই যে পাড়া বেড়ানি 'খুদ মাঙুনী' এলেন! সক্কাল বেলাই লোকের দোরে গিয়ে হাত পাততে লজ্জা করে না শামি? অমন পেটে আগুন ধরিয়ে দে, আগুন ধরিয়ে দে! ভাতার-পুতের সংসার নয়—একটা পোড়া পেট, তার জন্য এত আহিঙ্খে? ছিঃ ছিঃ, আমি হলে গলায় দড়ি দিতুম।

শ্যামার যে এ বাড়িতে সত্যকার কি দাবি আছে সেটা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত, হয়তো অতি সূক্ষ্ম একটু সম্বন্ধের রেশ থাকিলেও থাকিতে পারে, হয়তো কেবলমাত্র আশ্রয়হীনতার দাবিতে সে আছে। অথচ এতবড় ভাঙা বাড়িতে তাহার মন টেঁকে না, তাই সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। সময় অসময়ে লোকের উপকার করিতেও ছাড়ে না এবং ভদ্রতার আবরণে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়াই তাহার দিন চলে।

আরও একজন বাসিন্দা আছে সে হৈমন্তী।

প্রেতপুরীর অন্ধকার গহ্বরেও কি সোনার প্রদীপ জ্বলে? জ্বলিলে হয়তো হৈমন্তীর সঙ্গে তুলনা করিবার মতো বস্তু একটা মিলিত।

এ বাড়ির শেষ বংশধর সমুদ্রনারায়ণের স্ত্রী হৈমন্তী। সৌন্দর্য্য আর সুলক্ষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া আনা মেয়ে। কিন্তু কোষ্ঠিকারকদের শাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া হৈমন্তীর জীবন-ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে অদ্ভুত অলক্ষণের মধ্যে।

নিতান্ত দরিদ্রের ঘর হইতে যখন এ বাড়িতে বধূ-বেশে আসিয়া দাঁড়াইল হৈমন্তী, তখনও—বাজনার শেষে সুরের রেশের মতো এদের পূর্ব গৌরবের কিছু জের আছে। জীর্ণ জামিয়ারের আংরাখা গায়ে দিয়া আর চওড়া কল্কাপাড় শান্তিপুরী ধুতি পরিয়া দাদাশ্বশুর বিশ্বনারায়ণ রূপার থালায় পাঁচখানি আকবরী মোহর দিয়া কন্যা আশীর্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন।

হৈমন্তী পশ্চিমের মেয়ে, দরিদ্র পিতার ঘর হইতে সে প্রচুর ঐশ্বর্য বহিয়া আনিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু আনিয়াছিল অনবদ্য রূপ আর অপূর্ব সঙ্গীতানুরাগ। ইহাদের বনেদি জমিদারের ঘরে মলপরা নোলোকপরা অষ্টাঙ্গ গহনায় মোড়া মেয়েদের মাঝখানে হৈমন্তী যেন একটা আবির্ভাব।

তা সমুদ্র তাহার মান রাখিয়াছিল, সনাতন নিয়মের গণ্ডী কাটাইয়া তাহার জন্য রাখিয়াছিল অনেকখানি আকাশ, আনেকটা আলো। কিন্তু কয়দিনই বা? উৎসবাড়ির হাজার বাতির ঝাড়ের মতো নিমেষে মিলাইয়া গেল সেই সমারোহের দিনগুলি।

সে দিন চাঁদ উঠিয়াছিল... সদ্য ফোটা চাঁপাফুলের মদির গন্ধে বাতাস ছিল উন্মনা... দিঘির ঘাটের বাঁধানো চাতালে হৈমন্তী বসিয়াছে সেতার হাতে... জ্যোৎস্নায় মাজা দেহ, পরনে নীলাম্বরী... পায়ের কাছে সমুদ্রনারায়ণ...

হৈমন্তী বলিয়াছিল—আজ আর বাজাতে ভালো লাগছে না, কি জানি কেমন যেন ভয় করছে। মনে হচ্ছে—

—কী মনে হচ্ছে বল তো?

—মনে হচ্ছে এত সুখ বুঝি সইবে না—বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি শেষ—

নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে কথার শেষ হারাইয়া গিয়াছিল। সমুদ্র হাসিয়া বলিয়াছিল—বুকের এত কাছে থেকে ভয় কেন হৈম? কীসের ভয়? ওটা দক্ষিণে হাওয়ার গুণ। কবিরা তাই বলেন, মাতাল বাতাস! তোমার সেই সুরটা বাজাও, সেদিন ছাদে বসে যেটা বাজালে।

হৈমন্তী ধীরে ধীরে বাজনাটা তুলিয়া লইয়াছিল—কিন্তু হাত খুলিল না, সুর কাটিয়া গেল বার বার। কাতরভাবে বলিয়াছিল—আজ থাক্—শুধু তুমি আমার আরও কাছে এস, খুব কাছে।

—আরও কাছে? সমুদ্র হাসিয়া ফেলিল কিন্তু হাসির সুর মিলাইবার আগেই বাড়ির ভিতর হইতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল ক্ষীরোদা ঝি—দাদাবাবু, সর্বনাশ হয়েছে—

—কী রে ক্ষীরোদা, ব্যাপার কী?

—ইন্দির দাদাবাবু নাকি বাগ্‌দীপাড়ায় গিয়ে কী কেলেঙ্কারি করেছিল, তারা পাড়া ঝেঁটিয়ে লাঠি নে' তেড়ে এসেছে—

মুহূর্তে মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল...আবার এই কাণ্ড? এই সেদিন ইন্দ্রের জন্য কত হাঙ্গামা কত অপমান সহিতে হইল। পুলিসকে আক্কেল সেলামি দিতে গিয়া সমুদ্রের উঁচু মাথাটা হেঁট হইয়া গিয়াছিল। পিসির ছেলেকে লইয়া নিত্য এত ঝঞ্ঝাট পোহানোর দায় কীসের?

বাড়ির মধ্যে ঢুকিতেই ভীত ইন্দ্রনাথ ছুটিয়া আসিয়া কাতরভাবে বলিল—ছোড়দা, তোমার পায়ে পড়ি বাঁচাও, ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে—

—ওরা? ওদের হাতে পড়বার আগে আমিই তোমায় খুন করব রাস্কেল—

আচম্‌কা একটা ধাক্কা খাইয়া ইন্দ্র উঁচু রোয়াকের উপর হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িল শানবাঁধানো উঠানে।

আশ্চর্য! পড়িল আর উঠিল না!

সমুদ্রকে জব্দ করিবার জন্য সত্যই খুন হইয়া গেল ইন্দ্র!

জোয়ান ছেলে, স্বাস্থ্য সবল দেহ, এতটুকু উঁচু হইতে পড়িয়া মরিয়া যায়? হয় তো আশঙ্কায় আর উত্তেজনায় স্নায়ুশিরায় টান হইয়াছিল, এতটুকু আঘাতেই ছিঁড়িয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

এখনও সে দৃশ্য চোখের উপর ভাসিয়া উঠে হৈমন্তীর। উঠানের মাঝখানে ইন্দ্রর মৃতদেহ খিরিয়া বাগ্‌দী প্রজাদের নীরব জনতা, একজনের হাতে একটা মশালের আলো দপদপ করিতেছে... দুরন্ত বাতাসে তাহার সঞ্চরণশীল আলোছায়ায় সমুদ্রনারায়ণ মুহূর্তে মুহূর্তে যে হারাইয়া যাইতেছে।

চাঁদ বোধ করি তখন অস্ত গিয়েছে।

কেমন করিয়া সেই বাগ্‌দীদের সাহায্যেই লাশ সরানো হইল, কেমন করিয়া তাহাদের নির্বন্ধে সেই রাত্রেই সমুদ্র গ্রাম ছাড়িয়া ফেরার হইল, সে সব কথা এখন আর হৈমন্তীর বোধ করি ভালো মনে পড়ে না।

শুধু সমুদ্রের শেষ কথাটা মনে পড়ে...'পুলিসের হাতে ধরা দেবার সাহস খুঁজে পাচ্ছি না হৈম, তোমাকে বিধবা করতে পারব না... পারব না তোমায় ফেলে মরতে..."

তাই দীর্ঘ এক যুগ বৈধব্য আর সাধব্যের অদ্ভুত ত্রিশঙ্কুলোকে কাটাইয়া আসিতেছে হৈম আর মাস দুই গেলেই সিঁদুর মুছিয়া থান ধরিবার ব্যবস্থা, এক যুগ কাটিয়া গেলে নাকি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

আঠারো বছর হইতে ত্রিশ বছরের দরজায় আসিতে যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে হৈমন্তীকে, সেকি এতই ক্লান্তিহীন? খুনির স্ত্রী, ফেরারি আসামির স্ত্রী, এই ঘৃণ্য পরিচয় লইয়া এতদিন বাঁচিয়া আছে হৈমন্তী কি হিসাবে?

হয়তো মরিবার সাহস সেও খুঁজিয়া পায় নাই।

সমুদ্র যদি কোনওদিন ফিরিয়া আসে...যদি ডাক দেয়... সাড়া দিবে কে?

শবরীর প্রতীক্ষার মতোই বুঝি ধৈর্য্যহীন প্রতীক্ষা হৈমন্তীর।

তবু এ বাড়িতে টিকিয়া থাকা আশ্চর্য বই কী। কেবলমাত্র শ্যামা আর নতুনগিন্নির মতো লোকের আবহাওয়ায় হৈমন্তীর মতো মেয়ে এতদিন কাটাইল কেমন করিয়া, যেখানে রুচি প্রবৃত্তি শিক্ষা পদে পদে ব্যাহত হইতে থাকে? দারিদ্র্য সহ্য করা সহজ, কিন্তু নির্লজ্জ নগ্নতা সহ্য করা কঠিন নয় কি?

সমুদ্রের ফটোয় টাটকা মালাগাছটি পরাইয়া বাসি, মালাটি খুলিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হৈমন্তীর নিত্য কাজ। নতুনগিন্নির যে সে কথা জানা নাই এমন নয়, তবু খিড়কির দরজায় শাড়ির পাড়ে শেষাংশটুকু মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুনগিন্নি ওদিককার দালান হইতে চিৎকার করিয়া শ্যামাকে প্রশ্ন করেন—মেমসাহেবটি কোথায় হাওয়া খেতে বেরুলেন লা শামি?

—কী জানি, দিঘিতে বুঝি—

—'কী জানি' কী লা? জানিস না তুই? ন্যাকা! বলে, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা আর শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। কিন্তু এও বলি মা, ঘরের বৌ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে বাড়ির বার হওয়া কীজন্যে। মালা গাঁথছেন—ফুল ভাসাচ্ছেন—কত রঙ্গই জানেন। এই তো—আমার ষোলো বছর বয়সে সোয়ামী গিয়েছিল, বলুক দিকিন্ কেউ, কোনো দিন আদিখ্যেতা করতে দেখেছে?

তাঁহাকে ষোলো বছর বয়সে দেখিবার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল—তাহারা অবশ্য কেহই উপস্থিত নাই, তবু শ্যামা তোষামোদের ভঙ্গিতে সায় দেয়।

—তোমাদের সঙ্গে কার তুলনা দিদিমা—

দিদিমা বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে বলিয়া উঠেন—খোসামোদ করিসনে শামি, খোসামোদ শুনলে গা জ্বলে যায়।

নিঃশঙ্ক পথিককে এইরূপ আকস্মিক আক্রমণ করিয়া বসা তাঁহার স্বধর্ম। শ্যামা অপ্রতিভ মুখে বসিয়া থাকে, চট করিয়া উঠিতে পারে না এবং আলোচনাটা ভিন্ন খাতে বহাতেই বোধ করি একটা নূতন সংবাদের অবতারণা করে।

—সকাল বেলা আমাদের দিঘির ঘাটের ওদিক থেকে আসতে একটা মানুষ দেখলাম দিদিমা—কোট 'পেন্টুল' পরা লম্বা জোয়ান লোকটা, গোরাই হবে নাকি কে জানে, বকুল গাছের ওদিকটায় ঘুর ঘুর করছিল দেখে কেমন ভয়-ভয় করল পালিয়ে আসতে পথ পাই না—মনে হল—নতুন এসেছে গাঁয়ে—

—তা মনে হবে বই কী, তোমার তো আর গাঁ-সুদ্ধু চিনতে কাউকে বাকি নেই। বলি পালিয়ে এলি—বললি না কিছু?

—আমি কি বলব বাবা? কোট 'পেন্টুল' দেখলে আমার ভয় করে।

—কচি খুকি! মেয়ে-ঘাটে পুরুষ আসে কোথা থেকে তার হিসেব নেই? আজ এসেছে কি রোজ আসে কে জানছে? ও সব মালা ভাসানোর লীলা-খেলা কেন তাই বা কে জানে? কালামুখী তলে তলে কি কীর্তি করছে তা' ভগবানই বলতে পারেন। সোয়ামি যার বারো বছর দেশত্যাগী, তা'র পরিবারের এখনও সেমিজ কামিজ পরে পটের ছবি হয়ে বেড়াতে লজ্জা করে না! ধন্যবাদ!

নতুনগিন্নির মর্যাদা রাখিতেও হৈমন্তী সম্বন্ধে এতবড় কথাটায় স্পষ্ট অভিমত দিতে মুখে বাধে শ্যামার নতুনগিন্নি পুনশ্চ যোগ করেন, বুড়ো হয়েছি, কোমর পড়ে গেছে, চারদিকে চোখ রাখবার ক্ষ্যামতা নেই, নইলে দেখিয়ে দিতাম সবাইকে—বলিয়া হাঁপাইতে থাকেন।

ঘাটের পথ হইতে ফিরিয়া হৈমন্তী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—কাগজ এখনও দিয়ে যায়নি শ্যামা ঠাকুরঝি?

—কই না।

নতুনগিন্নি কাঠের উনানে ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে ঘরের ভিতর হইতে খনখনে গলায় বলেন—মেম সাহেবের রোজ খবরের কাগজ না পড়লে চলে না—ধন্যি বাবা, আমি হলে এতদিন গলায় কলশি বেঁধে ডুবে মরতাম, ছিঃ। ঘাটে পথে পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াবার সাহস কি অমনি আসে?

চব্বিশ ঘণ্টা কাগজ কেতাব নিয়ে থাকলেই বুকের পাটা বাড়ে।

হৈমন্তী বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া দুই দণ্ড শ্যামার মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যায়।

হৈমন্তী কবে কাহার সঙ্গে আলাপ করিল? ঘৃণায় লজ্জায় পৃথিবীর বুক হইতে নিজেকে তো প্রায় লুপ্ত করিয়াই রাখিয়াছে। শুধু একখানি খবরের কাগজের সেতু দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে এতটুকু একটু যোগসূত্র রাখা।

কীসের আশায় যে রাখিয়াছে সে কি নিজেই জানে ? বুভুক্ষুর মতো তন্ন তন্ন করিয়া সমস্তটুকু না পড়িলে তৃপ্তি হয় না কেন কে বলিবে?

কিন্তু নতুনগিন্নির মিথ্যা দোষারোপকে আর মিথ্যা বলা চলে কই? সন্ধ্যার অন্ধকার দোতলার বারান্দার এককোণে হৈমন্তী অমন থর থর করিয়া কাঁপে কেন—শ্যামা-বর্ণিত সেই "সাহেবের মতন" লোকটার সামনে দাঁড়াইয়া? অমন ভয়কাতর অস্থির ভাব কেন দুজনের?

অমন আকুল আগ্রহে সে হৈমন্তীকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল কোন সাহসে? কে সে? সমুদ্রনারায়ণ? সমুদ্র এখনও বাঁচিয়া আছে?.........

অনেকক্ষণ পরে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া হৈমন্তী কম্পিতকণ্ঠে কহিল—লুকিয়ে পালিয়ে যাব? লোকে কী বলবে?

—লোকে যা খুশি বলুক না হৈম, ক্ষতি কি? তোমাকে নিয়ে যাব আমার সেই নতুন রাজত্বে, জঙ্গল কেটে যেখানে গড়ে উঠেছে নতুন শহর, সেইখানে নতুন করে গড়ব আমাদের সংসার। সেখানে আমি সমুদ্র নয়, আমি 'মিস্টার মুখার্জ্জি'।

—নাম বদলেছ?

—বদলাব না? বারে! পুলিসের ভয়ে নিজেকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তুমি যখন চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে থেকেছ—আমি তখন প্রচণ্ড রৌদ্রে ছুটোছুটি করেছি কুলিমজুরের কাজ নিয়ে। ....

দীর্ঘকাল জাপানে আমেরিকায় কাটাইয়া অনেক ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া সমুদ্র অবশেষে কেমন করিয়া আজ একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ফরেস্ট অফিসার হইয়া বসিয়াছে—সঞ্চয় করিয়াছে প্রচুর অর্থ, তাহারই ইতিহাস শুনাইতে বসে হৈমন্তীকে। পাহাড়ের কোলে জঙ্গল ঘেঁষিয়া তাহার

বাড়িখানি, আরামের আর বিলাসের সমস্ত উপকরণ আনিয়া বোঝাই করিয়াছে হৈমন্তীর জন্য শুধু হৈমন্তীকে ঘিরিয়া তাহার এতদিনের স্বপ্ন আর সাধনা।

—একবারও তো খোঁজ নিলে না? যদি মরে যেতুম?

—কক্ষনো না, আমি নিশ্চয় জানতাম হৈম, আবার আমাদের দেখা হবে। আমার তপস্যা ব্যর্থ হবে না।

হৈমন্তীও সমুদ্রর মতন অমন সুন্দর করিয়া বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারে না, বুকের ভিতর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে পারে শুধু।

কান্না আর কথার মধ্য দিয়া রাত্রি গভীর হইতে থাকে........ শেষ রাত্রে হৈমন্তীকে লইয়া পালাইয়া যাইবে সমুদ্র, রোমাঞ্চকর সেই কল্পনায় মুখর হইয়া ওঠে সে—পরের বৌ নিয়ে পালানোয় তো নতুনত্ব নেই হৈম, তাই নিজের বৌ নিয়ে পালাব আমি! বেশ চমৎকার মৌলিক হবে না ব্যাপারটা?....... তুমি অমন কাঁদছ কেন বল তো ? কত পাহাড় জঙ্গল ডিঙ্গিয়ে, কত আগাধ সমুদ্র পার হয়ে ফিরে এলাম তোমার কাছে—সারা রাতটুকু কেঁদেই নষ্ট করবে? ..... আচ্ছা এদিকে কেউ এসে পড়বে না তো? এতদিন পরে আবার ধরা পরতে রাজি নই কিন্তু।

—কেই বা আছে? নতুন ঠাকুমা সিঁড়ি উঠতে পারেন না, শ্যামা ঠাকুরঝির ভূতের ভয়, সন্ধে হলে ঘরের বার হয় না।

—তা'হলে আজকের রাতটুকু নির্ভয়ে আশ্রয় পেতে পারি তোমার ঘরে?

ঘরে খিল লাগাইয়া সাবধানে আলো জ্বালে হৈমন্তী।

—ঘরের চেহারাটা প্রায় একই রকম রেখেছে দেখছি, কি আশ্চর্য লাগছে হৈম, সেই পালঙ্ক, সেই আয়না দেরাজ ছবি আলমারি, সেই জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তোমার মুখে, সেই তুমি প্রায় তেমনই সুন্দর রয়ে গেছ, যেন কিছুই পরিবর্তন ঘটে নি তোমার জীবনে, যেন আমি এই কিছুদিনের জন্য শুধু বিদেশ ঘুরে এলাম, অথচ কত ঝড় বয়ে গেল আমার জীবনে.....

টুকরো কথা...... টুক্‌রো হাসি....

এ ছবি কার? গুরুদেবটেব নয় তো? কি আশ্চর্য এই হতভাগার ছবিতেও মালা ঝোলে? নিলাম এটা আমি, আজ আমার পাওনা। বিশ্রী এই খাকির পোশাকে ফুলের মালা মানায় না, কি বল? .. কাপড়? ... ধুতি? ধুতি কি আমি শার্টের পকেটে নিয়ে বেড়াচ্ছি? ... তুমি দেবে? আমার জামা কাপড় তুলে রেখেছ এতকাল ধরে? হৈম...হৈম....

—তুমি কি কাউকেই দেখা দেবে না? নতুন ঠাকুমা, শ্যামা, ক্ষীরোদা—কাউকে বলব না?

— পাগল হয়েছে? বললে চাপা থাকবে না, স্টেশনে স্টেশনে হুলিয়া বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে রূপকথার রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে এসে রাতারাতি দুঃখিনী রাজকন্যাকে নিয়ে উধাও। দেখছ.... খুব বুড়ো হয়ে যাইনি কিন্তু হৈম। এত সুখ কি আমার জন্যে সত্যিই তোলা ছিল? ......

কথার শেষ নাই, রাত্রির শেষ আছে। পাণ্ডুর চাঁদের ফ্যাকাশে হলদে আলো ভোরের নতুন আলোর কাছে সহসা কোন ফাঁকে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিবে কে জানে!

হয়তো এখটু তন্দ্রা আসিয়াছিল...... তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সমুদ্র হৈমন্তীকে ডাকিয়া তোলে—

'মিসেস মুখার্জি', উঠুন উঠুন—তৈরি হয়ে নিন, চারটে চল্লিশের ট্রেন ধরতে হবে, অবাক হয়ে তাকাচ্ছ কী? মনে নেই আমি আর শ্রীল শ্রীযুক্ত সমুদ্রনারায়ণ মজুমদার নয়—মিস্টার এস্ মুখার্জি, কাজেই তুমি মিসেস মুখার্জি।..... তোমার ওই আধা ধুতির মতো বিশ্রী শাড়িটা আমার ভারি খারাপ লাগছে কিন্তু, ভালো একটা কিছু পরে নাও চট করে।

—ভালো আর কি আছে? হৈমন্তী ম্লান হাসে।

আশু বৈধব্যের জন্য প্রস্তুত হইতে চওড়াপাড় শাড়ি অনেকদিন ছাড়িয়াছে সে।

—তবে থাক, যা আছে থাক, মনের সাধ মিটিয়ে সাজাবো এর পরে। শুধু দেরি করে ফেল না লক্ষ্মী রানি আমার, সকাল হয়ে গেল, ভাবো অবস্থাটা!

হৈমন্তী শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখে.... এই তাহার চিরপরিচিত আবেষ্টন, তাহার ধ্যান, ধ্যানের দেবতা, শুচিস্মিতনির্ম্মল জীবনখানি, এই মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিয়া যাইতে হবে। শুধু মালা গাঁথিয়া ফুল ভাসাইয়া বাকি জীবনটুকু কাটানো যায় না ? সহসা সমুদ্রের এই রূঢ় পোষক পরা বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহখানা হৈমন্তীর নির্জ্জন একক শয্যায় কেমন বেমানান অশুচি লাগে।

হৈমন্তীর জীবনে সমুদ্র কি অবান্তর নয়? সত্যকার রক্তমাংসে গড়া সমুদ্র, পুরুষের দাবি লইয়া যে ডাক দিল?

ছবি লইয়াও তো দিন কাটিতেছিল মন্দ নয়।

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তীকে লোকে বলিবে কী ? শ্যামা আর ক্ষীরোদা যখন পাড়ায় পাড়ায় রটাইয়া আসিবে হৈমন্তীর নিরুদ্দেশের খবর?

—আমায় ক্ষমা করো।

কে বলিল? হৈমন্তী? সমুদ্রের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়া যে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

হতবুদ্ধি সমুদ্র শুধু প্রশ্ন করিতে পারে—যাবে না?

—আমায় ক্ষমা করো।

[১৩৫২]

আহত ফণা

দেশটা বাংলা ছাড়িয়ে অনেক দূরে।

এখানে নতুন রাস্তা বানাতে, পাহাড়ের গা কাটতে হচ্ছে। আর গরমের দুপুরে প্রায়ই দু' একটা হতভাগাকে 'লু' লেগে মরতে শোনা যাচ্ছে। খবরটা নতুন নয়। যেমন নতুন নয়, শীতকালে ওই হতভাগাদের ঘরেই দু দশটা বাচ্চার শীতে জমে নিথর হয়ে যাওয়ার খবর।

এককথায় এখানকার আবহাওয়াটাই বেমাত্রা, বাংলা দেশের ধারে কাছে লাগে না।

তবু 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' নাকি যেন বাংলা দেশের লোক পেটের ভাতের ধান্ধায় এখানেও ঠেলে এসে উঠেছে। এক আধজন নয়, বেশ কয়েকজন। তবে যার যেমন সার্কেল সে তেমন দলে ঘোরে, 'বাঙালি' খুঁজে বেড়াতে যায় না।

শুধু যাদের পদমর্যাদার কোনও বালাই নেই, তেমনি ক'জন খুদে খুদে বাঙালি জোগাড় করে একটা ছোট-খাটো দল গড়ে নিয়েছে। জরিপ আফিসের পিছনের বারান্দায় নিত্য সন্ধ্যাবেলা তারা একসঙ্গে বসে গুলতানি করে।

অবশ্য এদের দলে দুজন অবাঙালিও আছে, সুখলাল আর গিরিধারী। ওদের মাতৃভাষা নাকি হিন্দি, কিন্তু বাংলাভাষায় দখল ওদের খাঁটি বাঙালি যতীন রাসবেহারী নন্দ অমূল্য প্রভাপদ আর জীবনের চাইতে কিছু কম নয়।

সামান্য যে দেহাতী 'টান্'টা বাঙালি নয় বলে ধরিয়ে দিতে পারত, সেটাও আর পারে না, কারণ তেমন একটা 'টান্' এদের কথার মধ্যেও এসে গেছে, অনেকদিন বাংলার বাইরে থেকে থেকে।

সুখলাল আর গিরিধারী তেরো চৌদ্দ বছর বর্ধমানে কাটিয়ে প্রায় বাঙালি বনে গেছে। তাই ছিটকে এখানে এসে পড়ে বাঙালির আড্ডাটাই বেছে নিয়েছে। ওরা মাঝে মাঝে নিজের জাতভাইয়ের সম্পর্কে সব্যঙ্গে বলে, 'শালা ছাতুখোর ভূত।'

'তোর তো ভাই একদম বাঙালি বনে গেছিস।' বলে নন্দ।

ওরা হাসে, বলে 'যে চিংড়িমাছ খেয়েছে, সে শ্রেফ্ বাঙালি বনেছে। নইলে আর রোজ তোদের আড্ডায় ধর্না দিতে আসি?'

ওরা, মানে যতীন রাসবেহারী অমূল্যেরা অবশ্য অন্য কথা বলে। বলে, 'প্রাণের টানটা বাঙালির জন্যে নয়, পাখির জন্যে। .... একা পাখির টানেই এতগুলো নানান বয়সের পুরুষ একজায়গায় এসে হাজির হয়।'

পাখির বয়েস ঠিক ধরা যায় না।

পাখির পাথরে কোঁদা স্বাস্থ্য, বয়েসকে যেন কোথায় একখানে বেঁধে রেখেছে।

সেই উগ্র শরীরটা নিয়ে পাখি হেসে গড়িয়ে পড়ে ওদের কথা শুনে। বলে 'মরণ আর কি? তোদের এই এতবড় গাঁ-খানায় বুঝি আর মেয়েছেলে নেই?'

ওরাও হাসে।

বলে 'নেই! সত্যিই নেই। 'মেয়ে আছে, ছেলে আছে, 'মেয়েছেলে নেই! ... শুনিস নি সেদিন অমূল্যর দুর্দশা? ঠক্কন মালির পরিবার যখন ইঁদারা থেকে জল আনছিল অমূল্য বুঝি তাকিয়ে একটু হেসেছিল। ব্যস, জলভরা মেটে কলশিটা অমূল্যর পিঠে চৌচির হল! .... গায়ের ব্যথা মরতে অমূল্যর—'

পাখি আবার গড়ায়, 'অমূল্য ওস্তাদের সখকেও বলিহারি। ঠক্কনের বৌ আবার মেয়েমানুষ নাকি? ও তো একটা সেপাই। ওর একখানা হাতের ওজন যে তোর চাইতে বেশি রে অমূল্য।'

'কিন্তু চোখ দুটোয় মেরেছে—'

'তা আর একটু মরলি না কেন অমূল্য? ওই চোখের তির খেয়ে?' বাচাল হাসি হাসে পাখি, 'আমরা সবাই 'হরিবোল' দিয়ে তোকে সগ্‌গে পাঠিয়ে দিতাম।'

এই ওদের আড্ডা। এই কথা।

তবে এটা বেশিক্ষণ চলে না। দু'চার কথার পরই আসল আড্ডা শুরু হয়। পাখি তার তেলচিটে ছিটের থলি থেকে তাস বার করে।

তাস খেলারই আড্ডা চলে অনেক রাত্তির অবধি। সুখলাল ওদের তিন তাসের খেলা শিখিয়েছে। এ খেলার নেশা মদের নেশার চাইতে কিছু কম নয়।

রাসবেহারী জরিপ অফিসের একটু মান্য গণ্য কর্মচারী, এদের মতো রাস্তা মাপা 'খোঁটা পোঁতা' কুলি নয়। অফিসের ফাইল-টাইল খাতা-পত্তর সব রাসবেহারীর তত্ত্বাবধানে থাকে।

এই অফিস বাড়িতে আড্ডা বসাবার অধিকার রাসবেহারীরই দৌলতে, কারণ সে এখানে রাত্রে থাকে, অফিস ঘরের চাবি তার হাতে। তা প্রকৃতপক্ষে এ অফিসের 'অফিসার' রাসবেহারীই, কারণ আসল 'সাহেব' দৈনিক এক আধ ঘণ্টা মূর্তিটা দেখিয়ে যান।

বাকি সারা সময় রাসবেহারী।

পাখি রাসবেহারীর রান্নাটা করে দিয়ে যায়। বলাবাহুল্য পাখির খাওয়া-দাওয়াও এখান থেকেই চলে। রাতের দিকে মাঝে মাঝেই রান্নার মাপ দশগুণ হয়। .... ওরা সকলে চাঁদা দিয়ে 'ফিস্টি' লাগাতে আসে। দু একটা বুনো মুরগি জোগাড় হলেই 'ভোজ'।

এখানে কারুরই স্ত্রী কন্যা মা বোন নেই, তাই একটা মেয়ের হাতের রান্না পরিবেশন, হাসি কৌতুক কৃত কৃতার্থ করে তোলে এদের।

হোক সে খারাপ মেয়েমানুষ, হোক বাচাল বেহায়া জুয়ার নেশায় এবং আরও অন্য নেশায় আসক্ত, তবু তো মেয়ে। মরুভূমির শুকনো বালুর চড়ায় এক টুকরো ওয়েশিস্‌।

পাখি এদিকে যতই বাচাল বেহায়া হোক, হাতের রান্নাটা তার খুব ভালো, আর খাওয়া দাওয়ার যত্নটা আন্তরিক। কাউকে আর পর করে না সে। রাসবেহারীকেও যেমন যত্নে পরিবেশন করে, নন্দকে যতীনকেও তেমনি যত্নে পরিবেশন করে। নেহাতই যারা খিদমদগার।

শ্রেণির তারতম্য আছে, কিন্তু তাস ওদের 'এক' করেছে। তিন তাস। আর সেই একতার বাঁধন দিয়েছে পাখি।

শুধু মানি ঠক্কন ওদের এই হাসি হুল্লোড় খাওয়া মাখা দেখে রাগে জ্বলতে থাকে।

এমন কি ওপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করতেও চেষ্টা করেছিল, পাখির কথা তুলে দুর্নীতির

প্রশ্ন আমদানি করেছিল। ঠিকেদার দাসবাবু, আর জরিপবাবু হেসে উঠে বলেছিলেন, 'তোকে ভাগ দেয় না বুঝি? না জুয়ায় হেরে মরিস?'

কাজেই সে আর তার বাঘিনী বৌ এখানে এক ঘরে।

আজ আবার নাকি ঠক্কন প্রভাপদকে শাসিয়েছে, সাহেবকে বলে দেবে বলে. সেই কথা নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে পাখি হঠাৎ বলে উঠল, নতুন সাহেব তো এসে গেল।'

'ইঞ্জিনিয়ার শব্দটা যে পাখি উচ্চারণ করতে পারে না তা নয়, ওসব ওর ইয়ার্কি।

রাসবেহারী বলল, 'হ্যাঁ। দাসবাবু জরিপবাবু, অনঙ্গবাবু সবাই মিলে হন্তদন্ত হয়ে এস্টেশনে ছুটল যে সকালে।'

'খুব নাকি বড় সাহেব?'

'হ্যাঁ, বিলেত-ফের্তা। দুতিন হাজার টাকা মাইনে। আসলে ওই ধলা পাহাড়টা ফাটিয়ে সোজা নতুন রাস্তা বার করা যায় কিনা তার নক্সা করতে এসেছে।'

আবার কী ঝামেলা বাধায় দেখ! ওসব কেষ্ট-বিষ্টু যত না আসে ততই মঙ্গল, যতীন বলে।

পাখি হেসে হেসে বলে, 'তোর মঙ্গল' করবার তালেই তো ঘুরছে ভগবান ? ..... নে বোস। খালি কথা!'

তাস বিলি করতে করতে কিন্তু নিজেই আবার কথা ফাঁদে পাখি। বলে, 'সাহেবের মেমও তো এসেছে।'

'তা' আর আসবে না কেন?' প্রভাপদ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তিন হাজার টাকার সাহেব মেম আনবে না? ওরা তাবুঁতেও মেম আনে। এ কি আমরা?

ওর কথায় হেসে ওঠে সবাই।

সে হাসিতে কিন্তু কৌতুকের চাইতে ক্ষোভই প্রধান। ওরা তো দেখে আসছে চিরকাল, জগতের সমস্ত সুখ সৌভাগ্য আমোদ আহ্লাদ, ভগবান এক দিকেই ঢালে। যারা হতভাগা, তারা সব দিকেই হতভাগা।

'ভগবানের পুষ্যিপুত্তুর ওরা—' বলে নন্দ, 'দুধের সর সব ওদের ভাগে।'

পাখি স্পষ্টবাদী। পাখি ন্যায্য অন্যায্য বোঝে। তাই পাখি তীক্ষ্ম স্বরে বলে, 'থাম নন্দ, মুখ্যুর মতন কথা বলিস নে। দুধের সর ওদের পাতে পড়বে না তো কি তোর পাতে পড়বে?.... তুই দিয়েছিস ওদের মতন দশটা পাস? বিলেত জার্মানি ঘুরে এসেছিস তুই? ওদের মতন মাখন মিছরীর ঘরে জন্মেছিস?...... পূর্ব জন্মের সুকৃতি চাই বুঝলি? তার সঙ্গে ইহ জন্মের চেষ্টা চাই। শুধু ওদের হিংসে করলেই হয় না। যে যেমন গাছ পুঁতবে সে তেমন ফল খাবে।'

'পাখির কেবল সাহেবদের দিকে ঝোল টেনে কথা—অসন্তুষ্ট নন্দ বলে, দে এক তাস।'

কিন্তু নন্দকে যতই হক্ কথা শোনাক, পাখির শরীরেই কি ঈর্ষা একেবারে নেই? না থাকলে সাহেবের মেমের প্রসঙ্গই তোলে কেন ঘুরে ফিরে?

'সাহেবের মেম, বুঝলি অমূল্য, একেবারে পাকাটির গোছা শুধু হাড় আছে, আর কিছু নেই।'

অমূল্য একটা কুৎসিত ইঙ্গিতের মুখভঙ্গি করে বলে, 'তবে আর কি, তোর তো পোয়া বারো।'

'থাম অমূল্য, ছোটলোকামি করিস না। .... খেলবি তো খেল।'

'আমার তো সবই ছোটলোকামি। বলি সরকার সাহেবের ব্যাপারটা তো এক্ষুনি তুলি নি রে?

'সে কথা বাদ দে। সেটাও একটা ছোটলোক। যাবার সময় আমার পাওনা টাকা বাকি রেখে চলে গেল।'

'তুইও তাকে তেমনি কম অপমান করিস নি? এস্টেশনে গিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছিলি। নেহাৎ ট্রেন ছেড়ে দিল, তাই বাছাধন মুখ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল।'

'এ সাহেব অন্য রকম।'

বলল পাখি।

'এত সব এক্ষুনি দেখলি কখন তুই?' রাসবেহারী বলে, 'সেই তো একবার মাত্তর সাহেবের কোয়ার্টার ঝাড়ামোছা করে দিয়ে আসতে গেলি।'

'ওই একবারেই হয়'—পাখি মুচকি হেসে বলে, 'হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই বোঝা যায় সেদ্ধ হয়েছে কিনা।'

রাসবেহারী মুচকি হেসে বলে, 'তোর আগুনে সবাই সেদ্ধ হয়ে যায় শেষ অবধি।'

পাখি একটু মদগর্বের হাসি হাসে।......

এই ভাবেই কথা কয় ওরা।

উঁচু বলে যাদের মানতেই হয়, 'বড়' বলে স্বীকার না করে উপায় নেই যাদের, তাদের প্রতি আক্রোশটা এরা এইভাবেই মেটায়। নিজের এলাকায় বসে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে।

শুধু এরা বলেই নয়, সব ছোটরাই এ কাজ করে আসছে আদি অনন্তকাল। আড়ালে রাজার মাকে 'ডান' বলার প্রথা তো এ যুগে সৃষ্টি হয় নি।

পরদিন কথাটা রাসবেহারীই তুলল।

বলল, 'মুখুজ্যে সাহেবের বাংলোয় লোক চাই। মেয়েছেলে। মেমসাহেবের শরীর ভালো নয়, সর্বদা কাছে কাছে একটা মানুষ দরকার।..... তোকে কাল এক নজর দেখেই মেমসাহেরে খুব মনে ধরে গেছে রে পাখি, ডেকে পাঠিয়েছে!

বলে ভুরু নাচায় রাসবেহারী।

প্রভাপদ কুটিল দৃষ্টি হেনে বলে, 'মনটা ধরেছে কার গো রাসুদা? মেমসাহেবের, না খোদ সাহেবের?'

'তা দু'জনারই। সাহেবই তো আমায় ডেকে বলল, 'কাল যে মেয়েটি কাজ করে গেল, তাকে পাওয়া যাবে না?' ..... তা আমিও তোর দর বাড়ালাম বুঝলি পাখি,

বললাম, 'ও হুজুর একটু খামখেয়ালি। বাঁধাধরা কাজ বড় করে না। করলেও মাইনের খাঁই বেশি।'

'তা কী বলল?'

'বলল, মাইনের জন্যে কিছু এসে যাবে না। যা চাইবে পাবে।'

'তাহলেই বোঝা গেছে' বলে অভব্য হাসি হাসতে থাকে সবাই মিলে।

তাহলে কালই তোর জয়েনিং ডেট—হেসে ওঠে রাসবেহারী। তারপর বলে, দেখিস ভাই, আমাদের যেন একেবারে বিস্মৃত হোস নি। তোর হাতের দুটো ভালো মন্দ খেয়েই তবু দেহটাকে টিকিয়ে রেখেছি।'

পাখি মৃদু হেসে বলে, 'রান্না হবে।'

'হবে ? কখন আর হবে? বড় মানুষের বাড়ির মোটা মাইনের ঝি হবি এখন, চব্বিশ ঘণ্টার বাঁদী—'

'ইস রে! চব্বিশ ঘণ্টার বাঁদী! এমন কাজ পাখি করে না। বলব সন্ধের পর ছুটি দিয়ে দিতে হবে আমায়। নইলে কাজ করা চলবে না।'

'শুনবে? মাইনের ডাঁট দেখাবে না?'

'দেখলে করব না। .... দেখি মেমসাহেব এই পাখির মতন আয়া আর একটা কোথায় পায়।'

এ অহংকার অবিশ্যি পাখির সাজে। এখানে যখন যে হোমরা-চোমরা আসেন, তাঁর বাড়ির কাজের জন্য ঠিক পাখির কাছে অনুরোধ আসে। আসল কথা বাঙালি ঝি দেখলেই মেমসাহেবদের মুখ দিয়ে নাল ঝরে।

অবাঙালি মেমসাহেবদেরও ঝরে।

বাঙালি ঝিয়ের পরিচ্ছন্নতা বোধ, পরিপাটি কাজ, অনেকেরই আকর্ষণীয়।

'তাহলে তাসের আড্ডাটা জলাঞ্জলি যাচ্ছে না, কি বলিস?

সুখলাল হৃষ্টচিত্তে বিড়ির বান্ডিল বার করে।

'আমার রান্নাঘরটাই জাহান্নমে যাবে', বলে রাসবেহারী। 'সন্ধেবেলা চলে আসব, আবার রাধতে আসব, এত আবদার খাটে না।'

'দেখিস? পাখি একটু বিজয় গৌরবের হাসি হেসে বলে, খাটে কিনা? বলব, 'বাড়িতে বুড়ো জ্যোঠা আছে, তাকে দুটো ভাত সেদ্ধ করে না দিয়ে এলে, মরে থাকবে বুড়ো!'

'জ্যাঠা, হি হি হি জ্যাঠা!'

একযোগে হাসতে থাকে ওরা।

তা পাখির চালাকি ব্যর্থ হয় না।

মেমসাহেবকে বলেন, দেখ, ও বলছে, বাড়িতে বুড়ো থুড়থুড়ো জ্যাঠা আছে, তাকে দুটি রেঁধে দিয়ে না এলে বেচারা খেতেই পাবে না। এগারোটা বারোটা নাগাদ একবার এক ঘণ্টার জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। কী করি বলো তো?'

সাহেব সহাস্যে বলেন, বেশ প্রশ্ন করেছ! এটা কি আমার জুরিসডিকশান?'

আহা তা তোমাকে একটু জিজ্ঞেস করব তো? চল্লিশ টাকা করে মাইনে নেবে, সন্ধ্যায় আটটা বাজলেই চলে যাবে, আবার দুপুরেও ; তুমি হয়তো বলবে আমি অন্যায় আশকারা দিচ্ছি!

সাহেব গলার স্বর নামিয়ে বলেন, 'তা ও অপবাদ তো তোমার আছেই। একমাত্র আমি বাদে, সকলেই তো তোমার কাছে আশকারা পায়। আয়া, বেয়ারা, ধোবা, গোয়ালা, জমাদার, মালি—'

'হয়েছে থামো। আর লিস্ট বাড়াতে হবে না। তবে আমি বলছি, ও সময়—আর কি বা এত কাজ আমার? বুড়ো লোকটা খেতে পাবে না? মানবিকতায় বাধছে।' 'বেশ তো তোমার অসুবিধে না হয়, দেবে ছুটি—' সাহেব বলেন, তবে কাজটাজ করিয়ে নিও তার আছে। ফাঁকির তাল খোঁজে না যেন।' টাই আঁটিতে আঁটতে সাহেব আর একটা কথাও বলেন, রান্নার কথা বলছে—তা তোমার রান্না ঘরেও এক আধবার প্রবেশাধিকার দিয়ে দেখো না? যতই হোক বাঙালির মেয়ে তো? বাঙালি রান্না কিছু জানেই। সেই বস্তুটি খাবার জন্যে তোমাকে তাহলে আর 'ওই বাবাজী'র সহকারী হতে হয় না।'

মেমসাহেবের মুখে একটি হাস্যজ্যোতি ফোটে। বলেন, 'সে যদি বললে, হয়ে গেছে সে কথা—'

'হয়ে গেছে ? বাঃ বাঃ চমৎকার।' সাহেবের প্রসন্নকণ্ঠের দরাজ হাসি সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে।

'তোমার কেবল হাসি। আমি কি নিজে থেকে বলেছি? পাখি নিজেই বলল—'

'কে? কী নাম বললে?

'পাখি। ওই ওর নাম', মেমসাহেব বলেন, 'আমিও নাম শুনে আশ্চর্য হয়েছিলাম। বলেছিলাম 'পাখি পাখি' বলে ডাকতে অসুবিধে, ভালো নাম কিছু নেই? বলল, কী জান? হেসে ওঠেন মেমসাহেব, বেশ কথা বলে। বললো, একটা নামই জোটে না মেমসাহেব তা দুটো-পাঁচটা—। নাম আবার দিচ্ছে কে? মা বাপ মরা মেয়ে, নিত্যিভুগতাম, রোগা টিংটিঙে পাখির মতন ছিলাম। দিদিমা 'পাখি পাখি' করত, সেইটুকুই নাম।'

সাহেব হেসে বলেন, 'পাখির মতো ছিলে? তাহলে এদেশের জলহাওয়ার গুণ আছে কি বল?'

মেমসাহেব শীর্ণ মুখে হাসেন।

অবিশ্বাসের হাসি।

জলহাওয়ার গুণে তাঁর বিশ্বাস নেই। এই তো আট নয় বছর বিয়ে হয়েছে স্বামীর সঙ্গে ঘুরছেনও তদবধি। ভালো ভালো জায়গাতেই গিয়েছেন। 'চেঞ্জ' লাগাবার জন্যে পয়সা খরচ করেও গেছেন দু'চার জায়গায়, কই? হাড়ে মাংস লাগল কই?

ছোটলোকেদের হয়।

মোটা চালের ভাত খেয়ে আর খেটেখুটে হয়। কিন্তু ও দুটোর একটাও তো তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়? অথচ স্বাস্থ্য জিনিসটা কী সুন্দর!

নইলে আর পাখি যখন আজ ইঁদারা থেকে জল তুলছিল, তখন মেমসাহেব মুগ্ধনেত্রে তার গঠনভঙ্গিমার দিকে তাকিয়ে থাকেন? ভাবেন ছেলেবেলায় রুগ্ন ছিল বলে, এর নাম 'পাখি' ছিল?

সাহেব অনেকক্ষণ সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে সহসা বলেন, 'তা' কই, তোমার সেই বাঙালি-রান্নার কথাটা কী হল? মাঝপথেই থেকে গেল যে!'

'ও হো হো হো!' মেমসাহেব খিলখিলিয়ে হাসতে থাকেন, আমার ঠাকুমা বলতেন চোরের মতো ভাঙা বেড়ায়! এত নতুন নতুন সব রান্না বই পড়ে শিখে খাওয়াই তোমায়, তবু সেই সুক্ত চচ্চড়ির দিকে মন।'

'ওই তো! ঠাকুরমার হাতে খেয়ে মানুষ যে! জানো বিলেতে থাকতে মনে হত পার্সেল করে কেউ যদি পোস্তচচ্চড়ি পাঠিয়ে দিত!'

'তার মানে সাহেব হওয়া আর তোমার হয় নি?'

'কই আর হল? তোমার বাসনা অপূর্ণই রয়ে গেল!'

'তা সত্যিই তো। মেমসাহেব' শুধু নামেই। তাই পাখি যখন বলল, আগে এখানে যে গাঙ্গুলীসাহেব না কে ছিলেন। তাঁরা ওর হাতের রান্না খেয়ে মোহিত হয়ে আয়ার কাজ ছাড়িয়ে রান্নার কাজেই লাগিয়েছিলেন, তখন পতিব্রতা সতীর হৃদয় নিয়ে বলতেই হল, তোমার এ সাহেবও বাঙালি রান্না খুব পছন্দ করেন। তুমি যদি আর কিছু বেশি নিয়ে—তা লোকটা ভালো। জিভটিভ কেটে বলল, 'সে কি? সাহেব যদি আমার হাতের রান্না পছন্দ করে খান, সে তো আমার ভাগ্যি।'

'বললি এই কথা?'

অমূল্য মেয়েদের মতো গালে হাত দেয়।

পাখি কোল থেকে তাস বার করতে করতে মুখটিপে হেসে বলে, 'বলো না কেন?'

'তুই যা সর্বনেশে মেয়ে, ওই হাতের রান্না খাইয়ে এমন বশ করে নিবি যে—'

কথাটা আর কথায় শেষ করে না অমূল্য বিশ্রী একটা হাসি দিয়ে শেষ করে। তার পর বলে, 'সে যাক! সাহেববাড়ির গল্পগাছা একটু কর শুনি।'

পাখি চালের ওপর বলে, 'গল্প আবার কী? মাইনে নেব কাজ করব, ফুরিয়ে গেল সম্পর্ক !'

'আহা লো! অমূল্য আবার মেয়েলি ভঙ্গি করে, 'পাখি আমাদের ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। তবু যদি না—'

'থাম তুই অমূল্য, পুরোনো কথা রাখ', নন্দ বলে, "সাহেবের চেহারাখানা কিন্তু সত্যি সাহেবের মতন!..... সকালে বেড়াতে বেরিয়েছিল দুজনে, সাহেবের পাশে মেমকে যেন 'হসন্ত'র মতন লাগছিল। ফর্সা অবিশ্যি, কিন্তু দেহে আছে কি? আর সাহেবের যেমনি লম্বা চওড়া শরীর, তেমনি মুখ, তেমনি রং। বিধাতা পুরুষ গড়েছিল ভালো। একটা পুরুষ বেটাছেলে বটে!'

'ওই আহ্লাদেই থাক', পাখি হেসে ওঠে বেহায়ার মতো, 'ওই খোলসটাই আছে। বুঝলি? হালচাল দেখলে অছেদ্দা আসবে। ...... ইঞ্জিন সাহেব পানিকরের বাড়িতে যখন কাজ করেছি, দিনে রাতে সাহেবমেমের লীলাখেলা দেখতে দেখতে—হি হি! আর আমার এই মুখুজে সাহেব? ...... বিকেলে বাড়ি ফিরে দুজনে মুখোমুখি বসে একটু চা খেলেন, ব্যস। তারপর সাহেব একখানা বই নিয়ে লম্বা হলেন, মেমসাহেব পশম আর বোনা কাঠি নিয়ে বসলেন, টুঁ শব্দ নেই ঘরে—'

এত পশম কী হয়?

'ওই যে যুদ্ধুর জন্যে নাকি। ..... বাবুলাল বলে, ওই চলে, রাত নটা অবধি। তারপর সাহেব ডাক দেয় 'বাবুলাল।' মেমসাহেব বলে 'টেবিল লাগাও।'..... খাওয়ার পর—বললে বিশ্বাস করবি—'হেসে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে পাখি, খাওয়ার পর সাহেব বলে, 'আচ্ছাগুড্‌নাইট।'.... মেমসাহেব বলে 'আচ্ছা।' তারপর দু'জনে দু'ঘরে শুয়ে পড়ে।'

দু'ঘরে।

পাখির পরিবেশিত শব্দে যেন বজ্রপাত হয় জায়গাটায়।

'বলিল কী পাখি?'

'তবে আর বলি কি? মেমসাহেবের নাকি 'হেল্‌থো' খারাপ, ঘুমের দরকার। .... তাই তো বলছি রে ওসব মাটির সেপাই।'

প্রভাপদ কুটিল চোখে চেয়ে বলে, 'তা' সাহেবেরও তো হেল্‌থো' ভালো রাখা দরকার—'

'থাম! মুখ খারাপ করিস না প্রভাপদ।'

'নাঃ। তোর আজকাল বড় মেজাজ হয়েছে পাখি।'

'হবে না? আজ মাসভোর কাজ করছে, কেবলই মেমসাহেবের নেক্‌নজরের গপ্‌পো করতে হচ্ছে বেচারিকে। .... মেমসাহেব শাড়ি দিয়েছে, মেমসাহেব বেলাউস দিয়েছে, মেমসাহেব বখশিশ দিয়েছে।—দুর দুর।'.....

পাখি হঠাৎ গুম্ হয়ে যায়।

পাখির আত্মমর্যাদায় যেন আঘাত ল্যাগে। পাখি যদি চেষ্টা করে এদের মুখের মতো জবাব দিতে পারে না? বাঘের বাচ্চা শুধু দুধ খেয়ে খেয়েই মানুষ হচ্ছে, মাংসের আস্বাদ জানে না। একবার জানালে—

'পাখি রাগ করিল?'

পাখি গম্ভীরভাবে বলে, রাগ আবার কীসের? মাটির গৌরাঙ্গ, তাই তাকিয়ে দেখি না। কিন্তু পাখি যদি চেষ্টায় লাগে—'

'তাহলে মৃত্তিকেয় প্রাণ সঞ্চার হয়, কি বলিস?'

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে কুটি কুটি হয় নন্দ।

ওদের ঘরের কথা, এরা নিয়ে আসে।

এদের ঘরের আলোচনা ওদের ঘরে পৌঁছায় না।

তাই মেমসাহেব মাঝে মাঝেই সাহেবের কাছে এসে 'পাখি' নামক পরম সম্পদটির গুণ বর্ণনা করে যান। ..... 'এমন আয়া নাকি তিনি জীবনে দেখেন নি। এদেশ থেকে যদি বদলি হয়ে যেতে হয়, তাহলে 'পাখি' হারানোর লোকসানে অশ্রুবর্ষণ করতে বাধ্য হবেন।'....... এমন কি এক এক সময় এমন কুবাসনাও ব্যক্ত করেন, পাখির ওই জ্যাঠা না কে যেন একটা আছে, বুড়োটার নাকি আশি নব্বুই বছর বয়েস, অতএব সে তো একটু অবিবেচনা করে মরতেও পারে? তিনি তাহলে পাখিকে আরও বেশি মাইনে দিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে যান।

সাহেব তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে হা হা করে হেসে ওঠেন, 'বল তো বুড়োকে গুলি করে আসি। তুমি নিষ্কণ্টকে—'

'এই চুপ। এসব ঠাট্টা শুনতে পেলে ভয় পাবে বেচারি। বাপ নেই, জ্যাঠা অন্ত প্রাণ! কিন্তু যাই বলো, মোচা রাঁধতে পারে আবার কেক্ পুডিং বানাতে পারে, এমন আয়া তুমি পাবে কোথাও? আবার দেখো কী মায়া মমতা! এই আমার একটু সর্দি হয়েছে, কত ব্যস্ত! মেমসাহব আদার চা খান, মেমসাহেব 'ফুটবাথ' নিন, মেমসাহেব নুনজলের কুল্লি করুন। জানেও ঢের!'

মুখার্জি সাহেব কিন্তু পাখির গুণকীর্তনে আর কর্ণপাত করলেন না। ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'সর্দি হয়েছে তোমার, বলছ না তো?'

'ঘটা করে বলবার মতো কিছু হয় নি।'

'হতে কতক্ষণ? তোমার তো সর্দি হলেই জ্বর। টেম্পারেচারটা নাও দিকি!'

'তারপর বুঝলি?'

পাখি সেই তার বাচাল হাসি হেসে হেসে বলে, 'তক্ষুনি জ্বর দেখা হল, তক্ষুনি ডাক্তারের কাছে খবর গেল, বুকে তেল মালিশ, পাঁজরে ফ্লানেল—'

'রুগ্ন বুঝি?'

ওই কবে যেন নিমোনিয়া হয়েছিল। তাই সাহেব আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখলেই বাড়িতে জল ঢালে।..... তা রোগকে অত আদর করলে আর রোগ চেপে বসবে না? আজ তো সকালে বেশ পষ্ট জ্বর।... সাহেব কাঁদো কাঁদো, পাখি তুমি তোমার জ্যাঠমশাইয়ের জন্যে এখান থেকেই ভাত নিয়ে যাও না? দিয়েই চলে আসবে।

দেখছ তো মেমসাহেবের অসুখ—'

রাসবেহারী কৌতুকের হাসি হেসে বলে, 'তা রাজি হয়ে গেলি না কেন? দু'দিন নয় সাহেববাড়ির ভালোমন্দ দুটো খেয়ে বাঁচতাম।'

'থাম! এক কথায় রাজি হবার মতন হ্যাংলা পাখি নয়। বললাম, সেকেলে লোক তো, রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসা ভাত খাবে না!'

'মাইরি পাখি, বলিহারি দিই তোকে। কথা এত জোগায় কী করে রে?'

পাখি একটা বিচিত্র মুখভঙ্গি করে বলে, 'কথা বেচেই তো খাচ্ছি।'

'তা' যা বাপু তাড়াতাড়ি যা! নিরেনব্বুই জ্বরে মেমসাহেব না আবার হার্টফেল করে। ..... তা সাহেব কাজে বেরোবে, না বাড়ি বসে থাকবে?

'কাজে আর বেরিয়েছে। এখন থেকেই তো চোখ ছলছল।'

'বয়স কত রে?'

'কার?'

'সাহেবের?'

'এই আটতিরিশ ছত্তিরিশ হবে।'

'ধন্যি বাবা!' অমূল্য সেই তার মেয়েলি ভঙ্গিতে বলে, 'মরে মেয়েমানুয হব, বড়মানুযের পরিবার হব।'

পাখি ধমকে ওঠে। 'থাম অমূল্য। মরে তুই কী হবি, সে যেন তার ইচ্ছে সাপিক্ষে। মরে কেঁচো কেন্নো গুবরে পোকা হবি কিনা তাই বা কে বলতে পারে? তবে হ্যাঁ, বলেছিস বটে ঠিক! বড় মানুযের পরিবার হল পৃথিবীর সেরা জীব। দেখি আর অবাক হই। কিছু দেয় না, শুধু নেয়, তবু আদর, তবু দাপট!'

পাখি রাসবেহারীর ভাত বেড়ে রেখে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বলে, 'আজ আর বোধহয় ওবেলা আসা হবে না। সাহেবের যা ব্যস্ততা—'

মেমসাহেবের জ্বর, তুই রাতে ফিরবি না—প্রভাপদ কটু গলায় বলে, 'তবে তো আজই অর্ধেক কাজ গোছানো হয়ে যাবে—'

'এই ছোটলোকটাকে তোরা কেউ একখানা ই'ট মার নারে। মা বসুন্ধরার ভার লাঘব হোক— বলে হাসতে হাসতে ভাওতে চলে যায় পাখি।

কিন্তু সাহববাড়িতে পাখির অন্য মূর্তি।

মূর্তিমতী সেবার আর নতমুখী বিষাদের প্রতিমা হয়ে মেমসাহেবের রোগশয্যার পাশে বসে আছে সে।

বার বার সাহেবের কাছে গিয়ে গিয়ে যে ওষুধের এবং পথ্যের নির্দেশ নিচ্ছে, সেও শান্ত নম্রমুখে।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন সাহেব মেয়েটার দিকে। ভাবছেন মেমসাহেব যে এত গুণমুগ্ধ তার কারণ আছে।

'সাহেব আপনি ঘুমোতে যান—' বিছানা থেকে নেমে এসে সাহেবের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে অনুরোধ জানায় পাখি, মেমসাহেব এখন একটু ঘুমিয়েছেন, আমি আছি—'

সাহেব নিদ্রাতুরা শয্যাশায়িনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে তেমনি আস্তে বলেন, 'তা তোমারও তো ঘুম-টুম—'

'আমাদের আবার ঘুম! কী যে বলেন। এখন মেমসাহেব যাতে আরাম পান—আর আপনাদের হল দামি শরীর, ঘুম না হলে—'

'আচ্ছা—' সাহেব আর একবার স্নেহকোমল দৃষ্টিতে নিদ্রিতাকে দেখে নিয়ে বলেন, 'যাচ্ছি। কিন্তু জেগে উঠে উনি যদি খোঁজেন, আমাকে ডেকে দিও। বাইরে থেকে দরজায় একটু শব্দ করলেই—'

'ওস্তাদ! হেসে কুটি কুটি হয় অমূল্য। 'তারপর? দিলি তো টোকা?'

পাখি গম্ভীর মুখে বলে, 'দিলাম বই কী! গিন্নি যে জেগে উঠেই 'সাহেবকেই সাহেব কই করে আনচান করলেন।'

'যাচ্চলে—জেগে উঠল। তবে আর কি হল ছাই!'

'তুই থাম অমূল্য।'

তুই তো চিরকাল আমায় থামিয়েই রাখলি পাখি! কিন্তু বলি , এবারে হেরে যাচ্ছিস যে?'

'হারি নি। চেষ্টা করছি না!'

'কেন বল তো?'

'কী জানি।'

'না, বাবা, তুই যেন রহস্য হয়ে উঠছিস! তা ডাকার পর কী হল তাই বল ?

'কি আবার হল! জেগেই বোধহয় ছিল! তক্ষুনি ঘরে আলো জ্বলে উঠল।...... সঙ্গে সঙ্গে রাতে পরবার আলখেল্লাটা জড়াতে জড়াতে বেরিয়ে এল। ..... বলল, 'কী হয়েছে? জ্বর বেড়েছে? ..... ছটফট্ করছেন? ... খুঁজছেন আমায় ? ছুটে চলে গেল।

'জ্বর খুব বেশি বুঝি ?

'বেশি বললে বেশি।, একশো এক!'

একশো এক!

'ফুঃ! এই নিয়েই এত মহমারী?'

'হবে না কেন? রাজার নন্দিনী প্যারী যে—'

· 'তা' আসল কথাটা বলো পাখি', প্রভাপদ তেতো গলায় বলে, 'যাবার সময় একটু ধাক্কা লাগিয়ে গেল বোধ হয়?'

'গেল! পাখি নিস্পৃহ গলায় বলে, ইঁট পাথরকে যেমন ধাক্কা দেয় লোকে—'

'ইস! তোর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে পাখি!'

'ওর জন্যে নয়, ওর বুদ্ধির জন্যে। তোর জয় যে, আমাদেরও জয় রে পাখি। বাইরে সাহেবরা আমাদের চাবকায়, আর ভেতরে তুই সেই সাহেবদের নাকে ঝামা ঘষিস, এটা ভাবতে কত ফুর্তি লাগে?'.......

'না না পাখি, তুই এমন গুব্‌লেট্ হয়ে যাস নে। ... অন্তত একবারের জন্যেও মেমসাহেবের দর্পচূর্ণ কর। ভেবেছিলাম ওই পাকাটির পুতুলকে তুই বুঝি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিবি। তা—'

'মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নে যতীন, কাল রাতভোর জেগে শরীর খারাপ লাগছে, ঘুমোব।'

'তাসখেলা হবে না?'

'তোরা খেল না।' বলে পাখি উঠে পড়ে।

এই জরিপ অফিসের পিছনেই একখানা খড়ের চালা আছে পাখির। জমিটা বেওয়ারিশ, ঘরটা রাসবেহারীর খরচায় তোলা।

পাখি চলে গেলে, এরা বলে, 'পাখির কি হল বল দেখি?'

'গঙ্গাজলী, সাহেব দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আশ্চর্য। পানিকর সাহেবের বিত্তান্ত ভাব? মেমসাহেবের সঙ্গে অত গলাগলি, অত বাড়াবাড়ি, তিনদিনের জন্যে মেমসাহেব পা মুচকে হাসপাতালে গেল সেই অবকাশেই সাহেব মচকাল।

'আহা যেতে দেনা আরও দুদিন! মুখুজ্যে মেমসাহেব খুব ঘু ঘু বুঝছিস না? নিজেই পাখিকে তোয়াজ করছে—'

'আরে বাবা! রেখে দাও। আমি বলছি মেমসাহব খাল কেটে কুমির আনছে। রাবণ রাজার মতন নিজের মিত্যুবাণ যত্ন করে তুলে রাখছে। পাখিকে চিনতে বাকি আছে তার।'

নিজের ভবিষ্যৎ বাণীতে পুলকিত গিরিধারী তাস বিলোতে শুরু করে।

কিন্তু হয়তো ওই ইতর লোকগুলোর কথাই সত্যি। হয়তো পাখিকে চেনা, মিসেস মুখার্জির মতো সভ্য ভদ্র সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের পক্ষে অসম্ভব নয়।

কিন্তু পাখি?

নিজেকেই কি নিজে চেনে সে?

এই তো যে জীবনে যে অভ্যস্ত, সে জীবনকে হঠাৎ এমন ঘৃণ্য মনে হচ্ছে কেন তার ? ..... এই তার বরাবরের সঙ্গীগুলোকে এমন নিকৃষ্ট মনে হচ্ছে কেন?

অথচ নিজের অক্ষমতাও যেন অপমানকর। ..... ওরা তাহলে ভাবছে পাখি বুড়িয়ে গেছে। পাখি গুটিয়ে যাচ্ছে। পাখির এখন থেকে পরিচয় শুধু সাহেব বাড়ির চল্লিশ টাকা মাইনের

আয়া? যাকে মেমসাহেবের ছাড়া শাড়ি কাচতে হয়, জুতোয় বুরুশ দিতে হয়, উঠতে বসতে ফরমাশ খাটতে হয়।....

আর কোনো মূর্তিতে ঝলসে উঠবে না পাখি? ঝলসে উঠতে পারবে না? ..... ওই তার আড্ডায় এসে হেসে গড়িয়ে পড়ে বলতে পারবে না, 'সব কাঠই ঘুণে ধরা, বুঝলি? টোকা মারলেই ধরা পড়ে।'

পাখি জানে না মুখার্জি সাহেব ঘুণে ধরা কাঠ কিনা। পাখি নিজেই দেখে নি টোকা মেরে।

কিন্তু কেন?

নিজের সেই খোড়ো ঘরে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ভাবল পাখি। ওদের কাছে যে বলে এল ঘুমোতে যাই, সে-কথা আর মনে থাকল না। তার বদলে অনেক ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল ওর।..... যখন দিদিমার কাছে থাকত, তখনকার কথা। দিদিমা কিন্তু মা-মরা নাতনি বলে রেয়াৎ করত না, রোগা বলে মায়া করত না, খাটিয়ে খাটিয়ে মারত। ...... একটু বয়েস হতেই বিয়ে দিয়ে দিল পাড়ার একটা বুড়োর সঙ্গে। হাড়-ঠকঠকে বুড়ো। আর সেই সময় জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল পাখির।......

ওর এক মাসতুতো বড় বোন, অনেক বড়, ওর গালে টোকা মেরে বলল, তুই যেমন হাবা, তাই ওই তিনকেলে বুড়োকে বিয়ে করলি, আমি হলে পালিয়ে যেতাম। দিদিমা বুড়ি কেন ওটার সঙ্গে তোকে জুড়ে দিল জানিস? বুড়ো নড়নড়ে, কদিনই বা বাঁচবে? দু'দিন বাদেই বিধবা হয়ে তুই আবার ঘরের মাল ঘরে ফিরে আসবি, দিদিমার রান্না করবি জীবনভোর। উপরি লাভ বুড়োর বারো বিঘে ধানজমি।

ছেলেপিলে তো নেই বুড়োর।'

পৃথিবীকে সেদিন চিনল পাখি।

চেনাল সেই মাসতুতো দিদি।

তা পরে ভবিষ্যতে আরো চিনিয়েছে সে। ওই দিদিই তার গুরু। হ্যাঁ গুরু বই আর কি? জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে যে চোখ ফোটায়, সেই তো গুরু।

দিদি তা ফুটিয়েছে।

দিদিমা মারা যেতে বিধবা পাখি যখন অসহায় হয়ে চারিদিক অন্ধকার দেখছে, তখন মাসতুতো দিদি এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে চোখের জল ফেলে বলল 'এই রূপ, এই বয়েস গাঁয়ে থাকলে কি আর তোকে রাখবে পাখি? বাঘে ভালুকে ছিঁড়ে খাবে। আমার কাছে চল তুই।'

দিদির মুখে ভগবানের ছায়া দেখল পাখি। দিদি পাখির বারো বিঘে ধানজমির ভার লাঘব করে দিয়ে, তার বদলে হালকা কখানা ছাপা কাগজ আঁচলে বেঁধে পাখির হাত ধরে বার করে নিয়ে এল তার চিরদিনের গ্রাম থেকে।

তার পর?

তারপর দিদি পৃথিবীকে ভালো করে চেনানোর ভার নিল। পাখির ধানজমির মতো, পাখির রূপ আর বয়েসের বিনিময়ে গোছা গোছা কাগজ আঁচলে বাঁধতে লাগল দিদি।

কিন্তু জ্ঞানাঞ্জন শলাকার কাজও তো হচ্ছে ততদিনে?

চোখ-ফোটা পাখি একদিন দিদির বাসা থেকে উড়ে পালাল। তার পর কত আকাশে পাক খেল, কত গাছে বাসা বাঁধল, কত খাঁচায় ছোলা চিবোল, হিসেব নেই। এখানে এসেছিল ইলেকট্রিক মিস্ত্রি শশীভূষণের সঙ্গে। বেচারি শশীভূষণ মারা গেল এখানেই। পাখি কাঁদল। কিন্তু শশীভূষণের দলের লোকদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে তখন। .... এই এরা যতীন প্রভাপদ সুখলাল গিরিধারী।

আধ ডজনের ওপর লোক শোকার্ত পাখিকে স্নেহবন্ধনে ঘিরে ধরল।

অলিখিত আইনে সবাই জানে পাখি এখন রাসবেহারীর সম্পত্তি...তবে হাসিঠাট্টা হৈ-হুল্লোহে জীবনটা সরস করে নিতে দোষ কি? রাসবেহারী তাতে বাধাও দেয় না।

আর ওই 'সাহেবগুলো এলে?

এ যেন ওদের একটা খেলা।

ওদের দলের।

'সব কাঠই যে ঘুণধরা' এটা প্রমাণ হলেই যেন তাদের কোথায় একটা জয়।

পাখির ভার প্রমাণ করার।

কিন্তু এবার পাখি হেরে যাচ্ছে।

আশ্চর্য। প্রমাণ করবার চেষ্টা না করেই হার মানছে পাখি। তা তাই কি মানবে সত্যি সত্যি?

এরা বলে 'কি রে পাখি, মনিবগিন্নির জ্বর ছাড়ল?'

পাখি বলে 'ঘাম দিয়ে।'

'তা গিন্নির এত সেবা করলি, সাহেব কিছু বখশিশ করল না?'

পাখি এক বিচিত্র মুখভঙ্গি করে বলে, 'করবে বলেছে।'

'কবে?'

'সময় আসুক।'

এরা আড়ালে বলে, নবডঙ্কা। ওই তো মেমসাহেব দশটা টাকা দিয়েছে।'

'ঘোড়েল। মেমসাহেবটা ঘোড়েল।'

পাখি এ সব শুনতে পায় না অবশ্য। তবু মেমসাহেবের হাত থেকে বখশিশ নিতে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ওর। মেমসাহেবদের বিরক্তিই উৎপাদন করে এসেছে সে এযাৎ, চক্ষুশূল হয়েছে তাদের আর আড়ালে সাহেবের কাছে হেসে গড়িয়ে বখশিশ আদায় করেছে।

কিন্তু এই মুখার্জি মেমসাহেব এমন অবলীলায় দেন যে 'না' করা যায় না। আর মুখার্জি সাহেব? তিনি যে কী তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারল না পাখি। এদিকে তো অন্য সাহেবদের চেয়ে শতগুণ সপ্রতিভ। তারা বরং সামনে অত ডাকাডাকি কথাবার্তা কইত না, এর সর্বদা ডাক 'পাখি পাখি পাখি!'

'পাখি তোমার মেমসাহেবকে বিকেলবেলা ফুড্ দিয়েছ? ...... পাখি তোমার মেমসাহেবের গা মুছিয়ে দিয়েছ।' এসব কথাও যেমন বলেছে, তেমনি আজেবাজে কথাও তো ঢের কয়।

'পাখি তোমায় এমন রান্না কে শেখাল বলো দিকি? ..... পাখি আজ আমাদের কী খাওয়াচ্ছ? ..... পাখি খরগোসের মাংস খেয়েছ কখনও?'......

কথা তো চলছেই।

আশ্চর্য, এই হরদম ডাকাডাকিতে মেমসাহেবের গোঁসা নেই।.....

এইখানটায় পাখি যেন ধাঁধায় থাকে।

চিরদিনের জানা অঙ্কের পদ্ধতিতে হিসেব মেলে না। .... পাখির চেনা পৃথিবী কি পাখির সঙ্গে নতুন কোনও মস্করা করছে? পাখি এখন করবেটা কী?

খবরটা সুখলাল এসে দিল।

'পাখি জানিস না?'

'কী?'

'মেমসাহেব কলকাতায় যাচ্ছে—'

পাখি চমকে ওঠে।

এই তো ঘণ্টা কয়েক আগে এসেছে সে, কই শোনে নি তো? বলল, যা ভাগ্।'

'তিন সত্যি কালীর দিব্যি। মেমসাহেবের ভাই এসেছে, বোনের বিয়ে। ভাইয়ের সঙ্গে আজই চলে যাবে মেমসাহেব। হঠাৎ বিয়ে বোধহয়।'

'আর সাহেব?'

'সাহেব?'

সুখলাল মুচকি হেসে বলে, 'সাহেব তোর হেফাজতে রইল—'

'যমের বাড়ি যাও তুমি লক্ষ্মীছাড়া। .... সাহেব থাকবে, মেমসাহেব যাবে? মনেও করিস না। বিবি ছেড়ে এক মিনিট থাকতে পারে সাহেব? চোখের আড়াল হলেই বিবি যদি মরে যায়।'

'দেখ, তিন সত্যি করলাম বিশ্বাস হল না? পরশু দিল্লি থেকে 'চিফ্' আসছে, সাহেবের এখন সরবার সময় আছে? ওদিকে গিন্নির বোনের বে। যাক তোর ঠাকুরই কলা খেল।'

সুখলালের কথায় এদিক ওদিক থেকে ওরা এল। হুমড়ে পড়ে বলল, 'তাই নাকি?

তাই নাকি? হুররে।'

'মর তোরা।' বলে কাজে চলে গেল পাখি।

এবং সন্ধ্যার আসরে এল না।

'দেখলি?'

'দেখলি?'

'দেখলি?'

অসভ্য হাসিতে ফেটে পড়ে বলে এরা দুঘণ্টাও তর সইল না, চারটের গাড়িতে গেছে মেমসাহেব। আর আজই সন্ধেয়—'

ওদের জানা জগতের হিসেব মিলিয়ে নিশ্চিন্ত হল ওরা।

বলল মেমসাহেব ফড়িংটি হলে হবে কী, রাশভারী আছে। নইলে আর সাহেব এইভাবে সামলে চলে?'

কিন্তু গিরিধারী এক নতুন খবর আনল।

একটা কুকুর তাড়াতে অফিস বাড়ির পিছনের দিকে গিয়েছিল বুঝি, এসে বললো,

'পাখির ঘরে আলো জ্বলছে।'

আলো জ্বলছে।

পাখির ঘরে আলো জ্বলছে।

কে জ্বালাল আলো?

পাখি এসেছে তাহলে?.... কিন্তু কখন এল? এল তো এদিকে এল না কেন?...

শরীর-টরীর খারাপ হয় নি তো?

তাস ফেলে চলল ওরা।

তিন হাত ঘরের মধ্যে ছটা লোক ঢুকে পড়ল ঠেলে।

'কী ব্যাপার রে পাখি?'

'ব্যাপার আবার কী!'

'শরীর খারাপ নয়তো?'

'শরীর খারাপ শত্তুরের হোক।'

'তা সাহেববাড়ি থেকে ফিরে হঠাৎ ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিস যে? ওখানে যাস নি!'

'মন যায় নি।'

'তা না যেতে পারে—' প্রভাপদ ত্যাবড়া গলায় বলে, 'গরিবের আড্ডা বই তো নয়। ..... ওকে বোধহয় আবার এখন সাহেববাড়ি ডিউটি দিতে যেতে হবে, তাই জিরিয়ে—'

'বেরো বেরো আমার ঘর থেকে, লক্ষ্মীছাড়া পাপেরা।'

পাখি মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে, তার পরই হঠাৎ বসে পড়ে বলে, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি—'

'ছেড়ে দিয়ে এসেছিস? চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছিস? খাঁটি কথা ক' না বাবা? মেমসাহেব ছাড়িয়ে দিয়ে গেছে তাই বল।'

'নাঃ।'

পাখি হঠাৎ যেমন শান্ত হয়ে যায়, গম্ভীর হয়ে যায়। উদাস হয়ে যায়। চৌকিতে বসে পড়ে বলে, 'ছাড়িয়ে দিলেও তো মান মর্যাদার কিছু থাকত। ছাড়িয়ে দেয় নি, বরং উল্টো। .... বলল কি, 'তুমি রইলে পাখি, আমি নিশ্চিন্দি। বাবুর কোনও অযত্ন হবে না।...... দেখাশোনা কোরো ভালো করে।' ... শুনে কেন কে জানে, হঠাৎ ভারি রাগ হয়ে গেল। পা থেকে মাথা অবধি যেন তাদের এই ইলেকটিকের শক লাগল। .... বলে বসলাম, আপনি থাকবেন না, একা বাড়িতে, এ কদিন আমি আসতে পারব না।'....

শুনে মেমসাহেব যেন আকাশ থেকে পড়ল। অবাক হয়ে বলল, 'এরকম অদ্ভুত কথা বলছ কেন পাখি? আমি থাকব না বলে সাহেবও কি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ রাখবেন? আমি থাকব না বলে তুমি কাজে আসবে না? এমন কথা তো শুনি নি কখনও—'

রক্ত মাথায় চড়ে উঠল জানিস? বললাম, 'এমন কথা শোনেন নি বুঝি?' সাহেব বলল, 'তা' সত্যি, শুনি নি। মেমসাহেব না থাকায় বরং বেশি করে কাজ করবে, তা নয় ছুটি নিয়ে বাড়ি বসে থাকবে? অদ্ভুত তো!...... দুজনেই বলল,

'অদ্ভুত!'

আমি বললাম, ভূতদের তো সব অদ্ভুতই হবে সাহেব। যাক ক'দিনের ছুটিতে আর দরকার নেই, আমায় একেবারেই ছুটি দিয়ে দিন!......'

'আশ্চর্য!' বলে মেমসাহেব নীরবে আমার মাইনে চুকিয়ে দিল।.... চলে এলাম।'

'তা আশ্চয্যিই বই কী—' রাসবেহারী বলে, 'কী এমন হল বল্‌দিকি যে অত ক্ষেপে গেলি?'

'বুঝবি না' তোদের বোঝবার ক্ষমতা নেই—' পাখি উদাস গলায় বলে, 'মেয়ে মানুষের অপমান বোঝা তোদের কর্ম নয়।.... আসল কথা কী জানিস, ওরা আমাদের 'মানুষ' বলে গণ্য করে না। ওরা জানে, ওরা যেখানে—আমরা তার থেকে হাজার সিঁড়ি নিচুতে। তাই দুজনায় গলা মিলিয়ে বলে, 'অদ্ভুত।'

এর পরেও থাকব সেখানে এই কথা বলিস তোরা? দুঃখী অভাগ্যি বলে কি চামড়ার নীচে রক্ত বয় না?'

ঈর্ষা

সুজাতার ঘরের বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুমন্ত একটা ছোট্ট চিরুনি দিয়ে জোরে চুল আঁচড়াচ্ছিল, অথবা বলা যায় আঁচড়েই চলছিল। কারণ তার মাথায় চুলের যা চাপ, তাতে তাঁত বসাবার মতো দাঁত ওই ক্ষুদে চিরুনিটার নেই। গায়ে হাত বুলোনোর মতো ভেসে যাচ্ছিল সুমন্তর প্রবল চেষ্টাতেও।

সুজাতা মোমবাতি নিতে ঘরে ঢুকে, ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ওটা কী হচ্ছে? চিরুনিটা ভেঙে যাবে যে? তোর চুলে ওই চিরুনি!

সুমন্ত একইভাবে হাত চালাতে চালাতে অগ্রাহ্যের গলায় বলল, তোমার চিরুনি নেওয়া হয়নি।

সুজাতা ভুরু কুঁচকে বলল, চমৎকার! খুব 'ম্যানার্স শেখা হচ্ছে।

সুমন্তদের স্কুলে 'ম্যানার্স' সম্পর্কে বিশেষ নজর রাখার ব্যবস্থা আছে এবং সুমন্ত না কি তাতে একটা সার্টিফিকেটও পেয়েছে। কিন্তু স্কুলের ব্যবহার স্কুলে, তাকে বাড়িতেও নিয়ে আসতে হলে পেরে উঠবে কেন? হাত পা খোলাবার জন্যে খেলামাঠের দরকার হয় না?

সুমন্ত মায়ের থেকেও অধিকভাবে ভুরুজোড়া কুঁচকে একবার মার মুখের দিকে তাকাল। কোনও কথা বলল না। আবার একই কাজ করতে লাগল। আজকাল এই এক বাহাদুরী হয়েছে সুমন্তর, ক্লাস ইলেভেন-এ উঠে পর্যন্তই বোধহয় হয়েছে, ইচ্ছে করে মা-বাপকে অগ্রাহ্য দেখান। বাহাদুরী ছাড়া আর কি? তবে বাবা বলে, তুমি আর শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না সুজাতা! বাহাদুরী নয় লায়েক হাওয়া। দেখ তোমার ওই ছেলে ক'দিন পরেই কী মূর্তি ধরে।...

এরকম সময় 'তোমার ছেলে' বলাই বিধি।

সুজাতা অবশ্য বাহাদুরী বলেই ধরে আছে এখনও। নতুন বড় হওয়ার সুখে এটা একটা নতুন সখ। এই আর কি! তবু ছেলের ওই ভুরু কোঁচকানো দেখে রাগে গা জ্বলে গেল। এবং মাতৃঅধিকারের শক্তিটা কাজে লাগাতেই বোধহয় জোরে জোরে বলল, বেরোচ্ছিস কোথায়?

বেরোচ্ছে, এটা সাজ সঙ্গতেই বোঝা যাচ্ছে।

সুমন্ত তখন চিরুনিখানা প্যান্টের হিপ্ পকেটে পুরে ফেলে ধীরে-সুস্থে বলল, কোনও একদিকে নিশ্চয়ই। কেন, কিছু আনতে হবে?

কিছু আনার ব্যাপারে অবশ্য সুমন্ত এখনও একপায়ে খাড়া। আট-দশ বছর বয়েস থেকে হরদম ছেলেকে দোকানে পাঠিয়ে তার এই নেশাটি ধরিয়ে দিয়েছে সুজাতা।

সুজাতা কঠিন গলায় বলল, না! কিছু আনতে হবে না, জানতে হবে।

কী জানতে হবে?

এই সন্ধের মুখে, লোডশেডিংয়ের মধ্যে যাচ্ছিস কোথায় সেটাই জানতে হবে।

কেন? আমি কি হাজতের আসামি? তাই এক পা বেরোলেই বলে যেতে হবে?

বাঃ চমৎকার! ক্রমশই বেশ বোলচাল শেখা হচ্ছে। তোর বাবা এখনো কোথাও বেরোলে বলে বেরোয় দেখিস না?

স্রেফ্ স্লেভ্ মেন্টালিটি। বলে সুমন্ত সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় তরতরিয়ে।

কিন্তু মায়ের মতো জাতবেহায়া আর কে আছে? তাই সুজাতাও সঙ্গে সঙ্গে নেমে যায় দু'চার সিঁড়ি। চেঁচিয়ে বলে বেশি দেরি করবিনা কিন্তু! আকাশটা দেখ। দারুণ বৃষ্টি আসছে।

কথার জবাব অবশ্য পায় না সুজাতা।

ঘুরে এসে রাস্তার দিকের বারান্দাটায় সুজাতা দাঁড়ায়। তরতরিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সুমন্ত, নেহাৎ 'ছেলে' বলেই বুঝতে পারছে, নইলে দেখার কথা নয়। সত্যিই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। তার সঙ্গে চন্দ্র-সূর্যের অমোঘ নিয়মের মতো লোডশেডিংয়ের অবদান তো আছেই। তবু হাঁটার ওই পরিচিত ভঙ্গিটা থেকেই হঠাৎ আবিষ্কার করে বসে সুজাতা ওর গতিভঙ্গিটা ঠিক ওর বাপের মতো গঠনভঙ্গিও। এই বয়সেই বাপের মতো লম্বা হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ পুরো দৈর্ঘ্যটাই এসে গেছে ওর এখনই।...এই তো ক'টা মাস হল ক্লাস নাইন পার করেছে। বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল ছেলেটা।

ঘরে চলে এসে জানলা-টানলাগুলো বন্ধ করতে করতে ভাবল সুজাতা, বাপের মতো আকৃতি পাচ্ছে। এই প্রকৃতিটা তো পাচ্ছে না?

শ্রীমন্তর মধ্যে কত শান্ত সভ্য নির্বিরোধী ভাব। কাউকে উঁচু কথাটি বলতে জানে না। এই তো নতুন বাহাদুরীতে ছেলে তো শুধু মাকে কেন, বাপকেও 'ডোন্টকেয়ার' ভাব দেখিয়ে মজা পায়। সুজাতার ভয় হয় ফট্ করে না ধাড়ি ছেলের গালে একটা চড় কষিয়ে দেয় শ্রীমন্ত, কিন্তু তেমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে না। বড়জোর স্বগত মন্তব্য করে কিছু। মন্তব্য করে সরে যায়, 'ভালো! ভালো! শিক্ষাদীক্ষা ভালোই হচ্ছে। ইংলিস মিডিয়াম স্কুল তো—'

এই ব্যঙ্গটুকু অবশ্য সুজাতার উদ্দেশে।

চারবছর বয়েসে ছেলেকে পাড়ার স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিল শ্রীমন্ত, যে স্কুলে নিজে পড়ে বড় হয়েছে। তখন তো শ্রীমন্তর মা দিব্যি ডাঁটো।...'পাড়ার ইস্কুল' বলে সুজাতা একটু খুঁৎ খুঁৎ করায় সতেজে বলেছিলেন, কেন? ওই পাড়ার ইস্কুলে পড়ে কি মন্তু আমার 'অমানুষ' হয়েছে?' তোমার ছেলে যদি আমার ছেলের মতো হয়, তা হলেই বর্তে যেও বাছা।

তবু দু'বছর পর থেকেই সুজাতা 'ইংলিস মিডিয়াম, ইংলিস মিডিয়াম' বলে এমন অস্থির হল, শাশুড়ি নিজেই বললেন, 'তবে দে বাবা, ছেলেকে সাহেবের ইস্কুলে ভরতি করে দে। বৌমার যখন এত ভয় ভাবনা, বাংলা ইস্কুলে পড়লে ছেলে বিলেত যেতে পারবে না, দিল্লি মুম্বাইয়ের চাকরি পাবে না।—শেষে আবার হয়তো তোকে দূষবে, মা বুড়ীর প্ররোচনায় পড়ে ছেলেটার পরকাল খেয়ে রেখেছ তুমি।

চোস্ত সতেজ কথাবার্তা ছিল মহিলার।

হয়তো সেইজন্যেই শ্রীমন্তর স্বভাবটা এত শান্ত শান্ত। বলতে গেলে মায়ের আওতাতেই তো জীবনটা কাটল। মহিলা মারা গেছেন তো এই সেদিন। যখন সুমন্ত বেশ বড় হয়ে গেছে। আড়ালে মায়েতে ছেলেতে শ্রীমন্তর 'মাতৃভক্তির' প্রাবল্য নিয়ে হাসাহাসি করেছে। সুজাতা বলত, ঠাকুমা বলেছেন? ও বাবা! মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর ওর আর নড়চড় করতে পারেন?

সুমন্ত হাসত হি হি করে।

আবার মায়ের অসুখের সময় শ্রীমন্তর অস্থিরতা দেখে চিন্তাও প্রকাশ করেছে, মা-বাপ তো মানুষের চিরদিন থাকে না। ঠাকুমা গেলে তোর বাবা যে কী করবে!

কিন্তু আশ্চর্য! মায়ের মৃত্যুর পর কোনও অধীরতা দেখা গেল না শ্রীমন্তর মধ্যে। বরং আরও বেশি শান্ত হয়ে গেল। পরিবর্তনের মধ্যে, সাতজন্মে পুজোপাঠ সন্ধ্যা গায়ত্রীর দিক দিয়ে যেত না, সেটাই হয়েছে। অবশ্য মায়ের ঠাকুরঘরের দুর্দ্দশা দেখতে পারবে না বলেই।

অশৌচান্তর পর থেকেই শ্রীমন্ত সকাল-সন্ধে দু'বেলা মায়েরই পুরোনো একখানা গরদের থান জড়িয়ে উঠে যায় তিনতলায় মায়ের ঠাকুর ঘরে। কী করে না করে সুজাতা দেখতে যায় না, তবে সকালে পুজো করে নেমে আসা শাশুড়ির কপালে যেমন ছোট্ট একটি চন্দনের টিপ দেখতে পেত, তেমনি ছোট্ট একটি টিপ্ শ্রীমন্তর কপালেও দেখতে পায়। ভাত খেতে বসেও রয়ে যায় সেটা, অফিস যাবার সময় মুছে ফেলে।

সুমন্ত এক একদিন হেসে হেসে বলে, বাবা নির্ঘাৎ একদিন বোষ্টম হয়ে যাবে মা, দেখো তুমি।

সুজাতা তো ছেলের কথায় সায় দেবেই, ছেলেকে নিজের পক্ষে না রাখতে পারলে পৃষ্ঠবল কোথায়? শ্রীমন্তকে তো কোনওদিনই ঠিক 'নিজপক্ষ' করে তুলতে পারেনি। মরে গিয়েও যেন ছেলের জীবনের বেশ খানিকটা নিজের দখলে রেখে দিয়েছেন সেই পরলোকগতা। অথচ কী বুদ্ধিসুদ্ধিহীন গ্রাম্য মহিলাই ছিলেন! আশ্চর্যই লাগে। শ্রীমন্তকে তো বুড়ো বয়েস পর্যন্ত বকে 'ধুড়ধুড়ি' নেড়ে দিতেন।' (এটি তারই ভাষা) পান থেকে চুণ খসলে রক্ষে রাখতেন না।

শ্রীমন্তর ছোটবোন খুকুর শ্বশুরবাড়ি ভবানীপুরে। এই ঢাকুরিয়ার বাড়ি থেকে নেহাৎ কম দূর নয়, তবু প্রতি সপ্তাহে বোনকে দেখতে যাওয়া চাইই চাই। কোনও কারণে একটা সপ্তাহ বাদ গেলেই মহিলা অনায়াসে বলতেন, তোর যে একটা বাপমরা ছোটবোন আছে সেটা বোধহয় এবার ভুলতে চেষ্টা করছিস মন্তা?

আর আশ্চর্য, শ্রীমন্ত রেগে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়ার বদলে পরদিনই বোনের প্রিয় খাদ্য গড়িয়াহাটার দোকানের ডালমুট আমসত্ত্ব শোন্ পাপড়ি নিয়ে ছুটত তার কাছে।

মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠাতেই বোধহয় এখনও হপ্তায় হপ্তায় 'খুকুর বাড়ি' যাওয়াটি অব্যাহতই আছে। আজই তো যাবার সময় বলে গেছে, খুব সম্ভব খুকুর বাড়ি হয়ে আসব, দেরি হলে ভেব না।'

সুজাতা বলে ফেলেছিল, 'এই তো গেলে সেদিন—'

শ্রীমন্ত কিছু বলেনি, জুতোর ফিতে বেঁধে হাত ধুয়ে চলে গিয়েছে। তা বলে সুজাতার ছেলের মতো ভুরুও কোঁচকায়নি।

দেরি হলে ভাবতে বারণ করেছিল শ্রীমন্ত, তবে দেরি করল না। এসেই গেল ঠিক সময়ে। বলল খুব বৃষ্টি আসছে মনে হল, তাই আর নামলাম না, টানা চলে এলাম।

এসেই যথারীতি মায়ের ছেঁড়া গরদ গায়ে জড়িয়ে সবে ঠাকুর ঘরে গিয়ে উঠেছে। আর তখনই নেমে এল সেই বৃষ্টি যে নাকি এতক্ষণ 'নামব নামাব' করে ভয় বাড়াচ্ছিল।

কিন্তু ভয়ের কি থাকত যদি সুমন্তও বাড়ি থাকত। বাড়ির লোকেরা যদি বাইরে না থাকে, বেদম বৃষ্টির মতো মজার কী আছে? কিন্তু এখন বাড়ির আসল লোকটাই তো বাইরে।

এখন ক্রমশ যত বাজ বিদ্যুৎ আর মেঘের দাপট বাড়ছে, ততই সুজাতার প্রাণের মধ্যে হু হু করছে। আর আপন মনে ছেলের উদ্দেশে বলে চলেছে—পাজি হতভাগা ছেলে! এত করে বললাম, শোনা হল না কথা। কোথায় গিয়ে পড়েছিস্, কী ভাবে ভিজে ঢোল হয়ে ফিরবি

ভগবান জানেন। দেখতেই লম্বা হয়েছে, আর মনে করছ মস্ত লায়েক হয়েছি। আসলে তো পট্‌কা। সে হুঁস আছে? এক্ষুনি কাসতে শুরু করবি।

আপন মনে অনুপস্থিত ছেলেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বকেই চলে সুজাতা। সামনা সামনি তো একটা কথা বলার সাহস নেই।

বৃষ্টি কমবার নাম নেই। বরং বাজ বিদ্যুতের সমারোহ বাড়ছে। আশ্চর্য শ্রীমন্ত দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে 'টঙে' চড়ে বসে আছে।

একবার বুক দুরদুর করছে না, কোথায় কী ঘটছে ভেবে। সুজাতার তো মনে হচ্ছে এটা প্রলয়ের সূচনা। ভাবল ছুটে ঠাকুরঘরে উঠে গিয়ে বলে, তুমি কি মানুষ না পাথর? যেতে হল না। যথাসময়েই নেমে এল শ্রীমন্ত। থান গরদ ছেড়ে সুতি ধুতি পরে চায়ের টেবিলে এসে বলল, বাবু বুঝি এখনও ফেরেননি?

সুতাজা ক্ষুব্ধ উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, দেখোনো, এত করে বললাম, ভীষণ মেঘ করেছে, দেরি করিসনি,—তবু এইটুকু ছেলে, এত কীসের আড্ডা! তুমিও তো কিছু বলো না। মায়ের শত কথায় কাজ হয় না, বাপ একটা ধমক দিলে—কাজ হয়।

ধমক?

শ্রীমন্ত চায়ের কাপটাই কপালে ঠেকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গি করে বলে তোমার ওই 'হীরো' ছেলেকে আমি দেব ধমক?

বলে নিশ্চিন্তভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে।

কড়কড় করে আবার বাজের শব্দ!

সুজাতা অস্থির হয়ে জানলা খুলে দেখতে যায়, শ্রীমন্ত বলে, ওটা কী হচ্ছে? ঘর যে ভেসে যাবে!

খুব নিশ্চিন্দি মানুষ বাবা। ছেলেটা কোথায় কী করছে—

কী আশ্চর্য! পাগল তো নয় যে এই সময় রাস্তায় থাকবে। আছেই কোথাও বন্ধুর বাড়ি-টাড়ি। আটকে পড়েছে। এত ভাবনা করছ কেন?

একথায় আবার রাগ এসে যায় সুজাতার। মনে হয়, খুব একটা বিপদে পড়ে ভিজে নেয়ে বাড়ি আসে সুমন্ত, তবে জব্দ হয় লোকটা।...আর তা যদি না হয়, তো আজ ছেলেকেই সুজাতা দেখে নেবে একহাত। ওইটুকু ছেলেকে এত ভয়ই বা পাব কেন আমি?...মনে দুঃখ পাবে বলেই না কিছু বলি না। রাত বাড়তে বাড়তে ক্রমে বৃষ্টি কমে। থামে মেঘের ডাক, বাজের ডাক, বিদ্যুৎ চমকানি। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, যেন জেরটা বজায় রাখতে চেষ্টা করে।

অতঃপর বাড়ি ফেরে সুমন্ত। ফেরে একখানা রিকশা করে।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কোথাও না, এই ঢাকুরিয়ার মধ্যেই, সুধাময়দের বাড়ি।

সুজাতা এতক্ষণ মনে মনে ভাঁজছিল ছেলে যদি শুকনো গায়ে মাথায় ফেরে তো দেখে নেবে তাকে। কিন্তু কী করে নেবে দেখে? কোন কথার পিঠে? ছেলে যদি বলে, তা' তুমি যদি ভাবতে বসো আমি বাজ পড়ে মারা গেছি, তা কষ্ট তো পাবেই! আমি কি কচি খোকা যে, তুমি একেবারে অস্থির হয়ে উঠলে?

সুজাতা ভারী মুখে বলে, অস্থির কী সাধে হই? কচিখোকা নও বুঝলাম ধাতটি তো খোকারই মতো। এই যে জোলো হাওয়াটি লাগিয়ে এলি এতক্ষণ, রাতেই কাসতে শুরু করবি। বলছিস তো ভিজিসনি, কই দেখি মাথাটা! যা চুলের রাশ—মুছে দিই ঘসে।

সুজাতা ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দেখতে আসে, এক ঝটকায় মার হাতটা ঠেলে দিয়ে বলে ওঠে সুমন্ত, আঃ! ভেবেছ কি তুমি? বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে, বুঝলে?

নিজেই তোয়ালে দিয়ে ঘসে ঘসে মাথাটা মুছে নিয়ে জামা বদলে শুয়ে পড়ে গিয়ে।...সুজাতা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

শ্রীমন্ত ওর ঘরের দরজায় এসে একটু হেসে বলে, কী রে? মার ওপর রাগ করে না খেয়ে শুয়ে পড়লি?

রাগ আবার কি!

সুমন্ত পাশ ফিরে বলল, সুধাময়ের মা ছাড়লেন না, জোর করে ওদের সঙ্গে খিচুড়ি বেগুনি ডিমভাজা খাইয়ে দিলেন।

ওঃ তাহলে তো আজ তোর মজার দিন গেল।

শুনলে তো?

শ্রীমন্ত বলে উঠল, বন্ধুর বাড়ি খিচুড়ি বেগুনি ডিমভাজা—যাক বেচারি আমরা আমাদের রুটি তরকারি নিয়ে বসিগে। যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে।

এখন আর লোডশেডিং নেই। দালানের দুটো আলোই জ্বালা। খাবার টেবিলের সামনে দেওয়ালে শ্রীমন্তর মার যে মস্ত ফোটোখানা টাঙানো রয়েছে, তার উপর আলো এসে পড়েছে....খেতে বসে শ্রীমন্ত যথা নিয়মে আগে সেই ছবির দিকে নীরব প্রণামের ভঙ্গিতে একটু চোখ ফেলে খাবারে হাত দেয়। আর কেন কে জানে সেই মুহূর্তে ভয়ানক একটা জ্বালায় সুজাতার ভিতরটা তোলপাড় করে দু'ঝলক গরমজল এসে যায় দুচোখের কোলে।

ওই অতি সাধারণ প্রায় অশিক্ষিত গ্রাম্যচেহারার মহিলাটির উপর ভয়ানক একটা ঈর্ষা অনুভব করে সুজাতা!

উচিত জবাব

পরনে লাল ডুরে, কপালে ধ্যাবড়া সিঁদুর টিপ, হাতে শাঁখা, পায়ে হাইহিল্, কোলে ছেলে, দুই চোখে হাওড়া স্টেশনের দিশেহারা আকুলতা। উদভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করল, "আছানছোল্ যাইবার গাড়ি কডায় ছাড়বে বইলতে পারেন?"

বলতে আমি পারতাম! বিনা অনুসন্ধানেই পারতাম, কারণ আমার গন্তব্যস্থলও ওই একই। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন বললাম না আমি। বিবেকের কশাঘাতে পীড়িত হয়েও বললাম না। "না বলতে পারিনি—" বলে মুখ ফিরিয়ে গট্ গট্ করে চলে এলাম।

কী; সত্যি বলে বিশ্বাস করছেন না? ভাবছেন এ একরকম চাল্ ফলাচ্ছি? না কি ভাবছেন মেয়েটি আমার শত্রু? না মশাই সে সব কিছু না। আসল কথা পরোপকার আমি করি না। সামান্যতমও না। গত পাঁচ বছর থেকে পরোপকারের ছায়াও মাড়াই না আর। কারণ সামান্য একটু পরোপকারের ছিদ্র দিয়েই আমার আজীবনের সুনামটুকু আমি হারিয়েছি। আর শুধুই কি সুনাম? কী নয়?

পাঁচ বছর আগের সেই একটি দিন, সেই রৌদ্রোজ্জ্বল একটি শরতের দুপুর আজও আমার বুকের মধ্যে আগুনের অক্ষরে আঁকা আছে।

হ্যাঁ সেও এমনি একটা ট্রেন ছাড়ার পূর্বমুহূর্ত।

হাওড়া নয়, শেয়ালদা। নিজের এ্যাটাচিকেসটা নিয়ে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছি, হঠাৎ দুরন্তবেগে কুলির পিছনে পিছনে প্রায় তদ্রূপ ছুটন্তবর্তী দুটি নারীমূর্তি! এক কামরার দরজা লক্ষ্য করেই তীব্রবেগে ছুটে আসছেন নির্ভুল সন্ধানী শিকারীর বুলেটের মতো।

সামনেরটি বৃদ্ধা, কুলির সঙ্গে ছুটে আসতে পরিশ্রমে রক্তমুখী, কিন্তু পিছনেরটি তা নয়, বিধাতা প্রদত্ত রঙেই সে মুখ ফোটা গোলাপের মতো আরক্তিম। সামনেরটির বয়স সহজেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম, ষাটের কিছু ওপরেই হবে। কিন্তু এটির পারলাম না। সুন্দরী মেয়েদের বয়েস বোঝা কঠিন, আঠারোও হ'তে পারে, আঠাশ হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু সে যাক! আমার দৃষ্টি তো সেদিকে ছিল না। বৃদ্ধা মহিলাটির ক্লিষ্টকাতর মুখ দেখেই আমার পরোপকারী প্রাণ ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। কাজে কাজেই তৎক্ষণাৎ নিজে উঠে না প'ড়ে তৎপর হয়ে উঠলাম তাঁর ব্যবস্থা—মানে তাঁদের ব্যবস্থায়। তাঁকে সযত্নে ধরে উঠিয়ে দিলাম, তাঁদের মালপত্রগুলি ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিলাম, এবং তাঁর সঙ্গিনীটিকে আলগোছে ধরে গাড়ির গহ্বরে নিক্ষেপ করে দিয়ে তবে নিজে উঠলাম। আর সেই মুহূর্তেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়িটা একেবারে মানুষে আর জিনিসে ঠাসা। সেকাল আর নেই যে ডবল মাশুল দিলেই খালি কামরায় হাতপা খেলিয়ে বসে হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া যায়। এখন সব ক্লাসেই ভিড়। এই তো সেবার যাচ্ছিলাম কোথায় যেন একটা সাহিত্যসভায়, পরের পয়সায় কাজেই নির্মল আনন্দময় চিত্তে প্রথম শ্রেণিতে চড়ে চলেছি, হঠাৎ যেন গায়ের কাছেই একটি বিজাতীয় অনুভূতি! তার কাছ থেকে সরে সরে বসলাম। কারণ পরনে ময়লা একটি ট্যানা, গায়ে শুধু ফতুয়া, হুঁ যা ভেবেছি তাই! নিশ্চয় বিনা ভাড়ার যাত্রী, বেপরোয়া উঠে পড়েছে। কটমট করে তাকাতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, আসুক না একবার টিকেট চেকার, বাছাধন টেরটি পাবেন মজা! উঃ কী লজ্জাই পেয়েছিলাম সেদিন। যেই না চেকারের আবির্ভাব, আমি সেই ফতুয়াধারীর দিকে যাকে বলে 'রোষ-কসায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ' তাই করে বললাম "কই টিকিটটা বার করো?"

পান খাবার আয়োজন করছিল লোকটা, ময়লা একটা বটুয়া খুলে, আমার কথায় কেমন একটু হাসল, তারপর অবলীলাক্রমে ফতুয়ার পকেট থেকে একখানা প্রথম শ্রেণির টিকিট বার করে চুনের কৌটো চাপা দিয়ে রেখে ফের পান সাজতে লাগল।

ভাবুন আমার অবস্থাটা?

আর ওঁদের-ই সব ভাইবেরাদারদের—আমার মুখের সামনে থেকে হাতছানি দিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে সহজ মহিমায় উঠে পড়া? সে তো সর্বদাই দেখছি। 'বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে—দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে যখন ভাবছি 'দুরছাই একটা ট্যাক্সিই নিই না হয়, কতই আর পড়বে—' ঠিক সেই মহামুহূর্তে সামনের ট্যাক্সিখানাকে হাত নেড়ে দাঁড় করিয়ে উঠে পড়ে যেদো মেধো রামা শ্যামা।

সাধে আর বলছি শ্রেণির মহিমা আর নেই।

সে যাক কী বলছিলাম? গাড়িতে ভিড় তাই না? হ্যাঁ গাড়িতে পা বাড়াবার জায়গা নেই, তবু ওরই মধ্যে কত সুব্যবস্থা সম্ভব তাই চিন্তা করছি, সহসা গাড়ির মধ্যে যেন একটা আর্তনাদ আছড়ে পড়ল "নাত্তি, আমার কুঁজোটা? জলের কুঁজোটা দেখছিনা যে?"

চমকে শিউরে উঠলাম।

বুকের রক্ত কুঁজোর জলের মতোই হিমশীতল হয়ে গেল। গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছিল, তখন তো দেখেছি সেই কুঁজো। দেখেছি মুখে একটি জার্মান সিলভারের গেলাস চাপা দেওয়া হৃষ্টপুষ্ট নিটোল একটি কুঁজো, বিরহিনীর মতো একাকিনী বসে আছে শূন্য প্লাটফরমের মাঝখানে। উদাসীনের মতো তাকিয়ে দেখেছি মাত্র স্বপ্নেও ভাবিনি তার জন্যেই এই আর্তনাদ উঠবে।

বৃদ্ধা এদিক ওদিক তাকিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেন "সেই ওস্তাদ ছোকরাটি গেলেন কোথা? জিনিসগুলো তোলবার সময় কি আকাশ-পানে ছিল?"

আমি অবাক!

বলাই বাহুল্য—এহেন মন্তব্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না বরং ভাবছিলাম, পরিস্থিতি একটু শান্ত হলেই শান্ত চাহনির কৃতজ্ঞতা এবং বৃদ্ধার কলকণ্ঠের আশীর্বাদলাভ করব, তা নয় এ কি?

তাকিয়ে দেখলাম বৃদ্ধার মুখে সেই রক্তিমাভা আর নেই, তার বদলে ঘষা পয়সার মতো একটি নিরেট তামাটে ভাব। তবু গিয়ে হাত কচলে বলি "আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারিনি কুঁজোটা আপনাদের!"

বৃদ্ধা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপ্রদীপে একবার আমার আপাদমস্তক আরতি করে নিয়ে বিরক্তকণ্ঠে বলেন "অ, তুমিই বুঝি তড়বড় করছিলে তখন? তা'বলে জিনিস তোলবার সময় 'মোট' গুণে তুলতে হয়, তাও জান না বাছা, জলের বাক্স না হয়ে গয়নার বাক্সই হত?"

বলতে পারতাম মোটের 'মোট' সংখ্যা আমার জানার কথা নয়, কিন্তু বললাম না, অপরাধীর মতো ঘাড় চুলকোতে লাগলাম। বৃদ্ধা পুনশ্চ ঝঙ্কার দিলেন "সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকে আর কি হবে? যা গেছে তা'তো আর ফিরবে না। আহা অমন জলজ্যান্ত সিলভারের গেলাশটা গো! যাকগে মরুকগে, এখন জিনিসগুলো একটু সরিয়ে নড়িয়ে জায়গা বার করো?"

কৃতার্থ হয়ে তাই করতে থাকি, শশব্যস্তে প্রাণপণে!

মহিলাটি গজ্ গজ্ করতে থাকেন "দেখে শুনে ভ্যালো গাড়িতে তুলেছো বাছা, একটু পা মেলবার ঠাঁই নেই, আমি বলে বাতের জ্বালায় দু মিনিট পা মুড়ে বসতে পারি না!"

'নান্তি' নাম্নী সঙ্গিনীটি তাঁর এতক্ষণ মুখে আঁচল ঠেকিয়ে খুক খুক করে করে হাসছিল কিঙবা কাসছিল, এবারে আঁচল সরিয়ে কী যেন বলে চুপি চুপি তার কথাটা শোনা যায় না, কিন্তু তার কথার উত্তরটা শোনা যায়, "তুই থাম নান্তি, ওর হয়ে আর ওকালতি করতে আসিসনে, রেলগাড়িতে আমি এই নতুন চড়ছি কিনা! বাষট্টি বছর ধরে রেলগাড়িতে আমি চড়ছি, কখনও এমন পা মুড়ে বসিনি।"

বেশ টের পাচ্ছি, গাড়িসুদ্ধ লোকের দৃষ্টি এইদিকে। আমি পরম উদাসীনের মতো বাইরের জানালার দিকে তাকিয়ে থাকবার চেষ্টা করি। কিন্তু জানালা ভরতি তো শুধু নরমুণ্ডের সারি! এ পৃথিবীতে উদাসীন দৃষ্টিনিক্ষেপের জায়গা কি জোটে? কোথাও কোথাও না ধাক্কা খাবে সে দৃষ্টি।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ আবার তারস্বরে আর্তনাদ, "নান্তি আমার দোক্তার কৌটো?"

সঙ্গে সঙ্গে যেন একটি বীণার ঝঙ্কার ঝনঝনিয়ে ওঠে "দোক্তার কৌটো সে তো ওই বেতের ঝাঁপির মধ্যে! বাঙ্কে উঠে গেছে।"

"বাঙ্কে উঠে গেছে?" বৃদ্ধা আবার একটি ভাঙা কাঁসির বাজনা বাজিয়ে দেন "বলি, ও ভালোমানুষের ছেলে কেমন আক্কেলটি তোমার বাছা? ঝাঁপিটা একেবারে টঙে তুলে দিয়ে বসে আছো? আর ও'র মধ্যেই আমার ছিষ্টির দরকারি জিনিস।"

শুনে আমি তো চোরের অধম।

"সে কি, সে কি, এখুনি পেড়ে দিচ্ছি—" বলে সীটে উপবিষ্ট একজন ভদ্রলোকের পা মাড়িয়ে অপর এক ভদ্রলোকের আঙুল থেঁৎলে দিয়ে সীটে উঠে তাড়াতাড়ি তাঁর বেতের ঝাঁপি পেড়ে দিই।

এবার ভদ্রমহিলা কিঞ্চিৎ প্রসন্ন মুখে ঝাঁপি থেকে পান দোক্তার কৌটো বার করে একসঙ্গে গোটা দুই পান আর একটিপ দোক্তা গালে ফেলেন, তারপর এক টুকরো মোলায়েম হাসি হেসে বলেন "আমার তো আর কোনো বালাই নেই, শুধু এই একটি নেশা! এতেই মরেছি। আর রেলে উঠলেই যেন বাতিক আরও বাড়ে। হ্যাঁরে নান্তি, পৌঁছাতে তো সেই সন্ধে হয়ে যাবে, এই ক'টা পানে চলবে?"

নান্তি গোলগাল গালে টোল খাইয়ে টেপা হাসি হেসে বলে "তাই কখনও চলে মেজপিসি? সামনে ইস্টিশন এলেই তো ইনি তোমার পান এনে দেবেন।"

শুনুন শুনুন আপনারা!

এ সব ইচ্ছে করে মানুষকে বিপদে ফেলা নয়? একটু না হয় ভদ্রতা করেইছি, তাই বলে আমার ওপর যথেচ্ছাচার চালাবে না কি? অথচ এভাবে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সুরে বললে আপনারাই বা কি উত্তর দিতে পারতেন?

অতঃপর বৃদ্ধা মহিলা ঝাঁপি থেকে আর একটি বড়সড়ো কৌটো বার করে ঢাকনি খুলতে খুলতে বলেন, "নে নান্তি, এই সময় গোটাকতক সন্দেশ গালে ফেলে নে দিকিন।"

সঙ্গে সঙ্গে আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। বলা বাহুল্য এটুকুতে বৃদ্ধা মহিলা নিবৃত্ত হল না. তীব্রস্বরে বলে ওঠেন "মাথা নাড়ছিস যে? সেই কোন কালে এক মুঠো ভাত খেয়ে এসেছিস, খিদে পায়নি?"

"না মেজপিসি।"

"না? অমনি না বললেই হল? তোর খিদে পেয়েছে কিনা আমি বুঝব না, তুই বুঝবি? নে ধর বলছি।"

এবার যুক্তিসহ আপত্তি। গোল মুখ আরও গোল করে নাতি আবদারের সুরে বলে "জল-নেই কিছু না, সন্দেশ খেয়ে গলা শুকিয়ে মরি আর কি।"

"জল নেই, জল আসবে!" মেজপিসি গর্জে ওঠেন "ওগো বাছা ভালো-মানুষের ছেলে, জলের কুঁজোটি ঘুচিয়ে দিয়ে দিব্যি তো নিশ্চিন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, বলি আমার সঙ্গে একটা কচি বাচ্চা রয়েছে তার খিদে তেষ্টা আছে, সে হুঁশ নেই? জলের একটা ব্যবস্থা করো?"

কচি বাচ্ছা!

আমি সচমকে মেজপিসির কচি বাচ্ছাটির দিকে তাকাই, দেখি সেখানে একটি হাড় জ্বালানো মুচকি হাসি! সে কি হাসি! মনে হল এই ঝণ্টু হাসিটি যিনি হাসতে পারেন, তিনি যদি কচি বাচ্ছা হ'ন তা হলে এ সংসারে পাকা পকান্ন কে?

মুখ লাল করে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, এবং রাণাঘাটে গাড়ি ইন্ করতেই বিদ্যুত্ বেগে নেমে পড়ি।

রাগেই গায়ে জোর বাড়ে, বুদ্ধি খুলে যায়। তাই রাগ করে শুধু যে একটা সোরাই কিনে জল ভরেই আনি তা নয় আনি 'গরম চা' 'গরম সিঙাড়া' ছানার জিলিপি। আনি এক গোছা সবুজ মিঠে পান।

এতক্ষণে বৃদ্ধামহিলাটির মুখে একটি সত্যকার হাসি ফুটে উঠে। নির্মল আনন্দের শুভ্র হাসি। মধুর কণ্ঠে বলেন, "যাক এতক্ষণে তবু একটু আক্কেল আচরণ দেখিয়েছ বাছা। নে নাতি খা।"

নাতি মুখ ফিরিয়ে পুনশ্চ বীণার তারে ঝঙ্কার তোলে "আমি তো আর বকরাক্ষস নই যে ওইগুলো খাব! যে এনেছে সে খাক না।"

বৃদ্ধা সুমধুর কণ্ঠে বলেন, "আহা তা' খাবে বই কী। সন্দেশেতে আর এই চা খাবারেতে ভাগ করে দু'জনে মিলেমিশে খা।"

আমি কোনও মন্তব্য করব না আপনারা শুনে যান। আমার মধ্যে যে আগুন জ্বলছিল—তা চেপে গম্ভীরভাবে বলি "আমি খাব না, খিদে নেই।"

মেজপিসির নাতি হাসিচাপা অমায়িক মুখে বলে "সে কি, খিদে নেই কেন? সেই থেকে কত খাটছেন।"

"তা হোক।"

"পাগল হয়েছেন! তা' হয় না।" বলে দুপক্ষের সমস্ত খাবারগুলি চুলচেরা ভাগে ভাগ করে একটা ভাগ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে "এই নিন, কেমন খেতে না পারেন দেখি।...এই চা-ওলা অর এক গেলাস চা দাও।"

আমি তো আর ওর মতন ইয়ে—বাচাল নই। কাজে কাজেই অতঃপর বিনা বাক্যব্যয়ে চা খাই, খাবারও খাই।

নাতিটি দেখতে গোলাপটি হলেও খাবার বেলায় দেখলাম দিব্যি। সেই একটি রাশ খাবার দিব্যি সেঁটে ফেলে নতুন কুঁজো থেকে জল ঢালতে ঢালতে বলে "মেজপিসি তোমার পান থেকে একটা ভাগ দিও তো! মিষ্টি খেয়ে গলাটা কেমন জ্বালা করছে। আপনি খাবেন না কি? খাবেন না? সুপারি? তাও না? উঃ কি দুর্দান্ত ভালো ছেলেরে বাবা।"

আবার সেই হাড় জ্বালানো ঝণ্টু মার্কা হাসি!

বুড়ির গালাগালের চাইতে অনেক বেশি গাত্রদাহকারী যে ওই কচি বাচ্ছাটির এই ঝুনো হাসি। ও কেন ওরকম মাথা পাগল করিয়ে তোলা হাসি হাসবে? আর আমিই বা কেন একবারও পারছি না ওই রকম তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গ মিশ্রিত মজা দেখা হাসি হাসতে।

মনে মনে সংকল্প করে দেখলাম ওকে ওর ওই হাসির সমুচিত জবাব দিতে হবে।

কী করে হবে তা জানি না কিন্তু একটা কিছু করতেই হবে। এই দৃঢ় সংকল্পের তাড়নায় এ গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়বার দুরন্ত ইচ্ছেকে শত বার দমন করে টিঁকেই থাকলাম গ্যাঁট হয়ে। গাড়ির অন্যান্য আরোহীদিগকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে। কারণ বেশ বুঝলাম আগাগোড়া যাত্রীর লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিলাম আমরা। মানে আমি আর নাত্তি এবং নাত্তির দোর্দণ্ড প্রতাপশালীন মেজপিসি।

আমার তখন শুধু চিন্তা কী করে মেজপিসির ভাইঝির ওই বেয়াড়া হাসির সমুচিত উত্তর দেব।

কিন্তু কোথায় কী?

চিন্তা করতে করতে গাড়ি কেষ্টনগরে এসে গেল। মেজপিসি একখানি পাঁচটাকার নোট বার করে বললেন "অ ছেলে এই পাঁচ টাকার সরভাজা কিনে দাও দিকিন, যাচ্ছি কুটুম বাড়ি অবিশ্যি কলকাতার মিষ্টি নিয়েছি সঙ্গে তা হোক। কি বলিস নাত্তি? গুড় ঢাললেই মিষ্টি।"

আমি সবিনয়ে বললাম "স্টেশনের জিনিস তেমন ভালো হবে কি?"

"ভালো হবে না" মেজপিসি সন্দিগ্ধ।

"নাঃ! এরা হল গিয়ে নেহাৎ বাজে ময়রা। খাঁটি জিনিস এরা পাবে কোথায়? চোখেও দেখেনি।"

সঙ্গে সঙ্গে 'আবার—আবার সেই কামান গর্জন!'

গর্জন না হোক—গর্জনের অনুভূতি বহনকারী।

অর্থাৎ সেই হাসি।

সেই গোল গালে টোল্ খাওয়া ঈষৎ মুচকি ঝুনো ঝণ্টু হাসি।

হে ঈশ্বর আমি কী করব!

নাঃ কখনও কোনও ক্ষেত্রে দেখিনি ঈশ্বর পুরুষের সহায়ক। জীবনে প্রতি পদে পদে দেখেছি পুরুষ জাতিকে বিপদে ফেলতে অপদস্থে ফেলতে যাতে তাতে কষ্ট দিতে উনি একপায়ে খাড়া। খুব সম্ভব ভদ্রলোক জাতে বাঙালি, তাই এখন স্বজাতি বিদ্বেষ। অতএব এমন কোনও জন্ম পেলাম না যে সেই হাসিকে ফাঁসি কাঠে চড়াই। তবু ভেবে চিন্তে ফের বলতে যাচ্ছিলাম "এ জিনিস দিয়ে কুটুম বাড়িতে বরং নিন্দেই কেনা হবে—" বলা হল না। মৃদু কণ্ঠ ধ্বনিত হল—"তা' হলে এক কাজ করতে বলোনা মেজপিসি! উনি না হয় এখানে নেমে পড়ে খাঁটি জিনিস খুঁজুন, আমরা আমাদের লালবাগের ওখানের ঠিকানাটা দিয়ে দিই, পরের গাড়ি ধরে উনি সেখানে পৌঁছে দেবেন অখন।"

নিতান্ত নিরীহ প্রস্তাব একেবারে।

বলুন! বলুন আপনারা এর পরেও যে আমি আমার মাথা ঠিক রেখেছিলাম তাতে বাহাদুরী দেওয়া উচিত কিনা আমাকে? পড়ে রইল মেজপিসির নোট। লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম প্লাটফর্মে।

গট গট করে এগিয়ে গেলাম—না, শহরের দিকে নয় সেই খাবার ফেরিওলাটার দিকেই। জ্বলন্ত ক্রোধে কিনে ফেললাম প্রায় সাড়ে আট টাকার সরভাজা সরপুরিয়া। খাক্ ওদের কুটুম্বরা এই বাজে মালই খাক!

মেজপিসি জিনিসগুলি নেড়ে চেড়ে হৃষ্টচিত্তে বললেন "কই তেমন মন্দ তো নয়। দিব্যি বাস বেরোচ্ছে। নান্তি সববের বড় কৌটোটা বার কর দিকি। ওমা নোটখানা যে পড়ে। কী দিয়ে কিনলে গো?"

গম্ভীর ভাবে বললাম, "আমার দাম লাগেনি।"

"দাম লাগেনি? ওমা সে কি?"

"হ্যাঁ, ও ছোকরা আমাদের দেশের ছেলে, আমাদের বাড়িতেই খেয়ে পরে মানুষ। তাই—"

"অ মা! তাই বুঝি? তা ভালো! তা এ তো অনেক, তুমিও দু'খানা নাও।"

"আমার কী হবে?"

"শোনো কথা। খাবার আবার কী হবে, খাবে। ও কী লা নান্তি, অমন করে হেসে গড়িয়ে পড়ছিস যে? এই এক বেয়াড়া বিদঘুটে রোগ মেয়ের। অকারণ হাসি। যত বলি অকারণ হাসি সর্বনাশী, তা যদি একতিল শোনে। হাসতে হাসতে যে গেলি একেবারে! কী হল!"

"মেজপিসি জিজ্ঞেস করো তো ওঁর বুঝি গল্প লেখার অভ্যাস আছে?"

আমি আর তাকালাম না!

অবশেষে গাড়ি আমার এবং এঁদের গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছল।

না কোনও জবাব দেওয়া হল না।

নির্লিপ্ত ভাবে নিজের এ্যাটাচিকেশটা তুলে নিয়ে দরজার কাছে এগোচ্ছি হঠাৎ পিছনে কাঁসি ভাঙার আওয়াজ।

"অ ছেলে! গট গট করে চলে যাচ্ছ যে? দেখছ এই সন্ধে বেলা বিদেশ বিভুঁই জায়গায় আমরা দুটো অসহায় মেয়ে মানুষ এত মোটঘাট নিয়ে—ইস্টিশানে আমাদের কেউ নিতে এসেছে কিনা সেটুকু খোঁজ নিয়ে যাবে তো?"

পারতাম!

এই মোক্ষম সময়ে সেই হাড় জ্বালানো টোল খাওয়া হাসির জবাব দিতে পারতাম। উচিত জবাবের ধাক্কায় ধারালো মুখ একেবারে নিটোল হয়ে যেত। অনায়াসেই ওর মতো ওই রকম মুচকি হেসে বলতে পারতাম "তা' আপনারা তো আমাকে সহায় করে পথে বেরোন নি?" বলতে পারতাম "আপনারা যদি 'অসহায় অবলা' হন, তাহলে বাঙলা ভাষায় কিছু কিছু মানে পাল্টানো উচিত।" বলতে পারতাম, হ্যাঁ অনেক কিছু বলতে পারতাম, কড়া আর ধারালো, কিন্তু বলতে পারলাম না।

পুরুষ জাতির উদারতাবোধ আমার 'বলি বলি মুখ'কে চেপে ধরল। উচিত জবাব দেবার জন্যে যে মহিমময় সঙ্কীর্ণতাটুকু আবশ্যক তার সবটুকুই যে বিধাতাপুরুষ কেবলমাত্র মহিলা জাতিকেই নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছেন। পুরুষের ভাগে রাখেনইনি।

কাজে কাজেই যেন সচমকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হল "আপনারাও এখানে নামবেন না কি?"

"নামবো না তো কি বসে থাকবো?"

'কুলি কুলি' রবে হাঁক পেড়ে এঁদের নামিয়ে নিলাম। এবং সবিনয়ে শুধালাম "যাবেন কোথায়?"

"যাব তো কাঁসাপটির নিমাই উকিলের বাড়ি। কিন্তু কই কাউকে দেখছিনা তো। হ্যাঁলা নান্তি, তোর মামাদের তো আচ্ছা আক্কেল দেখছি কুটুম-কাটুম আসবার কথা থাকলে, ইস্টিশানে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় একটু জ্ঞান নেই?

নান্তির কণ্ঠ এবার ক্ষীণ। মুখে অপ্রতিভ ভাব।

"তা' আমরা তো আর কোন্ গাড়িতে আসছি জানিয়ে আসিনি।"

কিন্তু ক্ষীণ কণ্ঠ দাঁড়াতে পায় না মেজপিসির কণ্ঠদাপটে? "থাম থাম্, তুই আর মামাদের হয়ে ওকালতি করতে আসিসনে। বলি আজ আসব তা তো জানত? সব গাড়িগুলো একবার দেখে যাওয়া উচিত ছিল! কী করবো নেহাৎ নাকি তোর দায়িত্ব আমার গলায়, তাই মরতে মরতে এসেছি, নইলে তোর মামাদের বাড়ি আমার আসবার কী দায় পড়েছিল রে? নে এই ছেলেকে ঠিকানাটা গুছিয়ে বলে দে—"

এবার নাতি তীক্ষ্ণ কঠিন "কেন ভাবছ মেজপিসি, আমি গাড়োয়ানকে বুঝিয়ে ঠিক পৌঁছে যেতে পারব।"

"পারলেই বা পারতে দিচ্ছে কে?" মেজপিসি ঝান্সির রাণীর ভঙ্গিতে বলেন "সে আমাকে কাটলেও হতে দেব না। বলি খুব তো সাহস? গাড়োয়ান ব্যাটা যদি তড়বড়িয়ে অন্যদিকে নিয়ে যায়?"

ব্যস্ত হয়ে বলি "সে তো নিশ্চয়! ও সব লোককে বিশ্বাস কী? চলুন আপনার কাঁসাপটি লোহাপটি কোথায় যেতে হবে।"

না বলে উপায় কী?

আর আমি তো বলিনি, অঘটন ঘটনপটিয়সী নিয়তি দেবীই তখন আমার কণ্ঠে ভর করে সব কিছু বলাচ্ছেন। আর এপর্যন্ত তিনিই তো ঘাড়ে ধরে চালিত করে আনলেন!

তারপর?

তারপর আর কি। সেই রাত্রে দু'টি অসহায় অবলার গার্জেন হয়ে কাঁসাপটির নিমাই উকিলের বাড়িতে গেলাম। কাঁসাপটিতে নিমাই উকিলের প্রাণটা কঠিন নয়, বরং মাখনের মতো। হাজার হোক পুরুষের প্রাণ তো! তাই বার বার ত্রুটি স্বীকার করে আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন পরদিন তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে।

তারও পরে?

সে আর নিজমুখে বলিই বা কী করে? তবে—নেহাৎ যদি না ছাড়েন তো বলি সেই অঘটন ঘটনপটিয়সী নিয়তির নিয়মে তদবধি এই পাঁচ বছর কাল মেজপিসির নাতিই আমাকে ঘাড় ধরে চালিত করছেন!

অবিশ্যি তাতে যে আমি খুব বেশি কাতর তা নয়, তবে সেই অবধি পরোপকার আর করিনি। কারণ ঠিক জানি, করলে তাঁর কাছে চাপা থাকবে না। আর টের পেলেই ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠবেন "পরোপকার না হাতি? কী, তা আর আমার বুঝতে বাকি নেই। তোমার মতন হ্যাংলা বেটাছেলে আমি যদি আর দুটো দেখেছি! গাড়িতে তোমার অবস্থা দেখেছি আর হাসি চাপতে চাপতে মরে গেছি, উঃ! নেহাৎ কচি ছেলেটা সামনে রসগোল্লা দেখলেও অমন জ্ঞানহারা হয়ে ছোটে না। মেজপিসিও কম চাল চালেনি। দেখেই ঝোঁক পড়ে গিছল কিনা! কিন্তু তুমি যদি অমন আদেখলে না হতে! বলি আমায় পারত কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার ভাইপো বোনপোর সঙ্গে বিয়ে দিতে?"

আবার—আবার সেই হাড়-জ্বালানো গালে টোল ফেলা ঝুনো হাসি! এই পাঁচ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও যার সমুচিত জবাব দিয়ে উঠতে পারিনি।

অথচ বিশ্বাস করুন আপনারা শুধু ওই জন্যই টোপর পরার বোকামিটুকু করে বসেছিলাম। ভেবে ছিলাম নিজের কোর্টে পেয়ে—ও কি! আপনারাও যে সেই রকম সর্বনেশে হাসি হাসতে শুরু করেছেন দেখছি? মানে কী? ছোঁয়াচ লাগল না কি?

এক প্রেমিক পুরুষের ইতিবৃত্ত

এন্তার প্রেম করেছে নন্তু তার এই বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে।
জীবনভোরই নন্তু প্রেমে পড়ছে।

ওর প্রেমের প্রথম ইতিহাস খুঁজতে গেলে চলে যেতে হবে ওর আট বছর বয়সে। হ্যাঁ, ঠিক আট বছর, তখন নন্তু প্রেমে পড়ল। মোক্ষম ভাবেই পড়ে গেল।

প্রেমপাত্রী তার সদ্য বিবাহিত মাসতুতো বৌদি রাকা।

নন্তু সেই নববধূর ঢলঢলে মুখ দেখে মোহিত হল, কাজলপরা কালো চোখের চাউনি দেখে মুগ্ধ হল, আলতাপরা পায়ের লাবণ্য দেখে বিভোর হল, আর ঝকমকে গহনায় মোড়া হাত গলা কান দেখে জগৎ বিস্মৃত হল।

নন্তু ওই লাবণ্যবতীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে ভাবে, স্বর্গের পরীরা নিশ্চয় এই রকমই হয়। ভাবে সোনার কাঠি রুপোর কাঠি গল্পের রাজকুমারী কি আর এর থেকে সুন্দর? নতুন বৌ ওর সঙ্গে কথা কইলে নন্তুর বুকের মধ্যে যেন একটা অজানা সুখের বাঁশি বেজে ওঠে, নতুন বৌ ওর হাত ধরলে, নন্তুর মনে হয় সে এক্ষুনি মরে যাবে।

বিয়ে-বাড়িতে কত লোক, কত ছোট ছেলেমেয়ে কত হৈ-চৈ, কত খাওয়া-দাওয়া, সে সব দৃশ্যের মধ্যে নন্তু নেই। নন্তু ওই একটি জায়গাতেই পড়ে আছে। নতুন কনের কাছে।

নতুন কনের গতিবিধির সঙ্গে নন্তুর গতিবিধি গ্রন্থিত। নতুন কনের পায়ে পায়ে ঘোরে, ওর একটু কিছু কাজ করতে পেলে কৃতার্থ হয়ে যায়। নতুন কনের আরা কাজ কি? হয়তো একটু জল চাইল, হয়তো কোনও একটা বই চাইল। একদিন বলল এ বাড়িতে খবরের কাগজ আসে না নন্তু?

নন্তুর মনে হল জীবন ধন্য হয়ে গেল তার। নন্তু একেবারে সোজা দাঁড়িয়ে উঠল।

হ্যাঁ তো। দুটো কাগজ আসে তো, ইংরিজি বাংলা।

এখন কেউ পড়ছে?

জিজ্ঞেস করল নতুন বৌ। তার মানে ওটা ওর এখন পেলে ভালো হয়।

নন্তু তিরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর মুহূর্তে দুখানা কাগজই হাতে নিয়ে চলে এল।.... যেন কোথাও কোনো বামনবুড়ো অথবা দৈত্যরাজকে পরাজিত করে

রাজকুমারীর প্রাণভোমরা উদ্ধার করে নিয়ে এল।

মুখের চেহারায় তেমনি দীপ্তি।

রাকা বলল, আরে, দুটোই নিয়ে এলে? আর কেউ যদি পড়তে চায়?

বিয়ে-বাড়িতে কে পড়ছে? বড় মেসোমশাই শুধু সকালে একবার—

নন্তুর তখনও বুক তোলপাড় করছে, নন্তুর কথার ভঙ্গিতে সেটা ধরা পড়ে যায়।

নতুন বৌ হেসে ফেলে বলে, এত ছুটতে আছে? এই দেখো হাঁপাচ্ছ।

নন্তু কৃতার্থমন্যের হাসি হেসে বলে, না তো।

এ বিয়েতে নন্তুই হয়েছিল নিতবর।

কারণ ওর বয়সের যে সব ছেলে আছে এদিক ওদিক নন্তুর তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সুকান্তি। তাছাড়া নন্তু সব থেকে আদরণীয়ও বটে। বরের মা-র ছোট বোনের ছোট ছেলে।

সেই যে নন্তু কোঁচানো ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি পরে, কপালে চন্দনের ছাপ এঁকে আর গলায় ফুলের মালা দুলিয়ে বরের সঙ্গে গেল, আর ছাঁদনাতলায় বৌকে দেখল, সেই ওর রোমাঞ্চের শুরু।

বিয়ের সত্যি বর ছলছুতোয় এঘরে এসে হেসে হেসে বলে, নিতবরটিই দেখছি সবটা দখল করে নিচ্ছে, আসলের জন্যে কিছু রাখছে না। বৌ মুখ টিপে হেসে বলে, ও তো দস্তুরমতো আমার প্রেমে পড়ে গেছে।

ও পড়লে ক্ষতি নেই, তুমি না পড়লেই হল।

বৌ বলে, আমিই বা নয় কেন? প্রতিদান বলে একটা কথা আছে তো?

নন্তু অবশ্য এসব শুনতে পায় না। ওর কান বাঁচিয়েই বলা হয়, আর রাণুদা ঘরে ঢুকলে তো নন্তু ব্যাজার মুখে উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। রাণুদাকে আজ-কাল আর দুচক্ষে দেখতে পারে না নন্তু।

তবু রাণুদা যখন ডাকে, কী রে নন্তু চলে গেলি কেন? আর না এসে উপায় থাকে না বেচারার। কিন্তু ভালো লাগে না একদম।

রাণুদা ঘরে ঢুকলেই যেন বিশ্বপৃথিবী ভুলে যায় বৌদি। নন্তু নামের একটা ছেলে যে এখানে উপস্থিত আছে তা যেন মনেই থাকে না।

তবু এই নিষ্ঠুরার সঙ্গই নন্তুর কাছে প্রাণ।

নন্তুর মা বলে, ভালো এক নেশায় পড়েছে ছেলে। খেতে ডাকলে আসে না গো।

কাল থেকে ওই নতুন বৌয়ের সঙ্গেই খেতে দিতে হবে দেখছি।

বড়মাসি বলেন, তার চেয়ে একটা উচিতমতো কনে জোগাড় করে ফেল, তোর বাড়িতেও একটা ঘটা লাগুক।

হাসির রোল উঠল বাড়িতে।

কিন্তু ও রোল বেশিদিন থাকল না।

অবশ্য নন্তুরাও তো বেশিদিন থাকল না। নেহাত গরমের ছুটির মধ্যে এই বিয়েটা হল বলেই এতদিন থাকতে পাওয়া।

যেতে তো হবেই একদিন। কিন্তু শেষ-রক্ষা আর হল না। যাবার দিন নন্তু এমন এক কান্ড করে বসল যে, সবাই নন্তুর এ কদিনের ব্যবহারের আসল মানে খুঁজে পেয়ে হাঁ হয়ে গেল। আর ভাবতে লাগল, যত সরল শিশু ভাবা যাচ্ছিল, তত তো নয় বাপু!

চলে আসার দিন নন্তু এক ফাঁকে একটি 'প্রণয়-কাব্য' লিখে রাকার হাতে গুঁজে দিয়ে পালাল বলে গেল কাউকে দেখাবে না কিন্তু। কিন্তু অবিশ্বাসিনী নারী নন্তুর এই নিষেধের মর্যাদা রাখল না। ফলে বাড়ি-সুদ্ধ সকলের হাতে হাতেই ফিরতে লাগল সেই কবিতা-পত্র।

হাসির স্রোতেই ভাসমান হয়ে পড়ল সবাই, কিন্তু মনে মনে না ভেবে পারল না, ও খোকা, তলে তলে তো বেশ পেকেছ দেখছি। সেই কাব্য-পত্রটি এই—

'রাকা, রাকা রাকা।
তোমায় ছেড়ে চলে যেতে প্রাণ হচ্ছে ফাঁকা।
তুমি এত সুন্দর তাই তো এত ভালোবাসি,
তোমার সবই সুন্দর, কথা আর হাসি।
স্কুলে গিয়েও তোমার কথা মনে পড়বে,
লেখা পড়া সব কিছু মাথায় চড়বে।

ইতি নন্তু।

শেষ লাইন দুটোই মারাত্মক।

এর মধ্যেই পাকামির আভাস। যাক, বাড়ি ফিরে বাবার হাতের একটি কড়া কান মলা ব্যতীত আর কোনো খেসারত দিতে হয় নি নন্তুকে তার প্রথম প্রেম বাবদ।

সেটা দিতে হল দ্বিতীয়বারের বার। দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়েছিল নন্তু তার তেরো বছর বয়সে। ... এবার প্রেমপাত্রী তাদের পাশের ফ্ল্যাটে নতুন আসা ভাড়াটেদের বারো বছরের মেয়ে দীপা। মেয়ে নয়, যেন পাকা আপেল, ফোটা গোলাপ। নন্তু জানলা দিয়ে নতুন ভাড়াটেদের আসা দেখছিল, খাট আলমারি আয়না দেরাজ নামানো দেখতে দেখতে হঠাৎ ওই মেয়েকে দেখল। এবং দেখল আর মরল। নন্তুর থেকে একটু বড় একটা ছেলেও ছিল ওদের বাড়ি, নন্তু হঠাৎ তার দারুণ ভক্ত হয়ে গেল। নন্তু ওদের বাড়িতেই পড়ে থাকতে শুরু করলো। মা কিছু বললে, তেজের গলায় বলে, দীপকদার কাছে পড়া বুঝে নিতে গিয়েছিলাম।

মা সন্দেহের গলায় বলে, ওর এত সময় আছে যে, এতক্ষণ তোকে পড়ায়?

নন্তু আরও জোর গলায় বলে, এতক্ষণ পড়াবে কেন? দীপকদা বলে, সর্বদা পড়া পড়া করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। ক্যারাম খেল। খেলাটা মিথ্যে নয়। নন্তু গেলেই দীপা ক্যারামবোর্ড পেড়ে বসে।

দাদার নাম দীপক, বোনের নাম দীপা। শব্দটার সঙ্গে কোনো মিল খুজে না পাওয়ার জন্যেই হোক, আর পূর্ব-অভিজ্ঞতার তিক্ত স্বাদের স্মরণেই হোক, এবার আর নন্তু কবিতার দিক দিয়ে গেল না।

নন্তু সোজাসুজি দীপার হাত ধরে বলে বসল, আমি তোকে ভালোবাসি।

দীপা যে সত্যি একেবারে অবোধ, তা মনে করবার হেতু নেই, আপন রূপ সম্পর্কে দিব্যি সচেতন এই দ্বাদশী, ছলা-কলাও শিখেছে কম নয়। ক্যারাম খেলায় হেরে গিয়ে যখন হৈ চৈ করে অথবা 'আর খেলব না' বলে ঘুঁটি ছড়িয়ে উঠে যায়, তখন ভঙ্গিমা করে অনেক, এবং খাটো ফ্রকের আঁটো কাটের বাহারটি কীসে ভালো মতো উদ্‌ঘাটিত হয়, তা ভালোই জানে। কিন্তু এখন, নন্তুর ওই প্রেম-নিবেদন, স্রেফ, এইমাত্র পৃথিবীতে পড়া মুখে, বলল, ওমা, সেকথা এত ঘটা করে বলার কী আছে রে? বন্ধু হোস, ভলোবাসবি না?

আমিও তো তোকে কত ভালোবাসি!

তেরো বছরের নন্তু তার থেকে এক বছর দু'মাসের ছোটো এই অবোধ বালিকার মধুর সরলতায় মুগ্ধ হল, আবার করুণাও বোধ করল। তাই করুণার গলাতেই তাকে জ্ঞান দেবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বলল, তুই এমন বুদ্ধু। বন্ধুর মতো নয় মোটেই। তোর জামাইবাবু তোর দিদিকে যেমন ভালোবাসে, তেমনি।

এমা! কী অসভ্য। বলে দেব দিদিকে, চল তোকে দিদির কাছে নিয়ে যাই, বলে দীপা ওকে এমন ভাবে সাট্টে পাট্টে ধরে নিয়ে চলল, তেমন ধরা একমাত্র চোরকেই ধরে লোকে, চোর পালিয়ে যাবার ভয়ে।

কিন্তু এখানে, চোর কি পালিয়ে যাবার?

নন্তুর মনে হল ধরা পড়ার মতো সুখ কি ইহ-পৃথিবীতে আর আছে?

নন্তু সেই সুখটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চোখ বুজল।

কিন্তু নন্তুর সময় নির্বাচনটা বড় ভুল হয়েছিল, দীপার দিদি-জামাইবাবুর উপস্থিতিতে দীপার সঙ্গে প্রেমের রকমফেরের ব্যাখ্যা করাটা সমীচীন হয় নি তার।

তবে সেটা বুঝল নন্তু একটু লেট-এ।

লেট-এ।

চোখ বোজা অবস্থাতেই দিদির গলা শুনতে পেল—এর মানে?

কণ্ঠস্বর কুলিশ-কঠোর।

সঙ্গে সঙ্গেই দীপার শিশুকণ্ঠের আদুরে কথা যেন কানের ওপর বাজ ফেলল। দেখ না দিদি এই পাজিটা এমন অসভ্য কথা বলছে। তাই তোমার কাছে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

আর নিয়ে যেতে হবে না, বাচাল বেহায়া মেয়ে কোথাকার। ছাড় ওকে।

মুহূর্তে স্বর্গসুখ বিলুপ্ত। পায়ের তলায় কি মাটি আছে? থাকলে নন্তু নামক প্রেমিক বালকটি তলিয়ে যাচ্ছে কেন?

কেন?

দিদি নন্তুকে জিজ্ঞেস করল না, কী বলেছিস তুই দীপাকে?

দীপাকেই জিজ্ঞেস করল, কী বলেছে?

দীপা অবলীলায় বলল, বলেছে জামাইবাবু তোমায় যেমন ভালোবাসে, ও আমায় তেমনি—হি হি, এমন অসভ্য না।

নন্তু তখনও লোকচরিত বিশ্লেষণ করতে শেখে নি। কিন্তু তখন নন্তুর মনের মধ্যে যে ঝড় বইছিল তা ভাষার ছাঁচে ফেললে এই দাঁড়ায় উঃ মেয়েমানুষ কী সর্বনেশে জাত! ফোটা গোলাপের মধ্যে এমন কাঁটা? পাকা আপেলের ভিতরটা এমন পচা?

দিদির মুখ দিয়েই বা এসব কথা বেরুচ্ছে কী করে?

নন্তু ভিজে বেড়াল?

নন্তু ন্যাকা বদমাইশ?

নন্তু বোকা বজ্জাত?

নন্তু মনে মনে ঠিক করল, জীবনে আর এই মেয়েমানুষ জাতটার কাউকে ভালোবাসা নয়। এরা হাসতে হাসতে লোকের গলা কাটতে পারে।

আসুক কোনওদিন ওই পাজি মেয়েটা 'এই নন্তু ক্যারাম খেলবি? বলে ডাকতে।

মজা দেখিয়ে দেবে নন্তু।

কিন্তু ইহজীবনে আর তাকে মজা দেখাবার সুযোগ পেল না নন্তু, মেয়েটা কোনও দিন ডাকা তো দূরের কথা, নন্তুর দিকে তাকিয়েও দেখল না। ... নন্তুর সামনে দিয়ে দিয়ে স্কুলে গেল এল, স্কুলে গেল এল করতে করতে শরীরটাকে এমন বাড়বাড়ন্ত করে তুলল যে, চৌদ্দতেই আঠারো মনে হতে লাগল।

অবশেষে সত্যি আঠারো হতে না হতে দীপুকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিল ওরা। ওই বিয়েটাকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেছিল নন্তু। বিরোধ ভুলে ওরা নেমন্তন্ন করবে, বাড়ির আর কেউ যেতে না চাওয়ায়, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো নন্তুকেই যেতে হবে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।

তারপর বিয়ের কনেকে জানিয়ে আসা যাবে—তোমার জন্যেই আজ আমার এই দশা,

তোমার জন্যেই আজ আমি মরতে বসেছি।

কিন্তু কথাগুলো বলবার সুযোগ আর পেল না নন্তু। দীপুর চোখের চামড়াহীন বাপটা পড়শি হিসেবেও নন্তুদের একখানা নেমন্তন্নর চিঠি দিল না। সেই পুরোনো রাগ পুষে রেখেছে। চিঠিটা বুকপকেটে না থাকলে কীসের বলে বলীয়ান হয়ে এরকম গোলমেলে জায়গায় যাওয়া যাবে?

তবে ঢুকতে পেলেও এবং বলতে পেলেও, সত্যি কথা তো আর বলা হত না। সত্যি কি আর দীপুর দুর্ব্যবহার বুক-ভাঙা হয়ে নন্তু চুপ করে বসে ছিল? নাকি তেরো থেকে উনিশ এই ছ'ছটা বছর রমণীহীন পৃথিবীতে বাস করে এল নন্তু? এই ছ'বছরে, কম করেও তিন ছয়ে আঠারো বার প্রেমে পড়েছে নন্তু।

অতএব আঠারো বার বুক-ভাঙা মন নিয়ে ঘুরে ঘুরে আবার ভাঙা বুক জোড়া দেবার ওষুধ খুঁজে বেড়িয়েছে।

বুকের মধ্যে একখানা তাজা চকচকে প্রেম নেই, সর্বদা স্মরণ করবার মতো একখানা মুখ নেই, এ অবস্থা নন্তুর ধারণার বাইরে।

তবে নন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে পাস-টাস গুলোও চালিয়ে গেছে ঠিক মতো। এই যা বাঁচোয়া।

নন্তুর এইসব প্রেমের পাত্রীরা বিচিত্র। এর মধ্যে নন্তুর থেকে বয়েসে অনেকটা বড়ও থেকেছে দু'একজন।

যেমন চারুলতাদি।...... মনীষা খুড়িমা। তাছাড়া পাশের বাড়ির মেয়ে, দাদার শ্বশুর বাড়ির মেয়ে, বামুনদির মেয়ে, রজনী স্যাকরার মেয়ে, লন্ড্রীর সুবোধদার মেয়ে, মিল্ক সেণ্টারের দুগ্ধদাত্রী মেয়ে, আরও কত কত।

কিন্তু এমনি ভাগ্য নন্তুর যে, নন্তুই শুধু প্রেমে বিহ্বল হয়। তার প্রেমাস্পদারা ফিরেও তাকায় না। আর যদি বা তাকায়, সেটা নন্তুকে শাসাতে। ..... আর বড়দের বলে দিতে।

একটা প্রেমেও নন্তু সাকসেসফুল হতে পারল না, সব বিশ্বাসঘাতিনীর দল। অথচ নন্তু সুন্দর সুকান্তি পুরুষ। দেখলেই তো ভালোবাসতে ইচ্ছে হবার কথা। তা সে ইচ্ছে নন্তুর কলেজের মেয়েদের মধ্যে দেখা দিল। তাই নন্তুকে কলেজসুদ্ধ মেয়ের প্রেমে পড়তে হল। যাতে নন্তুকে নিরপেক্ষ বলে ধরা যায়, নন্তুকে তাই কখনও বেলার সঙ্গে বেড়াতে যেতে দেখতে পাওয়া যায়, কখনো কণার সঙ্গে গঙ্গার ধারে ঘুরতে দেখা যায়, কখনো মঞ্জুরীর সঙ্গে কফি হাউসে, কখনও হৈমন্তীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে।

মোটের মাথায় প্রেম-শূন্য অবস্থা একবারও থাকে নি নন্তুর জীবনে।

কিন্তু এই প্রেমের জন্যে নন্তু তার জীবনে কি কম লাঞ্ছিত হয়েছে? কম তিরস্কৃত? কখনও নিজের গার্জেনদের কাছে। কখনও অপর পক্ষের গার্জেনদের কাছে।

কখনও প্রেমপাত্রী নিজেই ঠিকরে সরে গেছে।

যেমন কেতকী হালদার।

ওর পিরিয়ডে একদিন নন্তুকে রাখী বোসের সঙ্গে চায়ের দোকানে বসে চা খেতে দেখেই ওর মাথায় রক্ত চড়ে উঠেছিল। ফট ফট করে চায়ের দোকানে ঢুকে এসে নন্তুকে যাচ্ছেতাই করে বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ির উল্টোমুখো।

তারপর কেতকী কলেজসুদ্ধ সবাইকে নন্তুর বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলে বেড়িয়েছে, এবং নিজের রুমাল ভিজিয়েছে।

স্বভাবতই এতে লোকের নন্তুর প্রতি সমবেদনার মনোভাব চলে যায়, বরং তার উপর তীব্র একটা বিরুদ্ধ ভাব এসে যায়।

কিন্তু চরম করল সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেরা। সবাই মিলে নন্তুকে আচমকা ঘিরে ফেলে আচ্ছা করে ধোলাই দিল। বলল চাঁদু তুমি ভেবেছ কী? চাঁদমুখটি দেখিয়ে তুমি গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে? তোমার প্রেম-রোগ সারাচ্ছি জন্মের শোধ।

বাড়ি ফিরতে মা চমকে উঠে, শিউরে বললেন, এ কি সর্বনাশ! এ কি চেহারা? কী হয়েছে? নন্তু বলল, দারুণ পড়ে গিয়েছি।

কোথায়? কী ভাবে?

তখন আবার দারুণ একটা গল্প বানাতে হল নন্তুকে। ..... অতঃপর ওষুধ এল, মলম এল, বেশ রাজকীয় সেবাই হল নন্তুর।

কাজেই নন্তু আবার মনে মনে কানমলা খাওয়াটা ভুলল।

তবে এবার নন্তু একনিষ্ঠ হল।

নন্তুর বড় ভাইঝিকে বাড়িতে পড়াবার জন্যে যে দিদিমণিটি বহাল হলেন, প্রথম দিনেই তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ল নন্তু। সূত্রটা এই তাঁর পাড়াটা ভালো নয়, আর সন্ধেটা লোডশেডিংয়ের ছিল বলে ভদ্রমহিলা একটা টর্চ চেয়েছিলেন, নন্তু 'বেণীর সঙ্গে মাথা' দিল টর্চটা ধরে একেবারে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল।

ব্যস!

তদবধি রোজই দেখা যেতে লাগল, দিদিমণি ঠিক ফেরার সময়ই নন্তু বাড়ি ফেরার পথে। অতএব নন্তুর সৌজিন্যবোধ জাগরিত হয়ে ওঠে, নন্তু বলে, চলুন আপনাকে পৌঁছেই দিয়ে আসি।

মহিলাটি অবশ্য আপত্তি করেন, আবার কেন কষ্ট করবেন? বলেন, কিন্তু পৌঁছে দেবার পর বেশ সকৃতজ্ঞ ভাষণেই বলেন, যাই বলুন, এই রাস্তাটা রাত্তিরের দিকে একা আসতে ভয় ভয় করেই। ভাগ্যিস আপনি—। এই ভাগ্যিসের খেলাটা চলছিল বেশ। কিন্তু নন্তু চিরদিনই ধৈর্যের পরীক্ষায় ফেল। নন্তু বরাবর যা করে তাই করল।

ওই খেলাটা তলিয়ে ভেবে জমিয়ে তোলার আগেই দুম করে একদিন রাস্তাতেই একখানা খোলাখুলি প্রেম-নিবেদন করে বসল। আর আশ্চর্য! এতদিনের সৌজন্যময়ী ভদ্রমহিলা মুহূর্তে একেবারে ফণা-তোলা ফণিনী হয়ে বলে উঠল, আপনি কি পাগল নাকি?...... ইস! আপনার ভদ্রতার মুখোশের তলায় এই ছিল? ছিঃ! পরদিন এই নিয়ে চাপা গুঞ্জনে বাড়ি মুখরিত। দিদিমণি কাজ ছেড়ে দিতে চাইছেন। কারণ?

কারণ তাঁর ছাত্রীর কাকা।

নন্তুর বৌদি এমন দিদিমণিটি হাতছাড়ার আশঙ্কায় ঝাঁজালো হলেন, লেখাপড়া তো শিখলে অনেক, জ্ঞানবুদ্ধির বালাই হল না কেন? সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আর চোখ-কানে দেখতে পাবে না এ রোগ কবে যাবে তোমার? সুধা বিশ্বাসের সিঁথিতে যে সিঁদুর তাও চোখ পড়ে নি? আর তো তোমায় ছাড়া গরু করে রাখা যায় না, এবার গোয়ালে পুরতে হবে।

অতএব তোড়জোড় করে মহাসমারোহে গোয়ালজাত করা হল নন্তুকে।

বাড়ির ছোটছেলে, সমারোহ ভালোই হল, আনাচকানাচ থেকে পর্যন্ত আত্মীয়জন এসে ভিড় করল, তাদের মধ্যে সুন্দরী সুন্দরী মেয়েও ছিল অনেক, কিন্তু নন্তুর নবপরিণীতার কাছে সবাই নিষ্প্রভ।

নন্তুর মা খোট ধরেছিলেন, ও আমার সুন্দর মুখ ভালোবাসে, সেটি এনে দিতে হবে। তা ভাগ্যক্রমে এসে গেলও।

না এসে যাবারও কারণ নেই, নন্তুর ভালো নাম নন্দিতকুমার, নন্তু ইতিহাসে এম. এ. নন্তু দেখতে রূপবান, এবং এখন একটা নামী কলেজের লেকচারার।

তাছাড়া নন্তু বাড়ির ছোট ছেলে, এখনও মা-বাপ বর্তমান, এবং তিন দাদাই কেষ্ট-বিষ্টু। সম্প্রতি নন্তুর মেজদা গাড়ি কিনেছেন, আর নন্তুর ঠাকুর্দা এমন একখানি রাস্তার ওপর এমন একখানি জাঁদরেল তিনতলা বাড়ি হাঁকড়ে রেখে গেছেন যে, আরও এক পুরুষের বংশধরদেরও কুলিয়ে যাবে। অতএব সুন্দরী সুগায়িকা, সুপাত্রী জুটবে নন্তুর, এটা আশ্চর্যের নয়।

সবাই নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

এতদিনে নন্তু একটা বৈধ প্রেমপাত্রী পেল। আর নন্তুকে নিয়ে দিশেহারা হতে হবে না। বাড়ির লোকের, পাড়ার লোকের, আত্মীয়-জনের বন্ধুমহলের।

এযাবৎকাল তো সবাইকে হতে হয়েছে দিশেহারা।

কাকের মুখ থেকে মাছের মতো, বেড়ালের মুখ থেকে দুধের মতো, সিঁড়ির মুখ থেকে হামা-দেওয়া শিশুর মতো, 'ধর ধর' করতে হয়েছে তো চিরকাল নন্তুকে নন্তুরই মুখ থেকে।

আর কারও দায়িত্ব নেই।

এখন ভাবনা নন্তু বৌ নিয়ে কতটা মাতামাতি করে, কতটা বেহায়াপনা করে।

অষ্টমঙ্গলার মধ্যেই তো হনিমুনে যাবার জন্যে উদ্দাম হচ্ছে দেখা গেল।

আমি নন্তুদের পাড়ার চিরকালের বাসিন্দা। নন্তুর বিয়ে পর্যন্তও তাই ছিলাম, কর্মচক্রে তারপরেই হঠাৎ দেশছাড়া হতে হল।...... তারপর যা হয়—

প্রথম প্রথম ঘন ঘন চিঠিপত্রে খবরের লেনদেন, ক্রমশ কমতে কমতে একেবারে শূন্যের অঙ্ক।

দশ বছর পরে আবার দেশে ফিরলাম। এবং সেই পুরোনো পাড়াতেই ফিরতে হল,

কারণ বাড়িটা বসতবাড়ি পৈত্রিক বাড়ি।

বাড়িতে যারা ছিল তাদের কাছে পাড়ার খবর নিই। এ কেমন আছে? ও কেমন আছে?

ভালো মন্দয় মেশানো খবর।

কিন্তু নন্তু।

নন্তুর খবর অদ্ভুত।

হনিমুন থেকে ফিরে এসেই নাকি নন্তুর প্রেম-রোগ এমন সেরে গেল যে, নন্তু তার বৈধ প্রেমপাত্রীটিকেও একেবারে ভুলে গেল। নন্তু খিটখিটে হল, এবং ছোটলোক হল।

নন্তু স্ত্রীর প্রতি যা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, যা দুর্ব্যবহার করে, যা নিষ্ঠুরতা করে, তা নাকি বাসনমাজা ঝিয়েদের বরেও করে না।

উঠতে বসতে খিঁচোয় বৌটাকে।

শুনে তাজ্জব লাগল বই কী।

গেলাম ওদের বাড়ি।

বৌ দেখে অবাক।

সেই রং কোথা? সেই গড়ন কোথা? সেই মুখ কোথা? বিষণ্ণ বিষণ্ণ মুখে যে হাসিটুকু সেও যেন করুণ। বিয়ের সময় বাইশ বছর বয়েস ছিল বৌয়ের, দশ বছর পরে অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মে এখন বত্রিশ। কিন্তু এই কি বত্রিশ বছরের চেহারা, বৌ যেন বাহান্ন বছরের এক বুড়ি। নন্তু ঘর

থেকে বেরিয়ে এল আমার সাড়া পেয়ে, প্রথম নজরেই বৌকে একটা তাড়া দিয়ে—সঙের মতন দাঁড়িয়ে আছ কেন? চায়ের জল-টল চড়াও তো একটু।

বলল শুধু তাড়া দিয়েই নয়, খিঁচিয়েও।

কিন্তু এই নন্তুই কি সেই নন্তু?

এরই বা কী চেহারা হয়েছে?

জেল্লাহীন হলদেটে রং, গাল ভাঙা, চোখ কোটরে, মাথার মাঝখানে টাকের আভাস।

না বলে পারলাম না চেহারার এ কী হাল করেছ নন্তু?

নন্তু অবজ্ঞায় চোখ উল্টে বলল, বয়েস হচ্ছে না?

নন্তুর বৌ চা নিয়ে এল। খুব ভালো চা। সঙ্গে সিঙাড়া। তবু নন্তু বৌকে আরও দুবার খিঁচিয়ে নিল চা দেওয়ার ছিরির জন্যে, তারপর খিঁচোলো বাড়িতে কিছু করে না দিয়ে বাজারের খাবার আনিয়ে দেওয়ার জন্যে। বৌ সরে যেতে দুঃখিতভাবে বললাম, বৌকে অত ধমক-টমক দিচ্ছ কেন নন্তু?

নন্তু বিরক্তিতে মুখ বাঁকিয়ে বলল, তবে কি মাথায় করে নাচতে হবে?

ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে আসছি নন্তুর এ মনস্তত্ত্বের কারণ কী?....... বিয়ে হয়ে নন্তুর সব সম্ভাবনা ফুরিয়ে যাওয়ার হতাশায়? না, সারা জীবন নন্তু নারীজাতির কাছে যে দাগা পেয়েছে, হাতের মুঠোয় তাদের একজনকে পেয়ে হিংস্র প্রতিশোধ নেওয়া?

একটি অমোঘ মৃত্যু

ক'দিন পরে মাত্র আজই সকাল থেকে আবার সংসারে দিনযাপনের রীতিটা সহজ খাতে বইতে শুরু করল।

ঠিক সকাল পৌনে ছটায় অনন্ত উঠে এসে ঘুম ঘুম চোখটা মুছতে মুছতে গেটের তালা খুলে তালাচাবিটা নিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে এল, যেমন আগে করত। তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বিমলা রকেটের গতিতে এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল, যেমন আগে পড়ত। বিমলা ঢুকে আসার পরই অনন্ত জলের পাম্প-এর সুইচটা অন্ করে দিল, যেমন আগে দিত, আর দেওয়া মাত্রই সেই চির-পরিচিত, উপকারী অথচ বিরক্তিকর শব্দটা একবার আচমকা একটা আর্তনাদে বাড়ির ভিত থেকে ছাদ পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে একটানা ঘ্যানোর ঘ্যানোর কান্না চালিয়ে চলতে লাগল, যেমন আগে চালাতো।

সব একেবারে যথাযথ।

যেন সংসারে ভয়ানক একটা ওলট-পালট হয়ে যায়নি।...কিন্তু এ' কদিন কি এসব হচ্ছিল না? ভাবলেন অমিতাভ বসুরায়, অথচ এ কাজগুলো তো বন্ধ হবার নয়। বরং হিসেব করে দেখলে এগুলো অনেক বেশি-বেশিই হবার কথা। বাড়িটা তো জনারণ্য হয়ে গিয়েছিল ক'দিন। কিন্তু কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছিল না। খেয়ালও হয়নি এগুলো কখন হচ্ছে, কে করছে, অথবা আদৌ হচ্ছে কিনা।

মনে হচ্ছিল দিনযাত্রায় স্বচ্ছন্দ ধারাটার উপর হঠাৎ কোথা থেকে একটা বৃহৎ পাথরের চাঁই এসে পড়ে প্রবাহের মুখটা দিয়েছে আটকে, প্রবাহিত ধারাটা বিরাট একটা কলরোল তুলে ঘূর্ণিপাক খেতে খেতে এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ছে।

আজই হঠাৎ সেই পাথরের ভারটা অনুভবে পাওয়া যাচ্ছে না। নইলে—গতকাল সন্ধ্যাতেও তো—

হ্যাঁ গতকাল সন্ধ্যাতেও সীমা যখন ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছিল, তখনও ধারণা করা যায়নি এবাড়ির জীবনযাত্রার এই সহজ খাতটা কোথাও কোনওখানে টিকে আছে। তখন ওই পাথরের চাঁইটা আরও ভারী হয়ে উঠেছিল, আর ওই ঘূর্ণিপাকের কলরোলটা অধিক উদ্দাম হয়ে উঠেছিল।

তখন একেবারেই ভাবা যায়নি আজই সকালে সংসারের চাকাটা এমন নির্ভুল চলতে শুরু করবে। অন্তত অমিতাভ বসুরায় ভাবতে পারেননি। এখন তাই ভেবে অবাক হচ্ছেন, সীমার

সেই গেটের সামনে পড়ে আছড়া-আছড়ির দৃশ্যটা যদিবা মুছে গিয়ে থাকে, সেই তীব্র তীক্ষ্ণ বিলাপধ্বনিটা এমন মিলিয়ে গেল কী করে?...সত্যি ভীষণ অবাক হয়ে ভাবলেন, তখন যে মনে হচ্ছিল ওই মর্মান্তিক বিলাপের বাণী আর ধ্বনি বাড়ির ইট-কাঠ-লোহা সিমেন্টের ভিতরে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

তা ঢুকেই যদি না যাবে অমিতাভ বসুরায় এখনও শুনতে পাচ্ছেন কী করে—'ওমা মাগো! তোমার এই গেট্ থেকে জন্মের শোধ বেরিয়ে যাচ্ছি মা, আর কখনও আসব না। তুমি-শূন্য বাড়িতে আর ঢুকবো না। তোমার সীমা এ দরজা থেকে চিরকালের মতো বিদেয় হয়ে যাচ্ছে—?'

পরিতোষ তখন মৃদু ভর্ৎসনার মতো করে বলেছিল, 'আঃ খুকু! কি বলছিস যা তা? বাবা রয়েছেন না? বাবাকে দেখতে আসবি না তুই?'

তাতেও সীমা বেশি হাহাকার করে উঠেছিল, 'বাবাকে তোমরা দেখো দাদা, খুকু আর আসছে না। যেদিন ছুটতে ছুটতে এসে আমি মার মরা-মুখ দেখেছি সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছি—'

শেষটা আর উচ্চারণ করতে পারেনি, হু হু করে কেঁদে উঠেছিল।

সীমার সে কান্না হয়তো আরও অনেকক্ষণ চলতো, যদি না তার বর মনে পড়িয়ে দিত, আর দেরি করলে ট্রেন ফেল হয়ে যাবে।

প্রণাম-ট্রনামের পর্ব চুকিয়েই গাড়িতে উঠতে গিয়েছিল সীমা, তাই তাড়া খেয়ে কান্না থামিয়ে চোখ মুছতে মুছতে গাড়িতে উঠে পড়েছিল।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, আর ওই ছেড়ে দেওয়ার ঠিক পরমুহূর্তেই, প্রথম বাড়িতে মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। নিজের দোতালার ঘরের জানলার সামনে পাতা বেতের চেয়ারটায় বসে অমিতাভ অবশ্য স্তব্ধ হয়েই বসেছিলেন, যেমন এই ক'দিন ধরে বসে থেকেছেন, যেমন এখন এই সকালেও বসে আছেন, কিন্তু আর কোথাও তো স্তব্ধতার স্পর্শ ছিল না। সারাক্ষণই তো কথা আর কথা। জানা-অজানা সব কণ্ঠধ্বনি, বিচিত্র সব প্রসঙ্গ, অমিতাভর কানের পর্দায় আছড়ে-আছড়ে এসে পড়েছে। সব থেকে বেশি সীমার কণ্ঠস্বর।

সীমার গাড়ি ছেড়ে যাবার পর, আর কেউ একটি কথা বলল না। যেন হঠাৎ লোড্সেডিঙে পুজো প্যাণ্ডেলের উদ্দাম মাইকটা বোবা হয়ে গেল।

বাড়িতে যে পরিতোষ আর মনতোষ নামের দু-দুটো বড় বড় ছেলে আছে, আছে মীরা নামের একটা করিৎকর্মা বৌ, আর তার একটা ছটফটে দুরন্ত ছেলে, আছে বাক্যবাগীশ অনন্ত, আর অবিরত তার সঙ্গে কলহনিরত পশুপতি, এসব আর বোঝা গেল না। অন্তত অমিতাভ বসুরায় বুঝতে পারলেন না।

ওই স্তব্ধতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বসে রইলেন সময়ের জ্ঞান হারিয়ে, বুঝি বা নিজেকেও হারিয়ে।

অমিতাভ কি ওই স্তব্ধতার গভীরে ডুবে গিয়ে—মণিমালাকে ভাবতে বসেছিলেন? মণিমালার হাসি, কথা, চলাফেরা প্রতিটি ভঙ্গি? নাঃ তাও নয়, অমিতাভ বসুরায় নামের মানুষটা কতখানিটা সময় যেন একটা ভাবশূন্যতার ঝাপসা ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থেকেছিলেন। যেন অনেক অনেকক্ষণ পরে খেয়াল হল তিনি কিছু ভাবছিলেন না এতক্ষণ।

খেয়াল হতে ভাবলেন, বাড়িসুদ্ধ সবাই কি সীমাকে তুলে দিতে স্টেশনে গেছে? তারপর ভাবলেন, তা কী করে হবে? একখানাই তো মাত্র ট্যাক্সি এসেছিল, সেখানেতে তো চলে গেল সীমা, সীমার বর, তার মেয়ে দুটোকে নিয়ে।

তবে?

হঠাৎ খুব একটা কষ্টের অনুভূতি কামড় দিল অমিতাভ বসুরায়কে। দম আটকে আসা বুকচাপা কষ্ট। হঠাৎ পৃথিবীর সব বাতাস ফুরিয়ে গেল নাকি?

ওই বাতাস ফুরানো কষ্টটা বাড়তে-বাড়তে দারুণ একটা অভিমান এসে গেল অমিতাভর।

আমার কাছে কেউ আসছে না কেন?

'আমি' বলে যে একটা মানুষ আছে বাড়িতে সেই কথাটা কি ভুলে গেল সবাই? ভুলে গেল আমি সেই কখন থেকে একা বসে আছি।

আমার তো খুব জলতেষ্টাও পেতে পারে।

এই ক'দিন ধরে তো যখন-তখন ওষুধও খাইয়ে যাচ্ছিল ওরা, এতক্ষণের মধ্যে একবার কোনও ওষুধ খাওয়ার সময়ও হল না?

আমি কি কারো নাম ধরে চেঁচিয়ে ডেকে উঠবো? খোকার, মহীর, মীরার? নিদেন পক্ষে অনন্তর নাম ধরেও? কেউ এলে বলে উঠবো, 'বুঝতে পারছ না আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে! আমার দম আটকে আসছে। আমার ভয় করছে—তোমরা আমায় ফেলে কোথাও চলে গেছ।'

নাঃ ডাকলেন না।

ডেকে উঠতে পারলেন না বলেই ডাকলেন না।

আর ক্রমশ ওই তীব্র অভিমানটাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করে কিছুটা সফল হলেন। ভাবলেন, কী-ভাবছি বোকার মতো?

ওরা আমায় একা ফেলে রেখে কোথাও চলে যাবে?

কিন্তু বাতাসবন্ধ ভাবটা যেতে চাইছে না। এটা বোধহয় শুধু মানসিকই নয়, শারীরিকও।

উত্তেজনাটা থিতিয়ে গেল।

ভাবলেন, এর নামই তাহ'লে মৃত্যুর স্তব্ধতা? আর এই স্তব্ধতার শিকার হবার ভয়েই তাহ'লে, একটা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একশো রকম আচার-অনুষ্ঠান-নিয়মনিষ্ঠার সমারোহের মধ্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা।

আজীবনই দেখে আসছেন অমিতাভ পরিবারের কারো মৃত্যু ঘটলে একটা পারিবারিক সমারোহময় সম্মেলন। কিন্তু তার কারণ নিয়ে চিন্তা করার কথা মনে পড়েনি কখনও, আজ হঠাৎ মনে পড়ল।

ক'দিন ধরে বাড়িতে কত লোক, কত কথা, কত আয়োজন। ডেকরেটারের লোকেরা যখন ছাদে প্যাণ্ডেল খাটাবে বলে মালমশলা বাঁশ দড়ি এনে গেটের সামনে ফেলেছিল, বিয়ে বাড়ির মতো লাগছিল। খুকুর আর পরিতোষের বিয়ে তো এই বাড়িতে আসার পরই হয়েছে।

এ ক'দিন জানলার ধারে, এই বেতের চেয়ারটায় বসে বসে কত কিছুই দেখতে পেতেন অমিতাভ।

ঝাঁকা মুটের মাথায় চাপিয়ে বাজার আসছে, যখন-তখন হাঁড়ি-হাঁড়ি দই, আর বাক্স-বাক্স মিষ্টি আসছে, অনন্ত মিনিটে মিনিটে গেট ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে। কী জন্যে এই বেরনো বুঝতে পারছিলেন না অমিতাভ।

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করত না, কথা কইতে উৎসাহ আসত না। অথচ এখন ইচ্ছে হচ্ছে। মনে হচ্ছে—ওরা যদি কেউ কাছে এসে বসত। পরিতোষ, মনতোষ অথবা মীরা। অমিতাভ কথা বলে বাঁচতেন। ...সেকি এই স্তব্ধতার হাত থেকে মুক্তি পেতে?

অনেক অনেকক্ষণ পরে, অমিতাভর মনে হল যেন যুগ-যুগান্তর পরে অনন্ত এল হর্লিকস্ নিয়ে। জগতে কত রকম নতুন নতুন পানীয় দেখা দিয়েছে, ভিটামিনবহুল, প্রোটিনযুক্ত। অমিতাভ এই আদি-অনন্তকালের হর্লিকস্‌টিই ধরে বসে আছেন।

মণিমালা বলতেন, 'বেজায় রক্ষণশীল মন তোমার, নতুন কিচ্ছু নিতে চায় না।'

তখন অমিতাভ বসুরায় নামের এই গম্ভীর মানুষটা, হাসিচাপা গলায় বলতেন, 'নিতে চায় না, সেটা তোমারই ভালো, চাইলে মুশকিল হত।'

'বাবু, হর্লিকস্‌টা খেয়ে নিন।'

অনন্ত সচেতন করে দেয়।

আর ওই দেওয়াটার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই চাপা অভিমানের উত্তেজনাটা ফিরে আসে অমিতাভর। ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'এত রাত্তিরে আর হর্লিকস্‌ কেন?'

অনন্ত বলল, 'রাত্তির কোথা? এই সময়ই তো খান।'

'এই সময়? এই রাত দশটায়?'

অনন্ত শান্ত গম্ভীর, 'দশটা কী বাবু, এইতো আটটা বাজল। আটটাতেই তো খান।'

ওর ওই শান্তভঙ্গিতে ভারী রেগে গেলেন অমিতাভ। প্রায় ক্ষেপে যাওয়া গলায় বললেন, 'এতক্ষণে সবে আটটা বাজল? এই বোঝাতে এসেছিস তুই আমায়? ঘড়িগুলোও বুঝি বাড়ির ভয়েই কাঁটা সবাই।'

তারপর অনন্তও একটু নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'আর কেউ বলতে আসবেও না। মাসিমাই ছুটে ছুটে এসে সংসারের সকল খবর, সকল বার্তা আপনার গোচর করে যেতেন। অমন জমজমাটি মানুষটা কপ্পুরের মতন উবে গেল। এই তো পৃথিবী।'

দার্শনিক এই মন্তব্যটি করে বিদায় নিল বাক্যবাগীশ অনন্ত।

অমিতাভ যেন অবাক হয়ে বসে রইলেন।

অসময়ে শুতে চান না, রাতে ঘুম হবে না ভয়ে।

তারপর অনেক রাত্রে, কিংবা অনেক রাতে নয়, অমিতাভর মনে হয়েছিল অনেক রাত, পশুপতি অমিতাভর রাতের খাবার নিয়ে এসেছিল। দু'খানা টোস্ট, একপ্লেট স্টু।

পশুপতির সঙ্গে মনতোষ এসে দাঁড়িয়েছিল।

অমিতাভর হঠাৎ ওর দিকে তাকাতে লজ্জা করল। চোখ নিচু করে অস্ফুটে বললেন, 'তোমরা কখন খাবে?'

মনতোষ আস্তে আস্তে বলল, 'কিছু খাবো না—স্রেফ একগ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়বো।'

অমিতাভর মনে হল এ বিষয়ে বোধহয় তাঁর কিছু দায়িত্ব জন্মেছে এখন। সোজা হয়ে বসলেন, বললেন, 'কেন?'

মনতোষ বলল, ভীষণ বেলায় খাওয়া হয়েছে। খুকুরা বেরিয়েছিল, ফিরতে দেরি হল—'

কিন্তু এসব তো গত কালকের কথা।'

অমিতাভ জানেন না রাত্রে কেউই কিছু খেয়েছিল, না সকলেই স্রেফ একগ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। তাঁর নিজের তো খেতে খেতে মনে হচ্ছিল সেই পাথরের চাঁইটা গলার মধ্যে আটকে আছে।

অথচ আজ সকালের চেহারা আশ্চর্য রকমের স্বাভাবিক।

অদ্ভুত না?

অমিতাভ বসুরায় দেখলেন, আজ ঠিক সাতটায় তাঁর ব্রেকফাস্ট এসে গেল যেমন আগে আসত। ছানা বিস্কিট কর্নফ্লেক্স আপেলসিদ্ধ আর চা। অবিকল আগের মতো।

হঠাৎই গেটের সামনে চোখ পড়ল, দেখলেন প্রকাণ্ড সেই নীলরঙা স্কুলবাসটা গেটের সামনে দাঁড়াচ্ছে।

আজ আর কেউ কোনও খান থেকে ভারী ভারী গলায় বলে উঠলো না, 'যাবে না।' আজ টোটো স্কুলের ইউনিফর্ম পরে কাঁধে ওয়াটার বট্‌ল আর হাতে বইয়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে অমিতাভর ঘরের দরজায় এসে দ্রুত লয়ে বললো 'দাদু, টা টা।'

তারপর দুদ্দাড়িয়ে নেমে গেল যেমন বরাবর যেত। আর ঠিক আগের মতোই অনন্তর হাতে ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে তড়াক করে বাসে উঠে পড়ে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা তুলে নিল।

এরপর নিশ্চয় বাজার চলে গেল অনন্ত।

তাই নিয়ম ছিল। টোটোকে বাসে তুলে দেবার সময়ই বাজারের থলি আর টাকা নিয়ে নামত। ...কিন্তু বাজারের তালিকাটা গুছিয়ে বলে দেবে কে? বারবার সমঝে দেবে কে অনন্তকে; যাতে না কিছু আনতে ভুল হয়ে যায়।

অমিতাভ একটা খেইহারা সুতোর জট হাতে নিয়ে বসে রইলেন। ...ঘড়ির কাঁটাটা সরতে চায় না কেন? বেলা এত বড় হয়ে গেল কেন? তবু একসময় ঘড়ির কাঁটা নড়ল।

মনতোষ অফিস যাবার সাজে এসে এঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। মনতোষের ন্যাড়ামাথায় একটা সাদা গান্ধি টুপি চড়ানো। মুখটা অন্যরকম লাগছে।

মনতোষ অবশ্য ভাইপোর মতো টাটা করলে না, তবে ভঙ্গিটা প্রায় একই। বলল, বাবা চলি।'

'আজই ছুটি ফুরিয়ে গেল?'

ফুরোল আর কি? গতকাল পর্যন্তই বলা ছিল।'

অমিতাভ আস্তে বললেন, 'এত কষ্ট গেল, আর দু'একদিন রেস্ট নিলে পারতে।'

'নাঃ, কি হবে বাড়ি বসে থেকে?'

সব লোকগুলোর মত ঘুমিয়ে পড়েছিল?'

'ঘুমিয়ে পড়বে কেন বাবু, ঠিকই চলছিল। দিদিমণি ট্যাক্সিতে উঠল কাঁটায় কাঁটায় সাতটা, তারপর এই আটটা বাজল।'

দিদিমণি! তার মানে সীমা।

অমিতাভ আরও উত্তেজিত হলেন।

সীমা চলে যাবার পর মাত্র একঘণ্টা সময় পার হয়েছে! অনন্তকালের অনুভূতি বহে আনা এই সময়টা মাত্র একঘণ্টা!

অমিতাভ স্বভাবছাড়া উত্তেজিত হলেন, আমায় ছেলে ভোলাতে আসিস না অনন্ত। ...ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা বসে আছি আমি—'

অনন্ত অবিচলিত অবলীলায় বলে, একা বসে থাকলে ওই রকমই মনে হয় বাবু। তবু তো লোড্‌শেডিং হয় নাই। ন্যান খেয়ে ন্যান।'

অমিতাভর হঠাৎ অনুভবে এল, খাওয়ার খুব দরকার হয়েছে। গেলাশটা নিয়ে চোঁ চোঁ করে খেয়ে নিয়ে বললেন, 'টোটো ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'কখো—ন। শুধু টোটোবাবু ক্যানো, বাড়ির সব্‌বাই।'

'বাড়ির সব্‌বাই?'

অমিতাভ চিন্তিত প্রশ্ন করলেন, 'কেন বল্‌তো?' এক্ষুনি সবাই ঘুমিয়ে গেল কেন?'

অনন্ত খালি গেলাশটা উঠিয়ে নিল। বলল, ক্যানো কী বাবু? কদিনের ধকলটা ভাবুন? আজ এতক্ষণে নিশ্চিন্দি হয়েছে সবাই। যেন তুফানদরিয়ার মাঝি নৌকা কিনারায় এনে তুলেছে। বাড়িতে বাইরের মানুষ আর নেই। বাবাঃ কমজনা এয়েছিল? চন্দননগরের মাসির গুষ্টি, আম্‌তার পিসির গুষ্টি, আসানসোলের জ্যাটাজ্যেটি, দুগ্‌গাপুরের মামাবাবু-মামিমা, রানিগঞ্জের

দাদা-বৌদি, রাণাঘাটের কাকা, কেষ্টনগরের কে দুজনা তাছাড়া নবদ্বীপ থেকে মায়ের গুরুপুত্তুর, ও! একোজনের একশো বায়নাক্কা। রাতদিন ফাই-ফরমাস। এই অনন্ত হতভাগার তো জান্ নিকলে গেছে।'

এখন আর অমিতাভ বসুরায়ের মধ্যে অভিমান নেই, উত্তেজনা নেই, অবাক গলায় বললেন, 'এত সবাই এসেছিল?'

'এয়েছিল না তো কি বানিয়ে বলছি? তবু ওনাদের সঙ্গের ছানা-পোনাদের কথা তো বলি নাই।'

অমিতাভর কণ্ঠস্বর স্খলিত, 'এত সকলের ব্যবস্থা কে করল অনন্ত?'

অনন্ত অমোঘ নিয়তির গলায় বললে, 'কে আবার করবে? যার দায়, তিনিই করল। দায় বলে দায়, শাউড়ি মরা দায়। দাদা-বাবুদের তো মাতৃদায় বটেই, বৌদিদির দায় তারো অধিক। বাপ্‌স্! নানান জনের নানান ফ্যাচাং। ইনি এটা খান না, উনি ওটা খান না, গিন্নিরা আবার পশুপতির হাতে খাবেন না—'

'বলিস কি অনন্ত?'

অমিতাভ বসুরায়ের প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে।

দুদিন ধরে মাঝে মাঝেই অনেকজন এসে এসে অমিতাভর কাছে বিদায় নিয়ে গেছেন, কেউ কেঁদে, কেউ চোখ মুছে, কেউ নীরব বিষণ্ণতায়। অমিতাভ সকলকে তেমন করে লক্ষও করেননি। তাঁদের জন্যে যে এত সব ঝামেলার ব্যাপার ছিল তা কে জেনেছে?

অনন্ত আরও অবলীলা অবহেলায় বলে, 'শুধু কি তাই? একোজনের একো বিধেন। কেউ বলে, গঙ্গাজল খেতে হয়, কেউ বলে, চা খেতে নাই, কেউ বলে, আজকাল কেউ এত মানে না, কেউ বলে, মা তো কারো একবার বৈ দুবার মরে না, কষ্ট একটু করলেই বা।

...শুনে শুনে বৌদিদির তো মাথা ঝিমঝিম। দিদিমণি যাওয়া মাত্তর সেই যে গা গড়িয়ে শুয়ে পড়েছে, ব্যস অঘোর ঘুম। দেখাদেখি দাদাবাবুরাও। আহা, এতদিন যা কষ্ট গেছে। খাওয়ার কষ্ট, শোওয়ার কষ্ট, একোঘরে দশটা করে লোক।'

অমিতাভ একটু নিঃশ্বাস ফেললেন।

বললেন, 'আমি এত সব কিছুই জানি না। আমায় কেউ কিছু বলেনি।'

'আপনাকে কে কী বলতে আসবে? আপনি হাটের রুগী। আপনার না রোগ বেড়ে যায় এই বলে চটপট নেমে গেল, একটা অনির্দিষ্টকাল বাড়ি বসে থাকা লোকের সামনে দিয়ে।

জানালা দিয়ে চোখ ফেললে রাস্তার ওপারে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের দেখতে পাওয়া যায়, সামনেই স্টপ্। অমিতাভ তাকিয়ে থাকলেন, মনতোষ গিয়ে দাঁড়ালো, হাতে সেই পরিচিত কালো ব্রীফকেসটা। ...একটু পরে পরিতোষও এল, দাঁড়াল, চলে গেল।...বলে গেল 'সাবধানে থাকবেন।' ঠিক সেই আগের মতো।

যেন কোনও খেলায় ঘুঁটিগুলো কার হাতের ধাক্কায় এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। আবার গুছিয়ে সাজানো হল তাদের।

খবরের কাগজ দু'খানা রেখে গেল অনন্ত। যেমন যেত। এই ক'দিন কাগজগুলো কোথায় যেন উড়ে বেড়িয়েছে।

বাড়িতে কত লোক, কত হাতে ঘুরেছে, তারপর হয়তো এখানে ওখানে গড়াগড়ি খেয়েছে।

তাছাড়া অমিতাভ বসুরায় নামের লোকটার কি মনেই ছিল 'কাগজ' বলে একটা জিনিস আছে, যার জন্যে তার সকাল থেকে আগ্রহ থাকত, অধীরতা থাকত। আসতে দেরি হলে বিরক্তি লাগত।

আজ ওগুলো দেখে যেন বেঁচে গেলেন। ওরা যেন অমিতাভকে একটা আশ্রয়ের আশ্বাস এনে দিল।

কিন্তু কই? আশ্রয় মিলছে কই? পড়তেই পারছেন না যে। কাগজ পড়ার সময় কী যেন একটা থাকত, যাতে সবটা ভরাট আর আলো আলো থাকত। ওঃ, একটা উজ্জ্বল উপস্থিতি, একটা অকুণ্ঠ কণ্ঠ, 'তুমি আগে ইংরিজিখানা পড়তো, বাংলাখানা আমায় দাও, পড়ে নিই।'

সেই উজ্জ্বল উপস্থিতি, সেই অকুণ্ঠ কণ্ঠ সব কিছু আলোকিত করে রাখতো না? এই ঘর বারান্দা রাস্তা, পথ চলতি মানুষ আর গাড়ি, না:, আলাদা করে কিছু বলার নেই, সমস্ত পৃথিবীটাই সেই উপস্থিতির আলোয় ঝলমল করতো। সেই ঝলমলানিটার অভাবই অসুবিধে ঘটাচ্ছে।

কাগজগুলো উল্টে-পাল্টে সরিয়ে রাখলেন।

তাকিয়ে থাকলেন জানালার বাইরে একখণ্ড উজ্জ্বল নীল জ্যোতির্ময় শূন্যতার দিকে, যার ওপারে না কি অনন্তকালের মতো হারিয়ে যাওয়াদের মিছিল।

জীবনব্যাপী সাধনার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঞ্চয় ধূলিসাৎ করে দিয়ে অবুঝ শৈশবের একটা অলীক ধারণা এক মোহময় আশ্বাস বহন করে নিয়ে আসে, অনেক অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে নাকি চকিতের জন্য একবার ওই নীল যবনিকা বিদীর্ণ করে ফুটে ওঠে সেই মিছিলের মুখের একখানি মুখ।

রোদ চড়া হয়ে উঠছে, নীলটা এখন ঝক্‌ঝকে তলওয়ারেরমত। তাকানো যাচ্ছে না আর। চশমাটা খুলে মুছে নিলেন অমিতাভ, আর ঠিক তখনই খেয়াল হল, অনেকক্ষণ থেকে একটানা একটা কাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। বাড়িরই কোনও খানে। আশ্চর্য কেউ ওটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠছে না কেন, 'দূর হ লক্ষ্মীছাড়া! কেবল অপয়া ডাক ডেকে মরছে।'

অমিতাভ কি কাউকে জোরে ডেকে বলবেন, কাকটাকে কেউ তাড়াচ্ছ না কেন? শুনতে পাচ্ছ না কী বিশ্রী ডাকছে? কিন্তু কী করে বলবেন? অমিতাভই না, হেসে হেসে বলতেন, 'খোকা দেখ তোদের মা প্রথম ভাগখানাও পড়েনি। জানেনা "কাক ডাকে কা কা আগে অ পরে আ।"

মীরা এল, বলল 'বাবা, আপনার স্নানের সময় হয়েছে—' তারপর কাগজগুলো গুছিয়ে রেখে বলল, 'কদিন যা গোলমাল গেল, ভীষণ অনিয়ম গেছে আপনার। নাওয়া-খাওয়া কিছুই ঠিক সময়মতো হয়নি। এবার একটু নিয়মমতো—অনন্তকে পাঠিয়ে দেব হেল্‌প করতে?'

অমিতাভ তাড়াতাড়ি বললেন, 'না মা।...দরকার হবে না।'

অমিতাভর নিজস্ব স্নানের ঘরে সবই হাতের কাছে আছে, তা'ছাড়া একটা ভারী টুল পাতা আছে। মণিমালার ব্যবস্থা। হার্টের রোগীর পক্ষে দাঁড়িয়ে স্নান করা ক্ষতিকর এই তাঁর ধারণা ছিল।

স্নানের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন অমিতাভ।

এখন কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে ছেড়ে দেওয়া যায়।

জলের ট্যাপ্‌টা খুলে দিয়ে চুপি চুপি কথাও বলা যায়। ...কিন্তু কী বলবেন?

'মণি, তুমি চলে গেছ, এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা আমি কিছুতেই অনুভব করতে পারছি না কেন? কেন ভেবে ভেবে মনে করতে হচ্ছে তুমি নেই। অথচ তুমি সত্যিই চলে গেছ। এই পৃথিবীর কোনও খানে কোথাও আর দেখতে পাওয়া যাবে না তোমাকে।'

না কি বলবেন, 'মণি, তোমায় বাদ দিয়ে আমার অস্তিত্ব কোথায়? কীসের ওপর থাকব আমি? বুঝতে পারছি না। আচ্ছা কেনই বা থাকব বলতো? আমাকে আর কার কী দরকার?'

...ঠক্ ঠক্।...

দরজায় ধাক্কা পড়ল।

'বাবু কতক্ষণ চান করছেন?'

অনন্ত খোঁজ নিতে এসেছে। যেটা মণিমালা নিতেন, অমিতাভর অসুখ করা অবধি। একটু দেরি হলেই দরজায় টোকা দিয়ে সাড়া নিতেন।

তাই বলে অনন্ত? এত আস্পর্দ্ধা হল কী করে ওর? কে বলেছে ওকে এত সর্দারি করতে?

অমিতাভর ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'বেশ করব আমি, যতক্ষণ ইচ্ছে চান করব। তোদের কী?'

কিন্তু ইচ্ছে হলেই কি বলা যায়? তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে। অনন্ত বলল, বৌদিদি বলছিল, আর আপনার বাথরুমে ছিট্‌কিনি লাগিয়ে চান করা চলবে না।'

ওঃ। এই তো। এই তো সুযোগ। এই ছুতোয়ও তো চেঁচিয়ে উঠতে পারেন অমিতাভ। বলতে তো পারেন, 'কেন? কেন শুনি হঠাৎ আমার ওপর তোমাদের এত খবরদারি কীসের? উঠতে বস্‌তে তোমাদের মতে চলতে হবে না কি আমাকে?'

হঠাৎ একবার জোরে চেঁচিয়ে উঠতে ভীষণ ইচ্ছে করছে অমিতাভর। সীমার মতো জোরে। কিন্তু অমিতাভ একটা ভদ্রব্যক্তি তো? না কি?

নিঃশব্দে চলে এলেন ঘরে। অথচ সেই হঠাৎ খুব চেঁচিয়ে ওঠার একটা দুরন্ত ইচ্ছেটা মনের মধ্যে পাক খেয়েই চলেছে।

অনন্ত এল।

'বাবু, ক'দিন তো গোলেমালে আপনার খাবার এ ঘরেই দেওয়া হয়েছে, বৌদি বললে, আজ টেবিলে আসুন।'

খাবার টেবিলের ধারে মীরা দাঁড়িয়ে। বলল, 'অনন্ত পাখাটা বাড়িয়ে দে।'

অমিতাভ আহারের আয়োজনের দিকে তাকিয়ে আস্তে বললেন, 'এই সব চিকেন-ফিকেন—'

মীরা শান্ত কোমল গলায় বলল, নিয়মভঙ্গ তো হয়ে গেছে বাবা। আর দোষ নেই। ক'দিন যা খাওয়ার কষ্ট গেছে আপনার। আমরা তো তবু দই মিষ্টি ফলটল খাচ্ছিলাম, আপনারই—'

পাতের কাছে নুনের পাত্রটা এগিয়ে দিল।

তারপর গলাটা একটু তুলে বলল, 'পশুপতি বাবুকে পলতার বড়া দাওনি? কী আশ্চর্য।'

তা' আশ্চর্য হবারই কথা। কারণ জিনিসটা তুচ্ছ হলেও অমিতাভর বিশেষ প্রিয়। পুরোনো লোক পশুপতির সেটা জানবার কথা। কিন্তু মীরা? মীরা কী করে জানল? মীরা তো কখনও টেবিলের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকত না।

ফ্রিজ থেকে দই বার করে এনে পাতের কাছে রাখল মীরা। ঘরে পাতা মাঠাতোলা দুধের দই। পরিচিত নীলাভ কাচের বাটিতে।

অমিতাভ বসুরায় নামের ভদ্রব্যক্তিটির এখন সেই ভয়ানক চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল। যেরকম চিৎকার মহাশূন্য ভেদ করে কোনও একটা নামহীন কায়াহীন—ছায়ালোকে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

'মণি, মণি, তোমার সংসারকে তুমি এত নিখুঁত তালিম দিয়ে রেখেছ কেন? কেন এরা এমন

নির্ভুলভাবে তোমার সংসারকে চালাবে? যাতে বোঝাই যাবে না তুমি আছো কি নেই? না, না এ ঠিক নয়। এ ঠিক নয়। খুব ভুল করেছো তুমি মণিমালা। ...আমার ইচ্ছে হচ্ছে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাক, সব কিছু উল্টোপাল্টা। এরা হোঁচট খাক্, দিশেহারা হোক, এদের অক্ষমতা প্রকাশ পাক, অপটুতা ধরা পড়ুক। ...সবাই বুঝতে পারুক কী নিপুণভাবে সবকিছু চালিয়ে এসেছো তুমি এ-যাবৎ।...কিন্তু তা হচ্ছে না। তা' হয়নি। বাড়িতে এত লোক এসে এতদিন ধরে থেকে গেল, আমি টেরও পেলাম না। তার মানে কোনও বিশৃঙ্খলা হয়নি, কোনও অস্থিরতা।...এতে আমার কী ভীষণ রাগ হচ্ছে মণি, কী ভীষণ দুঃখ, বুঝতে পারছ না? এত দস্তুরমতো তোমার অপমান। তার মানে আমারও অপমান। ...মণি, আমি কি কটু হব? রুক্ষ হব? জোরে জোরে প্রশ্ন করব, কেন তোমরা এত নির্ভুল হবে? তোমাদের মধ্যে কি একটু নম্রতা থাকতে পারত না? একটু সৌজন্য? কিছু না হোক একটু সেন্টিমেন্ট।...'

'বাবা আপনি যে কিছুই খাচ্ছেন না। সকালে ব্রেকফাস্টও সবই প্রায় ফেলে রাখলেন। আজ তো তা হলে একবার ডক্টর মিত্রকে আসতে বলতে হয়। ভালো করে একবার দেখুন—'

অমিতাভ চমকে উঠলেন।

যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন।

তাড়াতাড়ি বললেন, 'কেন? ডাক্তার কেন? এই তো খাচ্ছি তো—'

প্রমাণস্বরূপ পরপর দু'গ্রাস ভাত মুখে পুরে ফেললেন। ...আলাদা একটা প্লেটে মীরা অমিতাভর মাছটার কাঁটা বেছে রাখছিল, সেটা ওঁর পাতের কাছাকাছি এগিয়ে দিয়ে একটু হেসে বলল, 'যত টেস্টফুল মাছগুলোতেই যত রাজ্যের কাঁটা, দেখেছেন বাবা।'

অমিতাভর চোখটা ইদানীং বেশি খারাপ হয়ে যাওয়ায়, তাঁর মাছের কাঁটা বেছে দেওয়া হত। আজও হল।

অমিতাভ আর চেঁচিয়ে উঠতে চাইলেন না।

শুধু একটা হতাশ নিঃশ্বাস চেপে ফেললেন। ভাবলেন, কী আশ্চর্য! মণি, কোথাও কোনওখানে তাহলে একটু ফাঁক পাওয়া যাবে না, যেখানে তোমার মৃত্যুটাকে একটু আশ্রয় দেওয়া যায়? সামান্যতম একটু ঠাঁই?...

ভাবলেন, ভাবতেই লাগলেন, নাঃ মণিমালার হাতেগড়া এই সংসারে আর কোথাও পাওয়া যাবে না সে ঠাঁই। অমিতাভ অনুভব করছেন, সেই মৃত্যুটারই মৃত্যু ঘটেছে। শবদেহটাকে তুলে রাখবার গরজ কার অমিতাভ বসুরায় ছাড়া? অমিতাভ তাই ওই শবটাকে খুব সাবধানে আপন পঞ্জরাস্থির মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন।

একটি করুণ কাহিনী

গিয়েছিলাম পুজোর সময় দার্জিলিং, উঠেছিলাম লুইস জুবিলি স্যানাটেরিয়ামে। ভ্রমণের আনন্দ এবং 'জাতিধর্ম' দুই-ই যাতে বজায় থাকে সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে "অর্থোডক্স" ডিপার্টমেন্টে আশ্রয় নিয়েছি, আশপাশে কিছু সগোত্র প্রতিবেশিনীও পাওয়া গেছে।

একটি পরিবারের সঙ্গে একদিন "টাইগার হিল"-এ সূর্যোদয় দেখে আসার সূত্রে বেশ একটু ঘনিষ্ঠতাই হয়ে গেল।

তবে পারিবারিক পরিচয়ের বাইরে নিজের যে তুচ্ছ একটুখানি পরিচয় আছে, সেটুকু সযত্নে গোপন রেখেই চলেছি।

ওঁদের রুম এগারো, আমাদের তেরো। মধ্যবর্তিনীটি নিতান্তই তরুণী, চুলে যাদের পাক ধরেছে তাদের সযত্নে এড়িয়ে চলেন।

কাজেই—এক ঘর টপকে ও ঘরের সঙ্গে আলাপ জমানো।

এগারো নম্বর প্রায়ই এ ঘরে আসেন, এবং আমার টেবিলে পুজো বার্ষিকীর ছড়াছড়ি দেখে (ছড়াছড়ির কারণ—রুম নম্বর তেরোর কর্তা ছুটির মধ্যে পড়ে শেষ করবার বাসনা নিয়ে ডজনখানেক পত্রিকা সঙ্গে এনেছেন) পুলকিত চিত্তে মন্তব্য করেন—"আপনারও দেখছি আমারই মতো বই বাতিক! পয়সার কাঁড়ি নষ্ট করে কত বই কিনেছেন? আমিও অবিশ্যি ওই বাতিকের জ্বালায় এই পুজোর সময় অনেকগুলো পয়সা জলে দিই, তবে আপনার মতো এত না।"

আমাকে যে এ বইগুলির জন্যে পয়সা একটিও জলে দিতে হয়নি, সে খবর আর ফাঁস করে ফেলি না।

সর্বভাবময়ী এবং সর্ববাক্যময়ী একটু হাসির দ্বারাই উত্তর সমাধা করি। তবে তাঁর পয়সাগুলি যে জলেই গিয়েছে সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত পোষণ করি না।

এগারো নম্বর বলেন—"এখানে হৈ হৈ করে কেটে যাচ্ছে তাই বুঝতে পারছেন না, নইলে চব্বিশ ঘণ্টা শুধু বই নিয়েই থাকি। কর্তার কাছে কম বকুনি খাই তার জন্যে? কিন্তু কী করব ভাই, পারি না। বই নইলে একদণ্ড থাকতে পারি না।"

হৈ হৈ করে কাটছে সকলেরই।

এর মধ্যে একদিন একটি মজার ব্যাপার ঘটল।

'ঘটল' মানেই যে তার মধ্যে কোনো 'ঘটনা' আছে তা নয়, সে আশা করবেন না। ঘটল—'ব্যাপার'।

ঘটনা কোথায়?

সারা জীবনের ইতিহাস তন্ন তন্ন করে দেখেছি, কোথাও একটি 'ঘটনা' চোখে পড়ে না। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী দেবী ভুলেও কোনওদিন ফিরে তাকাননি আমার দিকে!

যা সচরাচর ঘটছে, যা অনেকের জীবনেই ঘটে থাকে তাকে আর ঘটনা বলা যায় কী করে।

—একটা কুকুর যখন কোনও মানুষকে কামড়ায়, সেটা তো আর সংবাদ হয় না? সংবাদ হয় তখনই যখন কোনও মানুষ একটা কুকুরকে কামড়ায়।

সত্যি, ভারি খেদ হয় যখন আগাগোড়া জীবনটা হাতড়েও একটিও 'সত্যি গল্প' লেখবার মতো ঘটনা খুঁজে পাই না।

অথচ দেখছি তো ধারে কাছে, মনে হয় আমি বাদে সকলের জীবনেই গাদা গাদা 'ঘটনা'। এক এক ভাগ্যবানের জীবন তো দেখি 'ঘটনা'র চাষ চলে।

তার সাক্ষ্য দেখবেন—ওঁদের জীবন কাহিনীতে, ভ্রমণ কাহিনীতে। ওঁরা যদি ভ্রমণে বেরোলেন তো স্টেশন প্লাটফরম থেকেই ঘটনা শুরু হল। পথেঘাটে হোটেলে রেস্তোরাঁয় মন্দিরে ধর্মশালায় যেখানে যত রূপসী তরুণী আছে সকলে মিলে পালা করে সেই ভাগ্যবানেরই প্রেমে পড়তে থাকে। আর চমৎকার এক একটি গল্পের মতো সুন্দর সুন্দর ঘটনা ওঠে জমে।

ওঁদের পক্ষে 'সত্যি গল্প' লেখা কত সোজা।

সোনার সঙ্গে কতটুকু খাদ মিশালে খাঁটি গিনি সোনা হয়, আর 'সত্যির' সঙ্গে কতটুকু গল্প মিশেল দিলে খাঁটি সত্যি গল্প হয়, এটা জানা একটা আর্ট বই কী!

সে আর্ট সকলে আয়ত্ত করতে পারে না।

যাক্‌গে—কী বলছিলাম—

হোটেলের চাকরটা একদিন বুঝি ভুলক্রমে আমাদের চিঠি ওঁদের ঘরে দিয়ে এসেছে। বিজয়া দশমীর পরদিন চিঠি দুচারখানা আসছেই এদিক-ওদিক থেকে।

দেখি—এগারো নম্বরের ভদ্রমহিলা দু'খানা চিঠি নিয়ে ছুটে এসেছেন। আমার দিকে এগিয়ে বললেন, এ চিঠি আপনার?

হাতে নিয়ে উল্টে দেখলাম একখানা খাম, একটা পোস্টকার্ড। মেয়ের আর বোনের। সৌজন্যের হাসি হেসে বললাম—হ্যাঁ আমারই। আপনার চিঠির সঙ্গে দিয়ে গেছে বুঝি?

—আর বলেন কেন। বুদ্ধি দেখুন মুখপোড়ার, রুম নম্বর এগারোর চিঠির সঙ্গে তুই রুম নম্বর তেরোর চিঠিটাও দিলি কী বলে?

পাহাড়ি ভৃত্য 'জ্যেঠু'র পক্ষে এ ভুলটুকু করে ফেলা খুব একটা মারাত্মক ভুল বলে মনে হয় না, তবু বলি—ওর ভুলের খেসারৎ দিতে আপনাকে আবার ছুটে আসতে হল।— তাতে কি? ক্ষয়ে তো আর গেলাম না। বরং শাপে বর হল।

কীসের শাপ, কীসের বর?

—ধরে ফেললাম আপনাকে। ভেবেছিলেন ফাঁকি দিয়ে পার পেয়ে যাবেন, কেমন? এখন? ধর্মের কল বাতাসে নড়ল তো? আচ্ছা দিদি এতদিন আলাপ হয়েছে, পরিচয় দেননি কেন বলুন তো?

হেসে ফেলে বলি—কীসের পরিচয়?

—আহা, আর লুকোতে হবে না। যাক ভাগ্যিস চিঠি বিভ্রাট হল। তাই না জানতে পারলাম? কিছু মনে করবেন না, আপনার বোনের লেখা পোস্টকার্ডখানি পড়ে ফেলেছি। তাইতেই তো

ধরে ফেললাম।

বোনের লেখা পোস্টকার্ড ততক্ষণে আমিও পড়ে ফেলেছি। দেখলাম তিনি কার্ডেই কবিত্ব করেছেন। প্রশ্ন করা হয়েছে দার্জিলিঙে এসে ক্যালকাটা রোডের নির্জনতায় কোনও গল্পের উপকরণ পেয়ে গেলাম কি না।

এগারো নম্বর আবার বলেন, দেখুন দিকি, এত বড় একটি গুণী মানুষকে নিয়ে এই ক'দিন ধরে ঘর করলাম, অথচ কিছু টের পেতে দেননি।

বললাম—ভারি তো গুণী।

"—আপনার দেখছি ভারি বিনয়। বাঙলা দেশে কে না আপনার নাম জানে? সত্যি, আপনার লেখা যে কী ভালো লাগে আমার!"

একটুখানি স্নিগ্ধ হাসি হাসলাম।

সত্যি বলতে — ভদ্রমহিলার বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর হঠাৎ যেন বেশ একটু আস্থা জন্মে গেল।

এত গেল প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখি এগারো নম্বর তাঁর স্বামী বেচারাকে ধরে এনেছেন লেখিকা সন্দর্শনে! ভদ্রলোক শুনেছি কারবারি লোক, বাজারদরের ওঠা পড়ার দিকে তাকিয়েই দিন কাটে নিশ্চয়। তাঁকে ধরে এনে এ কি বিড়ম্বনা?

হেসে বললাম সন্দর্শন তো দিনভোরই হচ্ছে।

একগাল হেসে এগারো নম্বর বললেন সে আলাদা দেখা, এ হল নব দর্শন।

বুঝুন কপাল আমার! ভাগ্যে যদিও বা একটি নবদর্শনের দর্শক জোটে তো সে কি না নীরেট নিটোল একটি। কিন্তু ওকথা থাক—কী জানি এ লেখা কখন কার চোখে পড়ে।

যাই হোক তবুও বলব লোকটি লোক ভালো।

কথা কয়ে বুঝলাম, 'লেখক' শব্দের ভাষাগত অর্থটুকু জেনে রাখা ছাড়া, এ যাবৎ আর কখনও তাদের সম্বন্ধে মাথা ঘামাননি ভদ্রলোক, তথাপি বই বাতিক গৃহিণীর পাল্লায় পড়ে ঝাড়া একঘণ্টা জলজ্যান্ত একটি লেখিকার সঙ্গে 'সাহিত্য' নিয়ে আলোচনা করে গেলেন।

আলোচনার ধারাটা এই ধরনের, যথা—লিখে মাসে কত করে আর হয় আমার, নিয়মিত হিসেব না থাকলেও গড়ে? নিজের বই নিজে না ছাপিয়ে পাবলিশারের হাতে দিই কেন? পাবলিশার যে সততা রক্ষা করে চলেন তার প্রমাণ কি? তাঁদের সঙ্গে কী কী শর্ত থাকে? সম্পাদক এবং প্রকাশকের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি না? সিনেমা কোম্পানি তো অনায়াসেই দু-চারটে টাকা খরচা করে বাজার থেকে ছাপা বই কিনে নিতে পারে, তবে লেখকের কাছ থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে আসে কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ তো কাটলো সন্ধেটা। পরদিন দেখি আমাকে আবিষ্কারের গৌরবে গৌরবান্বিতা ভদ্রমহিলা মিটি মিটি হাস্য সহযোগে এসে দাঁড়িয়েছেন সঙ্গে জনাতিনেক দর্শনপ্রার্থিনী নিয়ে।

ছোট্ট ঘরটুকু জিনিসে বোঝাই, কোথায় বসাই ভেবে পাই না। ঘরের লোকটিকে তাড়া দিয়ে 'লন'-এ পাঠাই। যাঁরা এসেছেন তাঁরা একেবারে বিগলিত আনন্দে একে একে বলেন—"উঃ আপনার সঙ্গে যে এমন অপ্রত্যাশিত দেখা হয়ে যাবে এ কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি!.... আপনার লেখা যে কি ভালো লাগে আমাদের!.... আচ্ছা কী করে লেখেন আপনি? ... প্রথম কবে লিখতে শিখলেন?"......

.....আরও অনেক কিছুই বল্লেন এঁরা, কিন্তু সব কথা লিখতে গেলে আপনারা হয়তো ভেবে বসবেন, এই সুযোগে নিজের পাবলিশিটি করে নিচ্ছি। শুধু বলে রাখি, এরকম একদিন নয় রোজই ঘটে। ... যখন তখন দর্শনার্থীর আবির্ভাব হয় ঘরে।

এগারো নম্বর আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলেন—কি, এইবার রাখুন নিজেকে লুকিয়ে? .... রাখতে পারলেন? আগুন কি ছাই চাপা থাকে?"

তুলনা শুনে প্রাণে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। বলা বাহুল্য এগারো নম্বরের বোধ শক্তির প্রতি আস্থা ক্রমশই বাড়ছে। এখন আর উনি এঘরে বেড়াতে এলে, এই রে আবার আসছেন ভেবে হতাশ হই না, পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করি।

তাছাড়া অতিথি এলে ঘরের লোকটিকে আর ঘরছাড়া করি না আজকাল। বলি, থাকো লেপের তলায়, এই নতুন কার্তিকের হিম, বাইরে বেড়িয়ে সর্দিকাশি ডেকে আনতে হবে না।

বাইরের বেড়ানো সেরে সন্ধ্যার পরই আসেন কি না ভদ্রমহিলা। এসেই অবশ্য তাঁর নিজের বই পড়ার বাতিকের কথা পাড়েন। ওঁর যে শুধু একটা লাইব্রেরিতে কুলোয় না, সর্বদা দুটো লাইব্রেরি থেকে বই আসে, রাত্রে বই পড়তে পড়তে যে এক এক সময় রাত কাবার হয়ে যায় ওঁর, বই পড়ার নেশার জ্বালায় যে ছেলেবেলায় শ্বশুরবাড়িতে বহু গঞ্জনা খেয়েছেন, এসব কথা শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য তারই ফাঁকে ফাঁকে আমার নৈবিদ্যিও সাজানো।

"জীবন ভোর পড়েই ম'লাম, লিখতে তো শিখলাম না। কখনও। আপনাকে দেখে হিংসে হয়। সত্যি, কী লেখাই লেখেন ভাই। আহা আপনার "বলয় গ্রাস" টা যখন পড়েছিলাম, কেঁদে আর বাঁচিনে! একা পড়ে সুখ হয়নি, কর্তাকে ধরে বেঁধে শুনিয়ে তবে ছেড়েছিলাম!"

যতক্ষণ না খাবার ঘণ্টা পড়ে, ততক্ষণ গল্প চলে।

উনি চলে গেলে রুম নম্বর তেরোর কর্তা লেপের তলা থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আহা বেচারা!

বেচারা আবার কে হল?

রুম নম্বর এগারোর কর্তা। তাঁবু দুর্গতি শুনে আমারই কান্না পাচ্ছিল!

এমনি চলতে চলতেই মেয়াদ ফুরিয়ে এল!

কালই রওনা।

'চল মুসাফির তোল ডেরা' গোছের মনোভাব নিয়ে এটা ওটা গোছাচ্ছি, রুম নম্বর এগারো এসে পর্দা ঠেলে ঢুকলেন। সঙ্গে একটি তরুণী বৌ।

নতুন কেউ নয়, আমাদেরই মধ্যবর্তিণী বারো নম্বর। বুঝলাম এতদিন গ্রাহ্য করে কারো সঙ্গে আলাপ করেননি বলেই বোধহয় তাঁর পাশের ঘরে কী রত্ন লুকানো ছিল জানতে পারেননি। শেষ বাজারে টের পেয়ে আপশোশ ভরে ছুটে এসেছেন।

এগারো নম্বর আমার কর্মপদ্ধতির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন নেহাৎই মায়া কাটাচ্ছেন তাহলে?

হেসে বললাম, মায়া তো একদিন সকলকেই কাটাতে হবে।

যা বলেছেন! এগারো নম্বর দার্শনিকের ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হাসি মিশিয়ে বলেন "ঠিক বটে! এই হোটেলখানাই যেন একটা জগৎ!" লোকে আসছে যাচ্ছে, যার যতদিন মেয়াদ ততদিন থাকছে। এর মধ্যেই ভাব ভালোবাসা আবার ছাড়াছাড়ির দুঃখু! সত্যি এও এক ভগবানের রাজ্য!"

চিন্তাশীলতার পরিচয়ে মুগ্ধ হলাম। অথচ আগে মনে মনে কত অবিচারই না করেছি! কতটুকু পরিচয়ে আমরা মানুষকে বিচার করি।

উনি বলতেই থাকেন, বেশ থাকা গিছলো ক'দিন, চিরকাল মনে থাকবে। গিয়ে সবাইয়ের কাছে গল্প করব।

বারো নম্বরটি চুপচাপ কেমন যেন ব্যঙ্গ মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল!

জানি এটা একরকমের ফ্যাসান!

'জগতের সবাইয়ের দিকে আমি তাচ্ছিল্য দৃষ্টি হানছি', এই একরকম ভাব এক একজন বেশ রপ্ত করে নেয় হাসিতে চাউনিতে।

এ চাউনির সামনে ঠিক সৌজন্যসূচক অভ্যর্থনা আসে না, অথচ অতিথি। সঙ্কট মোচন করলেন এগারো নম্বর।

বারো নম্বরের দিকে, ব্যঙ্গ কৌতুক এবং তিরস্কার মিশ্রিত একটি দৃষ্টিপাত করে বললেন, কই গো চুপ কেন? এই তো খোদ জায়গায় এনে দিয়েছি, সন্দেহ ভঞ্জন করো?

হেসে বললাম, কীসের সন্দেহ?

আর বলেন কেন। এতক্ষণ এনার আমার সঙ্গে তুমুল তর্ক। ইনি বলেন কিনা আপনি নাকি কস্মিনকালেও লেখিকা নন, আমাকে বোকা পেয়ে নাকি মিছামিছি চাল মেরেছেন। আপনি যাঁর নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছেন, তাঁকে নাকি ইনি খুব চেনেন। শুনুন তো হাসির কথা। আপনার বিনয়ের জ্বালায় মরি, আর আপনি দেবেন বাজে চাল।

শুনে কীভাবে তাকিয়ে ছিলাম তখন বুঝতে পারিনি, পরে মনে হয়েছে— সাধু ভাষায় তাকেই বোধহয় স্তম্ভিত দৃষ্টি বলে।

বাকশক্তি ফিরে পাবার আগেই এগারো নম্বর ফের কারোকে উদ্দেশ করে কৌতুক হাস্য বিজড়িত মুখে বললেন—নাও এখন বলো—আজন্মকাল ভাগলপুরে আছি আমরা, এঁকে কখনও ভাগলপুরের ছায়া মাড়াতে দেখিনি।

বলো—'এরকম চালবাজি আমার ঢের জানা আছে—' বলো— "হোটেলের খাতায় দেখেছি তেরো নম্বরের কর্তার পদবি "গুপ্ত" ... বলো সব। শুনে হাসবে সব। আপনার কর্তার পদবি না কি গুপ্ত।

এতক্ষণে বাকশক্তি ফিরে পেয়ে গম্ভীর হাস্যে বলি—ইনি ঠিকই বলেছেন, পদবি গুপ্তই তো।

এগারো নম্বর থতমত খেয়ে শুকনো হাসি হেসে বলেন—দিদির বেশ কথা, উনি যদি গুপ্ত আপনি তবে সিংহ হলেন কেমন করে?

—সিংহ হয়েছি, একথা কবে বললাম আপনাকে?

আমার তুষ্ণীভাব দেখে ভদ্রমহিলা একটু মুসড়ে পড়লেন মনে হল। ম্লান মুখে করুণ প্রশ্ন করলেন—কেন, আপনি আশালতা সিংহ নন?

—না।

তরুণী বৌটি বিনা বাক্যে একটু মুচকি হেসে সট্‌কান দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এগারো নম্বর কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন। ওঁর মুখের চেহারা দেখে একটু করুণা হল। তুষ্ণীভাব ত্যাগ করে হেসে বললাম—সেদিন চিঠির ওপর কী নাম দেখেছিলেন আমার? ভাবুন তো—

—'কী জানি ভাই, মোটামুটি চোখ বুলিয়ে গেছি নামটা দেখেছি, সিংহ কি 'গুপ্ত' অতটা লক্ষ করিনি। আপনার বোন 'লেখা' লেখা করে কী যেন লিখেছিল, তাতেই মনে করলাম বুঝি লেখিকা। এই এক স্বভাব আমার কখনও জিনিসের শেষ পড়তে পারি না আলিস্যি লাগে। যাক্ ভাই, বোকা পেয়ে কদিন খুব বাঁদর নাচ নাচিয়ে নিলেন। বারো নম্বর চালাক মেয়ে এক নজরেই ধরে ফেলেছে।"

উচ্চারণোদ্যত কথাকে অনুচ্চারিতই রাখতে হল। এরপর পার কোন মুখে যে বলয় গ্রাস পড়ে কেঁদে ভাসিয়ে ছিলেন তার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা তুলি? তাছাড়া—নাচাটা কোন্ পক্ষে সেটাও তো ভাববার কথা?

[১৩৫৭]

এখনও নেভেনি হোমের আগুন

মাঝরাতে হঠাৎ ঝড় উঠল।
যেখানে যত কপাট আছে, খিলছিটকিনির বন্ধনমুক্ত হয়ে আছড়ে পড়ল একযোগে। দেয়ালের গায়ে গায়ে বাতাসের 'শোঁ শোঁ' শব্দ আছাড় খাচ্ছে চাপা আর্তনাদের মতো। মুহূর্তে ধুলোয় ভরে গেল—পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ঘর-দোর, বালিশ বিছানা, আসবাব পত্র।...

অসতর্ক ঘুমন্ত মানুষ—হঠাৎ জেগে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, কোনটা সামলাবে আগে?

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসেছে সুমিতা, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে তেষ্টায়, হাতে পায়ে ঘাম।...না, ঝড়ে ঘুম ভাঙায়নি সুমিতার, ভাঙিয়েছে দুঃস্বপ্ন। মাঝরাতে যখন হঠাৎ ঝড় উঠেছে, দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল সুমিতা।

পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বিধবা ননদ নলিনী। ঝড়ে তাঁকে ধাক্কা দিতে পারেনি, ধাক্কা দিল সুমিতা।

—ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি, একটু জল দিতে পারো আমায়? ঠাণ্ডা জল?

নলিনী হতচকিত হয়ে উঠে বসে ভয়তরাস গলায় প্রশ্ন করে—কী হয়েছে বৌদি? দাদা—

—না না, ভয় নেই ঠাকুরঝি, দাদা তোমার বেশ ঘুমোচ্ছেন, আমারই কেমন হঠাৎ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল, দেখছি গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে ...ও বাবা, কী ঝড় উঠল গো।

'ঝড় উঠলো গো' বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সুমিতার প্রকৃতিতে খাপ খায় না, তবু বোকার মতো বসেই থাকল সে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ...হঠাৎ ক্ষেপে-যাওয়া আবদেরে মেয়ের মতো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত যে 'আপ্‌সা আপ্‌সি' করছে।

নলিনী উঠে আত্মরক্ষার প্রাথমিক প্রতিবিধানস্বরূপ তাড়াতাড়ি জানলার কপাটগুলো বন্ধ করে দিয়ে কুঁজো থেকে একগ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে সসঙ্কোচে বলে—বিছানার কাপড়ে জল খাবে বৌদি?

—খাব না? কেন বলো তো?

—আজ 'সঙ্কটা চণ্ডীর' উপোসে আছো না?

—ওঃ—

হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে খালি করে নলিনীর হাতে ফেরত দিয়ে সুমিতা সহজ স্বরে বলে—রাত্রে 'বারদোষ' থাকে না ঠাকুরঝি। তা'ছাড়া—জল না খেলে পেরেও উঠতাম না ভাই।

সহানুভূতিতে গলে যায় নলিনী—পেরে যে ওঠো কী করে তাই ভাবি। অবাক হয়ে যাই বাবা, মাসের মধ্যে কম করে দশবারোটা দিন তো উপোসেই যাচ্ছে। ...মাসে দু'টো মোটে একাদশী, তাইতেই তো আমার একেবারে—

অপ্রতিভ হয়ে থেমে যায় নলিনী। ...বিধবার একাদশীর সঙ্গে নাকি সধবার কোনও কিছুরই তুলনা করতে নেই।

—তবে—অবাক সে সত্যিই হয়।

আজ পর্যন্ত সুমিতার মতো এমন অকাতর উপবাসপটুত্ব সে দেখেনি কারুর, দেখেনি এমন অসাধারণ স্বামীভক্তি। রুগ্ন স্বামীর আরোগ্য কামনাতেই না এই অন্তহীন তপশ্চর্যা সুমিতার, এই বেপরোয়া কৃচ্ছ্রসাধন?...তেত্রিশকোটি দেব-দেবতা কারোর উপরই অনাস্থা নেই সুমিতার, ব্রতে আর উপবাসে যেন নিজেকে ঝাঁজরা করে ফেলে বাঁচিয়ে তুলতে চায় স্বামীকে। বিয়ে হয়ে ইস্তকই তো বিছানায় পড়ে আছে ললিত।

শুধু অবাক নয়, কেমন যেন ভয়ও লাগে নলিনীর।

নলিনী কি পারত? দেবেশ যদি বেঁচে থাকতো, তাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে নলিনী পারত এত সাধনা করতে?...তিনটে রাতের বেশি সে তো রাতই জাগতে পারেনি, আর তার 'কালঘুমে'র সুযোগ নিয়ে দিব্যি ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল দেবেশ।

আর সুমিতার তপশ্চর্যা যেন যুদ্ধ। অহরহ যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে সুমিতা।

পাশের ঘরেই ঘুমোচ্ছে ললিত। দু'টো ঘরের মধ্যবর্তী খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল বাল্‌বের মৃদু স্বপ্নময় আলো, ঘূর্ণ্যমান বিজলিপাখার পক্ষ-তাড়নায় আন্দোলিত নেটের মশারির একাংশ।

অজ্ঞাতসারেই সেদিকে তাকাল নলিনী, বলল—কী ভাগ্যিস, এত ঝড়ের শব্দেও ঘুম ভাঙেনি দাদার?

—ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছেন যে—সুমিতা বলল—

ভারি অপ্রতিভ হয় নলিনী—আর কী যে পোড়া ঘুম আমার চক্ষে! কখন ঘুমোলেন?

—এই তো কিছুক্ষণ আগে। কী ভীষণ হাঁফের টান্—উঃ! দেখে সহ্য হয় না। ঘুমের ওষুধ দিতে, তবে—

—আমি মুখপুড়ি যেন বিছানায় পড়ি আর মরি, জ্ঞান থাকে না। তোমার কত কষ্ট হয় একলা।

নলিনী ভারি কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

সুমিতার কিন্তু রাগ নেই, ক্ষমা আছে তার শরীরে। বলে—তোমারও তো সারাদিনের খাটুনির শরীর, শুয়ে পড়ো ঠাকুরঝি, শুধু শুধু ঘুমটা ভাঙালাম তোমার।

—আমার ঘুমের মুখে আগুন, আর ঘুমোতে চাই না বাবা।

সুমিতা হেসে ওঠে—রাগ করে ঘুমোবেই না আর? নাও নাও শুয়ে পড়ো।

নলিনী শুয়ে পড়ে, মিনিটখানেক পরে মৃদু গলায় বলে—কী দুঃস্বপ্ন দেখলে বৌদি?

—দুঃস্বপ্ন? ও। যা দেখলাম বলবো কি না তাই ভাই ভাবছি—সুমিতা বলতে থাকে—দেখলাম কী জানো?...যেন তোমার দাদার খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা, আর আমি গিয়েছি 'অরুণেশ্বরের' মন্দিরে পুজো দিতে—

—'অরুণেশ্বর' কী বৌদি?

—'অরুণেশ্বর শিব' যে—শোনোনি? আমার বাপের বাড়ি থেকে তিন ক্রোশ দূরে। ভারি

জাগ্রত দেবতা।...স্বপ্ন দেখছি—সেই পথ সেই পুকুর, সেই মন্দিরের সামনে নাটমন্দির...ষোড়শোপচারে পুজো সাজিয়ে সবে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছি—আর ধাক্কা লাগল একজনের সঙ্গে, ঝন্‌ঝন্ করে পড়ে গেল হাতের থালা, পুজোর সবগুলো স্তূপাকার হয়ে গেল...চমকে উঠেই লোকটার দিকে তাকাতেই যেন হঠাৎ ঝড় উঠল...এলোমেলো হয়ে গেল চারিদিক, আর ঘুমটা ভেঙে গেল। ...জেগে দেখি সত্যিই ঝড় উঠেছে।

—তাই তো—

ভয়ে দুঃখে গলা বুজে আসে নলিনীর—পুজো দিতে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে গেল? কি জানি কপালে কী আছে!

সাড়া পাওয়া যায় না সুমিতার দিক থেকে।

নিঃশব্দ কয়েকটা মিনিট।

—বৌদি! তোমার কিন্তু একবার যাওয়া উচিত।

—কোথায়?

সুমিতা যেন চমকে ওঠে।

—ওই যেখানে বললে। ওই অরুণেশ্বরের মন্দিরে।

—যাওয়া উচিত?

ধড়মড় করে উঠে বসে সুমিতা—সত্যি বলছো ঠাকুরঝি? যাওয়া উচিত? যাওয়া যায়?

—তাইতো ভাবছি বৌদি, কী অপরাধে যে কি হচ্ছে কে জানে। সাজানো পুজো নষ্ট হয়ে গেল, এ স্বপ্ন তো ভালো নয়! আমি বলি—একদিন যাও—

সুমিতা ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে ফের, নিস্তেজ গলায় বলে—কী করে যাব? তোমার দাদার এই অবস্থা!

নলিনী সান্ত্বনার সুরে বলে—আমি তো রয়েছি, যেমন করে হোক চালিয়ে নেব।...দূরের রাস্তা তো নয়? ভোরের গাড়িতে বেরোলে সন্ধের মধ্যেই তো ফিরতে পারবে?

—তা পারা যায়।

—তা'হলে আর চিন্তা করো না বৌদি, ষোড়শোপচারে পুজো দিয়ে মানসিক করে এস দাদার নামে।

—মানসিক করে আসবো? তোমার দাদার নামে? ও! কিন্তু স্বপ্নের কি সত্যিই কোনও মানে আছে ঠাকুরঝি?

—ভালো স্বপ্নের না থাক, দুঃস্বপ্নের খুব আছে বৌদি। দেখলাম তো কতবারই।

নলিনীর কথাই রইল।

রুগ্ন স্বামীর জন্যে দেবতার কাছে 'মানসিক' করতে সাত বছর পরে আবার বাপের বাড়ির দেশে পা দিল সুমিতা।...ঘণ্টা তিনেকের পথ, তবু এই সাত বছরেও সময় হয়নি এক ঘণ্টার জন্যে আসতে।

কিন্তু কার কাছেই বা আসবে?

সুমিতার বিয়ের বছর না ঘুরতেই বাপ গেলেন মারা, ভাই ভাজ চলে গেল বিদেশে। কোথায় তবে আসবে সুমিতা?

আজই যে এসেছে, এ কি বাপের বাড়িতে? না, বাড়িতে নয়—বাপের বাড়ির দেশে। স্টেশন থেকে গরুর গাড়ি ঠিক করেছে সোজা 'শিবতলায়' যাবার চুক্তিতে। মরচে পড়া একটা তালা ঝোলানো, বাপের বাড়ির দরজাটা একবারটি চোখে দেখে চক্ষু সার্থক করবার সাধ নেই সুমিতার।

কিন্তু স্টেশন থেকে সোজা গেলেও কি পৌঁছতে পারবে ঠিক সময়ে?

রাস্তার মহিমায় গাড়ির গতি ক্রমশই মন্থর হয়ে আসছে। পথের এখনও অনেক বাকি যে! বারোটা বাজলে মন্দিরের দরজা যাবে বন্ধ হয়ে।

—বিমল, তোর ঘড়িতে ক'টা বাজল বাবা?

পল্লিপ্রকৃতির শোভা সন্দর্শন-নিরত অন্যমনস্ক বিমল চমকে উঠে মণিবন্ধের ঘড়িটার দিকে চোখ বুলিয়ে বলে—এগারোটা পঁয়ত্রিশ—মামি!

—বলিস কি? অ্যাঁ। —সুমিতার কণ্ঠে উদ্বেগ—বারোটা বাজলেই যে বন্ধ হয়ে যাবে রে—কী হবে?

—কুছ পরোয়া নেই মামি, কাল বেলা বারোটা নাগাদ ঠিক পৌঁছে যাবে দেখো।

—যা বাপু বাজে বকিস নি, প্রাণ ছটফট করছে আমার। এত কষ্ট করে এসে পুজো না দিয়ে ফিরে যাব? ফিরতে তো আমাকে হবেই আজ। গাড়োয়ানটাকে একটু বল না বাবা।

বিমল হতাশের ভঙ্গিতে দুই হাত উল্টে বলে—ব'লে আর হবে কি মামি? ওর তো দোষ নয়, দোষ তোমার বাপের দেশের চৌরঙ্গীর। উঃ রাস্তা বটে একখানা।

সুমিতা সে কথায় কান না দিয়ে ব্যাকুলভাবে বলে—এই রাস্তা দিয়েই তো সব কাজ চলছে এ দেশের। যাই হোক, তুই একবার ভালো করে তাড়া দে গাড়োয়ানটাকে।

—তাড়া খেলেই ওর পালোয়ান বলদ দু'টি ঝোপ জঙ্গল ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবে, এই কি তোমার বিশ্বাস মামি?

—ও রকম গা-আলগা কথা কসনে বিমল, শুনে গা জ্বালা করে। তোর সঙ্গে আসাই ঝকমারি হয়েছে আমার। বেশ, তুই না পারিস আমিই বলছি।

—নাঃ, তুমি দেখছি সত্যিই চটছো মামি!...ওহে, ও মহাপ্রভু, গাড়ি যে তোমার পেছন দিকে এগোচ্ছে মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি?

গাড়োয়ানটা গরু দুটোকে ধাক্কা মেরে বিব্রতভাবে বলে—আজ্ঞে বাবু, রাস্তা খারাপ।

এবার সুমিতা নিজেই মুখ বাড়ায়—রাস্তা খারাপ, সে তো তোমাদের জানা আছে বাপু, তবে ভরসা দিলে কেন ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবে বলে?

—আজ্ঞে হয়ে যাবে ঠিক।

শেষ অস্ত্র হিসাবে গাড়োয়ানটা গরুকে আর একবার ধাক্কা মেরে একটা অবোধ্য কটূক্তি করে অবোলা জীব দু'টির উদ্দেশে। পরমুহূর্তেই তারা স্বাভাবিক মন্থরতা ত্যাগ করে অ-সমতালে দৌড়তে থাকে।...

ঝাঁকুনি লেগে কাহিল হয়ে যাবে সুমিতা? না কি, ওর ভিতরের আলোড়ন-টাকে সহনীয় করতে বাইরের এমনি একটা ঝাঁকুনির প্রয়োজন ছিল?...দৈহিক ক্লেশ কি মানসিক যন্ত্রণার ঔষধ নয়?...অসহনীয় আবেগে কেন তবে লোকে দেয়ালে মাথা ঠোকে, চুল ছেঁড়ে, নিজের হাত কামড়ায়?

অকস্মাৎ একটা অর্থহীন আবেগে এমন পাগলের মতো ছুটে চলে আসার জন্যে কি সেই মানসিক যন্ত্রণা শুরু হয়েছে সুমিতার?

কিন্তু বিমলের তো মানসিক সমস্যার বালাই নেই—ওর পক্ষে এই বোতল ঝাঁকুনি অসহ্য, তাই মিনিট দুই তিন "উঃ আঃ" করার পর হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে—মাসিগো, তোমার বাবার দেশে হাসপাতাল আছে তো?

—হাসপাতাল!...সুমিতা চমকে উঠে অবাক হয়ে বলে—কেন?

—কেন কি মামি? তুমি কি ভেবেছো হাড়গোড়গুলো আস্ত নিয়ে ফিরতে পারবে কলকাতায়?

—হয়েছে! খুব বীরপুরুষ বটে। দেখছি তোকে না আনলেই ভালো ছিল! চাকর বাকর কারুর সঙ্গে—

বিমল টেবিলের অভাবে বাম হাতের তেলোয় ডান হাতের ঘুষি বসিয়ে বলে—আচ্ছা, আবার এসো একদিন, আমি স্ট্যাম্প কাগজে লিখে দিচ্ছি—সে বেটা তোমার এই এরোপ্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ে যেদিকে দু'চোখ যায় ছুটবে...উঃ, ভাবলাম মুফতে যদি বাংলার পল্লিসৌন্দর্যের কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারি মন্দ কি! বাবা নমস্কার! ক্যামেরায় হাত দেবার ক্ষ্যামতাটুকুও রইল না। এখন প্রাণটা নিয়ে—

একটা প্রবল ঝাঁকুনির মধ্যে কথার শেষাংশ তলিয়ে যায়।

দম ফেরবার পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সুমিতা বলে—

—সব কষ্ট সার্থক হয় যদি গিয়ে মন্দিরের দরজা খোলা পাই।

মিনিট কয়েক নিস্তব্ধ।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিমল সহসা প্রশ্ন করে—আচ্ছা মামি, সত্যিই কি সেই পাথরের নোড়ানুড়ির ওপর এ রকম ঐকান্তিক বিশ্বাস আছে তোমার?

—বিশ্বাস থাকবে না? বাঃ!

সুমিতা যেন অবাক হয়ে গেছে।

—'থাকবে না কেন' সে কথা তো হচ্ছে না, বলছি সত্যিই আছে কি?

—হিঁদুর মেয়ে, বাঙালির মেয়ে, শিব ঠাকুরে ভক্তি থাকবে না? তুই বলিস্ কি বিমল?

বিমল পথের দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে বলে—নাঃ, আর কিছু বলবার নেই, আমার উত্তর পেয়ে গেছি।

—তুই বাপু দিন দিন হেঁয়ালি হচ্ছিস। উত্তর আবার কী পেলি?

সুমিতার স্বর অপ্রতিভের। ...কোথায় যেন ধরা পড়ে গেছে ও।

অতঃপর উভয়েই চুপচাপ।

বৈশাখের দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে গাড়ি চলতে থাকে—কখনও এলোমেলো দ্রুত গতিতে, কখনও ঢিমে চালে। ... দু'পাশে মাঠের পর মাঠ...জনবসতির চিহ্নমাত্র নেই এদিকে। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় আম কাঁঠাল লিচুর বাগান, ক্বচিৎ বা এক আধটা কঙ্কালসার মনুষ্যমূর্তি চোখে পড়ছে, সে বোধ করি ওই 'উদ্যান-রক্ষক'।

মন্দিরের কাছ বরাবর সবুজের শোভাও আর চোখে পড়ে না, শুধু রুক্ষ ধু ধু মাঠ।...মেলার মাঠ, বছরে দু'বার করে মেলা বসে এখানে। প্রধান মেলা হয়ে গেছে এই চড়কের দিন, আর একটা হবে দুর্গাপূজার বিজয়ায়।

ছেলেবেলায় কি বিপুল উৎসাহে এই উৎসবের দিন গুনেছে সুমিতা! কী প্রবল আকর্ষণ ছিল 'শিবতলার' দিকে! সুবিধের জন্যে এই পাড়ায় পিসির বাড়িতে কয়েকটা দিনের জন্যে আস্তানাই গাড়ত দুই ভাই বোনে।

কিন্তু আকর্ষণটা কি শুধুই উৎসবের? শুধুই মেলার বাজারের?...

অবশেষে এক সময়ে দুর্গতির গতি থামে।

গাড়ি এসে গন্তব্যস্থলে পৌঁছয়।

সেকেলে ধরনের মন্দির।

ভিতরের অবস্থা জীর্ণ হয়ে এলেও যেন গাম্ভীর্যে মহান্।

স্তব্ধ মধ্যাহ্ন,—ঘুমন্ত দেবালয়। সকাল সন্ধ্যা দু'বেলা যে এখানে মানুষের হাট বসে। কাঁসর ঘণ্টার শব্দে পাড়া মুখরিত হয়ে ওঠে—সে আর এখন বিশ্বাস করা কঠিন।

এখন বন্ধ হয়ে গেছে কপাট, বড় বড় দুটো পিতলের কড়ায় লোহার কুলুপ ঝুলছে প্রকাণ্ড।

কিন্তু সুমিতার গায়েও কি ছোঁয়াচ লাগল এই ঘুমন্ত স্তব্ধতার?

যে ব্যাকুলতা নিয়ে সারা পথ গাড়োয়ানটাকে গঞ্জনা দিয়েছে সুমিতা, ছুটিয়ে মারিয়েছে কঙ্কালসার গরু দুটোকে, সে ব্যাকুলতা কোথায় গেল হারিয়ে?

সঙ্গের এই পূজা-উপচার, সোনার বিল্বপত্র, রূপার ঘটে দুধ-গঙ্গাজল সবই অর্থহীন হয়ে গেল?...শুধু মন্দিরের এই ধূলি-ধূসরিত সিঁড়িটার উপর দুধে গরদের শাড়িখানা পরে বসে থাকবার জন্যেই কলকাতা থেকে ছুটতে ছুটতে এসেছে সুমিতা? আর কিছু করবার নেই ওর?

—এখন উপায়?

বিমলের প্রশ্নে সুমিতা মুখ তুলে চাইল।

—কি করবে মামি? ফিরে যাবে?

—ফিরে যাব?

—উপায় কি? তা যদি তোমার বাপের বাড়ি গিয়ে ওঠো—

—ক্ষেপেছিস বিমল, তার চাইতে কলকাতা যাওয়া সোজা।

—তা'হলে?

—তাই তো।

—নাঃ, হোপলেস। তোমার যেমন খেয়েদেয়ে কাজ নেই, কলকাতায় অমন "বাবা নকুলেশ্বর" থাকতে এই ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে এলে এই অরুণেশ্বরের মাথায় গঙ্গাজল ঢালতে! নাও বোঝো এখন! নিজের মাথার তেলোতেই খানিক কাঁচা দুধ ঢাললেই ভালো হয়।

সুমিতা যেন এতক্ষণে চৈতন্য ফিরে পায়, ব্যস্ত হয়ে বলে—ওমা, তোকে শুধু শুধু কী কষ্ট দেওয়া! সঙ্গে ফল মিষ্টি আছে আলাদা, খা বাবা।

—ব্যস্, আমি যেন খিদের জন্যেই বলছি?

—তুই বলবি কেন, আমিই বলছি। বোস, তোর ফ্লাস্কের জল ফুরিয়ে যায় নি তো? গাড়িতে খাচ্ছিলি মনে হল।

—থাক্‌গে মামি এখন খাওয়াদাওয়া, কী উপায় হবে তাই বলো।

—যা হয় হবেই একটা, তুই খা আগে, তারপর ডাক গাড়োয়ানটাকে, দেখি যদি—

গাড়োয়ানটাকে ডাকতে হয় না, নিজেই আসে সে, মন্দিরের সেবায়েৎ তারক ভট্‌চায্যিকে সঙ্গে নিয়ে।...বোধকরি দেরি হয়ে যাওয়ার অপরাধে মনে মনে পীড়িত হয়েছিল সে, তাই দুপুর রোদে ধরে এনেছে বুড়ো বামুনকে।...তা'ছাড়া ভাড়ার জন্য দরকষাকষি করে না এমন লোকের জন্য যে মমতা আপনিই আসে।

পূজার্থিনীটি যে বেশ শাঁসালো তা' এক নজরেই চোখে পড়ে ভটচায্যির, তাই অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলেন—মানসিকের পুজো বুঝি? কিন্তু হবে না মা লক্ষ্মী, একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে যে!

সুমিতা উত্তর দেবার আগে বিমল চট করে বলে ওঠে—এর আর না হবার কি আছে ঠাকুর মশাই? আপনিও রয়েছেন, শিবও রয়েছেন, পুজোর মাল-মশলাও মজুত, বাধাটা কি?...কী দক্ষিণে লাগবে বলে ফেলুন চটপট—আটকাবে না।

তারক ভট্‌চায আকর্ণ হেসে বলেন—আহা-হা আটকাবে না তা বুঝতেই পারছি, মা আমার রাজলক্ষ্মী! মানসিকের পুজোয় কী লাগে না লাগে মা নিজেই জানেন, কিন্তু উপায় যে নেই বাবা!

—কেন এত কি নিরুপায়?

—দেবতার যে 'শয়ান' হয়ে গেছে বিমল—

শ্রান্ত স্বরে উত্তর দেয় সুমিতা।

—এই দেখুন, সাধে কি বলছি মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। সব জানেন!

—কচু জানেন...বিমল বিরাট একটি হুঙ্কার ছাড়ে—এত জানো মামি, আর এ জানো না মহাকালের নিদ্রাজাগরণ নেই, তিনি সদা জাগ্রত। একটা খেলাঘরের বিছানা পেতে, ইচ্ছেমতো ঘুম পাড়াবার আর জাগাবার ক্ষমতা তোমার আছে?...ঠাকুরমশাই, দেখুন আজ ইনি উপবাস করে রয়েছেন, এবং আজই কলকাতায় না ফিরলে নয়, এ ক্ষেত্রে একটু নিয়মের ব্যতিক্রম করলে খুব পাপ হবে না। ভক্তের ভগবান জানেনই তো?...খুলে ফেলুন তালাটা, আপনার যা পরিশ্রম হবে সে বিষয়ে বিবেচনা করা হবে... নাও মামি, কোথায় তোমার সোনার বিল্বপত্র, রুপোর ঘট আছে বার করো—

সুমিতা প্রায় হেসে ফেলে।

'চার' ফেলার কৌশলটা বিমল আয়ত্ত করেছে মন্দ নয়।

'চারের' ফল ফলতে থাকে।

তারক ভট্চায দুই হাত কচলে বলেন—বাবু যা বলছেন কথাটা মিথ্যে নয়, মহাকালের ঘুমই বা কি, জাগরণই বা কি? তাঁকে ঘুম পাড়াবার মালিক কি আমরা? কিন্তু কথা হচ্ছে আলাদা, চাবি খোলবার হুকুম নেই, খোদ জমিদার বাবুর আইনে।

—কার আইন?

পাখির মতো তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ বেরোয় সুমিতার কণ্ঠ হ'তে।

—আজ্ঞে মা ঠাকরুণ, আমাদের বাবুর কথা বলছি। জমিদার বাবু। বারোটা বাজতেই শিবের ঘরের চাবি তাঁর ঘরে পৌঁছে দেওয়া চাই। পেয়াদা দাঁড়িয়ে থাকে।

—তাই নাকি? হেতু? ...বিমল প্রশ্ন করে।

—আর কি বলবো বাবু, বলতেও লজ্জা করে...অবিশ্বাস, অবিশ্বাস! গেল বছর মেলার সময় রুপোর বাসন সেট চুরি গেল, সেই অবধি এই সন্দেহ-বাতিক। বুঝলাম মনে লেগেছে—মায়ের শ্রাদ্ধের সময় নিজে পছন্দ করে পাঁচশো টাকা খরচ করে গড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু গরিব ব্রাহ্মণের কি অপরাধ বলুন? মাঝরাতে তালা খুলে কে চুরি করে নিয়ে গেল, আমি নিজের কুঁড়েয় বসে কি খবর রাখব তার?

—সে তো বটেই—মহোৎসাহে সায় দিল বিমল।

—তবেই বলুন। আপনারা 'বুঝমান', তাই বললেন এ কথা, কিন্তু আমাদের বাবুর মেজাজ আলাদা। আচ্ছা, মেলায় দু'দশ হাজার লোক আসে, কার মনে কী থাকে কে জানে?

—সে তো বটেই, কার মনে কী থাকে কে জানে? ...বিমল মুচকে হাসে।

তারক ভট্চায অতঃপর আরও গদগদ ভাষায় বলেন—তা দেখুন, পুজো আমি আজকেই করিয়ে দিতে পারতাম, মা আমার উপবাসী হয়ে সেই দূরান্তর থেকে ছুটে এসেছেন, নিরাশ হয়ে ফিরে যাবেন? কিন্তু কী করব হাত পা বাঁধা! জমিদারের আইন—

সুমিতা এতক্ষণ স্থির হয়ে শুনছিল, তারক ভট্চাযের কথা শেষ হতেই এবার মুখ তুলে দৃঢ় স্বরে বলে—চাবি আপনি আনিয়ে নিন ঠাকুরমশাই, আমি আজই পুজো দেব।

তারক একটি আক্ষেপসূচক ধ্বনি করেন—আহা হা—মা, ও কথা বলে আর সন্তানকে অপরাধী করবেন না, বেলা চারটের আগে চাবি আনবার উপায় নেই। পেয়াদা এসে নিজে খুলে দিয়ে, পাহারা দেবে, আবার সন্ধে আরতির পর চাবি লাগিয়ে চলে যাবে। দেখুন দেখি কী জুলুম!

—হুঁ। কিন্তু আপনার জমিদার মশাই কি ভেবেছেন, পাঁচশো টাকার রুপোর বাসন দিয়ে ঠাকুরের মাথাটা কিনে রাখা যায়? ঠাকুর সাধারণের, সকলের।

—সে তো আমি আপনি বুঝলাম।...ভট্‌চায একটি মুখভঙ্গি করেন, —এ ঠাকুর ওনাদেরই কি না। ওনার পূর্বপুরুষের 'পীতিষ্ঠে করা'।

—তা জানি, কিন্তু প্রতিষ্ঠা করার পর আর নিজের স্বত্ব থাকে কি ঠাকুরমশাই? তা'হলে ওই প্রতিষ্ঠা করা পুকুরটার জল ওঁর এক্তারে থাকবে?... সুমিতা যেন রুক্ষ কঠিন হয়ে ওঠে।

—তাই তো কে বলে—ভট্‌চাযের কণ্ঠে আক্ষেপের সুর—কিন্তু বৈকাল চারটে অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই দেখি না মা লক্ষ্মী।

—তা হয় না ঠাকুরমশাই, চারটের পর আর ফিরে যাবার গাড়ি নেই। যেতেই হবে আমাকে। ...আপনি আপনার জমিদারকে খবর দিন গে দরজা খুলিয়ে দিতে।

তারক হতাশভাবে মাথা নাড়েন।

অর্থাৎ অসম্ভব।

কিন্তু সুমিতা হঠাৎ এমন ভীষণ হয়ে উঠেছে কেন? ওর কণ্ঠে কেন অমন রূঢ় স্বর?

—বিমল, আমি এই বসে রইলাম, তুমি এঁর সঙ্গে যাও—চাবি আনতে পারো ভালো, নয় তো—এঁদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেই জমিদার বাবুকেই ডেকে নিয়ে এস—

—মামির হুকুমটা বেশ। সে ভদ্রলোক যেন তোমার বাগদী প্রজা, ডাক দিলেই বেগার খাটতে আসবেন।

—তুমি গিয়েই দেখো না। আমি এই বসে রইলাম—

তারক এবার রীতিমতো ঘাবড়ান। —স্ত্রীলোকটির মাথার ঠিক আছে তো?

ভরদুপুরে জমিদার মশাই আসবেন ওঁর হুকুম তামিল করতে? মন্দিরের শিব যাঁর দর্শন পান বৎসরে তিন দিন?

বিমলও হাসতে থাকে—মামি এবার ক্ষেপে গেলে, আমি গিয়ে প্রস্তাবটা করবো কীভাবে? বড় জোর অনুনয়-বিনয় করে চাবির কথা বলতে পারি।

—সেইটাই বলবে আগে। রাজি না হন, বোলো আমি একবার দেখা করতে চাই তাঁর সঙ্গে।...দেখি তিনি কত বড় জমিদার হয়েছেন আজকাল।

তারক ভট্‌চায সবিনয়ে বলেন—মা ঠাকরুণ বাবুকে চেনেন নাকি?

—অসম্ভব নয়, ওঁর বাপের বাড়ি এখানেই।... চেন না কি মামি?

—না।

সুমিতার উত্তর সংক্ষিপ্ত কিন্তু দৃঢ়।

ভট্‌চায সোৎসাহে বলেন—মায়ের বাপের বাড়ি এখানে? কই দেখিনি তো কখনও, কাদের বাড়ি আজ্ঞে?

—সে আপনি চিনবেন না ঠাকুরমশাই, অনেক দূর। ও কথা থাক্। আপনি গিয়ে বলুন গে, কলকাতা থেকে একজন এসেছে, দেবদর্শন না করে যেতে রাজি নয় সে—

—শুধু দর্শন? আর তোমার পুজোর কাণ্ড?...বিমলের প্রশ্নে সুমিতা ক্লান্ত দৃষ্টি তুলে শান্ত গলায় বলে—ও থাক্ ঠাকুরমশায়ের জিম্মায়, নাম গোত্র বলে যাবো, উনিই করিয়ে দেবেন কাল। অবিধির পুজো করিয়ে লাভ নেই, আজ আমি শুধু একটিবার দর্শন করে যাব।

—তবে চলুন ঠাকুরমশাই, কোথায় আপনাদের রাজবাড়ি। দু'চার মাইল দূর নয় তো?

—না না, ওই তো কাছেই, এই মাঠটা পার হলেই—তবে ভাবছি মা নিজে যদি একবার—

—পাগলামি করবেন না ঠাকুরমশাই, চলুন।

রৌদ্রে খাঁ খাঁ করছে মাঠ, ওটুকু পার হতেই ঝলসে যাবে বেচারারা। নিজের অসঙ্গত জিদের জন্য কি লজ্জা করে সুমিতার?

নাঃ, সুমিতা ওদের দিকে তাকায় নি মোটে।

বড় বড় পিতলের কড়ায় লাগানো প্রকাণ্ড লোহার কুলুপটার দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষে। ...সুমিতা কি শুধু পুজো দিতেই এসেছে?...এসে যদি খোলা পেত দরজা, শান্ত সন্তুষ্ট মনে আপনার কর্তব্য সেরে ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠত? নিজেকে কি সেই কথাই বোঝাতে চাইছে সুমিতা অমন দিশেহারা দৃষ্টি মেলে?

মেলার মাঠের আকর্ষণ ফুরিয়ে গেছে ওর জীবনে?

দুপুর রৌদ্রে জমিদার মশাইয়ের কাছে পৌঁছানো—তা সে যত ক্ষুদে জমিদারই হোক—সহজ কথা নয়। তারক ভট্চাযের ঊর্ধ্বতন পুরুষেরও সাহস হত কি না সন্দেহ। ...হয়তো একলা এলে এদিক ওদিক ঘুরে কেটেই পড়তেন। বেশ কিছু লাভের আশায় ছাই দিয়েই পালাতেন। ...কিন্তু সঙ্গে রয়েছে বেপরোয়া বিমল। এই বনগাঁয়ের শিয়াল রাজাকে থোড়াই কেয়ার করে সে।...কাজেই শেষ পর্যন্ত সত্যিই দেখা যায় সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে মাঠ ভেঙে তিনটে মানুষ আসছে। একজনের মাথায় ছাতা, পিছনে বোধ করি ছত্রধারী ভৃত্যও আছে।

—এই যে নমস্কার—দুই হাত জোড় করে উঠে দাঁড়াল সুমিতা—দয়া করে নিজেই এসেছেন দেখছি, কিন্তু এত কষ্ট করবার সত্যই কিছু দরকার ছিল কি? আমার প্রার্থনা তো সামান্য।

সুরেশ রায় কিন্তু থতমত খান বলে মনে হয় না, হঠাৎ এ রকম একটি অপরিচিতা মহিলার প্রগল্‌ভতা দেখেও না।...যেন প্রস্তুত হয়েই এসেছেন তিনি। তাই মৃদু হেসে প্রতিনমস্কার করে বলেন—সামান্য প্রার্থনাই যে কখন কোন সময় অসামান্য হয়ে ওঠে সেকথা বোঝা মুশকিল। আপনি অসময়ে এলেন ঠাকুরের ঘুম ভাঙাতে,—কি উপায় বলুন?

—অসময়ে? ও। ...মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল সুমিতা, তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললো—আপনার কি ধারণা দেবতাও ঘুমোন?

যেন সচেতন হয়ে তর্কযুদ্ধে নামল এবার।

—আমার কি ধারণা সে-কথা বলে লাভ কি? শাস্ত্রের নির্দেশ তো মানতেই হবে?

—আমি যদি না মানি?

—আপনি না মানতে পারেন, কিন্তু চিরাচরিত প্রথার পরিবর্তন হবে কী করে বলুন?

—তার মানে, এ ঠাকুর আপনার সম্পত্তি, অতএব আপনার মতই বজায় থাকবে—সুমিতার চোখ জ্বলে ওঠে—এই তো কথা?

—আপনি দেখছি বেজায় চটেছেন, সহজ কথাও উল্টো বুঝবেন।...ঠাকুর মশাই, ছায়ায় বসুন না ওদিকে...ছেলেটি গেল কোথায়?

তারক হাত কচলে বলে—ওই দিকে আজ্ঞে, বোধ করি বিড়িটা আসটা খেতে, আপনার সামনে তো আর—

—ভালো ভালো, কলকাতার ছেলেরা তো শুনেছিলাম এ সব কুসংস্কার আর মানে না। ...এই, তুই ব্যাটা ছাতা হাতে করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বসগে যা ছায়ায়, আমি যাচ্ছি একটু বিশ্রাম করে—

প্রচণ্ড রৌদ্রে ধুলায় ভরা ভাঙা সিঁড়িতে বসে বিশ্রামের ইচ্ছাটা বাবুর পক্ষে অভিনব বটে, চাকরটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার নবাগতার পানে তাকিয়ে গামছা ঘোরাতে ঘোরাতে চলে যায়

চোখছাড়া হয়ে। চোখ ছাড়া তারক ভট্‌চাযও হন, তবে এঁদেরকে নিজের চোখ ছাড়া করেন না, সুবিধামতো এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসেন, যাতে নিজেকে আড়াল করা যায়।...

এত বড় একটা রহস্যময় ঘটনা অবহেলা করবার মতো বোকা বামুন নয় তারক ভট্‌চায, ঘোড়েল লোক!

ওরা চলে যেতেই সুমিতা আরক্ত মুখে বলে—রাজ্যসুদ্ধ সকলকে ছায়ায় পাঠাবার দরকারটা কি ছিল?

—তার কারণ ওদের আলোকিত করবার ইচ্ছে আপাতত নেই। কিন্তু ওদের কথা থাক, আমি শুধু করজোড়ে আবেদন করছি, অন্তত একদিনের জন্যেও অতিথি-সৎকারের পুণ্যটুকু অর্জন করতে চাই।

—অসম্ভব আবেদনে লাভ কি?

—নিতান্তই অসম্ভব?

—প্রশ্নটা বাহুল্য।

সুরেশ রায় নাকি এ অঞ্চলের দুঁদে লোক, কিন্তু অমন নম্র প্রার্থনার ভঙ্গি কেন ওঁর ভাষায়? অমন কোমল কাতরতা কেন চোখের দৃষ্টিতে? বলেন—শিবকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আত্মাকে পীড়িত করে তোলার মধ্যে সত্যিই কি কিছু পুণ্য আছে? উপবাসে যে চোখমুখ বসে গেছে?...

—বাজে কথা। উপবাস আমার অভ্যাস আছে, জীবনভোরই তো উপবাস করছি।

কঠিন একটা কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ যেন থেমে যান সুরেশ রায়, তারপর বলেন—কিন্তু একটা কথা—

—না, আর 'কিন্তু' নয়, আর কোনো কথা নয়, দেরি করবার সময় নেই আমার। দয়া করে একবার মন্দিরের দরজাটা খুলিয়ে দিন, এত কষ্ট করে এসে দেবদর্শন না করে ফিরে যাব না।

—অপেক্ষা করা কি কোনোমতেই চলে না?

—না না কিছুতেই না। অনর্থক দেরি করিয়ে দেবেন না, চারটের গাড়িতেই ফিরতে হবে আমাকে।

—সে কি আর হয়েই উঠবে? রতন গাড়োয়ানের পক্ষীরাজ তো?

—যেমন করে হোক হ'তেই হবে। ...সুমিতার স্বর কঠিন দৃঢ়—রুগ্ন স্বামীকে ফেলে রেখে এসে কোথাও সময় নষ্ট করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

—রুগ্ন স্বামী? ওঃ।—কিন্তু আমার যে কোনো উপায়ই নেই। অসময়ে মন্দির খোলা যায় না।

—কোনও বিশেষ প্রয়োজনেও নয়? কারো অনুরোধেই নয়?

—নাঃ, ওই একটি জায়গায় মানুষের পরাজয় সুমিতা।

দুধে গরদের শাড়ির লুটানো আঁচলটা ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুমিতা। বলে—আচ্ছা বেশ, এই পরাজয়ের সংবাদটাই লাভের হিসেবে রইলো এ যাত্রা।...নমস্কার! ...কইরে বিমল—

—আর একটু দাঁড়াও সুমিতা, দোহাই তোমার, একটা কথা শুধু জানতে দাও আমায়, তোমার আজকের এ আচরণের অর্থ কী?

—অর্থ? কিছু না কিছু না। যারা সকল অনর্থের মূল তা'দের কাজের কি অর্থ থাকে?...অনুচ্চস্বরে হেসে ওঠে সুমিতা।

—আট বছর পরে হঠাৎ এসেছিলে কেন, সে কথাটাও কি বলবে না?

—সে কথাটা তো তুমি শুনেই এসেছো—রোদ-লাগা মুখ আরও লাল হয়ে ওঠে সুমিতার—স্বামীর অসুখের মানসিক পুজো দিতে এসেছি—

—সে তো শুনলাম, কিন্তু সেইটাই কি শেষ কথা সুমিতা?

—তা ছাড়া আর কী কথা তুমি শুনতে চাও শুনি? তুমি কি ভাবো ইচ্ছে করলেই অপমান করা যায় মানুষকে?

—ভাবতাম না সুমিতা, এখন শুধু দেখছি। ...কাউকে অপমান করবার ইচ্ছে হ'লে একটা দেশ থেকে আর এক দেশে ছুটে আসাও যায়। কিছুই অসম্ভব নয় মানুষের পক্ষে।

—কক্‌খনো নয়—এবারে যেন দুর্বল শোনায় সুমিতার স্বর—বারবার তো বলছি—দুঃস্বপ্ন দেখে স্বামীর কল্যাণ কামনায় পুজো দিতে এসেছি আমি।

—যে কথা বারবার বলতে হয় সেইটার ওপরই সন্দেহ হয় সুমিতা, কিন্তু থাক্ তোমাকে বিরক্ত করব না আর।...পার তো আমার অপরাধ ক্ষমা কোরো।...দুঃস্বপ্নটাই শুধু একটু শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল সুমিতা, যে দুঃস্বপ্ন একজনের ক্ষণিক একটু সুখস্বপ্নের বাহক।

—দুঃস্বপ্ন? ...বড্ডো বেশি সত্যের কান ঘেঁষা স্বপ্ন, বিশ্বাস করতে পারবে তো?...স্বপ্নে দেখলাম পুজোর আয়োজন নিয়ে উঠেছি এই সিঁড়িতে, নেমে আসতে গিয়ে ধাক্কা দিলে তুমি, ছড়িয়ে গেল নৈবেদ্য। বড় বেশি বাস্তব স্বপ্ন না? ঘুম ভেঙে 'হায় হায়' করে উঠলো প্রাণ, তাই নির্বোধের মতো ছুটে এসেছিলাম। বুঝতে পারিনি এসে দেখব দেবতা পড়েছেন ঘুমিয়ে, দরজায় ঝুলছে লোহার তালা! সেদিনও জয় হয়েছিল সংস্কারের, আজও পরাজয় মেনে গেলাম তার কাছে।...কই-রে বিমল, আয় বাবা, ডাক তোর গাড়োয়ানকে।...নাঃ স্টেশনেই আজ সারারাত বসে থাকতে হবে দেখছি, ট্রেন আর পেয়েছিস।...

—সুমিতা, তোমার ছেলেবেলার খেলাঘরটা কি খোলা স্টেশনের চাইতেও খারাপ?

—নয় কেন? খোলা স্টেশন কৃপার আশ্রয় নয়, দাবির জায়গা।

—এ কথার উত্তর দেবার দিন আজ আর নেই সুমিতা, তবু আজকের দিনটা রইল আমার কাছে সোনার রঙে অক্ষয় হয়ে।...অবাক হচ্ছ?...জেনো, নিজেকে তুমি যতই ভোলাতে চাও সুমিতা ভোলাও, তবু তোমার দেওয়া এই শাস্তিই রইল আমার পরম সম্পদ হয়ে।...হয়তো—একদিনের জন্যে আমার আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করলে সন্তুষ্ট হ'তাম, সুখী হ'তাম না।

—তোমার কথা বোঝা কঠিন।

—মোটেই নয় সুমিতা, 'বুঝবে না' প্রতিজ্ঞা করে বুদ্ধির ওপর আবরণ চাপিয়ে চাপিয়ে বুদ্ধিটাকে ঘোলা করে রেখেছ বলেই বোঝা শক্ত হচ্ছে। ... কিন্তু পালাবার আগে একটা কথা শুনে যাও সুমিতা, শিব কখনও ঘুমিয়ে পড়েন না, আমাদের অহঙ্কারের বিরাট কপাটটাই আড়াল করে রাখে তাঁকে। তাঁর দরজা চিরদিন খোলা আছে, চিরদিন খোলা থাকবে।

[১৩৫৬]

কঙ্কণ

সব শুনিয়া অঞ্জলি রীতিমতো বিরক্ত হইয়া ওঠে। সুধীরের কি কাণ্ডজ্ঞান নাই! বিরক্তি গোপনের চেষ্টা না করিয়া বলে—তুমি অমনি মত দিয়ে এলে? এর কোনও মানে হয়? আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার মনে করলে না?

সুধীর ভানটা করে সরলতার।

—বাঃ, নেমন্তন্ন করেছে—যাবে, এর আর মতামতের কি আছে?

—তোমার তা'হলে ধারণা, আমি যাব সেখানে?

এবার যে চাপা হাসিটা ফুটিয়া ওঠে সুধীরের মুখে সেটাকে আর সরলতা বলিয়া ভুল করা চলে না। বলে—যাবে না কি বলো! আদর করে নেমন্তন্ন করেছেন—গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবেন—বড়মানুষের বাড়ির ক্রিয়াকাণ্ড ব্যাপার দেখবে—এ তো ভাগ্যের কথা।

স্বামীর ঈর্ষাকুটিল মুখের পানে চাহিয়া অঞ্জলি গম্ভীর হইয়া বলে— ভাগ্যের হিসেব-নিকেশ করতে চাইনে তোমার সঙ্গে, মোটকথা আমি যাব না।

সুধীর নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে—পাগল হয়েছ, তাই কখনও হয়? যেতে তো হবেই, যার নাম অফিসের 'বড় সাহেব', হুকুম করলেই ছুটে যেতে হত, আর এ তো নেমন্তন্ন।

অঞ্জলি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে—হুকুম তামিল করতে ছুটে যাক তারা, যারা অফিসের চাকর। আমার সঙ্গে কী?

—তোমার সঙ্গে তো অনেক কিছুই গো, তা' নইলে অফিসে এত রুইকাতলা থাকতে সুধীর মুখুয্যের মতন চুনোপুটির স্ত্রীকে ছেলের পৈতেয় ঘটা করে নেমন্তন্ন করা কেন? এই তো দেখ না—নামটা অবশ্য আমারই, কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা তো তুমি।

'শুভ উপনয়ন' মোহরাঙ্কিত বৃহদাকার সুদৃশ্য খামখানা সুধীর অঞ্জলির সামনে ফেলিয়া দেয়।

—কার কি আসল উদ্দেশ্য তার জন্য আমি দায়ী নই। বলিয়া কাঁধের উপর জড়ো-করা ভিজা কাপড়গুলো মেলিয়া দিতে উঠানের ওদিকে নামিয়া যায় অঞ্জলি।

সুধীর খোলা দালানে পায়চারি করিতে থাকে।

নাঃ, অঞ্জলির আপত্তি কোনও কাজের নয়। চাটুয্যে-সাহেব হইল তাহার অফিসের হর্তাকর্তা বিধাতা, তাঁহার নিমন্ত্রণ অবহেলা করা কি সহজ কথা?

অবশ্য অঞ্জলির উপর একটা অহেতুক বিরাগ এবং 'বড়সাহেবে'র উপর বিদ্বেষে মনটা নিতান্তই তেতো হইয়া আছে, তবু পাঁচজনের কাছে—অফিসের আর সকলের কাছে তো মুখটা কম বড় হইল না।

সাহেব যখন অকস্মাৎ খাস কামরায় ডাকিয়া পাঠাইয়া ছিলেন তখন সে কি ভয়, বুকের ধুকপুকুনি আর ঘোচে না। অবশ্য পরের ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত।

ঘুরিয়া আসার পর সহকর্ম্মীদের উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে নিতান্ত অবহেলার ভঙ্গিতে নিমন্ত্রণের খবরটা জানানোর মধ্যে কি অপরিসীম গৌরব। শুধুই কি দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মতো। দায়সারা নিমন্ত্রণ? ছাব্বিশ মাইল পাড়ি দিয়া চাটুয্যে নিজে যাইবেন গাড়ি লইয়া সুধীরের স্ত্রীকে আনিতে।

একজনের অবিশ্বাসের দৃষ্টি লক্ষ করিয়া সুধীর আরও অগ্রাহ্যের সুরে বলে—এতে আর অবাক হ'বার কি আছে? বলেই তো দিলেন আমাকে—'ভালোই হ'ল এই উপলক্ষে বাইরের দিকে একটা লম্বা ট্রিপ দেওয়া হবে। শহরের গণ্ডি ছেড়ে সহজে তো বের নাই হয় না।".....বড়মানুষ আত্মীয়—ইচ্ছে করেই তেমন গা করি না, পরিচয় দিইনা, নইলে এই অফিসে এই মাইনেয় পড়ে আছি জানলে এতদিন—হুঁঃ।

—আগে বুঝি জানতেন না উনি?

—না না, বললাম তো—

—আচ্ছা কী রকম আত্মীয় হ'ন?

এক ছোকরার এই অভদ্র প্রশ্নে সুধীর কম চটে নাই।

আত্মীয়তা এত সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত যে চট করিয়া খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত, তাও সুধীরের দিক হইতে নয়, অঞ্জলির দিকে। গোঁজামিল দিয়া প্রশ্নটা না হয় এড়ানো গেল, কিন্তু অঞ্জলি এখন যাইব না বলিয়া গোঁ ধরিলে সব দিক মাটি।

হয়তো বিশ্বাসই করিবে না কেউ।

অন্তত শীতাংশু ছোকরা তো বটেই। হয়তো 'বক দেখাইয়া'ই বসিবে।

এবার রান্নাঘরের দোরে একখানা পিঁড়ি টানিয়া চাপিয়া বসে।.....

অঞ্জলি কাঠের উনান জ্বালিয়া রান্না চাপাইয়াছে....রেল ধর্ম্মঘটের আশঙ্কায় কয়লা স্টক করিয়া—এ অঞ্চলের অধিকাংশ ঘরেই কাঠের ব্যবহার চলিতেছে...অঞ্জলির মুখের পানে চাহিয়া সুধীর একটু ইতস্তত করে, ঠিক যে-ভাবে বলিবে ভাবিয়াছিল—সেটা মনে পড়ে না।

কাঠের আঁচের লালচে আভা হ্যারিকেন লণ্ঠনের হলদে আলোয় মিশিয়া অঞ্জলির নিস্তব্ধ কঠিন মুখের রেখায় স্থির হইয়া আছে। অঞ্জলির মুখটা এত নিখুঁত কেন? ..... ও যখন চুপ করিয়া থাকে, তাকাইলে যেন ভয় লাগে সুধীরের। ..... তুচ্ছ কথার শব্দতাড়নায় এই অবাঞ্ছিত নীরবতাটা ভাঙিতে পারিলেই যেন বাঁচে।

—রান্না হল নাকি?

অঞ্জলি মুখ তুলিয়া চায়, জানে এটা গৌরচন্দ্রিকা মাত্র।

—বলছিলাম তোমার হাঁড়িকুড়িগুলো একটু চিনিয়ে দিয়ে যাও—দুদিন তো আমাকে নিজেই চালিয়ে নিতে হবে।

—কেন বকছো পাগলের মতো, যা অসম্ভব তা নিয়ে বেশি কথা কওয়া ভালোবাসি না আমি, বাইরে হাওয়ায় বোসো গে—রান্না শেষ হলে ডাকবো।

অর্থাৎ একরকম তাড়াইয়া দেওয়াই।

অন্য সময় হইলে সুধীরও উল্টা রাগ দেখাইত, আজ রাগের বশে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাহিরে যাইতে দিলে চলিবে না বুঝিয়াই হাসিয়া বলে আত্মীয় স্বজনের বাড়ির কাজেকর্মে মানুষ যায় না?

—'আত্মীয়' আর 'স্বজন' কোন্ পর্যায়ে ফেলতে চাও তোমার অফিসের ওপরওয়ালাকে?..... তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে অঞ্জলি—'স্বজন' বলে ভুল নিশ্চয়ই করবে না? আর আত্মীয়? মামির ভাইপো—এমন কিছু নিকট আত্মীয় নয় যে না গেলে অন্যায় হবে।

—আহা বুঝছো না—নেমন্তন্ন যখন করেছেন—আগ্রহ করে নিতে আসবেন বলেছেন—বলেছেন অতবড় একটা মান্যগণ্য লোককে ফিরিয়ে দেওয়াই কি উচিত হবে? কাল বেলা চারটের সময় আসবেন বলে দিয়েছেন।

—কাল অফিসে গিয়েই তুমি নিষেধ করে দিও—বোলো অসুখ করেছে।

—কাল তো ছুটি—কিন্তু আশ্চর্য, কি যে অসঙ্গত জেদ তোমার।

সুধীর বিরস মুখে উঠিয়া দাঁড়ায়।

অঞ্জলিও উঠিয়া দাঁড়ায়, রান্নাঘরের বাহিরে সামনের উঠানে যে সাদা টগর ফুলের গাছটা চাঁদের আলোর চাদর গায়ে জড়াইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পানে মিনিটখানেক স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া মৃদু হাসির সঙ্গে বলে—আশ্চর্য, না? যাওয়াটা তুমি তা হলে সঙ্গত বলেই মনে করো? এই বেশভূষায়—এই শাঁখের শাঁখা জোড়াটি মাত্র সার করে বড়লোকের বাড়ি গেলে তোমার প্রেস্টিজে বাধবে না?

'বাধিবে না'—এমন কথা অবশ্য সুধীর স্পষ্ট বলিতে পারে না—কিন্তু অঞ্জলি চাটুয্যে-সাহেবের বাড়ি দুইদিন সমাদর লাভ করিয়া আসিলে অফিসে যে প্রেস্টিজটি বাড়িবে সেটাও তো ভাবা দরকার।

চাই কি, সাহেবের নজরে পড়িয়া গিয়া পদোন্নতিও হইতে পারে—অন্তত হওয়া অসম্ভষ্ট নয়। তাই উড়াইয়া দিবার ভঙ্গিতে বলে—সে অন্য কোথাও হলে কথা ছিল, এ হল মনিব-বাড়ি মান আর অপমান। আশি টাকার কেরানির বৌয়ের অঙ্গে সোনা-মুক্তো ঢাকাই বেনারসী দেখবার আশা করাই অন্যায়। .... কারবারে লাখ লাখ টাকা লাভ হচ্ছে—কর্তার নিজের তো বাবা একাদশে বৃহস্পতি, আমাদের ভাগ্যে যে ঘাসজল সেই ঘাসজল। স্ত্রীপুত্রকে সাজাবার ভাগ্য কি আমাদের রেখেছে?

মনিব আমার নয়, তোমার। থাক বেশ, যাব। ঈশ্বরকৃপায় পুত্র নেই এই বাঁচোয়া—

বলিয়া অঞ্জলি পুনর্বার উনানপাড়ে আসিয়া বসিয়া আরব্ধ কাজে মন দেয়।

সুধীর আর কোনও সুবিধা না পাইয়া বাহিরে আসিয়া বসে। অঞ্জলি সম্মতি দিল বটে—কিন্তু যেন সুধীরের উপর আক্রোশ করিয়া। কিন্তু কেন? ..... সুধীরের ধারণাটা ছিল অন্যরকম—আশা করিয়াছিল— চাটুয্যে সাহেব বা পাতানো সুবাদে 'মেজদা'র এমন সাদর আমন্ত্রণে খুশিই হইয়া উঠিবে অঞ্জলি—তখন বরং সুধীরেরই সুবিধা হইত পুরোনো সন্দেহ ঝালাইয়া তুলিয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপে গায়ের ঝাল মিটাইতে।

কিন্তু এটা কেমন হইল?

এই ভাগ্যবান্ লোকটির উদ্দেশে অঞ্জলির মনের মধ্যে সঞ্চিত আছে যে অপরিসীম শ্রদ্ধা আর প্রীতি, সে কি সুধীরের কাছে ধরা পড়িতে বাকি আছে ? আকারহীন অভিব্যক্তিহীন সেই সশ্রদ্ধ প্রীতিকে ঠিক ভ্রাতৃস্নেহের কোঠায় ফেলা যায় কি না এই তীক্ষ্ণ সন্দেহ দীর্ঘ একযুগ ধরিয়া মনের কোণে পোষণ করিয়া আসিতেছে সুধীর। অকস্মাৎ এমন কি ঘটিল যে এত ভক্তি ভালোবাসা কর্পূরের মতো উবিয়া গেল?

ম্যানেজার বদল হইয়া অফিসে যেদিন নতুন ম্যানেজাররূপে এম.এন. চ্যাটার্জির আবির্ভাবের সংবাদ শুনিয়াছিল—সেইদিনই শুধু কেমন বিমনা দেখাইয়াছিল অঞ্জলিকে, মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়াছিল সুধীরকে সেই অনুল্লেখযোগ্য ক্ষীণ আত্মীয়তার খবরটুকু পাঁচজনের কাছে বলিয়া বেড়াইতে।

তারপর কই একদিনের জন্যেও তো মেজদার উল্লেখমাত্রাও শোনা যায় নাই অঞ্জলির মুখে। অবশ্য সংবাদ চাহিলে সুধীরের পক্ষে মুশকিল ছিল বই কী। নিজের পোস্টটা তাহার এতই নীচে যে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অবসরই ঘটে নাই এই আটমাসের মধ্যে।

হঠাৎ কেমন করিয়া পরিচয় রহস্য ফাঁস হইল—আকাশের চাঁদের সাধ হইল মাটির তৃণের সহিত মিতালি করিবার—সে সব কথা সুধীরের অবোধগম্য।

যেমন বুঝিতে পারে না অঞ্জলির এই অহেতুক ক্রোধ।

কেবলমাত্র গহনা-কাপড়ের অভাব?

অঞ্জলি কি তেমন মেয়ে?....একখানি একখানি করিয়া সমস্ত অলঙ্কার তো নিজের হাতেই খুলিয়া দিয়াছে—বন্ধকি ভিটা ছাড়াইতে।

কিন্তু নয়ই বা কেন?

গহনা কাপড় তো সকল ক্ষেত্রে শুধু মেয়েলি শখ মাত্র নয়। পদমর্যাদার নিরিখ। সমাজ-জীবনের মানদণ্ড।..... জীবন-যুদ্ধে যারা প্রত্যক্ষভাবে জয়ী হইয়াছে—লাভ করিয়াছে সাধনার পুরস্কার, তাদের স্ত্রীকন্যার হয়তো বসনভূষণের বাটখারা চাপাইয়া মানদণ্ডের ভারসাম্য রাখিবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু পরাজিত হতভাগ্যদের ওজনের কমতি ধরা পরিবার ভয়েই না মধ্যবিত্তের ঘরে আভরণের কম-বেশি লইয়া এত অশান্তি।

উৎসবে আনন্দে আত্মীয়বন্ধুর গৃহে ডাক পড়িলেই এদের নিস্তরঙ্গ স্তিমিত জীবন অভিযোগে মুখর হইয়া ওঠে।..... কলহ বাধিয়া যায় স্বামী-স্ত্রীতে, চিড় খায় আত্মবিস্মৃত শান্তির গায়ে।

অঞ্জলি গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, কলহ করিতে তাহার প্রবৃত্তিতে বাধে, খোঁটা দিয়া স্বামীর অক্ষমতা প্রমাণ করিতে লজ্জা পায়, ঝোঁকের মাথায় একবার মাত্র একটা কথা বলিয়াই একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছে। পরদিন বেলা চারটে বাজিবার পূর্বমুহূর্ত্ত পর্যন্ত সুধীর আন্দাজ করিতেই পারে না অঞ্জলি শেষ পর্যন্ত স্থির করিল কী।

কিন্তু একসময় চারটে বাজে।

প্রতীক্ষিত শব্দটা ধ্বনিত হইয়া ওঠে সদর দরজার বাহিরে। অগত্যা তদ্‌ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসা ছাড়া সুধীর করিতে পারে কী ! ..... হউক সম্বন্ধী-সম্বন্ধীয়, উপরওয়ালা বড় সাংঘাতিক বস্তু। ..... কিন্তু আঃ, এই সময় একটাও লোক থাকিতে নাই পথে? সুধীরের দরজায় যখন বিরাটবপু "বুইক"-খানা দাঁড়াইয়া ? পাড়ার পরিচিত ভদ্রলোকেরা সকলেই কি আজ এই ছুটির দিনে জোট করিয়া অন্তঃপুরচারী হইয়াছেন? "ডেলিপ্যাসেঞ্জার" বা সাপ্তাহিকের দল সকলেই তো আজ দেশের মাটিতে শিকড় গাড়িয়া আছেন'....... অথচ সুধীর যেদিন তেল-গুড়-বাজার ইত্যাদির ভারে ভারাক্রান্ত দুইহাতে রবিবাসরীয় কর্ত্তব্য করিয়া বাড়ি ফেরে সেদিন দেশসুদ্ধ লোকের কুশলপ্রশ্নের মরশুম পড়িয়া যায় যেন।

—আসুন আসুন—আমার বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো... কই গো, তোমার মেজদা এসেছেন যে ...... চলুন চলুন বাড়ির মধ্যে। .... কি মুশকিল আছো কোথায়? তোমার মেজদা এসেছেন বললাম যে—

অঞ্জলিকে হাজির করিতে পারিলেই যেন মস্ত দায় হইতে রেহাই পায় সুধীর।

মণীশ সহাস্যে বলে—থাক থাক, অত ব্যস্ত হবার কি আছে? বসছি এখানে.... সে তৈরি হয়ে আছে তো? এখুনি বেরোতে হবে কিন্তু—

'না হু' গোছের কি একটা উত্তর দিয়া সরিয়া পড়ে সুধীর।

অঞ্জলি আসিয়া প্রণাম করিল।

হ্যাঁ, প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে, সাদাসিধে ফরসা শাড়ি ব্লাউজ পরা, নিখুঁত সুন্দর মুখে সামান্য একটু প্রসাধনের ছাপ। তেমন কিছুই নয়, হয়তো চুলটা একটু বিশেষ যত্ন লইয়া বাঁধা, হয়তো ললাটের সিন্দুর তিলকটা একটু বিশেষ উজ্জ্বল। শুধু এই।

—ভালো আছো তো মেজদা? মাসিমা ভালো আছেন? বৌদি? ছেলেমেয়েরা?

—আরে ভালো না থাকলে আর বাড়িতে এইসব হাঙ্গামা বাধাই? সব ঠিক আছে। কিন্তু তোকে তো মোটে ভালো দেখছি না, বেজায় রোগা হয়ে গেছিস।

—কই, বেশ তো আমি। কিন্তু তোমার ছেলেটি ক'বছরের হ'ল মেজদা? পৈতেধারী পণ্ডিত হবার উপযুক্ত হয়েছে?

—তা হল বই কী, বছর নয়। বামুনের ছেলে—সুতোগাছটা যথাসময়ে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়াই ভালো—কি বলেন সধীরবাবু?

দেঁতো-হাসি ছাড়া সুধীরের কাছ হইতে আর কোনো উত্তর আসে না।

—তাহলে অঞ্জু তুই ঠিক হয়ে নে—এখন আরম্ভ করলে—তবে যদি গোটা পাঁচ ছয়ের সময় বেরনো যায়, তোমাদের মেয়েদের সাজের ব্যাপার তো ! ঘণ্টা দুয়েকের কমে কি আর হয়ে উঠবে? জানি তো—

বলিয়া মণীশ আর এক দফা হাসিয়া ওঠে।

সুধীরকে অবাক করিয়া দিয়া অঞ্জলিও হাসিয়া ওঠে—কি যে বলো মেজদা, বুড়োবয়সে আবার সাজবো কি? এই তো বেশ আছি, চলো।

মণীশ অন্যমনস্ক হইতে পারে, নির্বোধ নয়।

অঞ্জলির আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লয়। বাড়িখানি নিতান্ত শ্রীহীন নয়, পল্লিগ্রামের সবুজ দাক্ষিণ্যে বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া চট্ করিয়া দারিদ্র্য ধরা পড়ে না।..... কিন্তু অঞ্জলি এত নিরাভরণ কেন? মুহূর্ত্তমাত্র.... পরক্ষণেই সহজ প্রসন্নতার সুরে বলিয়া ওঠে—তা হলে আর বিলম্ব নেই তো? অবিলম্বে যাত্রা করা যাবে? বাঁচা গেল বাবা! আমার তো—মেয়েদের সেই সাজের ব্যাপার মনে করলেই হৃৎকম্প হয়! .... আচ্ছা সুধীরবাবু, নমস্কার! কাল যাচ্ছেন তো? হ্যাঁ, অফিস ফেরতই চলে যাবেন সোজা, হোল্ স্টাফ্ যাচ্ছে, অসুবিধের কিছু নেই, সকাল সকাল ছেড়ে দেবো আটটার ট্রেন পেয়ে যাবেন। অঞ্জুকে কিন্তু দিন দুই তিন ছাড়ছি না, বুঝলেন? মঙ্গলবার আবার পিসিমার একটা ব্রত-উদ্‌যাপন গোছের ব্যাপার রয়েছে—আমায় বলে দিলেন বিশেষ করে।

পিসিমা অর্থে অঞ্জুরই মামি, স্বামী-পুত্র হারাইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সংসারে আশ্রয় লইয়াছেন।

—বিলক্ষণ বিলক্ষণ, ওর আর কি, থাকবে থাকবে—

সুধীর বিনয়ে ভাঙিয়া পড়ে একেবারে।

গাড়ি চলিতে থাকে....... উদ্দাম বেগে নয়, ধীরে ধীরে। বাঁকাচোরা সঙ্কীর্ণ ধূলিধূসর পথ, মাঝে মাঝে এক একটা বড় গাছের গুঁড়ি নিজেকে বিস্তৃত করিয়া পথকে আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সাবধানে যাইতে হয়।

দুই পাশে বাংলার পল্লির সাধারণ দৃশ্য.... গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ভাঙাচোরা পলস্তারা-খসা এক-একখানা বাড়ি, ভিতরে মানুষ বাস করে, অথবা 'পোড়ো' বাড়ি, সহজে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। সকালের দিকে জীবনের যে সাড়া মেলে, এবেলায় আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। পল্লিগ্রামের জীবন যেন আধখানা। বেলা পড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্যহীন মন্থর গতিভঙ্গি স্তিমিত হইয়া আসে।

অঞ্জলি এইখানে বাস করে। ... মণীশের কত ঐশ্বর্য্য কত প্রাচুর্য্য, অথচ অঞ্জলি এত রিক্ত! অঞ্জলিকে নিমন্ত্রণ করিয়া মণীশ কি বড় বেশি ভুল করিয়া ফেলিল? ..... বেচারা কি পদে পদে কুণ্ঠিত হইবে না মণীশের বাড়িতে? .... 'হঠাৎ বড়মানুষের' ধনগৌরব-স্ফীত আড়ম্বরবহুল সংসারে উপযুক্ত শ্রদ্ধা-সম্মান পাইবে তো অঞ্জলি? .... এই অকারণ খেয়ালটা মণীশের না হইলেই হয়তো ভালো ছিল। কি লাভ? কতটুকু সঞ্চয়? ..... বাড়ি পৌঁছানোর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত!...... চৌকাঠ ডিঙানোর সঙ্গে সঙ্গেই তো হারাইয়া যাইবে অঞ্জলি অন্তঃপুরের বিরাট নারীবাহিনীর মাঝখানে। এই উপলক্ষে লোক তো বড় সোজা জড়ো হয় নাই, তিন কুলের বাকি নাই কেহ। হয়তো অঞ্জলিকে এসময় না আনিলেই ভালো ছিল.... এখন আর ভাবিয়া লাভ নাই।..... কিন্তু উপলক্ষ উপস্থিত না হইলেই বা মণীশের দাবি মানিত কে? .... একযুগ ধরিয়া মণীশ অঞ্জলির ভাবনাই ভাবিয়াছে এমন নয়, তবু অফিসে হঠাৎ সুধীরের পরিচয় পাইয়া—মনটা কেমন যেন 'হায় হায়' করিয়া উঠিয়াছিল। উপলক্ষও যখন পাওয়া গেল হাতের কাছে, একবার দেখিতে ইচ্ছার মধ্যে দোষের কি আছে? .... তার নিজের দুই বোনও তো আসিবে শ্বশুরঘর হইতে! ছেলেবেলায়—অঞ্জলির সঙ্গে কত ভাব ছিল নীলা-লীলার। ..... সেই সুবাদেই না কখন্ একসময় মণীশ একদিন সাব্বর্জনীন 'মেজদা' হইয়া উঠিয়াছিল!.....

ছেলেবেলার কথা যাক্, বর্তমানে অঞ্জলির মুখ দেখিয়া এত মায়া লাগে, নীলা-লীলার মতোই স্নেহ মমতায় কাছে বসাইয়া কুশলপ্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয়—কিন্তু এতদিন পরে এ উচ্ছ্বাস মানাইবে কেন? হয়তো অঞ্জলিই অদ্ভুতভাবে বদলাইয়া গিয়াছে! ......

কথা আর হয় না।

শুরু করাটাই কঠিন। .... অঞ্জলিও যেন বোবা হইয়া গেছে।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়া নামিবার কাছাকাছি সময় হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে অঞ্জলিই, একটু হাসিয়া বলে—যাচ্ছি তো—ভয় করছে কিন্তু।

—ভয়?

মণীশের চমকটা সুস্পষ্ট।

—ভয় কি রে?

—কী জানি বাপু, ভীষণ নাকি বড়লোক হয়েছ তুমি আজকাল—

—তাই? তা আমিই তো বড়লোক হয়েছি—খুব ভয় লাগছে দেখে?

—উহুঁ তা কেন, 'বড়লোকের বাড়িটাই বড় বিপজ্জনক ঠাঁই।

—এই দেখো—কি পাগলামি। নীলা লীলা হাঁ করে আছে—কত খুশি হবে তোকে দেখে তোর বৌদি তো দেখেই নি তোকে—সেও—

এটা অবশ্য মণীশের বানানো কথা, বৌদি দেখে নাই তা' ঠিক, কিন্তু দেখিবার জন্য যে খুব বেশি উদ্গ্রীব হইয়া আছে এমন বদনাম দেওয়া যায় না তাহার নামে।.... আর নীলা লীলা—সংবাদ শুনিয়া নিতান্তই নিরুৎসাহ ভঙ্গিতে সাধারণ প্রশ্ন করিয়াছিল—অঞ্জুকেও আনছো বুঝি?

তাই নাকি?'

অঞ্জুকেও তাহাদের সমান মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম অপমান আছে, এমনি অপ্রসন্ন ভাব।.....

—আমার কি হয়েছে জানো মেজদা, একপাশে পড়ে থাকি—সমাজ-সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই বললেও হয়—বেজায় কুণো হয়ে গেছি।

—আর ছেলেবেলায় কি ওস্তাদই ছিলি, উঃ!

মনে আছে তোমার?

অঞ্জলি এবার সত্যকার হাসি হাসিয়া ওঠে।

—মনে? তা' একটু-আধটু আছে বই কী, যদিও তোরা আমার স্মৃতিশক্তির ব্যাখ্যা করে ছড়া তৈরি করতিস তখন। করতিস না? কি যেন সেই একটা—

—ও সেই যেটা সমীর আর আমি করেছিলাম? .... "কাশী থেকে আসি এক মহাপণ্ডিত—বলিতে গিয়া থামিয়া যায়— ম্লানমুখে বলে— কোথায় চলে গেল সমীর।... ছোটমামি সেই থেকে তোমার কাছেই আছেন তা হলে?

—হ্যাঁ, একরকম তাই—মাঝে মাঝে কমলার বাড়ি যান, কমলা আবার তোমার পছন্দ করে না মার জামাইবাড়ি গিয়ে থাকা। দু'চার দিন থেকে আসেন এই আর কি।

—অনেকদিন পরে দেখা হবে সকলের সঙ্গে।

মৃদু বিলম্বিত একটা নিশ্বাস গাঢ় হইয়া আছে।

কিন্তু না আসিলেই যে ভালো হইত সেকথা মণীশের চাইতে কি অনেক বেশি টের পাইতেছে না অঞ্জলি? কেবলমাত্র সুধীরের উপর বিরক্তির বশে এতটা না করিলেই হইত।

দারিদ্র্যের লজ্জা কি প্রখর।

ঐশ্বর্য্যের অহংকার কি নগ্ন।

অবশ্য আতিথ্যের ত্রুটি হইয়াছে বলিলে অন্যায় হইবে। আসিবামাত্র একজন ঝি স্নানের ঘর দেখাইয়া দিয়াছিল, সাবান তোয়ালে লাগিবে কি না প্রশ্ন করিতেও ভোলে নাই।..... মুখ ধোওয়ার পর চা জলখাবার আসিয়া হাজির হইয়াছে, এবং বাড়ির গৃহিণী আসিয়া মিষ্ট হাস্যে কুশলবাদে কর্ত্রীর কর্তব্যের ষোলো আনা পুরণ করিয়া গিয়াছেন।

নীলা অন্ধকার ঘরে ছেলে ঘুম পাড়াইতেছিল.... সে ঘরে প্রবেশ কাহারও নিষেধ.... লীলা আসিয়া অনেক গল্প করিয়াছে।..... "অঞ্জলির চেহারা এমন ডাইনে খাওয়া' মতো কেন—সে ছিরি-ছাঁদ কোথায় গেল, একটিও ছেলেপুলে না হইবার কারণ কী—সুধীর মেজদার অফিসে কী রকম চাকরি করে—কত টাকার গ্রেড্" ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া সে এইমাত্র বামুনঠাকুরেরা যেখানে মিষ্টির ভিয়ান বসাইয়াছে সেখানে গেল তদারক করিতে।
.....

চাহিয়া চাহিয়া অঞ্জলির ভারি হাসি পায়, বাবা, এত মোটাও হইতে পারে মানুষ। ক'গজ কাপড় লাগে ওর একটা ব্লাউসে?

ছোটমাসি বিস্তর হা-হুতাশ কান্নাকাটি করিলেন... স্বামীশোক, পুত্রশোক.... বহু পুরাতন হইলেও অঞ্জলির সঙ্গে নূতন দেখা হওয়ার অজুহাতে আর একবার জাগাইয়া তুলিলেন। .... তাছাড়া—দিন বুঝিয়া এই সময় কমলা বসিয়া রহিল আঁতুড়ঘরে। এতবড় একটা কাজে আসিতে পাইল না—সেটাও কম শোকাবহ ব্যাপার নয়। ... চুপি চুপি ভাইপো বৌয়ের নিন্দা করিলেন প্রাণ খুলিয়া। পাঁজিতে আরও দিন ছিল.... কমলা তখন কারাগার হইতে মুক্তি পাইত,

বৌ গ্রাহ্যই করিল না।..... ওর বাপের বাড়ির লোকগুলি আসিলেই ব্যস।.... মাছিটি পর্যন্ত বাদ পড়ে নাই... ইত্যাদি ইত্যাদি...

ব্যস্, অঞ্জলি সম্বন্ধে আর কাহারও কোনো কর্তব্য নাই। ... কিন্তু কৌতূহল আছে ঠিক।..... আড়ালে আবডালে চাপাহাসি.... ইশারা ইঙ্গিত... ফিস্‌ফাস্ গুজগাজ... অঞ্জলির তীক্ষ্ণ অনুভূতির কাছে চাপা থাকে না।.....

নীলার ছেলে বোধ হয় এতক্ষণে ঘুমাইল .... এখনো চাক্ষুষ হইতে বাকি আছে, কিন্তু মন্তব্যটা শোনা যায় স্পষ্ট ..... "মরণ আর কি, লজ্জাও নেই ছাই। আমাকে তো বাবা কেটে টুকরো টুকরো করলেও অমন হাড়ির হাল করে লোকসমাজে আসতাম না।"

—"চেহারা হয়েছে, দেখেছিস"—এটা লীলার গলা—"গলা দুটো যেন চড়িয়ে ভেঙেছে। কথায় বলে—মাংসই লক্ষ্মীছিরি.... মা লক্ষ্মীর হাওয়া লাগলেই গায়ে মাস গজায়—

—"শুদ্ধু দুগাছ শাঁখের শাঁখা। জামাই-বাবুর এ কুটুম্বটি আবার কোন্ গোকুলে ছিলেন? কখনও .... হ্যাঁ গা দিদিমণি, তোমার দুখানা কাপড় নয় বার করে দিও পরতে—পাঁচজনের সামনে ওই পোশাকে বেড়ালে যে তোমার গায়েই ধুলো দেবে লোকে"—মেজ বৌয়ের বাপের বাড়ির ঝি হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে কথার সঙ্গে সঙ্গে।

—আমার দায়। সাধ করে নেমন্তন্ন করতেও যাইনি—ঘটা করে আনতেও যাইনি। পেট্রল পাওয়া যাচ্ছে বলেই আখকুটের মতন বাজে নষ্ট করতে হবে।... ভাব ভালোবাসা যখন ছিল—ছিল, এখন যখন আপিসের ছোট কেরানির বৌ, তখন তুমি আপিসের মাথা—তোমার আবার নিজে গিয়ে তাকে আনতে ছোটা কেন?

—'ছিল' বলে তো উড়িয়ে দিচ্ছ, বলি এখনও 'আছে' কি না খোঁজ নিয়েছ তো ঠাকুরঝি? মণীশের ছোট শ্যালাজ টিপ্পনী কাটে।

—বকিসনে ছোটবৌদি, গা জ্বলে যায়।

—বিশ্বাস কি, যা 'গ্রীসিয়ান-কাটের' মুখ। সত্যি ফাইন্ মুখখানা বাবা! রংও একদা ছিল বলে বোঝা যায়।

বাপের বাড়ির ঝি হাসিতে হাসিতে বলে—আমাদের জামাইবাবু একদিকে, আর গঙ্গাজল একদিকে—ওসব কিছু নয়। স্পষ্ট কথা বলি শোনো ছোট বৌদি, 'কণ্ট্রোলে'র বাজার, ভালোমন্দ খাওয়া তো উঠে গেছে মানুষের—তবু দু'দিন একটু খেয়ে মেখে নিতে পারলে সুবিধে।

—আমার তো দেখে সর্ব্বাঙ্গে বিষ ছড়াচ্ছে।...... পাড়ার লোকের দু'খানা গয়না কাপড় চেয়ে আনলেও পারতিস....এ যে আমাদের শুদ্ধ মুখ-পোড়ানো!

—ওগো দিদিমণি, এসব একপ্রকার চালাকি, বড়মানুষ ভাই, 'দাদা দাদা' করে গায়ে পড়ে কিছু আদায় না করেই কি আর যাবে?

—তাই কি একদিনে যাবে? পিসিমার ব্রত উদ্‌যাপন দেখে তবে নাকি নড়বেন।

—তাই নড়লেই বাঁচি, এখন তোমার সংসারের ঘি দুধের মায়া কাটিয়ে কবে নড়েন দেখে আসতে মাত্তরই তো সন্দেশ রসগোল্লার ছড়াছড়ি।

—বাড়ির কর্তার হুকুম।......

অঞ্জলির কি হঠাৎ চলৎশক্তি রহিত হইয়া গেল নাকি? বারান্দার এই অন্ধকার কোণটা ছাড়িয়া নড়িতে পারে না কেন?

আচ্ছা কোথায় যেন গল্প শোনা ছিল না, সন্তানের লজ্জার দায়ে মা বসুমতী দ্বিধা হইয়া গিয়াছিলেন?...নেহাৎই গল্পকথা?.... না বৃদ্ধা বসুন্ধরা আজ শ্রবণশক্তি হারাইয়া বধির হইয়া বসিয়া আছেন?

মিথ্যা কলঙ্কের চাইতে সত্য দারিদ্র্য কি কম লজ্জাকর?

পরদিন ভোজের ঘটা।

রাত্রি না পোহাইতেই আরম্ভ হইয়া গেছে হৈ-হুল্লোড়।.... অনেক লোকের ভীড়ে একটা সুবিধা যে, নিজেকে কিছু আড়াল করিয়া রাখা চলে। ..... কিন্তু একেবারে আড়াল করিলেই বা চলিবে কেন? মুখের হাসির ঠাট্‌টা বজায় না রাখিতে পারিলে পরাজয়টা যে বড় শোচনীয়।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটিল চমৎকার।

মণীশ ব্যস্তভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া নীলাকে ডাক দেয়—ওরে নীলি, দেখ্ তো অঞ্জু কোথায়? সুধীর অফিস থেকে এক ছোকরাকে দিয়ে এই জিনিসটা পাঠিয়ে দিয়েছে—স্যাকরাবাড়ি পড়ে ছিল নাকি, কালকের মধ্যে আর কিছুতেই দিয়ে উঠতে পারেনি—অনেকক্ষণ দিয়ে গেছে আমায়.....ভাগ্যিস মনে পড়লো—আমার যা মন, কোথায় ফেলেই দিতাম হয়তো।

পাতলা সাদা কাগজের আবরণ খুলিয়া জিনিসটা দেখায় মণীশ।

অভিনব কারুকার্য্যে গড়া একজোড়া কঙ্কা কঙ্কণ।

ওজনে এবং গঠনের পারিপাট্যে লোভনীয় সন্দেহ নাই।

অঞ্জু আসিয়া দাঁড়াইতেই মণীশ আরও ব্যস্তভাবে গহনাটা প্রায় গুঁজিয়া দেয় তার হাতে। খুব যেন তাড়াতাড়ি এইভাবে বলে—এই নাও তোমার কর্তার কাণ্ড। বাজে একটা লোককে দিয়ে এই দামি জিনিসটা পাঠানো হয়েছে বাবুর। একমাস আগে নাকি গড়তে দিয়েছিল? তা' তোদের পাড়াগায়ের স্যাকরার কাজ তো নেহাৎ খারাপ নয়..... নে হাতের ভিতর ঢুকিয়ে ফেল, গোলমালে বাড়ি—যেখানে সেখানে ফেলে রাখলেই বিপদ।

যেমন ব্যস্তভাবে আসিয়াছিল তেমনি ব্যস্তভাবে চলিয়া যায়।

রঙ্গমঞ্চের লোকগুলো একেবারে পাথর বনিয়া গেল কি না সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র করে না।

কিন্তু মুহূর্ত মাত্র।

নীলা ছোঁ মারিয়া জিনিসটা তুলিয়া লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর ফিরাইয়া দিয়া বলে—হ্যাঁ জিনিসটা গড়েছে ভালোই দেখছি—ক'ভরি হয়েছে?

—ভরি চারেক হবে—আপনাকে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে অঞ্জলি—চুড়িগুলো 'খয়ে চুন' হয়ে গিয়েছিল—ভাবলাম একটা কঙ্কণ পরার সাধ, তাই দিই। সোনা কিনে' দুটো জিনিস তো আর হয়ে উঠবে না ভাই। .... ওখানের স্যাকরা না ছাই—বলে 'লোহা বাঁধানোই' গড়তে পারে না। এখানেই বুঝি গড়তে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মণীশ নির্বোধ বলিয়া তো আর বিশ্বসুদ্ধ লোক বোকা নয়।

মণীশের বৌ মণীশকে একহাটে বেচিয়া আর এক হাটে কিনিতে পারে। যত বড় অফিসারই হোক মণীশ, সাংসারিক বুদ্ধিতে পাকিতে দেরি আছে তার। তা না হইলে পাঞ্জাবির পকেটে ক্যাশমেমো রাখিয়া 'পুকুর চুরি'র মতো দুঃসাহস করিয়া বসে।

সমারোহের বাড়ি, নিমন্ত্রিতাদের গায়ে নতুন ঢংয়ের অলঙ্কারের অভাব নাই, তবু অঞ্জলির কঙ্কণ জোড়াটা যে বাড়িসুদ্ধ লোকের কি এক কৌতূহলের খোরাক হইয়া উঠিয়াছে..... "দেখি দেখি" ..... "ওমা তাই তো" .... "নীলা তাই বলছিল"..."কোন্ স্যাকরাকে দিয়ে গড়ানো ভাই".... "বাণী কত করে নিয়েছে"—"অবাক করলে, কিছুই জানো না? তোমার কর্তা বুঝি তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই".....

উত্তর দিতে দিতে হয়রান হইয়া পড়িয়াছে অঞ্জলি।

রাত্রে যদি সুধীর সত্যই আসে নিমন্ত্রণ রাখিতে, কোনও উপায়ে কি পলাইতে পারে না অঞ্জলি? যে কোনও ছুতায়? কিন্তু সুধীর আসিবে না সেকথা অঞ্জলি জানে...... আজ আর সারা বাড়িতে এক ফোঁটা অন্ধকার কোণ খুঁজিয়া মেলা দায়। ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে এই হাজার বাতির শক্তিসম্পন্ন হাজারটা বিদ্যুৎ-বাতির নীচে.....

ওরই মধ্যে মণীশের বৌ নিজে আসিয়া আহ্বান করিয়া গেছে—এসো ঠাকুরঝি, খাবে এসো। খিদে নেই? সে কি কথা, তা বললে শুনছি না ভাই, ছাব্বিশ মাইল পথ ভেঙে নেমন্তন্ন খেতে এসেছো, 'খাবে না' বললে চলে? তোমার দাদা শুনলে রক্ষে রাখবেন। বাবা, এমনিতেই তো তাঁর ধারণা এ বাড়িতে নাকি তোমার উপযুক্ত আদরযত্ন হচ্ছে না—আমরা নাকি বড়মানুষকেই ভজি—

উঠিয়া গিয়া পাতের সামনে বসিতেও হইয়াছে।

শয্যার ব্যবস্থা ছোটমামির ঘরে।

অনেক রাত্রে গোলমাল মিটিয়া গেলে শুইতে আসিয়া দেখিল—ছোটমামি তখনও জাগিয়া ..... অঞ্জলিকে দেখিয়া বিরক্তিক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন—এসব কি শুনছি অঞ্জু?

—কেন ছোটমামি?

শ্রান্তির ভারে শরীরের সঙ্গে কণ্ঠস্বরও ভাঙিয়া পড়িয়াছে যেন।

—মণি নাকি তোকে কঙ্কণ গড়িয়ে দিয়েছে—তুই তাই প'রে বড়মুখ করে বেড়াচ্ছিস—আবার বলা হচ্ছে 'জামাই পাঠিয়ে দিয়েছে'—ছি ছি, একি কেলেঙ্কারি মা!

অঞ্জলি ম্লানহাসির সঙ্গে বলে—কেন ছোটমামি, একজোড়া বালাও কি দিতে পারে না তোমার জামাই?

—পারে কি না তুমিই জানো বাছা, পারলে আর দু'গাছা শাঁখা ঢনঢনিয়ে কুটুমবাড়ি আসতে না। এও বলি বাছা, আগুন কখনো ছাইচাপা থাকে? মণির পকেটে সেই দোকানের রসিদ নাকি বেরিয়েছে—বৌমা দেখে কুরুক্ষেত্র করছে, স্বামী-স্ত্রীতে এতক্ষণে কি হল জানি না মা।

এ কি বিড়ম্বনা, এ্যাঁ! তোমাকেও বলি মা—গরিব বড়লোক ভাগ্যের কথা, প্রবৃত্তি ছোট কোরো না। পরের জিনিসে যে লোভ করে তার অনন্ত নরক।..... ও কঙ্কণ তুমি দাও আমার কাছে, বৌমাকে চুপি চুপি ফিরিয়ে দেব আমি।

অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না বটে—সোনার জিনিস হাতে পড়িলে চিনিতে ভুল হয় না....ছোটমামি হৃষ্টচিত্তে আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলেন—বৌটিও তো সোজা নয়, বড়মানুষের মেয়ে হ'লে কি হয় ..... বড় ছোট নজর।

যাত্রা'টা বোধ করি এ-যাত্রা নিতান্তই খারাপ ছিল অঞ্জলির, তা নয় তো এমন ঘটনাও ঘটে। ...... গতকাল হইতে নাকি সুধীরের ভেদবমি হইতেছে—এই মুহূর্তে অঞ্জলির যাওয়া দরকার—মণীশ অফিসে গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া দুঃসংবাদটা পেশ করে।......

ছোটমামি হাঁউমাউ করিয়া উঠেন—সধবা মানুষের হাত হইতে কঙ্কণ খুলিয়া লওয়ার স্মৃতিটা বোধ করি মনের মধ্যে সাপের মতো ছোবল মারে। কাতরভাবে বলেন—কী সর্বনেশে কথা বলছিস্ মণি, বাঁচবে তো? কে বলে গেল তোকে?

—অফিসেরই এক ছোকরা, ওদের দেশ থেকে আসে।..... যাক আর দেরি করে লাভ কি? ঠিক হয়ে নে অঞ্জু, ভাবছিস কেন—ভাবনার কিছু নেই, ও গেঁয়ো লোকদের একটু বাড়িয়ে বলা রোগ, যতটা বলেছে ততটা হয়তো নয়—চল্ চল্, আর দেরি নয়।

—তুমিই যাচ্ছো তা'হলে? তোমারা অফিসের ক্ষতি হবে না?

তীক্ষ্ন প্রশ্ন করেন মেজগিন্নি।

—আরে দূর অফিস! যার জিনিস নিয়ে এসেছি তাঁকে ফেরত দিয়ে আসতে পারলে বাঁচি।

আবার পথ।

আবার দুইটি নীরব প্রাণী।

কলিকাতার কাছাকাছি পর্যন্ত উদ্দাম বেগে ছুটিয়া গাড়ির গতি ক্রমশ কমিয়া আসে। বাঁকাচোরা সঙ্কীর্ণ পল্লিপথ, ধীরে ধীরে সাবধানে যাইতে হয়।

এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করে মণীশ। গাড়িটা প্রায় থামাইয়া আস্তে বলে—তোর কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত অঞ্জু!

—থাক্, আর ক্ষমা চাইতে হবে না মেজদা! আমি জানি—

—কি জানো তুমি?

সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করে মণীশ।

—অসুখ-টসুখ কারুর কিছু করেনি।

—অ্যাঁ, জানিস্ তুই? কি করে জানলি?

—এমনিই জানতে পেরেছি—

মৃদু হাসে অঞ্জলি।

—তা'হলে তো আর তোমার কাছে কিছুই লুকোবার নেই দেখছি!

—তা' নেই।

বলিয়া আর একবার সহজভাবে হাসিয়া ওঠে অঞ্জলি।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

আবার একবার মণীশ একটু ইতস্তত করিয়া গাঢ়স্বরে বলে—আমি তোকে অপমান করতে ডেকে নিয়ে যাইনি অঞ্জু, বিশ্বাস কর্।

—তুমি কি ক্ষেপে গেলে মেজদা?

—হয়তো আমি সবটা জানি না, হয়তো আরও অনেক বেশি লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে এসেছ, তবু এও জানিস ভাই, দুঃখ আমিও কম পাইনি।

এ সম্বোধনটা নূতন।

অঞ্জলি ব্যাকুলভাবে বলে—আমি তাও জানি মেজদা।

—তবে আমার আর একটি অনুরোধ রাখো বোন। রাখবি তো?

—রাখবো বই কি মেজদা, কী বলো?

পাতলা সাদা কাগজে মোড়া একটি বস্তু পকেট হইতে বাহির করে মণীশ।

উজ্জ্বল চাকচিক্যময় একজোড়া কঙ্কণ।

অঞ্জলি অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে..... প্যাটার্নটা অন্য, ভুল করিবার কিছু নাই, কিন্তু

কি অদ্ভুত ছেলেমানুষি মণীশের।...... সহসা মণীশকে আশ্চর্য করিয়া দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে অঞ্জলি.....

—তোমার কী কঙ্কণের গাছ আছে মেজদা? হাত বাড়িয়ে পেড়ে আনলেই চলে? আবার কী বলে কিনেছ একজোড়া? লজ্জা-শরমও নেই বাপু!

—লজ্জা? 'নেই কি করে বলি বল্? আমার দেওয়া জিনিস, ওরা তোর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে—এ লজ্জা আমার মরে গেলেও যাবে না।.....

—তুমি একটি আস্ত পাগল মেজদা, আজকালকার দিনে টপ করে অতগুলো টাকা নষ্ট করা কোন বৌ সহ্য করে শুনি?

—থাক, তোমার ওকালতি করতে হবে না, শুধু ফিরিয়ে দিতে চেয়ো না দয়া করে, এ আমার নিজস্ব টাকা, সংসারের প্রাপ্য পাওনা নয়। আঙুলে একটা আংটি। কি কাজেই না লাগে। হঠাৎ খুলে পড়ে হারিয়ে যেতেও পারে। ধর তাই গিয়েছে। জীবনে কত কীইতো হারায়।

অঞ্জলি থমকিয়া তাকাইয়া দেখে।

কী সর্বনাশ, অত্যুজ্জ্বল যে হিরার আংটিটা মণীশের সুপুষ্ট আঙুলের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল সে স্থানটা ফাঁকা।

কিন্তু এও তো এক পরম বোকামি। এটাই কি ধরা পড়িবে না? কি অবোধ।

—ছি ছি, এ কি অন্যায় মেজদা। না না—কেন ভাই এ রকম পাগলামি করছো?

—তবে থাক্, নিয়ো না। বুঝলাম—ক্ষমা করতে পারোনি।

এই এক বিপদ। তর্কের উত্তর আছে, নীরব অভিমানের উত্তর কি?

—মেজদা, রাগ করলে?

—রাগ? রাগ করবার কি রাইট আছে আমার শুনি।

—কি মুশকিল। কই দাও বাপু পরছি—এই দেখো হ'ল তো?

—হ'ল। অনেক দুঃখের মধ্যে একটু সান্ত্বনা রইল আমার। প্রার্থনা করি এ জিনিস তোমার হাতে অক্ষয় হোক বোন। একটা মিথ্যে কথা বানিয়ে পর্যন্ত ভয়ে সারা হচ্ছি।

দরজার সামনে নামাইয়া দিয়াই মণীশ তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিয়া স্টার্ট দেয়। হয়তো অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাইত—যদি না ধূলিধূসর মেঠো পথ গাড়ির পিছনে ধূলার ঝড় রচনা করিয়া দৃষ্টির আড়াল করিয়া দিত।

মিছামিছি পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে কেন অঞ্জলি?

উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত শেষ ধূলিকণাটিও তো অবশেষে ফিরিয়া আসিয়াছে মাটিতে—পূর্ব্বপরিবেশের মধ্যে।.... ঝড়ের চিহ্ন ও আর নাই।

সদর দরজায় তালা লাগাইয়া অফিস গিয়াছে সুধীর..... অঞ্জলির তো আসার কথা নয়!.... হয়তো প্রতিবেশিনী সরযূ-ঠাকুরঝির বাড়ি খোঁজ করিলে চাবির সন্ধান মিলিবে। ..... ঘণ্টা কয়েক সময় তাহার বাড়ি বসিয়া থাকাও চলে..... তবু কি এই রকম বোকার মতো দাঁড়াইয়া থাকিবে অঞ্জলি? কতকাল থাকিবে?

নাঃ অঞ্জলি বোকা নয়, ধাতস্থ হইতে বেশি দেরি হয় না তার। ..... সুধীর আসিবার আগে সংসারের কাজের মধ্যে সহজ হইয়া থাকার দরকার এটা সে বিস্মৃত হয় নাই।...... নিমন্ত্রণের

ব্যাপার যখন মিটিয়াই গেল তখন অঞ্জলি চলিয়া আসিবে না তো কি? মিছামিছি কেন আর পরের বাড়ি বসিয়া থাকা—বেচারা সুধীরকে যেখানে হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে হইতেছে।

সরযূর বাড়ি যাইতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া পড়া ছাড়া উপায় থাকে না।

কি আশ্চর্য, অঞ্জলি কি ভুলিয়া গিয়াছিল নাকি? ..... মিনিটখানেক নূতন অলঙ্কারশ্রীমণ্ডিত হাত দুইখানির পানে অভিভূতের মতো চাহিয়া থাকে। কঠিন ধাতু.... তবু যেন বন্ধুর স্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া আছে কোমল প্রকোষ্ঠ দুইখানি।.....

হ্যাঁ—প্রেম নয়, করুণা নয়—স্নেহমাত্র।

কিন্তু পৃথিবীটা তো এত বোকার জায়গা নয় যে, স্নেহকে 'স্নেহ' বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে!

গীষ্মের দুপুরটা কি নির্জ্জন।

পুকুরের জলটা কি নিস্তরঙ্গ।

'টুপ' করিয়া সামান্য এতটুকু যে শব্দ সে সাড়া কাহারও কানে যাইবার আশঙ্কা নাই। কতটুকু সেই শব্দ? ..... সামান্য একটা ঢিল, ছোট্ট একটু গাছের ফল হামেশাই তো পুকুরের জলে পড়িয়া তলাইয়া যায়।

কে খোঁজ পায়?

কতক্ষণ আলোড়ন থাকে?

[১৩৫৩]

কসাই

কান্না! কান্না!

একটানা একঘেয়ে কুৎসিত একটা কান্না! এ কান্না শুনলে মমতা আসে না, করুণা আসে না, আসে বিদ্বেষ বিরক্তি। তবু ভোলাতে হয়, আদর করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে হয়। রুগ্ন ছেলেটাকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যায় সমরেশ, অথচ কমলার দেখা নেই।

রান্নাঘরে কি এত কাজ হচ্ছে ভেবে পায় না সমরেশ। সংসারে আরও দুই বৌ রয়েছে, রয়েছেন বিধবা দিদি, বড়বৌয়ের মেয়েটাও শাড়ি ধরেছে ইদানীং, তবু কমলাকেই বা রুগ্ন ছেলে ফেলে রান্নাঘরে পড়ে থাকতে হয় কেন, এ প্রশ্ন করবার জন্যে বারবার এগিয়ে গিয়েছে সমরেশ, ফের ফিরে এসেছে।

জানে সমরেশ গিয়ে রান্নাঘরের দোরে হানা দিয়ে এ প্রশ্ন উচ্চারণ করলে, পরে কমলাই সমরেশকে আস্ত রাখবে না। হয়তো বা রাগ করে আরও দেরি করবে, ছেলেটার দুর্গতি তাতে বাড়বে বই কমবে না।

রোগাছেলের দুর্দশা করে, সংসারের বয়স্থ পোষ্যদের ষোলো আনা সেবার নৈবেদ্য সাজানোর চেষ্টায় সমস্ত সময়টা ব্যয় করার মধ্যে কি মনস্তত্ত্ব আছে? সমরেশ ভাবতে থাকে অথচ কমলার কথায় বার্তায় অভিযোগে অনুযোগে এমন একটা ক্ষোভ প্রকাশ পায়, যাতে বোঝা স্বাভাবিক, বাধ্য হয়েই এমন হৃদয়হীনতা করতে হচ্ছে বেচারাকে।

সত্যিই কি তবে সমরেশের আত্মীয়-পরিজন এত নিষ্ঠুর? মানুষ—মেয়ে-মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়?

ওদিকে কিন্তু কমলাও মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছে। ছেলের কান্নার ধরনে বুঝছে সমরেশ আর পারছে না। কিন্তু করবে, কি, আজ যে তার রান্নার পালা। কমলা যদি পালা ফাঁকি দিতে চায়, চলবে কেন?

কচি ছেলে আর কার নেই? কার হচ্ছে না? রোগ অসুখই বা কার ছেলের নেই? তবে হ্যাঁ কমলার মতো ছেলেকে এমন বেয়াড়া আবদেরে করে মানুষ করে না কেউ, এই যা। এ ধরনের কথা বেশি বলেন বড়-জা। এক থালা রুটি বেলে কমলার উনুনের দিকে ঠেলে দিয়ে তিনি বলে ওঠেন, "কান্না। কান্না। বাপস্! বাড়িসুদ্ধ লোকের কানে তালা ধরে গেল। ছেলে বটে একখানা সেজ বৌয়ের। দেখতে তো চামচিকেটি, গলা যেন ভাঙা কাঁসর।"

কমলা সেই বেলা রুটির গাদা, আর মাখা ময়দার পর্বতের দিকে তাকিয়ে হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলে, "আজ যে এত কান্না কেন কাঁদছে! কি জানি ভেতরে ভেতরে কিছু যন্ত্রণা হচ্ছে কি না।"

বড়-জা মুখ বাঁকিয়ে বলেন, "তুমি আর বকো না সেজ বৌ, কবে আবার তোমার ছেলে না কাঁদে! মা ঘরে গিয়ে কোলে করে বসে নেই, সেই যন্ত্রণা। জ্বর নেই জ্বালা নেই পরিত্রাহি কেঁদেই চলেছে, ঢের ঢের ছেলে দেখেছি বাবা, এমন ছেলে সাতজন্মে দেখি নি।"

বিধবা ননদ সেই মাত্র ঠাকুরঘর থেকে নেমে আসেন, এবং তীব্র ভাষায় বড় ভাজকেই সমর্থন করেন, "ভর সন্ধেবেলা ছেলের চিৎকারে পুজোপাঠ মাথায় উঠলো গা? কি ছেলেই জন্মেছে! অমন ছেলেকে নুন খাইয়ে মারতে হয়। মানুষের ছেলে চেঁচাচ্ছে, কি জানোয়ারে চেঁচাচ্ছে বোঝবার উপায় নেই।

ননদ কটুভাষিণী হলেও মিথ্যাভাষিণী নয়। সত্যিই ছেলেটা চিৎকার করে যেন জানোয়ারের কণ্ঠে। কে জানে কোথায় আত্মগোপন করে আছে এই চিৎকারের কারণ। কোথায় অবস্থান করছে এই কান্নার উৎস? ডাক্তারে হার মেনেছে, তবে 'হার মেনেছে' এটা স্বীকার করে না—বলেই বলে "এ্যালার্জি।" ...সম্পূর্ণ অচেনা নতুন আমদানি এই নামকে কেউ রোগ বলে স্বীকার করে না। তাই হাসি টিটকারিই চলে। ভাবটা যেন আবদেরে ছেলেকে 'রুগ্ন' বলে চালাতে চায় কমলাই, ছেলের দোষ ঢাকতে।

ননদের তীব্র ঘোষণায় চোখে জল এসে যায় কমলার। কি একটা বলতেও যায় হয়তো, কিন্তু ঠিক এই সময় সমরেশ এসে জীর্ণ শীর্ণ ছেলেটাকে প্রায় ঠক্ করে রান্নাঘরের দোরে বসিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে, "পিণ্ডির যোগাড় আর শেষ হচ্ছে না? ও কাজ আর কাউকে দিয়ে হতে পারে না? না হয় বাজার থেকে পাঁউরুটি এনেই গেলা যাক না?"

বোঝা যায় ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে সমরেশের। ...কথাটা বলে চলে যায় সে।

মুহূর্তের জন্য উপস্থিত সকলেই চুপ করে যায়। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই খন্ খন্ করে ওঠেন বড়-জা, "যাও গো, যাও সেজ বৌ, ছেলে কোলে করে ঘরে বোস গে। দেখলে তো বাড়িসুদ্ধ লোকের 'পিণ্ডদান' হয়ে গেল! পষ্ট করে বললেই হয় বৌ রাঁধতে পারবে না। ছেলেকে চিমটি কেটে কাঁদিয়ে, এমন ঠেস দিয়ে 'কথা' শুনিয়ে দিয়ে যাবার দরকারটা কি ছিল?"

কমলা ব্যস্ত হয়ে হাত ধুয়ে বোধ করি ছেলেকে তুলতেই যাচ্ছিল, এই কথায় সহসা ওর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। উঠে গিয়ে রোগা ছেলেটার পিঠে এক চড় বসিয়ে দিয়ে আবার এসে নীরবে রুটি সেঁকতে থাকে।

কিন্তু ছেলে তো আর তাতে ভয়ে 'কাঠ' হয়ে যাবে না? সে এ ব্যাপারের প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না। ফলে ছেলের জ্যেঠা কাকা সকলেই ছুটে দেখতে আসেন ব্যাপারটা কি। আসেন মানে আসতে বাধ্য হন। কান্না চব্বিশ ঘণ্টাই শুনছেন তাঁরা, শুনে শুনে কানে তালা ধরে গেছে সত্যি, কিন্তু এ যে একেবারে অসহ্যেরও অতিরিক্ত।

'সেজ বৌ কোথাও চলে গেছে কিনা' এই প্রশ্নে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে সবাই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কমলার জেদ থাকে না, রান্না ছেড়ে উঠে এসে ছেলে ধরতে হয় তাকে। ..."আপদ তো মরেও না" বলে ছেলের পিঠে আরও একটা চড় বসিয়ে তুলে নিয়ে চলে আসে।

ভেবেছিল ঘরে এসে সমরেশকে দেখে নেবে এক হাত। কিন্তু এসে দেখল সমরেশ ঘরে নেই, বেরিয়ে গেছে।

পুরুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে তবু বহির্বিশ্বের এতটুকু আস্বাদ পাবার উপায় আছে, ঘর-সংসারের এই অবোধ মেয়েরা তাতেও বঞ্চিত। কিন্তু তাদেরও তো সহ্যের একটা সীমা আছে? মরীয়া হয়ে ক্রন্দনরত ছেলেটাকে টানতে টানতে উঠে যায় কমলা তিনতলার ছাদে।

থাকবে সে, এখানেই বসে থাকবে। যদি এতেই বাড়ির লোকের কানের শান্তি হয়, ছেলে চুপ করাবার সাধ্য আর তার নেই।

চৈত্রের এলোমেলো বাতাস বইছে, রাত নটার কম নয়...এখানে উঠে এসে সহসা যেন একটা নতুন জগৎ আবিষ্কার করে। বাড়ির মধ্যে এটুকু মুক্তিও তো আছে। এটুকু হতেও বঞ্চিত থাকে সে? ছেলের কান্না থামাবার কিছু মাত্র চেষ্টা না করে নিজেই উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

আর আশ্চর্য, হঠাৎ এক সময় অনুভব করে কই আর কাঁদছে না তো!... মুখ ফিরিয়ে দেখে—বসা ছেলেটা কখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সহসা একটা কথা মনে হয় কমলার!

গরমের জন্যে কাঁদে না তো ছেলেটা? হয়তো তাই! সমরেশ খালি ঠাণ্ডা লাগার বাতিকে ছেলেকে আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে রাখতে চায়, বেচারা ওই জন্যেই কাঁদে। কাল থেকে যাহোক করে সন্ধেবেলা একবার ছাদে এসে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে যাবে। কাছে সরে গিয়ে আঁচলটা তার গায়ে ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। নাঃ নিজে থেকে কিছুতেই নামবে না সে, সমরেশ এসে সাধ্যসাধনা করুক তবে।

বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে দিব্যি চলে যাওয়া হল বাবুর।

বাতাস উদ্দাম হয়ে ওঠে রাত্রি গভীর হবার সুযোগে। মৃদু জ্যোৎস্নায় ছেলের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভয় ভয় করে কমলার...আরও নিবিড় হয়ে কাছে সরে এসে আবার শুয়ে পড়ে।

খানিকটা পরেই সমরেশ এসে দাঁড়ায়। সাধ্যসাধনার দিকে যায় না। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "এর মানে কি? এই হাওয়ায় শুধু মাটিতে শুইয়ে রেখে দিয়েছ? খুন করতে চাও না কি ছেলেটাকে?"

কমলা অবশ্য নিরুত্তর।

এত সহজে কথা কওয়া চলে না।

"নিয়ে চল—ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

ডাক্তারবাবু!

আর অভিমানের বায়নাক্কা রক্ষা করা চলে না। —ধড়মড় করে উঠে বসে কমলা। বিহ্বলভাবে বলে, "ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গিয়েছিলে?"

"না তো কি হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম? এ কি। কী হয়েছে? এ যে একেবারে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে!" নিচু হয়ে নিজেই ছেলেটাকে তুলতে গিয়ে চমকে উঠেছে সমরেশ।

কমলা ভীত কম্পিত হয়ে হাতটা বাড়ায়, সমরেশ 'ছেড়ে দাও' বলে ওর হাতটা ছুড়ে সরিয়ে দিয়ে, ছেলে নিয়ে নিজেই চলে যায়। এবং নিয়ে যেতে যেতেই নতুন লক্ষণটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ...ভীতিকর ...গা ছমছমে লক্ষণ!...কঠিন কঠোর একটা স্পর্শ। ডাক্তারের কাছাকাছি গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হতাশ ভাবে বলে, "ডাক্তার সেন, এর ঘাড়টা যে একেবারে শক্ত হয়ে গেছে!"

নিঃশব্দ...নীরব স্তব্ধতা!

কুৎসিত কান্না-হীন শান্ত মৌন বাড়ি! আর কারও কানে তালা লাগবার মতো যন্ত্রণা নেই। ...হ্যাঁ শুধু সেই কান্নাটাই চুপ হয় নি, সকলেই একটু চুপ হয়ে গেছে। ...শুধু মাঝে মাঝে অস্ফুট একটা শব্দ—

কিন্তু স্তব্ধতা আর ক'দিনের জন্যে? একার সংসার তো নয়? অনেকের স্বার্থে গঠিত সংসার একজনের জন্য কদিন সহানুভূতি প্রকাশ করবে? তাছাড়া সকলেরই মাত্রাজ্ঞান আছে, কতটুকুর জন্যে কতটুকু খরচ করা দরকার সে সবাই জানে।

ব্যাপারটা ক্রমশ থিতিয়ে যায়...সব কিছুই যথানিয়মে চলে, শুধু কমলার রান্নার 'পালা'র দিনগুলো ভেঙেচুরে গড়-হিসেব হয়ে গেছে। ওকে আর কেউ ডাকে না। অগাধ অবসরের

সমুদ্রে ডুবে নিঃঝুম হয়ে দিবারাত্র পড়ে থাকে কমলা নিজের ঘরে।

অফিস থেকে এসে ক্লান্ত দেহ থেকে ঘামে ভেজা শার্টটা খুলতে খুলতে শ্রান্ত বিরক্ত স্বরে বলে সমরেশ, "এ ভাবে শরীর নষ্ট করার কোনও মানে আছে? একটা অসুখ বাধিয়ে বসলে কারুরই কোনও লাভ নেই?"

বিরক্তির স্বরটা বুকে বাজে। হঠাৎ উঠে বসে কমলা তীক্ষ্ণ আর তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলে, "ওঃ তুমিও এখুনি লাভ-লোকসানের হিসেব কষতে বসছো? তার মানে এখুনি আমাকে জোয়াল কাঁধে নিতে বলছো কেমন?"

"সে সব কিছুই বলি নি আমি, শুধু বলছি এ ভাবে ইয়ে করে একটা রোগ বাধিয়ে বসবে শেষটা।"

"যাক যাক শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকো না। আমার জন্যে তো তোমাদের দরদ উথলে উঠছে...স্বার্থপর। তোমরা সবাই স্বার্থপর"—কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা আর রাখতে পারে না কমলা, হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে, "সংসারের কারুর প্রাণে দয়া নেই। এই তো আমি পড়ে আছি, দিব্যি চলে যাচ্ছে সংসার, শুধু তখনই ছেলেটাকে মেরে ফেলতে—" আরও ডুকরে ওঠে কমলা, "শেষদিন অবধি তাকে ফেলে রেখে হেঁসেল সামলেছি আমি। কেউ বলে নি, "আহা ওর ছেলে মরছে। কসাই। তোমরা সব্বাই কসাই।"

কিন্তু এত বড় ভয়ঙ্কর অভিযোগেও তো কই বিচলিত হয় না সমরেশ। আপন পরিজনদের হৃদয়হীনতার জন্য ত্রুটি স্বীকার করে না, করে না তাদের কটু সমালোচনা। বরং একটু হাসে। ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের ধারালো হাসি। ...যে হাসি কেবলমাত্র মেয়েদেরই একচেটে, সে হাসি পুরুষের মুখে দেখলে কেমন যেন ভয় করে।

সেই ধারালো হাসি হেসে সমরেশ বলে, "কসাই আমরা, না তুমি?"

"আমি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। তোমরা মেয়েমানুষ জাতটাই তাই।...তোমরা পুত্রশোকের যন্ত্রণা সইতে পারো, তবু সইতে পারো না...দুটো বাক্যযন্ত্রণা। এতটুকু "কথা" সয় না তোমাদের। গায়ে ফোস্কা পড়ে। মুমূর্ষু ছেলেটার মরণ-যন্ত্রণার কান্নাকে অবহেলা করে, সংসারের কাজ না করলে কেউ ফাঁসি দিত তোমায়? না হয় দুটো কথা শোনাত। তার বেশি তো নয়? সেটুকু সহ্য করতে পারতে না তুমি? না, সে তোমরা পারো না, তাহলে যে ত্রুটিশূন্য কর্তব্য করতে পারার অহঙ্কার খর্ব হবে। সে অহঙ্কার কারও জন্যে খর্ব করতে পারো না তোমরা, স্বামীর জন্যে নয়, সন্তানের জন্যে নয়। আর নিজের এই বিকৃতির বোঝা হালকা করতে চাও অন্যের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে। আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর তোমরা, কাউকে ভালোবাসতে পারো না, ভালোবাস একমাত্র নিজেকে।"

তোয়ালেখানা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সমরেশ। আর নির্নিমেষ নেত্রে নির্বোধের মতো সেই দিকে তাকিয়ে থাকে কমলা।

তার অনেক যত্নে গড়া আত্মসমর্থনের প্রাসাদটা যেন সমরেশের একটি ফুঁয়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে।...সে প্রাসাদটা তাহলে ইঁটের নয়, তাসের? আর সেই তাসগুলোকেই যে মজবুত ইঁট ভেবে গেঁথে গেঁথে সাজিয়ে তুলেছে এতদিন? কি হাস্যকর। কি লজ্জা।

রুগ্ন ছেলের উপর মমতাহীনের মতো ব্যবহার করেছে সে অপরের হৃদয়হীনতা আর নিষ্ঠুরতায় নিরুপায় হয়ে নয়, করেছে আপন স্বার্থপরতায়?...ও যখন অভিযোগে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চেয়েছে, তখন সমরেশ মনে মনে তাকে করেছে ঘৃণা?

কার্বন কপি

লাল কাঁকরের সরু রাস্তাটা এসে শেষ হয়েছে রংচটা ওই কাঠের গেটটার সামনে। শেষ হওয়া ছাড়া রাস্তাটার আর গতি ছিল না। কারণ শহরটাও শেষ হয়ে গেছে এখানে।

বাড়ির পিছনেই রেললাইনের উঁচু বাঁধ। আর ওপারেই অনেকখানি বালির চড়ার ওধারে একটা বালুনদী। নাম নেই, দেহাতিরা ওর প্রকৃতি বিচার করে একটা নাম দিয়ে রেখেছে। ওরা বলে 'হঠাতি'। তার মানে ওই ওর প্রকৃতি। মাসের পর মাস কোথায় কোনখানে লুকিয়ে আছে, অনড় রোগীর মতো পড়ে আছে, হঠাৎ কোনও একদিনের আমাপা বর্ষণে লাস্যময়ী নবযৌবনার মতো উথলে ওঠে।

এখন নদীটার অনড় রোগীর মূর্তি।

কিন্তু তখন ছিল ভরা যৌবন। অনেক দিন আগে যখন আর একবার এসেছিল উত্তরা 'ফুলমাটিতে'।

তাই এবারে এসে প্রথমটা চিনতে ভুল হচ্ছিল, 'চৌধুরী বাংলো' নামটা পড়ে নিঃসংশয় হল।

ভাবল—সেদিন নদীতে জল ছিল, আর সেই ছোট মেয়েটার চোখেও জল ছিল। অবিরাম কান্নায় বালিশ ভিজিয়েছিল সে, আর এক নদী বইয়েছিল।

অন্তত উত্তরার পিসিমা সেই কথাই বলেছিলেন, ও-দাদা মেয়ে যে তোমার কেঁদে নদী বইয়ে দিল গো।

কিন্তু পিসিমার দাদা ওই নদী বহানোর মধ্যে আতিশয্যতা দেখেননি, তিনি জানতেন এমন ক্ষেত্রে অনেক ছেলেমেয়ে এমন অনেক কিছু করে বসে—যা চোখের জলে নদী বহানোর চাইতে অনেক ঘোরালো।

উকিল মানুষ, কেস তা অনেক আসে? দেখছেন নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে, দেখছেন আত্মহত্যা করতে। তাই সকরুণ হাসি হেসে বলেছিলেন, অমন হয় রে মনীষা। সময় লাগবে সামলাতে।

সামলাবার জন্যেই না মেয়েকে নিয়ে বিভাসবাবু কলকাতার জনসমাজের বাইরে, এখানে এসে উঠেছিলেন। নইলে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বোনের একটা বাড়ি আছে বলে, স্বাস্থ্য উদ্ধার করে নিতে আর কবে এসেছেন বিভাস?

উত্তরার মা আসেনি।

উত্তরার মা এটাতে আতিশয্য দেখেছিলেন। যার জন্যে মায়ের এই মর্মান্তিক কষ্ট, সেটা তো মেয়ের নিজেরই বোকামির ফল। তবে?

যা নিজের দোষে ঘটেছে তার জন্যে আবার এত সহানুভূতি কীসের? এই অভিমত ছিল উত্তরার মায়ের, উত্তরা যত ধিক্কৃত হবে, যত তার লোকসমাজে মুখ দেখাতে মাথা হেঁট হবে ততই আগামী বছরের চেষ্টা আসবে, শপথ গ্রহণের সঙ্কল্প আসবে।

বিভাস তা' বলেননি।

বিভাস নিজের কাজকর্মের ক্ষতি করে মেয়ে নিয়ে একমাসের জন্যে এখানে এই 'চৌধুরী বাংলোয়' এসে উঠেছিলেন মেয়ের মনের সদ্যক্ষতের উপর একটা পলস্তরা পড়বার সুযোগ দিতে।

এখানে লোকসমাজ কম।

উত্তরার পিসেমশাই অনেক দেখেশুনে এই জমিটুকু কিনেছিলেন বাড়ি করবার জন্যে। শহর ছাড়িয়ে রেললাইনের বাঁধের নীচে।

তা' পিসেমশাইকে আর বেশিদিন সে বাড়ি ভোগ করতে হয়নি, উত্তরার বিধবা পিসিই সময় সুযোগ মিললে এসে হাজির হতেন। কাঠের গেটের গায়ের মরচে-পড়া তালাচাবিটা খুলে ফেলে ঢুকে পড়তেন, থেকে যেতেন কিছুদিন।

সেই 'কিছুদিন'র মধ্যে সেবার বিভাস আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। আসার কারণটা পিসি হয় তো ছেলেমানুষী বলে ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন—দাদার একটা মোটে মেয়ে, তাই দাদা এত নাচাতে পারছেন। কিন্তু আসাটা পিসির বড় ভালো লেগেছিল। 'বৌদির' আবরণমুক্ত দাদাকে পেয়ে ছেলেবেলার স্বাদ ফিরে পেয়েছিলেন যেন।

আর বিভাসও হয়তো সে আবরণের প্রভাব মুক্ত হয়ে বদলে গিয়েছিলেন, হালকা হয়ে গিয়েছিলেন। এই সহজ আবহাওয়ার মধ্যে থেকে উত্তরার চোখের জল শুকোতে বেশি দেরি লাগেনি, ম্যাট্রিক ফেল করার মতো মর্মান্তিক শকও সামলে নিতে পেরেছিল।

হ্যাঁ, উত্তরা তার মায়ের মুখে কালি দিয়ে ম্যাট্রিকে ফেল করেছিল। একেবারে অপ্রত্যাশিত! প্রথম দিন প্রশ্নপত্রগুলো হাতে পেয়েই নাকি তার মাথার মধ্যেটা একেবারে ঝাপসা ধূসর হয়ে গিয়েছিল, সেই ধূসরতার মধ্যে থেকে একটা কথাও উদ্ধার করতে পারেনি উত্তরা। শুধু কলম কামড়েছিল, শুধু আকুল হয়ে মগজের সমস্তটা ওলট-পালট করে হাতড়ে বেড়াবার চেষ্টা করেছিল। চেষ্টা কাজে লাগেনি।

নার্ভাসনেস।

সম্পূর্ণ নার্ভাসনেস!

নইলে পড়াশোনা যথেষ্ট তৈরি করেছিল, বাড়ি এসে সেই প্রশ্নপত্রগুলোকেই টকাটক মেরে নিয়েছিল।

পরদিন থেকে বাকি দিনগুলো দিল পরীক্ষা, কিন্তু প্রথম দিনের ওই ব্যর্থতা সমস্ত উৎসাহ আর চেষ্টাকে শিথিল করে দিল।

ফলশ্রুতি—ফেল।

উত্তরার মা এতটা আশঙ্কা করেননি।

ভেবেছিলেন হয়তো থার্ড ডিভিশন পেয়ে ডোবাবে। একি এ যে মুখে কালির বুরুশ!

উত্তরা ঘর থেকে বেরোয় না, কাজেই কালিপড়ামুখ মায়ের সমস্ত আক্ষেপ আর অভিযোগের ভারটা তার উপর গিয়ে পড়ে। বিভাসবাবু দেখলেন মেয়েটাকে ওর মায়ের কবল থেকে কিছুদিনের জন্যে সরানো দরকার।

তাই মেয়ে নিয়ে ফুলমাটিতে চলে এলেন বোনের কাছে।

তা' বিভাসের বিবেচনাটা ভুল হয়নি।

শুধু শোকই সামলে উঠল না উত্তরা, যেন নতুন রক্তে লাবণ্যময়ী হয়ে উঠল, নতুন আবেগে চঞ্চল।

কিন্তু সে আবেগ কি শুধুই 'ফুলমাটির' আকাশ বাতাস আর পাখিরা ফুলেরা নিয়ে এসেছিল? সে লাবণ্যের কি শুধুই 'ওয়েদার'?

বিভাস শতমুখে 'ওয়েদারের' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।

মনীষা বলতেন, হ্যাঁ, নতুন বর্ষায় এখানে সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।'

কিন্তু মনীষা ভাইঝির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতেন।

আজ আর চৌধুরী বাংলোয় কোনও দৃষ্টি নেই। না স্নেহের, না সন্দেহের। মনীষা মারা গেছেন। অনেকদিন হল গেছেন।

বিভাস খুব ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে হঠাৎ ওকালতি ছেড়ে ফিল্ম ডিরেক্টর বনে গিয়ে বম্বে চলে গেছেন। আর হয়তো উত্তরার মা এতদিনে মনের মতো সমাজ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

কিন্তু উত্তরা?

উত্তরা হঠাৎ যেন সমাজের পক্ষপুট থেকে পিছলে পড়েছে। উত্তরা তার সেই ঘটার বিয়ের স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ধর্মাধিকরণের কাছে যে আর্জি পেশ করেছিল, তা' মঞ্জুর হয়েছে। উত্তরা আবার তার বাবার পদবিতে ফিরে গেছে, যে বাবা বলেছেন জীবনে আর ওর মুখ দেখবেন না।

মা ওকে সমর্থন করতে চেষ্টা করেছিলেন, মা ওর কাজটাকে ম্যাট্রিক ফেল করার চাইতে বেশি গর্হিত ভাবেননি। কিন্তু বিভাস বলেছেন, চুপ। যে মেয়ে আমার মুখে কালি মাখিয়েছে—

উত্তরা একবার মার মুখে কালি লেপেছিল, এবার বাবার মুখে লেগেছে।

আর অবাক হয়ে ভেবেছে উত্তরা, আশ্চর্য, তবু বাবার পদবিটাই গ্রহণ করতে হচ্ছে তাকে। তাছাড়া আর কিছু নেই।

এই অস্বস্তিকর মানসিকতায় হঠাৎ 'ফুলমাটির' কথা মনে পড়ল উত্তরার। মনে পড়ল 'চৌধুরী বাংলোটাকে।'

পিসি নেই, পিসির ছেলেরা তো আছে? ওদের কাছে বাড়ির চাবিটা চাইল উত্তরা। বলল, দু' চারদিন থেকে আসব—

ওরা বলল, চাবি খোলা আছে। মালি রেখে দিয়েছি একটা, আর তো যায় না বড় কেউ, শেষে জানলা-দরজাগুলো চুরি হয়ে যাবে? তা' গেলে ওই মালিটাই রেঁধে বেড়ে দেবে। কিন্তু কথা হচ্ছে—

উত্তরা হাসল। বলল, বল শুনেই যাই তোমাদের 'কথা হচ্ছেটা'। বোধহয় এই পাপীয়সীকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া নিয়ে দ্বিধায় পড়েছ!

পিসতুতো দাদা বলল, আঃ কি যে বলিস। কথা এই, ঠিক এই সময়ই অরণি গেছে ওখানে হপ্তাখানেকের জন্যে। ও এলে—

উত্তরা স্থির চোখে তাকাল।

অরণি।

দাদা বলল, হ্যাঁ, অরণি, আমাদের পিসতুতো ভাই? কেন তাকে তো দেখেছিস? সেবারে মামার সঙ্গে যখন গিয়েছিলি, অরণি গিয়েছিল যে?

উত্তরা ভুরু কুঁচকে বলল, মনে পড়ছে। কিন্তু ওরা থাকতে আর কারো যাওয়ায় বাধা আছে?

পিসতুতো দাদা মাথা চুলকে বলল, বাধা মানে আর কি, ও তো একা রয়েছে—

কেন ওর স্ত্রী?

স্ত্রী? হায় কপাল, মাথা নেই তার মাথাব্যথা! ওই এক ছেলে! অমন কাজকর্ম করছে, অথচ না বিয়ে, না সংসার। ওই ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়ে। কদাচ কখনও ফুলমাটিতে যায়। এবারে—তা' ও তো বলেছে সামনের শনিবার পর্যন্ত থাকবে, তুই বরং রবিবার—উত্তরা বলেছিল, দেখি!

কিন্তু সেই দেখাটা দেখবার জন্যে যে সেই রাত্রেই ট্রেনে চেপে বসবে উত্তরা, একথা কি ভেবেছিল উত্তরার পিসির ছেলে?

ভাবেনি।

ভাববে কেন? ভাববার মতো তো কথা নয়? কিন্তু উত্তরা ভেবেছিল, হয়েছে কি! বরং তো সুবিধেই। সাতসকালে ধুলো জমানো নেই বাড়িতে, রান্নাঘরটা চালু রয়েছে।

ঘরও তো চৌধুরী বাংলোয় গুনতিতে অন্তত গোটা পাঁচেক।

লাল সুরকির রাস্তাটা শেষ করে সাইকেল রিকশটা থামল। নেমে পড়ে গেট ঠেলে ঢুকে সেই পাঁচটা ঘরের দিকে তাকাল উত্তরা। কোন ঘরটায় যেন ছিল সেবারে? ওই পিছনের কোণেরটায় না? রেললাইন দেখা যায় বলে বেছে নিয়েছিল।

না, প্রথমটা বেছেছিল বোধহয় কেবল মাত্র পিছন বলেই। যাতে মুখ দেখাতে কম হয়। তারপর ঘরটা ভালো লেগে গেল। ঘরের পিছনে বাগান ছিল। তা-ই বলেছিল বাবাকে, পিসিকে।

বাগান আছে এখনও?

আস্তে এগিয়ে এল উত্তরা, রিকশওলাটার মাথায় নিজের ব্যাগ বিছানা চাপিয়ে।

কিন্তু কই?

কোথায় কে? পিসতুতো দাদার পরিবেশিত খবরটা ভুল তা'হলে।

ওকে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বারান্দার জিনিস দুটো ফেলে রেখে মালিকে খুঁজতে রান্নাঘরের দিকে এগোল উত্তরা।

এমনি একটু জনমনুষ্যহীন জায়গার জন্যেই তো তৃষিত হয়ে উঠেছিল উত্তরা, হাতড়ে মরেছিল সেই জায়গা ভাবতে, যেখানে কারো 'দৃষ্টি' নেই। না স্নেহের, না সহানুভূতির, না সন্দেহের।

অথচ—

শূন্য খাঁ খাঁ বাড়িটা দেখে মনটা বিশ্রী হয়ে গেল কেন? খাঁ খাঁ করে উঠল কেন?

মালিকে খুঁজতে বেশি দূর যেতে হল না।

রিকশর শব্দ শুনে নিজেই সে বেরিয়ে আসছিল কোনও এক কোটর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

উত্তরা অপ্রতিভ হ'ল।

বলল, এটা আমার পিসির বাড়ি, বুঝলে? থাকব দু'চারদিন—

মালি মাথা চুলকে বলল, চিঠি এনেছেন?

চিঠি!

আজ্ঞে মানে দাদাবাবুদের কারো চিঠি না হলে—

সেরেছে। তোমাদের আবার এইসব নিয়ম আছে নাকি? আমি নিশ্চিন্ত হয়ে—

মালি সবিনয়ে একটা বেতের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে, বসুন, একটু বসুন। যে দাদাবাবু রয়েছে এখানে, তিনি এলেই—

উত্তরা এক মিনিট শিথিল হয়ে যায় কথা বলতে পারে না।

তারপর নিজেকে চোস্ত করে নিয়ে বলে, দাদাবাবু? কোন দাদাবাবু আবার? আমি তো

তোমার সব দাদাবাবুদেরই কলকাতায় দেখে এলাম। রমেন, সোমেন, শুভেন—

মালির মুখে এবার হাসি ফোটে। বলে, তবে তো সবই জানেন। ইনি হচ্ছেন 'অরনি' বাবু। এই বাড়িটা অরনিবাবুর মামার বাড়ি!

ওহো তো তাই বল—উত্তরা প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠে, খুব চিনি। বলতে হয় এতক্ষণ? তা' কোথায় গেছেন?

আজ্ঞে পাখি মারতে—

পাখি মারতে? আজকাল আবার শিকারী হয়ে উঠেছেন বুঝি বাবু?

মালি হাস্য গোপন করে বলে, আজ্ঞে শিকার বলেন শিকার, খেলা বলেন খেলা। যান রোজ ভোরে বন্দুক ঘাড়ে করে। আর পাখি?

বুড়ো আঙুলটা তুলে নাচিয়ে নেয় লোকটা। আর এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাঝখানেই আসামির আবির্ভাব। বন্দুক হাতে বীরের বেশ।

চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অবাক হয়ে বলে, কে?

উত্তরা একটু বাঁকা হাসি হাসে, চিনতে পারছো না?

পারছি বৈকি! পারছি বলেই তো বিশ্বাস করতে দেরি লাগছে।

খুব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?

খুব।

কেন, তোমার মামার বাড়িতে আসতে আছে, আর আমার পিসির বাড়িতে আসতে নেই?

নেই কে বললে? আছে বলেই তো সেই দুর্লভ ঘটনা একাধিকবার ঘটল।

কী মনে হচ্ছে?

মনে হচ্ছে 'অকস্মাৎ' 'দৈবক্রম' এগুলো কেবলমাত্র উপন্যাসেরই বস্তু নয়।

আর যদি বলি, অকস্মাৎও নয়, দৈবক্রমও নয়, জেনেশুনে ইচ্ছে করে এসেছি?

তাহলে সেই মধুর মিথ্যেকে পরম সত্য বলে গণ্য করে স্বর্গসুখ পাব।

এখনও সেই রকম সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে পারো দেখছি।

সাজিয়ে-গুছিয়ে হয়তো, কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে নয়।

তোমার কাঁধের বন্দুক দেখে ভয় করছে। গুলিটুলি করে বসবে না তো?

ইচ্ছে করছে।

মালি বোঝে রহস্য আছে।

কারণ বুদ্ধিমানেরা যাদের বোকা ভাবে, তারা যে সব সময়ই বোকা হয় না, তার প্রমাণ হামেশাই মেলে। মালিটা বোকা নয়। আর বোকা নয় বলেই আর বেশিক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকার ভূমিকা অভিনয় না করে বলে, দিদিমণি খাবেন তো?

খাব বৈকি। বাঃ খাব না তো কি উপোস করতে এলাম? খুব ভালো ভালো খাব। কী কী রাঁধছ বল?

মালি বিনীত ভঙ্গিতে জানায়, রান্না এখনও শুরু হয়নি, বাবু পাখি মেরে আনবেন এই আশায়—

এই আশায়!

বাবু ধমকে ওঠে, পাখি আবার আমি কবে আনি হে? শিকার করতে যাই বলেই শিকার করে আনতে হবে এমন কোনও কথা নেই।

উত্তরা মৃদু হেসে আস্তে বলে, 'না তা' নেই বটে। অন্তত তোমার কাছে নেই।

কোণের সেই ঘরটাই নির্দিষ্ট করে দেয় উত্তরা নিজের জন্যে।

অরণি বলে, দক্ষিণের ঘর থাকতে, উত্তরের ঘর—

উত্তরা মৃদু হেসে বলে, উত্তরা যে। আর ভাগ্যের দাক্ষিণ্যে যার কপালে ঘরই সইল না, তার আর একদিনের ঘরে দক্ষিণের বাতাস লেগে লাভ?

একদিন। একদিন থাকবে বলে এসেছ?

কিছুই 'বলে' আসিনি। একদিনের বেশি থাকা সম্ভব কিনা তাও জানি না।

পিছনের সেই বাগানে এসে বসেছে ওরা। বিকেলের চা খাচ্ছে, বেতের চেয়ার পেতে।

মালিটা সব গুছিয়ে দিয়ে গেছে।

দুপুরবেলা খাইয়েছে চর্ব্যচোষ্য করে, আবার রাত্রের ব্যবস্থাকল্পে বাজারের দিকে গেছে। মনে মনে হেসে গেছে, সুবিধে দিয়ে গেলাম তোদের। যার জন্য যোগসাজস করে দুজনে এসেছিস এখানে। ভাবটা দেখাচ্ছিস যেন হঠাৎ যোগাযোগ। যেন এখানে হঠাৎ দেখা। কিন্তু সব বুঝি বাবা।

এরা ধরতে পারেনি ওর মনের কথা। এরা নিশ্চিন্তে চা খাচ্ছে।

অরণি টেবিলে একটা সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বলে, থাকা অসম্ভবই বা মনে হচ্ছে কেন? ভয় করছে?

করলে হাসির কিছু নেই। অরণি সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে রহস্যভরা গলায় বলেন, অথচ সেদিন ভয় করেনি। যখন বয়েস ছিল—বোধহয় মাত্র ষোলো।

ষোলো বলেই তো ভয় করেনি। ছাব্বিশ হলে করত।

অরণিরও কি ভয় করছে?

নইলে অরণির দেশলাই জ্বালতে অত দেরি কেন? কথা শুরু করতে জল খেতে ইচ্ছে করছে কেন?

স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'ল কেন?

ভাব না থাকলেই বিচ্ছেদ হয়।

ভাবের অভাব কীসের? অত ঘটার বিয়ে—

বিয়েতে তো আসনি, জানলে কী করে ঘটার বিয়ে?

না এলেও জানা যায়।

আমার খবর রাখার তোমার দরকার কি?

কিছু না। দেশের বহুবিধ খবরই তো রাখা হয়ে যায়।

শুধু এই?

তা' ছাড়া কী হবে?

ওঃ।

মনে হচ্ছে ক্ষুণ্ণ হলে।

হয়তো হ'লাম।

কেন?

আশা করেছিলাম, বলবে আমার খবরই তোমার ধ্যান-জ্ঞান।

মেয়েরা নিজেরা মধুর মিথ্যা বলে, কিন্তু বিশ্বাস করে কি?

উত্তরা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর খুব কেটে কেটে বলে, সেদিন কিন্তু করেছিলাম।

সেদিন। অরণি বিমূঢ় গলায় বলে, কোন দিন? কোন মিথ্যে?

মনে নেই? সেই ভয়ানক মিথ্যা কথাটা বিশ্বাস করে একটা অবোধ মুখ্যু স্কুলের মেয়ে নিজেকে হারিয়ে বসেছিল, আর—

সে কথাটা মিথ্যা, এই সত্যটাই বুঝি আবিষ্কার করেছ এতদিনে?

সত্যি তারই বা প্রমাণ পেলাম কই?

অরণি আর একটা সিগারেট ধরায়। ধরিয়ে হাতে রেখে দেয়। বলে, হিসেবে একটু ভুল আছে তোমার। মেয়েটা অবোধ মুখ্যু বালিকা, এটা ঠিক বসিয়েছ, কিন্তু ছেলেটা যে নিতান্ত মূঢ় অজ্ঞান কুড়ি বছরের একটা ছেলে মাত্র, সেটা বসাওনি হিসেবের খাতায়। তা' যদি বসাতে, প্রমাণ পেতে। সহজেই বুঝতে পারতে তার কাছে সেটাই সত্য ছিল। সেই প্রথম ভালোলাগাটাকেই সে ভালোবাসা বলে বিশ্বাস করেছিল।

কিন্তু মাত্র কুড়ি বছরের মূঢ় ছেলেটার দুঃসাহসের তো অভাব ছিল না কিছু?

মূঢ় বলেই অভাব ছিল না। দুঃসাহস তো মূঢ়দেরই!

পিসি তাই বলেছিলেন বটে—

পিসি! ওঃ মামি! হ্যাঁ মামি বলেছিলেন 'তোর যদি বয়েসটা সাবালকের কোঠায় পৌঁছত, তা'হলে তোর বাপকে বলে দিয়ে বুঝিয়ে ছাড়তাম শাস্তি কাকে বলে—'

আমাকেও তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, পরিণাম জানলে আগুনে হাত দিতে যেতিস না। ভগবানের অশেষ দয়া তাই আমি এসে পড়েছিলাম।

ঠোঁটটা কামড়ে তিক্ত একটা হাসি হেসে উত্তরা কথা শেষ করে, বলেছিলেন 'নেহাৎ দয়া করেই একথা দাদার কানে তুললাম না।' অথচ মজা এই, আমি ভেবেছিলাম, অনেক দিন পরে পর্যন্ত ভেবেছিলাম, অতটা দয়া প্রকাশ না করলেও হত। হয়তো বাবার কানে তুললে—

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায় অরণি। ওর মুখের রংটা অস্বাভাবিক লাল দেখায়। ওর নিঃশ্বাসের উষ্ণতা যেন টেবিলের এধারে এসে উত্তরার গালে লাগে।

টেবিলের এধারে ঘুরে আসে ও।

উত্তরার কাঁধের দিকে এসে দাঁড়ায়, চেয়ারের পিঠটা চেপে ধরে, ভয়ানক একটা চাপা অথচ উদ্ধত গলায় বলে, তোমার পিসি, আমার মামি, সেই মহীয়সী মহিলাটি যা করেছিলেন, প্রকৃতির আইনে সেটা জঘন্যতম অপরাধ তা' জান? অথচ তিনি এটা করতে সাহস পেয়েছিলেন, সামাজিক নিয়মে আমাদের বয়েস তখনও নাবালকত্বের গণ্ডিটা অতিক্রম করেনি বলে।

থাক তাঁর কথা উত্তরার রক্তের মধ্যে একটা উত্তাল সুর বাজছিল, উত্তরার শিরায় শিরায় একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটাছুটি করছিল, উত্তরা প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিল, বুঝি সাবালক অরণি তীব্র আক্রোশে সেই নাবালক ছেলেটার ওপর অবিচারের প্রতিশোধ নেবে, তবু কষ্টে কথাকে সহজ সুরে শেষ করেছিল সে, তিনি বেঁচে নেই।

উত্তর যা আশঙ্কা করছিল—(নাকি, শুধু আশঙ্কাই নয়, আশাও?) তা যদি অকস্মাৎ ঘটে যেত, হয়তো উত্তরা বাধা দিতে ভুলে যেত, হয়তো ওই বালুনদী 'হঠাতির' মতো বালুস্তর ভাসিয়ে দিয়ে উত্তাল হয়ে উঠত, কূল ছাপিয়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় পাড় ভাঙত।...কিন্তু উত্তরার আশা আর আশঙ্কা দুই-ই থমকে থাকল।

অরণি সরে গিয়ে শুকনো ঘাসের ওপর পায়চারি করতে লাগল।

উত্তরার ঘামে ঠাণ্ডা হাতটা আবার স্বাভাবিক উষ্ণতায় ফিরে এল।

কখন যেন পড়ন্ত বেলার সূর্য বিদায় নিয়েছে...চেতনায় এল যখন সমস্ত বাগানটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, দু'জনার কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

অরণি পায়চারি করতে করতে আবার সরে এসেছে, টেবিলের দুটো কোণ চেপে ধরেছে। আর তার মৃদু ভাঙা ভারী গলাটা থেমে থেমে উচ্চারণ করছে, তিনি মারা গেছেন কিন্তু আমরা তো বেঁচে আছি? সেদিনের সেই অবিচারের শোধ নেওয়া যায় না উত্তরা? এই সন্ধ্যাটাকে

উনিশশো তেষট্টির মনে না ক'রে উনিশশো তিপান্নর মনে করা যায় না? আমরা তো দু'জনে দুজনকে দেখতে পাচ্ছি না, কী এসে যায়, যদি আমরা ভেবে নিই, আমাদের ওপর দিয়ে প্রায় একটা যুগ চলে যায়নি! যদি ভেবে নিই, সেই আবেগ, সেই রোমাঞ্চ, সেই মরে যাওয়ার মতো অসহ্য সুখের মুহূর্তে কেউ এসে রক্তচক্ষু তুলে দাঁড়ায়নি আমাদের সামনে, আমরা শুধু সেই মুহূর্তটাকে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি...এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি...

অরণি! তুমি কী আমায় পরীক্ষা করছ?

পরীক্ষা! কী বলছ তুমি উত্তরা?

হয়তো তুমি ভাবছ, তুমি আছ জেনে, একা আছ জেনে, আমি ইচ্ছে করেই—

নিজেকে অত সৌভাগ্যবান ভাবতে পারি, এত সঞ্চয় আমার কোথায় উত্তরা? আমি শুধু মুষ্টিভিক্ষার কাঙালি!

ঘরে চল অরণি! আলো জ্বালাইগে—

না! অরণি সবলে ওর দুটো কাঁধ চেপে ধরে। বলে, ঘরে গেলে আলো জ্বাললে আমরা হারিয়ে যাব, ফুরিয়ে যাব, সমাজের শেকলে বাঁধা পড়ে যাব। এখানে প্রকৃতি বন্য, নিরাবরণ! জীবনের একটি সন্ধ্যা কি এই প্রকৃতিকে উৎসর্গ করা যায় না—উত্তরা?

উত্তরা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে।

উত্তরার সেই প্রতীক্ষায় উত্তাল রক্তপ্রবাহ 'সমে' এসেছে, সুস্থির গতি পেয়েছে, তাই গলার স্বর কাঁপে না ওর। খুব নরম গলায় বলতে পারে, মুষ্টিভিক্ষায় লাভ কি অরণি?

মনে কর, আমার দুর্লভ সঞ্চয়ের ঘরে জমা রাখব সেই ভিক্ষাটুকু! পরে, অনেক পরে, জীবনকে যদি কোনওদিন নিতান্ত মূল্যহীন মনে হয়, স্মরণ করব এই সন্ধ্যাটিকে। তোমার আর কতটুকু ক্ষতি উত্তরা, অথচ আমার অগাধ সমুদ্রের লাভ, অনন্ত আকাশ ব্যাপী লাভ!

অরণি আমায় দুর্বল করে দিও না।

ভুল করছ উত্তর! দুর্বলতার অথই জলেই তো ডুবে রয়েছ তুমি! আমি তোমাকে সেই দুর্বলতার পাথার থেকে উঠে আসতে ডাক দিচ্ছি। সবলে নিজেকে প্রকাশ কর তুমি। তুমি যে তোমার নিজের, একান্ত নিজের, সেই সত্যকে মহিমার সঙ্গে স্বীকার কর। এতবড় জীবনের একটি মাত্র সন্ধ্যা আমি তোমার কাছে চাইছি উত্তরা। সেটুকু দিতে কীসের এত দ্বিধা তোমার? তুমি এখন কারও বিবাহিতা স্ত্রী নও, কারো কুমারী মেয়ে নও, আর তুমি তোমার পিসির নাবালিকা ভাইঝিও নও। তুমি তো কেবল মাত্র তোমার!

সে জোর খুঁজে পাচ্ছি না অরণি...

উত্তরা মনে মনে বলে, বরং তুমি সবল হও, তুমি আমায় লুঠ করে নাও...তোমার সেই জোরের কাছে আমি হারিয়ে যাব, মিলিয়ে যাব। মনে মনে এমনি কত কথা বলে উত্তরা। কিন্তু মুখে বলে, আমার বুকের মধ্যে কী রকম যেন করছে। অন্ধকারে আমার ভয় করছে। ঘরে চল অরণি, আলোজ্বলা ঘরে।

সমস্ত যৌবনকালটা ধরে শুধু—গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলে অরণি, কৃপণতাকে বাড়িয়েছে উত্তরা! অথচ সেদিন যখন এত লাবণ্যের কিছুই ছিল না—

সেদিনের কথা বারবার তুলো না অরণি! বরং সেদিনের মতো নিজের জোরে কেড়ে নাও আমায়—

অরণি এগিয়ে আসে, আরও কাছে, উত্তরার পিঠটা নয়, চেয়ারের পিঠটা চেপে ধরে, হতাশ গলায় বলে, তা হয় না উত্তরা। ভিক্ষুক হতে পারি, বিশ্বাসঘাতক হতে পারব না।...তুমি এসে একা বাড়িতে আমায় দেখে তক্ষুনি ফিরে গেলে না, নিশ্চিন্ত মনে রয়ে গেলে, এই বিশ্বস্ততার

মূল্য শোধ করব কি নীচ হয়ে? ছোট হয়ে? যদি স্বেচ্ছায় দিতে, মাথায় করে নিতাম।...জানো উত্তরা, সেই কুড়ি বছরের ছেলেটা কত বছর কী অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে?

উত্তরার গলা থেকে যে অস্ফুট আওয়াজটা বেরোয় সেটা বোধহয়, কি?

অরণি আবেগরুদ্ধ গলায় বলে, সে স্বপ্ন, উঁচু বাঁধের ওপর রেল লাইন, চোখের সীমানায় এক দুরন্ত নদী, আর একটা বাড়িতে শুধু তুমি আর আমি—

তোমার সে স্বপ্নের কথা তো কোনও দিন আমার বাবার কাছে এসে বলনি অরণি?

বলেছিলাম উত্তরা। তুমি জানতে পারনি। তোমার বাবা বলেছিলেন, আমার মতো ইতর ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়ার চাইতে মেয়েকে বরং কেটে জলে ভাসিয়ে দেবেন।

অরণি।

বানিয়ে বলছি না উত্তরা। দিনে দিনে তাই সে স্বপ্ন শুধু স্বপ্নের কুয়াশায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু আজ...আজ আবার তুমি কেন এলে উত্তরা? একা একজন পুরুষের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে কেন রইলে?

আমায় মাপ কর অরণি।

মোহময়, জ্যোৎস্নাময় রাত্তিরটা তোমার হাতে আছে উত্তরা, ভাববার, সিদ্ধান্ত করবার—

রাতটা নেই অরণি, নটার গাড়িতে আমি ফিরে যাব।

ট্রেনের টাইমে তাড়াতাড়ি লুচি ভাজতে ভাজতে মালিটা ভাবে, দূর, যা ভাবছিলাম তা নয় দেখছি। যতই হোক—নির্জন নিরম্বু একটা বাড়ি, বলতে গেলে নিষ্পর একটা লোক....এখনকার মেয়েদের বেপরোয়া সাহস দেখে দেখে মনে করেছিলাম বুঝি...ছিঃ ভারি লজ্জা করছে।

উত্তরাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে আসতে অরণি ভাবে, ঘৃণা হচ্ছে নিজের ওপর। চাবুক মারতে ইচ্ছে হচ্ছে। কি লজ্জা। কি দৈন্য! দৈন্যের কি হাস্যকর প্রকাশ! কেন আমি ভিক্ষুকের মতো এত খেলো করলাম নিজেকে? সত্যিই কি দরকার ছিল এতটার?

ট্রেনটা একটানা শব্দ করে চলেছে ঝিক্‌ঝিক্ ঝিক্‌ঝিক্।

সেই শব্দের মধ্যে উত্তরার ভাবনাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে...মিলিয়ে যাচ্ছে। উত্তরাও ভাবছে, সত্যিই কি দরকার ছিল এতটার? এতটা শুচিবাইয়ের? আমার এই মহান শুচিতার জবাবদিহি করতে যাব আমি কার কাছে? যদি নিজের কাছে হয়, সবটাই তো হাস্যকর রকমের মূল্যহীন। প্রতি মুহূর্তেই তো আকাঙ্ক্ষা করেছি আমি ওকে, আশা করেছি ও লুঠ করে নিক আমায়।

তবে?

জবাবদিহিটা তা'হলে সেই সংস্কারের কাছে। বুঝতে পারছি, আমি জীবন-বিশ্বাসী নই, আমি সত্যধর্মী নই, এমন কি আমি আধুনিকও নই। আমি আবার সেই সেকেলে পিসির কার্বন কপি মাত্র। এছাড়া আর কিছু হ'বার ক্ষমতা নেই আমার।

ক্যাকটাস

বড় বেশি প্রয়োজনের সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সেই প্রয়োজনীয় বস্তুটি হাতে এসে পড়া মানুষের ভাগ্যে দৈবাৎই ঘটে।

ভারতীর ভাগ্যে হঠাৎ সেই দৈবদুর্লভ ঘটনাটা ঘটে গেল। খবরটা পেয়ে ভারতী ভাগ্যের এই অযাচিত করুণায় আহ্লাদে যেন দিশেহারা হয়ে গেল।

আরওই খবরের পর বাকি যতক্ষণ কলেজের কাজে আটকে থাকতে হল তাকে, ততক্ষণ সব কাজের মধ্যে পরিকল্পনা চলতে লাগল তার কোন্ ভাষায় আর কোন্ ভঙ্গিতে খবরটা পরিবেশন করবে গিয়ে শিশিরের কাছে।

কতক্ষণে করবে।

সত্যি বাড়ির চিন্তায় যখন অস্থির হয়ে যাচ্ছে ভারতীরা, নিত্যনতুন অপমানের জ্বালায়, গ্লানি ও তিক্ততায় মন ভরে উঠেছে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনের প্রতিটি ছুটির বারের কাজ হয়েছে বাড়ি দেখতে বেরোন, এবং খবরের কাগজ খুলে সর্বপ্রথম পঠিতব্য বিষয় হয়েছে 'বাড়ি ও জমি'র 'কলাম', সেই হেন সময় খবরটা যেন বিধাতার হাতের আশীর্বাদী ফুলের মতো।

অবশ্য 'গৃহসমস্যা' তাদের হবার কথা নয়, কারণ যে বাড়িটিতে ভাড়া আছে তারা, সে বাড়িটি অনেকাংশেই সুবিধাজনক। কিন্তু কিছুদিন থেকে বাড়িওয়ালারা আর ভারতীদের সুবিধাজনক মনে করছে না।

নিত্যবর্ধিত বাড়িভাড়ার আকাশছোঁওয়া উচ্চহারের খবরে খবরে ওদের মেজাজও আকাশে চড়েছে এই অনেক দিনের ভাড়াটেদের উপর।

অনেক দিনেরই।

ভারতীর তখনও বিয়ে হয় নি, সেই আমল থেকে এবাড়িতে আছে শিশিররা, বিয়ে হয়ে এই বাড়িতেই বৌ সাজে এসে ঢুকেছে ভারতী। দেখেছে একতলায় বাড়িওয়ালা, দোতলায় শিশিররা। কিন্তু 'বাড়িওয়ালা' মাত্র নয়, নিতান্ত আত্মীয়ের মতোই।

শিশিরের মায়ের সঙ্গে বাড়িওয়ালা গৃহিনি হৃদ্যতার শেষ ছিল না। শিশিরের মায়ের মৃত্যু হলে, তিনিই মা-মাসির মতো ওদের দেখেছেন, যত্ন করেছেন, 'বৌমা বৌমা' করে পাঁচবার খোঁজ নিয়েছেন। সুখে-দুঃখে একজন অভিভাবকের মতোই ছিলেন ওঁরা এদের।

কিন্তু কালের গতিকে, সেই 'নিকটাত্মীয়ই' অনাত্মীয়ের ভূমিকা অভিনয় করছেন। একসঙ্গে দু'দুটো তোলা উনুন জ্বেলে দিচ্ছেন ভারতীর শোবার ঘরের জানলা লক্ষ করে, রাত ন'টা

বাজতে না বাজতেই সদর দরজায় তালাচাবি মেরে দিচ্ছেন, ভারতীদের কাপড়-জামা দোতলায় বারান্দায় শুকোতে দেওয়া 'দেখুন মাথায় ঠেকছে' বলে তারস্বরে আপত্তি জানাচ্ছেন, ভারতীয় ছেলের হাতে রবারের বলটা ছিটকে নীচের উঠোনে পড়লে সরাসরি রাস্তায় ফেলে দিচ্ছেন। এবং যখন তখন ভারতীদের কর্ণকুহর 'তাক' করে একে ওকে তাকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'আর যা কর তা কর ভাই, মরে গেলেও কখনও বাড়িতে ভাড়াটে বসিও না। ও এমন সর্বনেশে জাত নয়, একবার গেড়ে বসলে জীবনে আর উঠবে না। পুরুষানুক্রমে রয়ে যাবে।'

এমনি আরও অনেক কিছু।

ভাড়াটে বিতাড়ন কান্ডের কর্মসূচী অনুযায়ী যা যা করণীয়, তার সবটাই প্রায় করছেন ওঁরা, যা ভারতী বা শিশিরের কাছে মরণতুল্য।

বিশেষ করে 'শুনিয়ে বলা' কথাগুলো বড় দুষ্পাচ্য। কর্মগত অপমানের চাইতে, বাক্যগত অপমানটাই যেন অধিক মর্মবিদারী। অথচ তার মাত্রাটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

কারণটা বোধ করি ওই জগৎ ব্রহ্মান্ডের সর্ববিধ মূল্যমান প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা। গত সপ্তাহের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা গেছে 'দুইখানি ঘর ও রান্না ঘর, বাথরুম, দুইশত পঞ্চাশ—' এ সপ্তাহে সেই বস্তুই 'তিনশত পঁচিশ—' পরবর্তী সপ্তাহে বোধ করি—তা সে যাক, মোটকথা, বরাবরের বন্ধু হঠাৎ শত্রুপক্ষ হয়ে দাঁড়ালে দুঃখের শেষ থাকে না। আর সে 'শত্রুর' মতো নির্লজ্জ হতে বোধকরি চিরশত্রুও পারে না।

এই আজই সকালে হয়ে গেছে একপালা।

দোতলায় ঘণ্টু কী সূত্রে একটু বেশি দাপাদাপি করে ফেলেছিল, হঠাৎ নীচতলা থেকে গিন্নি কণ্ঠে মধু মেখে বলে উঠলেন, 'বৌমা, অ বৌমা ছেলেকে একটু সামাল দাও মা, গরিবের জীর্ণ বাড়িখানা যে গুঁড়ো হয়ে গেল! ইহজীবনে খালিও তো পাব না কোনওদিন যে একবার মেরামত করিয়ে একটু শক্ত করে নেব।'

ভারতীর তখন কলেজে আসবার সময়, কথা বাড়াল না। পারতপক্ষে বাড়ায়ওনা। শুধু বছর আষ্টেকের ছেলেটাকে করুণ মিনতি জানিয়ে এলো দাপাদাপি না করতে। কিন্তু আজ ঘণ্টুর স্কুলের কীসের যেন ছুটি, অথচ মা-বাবার ছুটি নেই, এহেন সুবর্ণ সুযোগ তার কিছু আর বেশি আসে না। অতএব ঘণ্টু যে মা'র মিনতি অগ্রাহ্য করে এবং ঝিকে থোড়াই কেয়ার করে যথেচ্ছাচার করে বেড়াবে সারাদিন, তাতে আর সন্দেহ কি!

কে জানে গিয়ে কী পরিস্থিতি দেখবে ভারতী।

আর আগে আগে? যখন ঘণ্টু আরও ছোট ছিল? ওই ওঁরাই ঘণ্টুকে সারাদিন নিজেদের কাছে রেখেছেন, নাইয়েছেন, খাইয়েছেন, ঘুম পাড়িয়েছেন।

হয়তো তখন ওঁদের ওই আগ্রহ আর আন্তরিকতাটুকুর সাহায্যেই কলেজের চাকরিটা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল ভারতীর। ওরাই কত আহ্লাদ করে বলেছেন, 'তোমরাই ধন্য মেয়ে বৌমা। একালের মেয়েরা। এই সংসারের ছিষ্টি করছো, রাঁধছ, বাড়ছ, আবার মোটা টাকা ঘরে আনছ! আমরা তো মিথ্যে মানুষ এটুকুও আর করব না?'

চাকা ঘুরে গেছে।

পালা বদল হয়েছে।

এখন বাতাসে কথার তির ছোড়ার খেলা।

এখন ঘণ্টু বাড়ি থাকলে এই ধরনের তির এসে কানের পর্দা ভেদ করে। চললেন, মা চললেন ব্যাগ দুলিয়ে, আঁচল উড়িয়ে, এখন ছেলের দৌরাত্মিতে মরুক পাড়ার লোক! অসহ্য এক জ্বালা হয়েছে বাবা।'

শালীনতাহীন পালিশহীন এই মন্তব্যগুলো তারাই করে, যারা ঘণ্টুকে 'চাঁদের টুকরো' বলে আদর করেছে, আর ঘণ্টুর সম্ভাবনাকালে ভারতীকে 'আচার' খাইয়েছে এবং সতর্কতার বহুবিধ উপদেশ দিয়েছে।

হয়তো বা বিয়ের পর বৌ হয়ে আসা ভারতীর ক্রমবর্ধমান বিদ্যা ও তার ফলস্বরূপ একেবারে একটি কলেজের অধ্যাপিকা হয়ে বসার ইতিহাসটাও তাঁদের মনোভঙ্গের আরও একটা কারণ!

কিন্তু সে যাক, সেটা ভারতীর ব্যাপার নয়।

ভারতীর ব্যাপার হচ্ছে হঠাৎ গৃহসমস্যা সমাধানের এক সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে! সেটা হচ্ছে কর্তৃপক্ষ কলেজের হোস্টেল সুপারিণ্টেন্ডেণ্টের কাজটা ভারতীর উপর ন্যস্ত করাতে চাইছেন, যার ফলে সে বেশ উচ্চমানের একটি কোয়ার্টাস পাবে।

কলেজটা পুরোনো কিন্তু হোস্টেলের বিল্ডিং আনকোরা নতুন আধুনিক ছাঁদের এবং আধুনিক সুখ-সুবিধার উপকরণমণ্ডিত।

মোটের মাথায় অতীব লোভনীয় সন্দেহ নেই।

প্রস্তাবটা শুনে পর্যন্ত দিশেহারা হবারই মতো।

অবশ্য 'ভেবে কাল উত্তর দেব' বলেছে তখন, কিন্তু মনে জানছে ভাবাভাবির কিছু নেই, ও কাজ সে ভালো পারবে এ আস্থা আছে নিজের উপর। এ ধরনের কাজে প্রধান হচ্ছে তো ভালো ব্যবহার? অবশ্যই ফেল হবে না সে। তারপর ব্যবস্থাপনা!

আটকাবে না, ঠিক চালিয়ে নেবে।

বাড়ি ফেরার সময় 'উত্তর দেবার' আগেই ভারতী মনে মনে তার কর্মপদ্ধতির ছাঁচ গড়তে থাকে।

ফিরে দেখল ঘণ্টু খেলতে বেরিয়ে গেছে, ঝি উনুন ধরিয়ে দুধ জ্বাল দিচ্ছে।

ঘুঁটে-কয়লার উনুন।

দেখামাত্রই মনে পড়ল ভারতীর ওখানে গ্যাসস্টোভ। কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কী সহজ সুন্দর। পুরোনো সংসারের ধারা আর অবশিষ্টাংশ নিয়েই সংসার করে এল এতদিন ভারতী, নিজস্ব আধুনিক রুচি পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পেল না কখনও।

এবার ভাগ্য মুখ তুলে চেয়েছে।

ঝিকে বলল, 'সারদা, ঘণ্টুকে দুধ না খাইয়ে ছেড়েছ কেন?'

সারদা অধ্যাপিকার মানমর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব মাত্র না নিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'বেশ বলেছ বৌদিদি, 'ছাড়লে কেন'। তেমনি সুবোধ ছেলে যে তোমার ছাড়লে বেরোবে, না ছাড়লে ঘরে বসে থাকবে!'

'তা হোক, দুধটা খাওয়া পর্যন্ত ধরে রাখার চেষ্টা করা উচিত ছিল তোমার। ওর ছুটি থাকলেই মুশকিল আমার। সারাদিন খুব দুষ্টুমি করেছে তো?'

দুষ্টুমি।' সারদা আরও ঝঙ্কার দেয়, 'ডাকাতি' বলো।, বাড়িওয়ালা গিন্নি তো ওপরে উঠে এসে যাচ্ছেতাই করে গেছে।'

এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়।

ভারতী শুনে লজ্জিত হয়, মনঃক্ষুণ্ণ হয়, ছেলেকে বকে। আজ মনে হল, আশ্চর্য।

ছোট বাচ্চা দৌরাত্ম্যি করবে না? তাই বলে তিনি ঠেলে উঠে এসে যাচ্ছেতাই করে যাবেন? এত সাহস কেন? না, আমরা নিজের মানসম্ভ্রম রক্ষা করতে পারছি না, তেজ দেখিয়ে নাকের উপর দিয়ে চলে যেতে পারছি না, এই তো?

ঠিক আছে, দ্বিধার প্রশ্ন নেই, কালই উত্তর দিয়ে দেব।

ছটফট করতে থাকে শিশিরের ফেরার অপেক্ষায়।

আর একবার রিহার্সাল দিয়ে নেয় মনে মনে, কী ভাবে পরিবেশন করবে খবরটা। একটু হেসে একটু বিব্রত ভাব দেখিয়ে—

হ্যাঁ, একটু হেসে, একটু বিপন্ন ভাব দেখিয়ে বলে ওঠে, 'কলেজে তো আজ একটা ব্যাপার—'

শিশির হেসে বলে, 'তোমাদের কলেজে তো রোজই ব্যাপার। হল কী?'

'না মানে অন্য কিছু না, আমার কাছেই একটা প্রস্তাব এসেছে।'

'আরে বাবা, তুমি যে সেই গল্পের 'আস্তে আস্তে ভাঙো'র মতো করছ। প্রস্তাবটা কী? বিলেত পাঠাতে চাইছে তোমায়?'

'তোমার তো সব সময় আমাকে নিয়ে ঠাট্টা। শোনো মশাই, বলি, তাহলে। আমাকে উক্ত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী আবাসের পরিচালিকা করতে চাইছে।'

শিশির অবাক গলায় বলে, 'তাই না কি? হঠাৎ তোমাকেই এমন যোগ্য ব্যক্তি মনে হল যে?'

'যোগ্যতা দেখেছে নিশ্চয়—' ভারতী নিতান্ত তরুণীর ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে হেসে হেসে বলে, 'ভিতরে আছে গুণ। তুমিই শুধু দেখতে পাও না।'

'তাই দেখছি। তা তুমি ফট্ করে 'হ্যাঁ' করে আস নি তো?'

করে অবশ্য আসে নি ভারতী, কিন্তু শিশিরের কথার সুরে হঠাৎ একটু বিরক্তি এল তার। যেমন উৎফুল্ল হবার কথা, হল না তো। অবশ্য আসল আকর্ষণটা শোনে নি এখনও। মানে, জানা কথা হলেও মনে আসে নি নিশ্চয়। তবু বিরক্তিটা দমন করতে পারল না। বলল, কেন, হ্যাঁ করে আসায় দোষের কি আছে?'

শিশির বুঝল ভারতী চটেছে।

কিন্তু কেন কে জানে শিশির আজ আর তাতে ভয় খেল না, নিজেকে সামলে নিল না, বরং যেন মজা পেল। তবে কথা বলল গম্ভীরভাবে, 'না দোষের আর কি।

তবে—কাজটা খুব সহজ নয়।'

'তা শক্ত কাজেই তো আনন্দ।'

'সে আলাদা। সে তোমার হয়তো শক্ত অঙ্ক কষায়। এটা ঠিক তা নয়। রীতিমতো গোলমেলে কাজ।'

ভারতী হেসে ওঠে, 'নিজে গোলমেলে হলেই গোলমেলে। নিজে অনেস্ট থাকলে, 'মাল' নিয়ে 'গোল' না করলে, অসুবিধেটা কি?'

'তা ভেবো না। মনে রেখো মেয়েগুলি এ যুগের 'স্টুডেন্ট'। যাদের ইষ্টদেবতা হচ্ছেন অসন্তোষ, আর দীক্ষামন্ত্র হচ্ছে প্রতিবাদ।'

ভারতী দৃঢ় গলায় বলে, 'এটাও এ যুগের একটা ফ্যাসান। এই স্টুডেন্টদের নিন্দে করা। তারা যা দেখছে তাই শিখছে। আমরা নিজেরাই বা কি এমন বীর্য স্থৈর্য সন্তোষ সভ্যতার আদর্শ ধরছি এদের সামনে? নিজেরা 'শিক্ষিত দীক্ষিত অবিকৃত চিত্ত' হয়ে দেখাতে পারলে বোঝা যেত আসল গলদ কোথায়। তা যাক গে, আমাদের মেয়েরা অমন নয়। আমায় মেয়েরা কি ভালোবাসে!'

'ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তনও ঘটে—' শিশির হেসে ওঠে 'মাসিমা'ও তোমায় কি ভালোবাসতেন। বৌমা বলতে অজ্ঞান হতেন।'

ভারতীও হাসে। বলে, 'হ্যাঁ', ওই একখানি দৃষ্টান্তের পরাকাষ্ঠা আছে বটে! তা হলেও অফারটা আমি ছাড়ব না বাবা। ওর বিরাট আকর্ষণটি ছাড়া চলবে না। অন্তত আমাদের মাসিমার হাতে ছাড়াতে পারা যাবে, শুধু এই আনন্দেই। কাজটা নেওয়া মানেই—একটি সুন্দর সুদৃশ্য সুরম্য বাসভবন—'

হ্যাঁ, এইভাবেই রিহার্সাল দিয়ে রেখেছিল ভারতী। এতক্ষণে বলবার সুবিধে পেল। ভাবলো, এইবার আলো জ্বলে উঠবে শ্রোতার মুখে।

কিন্তু কই?

সে আশা কোনও এক অদৃশ্য দেওয়ালে প্রতিহত হয়। শিশির বলে, যেন বিদ্রূপ মিশিয়ে বলে, 'বাসভবনটা নিচ্ছ তাহলে?'

'আরে। লোকটা বলে কি!' ভারতী হাসির ঝাপটা মেরে যেন সম্ভাবনার ডানা মেলে এক অসীম সুখের আকাশে সাঁতরে আসে।

'নেব না? বলে ওই জন্যেই শুনে পর্যন্ত আহ্লাদে ভাসছি—কতক্ষণে খবরটা দেব তোমায়! তা তুমি একেবারে ভেবেই আকুল। এত ভাবনার কি আছে? আমি যদি ফাঁকি দিয়ে কেল্লা জয় করতে চেষ্টা না করে সত্যিকার খেটেখুটে কাজ করি, অসন্তোষ আসবে কেন মেয়েদের? ও ভেবে ভয় পেও না। আহা তুমি যদি আমাদের ওই কোয়ার্টাসটা দেখতে। শ্রেফ একখানি ছবি! দেখ কি একখানা সাজিয়ে ফেলব। আর বাড়ি ছেড়ে দিলে তোমার মাসিমাও হয়তো—' হেসে ওঠে ভারতী। বলে বসবেন, 'বৌমা তোমরা চলে যাচ্ছ—টিকবো কি করে তাই ভাবছি।' বলে কেঁদেই ফেলবেন। জগতে কিছুই অসম্ভব নয়।

তা ভারতীর কথাটা হয়তো সত্যি।

জগতে কিছুই অসম্ভব নয়।

তাই ভারতীর সুরে সুর মিলিয়ে হেসে না উঠে শিশির দুম করে বলে বসে, 'বাড়িটা একেবারে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন আসছে কী করে? কোয়ার্টার্স তো পাচ্ছ তুমি।'

'কী মুশকিল, আমি পাচ্ছি মানে? শুধু আমাকে থাকতে দেবে? আমার স্বামী পুত্রকে দেবে না?'

'পুত্রের কথা বলতে পারি না—' শিশির বলে, 'প্রশ্নটা স্বামীকে নিয়ে। থাকতে দিলেই যে থাকা যাবে এমন নাও হতে পারে।'

ভারতী বলে, 'কায়দা রেখে একটু প্রাঞ্জল করে বলবে?'

'প্রাঞ্জল তো সবটাই। তোমার ওই প্রমীলার রাজ্যে ঢুকে বাস করবার বাসনা আমার নেই।'

'এই কথা!

ভারতী অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, 'প্রমীলার রাজ্যের সঙ্গে কোনও সংস্রব নেই মশাই, একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ, ব্যাপার। এনট্রেনসটা পর্যন্ত কম্পাউন্ডের গেটের মধ্যে নয়, বাইরে। তা ছাড়া ভুলে যাও নি বোধহয় হোস্টেলটাই মেয়েদের, কলেজটা সহশিক্ষা'র।' ছেলেদের হোস্টেল সুপারিটেন্ডেন্টের কোয়ার্টাসে তাঁর স্ত্রী নির্ভয়ে বাস করেন।'

শিশির হেসে ওঠে, 'সেটা বলবার মতো কথা নয়। মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে বনে, অরণ্যে, পাতালে, পর্বতশিখরে সর্বত্র থাকতে পারে—

ভারতী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

ভারতী যে নিশ্চিত উৎফুল্ল আর সরল মনটুকু নিয়ে ভাবী সংসারের সুখের ছবি আঁকছিল, সে ছবির উপর যেন এটা হিংস্র বাদুড়ের ডানার ছায়া পড়ে। ভারতী আস্তে বলে, 'থাকতে

পারে নয়, থাকতে বাধ্য হয়। এটাই হচ্ছে কথা!'

আপত্তির কারণ বুঝতে আর বাকি নেই তার।

স্ত্রীর 'ভাগ্যলব্ধ' সেই বাসায় যাবার ইচ্ছে হচ্ছে না বাবুর।

সেই চিরন্তন পুরুষ জাতির অর্থহীন অহমিকা। কিছুতেই নিজেদেরকে স্ত্রীর থেকে উচ্চস্তরের না ভেবে ছাড়বে না। উচ্চস্তরের, উচ্চদরের, উচ্চমর্যাদার!

আরে বাপু, যেখানে দশ বছরের মেয়েগুলোকে এনে নিজেদের সংসার গারদে প্রায় ক্রীতদাসীর মতোই জন্মের শোধ পুরে ফেলতিস, সেকালের চিন্তা-চেতনা অভ্যাসটা ভুলতে পারছিস না কেন তোরা?

'স্বামী, প্রভু, বর' ইত্যাদি করে 'শ্রেষ্ঠাত্মক' শব্দগুলো নিজেদের নামের সঙ্গে জুড়ে রেখে করলি তো এতদিন অনেক রাজ্যপাট, এবার সেই কৃত্রিম মোহভঙ্গ হোক না।

জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দেখ না একবার 'বর বড় না কনে বড়।'

অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কি স্ত্রী পুরুষ দু'জনে একই সমতল ক্ষেত্রে নেমে আসে নি?

তবে?

মনে মনে ভাবল এসব ভারতী, চট করে মুখে কিছু বলল না। চলে এল অন্য প্রসঙ্গে বলল, 'কি মুস্কিল তুমি ফেরামাত্র গল্প জুড়ে দিয়েছি, এখনও যে হাত মুখ ধুতে যাও নি খেয়ালই হয় নি। যাও যাও চটপট। আলোচনা, বিবেচনা, ভাবনা সব কিছু পরে হবে।

তখন বাঁধ দিল।

কিন্তু আবার তো আসবে ঢেউ।

আবার উঠল সেই প্রসঙ্গ। ঢেউয়ের ধাক্কাতেই উঠল।

ঘণ্টা তিনেক পরে, ঘণ্টু সবে খেয়ে শুয়েছে, এরা খাবে বলে তোড়জোড় করছে, ঢেউ হয়ে এসে ধাক্কা দিলেন নীচতলার মাসিমা। যাঁকে আজকাল ভারতী 'বাড়িওয়ালী মাসি' বলতে শুরু করেছে আড়ালে আবডালে।

মাসিমার নাম চারুলতা।

তবে তাঁর নাম নিয়ে কেউ কোনওদিন চিন্তা করে নি। ইদানীং শিশির বলে, 'এক হিসেবে সার্থকনাম্নী। 'নষ্টনীড়ের নায়িকা। এমন সুখের নীড়টি আমাদের, কি নষ্টই করছেন।'

তা এখন এই সম্ভাবনাময় মুহূর্তটি নষ্ট করলেন বটে।

ভারতী ভাবছিল খেতে বসে, আবদেরে গলায় বুঝিয়ে আবদার করে, ওকে ওর ওই 'নকল প্রেসটিজের মিনার' থেকে নামিয়ে আনতে হবে। তা নইলে বলা যায় না, হয় তো হঠাৎ দুম ক'রে বলে বসবে, 'না। তোমার ও কাজ নেওয়া হবে না।'

ভাবছে সাত-পাঁচ বোঝাই যাচ্ছে।

ভারতীও শতরকম করে বুঝিয়ে ওর মনের দ্বিধা ঘুচিয়ে দেবে।

কিন্তু তার আগেই কুড়ি ভেঙে ফুল বার করলেন মাসিমা।

একদা এ বাড়িতে ওঁর অবারিত যাতায়াত ছিল, কাজেই আড়ষ্ট হলেন না। সিঁড়িতে ঠেই বলে বসলেন, 'বাবা শিশির, ডেকে-হেঁকেই বলতে হচ্ছে মনে কিছু কোরো না, বাড়িটা এবার ছেড়ে দিতে হবে। নানান রকমে জেরবার হয়ে যাচ্ছি তোমাদের রেখে। তার ওপর আমার নাতি সাহেবটি। কোন্‌দিন গরিবের জীর্ণ বাড়িটুকুর ছাত নামিয়ে দেয়, এই আতঙ্কে প্রহর গুণি। আমার এই বলাটাই নোটিস মনে করে বাড়ি খোঁজো—'

বরাবর 'মাসিমা' বলেছে, মান্য দিয়েছে, একেবারে মুখের উপর অসম্মান করতে পারা যায় না, তাই শিশির নম্রভাবেই বলতে যাচ্ছিল, 'খুঁজছি তো অনেকদিন থেকেই—'

কিন্তু ওর বলার ওপর ভারতী বলে উঠল, 'এযুগে তো নিয়মিত ভাড়া দিয়ে গেলে 'নোটিস' বলে কিছু চলে না মাসিমা।'

মাসিমা ঈষৎ চমকে ওঠেন।

কারণ, এটা আশা করেন নি।

এযাবৎ যা কিছু তির ছুড়ে আসছিলেন তিনিই। মনে হয় পাথরের দেয়ালে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে। বিঁধতে পেরেছেন এমন প্রমাণ পান না।

তিনি যা নিয়ে 'অসুবিধে' বলে চেঁচান, এরা সে বিষয়ে যতটা সম্ভব সতর্ক হয়, সাবধানী হয়। কোনওদিন জবাব শোনেন নি। আর আজ কি না ফট করে আইন দেখিয়ে বসল?

কালিপড়া মুখে বলেন, 'আমরা যে যুগের মানুষ বৌমা, এ যুগে কি চলে তা জানি না, মোটকথা বাড়ির তোমরা ব্যবস্থা কর এই হচ্ছে কথা। অনিলের বে'।

গট গট করে নেমে যান মুখ ফিরিয়ে।

ভারতী শিশিরের দিকে একটি স্থির দৃষ্টি মেলে বলে, 'শুনলে?'

'শুনলাম', শিশির বলে ওঠে, শুনছিই তো সব সময়। তবে তোমার উচিত হল না ওভাবে ওঁর মুখের ওপর আইন দেখিয়ে কথা বলা।'

ভারতী তার স্বামীর এই উল্টোপাল্টা কথায় অবাক হয়ে যায়। বলতে কি মাসিমাদের পরিবর্তনের পর থেকে এযাবৎ যে মাসিমা এবং তস্য পরিবারের সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে আসছে তারা, তার বারো আনা গৌরব ভারতীরই প্রাপ্য। শিশির অনেক সময়ই রেগে উঠে তেড়ে দু কথা বলতে যায়, ভারতীই নিবৃত্ত করে। বলে, 'দোহাই তোমার, আর যা কর কর। কোঁদল করতে যেও না। মনে রেখো, পরে আবার মুখ দেখাতে হবে। একবার 'মুখোমুখি ঝগড়া' হয়ে গেলেই সমস্ত আবরণ খসে পড়ে, নির্লজ্জতার চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে আর বাধে না তখন। ভদ্রতা বজায় রেখে সরে পড়ার চেষ্টা করাই ভালো।'

শিশির বলে, 'কিন্তু ক্রমশই বাড়াচ্ছেন, ওতেই। প্রতিবাদও দরকার।'

আশ্চর্য, আজ ভারতী যেই এক মুহূর্তের জন্যে নিজের নীতি থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সেই অমনি শিশির নিজের নীতি বদলে বসল।

ভারতী কয়েক সেকেন্ড নির্নিমেষে স্বামীর ওই উল্টোপাল্টা কথা বলা মুখের দিকে

তাকিয়ে বলে, 'উচিত হয় নি, কেমন?'

আমার তো তাই মনে হল।

'অথচ তুমিই বলো প্রতিবাদ দরকার।'

'বলি, তুমিই তাতে বাধা দাও।'

'আমি সহজে দিই না। আজ উনি দুপুরে এসে ঘন্টুকে যা ইচ্ছে বকে গেছেন, কান মলে দিয়েছেন, জানো সে কথা?'

'বকে গেছেন, কান মলে গেছেন?'

'তবে আর বলছি কি? ঘন্টুর কাছে শুনতে পার কাল। ছোট্ট ছেলেটাকে বলেছেন কি জানো? 'তোরা আমাদের এই ভাঙা বাড়িতেই বা পড়ে আছিস কেন? মা-বাপ দু'জনে রোজগার করছে, যা না অট্টালিকা বানিয়ে নিয়ে দাপাদাপি করগে না?'

শিশির ছায়াচ্ছন্ন মুখে বলে, 'হুঁ।'

'হুঁ মানে?'

'মানে ওই দু'জনের রোজগারটাই চক্ষুশূল হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।'

ভারতী আর একবার ওই ছায়াচ্ছন্ন রহস্যময় মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হানে।

কী বলতে চাইছে হঠাৎ ও?

দু'জনে রোজগার করাটা অনুচিত? পড়শির সেটা চক্ষুশূল হবেই। তাতে পড়শিকে দোষারোপ করা চলে না।

গম্ভীর মুখে বলে, 'তা ভুলটা যখন হয়েই গেছে, তখন আর চারা নেই। তোমার মাসিমার চক্ষুকে শূলবেদনা থেকে রক্ষা করা অবশ্যই সম্ভব নয়? এখন আশা করি 'প্রমীলারা রাজ্য' বলে একটা মিথ্যে ধুয়ো তুলে এই যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি লাভটা পিছিয়ে দেবে না? বরং তোমার মাসিমাকে অবহিত করিয়ে এসো সামনের মাস থেকে বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি।'

শিশিরও গম্ভীর হয়।

বলে, 'আমি তো পাগল হই নি।'

ভারতী হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

বলে, 'তার মানে? তুমি তা হলে সত্যিই আমার পাওয়া কোয়ার্টার্সে যাবে না?'

শিশির কথা চিবোয়, 'একেবারে যাব না এমন কথা কি প্রতিজ্ঞা করে বলা যায়?

ধরো, ইনভ্যালিড্ হয়ে গিয়ে তোমার সংসারে পড়লাম।'

'ওঃ তুমি আজ আমায় রাগাবেই প্রতিজ্ঞা করেছে। আমি কিন্তু আর রাগবো না। তোমাকে পাগলামিও করতে দেব না। কাজটা আমি নেবই, আর যেতেই হবে সকলকে। বুঝলে? কেন? তোমার বাড়িতে যদি আমি থাকতে পারি, কোনও অপমান বোধ করি না, আমার বাড়িতেই বা তুমি থাকতে পারবে না কেন?

'সব কথার উত্তর দিতে নেই।'

'উত্তর নেই, তাই দিতে নেই। তুমি আমায় বোঝাও তোমার আপত্তিটা কোন্ খানে?

শিশির হঠাৎ একটু মুচকি হেসে, নিজের বুকের মাঝখানে হাত দিয়ে বলে, এইখানে।'

'সে বুঝেছি। কিন্তু তোমার ওই পচা কুসংস্কার ছাড়তে হবে। আমার দাবি মানতে হবে।' ভারতীও অতএব হাল্কা হয়, ভালো ছেলের মতো মাসিমার নাকের সামনে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। সত্যি বলছি তোমায়, কাজটার জন্যে যত না হোক, ওই মহিলাটির কথা ভেবেই এত আহ্লাদ হয়েছে আমার।'

শিশির গম্ভীরভাবে বলে, 'ও কোনো কাজের কথা নয়। বাড়ি তো খোঁজা হচ্ছেই—'

'সে তো বহুকালই হচ্ছে।' ভারতী রেগে ওঠে, 'হয় তো অনন্তকাল হবে, তাতে কোনো লাভ হবে কি?'

কথায় কথায় কেবল তর্কই বাড়ে, আর বাড়ে জেদ। উভয় পক্ষেরই। শিশিরের এই অনমনীয় মনোভাব ভারতীকেও করে তোলে কঠিন।

শেষ পর্যন্ত রেগে গিয়ে বলে ওঠে ভারতী, 'ঠিক আছে তুমি থেকো তোমার পূজনীয়া মাসিমার বাড়িতে, পার তো তাঁর অনিলের বিয়েতে ভোজ খেও আর কোমর বেঁধে খেটো। আমি আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছি।' আর বলেই অবশ্য চমকে যায়।

বোঝে একটু বেশি রূঢ় হয়ে গেছে, কিন্তু কী করবে মানুষের শরীর তো। একই রক্ত মাংসে গড়া। শিশির যদি জীবনের আনন্দের দিকটা, শান্তির দিকটা, নিশ্চিতার দিকটা কিছুতেই দেখব না পণ করে, কেবল প্যাঁচালো কথা কয়, কতক্ষণ সহ্য করা যায়?

নিজের মনেও ক্রমশ প্যাঁচ উঠতে থাকে। মনে হয়, ওঃ তুমি পুরুষ বলে একেবারে রাজা হয়ে গেছ। তোমার অহঙ্কারই জয়ী হবে। কেন? আমি মানুষ নয়? আমার উন্নতি, আমার

ভবিষ্যৎ আমার আর্থিক সুবিধে দেখব না আমি? ক্ষমতা থাকতেও তোমার একটা তুচ্ছ অহমিকাকে তুষ্ট করতে ছেড়ে দেব সুযোগ? সেই আদি অন্তকালের 'বৌগিরিটা এখনও বজায় রেখেছি বলেই এত প্রশ্রয় তোমার কেমন? এই যে আমি সারাদিন খেটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কই একদিনও তো ভাবি না পাঁচ মিনিট বিশ্রাম করি। একবারও তো আশা করি না আমার মুখের সামনে কেউ জলের গ্লাসটা এনে ধরুক। আমি এসেই তোলা শাড়ি বদলে কোমর বেঁধে লেগে যাই কী করে তোমার ঘরে ফেরার সময় সব কিছু ফিটফাট করে তুলব।

আমি ফেরার পথে ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে তবে ফিরি, তাকে খাওয়াই সাজাই, খেলতে পাঠাই, তোমার ফেরার আগেই যাতে খেলে বাড়ি ফেরে তার জন্যে একশোবার নির্দেশ দিয়ে রাখি। কারণ, জানি তুমি অল্পে উৎকণ্ঠিত হও। জানি তুমি এসেই ওকে দেখতে না পেলে দুঃখিত হও।

ঘণ্টুর ব্যবস্থা করেই আমি হয় তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে যাই যাতে তুমি আসবার আগেই রান্নাটা সেরে ফেলতে পারি। আমার বাড়ি ফেরা আর তোমার বাড়ি ফেরার মধ্যে ঘণ্টা আড়াইয়ের ব্যবধান আছে বলেই, এই ব্যবস্থাটা সম্ভব করে তুলতে পারি আমি, ওই সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই তোমার প্রিয় জলখাবারটুকু বানিয়ে নিই চায়ের টেবিলে পরিবেশন করতে। আবার নিজেকেও তো তৈরি করে নিতে হয় সেই টেবিলে 'পরিবেশিত' হতে।

শুধু যে আমিই ভালোবাসি না সন্ধ্যাবেলা আলুথালু হয়ে বেড়ানো তা তো নয়, তুমিও তো পছন্দ কর না। সারাদিন খেটে এসে অত তাড়াহুড়ো করতে কি কষ্ট হয় না আমার?

খুবই কষ্ট হয়।

কিন্তু তুমি খুশি হবে ভেবে সব কষ্ট সয়ে যায় আমার। আজ পর্যন্ত আমার জীবনতরী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তোমার খুশির হাওয়ার গতি নির্ণয় করতে করতে।

অথচ তুমি?

তুমি জীবনে একবার মাত্র ভাবলে না, 'আহা ও খুশি হবে।'

তুমি আপন অহংকারে অটল।

আমি সভ্য, আমি ভদ্র, আমি মমতাশীল, তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি না—কাজটা নিলে বাড়তি যে টাকাটা আসবে, তার অঙ্ক তোমার মতো 'শুধু কেরানির' পক্ষে উড়িয়ে দেবার নয়। মনে করিয়ে দিচ্ছি না, তোমার যা সারা মাসের উপার্জন আমার তা বারোদিনের।

মনে করিয়ে দেব কী করে, নিজেই কি মনে করেছি কোনওদিন? আজ তুমি আমাকে বড় বেশি হতাশ করছ বলে, বড় বেশি দুঃখ দিচ্ছ বলে, মনে এসে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, মনের দুঃখেই ওই সব ছাইপাঁশ চিন্তা মনে এসে যাচ্ছে বেচারা ভারতীর।......

কিন্তু পরদিন যখন কলেজে আবার কথাটা ওঠে, ভারতী বলে, 'ভেবে দেখলাম আমার যোগ্যতা নেই।'

অধ্যক্ষ বলেন, 'যোগ্যতার বিচারটা আমাদের হাতেই ছেড়ে দিন না। সইটা করে ফেলুন চটপট।'

অধ্যক্ষ বলেন, অন্যান্য অধ্যাপিকারা বলেন। বান্ধবী লীলা ঘোষ বলে, 'তুই হচ্ছিস একের নম্বরের হাঁদা। নির্ঘাৎ তুই তোর সেই প্রাচীনপন্থী কর্তাটির নিষেধে এমন সুযোগটা ছাড়ছিস। আমি তো ভাবতেই পারছি না। আমায় অফার করলে আমি একটা ডিগবাজি খেয়ে নিতাম।'

ভারতী হেসে বলে, 'সে তো আমিও খাচ্ছি।'

'ছাড় ওসব কাব্যকথা। কর্তার ইচ্ছায় কর্মের যুগ চলে গেছে বাবা, দেখ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে?'

হঠাৎ মনের মোড় ঘুরে যায়।

হঠাৎ বলে বসে ভারতী—'ঠিক আছে।'

'ঠিক আছে।'

কিন্তু সে ঠিকটা কোথায়?

জীবনটা যে বেঠিক হয়ে বসল ভারতীর! শিশিরও তার সেই রাগ করে বলা কথার ধুয়ো ধরেই বলল ঠিক আছে। তোমার ব্যবস্থাই বলবৎ হোক। আমি থেকে যাচ্ছি এখানে, তুমি ঘণ্টুকে নিয়ে—'

ভারতী ভয় পেল।

ভারতী ভারি একটা অসহায়তা বোধ করল। ভারতী নম্র হল, নিচু হল।

অনেক রাত্রে যখন ঘণ্টু ঘুমিয়ে পড়েছে, এঘরে চলে এল। স্বামীর বুকের কাছ ঘেঁষে শুয়ে বলল, 'দেখ বিশ্বাস কর আমি গিয়ে স্রেফ্ 'না' করেই দিয়েছিলাম। কিন্তু এত অনুরোধ উপরোধ হতে লাগল শেষ পর্যন্ত—আর আসলে তো কোনও যুক্তি দেখাতে পারছি না।'

'স্বামী এখানে আসতে ইচ্ছুক নয়', এ রকম একটা যুক্তি দেখানও সম্ভব ছিল না বোধহয়?

বুকের কাছে ঘেঁষে আসা মানুষটার বুকের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করে না শিশির, বরং যেন নিজেকে সরিয়ে নেয় একটু।

ভারতী তবু মান খোয়ায়।

বলে, 'মানুষ তো একটা বোকামিও করে, একটা ভুলও করে, মনে কর না তাই করে ফেলেছি, তুমি সেটা সামলাও।'

শিশির রূঢ় গলায় হেসে ওঠে।

বলে, 'সামলাবো'? আমি? বলো কি?

'দেড়শো খুকী' সামলাবার ভার নিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে এলে, এখন এ কি বাণী?

হবে না, কিছুতেই নরম হবে না।

কিছুতেই জীবনকে সহজ হতে দেবে না।

সেই ছবির মতো সুন্দর বাসাটিতে সুন্দর করে ঘরকন্না সাজিয়ে সংসার করতে দেবে না ভারতীকে।

নিষ্ঠুর লোকটা কী জানে, মেয়েরা বিদ্যায়, কর্মে, পদমর্যাদায় বা 'পদে'র জটিলতায় যেখানেই পৌঁছক, তার একেবারে অন্তরের অন্তরলোকের একান্ত বাসনাটি থাকে মনের মতো একটি 'ঘর।' সেখানে সুন্দর করে সংসার করা।

বুঝতে পারছে না ও, জানতে পারছে না?

নয় তো বা পারছে ঠিকই। সব পুরুষই পারে, আর মেয়েদের ওই দুর্বলতার সুযোগটুকু নিয়ে ভাব দেখায় তার নিজের কোনও কিছুতেই প্রয়োজন নেই। 'ঘর' বস্তুটা তার কাছে স্বপ্নের নয়, সাধের নয়, সাধনার নয়, নিতান্তই 'আস্তানা' মাত্র।

ভাব দেখায়, দয়া করে যে ঘর বাঁধে সে, সংসার করে, সে কেবলমাত্র নারীজাতির প্রয়োজন মেটাতে। নিজে সে নির্লিপ্ত উদাসীন, 'ধরে আনা' অসহায় জীব। ধরে বেঁধেই রেখে দেওয়া হয়েছে তাকে সংসারের সঙ্গে জুড়ে।

তাই অনায়াসে নিতান্ত নির্মমতা অগ্রাহ্য করতে পারে মেয়েমনের ছোট সুখ, ছোট আশা, ছোট ছোট বাসনার চাহিদা।

শিশির ঘুমিয়ে পড়ে। ভারতীর মনে পড়তে থাকে, একবার ভারতীর বোনের বিয়েতে বারাসতে নেমন্তন্ন গিয়েছিল, ওর রাত হয়ে গিয়েছিল, বাকি রাতটুকু থেকে যাবার জন্যে

ভারতীর মা সহস্র অনুরোধ জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'কাল সকালে এখান থেকে খাওয়াদাওয়া করেই অফিসে চলে যেও বাবা, আজ এত রাত্তিরে—'

শিশির ভারতী মা'র সেই অনুরোধের মান রাখে নি। তার মানে ভারতীর মুখ রাখে নি, মান রাখে নি। তবু ভারতী সকালে শিশিরের খাওয়ার অসুবিধে হবে ভেবে, নিজেও সেই অত রাত্রে চলে এসেছিল শিশিরের সঙ্গে।.....

ভারতীর মনে পড়ে একদিন—

হ্যাঁ, এক এক করে এমন অনেক দিনের কথা মনে পড়তে থাকে ভারতীর, যার মধ্যে শিশিরের হৃদয়হীনতার স্বাক্ষর আছে।

হয়তো এসব কথা জীবনেও মনে পড়ত না ভারতীর, এসব যে আজও মনের কোন্ গভীর স্তরে ছিল তাও টের পেত না, কিন্তু আজ উঠে আসতে লাগল তারা, যেন আদালতের এক-একটি 'সাক্ষী'র মতো।

ভারতী ভুলে গেল সে একটা ডক্টরেট-পাওয়া মেয়ে, ভুলে গেল সে একটা বিশিষ্ট শিক্ষায়তনের অধ্যাপিকা, ভুলে গেল কর্মক্ষেত্রে তার মান সম্ভ্রম কতখানি। নিতান্ত তরুণী মেয়ের মতো নবপরিণীতা অভিমানিনী বধূর মতো কেঁদে বালিশ ভেজাতে লাগল।......

সাক্ষী রইল না কেউ, এই যা রক্ষা।

তা' ওই 'রক্ষা' নিয়েই এ সংসারের সমস্ত 'সম্মানের আসন'গুলি সুরক্ষিত। নিভৃত অশ্রুর দর্শক থাকে না, নিভৃত চিন্তার সাক্ষী থাকে না।

শিশিরেরই যে কোনো 'নিভৃত-লোক' নেই তাই বা কে বলতে পারে? হয়তো সেও পীড়িত হচ্ছে, আহত হচ্ছে, অভিমানে পাথর হচ্ছে, কারণ সে তার নিজের মতো করে ভাবছে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে, নিজের চিন্তাধারায় বিচার করছে। তাই সেও হয়তো ভারতীকে অহঙ্কারী, উদ্ধত আর নিষ্ঠুর ভাবছে।

দুজনেরই সাক্ষী-প্রমাণ নেই।

এতদিন ওরা দুজনে দুজনের মধ্যে এমন 'সম্পূর্ণ' ছিল যে ওদের কোনও বন্ধুও নেই, যার কাছে হৃদয়ভার লঘু করতে পারে। নির্বান্ধব দুটো মানুষ অতঃপর আপন দুর্মতির দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে, এবং প্রমাণ করতে থাকে, দুর্মতির অসাধ্য কাজ নেই।

আরও একটা তত্ত্ব নতুন করে প্রমাণ করে ছাড়ে ওরা, 'মানুষের কত পরিবর্তনই হয়।'

কারণ, পরবর্তী দৃশ্যটা সেই ছবির মতো বাসাটাকে গাছে-মাছে, কুশনে কভারে, পর্দায়-সোফায় সুন্দর করে সাজিয়ে ঘণ্টুকে নিয়ে একা আছে ভারতী, একটা বাচ্চা চাকর আছে সারাক্ষণের সে তার ছোট ছোট হাতে বাড়িটিকে রেখেছে ধূলিমালিন্য শূন্য করে, একটা ঝি আছে, সে দুবেলা এসে মোটা কাজগুলো করে দিয়ে যায়, উঁচু টেবিলে রাখা গ্যাসের উনুনে রান্না করে, বেসিনে ফেনা করে সাবান কাচে।

ভারতী মাঝে মাঝে ওই ঝিটার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকায়, কারণ হঠাৎ হঠাৎ চারুলতা মাসিমার বাড়ির সেই ইটের উনুন-পাতা কালিঝুল রান্নঘরটার কথা মনে পড়ে যায় ভারতীর, যেখানে বসে ভারতী অনেকগুলো বছর রান্না করেছে। মনে পড়ে যায়, সিমেন্টের চটা-ওঠা সেই কলঘরটাকে, যেখানে ভারতী অনেক সাবান কেচেছে, আর স্বপ্ন দেখেছে বেসিনওলা সুন্দর বাথরুমের।

অথচ এখন কিছুতেই একটা রুমাল কেচে নিতেও ইচ্ছে হয় না, কিছুতেই রান্না ঘরে ঢুকে দুটো আলু ভাজতেও ইচ্ছে হয় না।

কে জানে কেন।

সে কি ভারতী বড়লোক হয়ে গেছে বলে? না, সন্ধ্যা হলেই ওর সেই মনোরম গোল বারান্দাটিতে অধ্যাপিকাদের আড্ডা বসে বলে সময় পায় না?

এ আড্ডার প্রধান বক্তা বান্ধবী লীলা ঘোষ বলে, দেখাল বটে একখানা তোর পরম গুরু! বলে দিচ্ছি ভারতী, ওসব তেজ অহমিকা—কিচ্ছু নয়, স্রেফ্‌, হিংসে! স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ও জিনিসটা বেশ বেশি পরিমাণেই থাকে বুঝলি? নেহাত জয়েন্ট বিজনেসের স্বার্থে নিজেকে ঢেকে রাখে।'

ভারতী ফিকে হেসে বলে, 'এত কথা জানলি কী করে?'

'দেখে বৎসে, দেখে!'

'তাই বুঝি বিয়ে করিস নি?'

'দূর, তা বলে তা নয়—' লীলা ঘোষ হেসে ওঠে, 'এখনও পেলে করি। এই চেহারায় কে বিয়ে করবে বল? তাইতেই বুড়ি আইবুড়ি। তবে বুঝি সব।'

হাসির ফোয়ারা ওঠে, তার সঙ্গে চা চলে।

বাচ্চা ছেলেটা সাবধানে ট্রে করে বয়ে নিয়ে আসে ফাইন পেয়ালায় সোনালি চা।

ভারতীকে উঠতেই হয় না।

কাচের জানলার সামনে টবের উপরকার ক্যাক্‌টাসগুলো কেউ মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ বাঁকা-চোরা বাহুগুলো এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে কাচের গায়ে একটা বিকৃত মানুষের মতো ছায়া সৃষ্টি করে।......

বাতাসে পর্দা কাঁপে।

ওদের হাসির সময় ভারতী সেইদিকে তাকিয়ে থাকে, হয়তো ভাবে, কি এমন মন্দ আছি।'

একসময় ঝিটা এসে জিজ্ঞেস করে, 'দিদিমণি খোকা কি এখন খাবে?'

ভারতী বিরক্ত হয়ে বলে, 'কেন? এখুনি খেয়ে নিলেই তোমার পালাবার সুবিধে হয়, কেমন? নটার আগে খাবে না, পড়বে ন'টা পর্যন্ত।

ঝি ভারগলায় বলে, আমার জন্যে বলি নি, পড়তে পড়তে ঘুমে ঢুলছে তাই—'

চলে যায় রাগ দেখিয়ে।

ভারতীর বান্ধবীরা বলে, 'ও বেচারা একটু লোন্‌লি ফিল্‌ করে।'

ভারতী কাচের গায়ের সেই বাঁকাচোরা ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মতো বলে, 'হ্যাঁ, তাই ভাবি মাঝে মাঝে কোনও একটা বোর্ডিঙে ভর্তি করে দিলে হয়। তবু অন্য ছেলেদের সঙ্গে—'

আর শিশির?

তা সত্যি বলতে দৃশ্যত শিশিরও কিছু খারাপ নেই। দোতলাটা ছেড়ে দিয়ে সে চারুলতা মাসিমার নীচতলার বৈঠকখানা ঘরটায় আশ্রয় নিয়েছে, একেবারে পেয়িং গেস্ট হিসেবে। যত্নের ত্রুটিমাত্র হচ্ছে না, মাসিমা বিগলিত স্নেহে সর্বদা 'আহা' করছেন, শিশিরের জামার বোতামটি লাগান কিনা দেখতে বলছেন মেয়েদের।

আর সেটা যে শুধু 'দেখিয়েই করছেন সে কথা বললেও মাসিমার প্রতি অবিচার করা হবে। মমতার বশেই করছেন।

চিরদিনের স্নেহ-মমতার সম্পর্ক ছিল ভিতরে অন্তঃসলিলা হয়ে, তার উপরে একটা তীব্র স্বার্থের দুরন্ত ইচ্ছার ব্যাঘাত তাঁকে উগ্র তিক্ত নির্লজ্জ করে তুলেছিল। সে ব্যাঘাত দূর হয়েছে, দোতলাটায় একটু রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়ে আশাতিরিক্ত ভাড়ায় একটা ভাড়াটে বসিয়েছেন,

তার উপর বৈঠকখানা ঘরের অর্ধাংশ আর দু বেলা দু-থালা সাদামাটা খাওয়ার পরিবর্তে একমুঠো টাকা হাতে পাচ্ছেন আর একবার তবে নির্লজ্জ হতে বাধা কি?

অতএব আর একবার নির্লজ্জ হন চারুলতা মাসিমা। শিশিরের জন্যে মমতায় বিগলিত হন। বৌ পালিয়ে যাওয়া ছেলেটার নির্লিপ্ত মনের কাছে এ নির্লজ্জতার হাস্যকর কটুতা ধরা পড়বে না, এ বোধ মাসিমার আছে।

কিন্তু শিশির কি এতই বোধহীন হয়ে গেছে যে, আধখানা ঘরেই রাজি হয়েছে? তা হয়েছে। হয়তো চক্ষুলজ্জাতেই হয়েছে। কারণ, অবিবাহিত বড় হয়ে-যাওয়া ছেলের ঠাঁই ছিল ঐ ঘরটাতেই, তাকে স্থানচ্যুত করতে চক্ষুলজ্জায় বেধেছে শিশিরের। বলেছে, 'থাক্ না, অনিল যেমন শুচ্ছিল, শুক না। বড় ঘর—'

বরাবরই তো ছিল অনিল ছোট ভাইয়ের মতো। আগে কত আব্দার করত অনিল শিশিরের কাছে, কত উপদ্রব করত শিশিরের মায়ের উপর।

শিশিরের আর বেশি জায়গার দরকারই বা কি? এই তো কেটে যাচ্ছে দিন, কেটে যাচ্ছে রাত্রি। একথালা ভাত, একটা পাতা বিছানা, আর চান করে ছেড়ে রেখে যাওয়া ধুতি, গেঞ্জি, তোয়ালেগুলো কাচা শুকনো হয়ে হাতের কাছে মজুত থাকা।.....এ তো হচ্ছেই।

এর বেশি চাইবার কি আছে?

সংসারের দায়হীন বাধ্যবাধকতাহীন এই জীবনেরও একটা বিশেষ সুর আছে বই কী। মাসের প্রারম্ভে টাকাটা ধরে দেওয়ার পর, দ্বিতীয়বার আর চিন্তা করতে হয় না খেতে হলে খাটতে হয়। সংসার করতে হলে, শুধু টাকার ধান্ধাতেই নয়, তেল নুন লকড়ির ধান্ধাতেও বিশ্বভুবন চষে বেড়াতে হয়।

সত্যি এখন তো আর শুনতে হয় না, পাঁউরুটি নাকি আর কুপন ছাড়া পাওয়া যাবে না শুনছি, কী মুশকিল বলো তো।'.... শুনতে হয় না, 'আমার কোনও কাজ তুমি কর না কেন বলো তো? যাও একবার দেখে এস দিকি তেল সত্যিই একেবারে বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে কি না।'....... শুনতে হয় না, 'বেড়িয়ে ফেরার সময় একবার দোকান ঘুরে আসবে, চাটা একেবারে ফুরিয়ে গেছে।...... এই দেখ আজ তো সময় রয়েছে ঘন্টুটাকে নিয়ে একবার 'সাউথ টেলারিঙে' যেতে পারবে, ক'টা শার্ট প্যান্টের দরকার ছিল ওর।'

না, কোনও কিছু শুনতে হয় না।

কোনও প্রয়োজনের কথা কেউ তোলে না শিশিরের কাছে।

শিশির এখন এক অখণ্ড নিশ্চিন্ততার 'শব্দহীন' জগতে আশ্রয় পেয়েছে। এই 'শব্দহীন' জগতে বাইরের টুকটাক শব্দ মন্দ লাগে না। সে শব্দের মধ্যে কোনও দায় নেই। নেই কোনও অভিযোগের উদ্যত আক্রমণ।

এ শব্দ শুধু কানের কাছে ভেসে যাওয়া কথামাত্র।

অনিল সেই অনেকদিন আগের মতো মহোৎসাহে ওদের ফুটবল টীমের গল্প করে,

ভালোই লাগে।

মাসিমার মেয়েরা যখন-তখন বলে, 'উঃ, শিশিরদা, কি অন্যমনস্ক আপনি, আপনার ঘরের জলের কুঁজোয় কাল থেকে জল নেই, বলেনও নি তো?'

শুনতে খারাপ লাগে না।

আর মাসিমা যখন ভাতের সামনে পাখা নাড়তে নাড়তে বলেন, 'কি খাওয়ারই ছিরি হয়েছে বাবা তোমার, দেখলে প্রাণ 'হায় হায়' করে। 'দিদি'র আমলে দেখেছি তো—একগোছা করে ঘী-জবজবে রুটি করে রাখতেন, ছেলে কলেজ থেকে এসে খাবে বলে। কি দিনই গেছে সে সব—'

তখন তো আবেগে আনন্দে প্রায় চোখে জলই এসে যায় শিশিরের।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শিশিরের মায়ের কথাই তোলেন চারুলতা মাসিমা বেশি সময়। দু'জনে কি প্রগাঢ় ভাব ছিল গাঢ়কণ্ঠে সেইটুকু স্মরণ করিয়ে দেন, আর মাঝে মাঝেই নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'কি জানি বাবা, কেমন মন বৌমার। এইভাবে সংসার ছন্নছাড়া করে চাকরির উন্নতি করতে গেল। আমরা এসব কথা ভাবতেও পারি না।'

হয়তো এটাও শুধু ভারতীকে নিন্দে করেই বলেন না, এটা ওঁর সত্যিকার মনের কথাই।

অসহায় একক পুরুষের উপর মমতা মেয়েমনের চিরন্তন প্রকৃতি, তা' সে যে বয়সেরই হোক।

ছন্নছাড়া সংসার ছাড়া ছেলেটাকে আরও মায়া করতে ইচ্ছে হয়, বৌটাকে আরও নিন্দে করতে ইচ্ছে হয়।

ভারতীর দুর্মতিতে চারুলতা মাসিমার অনেক দিকে সুরাহা হলেও তার উপর রাগ না দেখিয়ে পারেন না।

কিন্তু ওদের কি তাহলে একেবারেই দেখা হয় না? স্বামী-স্ত্রীর? বাপ-ছেলের?

না,না, তাই কি সম্ভব?

আইন-আদালত করে ফারখৎ করে নি, কিছু না, যে যার সুবিধে হিসেবে আছে, এই তো।

দেখা হয়।

রবিবারে রবিবারে দেখা হয়।

শিশির যায় না ভারতীই আসে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। মাসিমার বাড়ির মধ্যেই এসে বসতে হয়। চাও খেতে হয় কখনও কখন। ঘণ্টুও খাবার খায় রেকাবি করে। কোনও-কোনওদিন যদি দেখে বাবা স্নান করতে গেছে, কি বেরিয়েছে, মাকে চুপি চুপি বলে, 'মা, একটু ছাদে যাব।'

ছাতটাই আড্ডা ছিল। ভাঙা লাটাইটা এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে তার ছাতের ট্যাঙ্কটার নীচে।

ভারতী ছেলের ঐ হ্যাংলামিতে বিরক্ত হয়, চোখ টেপে, কিন্তু শেষ রক্ষে হয় না। মাসিমা স্নেহ ভরা গলায় বলেন, 'আহা, যাক, যাক, আজন্মের খেলার জায়গা।

নতুন ভাড়াটেরা লোক খুব ভালো, কিছু বলবে না। যা, সিঁড়ি দিয়ে উঠে।'

শিশির স্নান সেরে সাজসজ্জা করে নিলে তিনজনে একত্রে বেরোয়। রবিবার আর কেউই বাড়িতে খায় না, হোটেলে খাওয়া হয়।

এটা যেন একটা অলিখিত আইনে স্থির হয়ে গেছে ও খরচাটা শিশিরই করবে, ভারতী কোনওদিন তার বটুয়ায় হাত দেয় না।

বাইরে খাওয়া হয়, এখানে ওখানে বেড়ানো হয়, হয়তো সিনেমা দেখা হয়, সার্কাস এলে সার্কাস।

মোটের উপর ঘণ্টুর মনোরঞ্জনের প্রচেষ্টাটাই লক্ষ্যে পড়ে। যেন ঘণ্টুকে একটু আমোদ-প্রমোদ দিতেই এই অভিযান ওদের। ফেরার সময় প্রায়ই জিনিসপত্র কেনা হয় ঘণ্টুর নাম করে। খেলনা, খাবার, লালমাছ, কাঁটাগাছ।

তাই বলে কি দু'জনে কথা বলে না ওরা? পরস্পরে? হাসে না?

সবই করে।

সাময়িক ঘটনা-নির্ভর সেই সব হাসি কথা গল্প বাতাসের গায়ে তরঙ্গ তুলতে পারে না বাতাসের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

সন্ধ্যার পর যে যার নিজ আশ্রয়ে ফেরে।

ছাড়াছাড়ির সময় দু'জনে আস্তে বলে, 'আচ্ছা।'

শিশির ঘণ্টুর মাথায় একটু ছোট চাপড় মেরে বলে, 'ঘণ্টুবাবু যা লায়েক হচ্ছে, এবার ওই আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরোবে, কি বলো ঘণ্টুবাবু?'

ঘণ্টু মুখ ফিরিয়ে থাকে। মুখ নিচু করে থাকে।

ঘণ্টু চোখটা কিছুতেই মা-বাপকে দেখতে দেয় না।

ঘণ্টু যে বড় হয়ে উঠছে, তা বোঝা যায়।

মাঝে মাঝে কখনও বড় হওয়া ঘণ্টু একটু এদিক-ওদিক সরে গেলে ভারতীও তার চোখটা দেখতে না দিয়ে বলে, 'আমার বাড়িদে তা হলে যাবে না কোনওদিন?'

'যাব না, একথা কবে বললাম?'

'বলো নি। তা সত্যি।'

'গেলেই হল একদিন।'

ভারতী চুপ করে যায়।

ভারতী মনে মনে ভাবে, 'আশ্চর্য, আমার একটা শক্ত রোগও তো হয় না কখনও। কি অটুট স্বাস্থ্যই দিয়েছেন ভগবান।'

কল্পনা করে—সেই অটুটতা হঠাৎ টুটে গেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ শিশিরকে খবর পাঠিয়েছে—

কিন্তু কল্পনা কল্পনাই থাকে।

আবার পরবর্তী রবিবারে স্বাস্থ্য-শক্তিতে টলটলে চেহারাটি নিয়ে এসে দেখা দেয় ভারতী চারুলতা মাসিমার বাড়ি। হয়তো ইচ্ছে করে একটু বেলা করেই আসে, যাতে শিশির একেবারে প্রস্তুত থাকে, কিন্তু সে আশা বড় মেটে না। শিশির ওদের না দেখলে যেন গা তোলে না।

অগত্যাই ভারতীকে মাসিমার রান্নাঘরের দরজায় এসে বসতে হয়।

আর ঘণ্টু ছাদে যাবার জন্যে উসখুস করে, তবে আগের মতো জেদ করে না, লাফা লাফি করে না। ভারি শান্ত হয়ে গেছে ছেলেটা। শান্ত আর গম্ভীর। ধরে নিতে হবে ঘণ্টুও ভালোই আছে। ভালো না থাকলে শান্ত হচ্ছে কী করে? সপ্তাহের পর সপ্তাহ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, একই উৎসাহ নিয়ে রবিবার শুরু আর একই হতাশা নিয়ে রবিবার শেষ হয়।

অথচ আশ্চর্য ;. এই জীবনটাকেও এখন আর অস্বাভাবিক লাগে না ওদের। পারি পার্শ্বিকের খাঁজে খাঁজে বসে গেছে সকলেই, বেশ খাপে খাপে খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিজেদের।

বিনিদ্র রাত্রির অপরিসীম ক্লান্তি নিয়েও ভারতী সহজেই সকালবেলা লালমাছগুলোকে খাবার দেয়, ক্যাকটাসের টবগুলোকে আলোর দিকে ঘুরিয়ে দেয়, আর ভাবে আরও গোটাকতক কিনতে হবে।

শিশিরও রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বিছানায় হাত-পা ছড়িয়েই ভাবতে শুরু করে, আসছে রবিবারে নতুন কী উপহার দেওয়া যায় ঘণ্টুকে।

মানুষ যে শক্তিমান এইখানেই তার প্রমাণ। নিজেকে আশ্চর্য রকম 'অ্যাডজাস্ট' করে নিতে পারে মানুষ। 'অ্যাড্জাস্ট করতে করতেই তার জীবন পরিক্রমা। তবু যে কেন নিজেকে নিয়ে ভাবনার শেষ নেই তার, এইটাই প্রশ্নের, এইটাই বিস্ময়ের।

গোড়েমালা

নসুকাকা ডাকাডাকি করছেন, সন্দেশের থালাটা হাতে নিয়ে ছুটে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়াল তুতুন। তারপর দুই চোখ বড় করে বলল—ওঃ লাভলি।

রাঙামাসী যেন অবোধ, দুই চোখে তাঁর বিশ্বের বিস্ময়—কী রে তুতুন? কী দেখে হঠাৎ এত—

—ওঃ রাঙামাসী! কী ফাইন দেখাচ্ছে তোমার খোঁপাটাকে।

—খোঁপা? ওঃ!...রাঙামাসী যেন এতক্ষণে তুতুনের চোখ বড়র দিশে পেলেন। হাত তুলে খোঁপার গায়ে একবার আলতো স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—আর বলিস নে। সেই অবধি লজ্জায় মরে যাচ্ছি।

—কেন লজ্জা কীসের গো?

—দূর দূর! খোঁপায় ফুল পরবার বয়েস আর আছে না কি?

তুতুন মুচকি হেসে বলে—তাতে কী? বেশ তো দেখাচ্ছে।

—ওই তো—রাঙামাসী হতাশায় ভেঙে পড়ছেন যেন,—ওই বেশ দেখানোর জ্বালাতেই তো চব্বিশ ঘণ্টা অস্থির। তোদের রাঙামেসোর তো কাণ্ডজ্ঞানের বালাই নেই। এই আছে মানুষ উদোমাদা সন্নিসী, এই কি খেয়াল চাপল নিউ মার্কেটে গিয়ে ফুল নিয়ে এলো গাদা গাদা, মালা আনল জোড়া জোড়া, নাও তাকে খোঁপায় পর গলায় পর। না পরলেই রসাতল।

—বল কী রাঙামাসী? এই ব্যাপার? যাই বল রাঙামেসোকে দেখলে কিন্তু—

—আর বলিস কেন। বর্ণচোরা আম। এই দেখ না এখানে এই হাজার লোকের মাঝখানে টুকুস করে এক ফাঁকে এসে মালাগাছটা চাপিয়ে দিয়ে গেল মাথায়। লজ্জায় মরছি সেই থেকে—

রাঙামাসীর এই বর্ণনার সঙ্গে রাঙামেসোকে মিলোতে গিয়ে খুক খুক করে বিষম খায় তুতুন। ...ওদিক সন্দেশ সন্দেশ রব উঠেছে। অতএব উত্তর মুলতুবি রেখে বিষম চাপতে চাপতেই ছুটে চলে যেতে হয় তুতুনকে।

নসুকাকা ওর হাত থেকে থালাটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে পরিবেশক ছোকরাদের হাতে চালান করে ধমকে ওঠেন—সন্দেশ আনতে যে বুড়ো হয়ে গেলি? সাধে বলি মেয়েদের দিয়ে কোনও কাজ হয় না?

—না হয় না—তুতুন বিষম খাওয়াটা শেষ করে নেয়...খক্ খক্ খক্—মেয়েদের যে কত জ্বালা জান না তো? পড়তে যদি আমার অবস্থায়—

হাসতে হাসতে চোখ মুখ রক্তবর্ণ করে কাঁদো-কাঁদো হয়ে ওঠে তুতুন।

—কীরে কী হল?

—উঃ! নসুকাকা, সে এক কাণ্ড!

—হেসেই তো মরছিস। কাণ্ডটা কী?

—কাণ্ড—মানে, ইয়ে—সে এক দৃশ্য! ...বলছি—বাবা—বলছি, এক গেলাস জল দাও আগে—

হাসির গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ইত্যবসরেই এসে জুটে যান বাঁশীপিসি আর আশুকাকা, সেজদি আর রত্নাবৌদি।

—ব্যাপার কী? এত হাসি কীসের?

তুতুন ক্রমশই বাড়াচ্ছে—ও সেজদি, রাঙামাসী—উঃ!

রাঙামাসী!

ওঃ! তাই!

অতএব হাসা চলে। কারণটা না জানলেও চলে। রাঙামাসী যে।...হি হি হি...কী হল? হা হা হা...হয়েছেটা কী? ...খি খি খু খু ...খুব বুঝি?

—মারা যাব সেজদি, ঠিক মারা যাব—

—মরবি সরিস, বলে তবে মর। হি হি হি।

—ও সেজদি, রাঙামাসীর খোঁপায় গোড়েমালা!...বেলফুলের।

—গোড়েমালা? বেলফুলের? রাঙামাসীর খোঁপায়?

হো হো হো! হি হি হি! হা হা হা! হাসির ঐক্যতান বাদন।

—রোস রোস—ওতেই শেষ নয়, আরও আছে।...রাঙামেসো নাকি চুপি চুপি—মালা নিয়ে হি হি হি! খোঁপায়—চাপিয়ে দিয়ে—

অ্যাঁ।! কী বললি? রাঙামেসো?

এরপর আর ভিজে-ছাদের জলকাদার বাধা মানা চলে না, বজায় রাখা চলে না সিল্কের শাড়ির মায়া! লুটিয়ে লুটিয়ে আর দুলে দুলে হাসতেই হবে! নসুকাকা আর আশুকাকা পুরুষমানুষ হলেই বা, মাটিতে গড়িয়ে না হোক দাঁড়িয়েও হেসে হেসে দুলতে হবে তাঁদের। ...না হেসে উপায় কী? রাঙামাসী যে! তার ওপর গোড়েমালা!

হাসি থামিয়ে বাঁশীপিসি বলেন—তবে যে একটু আগে বলছিল—ও আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেল ভাই—ওর শরীর ভালো নয়—নেমন্তন্ন বাড়ির খাওয়া ওর সয় না—

—ওগো তার ফাঁকেই 'টুক করে'। বর্ণচোরা কি না!

—কী বললি? বর্ণচোরা?

—আমি বলি নি বাপু! রাঙামাসীর নিজমুখনিঃসৃত বাণী। তিনিই বললেন দেখতে ওই রকম সন্নিসী সন্নিসী, আসলে বর্ণচোরা—

—রক্ষে কর তুতুন, থাম! আর হাসিয়ে মারিস নি।

—বিশ্বাস না হয় দেখে এস।

—ও বাবা! রাঙাদি যে একেবারে—ইয়ে—আপনাকে যে একেবারে চেনাই যাচ্ছে না রাঙাদি!...নসুকাকা যেন যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন—আজকের এই লগনসার বাজারে এ রকম মোটা মালা মেলাই দুষ্কর! কত নিয়েছে?

—কপাল আমার! গাঁটের-কড়ি খরচা করে মালা কিনে চুলে দেব? পাগল তো নই? পাওনা জিনিস রে ভাই, পাওনা জিনিস!

—ওঃ তাই বলুন! আমি ভাবছিলাম বুঝি জামাইবাবু নিউমার্কেট থেকে—

—তা আর নয়?—খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন রাঙাদি—তোমাদের জামাইবাবু না হলে আর গিন্নির খোঁপায় ফুলের মালা দোলাতে আসবে কে? এখানেই লাভ হল। ওই যে—কে যেন ছেলেটি তোমাদের বর-কনের মালা আনছিল, কি খেয়াল চাপল তার আমার খোঁপায় একটা মালা চাপিয়ে দিয়ে গেল! খামখেয়ালি ছেলেটা!

—তাই নাকি? মালা আমাদের আশু এনেছিল না?

মুহূর্তের জন্য কি একবার কেঁপে উঠলেন রাঙামাসী? নাঃ! এরকম ঢের আক্রমণ তাঁর গা-সহা। মাথা নেড়ে বললেন—ও-মা, না-তো!...ওই যে ওই ছেলেটি—কী যেন নাম, ঠিক মনে পড়ছে না—ফরসা, রোগা, ঢ্যাঙা!...দিয়ে গেল আহ্লাদ করে, তাই আর খুলি নি। লজ্জার মাথা খেয়ে মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছি।

কাজের বাড়ি, দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নেই। নসুকাকার ঘাড়েই আবার মেয়েদের খাওয়ানোর ভার। ছুটে চলে যেতে হল নসুকাকাকে, আর একটা ব্যাচ বসিয়ে দিতে হবে।

—রাঙাদি খেয়েছেন নাকি?—বাঁশীপিসি খোঁজ নিতে এসে থমকে দাঁড়ালেন। যেন থমকে যেতে বাধ্য হয়েছেন এই ভাব।—ওব্ বাবা! রাঙাদি? এখনও তো আপনার প্রাণে বেশ শখ আছে দেখছি?

...কেন রে বাঁশী—রাঙামাসী অবাক চোখে তাকান—পরেছি তো শুধু এই একটা ঢাকাই শাড়ি, আর সাদাসিধে এই অগ্যাণ্ডি লেসের ব্লাউসটা! বিয়ে বাড়িতে একটুও সাজব না?

—শাড়ি ব্লাউসের কথা কে বলছে? আমি বলছি খোঁপার কথা। যাই বলুন—আপনাকে প্রায় দশ-পনেরো বছর কম বয়েস দেখাচ্ছে।

—হ্যাঁ দশ-পনেরো বছর। কি যে বলিস ভাই! তবে হ্যাঁ, তোদের জামাইবাবু মাঝে মাঝে বলে বটে—"তোমার বয়েসটা কি উল্টো দিকে এগোচ্ছে?"

—বলেন তো? তাহলেই বুঝুন? চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যে প্রত্যেকে একই কথা চিন্তা করে থাকেন, এই তার আর একটি প্রমাণ!

—চিন্তাশীল? চিন্তাশীল না হাতি। ঘোর খামখেয়ালি! এই দেখ না, খোঁপায় একগাছা মালা জড়ানো দেখে এত স্ফূর্তি হল যে, স্ফূর্তির চোটে এই হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে—

হেসে লুটিয়ে পড়লেন রাঙামাসী, কথার শেষাংশ উহ্য রেখেই।

—রাঙামাসীমা, শুনলাম না কি আপনি খান নি। সব ব্যাচ শেষ হয়ে গেল যে? চলুন?—রত্নাবৌদি এসে দাঁড়ালেন মাসশাশুড়ির প্রতি বধূজনোচিত সমীহর ভাব মুখে ফুটিয়ে। রাঙামাসীর খোঁপার দিকে তার দৃষ্টি পড়েছে এমন মনে হয় না।

রাঙামাসী অন্যমনস্কভাবে আলতো একটু হাত তুলে খোঁপার মালাটা ঠিক করে নেন।

রত্নাবৌদি তবু উদাসীন। অন্ধ না কি?

—তোমরা সব খাবে না বৌমা?

—হ্যাঁ এই যে, এই সঙ্গে বাড়ির মেয়েরাও বসছে, চলুন চলুন। আগের ব্যাচে খেলেন না, শুনছি নাকি ফ্রাই সব ফুরিয়ে গেছে।

এ হেন দুঃসংবাদেও কিন্তু রাঙামাসীর আপসোস নেই। নিমন্ত্রণ বাড়িতে যারা দুটো ভালোমন্দ খাবার বাসনায় আসে, রাঙামাসী সে দরের লোক নন। তাছাড়া বাড়িতে তাঁর অভাব

কী? কাজেই রাঙামাসী অবিচলিত চিত্তে বলেন —গেছে, বাঁচা গেছে। তোমাদের পাঁচজনের সঙ্গে বসে খাওয়া নিয়ে কথা! খেতে যাব কি, সেই থেকে মনের মধ্যে যেন তোলপাড় করছে।

রত্নাবৌদির মুখে শিশুর সারল্য।—কোন্ সময় থেকে মাসীমা?

—আমার চেহারায়—মানে আর কি—সাজে-টাজে অদ্ভুত কিছু দেখছ না?

—অদ্ভুত? কই না তো?—রত্নাবৌদির মুখে ভোরের শিউলির চারুতা।

রাঙামাসী মাথাটা একটু ঘুরিয়ে দেখান—দেখ তাহলে—

—ওঃ মালা? বাঃ বেশ মালাটি তো!

—শুধু ওইটুকুই তো শেষ নয় বৌমা, এর মধ্যে কথা আছে।

—কথা? মালার মধ্যে কথা?

রত্নাবৌদি যেন বসে পড়তে চান।

রাঙামাসী তাঁর দিকে রীতিমতো ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে আসেন, চুপি চুপি বলেন—তোমার ওই—ছোট পিসশ্বশুরটি লোক কেমন বল তো বৌমা? বাঁশীর বর?

—ও, বাঁশী পিসেমশাইয়ের কথা বলছেন? খুব ভালো লোক তো? চমৎকার লোক।

—চমৎকার? রাঙামাসীর সুগোল দুটি চোখ গুপ্ত রহস্যের ছায়ায় ঘোরাল হয়ে আসে—তোমরা অবশ্য তাই জান! আমিও তাই জানতাম। কিন্তু আজ যা দেখলাম—

রাঙামাসী যেন লজ্জায় বাক্যহত হন।

—কী দেখলেন রাঙামাসী?

—দেখলাম আর কি—রাঙামাসী একটা নিশ্বাস ফেলেন—মানে বলছি যে —ওনার স্বভাব-চরিত্র বাছা তেমন সুবিধের নয়।

—সে কি রাঙামাসী?

—তবে আর বলছি কি? আহা বেচারা বাঁশীর জন্যে দুঃখ হয়। ওকে যেন এসবের কিছু বোলো না বৌমা। আমিও বলি নি।

—কিন্তু বাঁশী পিসেমশাই তো—

—হ্যাঁ সহজে বিশ্বাস হয় না বটে। —রাঙামাসী নিতান্ত ফিস্‌ফিস্ স্বরে কি একটু বলে নিয়ে, সাধারণ স্বরে বলেন—রাগে আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেছল মা, ইচ্ছে হল খোঁপা থেকে টান মেরে খুলে ওর নাকের ওপর ছুড়ে মারি।

—মারলেই পারতেন।

—পারতাম! কিন্তু মায়া হল বৌমা, মায়া হল। ঠাট্টার সম্পর্ক হিসেবে দিয়েছে, এ নিয়ে একটা সিনক্রিয়েট করলে বাঁশী বেচারা মর্মাহত হবে।

—তা এখনও তো কই ফেলে দেন নি?

—এখন? এখন আর—যাকগে—রয়েছে থাকগে! ফুলের মালা, ওর আর কি অপরাধ? চল যাই—আমার জন্যে তো আবার সবাই বসে রয়েছে।

খাওয়া মিটতেই তলব পড়ল লেবুদিদিমার দরবারে। লেবুদিদিমা, মানে রাঙামাসীরও যিনি মাসী। যাঁর সুবাদে এ বাড়িতে নেমন্তন্ন রাঙামাসীর।

—শোন্, ইদিকে আয়! বোস।

চল্লিশোত্তীর্ণা রাঙামাসী ভয়ে জড়সড় হয়ে সত্তরোত্তীর্ণা মাসীর পায়ের কাছে বসলেন।

—বলি—কী কীর্তি করে বেড়াচ্ছিস শতেকখোয়ারি?

গোল গোল দুটি চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকান রাঙামাসী।

—তোমাকে আনাই আমার ঝকমারি হয়েছিল মা। তোমার নামে সবাই মুখ বেঁকিয়েছিল,

আমিই মায়ায় পড়ে আনালাম। আমার সুরেশ তো তোমার নামে খড়্গহস্ত, ওকে লুকিয়ে খোকাকে পাঠিয়েছিলাম নেমন্তন্ন করতে! তা আমার মুখখানা একেবারে ডুবিয়ে দিলি?

—কী করেছি মাসীমা, বুঝতে পারছি না তো?—গরুচোরের মতো চোখ পিট্‌পিট্ করতে করতে শুধান রাঙামাসী।

—না, তা বুঝতে পারবে কেন? ছি ছি! তোর বয়সি মাগীরা নাতি-নাতনী নিয়ে জড়িয়ে সংসার করছে, আর তুই কি না এমনি করে ঢলিয়ে বেড়াচ্ছিস? বাঁজা বলে কি কচি খুকী আছিস? বলি খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে লোক হাসিয়ে বেড়াচ্ছিলি কেন সর্বনাশী?

রাঙামাসী অশ্রুভরা চোখে মাথা হেঁট করে বলেন—ফুল আমার বড় ভালো লাগে মাসীমা!

—ভালো লাগে, বাড়িতে ফুলের বিছানায় শুয়ে থেক। পাঁচজনের সামনে এ কি? পরেছিস পরেছিস, নিজের মুখে চুনকালি লেপেছিস বেশ করেছিস, ও সব কথা বলেছিস কেন? বাঁশী রেগে একেবারে আগুন হয়ে বেড়াচ্ছে, বাড়িসুদ্ধু সবাই হাসাহাসি করছে—আমারই লজ্জায় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে...জামাই আমার অমন ঋষিতুল্য, তার সঙ্গে এতকাল ঘর করেও এখন তোমার এমন প্রবৃত্তি? ছিঃ।

সহসা রাঙামাসীর ভাব পরিবর্তন হয়। তিনি মাথা তুলে বলে ওঠেন—ফুল পরেছি, হাসাহাসি করতে পারে, বাঁশীর রাগের কী হল?

—হবে না? তুই মিছে করে ওর সোয়ামির নাম জড়িয়ে কেলেঙ্কারের গপ্‌পো করবি, আর ও বুঝি আহ্লাদে ভাসবে?

—ওর স্বামীর নামে?—রাঙামাসী দুই গালে দুহাত থাবড়ে বলেন—ও মা সে কি? কি ঘেন্না! তার নামে আবার আমি কি বললাম?

লেবুদিদিমা সন্দিগ্ধ স্বরে বলেন—কেন, বলিস নি, বাঁশীর বর নাকি আচমকা পেছন থেকে তোর খোঁপায় মালা জড়িয়ে দিয়েছে।

রাঙামাসী ঠাস ঠাস করে চড় বসান নিজের গালে—ও মা আমি কোথা যাব! অমন বিশ্রী কথা কে রটিয়েছে, ছি ছি! ফুলটুনির খোকাটা তখন "লাঙাদিদা" "লাঙাদিদা" করে কাছে এসে কি খেয়ালে একটা মালা নিয়ে আমার মাথায় বসিয়ে দিল। ছেলেমানুষের আহ্লাদ-করে-দেওয়া উপহার, তাই সেটা ফেলি নি। দোষ হয়ে থাকে, এই ফেলে দিচ্ছি।

খুলতে উদ্যত ভঙ্গিতে হাতটা একবার উঠিয়েই অন্যমনার মতো সে হাত নামিয়ে নিয়ে রাঙামাসী বলে—ছেলেটা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে? হয় নয় ডেকে জিজ্ঞেস করো?

ফুলটুনির বছর চারেকের ছেলেটা অদূরে অকাতরে পড়ে ঘুমোচ্ছে, তাকে ডেকে সাক্ষ্য দেওয়ানোর প্রস্তাব করা, একমাত্র রাঙামাসীর পক্ষেই সম্ভব।

লেবুদিদিমা মুখ বাঁকিয়ে বলেন—হ্যাঁ! ওকে যাব সালিশ মানতে! আমি তো আর ক্ষেপি নি! তাহলে বলি—রত্না নাত-বৌয়েরই বা সাহস হয় কি করে, এসব কথা রটাতে? আর ওর দরকারই বা কী?

—দরকার আর কি, মজা দেখা। গোলমালের বাড়িতে একটা গণ্ডগোল তুলে দিল। তোমায় আমি বলছি মাসী, সুরেশদার ছেলের বৌটি বাপু সুবিধের হয় নি। দেখছি তো সমস্ত দিন। ভাসুর শ্বশুর জ্ঞান নেই, সবাইয়ের সামনে হাসাহাসি তর্কাতর্কি। মাথায় একটু কাপড় নেই—

লেবুদিদিমার এজলাসে আসামির বদল হয়। তিনি নাক কুঁচকে বলেন—ওর কথা আর বলিস নে! লজ্জা সরমের বালাই মাত্র নেই। মুখে বেশি কথা কয় না, ভেতরে ভেতরে ধিঙ্গি অবতার!

—তার ওপর আবার এই রকম কথা বানানো রোগ! ছি ছি!

লেবুদিদিমা ভারীমুখে বলেন—জানি না বাছা, কার কথা সত্যি, কার কথা বানানো। তোমার কথা নিয়ে এদিকে তো একেবারে ঢি ঢি পড়ে গেছে! তুমি কাকে নাকি বলেছ জামাই নিজে গোড়েমালা এনে দিয়েছে, কাকে বলেছ আশু দিয়েছে, আবার নাত-বৌয়ের কাছে এই অকথা-কুকথা বলেছ—

রাঙামাসী একটু বিজয় গৌরবের হাসি হেসে বলেন—তাহলে বোঝ মাসী, কাদের কথা বানানো। আমি তো পাগল নই যে, পাঁচজনের কাছে পাঁচ রকম কথা বলব? ফুলটুনির ছেলের ঘুম ভাঙলে জিজ্ঞেস করো কাল। ...আচ্ছা চললাম মাসীমা।

—এসো বাছা! মতিবুদ্ধি একটু ভালো করো। লোকে যেন গায়ে ধুলো না দেয়।

গাড়িতে উঠতে উঠতে রাঙামাসী অভিমান-ক্ষুব্ধস্বরে নসুকাকাকে বলেন—চললাম ভাই! খুব আহ্লাদ করে বিয়ে বাড়িতে এসেছিলাম, তা খুব শিক্ষা হল।

নসুকাকা মুচকে হেসে বলেন—প্রতিনিয়ত শিক্ষালাভ করতে করতেই তো আমরা জীবনের পথে এগিয়ে চলেছি রাঙাদি!

আগামীকাল বরকনে বিদায়।

রাঙামাসীকে কেউ যেতে বলে নি, রাঙামাসী নিজেই ড্রাইভার ছোকরাকে চুপি চুপি বলে রেখেছিলেন—কাল একবার সময় করে এস তো? বরকনে বিদেয়ের আগে—

সে ছোকরা রাঙামাসীকে নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কাল কখন আসব মাসীমা?

রাঙামাসী নেতিবাচক একটু হাত নেড়ে তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে যান। ...কণ্ঠ রুদ্ধ, কথা দিয়ে নিষেধ করবার ক্ষমতা নেই।

সিঁড়িতে উঠেই প্রথম ডানহাতি ঘরটার সামনে একবার থমকে দাঁড়ালেন রাঙামাসী। ব্যাঘ্র গর্জনের মতো একটা গর্জন ঘরের মধ্যে গম্ গম্ করছে! অর্থাৎ লেবুদিদিমার 'ঋষিতুল্য' জামাই নিদ্রা গেছেন! রাঙামাসী বাড়িতে ফিরেছেন কি না ফিরেছেন, জানবার দরকার নেই তাঁর। তিনি ঋষিকল্প নিয়মী। রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কম্বলশয্যা বিছানো হয়ে যায়। দরজাতে পর্দা ঝুলছে, সেও কম্বলের। সহসা দৃঢ় হস্তে পর্দাটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে দাঁড়ালেন রাঙামাসী!

নিয়মে আর যোগব্যায়ামে মজবুত দেহী মানুষটির এই সামান্য পদধ্বনিতে ঘুম ভাঙল না। ভাঙেও না। রাঙামাসীর অস্থির, চঞ্চল, ক্রুদ্ধ, কোনও পদক্ষেপণের শব্দেই কখনও ভাঙে না।

অরুচি জন্মে-যাওয়া পরিচিত দৃশ্য। ...সেই নীল বাল্‌বের মৃদু আলো, সেই মাথার কাছে টেবিলে মা কালীর পট, সেই পাশের দিকের তাকে সাজানো সাধন-তন্ত্রের তথ্য-গ্রন্থের সারি, সেই এ পাশে অজিনাসন সম্বলিত পূজার 'আসন', সেই চৌকির তলায় রাত্রের ভুক্তাবশিষ্ট শ্বেত পাথরের থালা বাটি গ্লাস।...কোনও নতুনত্ব নেই, নেই কোনও বৈচিত্র্য।

শিথিল হাতের মুঠো থেকে পর্দাটা ঝুলে পড়ে। সরে এসে সিঁড়ির বাঁ পাশের ঘরে ঢোকেন রাঙামাসী। ...কে বলবে একই বাড়ির মুখোমুখি ঘর। এটি একখানি প্রাচীন ও আধুনিক, সব কিছু বিলাস উপকরণে বোঝাই অতিসজ্জিত ঘর।...রাঙামাসীর বিয়ের সময় পাওয়া তাঁর বাবার দেওয়া সমস্ত ফার্নিচার এই ঘরে ঠাসা আছে, তার উপরে জমেছে রাঙামাসীর সারাজীবনের সঞ্চয়! তিলে তিলে তিল-ভাণ্ডেশ্বর।

একটা ঘরে তিনখান বড় আরশি। তিন দেওয়ালে আলো!

ঘরের দরজাটায় খিল লাগিয়ে বড় আলোটা জ্বেলে দিয়ে আরশির সামনে এসে দাঁড়ালেন রাঙামাসী!

খানিক আগে এইখানে দাঁড়িয়েই সেজে গেছেন।

প্রসাধনের নানাবিধ উপকরণ ইতস্তত ছড়ানো, তাড়াতাড়িতে তুলে রেখে যাওয়া হয় নি।

পাউডারের তুলিটা হাতে তুলে নিয়ে ভালো করে আর একবার আরশির মধ্যে চেয়ে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলেন রাঙামাসী। ...কে ও? ওর মধ্যে থেকে কে তাকিয়ে আছে রাঙামাসীর দিকে? চাকার মতো গোল কালো একখানা মুখে অশ্রুপাতে বিকৃত ফুলো ফুলো দুটো চোখ, গালের উপরকার পেন্টটা ধুয়ে মুছে গিয়ে কপালের সঙ্গে বেমানান বিশ্রী দেখাচ্ছে!...আঁট সাঁট অর্গ্যাণ্ডি লেসের ব্লাউস আর ইস্ত্রী-মটমটে ঢাকাই শাড়ি জড়ানো দেহ, তবুও যেন ব্যাঙের মতো শিথিল থপ্‌থপে লাগছে। ঘন্টা কয়েক আগে কি এই দেহখানিই দেখেছিলেন রাঙামাসী, আরশির সামনে ঘুরে ফিরে? আর দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন আপন কলা-কৌশলের কৃতিত্বে!

প্রসাধনে একটু ত্রুটি ছিল—খোঁপায় মালা, আজকাল যেটা খুব চল হয়েছে। সেইটুকুই সেরে নিয়েছিলেন বিয়েবাড়ি গিয়ে। অথচ লজ্জা-লজ্জাও করছিল, সেই লজ্জা ঢাকতেই না নানা গল্পের অবতারণা?...কী করবেন কোনওটাই যে ওরা বিশ্বাস করতে চায় না।

কিন্তু কী হয়েছে তাতে?

ওদের কী ক্ষতি হচ্ছিল?

শুধু শুধু ওরা কেন...কেন অকারণ এই নিষ্ঠুরতা ওদের?

খোঁপা থেকে মালাগাছাটা টেনে খুলে ফেলেন রাঙামাসী, আর অনেক চেষ্টা এবং অনেক কৌশলে সংগৃহীত সেই বেলফুলের গোড়েমালাটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে মুহূর্ত-কয়েক ধবধবে বিছানা পাতা পালঙ্কের ওপর চুপ করে বসে রইলেন, সামনের সাদা দেওয়ালটার দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে। ...ওই দৃষ্টির মধ্যেই কি স্থির হয়ে আছে রাঙামাসীর সারাজীবনের ছায়া?

সহসা পাশের বালিশটা ঠেলে মাটিতে ফেলে দিয়ে রাঙামাসী বিছানায় আছড়ে পড়লেন উপুড় হয়ে। পালঙ্কটা দুলে কেঁপে উঠল, আর অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে থাকল থেকে থেকে।...

চাপরাশি

অনেকক্ষণ ধরে কথা চালিয়ে, জোরাল গলায় অনেক ওজর-আপত্তি অনিচ্ছে দেখিয়ে অবশেষে প্রায় পরাজিতের গলায় 'আচ্ছা ঠিক আছে। কবে বললেন? বাইশে? টুকে রাখছি তারিখটা। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন কিন্তু—' বলে

টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রাধিকানাথ হতাশ গলায় বলে ওঠেন, 'নাঃ এই 'সভা' করে করেই দেশটা পাগলা হয়ে যাবে। আর সভাতেই আমার জীবন মহানিশা করে তুলবে। একদিকে শ্লোগান, আর একদিকে ফাংশান, এই নিয়ে আছে দেশ। অন্য চিন্তা করতে ভুলে যাচ্ছে। কারণে অকারণে হরদম এই ফাংশান করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বললে হাঁপাতেই হয়, কারণ কিছু কিঞ্চিৎ বয়েস হয়েছে রাধিকানাথের।

নন্দিতা অনেকগুলো বাংলা পত্র-পত্রিকা নিয়ে বসেছিল। পড়ছিল না, ওলটাচ্ছিল, আর বাবার জোরাল গলার আপত্তি শুনছিল। নন্দিতার হাসি হাসি মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ওই 'আপত্তি'টা সে যেন বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। নইলে গল্প পড়তে পড়তে হাসবে, বা হেসে উঠবে খিলখিলিয়ে, সে বয়েস আর নেই নন্দিতার। তাছাড়া পড়েই বা কই এই সব পত্র-পত্রিকা? শুধু তো ওলটায়।

রাধিকানাথ একটি নামকরা কাগজের সহ-সম্পাদক, বাড়িতে পত্র-পত্রিকার বৃন্দাবন। কত পড়বে? আর কি-ই বা পড়বে?

এখন আবার স্বগতোক্তি শুনে নন্দিতা পত্রিকাটা মুড়ে রেখে মুচকি হেসে বলে, 'কেন বাবা, তুমি তো সভা করতে খুব ভালোই বাসো।'

নন্দিতা সর্বদাই বাবাকে এ-অপবাদ দিয়ে থাকে, আর রাধিকানাথ সর্বদাই শুনে উত্তেজিত হন। কারণ তিনি তো জানেন এক-একটি সভাপতিত্বে, বা প্রধান অতিথিত্বে স্বীকৃতি দেবার আগে কত প্রতিরোধের চেষ্টা করেন তিনি।

জরুরি কাজ, স্বাস্থ্য ভালো নেই, সময়ের অভাব, ইত্যাদি প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র নিয়েই লড়েন, কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রাবল্যের কাছে, অবশেষে হার মানতেই হয়। বাঘ শিকারীরা কি কোনও বাধা মানে? আর সভাপতি শিকারীরা কি 'বাঘমারা'দের চেয়ে কম? অতএব পরাজয় মেনে বলতেই হয়, 'আচ্ছা ঠিক আছে—'

কিন্তু নন্দিতা যেন ওই ফাংশানকারীদের মতোই একবগ্‌গা। কোনও কথা বুঝতে চায় না, স্বচ্ছন্দে বলে বসে, 'সভা তো তুমি ভালোই বাসো বাবা?'

এতে রাধিকানাথ উত্তেজিত হবেন না?

হলেন।

সেই গলাতেই বলে উঠলেন, 'ভালোই বাসি? তুই বলিস কি নন্দা? তোর এই ভুল ধারণটা কি কিছুতেই যাবে না? সভা ভালোবাসি? বলে 'সভা' শুনলেই আমার আতঙ্ক হয়। কেবল সময় নষ্ট, নিজের কাজকর্ম কিছুই হয় না। শরীরেও বয়না সবসময়।'

'তবে যাও কেন?'

দুষ্টু দুষ্টু হাসে নন্দিতা।

অল্পবয়সে মাতৃহীন মেয়ে, বাবার উপর আবদার আধিপত্য দুই-ই প্রবল। হয়তো—এতটা উত্তেজিত হয়ে ওঠার কারণও রাধিকানাথের তাই। মেয়ের কথাকে রাধিকানাথ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

'যাও কেন' প্রশ্নটিকেও গুরুত্ব দিলেন। বললেন 'যাই কেন? যাই কেন, তা দেখতে পাস না? এককথায় যাই? কী অনুরোধ উপরোধের ঠেলা। বাপস্!'

নন্দিতা হেসে উঠে বলে, 'সে তো থাকবেই। নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তো লোকে তেমন অনুরোধই করে থাকে, যাতে ঢেঁকি গেলানো যায়। কিন্তু ঢেঁকিটা তুমি গিলবে কেন?'

রাধিকানাথ ক্ষুব্ধ হন, আবার চড়াও হন। বলেন, 'গিলি কেন? গায়ে মানুষের চামড়া আছে বলেই গিলি। না গিলে পারি না। আমাকে সবাই এত ভালোবাসে, এত শ্রদ্ধা সম্মান করে, আমাকে একটিবারের জন্যে নিয়ে যেতে পারলে কৃতার্থ হয়, সেটা দেখব না? তবু তো চেষ্টা করি এড়াতে, তা বলে অভদ্র তো হতে পারি না? না অভদ্র হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

রাগ-রাগ মুখ করে বসে পড়েন রাধিকানাথ।

মেয়ের মুখটা কিন্তু হাসি-হাসিই থাকে, 'সম্ভব হত বাবা—' নন্দিতা গলা ছেড়ে হেসে ওঠে। 'যদি তুমি ওই শ্রদ্ধা সম্মান ভালোবাসার স্বরূপটা বুঝতে।'

রাধিকানাথ এবার গম্ভীর হন।

গম্ভীর আর ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'তোর সেই কথা! তোরা এযুগের ছেলেমেয়েরা বড় অসভ্য হয়ে গেছিস নন্দা। এত ছোটকথা তোরা ভাবতে পারিস কী করে?'

নন্দিতাও অতএব গম্ভীর হয়, 'অবিরত 'ছোট' মানুষ দেখতে দেখতে, আর ছোট কথা বুঝে ফেলতে ফেলতে, 'ছোট' ভাবনা ভাবতে শিখে ফেলেছি বাবা। জ্ঞানচক্ষুটা বড় তাড়াতাড়ি খুলে গেছে আমাদের।'

রাধিকানাথ আরও গম্ভীর হন, 'যেটাকে জ্ঞানচক্ষু ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিস নন্দা, আসলে সেটা বিকৃত চক্ষু। আমাকে লোকে চায়, আমি 'কবি' বলে নয়, একটা কাগজের সাব এডিটার বলে, এই দেখাটাই তোর বিকৃত দৃষ্টির দেখা।'

নন্দিতা যদি রবীন্দ্রযুগের মেয়ে হত, নিশ্চয়ই বাপের এই ধিক্কার বাণীতে আহত হতো, অভিমান করত, চুপ করে যেত। তা'হলে নন্দিতার 'চোখ ছলছলিয়া উঠিত' অথবা 'বড় বড় দুই চোখের কোল বাহিয়া দুইফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িত।'

কিন্তু নন্দিতা রবীন্দ্রযুগের মেয়ে নয়, যুদ্ধোত্তর যুগে জন্মানো মেয়ে, তাই নন্দিতা অপবাদ গায়ে রাখতে রাজি হয় না। জোর গলায় প্রতিবাদ করে, 'ওকথা বললে মানবই না। নিজের চক্ষে দেখিনা বুঝি? যাইনা বুঝি তোমার সভায়-টভায়? দেখতে পাইনা তোমার কাগজের ক্যামেরাম্যানটি ক্যামেরা বাগিয়ে ধরলেই ফাংশান কর্তারা কেমন গুছিয়ে বাগিয়ে ক্যামেরার 'ফোকাসে'র মধ্যে এসে পড়েন। ঠেলাঠেলির চোটে তোমার মুখটাই প্রায় আড়াল হতে বসে। তা যাক, ফটোটা যখন কাগজে বেরোবে ওদের মুখটুখগুলো তো? আর বেরোবেই ফটো।

অন্তত তোমার কাগজে। তুমি যেখানে 'চিফ্‌গেস্ট' বা প্রেসিডেন্ট, সে সভার বিবরণ তোমাদের রিপোর্টার বেশ বিস্তারিত করেই লিখবে।'

'শুধু এই জন্যেই ওরা আমায় ডাকে?' রাধিকানাথ উত্তেজিত হন।

নন্দিতা কিন্তু নির্বিকার গলায় বলে, 'আমার তো তাই বিশ্বাস।'

'তোমাদের এযুগের এই বিশ্বাসহীনতার বিশ্বাসগুলো খুব ঠিক নয় নন্দা! আশ্চর্য, তুমিও এই বিকৃত আধুনিকতার শিকার হচ্ছ।'

'তুমি কবি মানুষ, কবিত্ব করে কথা বলতে পার বাবা। আমি বলব, 'ইহাই পরম সত্য।'

রাধিকানাথ আর কি বলতেন কে জানে, আবার টেলিফোন ঝনঝনিয়ে ওঠে। রাধিকানাথ ধরবার আগেই নন্দিতা ধরে, এবং বলে চলে, 'হ্যাঁ বাড়িতে আছেন, একটু ব্যস্ত আছেন। বলুন কী বলবেন? ও, আমাকে বললে হবে না? কিন্তু আমি তাঁর মেয়ে, যা বলবার—তাঁকেই একবার চাই? আচ্ছা ডেকে দিচ্ছি—কী নাম বলব? 'বিশ্ববেকার সংস্কৃতি সংস্থা?' আচ্ছা, ধরুন এক মিনিট।'

কষ্টে হাসি চেপে বাবার দিকে রিসিভারটা এগিয়ে দেয় নন্দিতা। 'বাবা বিশ্ববেকার সংস্কৃতি সংস্থা।'

রাধিকানাথ সেটা হাত দিয়ে চাপা মেজাজি গলায় বলেন, 'কই ভাগাতে পারলে না?'

'পারতাম, যদি তুমি এখানে বসে না থাকতে।'

নন্দিতা হাসতে থাকে। এবং উৎকর্ণ থাকে বাবার কথার ধাঁচের দিকে। খুব উৎকর্ণের কারণ অবশ্য নেই। রাধিকানাথ বেশ চড়া চড়া গলাতেই বলে চলেছেন, 'না না মাপ করবেন। সময় একেবারে নেই। ...কী করব বলুন? উপায় কী?...কি আশ্চর্য। রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কবি নেই বাংলাদেশে? ঠিক আছে, না থাকতে পারে। কিন্তু উপায় কি? ওইদিন আমার অন্য কাজ রয়েছে।'

নন্দিতার কর্ণগোচরের উদ্দেশ্যই বোধ হয় ঝাঁজটা বেশি। তাছাড়া বাস্তবিকই কাজ রয়েছে রাধিকানাথের। তাই বার বার বলেন, 'সময় নেই, মাপ করবেন। একদিনে দুটো সভা করি না আমি।'

কিন্তু 'করি না' বললেই যদি ছাড়ান পাওয়া যেত। রাধিকানাথের 'সময়' নেই, কিন্তু তাদের তো অগাধ-অনন্ত সময়? রাধিকানাথের 'কাজ' আছে, কিন্তু তারা যে 'বেকার।' তাছাড়া তারা সংস্কৃতির ধারক বাহক, তাদের কবির উপর একটা দাবি নেই? অতএব শেষ পর্যন্ত বলতেই হয় রাধিকানাথকে—'আচ্ছা ঠিক আছে—'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রাধিকানাথ মেয়ের দিকে একটি প্রাঞ্জল দৃষ্টি হানেন। যার অর্থ হচ্ছে—'দেখলে?'

নন্দিতা তো দেখেইছে।

তাই নন্দিতা মৃদু হেসে বলে, 'ছাড়বে না জানতাম। 'সংস্কৃতির' ধারক তো। অন্যের অনিচ্ছের বন্ধ দরজায় তুরপুন চালিয়ে ছেঁদা করে ঢুকে পড়াই কাজ যাদের।'

'কী বললি?'

'কিছু না। কিন্তু বাবা এইবার তোমায় চান করতে যেতে হয়, আবার হয়তো কেউ এসে পড়বে। হয়তো ফোন।'

রাধিকানাথ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন।

রাধিকানাথ চান করতে যান, কিন্তু মনের মধ্যে অবিরত পাক দিতে থাকে মেয়ের ব্যঙ্গোক্তি। কানের পর্দায় যেন ধাক্কা মারছে এখন।

'...যদি ওই শ্রদ্ধাসম্মান ভালোবাসার স্বরূপ বুঝতে। ...হি হি!'

রাধিকানাথের মেয়ে ওইসব অদৃশ্যপক্ষদের শ্রদ্ধাসম্মান ভালোবাসার স্বরূপ বোঝাতে বসছে তার বাবাকে। টের পাচ্ছে না তা থেকে রাধিকানাথ তাঁর মেয়ের শ্রদ্ধাসম্মান ভালবাসার স্বরূপটাই বুঝে ফেলছেন।

এই কথা মুখের ওপর বলছে নন্দিতা?

রাধিকানাথ একটা কাগজের সাব এডিটার বলেই তাঁকে নিয়ে এত টানাটানি!

রাধিকানাথের এই দীর্ঘজীবনব্যাপী কাব্যসাধনাটা কিছুই নয়? বোঝা যাচ্ছে অন্তত রাধিকানাথের মেয়ের কাছে 'কিছুই' নয়! তা-নইলে সেটা নন্দিতার সন্দেহের গণ্ডী অতিক্রম করে 'স্থিরবিশ্বাসের' ভূমিতে দাঁড়াত না।

...'আমার তো তাই বিশ্বাস!'

রাধিকানাথ শাওয়ারের নীচে মাথাটা পেতে দাঁড়িয়েই রইলেন অন্যমনস্কের মতো। যেন বাইরের জলে ভিতরের দাহ প্রশমিত হবে। আশ্চর্য বাপ সম্পর্কে এমন অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য করতে বাধলও না নন্দিতার?

জ্ঞানচক্ষু!

জ্ঞানচক্ষুর বড়াই!

তো সেই 'জ্ঞানচক্ষুতে' ধরা পড়ল না, দেশের লোকের 'কবি রাধিকানাথের' জন্যে মাথাব্যথা নেই, মাথাব্যথা দৈনিক 'মহৎ ভারতের'র সহ-সম্পাদক রাধিকানাথের জন্য, এই 'পরম সত্যে'র বাণীটি রাধিকানাথের মুখের উপর ছুড়ে মারাটা কি পরিমাণ নির্মম নির্লজ্জতা!

সন্তানের হাত থেকে আসা আঘাত এত যন্ত্রণাদায়ক!

রাধিকানাথ কি তবে যাচাই করে দেখবেন নিজের মূল্যের পরিমাণ?

অথচ রাধিকানাথের জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন মেয়ে একচক্ষু হরিণের মতো একটা দিকই দেখছিল। স্বপ্নেও ভাবেনি তার ওই 'স্থির বিশ্বাসের' পাথরের চাঁইটা সেই সব মতলববাজ অদৃশ্যপক্ষদের উপর না পড়ে তার সরলবিশ্বাসী এবং মানুষের ভালোবাসার প্রতি আস্থাশীল বাবার উপর গিয়েই পড়েছে।

তখন বাবার মুখটাও ভালো করে লক্ষ করেনি নন্দিতা, তাঁকে ঘর থেকে ভাগাবার চেষ্টাই করেছে। কারণ 'হঠাৎ কেউ এসে পড়া'র আশঙ্কা নয়, নিশ্চয় 'একজন' এসে পড়ার আশা ছিল। বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করছিল আশাটা।

রাধিকানাথকে চান করতে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হল, ঘড়ির দিকে তাকাল।

তারপর সে ঘরে ঢুকল, সে এসেই ধপ করে বসে পড়ে বলল, 'সারা সকাল এত কার সঙ্গে টেলিফোনে আড্ডা মার? যখনই রিং করি এনগেজড় সাউণ্ড!'

নন্দিতা ভ্রূভঙ্গি করে, 'আহা আমিই যেন সকাল থেকে টেলিফোন নিয়ে বসে আছি। কেন বাবাকে প্রধান অতিথির পদে বরণ করবার জন্যে বরমাল্য হাতে ফাংশানীর দল নেই? পার্টির পর পার্টি?'

'সত্যি!' নন্দিতার প্রধান অতিথি বলে ওঠে, 'বড্ড বেশি সভা করছেন তোমার বাবা। কাগজ খুললে, দশটা সভার মধ্যে ছটায় তোমার বাবা। হেলথ্ খারাপ হয়ে যাবে।'

'তা'তে কী? সভাকারীদের সভাটা তো উজ্জ্বল হবে? বিস্তৃত বিবরণটা তো কাগজে বেরোবে? বাস্তবিক এত রাগ হয় বাবার এই ইয়ে'র সুযোগ নিয়ে কীভাবে ভাঙিয়ে খাচ্ছে সবাই ওঁকে। ...বাবার ধারণা—'কবি'র প্রতিই এত শ্রদ্ধা সম্মান তাদের। টার্গেটটি যে কে, বুঝতেই পারেন না। চোখে ধরিয়ে দিলেও মানতে চান না।'

বাবার 'বোকামি' না বলে, বাবার ইয়ে' বলে নন্দিতা সৌজন্য করে।

তবু নন্দিতার প্রিয়বান্ধব বলে ওঠে 'এই নন্দিতা, এটা বোধহয় তুমি ঠিক বলছ না। এতটা নয়। দেশের লোকেরা কবি সাহিত্যিক এঁদের খুব ভালোবাসে। সবাই দেখতে চায়, নিয়ে গেলে দর্শনার্থীর ভিড় জমে—'

'হতে পারে!' নন্দিতা হেসে উঠে বলে, 'এক্ষেত্রে কিন্তু আমার অনুমানই নির্ভুল। আমি তো হি হি বাবার একটা বিশেষণই আবিষ্কার করে ফেলেছি। বাবাকে বলি—'চাপরাশি'। বাবা কিন্তু মানে বুঝতে পারেন না, বলেন, 'চাপরাশি-চাপরাশি করিস কেন রে নন্দা?'

'তুমি একটি পয়লা নম্বরের অভব্য মেয়ে—' আগন্তুক বলে ওঠে, 'বাবা না তোমার?'

'তাতে কি? পৃথিবীটাকে যে চিনে ফেলেছি। সত্যি ওই চাপরাশটা খুলে পড়ুক, দেখবে এই সব শ্রদ্ধাসম্মান, কবি-প্রেম স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে।...পাড়ার ছেলেরা পর্যন্ত ওঁকে ভুলে গিয়ে মেয়র আর মন্ত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে?'

'বাঃ চমৎকার! পাড়ার ছেলেদের ওপর তো দেখছি অসীম শ্রদ্ধা তোমার। নিজের ভবিষ্যৎ খুব অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না।'

'প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে জয় লাভই বীরপুরুষের কাজ।'

'বীরপুরুষ' শব্দটা তো ঐতিহাসিক।'

'ইতিহাসের পাতা থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা কর। জান না বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।'

'ওটা বোকা বোঝানোর ছল। আসলে বসুন্ধরা চতুর-ভোগ্যা। কিন্তু বাজে তর্ক থাক, আমাদের ব্যাপারটার কী ভাবছ তাই বলো?'

'সব ভাবনাটা আমিই ভাবব?'

'বেশ আমিই ভাবছি। এই দণ্ডে গিয়ে বলছি তোমার বাবাকে।'

'থাক, অত বাহাদুরিতে কাজ নেই, বলবে ধীরে সুস্থে। সেবারে তোমাদের সরস্বতী পুজোয় প্যাণ্ডেলের কেলেঙ্কারিতে বাবা তোমার ওপর হাড়ে চটে গেছেন।'

'কিন্তু আমি বেচারা সবচেয়ে নির্দোষ ছিলাম।'

'সে কথা কে বোঝাবে। কিন্তু যাক—আমার শর্তটা মনে আছে তো? জীবনে কখনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা চলবে না।'

'ঠিক আছে?' বেহায়া ছেলেটা একটি ব্যঞ্জনাময় হাসি হেসে বলে, 'কথা দিচ্ছি কেবল অসংস্কৃতির অনুষ্ঠানই চালিয়ে যাব।'

নন্দিতা চাপা রাগের গলায় বলে, 'এই দণ্ডে বিদায় হও। অভব্য কোথাকার।'

'যেতাম না। শোধ তুলে যেতাম এই অপমানের। কিন্তু তোমার বাবা আসছেন—'

'বাবা। এই সমীর, লক্ষ্মীটি শীগগির। প্লীজ্। আমিই বলব, মুড্ বুঝে বলব।'

বাবার 'মুড্' লক্ষ করছিল নন্দিতা।

কীভাবে পাড়বে কথাটা।

কিন্তু মুড্ আর পায় না। অথচ হঠাৎ ঝপ্ করে বলে ফেললে হয়তো বলা হয়েই যেত। যেমন ঝপ্ করে বলে ফেললেন রাধিকানাথ, 'বুঝলি নন্দা 'মহৎ ভারতের' অফিসের দরজায় সেলাম ঠুকে চলে এলাম।'

মহৎ ভারতের দরজায় সেলাম ঠুকে চলে এলাম।

এ আবার কেমনতর ভাষা।

নন্দিতা অবাক হয়ে তাকায়।

রাধিকানাথ যেন ক্যানভাসারের যান্ত্রিক গলায় গড়গড়িয়ে বলে ফেলেন, 'বললাম, এই রইল তোমার সাব্-এডিটারি! এত ইয়ে হয়ে কখনও থাকা যায়! একটা কথা থাকে না, কোনো পরামর্শ কেউ গায়ে মাখে না, অথচ খেটে মরো ডবল। নাঃ পোষাল না স্যার! ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম।'

'ছেড়ে দিলে? কাজ ছেড়ে দিলে?'

নন্দিতা অবাক হয়ে কুল পায় না।

কিন্তু রাধিকানাথ আত্মস্থ।

'দিলাম! অপমান সয়ে টিকে থাকতে পারে মানুষ!'

নন্দিতা আরও অবাক হয়।

বাবার ওই কাগজের অফিসে কোনও দিন তো কোনো মতবিরোধ ঘটতে শোনেনি বাবার। হঠাৎ এমন কী ঘটনা ঘটতে পারে? অথচ এ মুহূর্তে জিজ্ঞেস করাও যায় না। বোঝা গেল না।

সমীরও সেই কথাই বলে 'বোঝা যাচ্ছে না। মাঝখান থেকে আমাদের ব্যাপারটাই গুবলেট্ হয়ে গেল।'

'আহা, গুবলেট আবার কী? বাবা 'মহৎ ভারতের' কাজ ছেড়ে দিয়েছেন বলে, আমরা বিয়ে করব না?'

'করতে দেরি হবে। ওঁর এই মন মেজাজ খারাপের সময়—'

'যাক তুমি আবার মন-মেজাজটা যাচ্ছেতাই করে বোসো না। বাবাকে নিয়েই ভাবনা—'

'ভয় নেই তোমার বাবা ফাংশান টাংশানেই দিব্যি ভুলে থাকবেন। অন্য অসুবিধে আর কি! বাড়ি ভাড়ার আয়টা তো রয়েছে—'

নন্দিতা কী বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। তাকিয়ে থাকে ঘাড় ফিরিয়ে।

'কী হলো? কী বলছিলে?'

'বলছি—ফাংশানে কি আর কেউ ডাকবে বাবাকে?'

সমীর বলে ওঠে, 'বাজে কথা বোলো না। আর তোমার ওই সন্দেহের কথাটি যেন এক্ষুনি বাবাকে গিয়ে বোলো না।'

'হয়েছে। মার চেয়ে মাসীর দরদ। যাক কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাক, যখন তখন এস না। বাবা তো বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেনই না। তোমায় দেখলে হয়তো—'

কথাটা নন্দিতার সত্যি।

বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না রাধিকানাথ। বলছেন, 'নিজের কাজ করবার সময় তো পাইনি কখনও ভালো করে,—এবার নিজের দিকে তাকাই একটু।'

তাকাচ্ছেন তাই রাধিকানাথ।

নিজের দিকে তাকাচ্ছেন। সারাক্ষণ কবিতার খাতা নিয়ে বসে আছেন।

অসুবিধেও নেই।

ব্যাঘাত আসছে না কোনওখান থেকে। যেন প্রতিমা বিসর্জনের শেষে পূজা মণ্ডপ। ঢাক-ঢোল, ঘণ্টা-কাঁসরের জগঝম্প গেছে থেমে। আয়োজন করে প্রণাম করতে আসা দূরের কথা পথে যেতে যেতে কেউ থমকে দাঁড়াচ্ছেও না।

কে জানে কেমন করে কোন তারে বেতারে বার্তা রটে। মোটকথা রটেছে। টের পাওয়া যাচ্ছে সেটা। টেলিফোনের রিসিভারের গায়ে ধুলো জমে, রাধিকানাথের ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি চাদরের পাটভাঙা হয় না। আর সেটা হয় না বলেই হয়তো রাধিকানাথকেই কেমন ভাঙাচোরা দেখায়।

এতদিনে যেন 'চাপরাশি' শব্দটার মানে বুঝতে পারছেন রাধিকানাথ। মাঝে মাঝেই ধরা পড়ে সেটা তাঁর কথা-বার্তায়।

যাচ্ছে দিন সপ্তাহ মাস, মাসের পরে মাস, সেই 'মানে'টা যেন পাথরে কেটে বসছে।

নন্দিতার বাবার তবে এতদিনে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে?

অতএব বলতে পারা যায় নন্দিতা খুশি হয়েছে?

কিন্তু নন্দিতাকেও তবে ভাঙাচোরা দেখাচ্ছে কেন আজকাল? নন্দিতা কেন বাবার দিকে তাকাতে পারছে না আজকাল?

নন্দিতা আগে হঠাৎ হঠাৎ একদিন বলতে চেষ্টা করছিল, 'বাবা এই তুমি সারাদিন বাড়ি আছ কেউ ডাকল না, আর যেই একটু বেরিয়েছ অমনি ফোন্!...কী না 'বেহালা থেকে বলছি'—নাম বলবে না কিছুতে। যেন বেহালায় একমাত্র তিনিই আছেন। যত বলি আমি তাঁর মেয়ে যা বলবার আমায় বলুন, কিছুতে না। রেগে মেগে দিয়েছি আচ্ছা করে শুনিয়ে।'

বেহালা, হাওড়া, দমদম, উত্তরপাড়া।

সব পার্টিকে 'আচ্ছা করে শুনিয়ে' দিচ্ছে নন্দিতা। কিন্তু লক্ষ করছে ওর বাবা বড় 'আচ্ছা করে' ওর কথা শুনছেন। দৃষ্টিটা অস্বস্তিকর। তাই সেই হঠাৎ হঠাৎ ফোন্ আসা'র গল্পটা ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে নন্দিতা।

রাধিকানাথই বরং হঠাৎ হঠাৎ বলেন, 'নাঃ স্বীকার করতেই হবে তোদের এই যুগটা বুদ্ধির যুগ।'

অবান্তরই বলে বসেন।

কিন্তু নিজের যুগের বুদ্ধির প্রশংসায় খুশি হতে পারছে না কেন নন্দিতা!

নন্দিতা কোনওদিন সমীরের কাছে আসেনি, সমীরই যায়।

তাই সমীর তদ্‌ব্যস্ত হয়।

'এ কি, তুমি? আর এই অসময়ে?'

'অপমান বোধ করছি সমীর। আমি আসা মানেই তো সুসময়'।

'অপরাধ স্বীকার করছি। কিন্তু—'

'সমীর!'...

'কী? কী হল বলত?'

'সমীর, অনেক দিন তো তোমরা সাংস্কৃতিক উৎসব কর না, সামনের পয়লা আষাঢ়ে 'মেঘদূত' উৎসব করতে পার তো?'

সমীর ওর নিচু করে থাকা মুখটার দিকে তাকায়। তারপর আস্তে বলে, 'শর্তটা প্রত্যাহার করে নিচ্ছ?'

'নিচ্ছি।'

'নন্দিতা তোমার ভবিষ্যৎবাণী সফল হওয়ায় তো তোমার খুশি হওয়ারই কথা।'

'সমীর দোহাই তোমার, থামো। কিন্তু এই শোনো, তুমি নিজে যাবে না খবরদার। তোমার ক্লাবের এই সাধারণ সম্পাদক না কে যেন তাকে পাঠাবে। তুমি শুধু টেলিফোনে যোগাযোগ করো—' নন্দিতার বড় বড় দু চোখের কোণে দু ফোঁটা জল জমে। নন্দিতা চুপ করে যায়।

ছুটি নাকচ

চোখের সামনে দিয়ে সাঁ করে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। ...... একটা? একটা দুটো তিনটে চারটে।...... হাঁ করে তাকিয়ে দেখে মালতী। যেন এ রকম স্বর্গীয় দৃশ্য জীবনে দেখেনি।....

দেখেনি। পুরো তিন তিনটে বছর দেখেনি মালতী রাস্তা, গাড়ি, পথচলতি মানুষ। ভাবতে গিয়ে বিশ্বাস হচ্ছে না। তিন তিনটে বছর মালতী তার জানা পৃথিবীর বাইরে একটা অদ্ভুত পৃথিবীতে কাটিয়েছে।...... আর এখন আরও অবাক লাগছে আবার সেই পুরোনো পৃথিবীতে এসে দাঁড়িয়েছে।...... হঠাৎ নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখে নিল মালতী ঘটনাটা সত্যি না স্বপ্ন।

কাল রাত্তিরেই সেই পাজিটা—মালতী জানে না তাকে কী বলে চিহ্নিত করতে হয়। সর্দার! না কর্তা? কে জানে? জানতে ইচ্ছেও হয়নি কোনওদিন। মনে মনে তাকে মালতী 'পাজি' টাই বলে। তা, সে কাল রাত্তিরে খ্যাক খেকিয়ে হেসে বলেছিল, 'কাল সকালে তো তোর ছুটি হয়ে যাবে রে মালতী।'

ছুটি। ছুটি হয়ে যাবে। মালতী এই গারদ থেকে ছাড়া পাবে? বিশ্বাস হয়নি। ..... সারারাত ভয়ানক একটা 'যন্ত্রণা'র মতো চিন্তায় জেগে কাটিয়েছে। ঘুমোতে পারেনি। বারে বারে ভেবেছে পাজিটা তাকে খেপিয়ে মজা দেখতে অমন একটা 'সুখবর' দেয়নি তো? মিছিমিছি করে?

কাল সকালে মালতী যখন জিজ্ঞেস করবে, 'কই ছুটি হল? তখন সেই শেয়াল হাসিটা হাসবে।...কিন্তু আজ সকালে সত্যিই এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটালো। কে কোথা থেকে বিশ্রী একটা কর্কশ স্বরে বলে উঠল মালতীদাসী ..... ঈ ঈ ছুট্‌টি।.....

তারপর কার সঙ্গে কীভাবে জেলখানার মধ্যে থেকে বার হয়ে জেল গেট-এর বাইরে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াল নিজেই বুঝে উঠতে পারল না। কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো চলে এল।.....

আসার আগে কয়েকটা চেনা মুখ দেখতে পেল। তাদের মুখে হতাশা। আবার হয়তো হিংসেও।...... কিছু একটা বলে উঠল দু একজন, কিন্তু মালতী ঠিক বুঝতে পারল না। নিজেও কিছু বলতে গেল, তাও বলা হল না। সঙ্গে পাহারাদারটা গরু তাড়ানোর মতো হেট হেট করে ঠেলে বার করে নিয়ে এল।

'ছুটি' হয়ে গেছে। ছাড়ান পেয়ে গেছে, তবু এদের এক্তারে যতক্ষণ থাকতে হবে এরা খানিকটা দুর্ব্যবহার করে নেবেই।

সেই তিন বছর আগে—

মালতী যখন শুনেছিল তার 'জেল' হয়ে গেল, মনে করেছিল জেলখানায় ঢুকেই গলায় দড়ি দেবে। .... মেয়েছেলে হয়ে জেল। কি লজ্জা। কি লজ্জা। তাদের বস্তিতে কোন মেয়েটার কপালে এমন ঘটেছে? মোটামুটি বস্তিটা গেরস্থবস্তি। ..... মেয়েপুরুষে সবাই খেটে খায়। ছেলেপুলে নিয়ে 'সংসার' করে। ...... হয়তো সবক্ষেত্রে পুরুষগুলো 'খেটে' খায় না, অথবা খেটে যা যা রোজগার করে তাতে মদ তাড়ি খায় এবং পরিবারের রোজগারে ভাতটা খায়। ... তবে খাটেও অনেকে। মেয়েগুলো সবাই খেটে খায়। সাত আট বছর বয়েস থেকে মায়েদের সঙ্গে বাবুদের বাড়ি কাজ করতে যায়। ছোট ছেলেগুলোও খাটতে বেরোয়। তবে রাতে ফিরে এসে একটা ডেরায় ঢুকে পড়ে ঘুমোয়।..... একখানা মাত্রই ঘরের সম্বল, তবু তার মধ্যেই জন্মমৃত্যু মিলনবিরহ এবং কলহ কোঁদলের লীলা চলে নিজ নিয়মে। আর তার মধ্যেই একটা 'সংসার সংসার' ভাব থাকে।

এইজন্যেই পঞ্চাননতলার ওই বস্তিটাকে 'গেরস্থবস্তি' বলা হয় এদের মধ্যে যে সব 'যুগলজীবনের' প্রবাহ তাদের মধ্যে তাদের সম্পর্কের বৈধতা নিয়ে বিশেষ প্রশ্ন ওঠে না। ও নিয়ে মাথা ঘামাতে আসবার সময় নেই কারও। অতএব বলা যায়, আজকের আমাদের দেশের শিক্ষিত নারী সমাজের মধ্যে 'নারীমুক্তির' পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহবন্ধনের ফাঁস থেকে মুক্ত হয়ে যে 'লিভ টুগেদার' প্রথার প্রবর্তনের দাবিতে আধুনিক পত্রপত্রিকা সোচ্চার, এরা সেই প্রথায় 'বিশ্বাসী' বহু আগে থেকেই। 'নিরক্ষর' এবং 'নারীমুক্তি' শব্দটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলেও।

এদের কাছে বর্তমানটাই সত্য।

কিন্তু মালতীরা এমন নয়। মালতী আর অমূল্য রীতিমতো বিবাহিত দম্পতি। জেলা হাওড়া সজনেপোতা'র অনন্ত গড়াইয়ের ছেলে অমূল্য গড়াইয়ের সঙ্গে পাশের গ্রাম চণ্ডীখোলার কেতু দাসের মেয়ে মালতী দাসের বিবাহ কালে নাপিত পুরুত, শঙ্খধ্বনি, কলাতলা, ছাঁদনাতলা সব কিছুই হয়েছিল। অথচ সেই মালতীরই এমনি কপাল, মেয়েছেলে হয়ে জেল হল। কি লজ্জা। কি ঘেন্না।.....

সরকারি জেলখানায় মেয়ে কয়েদীর অভাব নেই। কিন্তু এতটা জানা ছিল না মালতীর। তাই যখন হুকুমটা শুনতে পেল তখন তার মনে হয়েছিল, ভূভারতে এমন ঘটনা বুঝি এই একটাই ঘটনা.... অতএব গারদের মধ্যে ঢুকেই গলায় দড়ি।.... দড়ি না জোটে পরনের শাড়িখানা তো আছে? ওর ফাঁসেও কাজ হয়।

কিন্তু ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকে এসে তাজ্জব বনে গিয়েছিল মালতী। এত মেয়েছেলে জেলে ভর্তি?....... বুড়ি থেকে যুবতী গাদাগাদা মেয়ে।

দেখে শুনে 'শাড়ি দড়ি' ওগুলো আর তেমন ঠ্যালা মারল না মালতীকে। ভাবল, তাড়া কী? দেখাই যাক। শাড়িটা তো হাতে রইলই।

আর সেই দেখাটা দেখতে দেখতে দিনরাত মাসগুলো পার হতে হতে তিনটে বছরও কেটে গেল। অবশ্যই ঝরঝরিয়ে কেটে যাওয়া নয়, প্রতিক্ষণ কাটতে কাটতে কাটা।

তবু কাটল।

জেল গেট-এর বাইরে এসে মালতী উদভ্রান্ত হয়ে চারদিক তাকাল কোথায় সেই চিরপরিচিত মুখটা? .... খাঁড়া নাক চওড়া কপাল পেটানো শরীর ঢ্যাঙা গড়ন তামাটে রং মানুষটা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না ? মালতী যে আজ ছাড়া পাবে সে খবর তার জানা নেই।

অবিশ্যি ইদানীং আর অনেকদিন আসেনি অমূল্য। যা এসেছিল গোড়ায় গোড়ায় তা বলত আসতে যেতে অনেক সময় যায়, কাজের ক্ষতি হয়। পয়সাও তো কম খরচ হয় না? মালতী নিজেই বলেছিল তো নিত্যি আসার কাজ নাই। একেবারে সেই ছাড়ার দিনটাতেই চলে এস। ফেরার কালে দুজনায় মা কালীর স্থানে পুজো দিয়ে ঘরে ফিরব।

কিন্তু কোথায় অমূল্য?

ও কি তা'লে তারিখটা জানেনি?

বড় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এদিক ওদিক তাকায় মালতী। জেল কর্তৃপক্ষ তার হাতে একটা পুঁটুলি ধরিয়ে দিয়েছে বেরোবার সময় এটা নাকি মালতীর নিজস্ব সম্পত্তি জেলখানায় তোকবার সময় ওর সঙ্গে যা ছিল। ..... কী বা ছিল? তখন ভবি্যযুক্ত হতে গায়ে একখানা চাদর দিয়েছিল আর অমূল্য একখানা নতুন গামছা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। আর ছিল হাতে পরা একগোছা প্লাস্টিকের চুড়ি। এগুলো যে কেন খুলে রাখতে হয়েছিল জানে না মালতী। তবে এরা কিছু পয়সাও দিয়েছে রাহা খরচ বলে।

অমূল্য এল না। অনেকদিনই আসে নি।

শরীর গতিক ভালো আছে তো? ছেলেটাই বা কেমন থাকল? তিন বছরের ছেলেটা এতদিনে ষেটের ছ বছরেরটি হবার কথা।

ছেলেটাকে একবারও আনেনি অমূল্য।

মালতী যখন লোহার গরাদে মুখ চেপে কেঁদে ফেলে বলেছিল গোপলটারে একবার আনলে নাই?

অমূল্য উদাস ভাবে বলেছিল ওরে বলি নাই। বলেছি তোর মা বাপ-ঘর গেছে।

অন্যজনেরা কী আর না বলে ছেড়েছে?

বলেছে। সব্বাই ফিসফিস গুজগাজ করে আবার বলেও নিয়েছে। আমি গোপালকে বুঝিয়েছি, তোর মা বাপ-ঘর গেছে। বাপের ব্যামো।

কিন্তু বাপের ব্যামো কতদিন থাকে আর যদি সেই ব্যামো থেকে মুক্তি হয়, তখনও মাকে বাপ-ঘর থাকতে হয় কেন ? এ প্রশ্ন গোপাল তার বাপকে করেছিল কিনা সে-খবর পায়নি মালতী। মুখ্যু আর অভাগাদের ধৈর্য বেশি। তারা আপন জন বিদেশে গেলে দু-ছমাসে লোকমুখে একটা বার্তা পেলেও নিশ্চিন্ত থাকে। জানে, সেই যথেষ্ট ভাগ্যবানদের মতো সাগর পারে যাওয়া আপনজনেদের সঙ্গেও তড়িঘড়ি যোগাযোগের কথা ভাবতে পারে না।

মালতী মনিববাড়িতে দেখেশুনে হাঁ হয়ে যেত। মনিবগিন্নি টেলিফোন তুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলত। আর পরে বলত ছোটবোনের সঙ্গে কথা কইছিলাম।

কিন্তু কোথায় যে ছোটবোন ? কখনও তো দেখি নাই ?

ওমা দেখবে কোথা থেকে? সে তো বিলেতে থাকে।

বিলেতই বলত। মুখ্যুদের বোঝাতে সাগরপারের সকল দেশকেই বিলেত বলতে হয়। ওটাই ওরা বোঝে।

তা ভাগ্যমন্তদের তো-আবেগ ভালোবাসা মন কেমন সবই বেশি বেশি। বিলেতের ছোটবোনকে ডেকে যখন তখন কথা না কয়ে থাকতে পারে না।

মালতীদের কথা আলাদা।

মালতীদের অপেক্ষার শিক্ষা আছে। মালতী তাই দিন গুনেছে, আর ভেবেছে গিয়ে গোপালটারে কতটি ডাগর দেখব কে জানে তেমন কী আর হয়েছে ? কে যত্নআত্তি করেছে? অমূল্যর হাতেই তো হাঁড়ির ভার পড়েছে কী বা রেঁধেছে কী বা খেয়েছে বাপ বেটায়।.....

তার রং মিস্ত্রীর কাজটাও তো বজায় রাখতে হয়েছে ..... মালতী মনিববাড়ি মাস মাস আশিটাকা করে পেত। প্লাস দুবেলা বাড়ির চা রুটিটা বাঁচত সেটা তো গেছে।...

মনিবগিন্নির সুখ্যাতিতে শতমুখ হতে মালতী বস্তির সবাইকে ডেকে ডেকে গল্প করত।

মনিবগিন্নির বদান্যতায় মালতী কত রঙবেরঙের ভালো ভালো শাড়ি পড়েছে। .... আধপুরোনো হলেই দিয়ে দিত। .... মালতী বলত, ওরা তো আমাদের মতন বাঙালি না, বুড়োগিন্নিও রঙচঙা কাপড় পরে।

বাঙালি নয় বটে তবে কথাবার্তা আমাদের সঙ্গে আমাদের মতনই কয়। বরাবর এইখানেই তো। অমন মানুষ হয় না।

কিন্তু এখন?

এখন মালতী দু বেলা সেই মনিবগিন্নিকে শাপান্তর না করে জলগ্রহণ করে না। মালতীর জীবনটা ধ্বংস হল তো তার জন্যেই ঃ

অবশ্য মিথ্যে কথা বলব না মালতীরও লোভ হয়েছিল। কিন্তু এও বলতে হবে তার থেকেও বেশি হয়েছিল মায়া আর সমীহার। ...... অমন মানিমান্য মানুষটা মালতী হেন তুচ্ছ মানুষটার হাত ধরে কাকুতি মিনতি করছে। চোখের জল ফেলছে। এ দৃশ্য তাকে বিচলিত করেছিল।

নাঃ কোনওদিকে কোথাও অমূল্যর ছায়া নেই।

আস্তে আস্তে একলা একলা এগোয় মালতী। তাদের বাড়ির দিকের বাসের রাস্তাটা কোন দিকে? অনেকদিন পথে পা দেয়নি, এই সকালের আলোতেও কেমন গা ছমছম করছে।

হঠাৎ একটা লোক-এর ছায়া পড়ল সামনে ছায়াটা দীর্ঘ। কে ? অমূল্য আসছে না কি? লোকটাকে দেখে যেন আর তেমন সন্দেহ আসছে না। শাস্ত্রবাক্যের প্রভাব কিনা কে জানে।

মালতী আস্তে বলল, সে অনেক কথা। একের পারে আর-এক দণ্ড। তো কেসটা ছেলেচুরি।

ছেলেচুরি!

সেই তো-দুদিনের বাচ্চা। হাসপাতাল থেকে বার করে নিয়ে এসে—

হঠাৎ যেন মালতীর প্রাণের ভেতরটা উথলে উঠল। নিজের কয়েদের ইতিহাস জেলখানায় দুচারটে মেয়ে কয়েদীর কাছে করেছে বটে। তবে তারা তেমন বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয়নি।.... এ লোকটা মনে হচ্ছে বিশ্বাস করবে। ভিতরের আবেগ দুঃখ জ্বালা হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। আর অদ্ভুত একটা কাহিনী শোনাল! ..... অথবা অদ্ভুত নয়, ইহ সংসারে এমন আকছারই হয়। পঞ্চাননতলার মালতীর সেটা জানা ছিল না।

মালতী কাজ করত এক মস্ত বড়লোকের বাড়ি। কর্তার বড়বাজারে গদি আছে। গাড়ি আছে দু দুখানা। ..... কিন্তু নেই একটা জিনিস। তার নাম হচ্ছে শান্তি।

দু-দুটো ছেলে। তারা বাপের বিজনেস না দেখে বেশি লেখাপড়া শিখে পরের দোরে চাকুরি করাই ভালো মনে করে একজন দিল্লি আর একজন বোম্বাই গিয়ে বসে আছে বৌ ছেলেপুলে নিয়ে। .... তো একটা মাত্র মেয়ে সেও দূরে। বিকানিরে তার শ্বশুরের মস্ত ব্যবসা। কিন্তু মেয়েটার বছর ছ-সাত বিয়ে হয়েছে, ছেলে মেয়ে হয়নি।....

মেয়ের চিঠিতে জানতে পারছে এই জন্যে মেয়েটার শ্বশুরবাড়িতে গঞ্জনার শেষ নেই। স্বামী সুদ্ধু অনাদর অবহেলা করছে এবং শাশুড়ি শাসাচ্ছে আর একটা বছর দেখবে, তারপর ছেলের আবার বিয়ে দেবে।..... ছেলেমেয়ে নাহলে ডিভোর্স দেওয়া আইনে আছে। ..... এইরকম চলছিল। আর মেয়ে ভয়ে কাঁটা হয়েছিল। তো ভগবানের দয়ায় এতদিন পরে তার সন্তানসম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। .... শরীর খুব খারাপ শাশুড়ি বৌকে মা বাপের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এবং শাসিয়েছিল..... 'মেয়ে' কোলে করে ফেরা চলবে না। ছেলে চাই। বংশের বংশধর। এত সম্পত্তির মালিকটা কে হবে, যদি বৌ ফেলিওর হয়।

কিন্তু ভাগ্যের নির্লজ্জ পরিহাস।

সেই উৎপীড়িতা মেয়ের পুত্র সন্তানই হল, কিন্তু অকালে মৃত।

মেয়ে হয়তো তখন আত্মহত্যা করে বসত। যদি উঠে বসার ক্ষমতা থাকত। আগলে আগলে রেখেছেন বৃদ্ধা মহিলা। তখনই তিনি বাড়ির বাসনমাজুনি ওই মালতীর কাছে কেঁদে পড়লেন, যেমন করে হোক একটা সদ্যোজাত ছেলে বাচ্চা এনে দিতে হবে তাঁকে।

এর জন্য তিনি মালতীকে নিজের গলার একছড়া দশভরির পাকা সোনার হার করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যেখানে যত ঘুস লাগে তা দেবেন।.....

তোদের বস্তি থেকে হোক কোনও অখ্যাত হাসপাতাল থেকে হোক হাসপাতালের আয়ার সঙ্গে আঁতাত করে অথবা জমাদারনিদের ঘুস খাইয়ে।

মালতীর বিবেক চিন্তাকে প্রশমিত করতে যুক্তিও দিয়েছিলেন, আরে বাবা, হাসপাতাল থেকে কুকুর শেয়ালে 'বাচ্চা' তুলে নিয়ে যাচ্ছে, অসাবধান আয়াদের অবহেলায় কত বাচ্চা মরেই যাচ্ছে। আর যদি বা টিকছে তো ওই সব দীন দুঃখীর ঘরের বাচ্চারা কুকুর বিড়ালের মতো 'মানুষ' হচ্ছে। ... এদের একটাকে যদি ওই আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এনে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দাও, সেটা পাপ না পুণ্যি।....

যে ঘরানার মহিলার পা ছুঁতে সাহস হবার কথা নয় মালতীর মতো দরের লোকের, তিনি মালতীর হাত ধরে আবেদন করলেন এবং মিনতি করলেন যেন কাকপক্ষীতে টের না পায়।

মালতী অবশ্য কাকপক্ষী জনসমাজ কাউকে টের পেতে দেয়নি। শুধু জানিয়েছিল স্বামীকে। বলেছিল, ভেবে দেখো সত্যি পাপ না পুণ্যি?...... তাছাড়া ওই দশভরি সোনা হাতে পেল তুমি এই রং মিস্তিরির কাজ আর পঞ্চাননতলা বস্তি ছেড়ে দিয়ে দেশে ঘরে গিয়ে আগের মতন দোকান দিয়ে গুছিয়ে বসবে।

লোকটা অবাক হয়ে বলেছিল, দেশ, ঘর আছে না কি?

এ প্রশ্নেরও উত্তর অনেক কথায়।... 'আছে' নয় বটে, তবে ছিল। চিঁড়ে মুড়কি খই বাতাসা আর গুড়ের দোকান ছিল..... কিন্তু বছর দশেক আগের সেই আকালের বছরে অন্ন অন্ন করে হাহাকার। কোথায় চিঁড়ে মুড়ি খই মুড়কি ? .... তার উপর আবার অভাবের সময় যা হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে জমির ধান চালের ভাগ নিয়ে বচসা। আর এদিকে জায়ে জায়ে কোঁদল।

ধুত্তোরি। রোজ রোজ এই অশান্তি। 'এর থেকে শহরে গিয়ে দুই মনিষ্যি হাতে পেয়ে খেটে জেবন কাটবো'—বলে বৌকে নিয়ে চলে এসেছিল অমূল্য।

তখনও গোপাল জন্মায়নি, তাই দুই মনিষ্যি।

তা চলছিল তো ভালোই।

যদিও অমূল্য মাঝে মাঝে বলত, দূর এই বস্তির কিচকিচিনি আর ভালো লাগে না।..... তবে রঙের কাজটা ভালোই শিখে নিয়েছিল। হঠাৎ ওই মনিবগিন্নির রূপ ধরে কালগ্রহ এসে আছড়ে পড়ল মালতীদের জীবনে।

মনিবগিন্নির দেওয়া (খরচা বাবদ) এক হাজার টাকার অর্ধেকটা অমূল্যর কাছে রেখে বাকি অর্ধেকটা দিয়েই কাজ ম্যানেজ করে ফেলেছিল মালতী। সাঁতরাগাছির এক নেহাত দীনহীন হাসপাতাল থেকে।

জমাদারনিরই মাধ্যমে। তো সে পরমানন্দে টাকাটা আঁচলে বেঁধে নিয়ে যা বলেছিল তার সারমর্ম হচ্ছে ঃ এতে মালতীর অধর্ম নেই। ওই যে আধুবুড়ি মেয়েছেলেটা? কুলিবুস্তির বাসিন্দে। পাঁচসাতটা ছেলেমেয়ের মা ওটা। তো নেই ঘরেরই তো খাঁই বেশি? তাই আবার এসেছে হাসপাতালে ছানা পাড়তে। .... বছরে বছরে একবার করে আসে, কিন্তু ছানা পাড়ে

যেন বেড়ালছানা। ফুটফুটে নাদুসনুদুস।.... তারপর সেগুলো হাড় চামড়া সার হয়ে আধ উলঙ্গ মূর্তিতে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। নিয়ে যাও এবারেরটাকে। কুকুরে নিয়ে গেছে বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে।

তো হয়ে গিয়েছিল সবটাই।

ন্যাকড়া মোড়া দিন দুইয়ের বাচ্চাটাকে নিয়ে রিকশায় উঠেওছিল মালতী সন্ধে সন্ধে সময়। রিকশাওলার কাছে 'নিজের বাচ্চা' বলে চালিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। বোধহয় ওই জমাদারনিদের মধ্যেই কারও সঙ্গে বখরার ভাগ নিয়ে বচসা হওয়ায় সে ফাঁস করে দিল।...

মনিববাড়ির কাছ বরাবর এসে ধরা পড়ে গেল মালতী। ...

কিন্তু মালতী মন্ত্রগুপ্তির শপথটি পালন করেছিল। বলেছিল, নিজেরই লোভ হয়েছিল। স্বীকারোক্তির পর আর তাকে কেউ ছাড়ে?

মালতীর দণ্ডাদেশ হয়ে গেল।

এই রকম সব ছোটখাটো আসামি দিয়ে জেল ভরতে পারলেও জেলখানার একটা মান মর্যাদা বজায় থাকে।.....

আরও একপ্রস্থ চা নেওয়া হয়েছিল। তারপর উঠে পড়া মালতী চলতে চলতে বলল, কথাগুলো তবু একজনার কাছে বলতে পেরে মনটা একটুক হালকা হল। তো নিজের কথাই সাতকাহন। ..... তোমার বিত্তান্ত তো কিছু জানা হল নাই।

আমার আবার বিত্তান্ত। 'জেল' আমার জল ভাত।

অ্যাঁ। আরও হয়েছে?

তবে আমার কী? ভাড়াটে গুন্ডা। কোনওখানে জমি দিয়ে লাঠিবাজি করতে দরকার পড়লেই এই নিকুঞ্জর ডাক পড়ে। তো এবার ভুলক্রমে একটা বড় পার্টির লোকের মাথা ফাটিয়ে মরে কয়েদটা হয়ে গেল। কেউ ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না।

মালতী অবাক হয়ে দেখল। লোকটা কত সহজে দোষ কবুল করল।

নাম তাহলে নিকুঞ্জ? ..... দেশ ঘর কোথায়?

দূর! দেশও নাই, ঘরও নাই।

আহা কোথাও তো একদিন জন্মেছিলে? মা বাপও ছিল?

নাঃ। ওসব কিছু দেখি নাই। নিজেকে ভুঁইফোঁড় বলেই জানি। ....নাও চল চল কোথায় তোমার পঞ্চাননতলার নন্দীবাবুর বস্তি।.....

কিন্তু কোথায় সেই পরমধাম?

মালতীর চোখের ওপর যার ছবিখানি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।......সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে বেড়ার গায়ে নিজের যে ফুলছাপ ব্লাউজটা আর গোপালের নীলরঙা হাফ প্যান্টটা মেলে দিয়ে এসেছিল সেটাও বুঝি দেখতে পাবে এই ব্যগ্রতা নিয়ে বাস থেকে নেমে হনহনিয়ে এগিয়ে এসেছিল।

কিন্তু কোথায় কী?

রাস্তা ভুল করে অন্য কোথাও চলে এল না কি মালতী?

নিকুঞ্জ বলল, তোমার বোধহয় বিস্মরণ হয়ে গেছে গো। অন্যদিকে হবে।

বিস্মরণ ? বললেই হল? এইতো এই ইস্কুল বাড়ি তারপর যদুর মুদিখানার দোকান..... তারপর

তারপর? তারপর আর কী উঁচু উঁচু বাড়ি.....নতুন রং করা জানলা দরজা, বারান্দায় রঙিন শাড়ি ঝুলছে। জানলায় জানলায় পর্দা।....এইসব দরজা জানলা রং করেছে কে?

মালতী দিশেহারা হয়ে উর্ধ্বমুখে সেইখানেই পাক খেতে থাকে।

নিকুঞ্জই দোকানি পশারিদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে এল খবরটা।

নন্দীবাবুরা বস্তি উঠিয়ে জমি বিক্রি করে চলে গেছে। সেখানে এইসব ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে।

আর বস্তিতে যারা ছিল?

তাদের সন্ধান কে রাখতে গেছে?

কাউকে কিছু বলে যায় নাই?

কে কার জামাই বোনাই? অ্যাঁ?.... কে কার কড়ি ধারে?

মালতী রাস্তার মাঝখানেই চেঁচিয়ে উঠে বলল, এত গুলান গেরস্থ ছানাপোনা নিয়ে উচ্ছেদ হয়ে গেল কেউ একবার কারও ঠিকানাটাও জানতে চাইল না? এমন পাষাণ পাড়া? মায়া নাই? রিদয় নাই?

যাদের কানে গেল তারা পাগলি ভেবে ফ্যাকফেকিয়ে হেসে চলে গেল।

এখন কী করবে?

নিকুঞ্জ পথের ধারে একটা পুরোনো বটগাছের গুঁড়ির ওপর বসে বিড়ি ধরিয়ে বলল, তোমার নন্দীবাবুর বস্তি তো ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে একটা পরীর রাজ্য বসিয়ে দিয়েছে।

এখন?

মালতী এখন হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, ওরে গোপালরে।.....তোরে কে কমনে কোথায় নিয়ে গেল রে?

নিকুঞ্জ নীরবে বসে বসে বিড়িটা শেষ করতে লাগল। কোনো সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করল না।

একসময় নিজেই থামল মালতী।

তারপর বলল, তবে আর জেবনধারণে কাজ কী? যাই মা গঙ্গার কোলে জুড়োইগে। শেষমেশ তুমি আমারে গঙ্গার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও। তারপর তোমার ছুটি। নিকুঞ্জ বলল, তো চল। আমারও মজ্জা ঝাঁ ঝাঁ করছে। একটা ডুব দিয়ে নিইগে।

তা ডুব দিয়ে কি শুধু নিকুঞ্জই উঠল?

মালতী উঠল না?

তা অবশ্য হল না।

নিকুঞ্জ বলল, এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয়? ডুবটা সেরে দুজনই এই পৈঁঠেয় বসে ভিজে কাপড় জামা গায়ে শুকিয়ে নিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখি, কাছপিঠে কোথাও ভাতের হোটেল আছে কিনা।

পয়সা আছে অত?

হয়ে যাবে।

তো আমার কাছে যা আছে ন্যাও। আড়াইটে টাকা দিয়েছে দেখছি।

নিকুঞ্জ হাসল, বাকি আড়াইটে মেরে দিয়েছে আর কী!

ভাত জুটল। ডাল ভাত আর একটা ঘ্যাঁট। তো, তাই অমৃত। একটা করে পানও খাওয়া হল।

মালতী কী যেন একটা কারখানার শেড-এর ধারে পা ছড়িয়ে বসে পড়ন্তবেলার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—এতক্ষণ তো যা হোক হল। এইবার? রাত হলে কোথায় আছ্রয়? জেলখানার মধ্যে তো তবু এ ভাবনা ছিল না।

নিকুঞ্জ সেই কালো কুচকুচে মুখে সাদা দাঁত বিকশিত করে হেসে উঠে বলল, যাবে না কি আবার? বলো তো চল হাজতে ঢুকিয়ে দিয়ে আসতে পারি।..... আমার অনেক দোস্ত স্যাঙাত আছে।

মালতী বলল, গলায় দড়ি।

তারপর মালতী এক আকাশ ছোঁওয়া আবদার করে বসল।

এই দিনভোর আমায় নিয়ে অনেক নাটাঝামটা খেলে। চেনা না জানা নয়। আপনজনের অধিক করলে। তো শেষমেশ আমায় একটা ঠাঁই পৌঁছে দাও। তারপর তোমার ছুটি।

কোনখানে? অ্যাঁ?

কোনখানে আর? সেই জেলা হাওড়া, গ্রাম সজনেপোতা, ঈশ্বর অনন্ত গড়াইয়ের বাটি। ওই একটা ঠিকানাই তো মুখস্ত মালতীর।

আঁচলে চোখ মুছে বলে মালতী, মন নিচ্ছে বস্তি উচ্ছেদের জ্বালায় ছেলেটাকে নিয়ে সেখানেই গেছে মানুষটা। তবু তো সেখানে খুড়িটা জ্যেঠিটা রয়েছে। ছেলেটাকে দেখবেই হেলায় ছেদ্দায়।..... তো, এখান থেকে খুব দূর না। ওই হাওড়ার গুমটি থেকে বাস ছাড়ে। বাস গাড়ির গায়ে লেখা থাকে—চন্ডীতলা, সজনেপোতা, বাকুলি—

জানি, জানি। ওসব জায়গা আমার খুব চেনা আছে।

অ্যাঁ তাই বুঝি? তবে তো ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। সেখানে আমারে একটুক পৌঁছে দাও।....বুঝছি তোমার ওপর খুব জুলুম হচ্ছে। কিন্তু আমার একটা ব্যাবোস্তা না করেও তো তোমার ছুটি নাই।

অমূল্য গড়াইয়ের পরিবার মালতী গড়াইয়ের একটা ব্যাবোস্তা না করে ভাড়া খাটা গুন্ডা নিকুঞ্জ দাসের ছুটি নাই কেন? এ প্রশ্ন মাথায় আসে না মালতীর।

নিকুঞ্জ বলল, জুলুমের কথা হচ্ছে না। তবে তোমার সজনেপোতার গড়াই বাড়ি যদি নন্দীবাবুর বস্তির মতন উবে গিয়ে বসে থাকে, সেই ভাবনা।

মালতী আশ্বাসের গলায় বলে, গাঁয়ে ঘরে অমন শহর বাজারের মতন দুমদাম চেহারা পাল্টায় না। বিশ পঞ্চাশ বছর একইভাবে থাকে।

তবে আর কী করা? রাতটুকু এই বন্ধ কারখানার মোড়-এর ধারে পাশে একইভাবে বসে থেকে ভোরবেলা বাস ধরা। যে বাসের গায়ে লেখা থাকে চন্ডীতলা সজনেপোতা বাকুলি।

তা মুখ্যু হলেও একটা বিষয়ে বোধ বুদ্ধি আছে বই কী মালতীর।.......

গ্রাম গঞ্জের চেহারা যে বিশপঞ্চাশ বছর প্রায় একইভাবে থাকে সেটা খুব ভুল নয়। বাইরের দিকে যদি বা এদিক ওদিক হচ্ছে ভেতরের দিকটা একই রকম রয়ে যায়।

বাস থামবার মুখোমুখি মালতী প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, দ্যাখো দ্যাখো আমি বলি নাই 'এক রকম ভাব থাকে'। ... ওই তো শেতলাতলা পার হয়ে গেল ওই তো বুড়োশিবের থান' ... ওই তো সেই হেলে পড়া বটগাছটা—

নামবার জায়গায় কিছুটা ভিড় কিছুটা কোলাহল। চায়ের দোকানের সামনে মাটির ভাঁড়ের তৎপরতা।

নিকুঞ্জ বলল, এবার পথ চেনার ভার তোমার। চিনে যেতে পারবে?

মালতী সভয়ে বলল, তুমি আমার এখান থেকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবে?

না তা যাব নাই।...... এখানেই আছি ফেরত-বাস পর্যন্ত। গাঁয়ের বৌ এতদিন বাদে একটা পরপুরুষের সঙ্গে ফিরলে এটা লোকে ভালো চক্ষে দেখবে না।

ঠিক। কথাটার যৌক্তিকতা আছে।

মালতী দু পা এগিয়ে বলল, তুমি নয় ততক্ষণ দোকানের ধারে গিয়ে একটু চা-টা খেয়ে নাও।

সে আমি বুঝব। ..... ঘণ্টা দুই বাদে ফেরত-বাস ছাড়বে। তুমিও ততক্ষণে যদি ফিরে না আস বুঝব তোমার শ্বশুরের ভিটেটা উপে যায়নি।....

তবু মালতী একটু দাঁড়ায়।

কী হল? পথ মনে পড়ছে না?

না না। সে খুব মনে পড়ছে। বলছি, তালে তো তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে নাই?

নিকুঞ্জ বিড়িতে আগুন ধরাতে ধরাতে বলে, আর দেখা হওয়ায় কাজ কী? একদিনের বন্ধু বই তো না।

মালতী তথাপি ইতস্তত করে বলে, তা বটে। তবে তুমি আমার এতটা উপগার করলে আর বাড়ির দোর থেকে অমনি মুখে ফিরে যাবে? যতই হোক গেরস্থ বাড়ি—

নিকুঞ্জর কাষ্ঠ-কঠিন মুখে একটু সুক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে। তবে বেশ স্বচ্ছন্দ গলায় বলে, বেশ তো গিয়ে যদি তেমন জুত বরাত দেখ, জলপানির রেকাব সাজিয়ে কাউকে দিয়ে ডাকিয়ে পাঠিও। .... এখানেই তো রইলাম।

সে তোমায় চিনবে?

ভাবতে হবে না আমিই চিনে নেব।

বলে একটা খুঁটি ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে।......

কিন্তু শ্বশুরের ভিটেটা উপে গেছে কিনা, সেটা দেখবার জন্য কি মালতীকে ভিটে বরাবর যেতে হল।

হঠাৎ সামনেই শ্বশুরবংশের বংশধর। মালতীকে দেখে প্রায় ছিটকে উঠে বলল, কে?

মালতী এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিগলিত গলায় বলল, যা মন নিয়েছিল তাই। ঠিক বুঝেছি, নন্দীবাবুর বস্তি উচ্ছেদে ছেলে নিয়ে এখানেই এসেছ।....বলে কিনা গড়াইবাড়ি উপে যায় নাই তো? কাল ছাড়া পেলাম।

অমূল্য গড়াইয়ের মুখটা কঠোর কঠিন হয়ে ওঠে। দাঁতে পেষা চাপা গলায় বলে, কাল 'ছুটি' হয়ে গেল তাই আজই ছুটতে ছুটতে এখানে এসে ধাওয়া করা হল ? আচ্ছা আসপদ্দা তো। ..... কয়েদখাটা মেয়েছেলে, গড়াইবাড়ি ঢুকতে এসেছ?

মালতী কেমন ফ্যালকা মুখো হয়ে তাকায়, লোকটা অমূল্যই তো? আস্তে বলে, তো আর কোথায় যাব?

কেন যমের বাড়ি ছিল না? যমের বাড়ি? গলায় দড়ি দিতে পারনি? যাও যাও। খবরদার আর এগোতে চেষ্টা করবে না।

আমারে তাড়িয়ে দেচ্ছ?

আরও চাপা গলায় হিসহিসিয়ে ওঠে অমূল্য, না তো কী, ঘানি ঘুরিয়ে আসা চোরচোট্টা পরিবারকে মাথায় করে ঘরে নিয়ে যাব? যাও। যাও।

আসলে ভয়ানক অস্বস্তি পাছে কেউ দেখে ফেলে। লোক জানাজানি হবার আগে ঠেলে পার করে দিতে পারলে বাঁচা যায়। অন্য সময় এখানে তেমন লোক চলাচল নেই, কিন্তু এ সময় যথেষ্ট আছে। বাস থেকে লোকে নামে, এখান থেকে কড়েয়া আনাজপাতি শাকসব্জির ঝাঁকা নিয়ে কলকাতামুখো ট্রাকে তুলে দিতে যায়। ..... মালতী যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, বিছে কামড়াবে অমূল্যকে।

মালতী কেঁদে ফেলে বলে, চুরি চোট্টামি আমি নিজের জন্য করি নাই। তোমার জন্যিই করেছিলুম। তা বেশ ঘানি ঘোরানো পরিবারকে ধুলো পায়ে বিদেয় দেওয়া যদি ধর্মে হয়, তো দাও। তো আমার গোপালকে আমারে দাও।

গোপালকে। বটে বটে। সাধে বলছি আসপদ্দা। ঈশ্বর অনন্ত গড়াইয়ের নাতিকে তোমার হাতে তুলে দেবে? বেশি দিক বোকো না বলছি। যাবে? না গলাধাক্কা দিতে হবে?

মালতী চোখ মুছে শক্ত হয়ে বলে, অতটা করতে হবে না। গোপালকে একবার চোখের দেখা দেখে যাই। আঃ এ তো ভালো ঝামেলায় পড়া গেল। গোপাল জানে, তার মা মরে গেছে। গাঁয়ের লোকও তাই জানে। এখন হঠাৎ তার মরা মায়ের পেত্নী নামিয়ে নাটক করতে বসব নাকি? তুমি যাবে কিনা?

ততক্ষণে দু একটি লোক এসে জুটে গেছে?

কী হয়েছে? অ্যাঁ? কী হয়েছে?

আর বলো কেন? কোথা থেকে একটা পাগলি এসে—যত বলছি সরে পড় নড়ছে না।

তাই না কি? তাই না কি?

এগিয়ে আসে ওরা উৎফুল্লভাবে। আহা 'পাগল' 'পাগলি' বড় খাশা জিনিস। বিনা খরচে কিছুক্ষণ আমোদ করে নেওয়া যায়।.....কিন্তু সে সুযোগ হয় না তাদের। ততক্ষণে মালতী উল্টো পাক খেয়ে হন হন করে বাসগুমটির কাছে এগিয়ে যায়।

নিকুঞ্জ একটু হেসে বলল, কী হল? শ্বশুরের ভিটে উপেই গেছে তো?

মালতী হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, হ্যাঁ।

নিকুঞ্জ অনাসক্ত গলায় বলল, এক্ষুনি একটা কাঁচাবাজারের ট্রাক ছাড়বে। ড্রাইভারটাকে পটিয়ে রেখেছি কচু কুমড়ো ঝোড়ার খাঁজে খাঁজে একটু বসতে দেবে।

বাজার ট্রাক। খোলা ব্যাপার।

নিকুঞ্জ আগে নিজে উঠে পড়ে শির ওঠা কেঠো হাতখানা বাড়িয়ে মালতীর একখানা হাত ধরে হিঁচড়ে ওপরে তুলে নিয়ে একটু খাঁজ দেখিয়ে বলে, বসে পড়।

মালতীর মনে পড়ে না লোকটা ওই কেঠো হাতখানা দিয়ে একটা মানুষের মাথা ফাটিয়ে বছর চারেক জেল খেটে বেরিয়েছে। মালতীর এখন দড়ি কি শাড়ি এ-ও মনে পড়ল না আস্তে বলল, তোমার তালে আর ছুটি হল নাই?

কই আর হল?

আবার একটা বিড়ি ধরাল।

চারদিকে নানা কোলাহল। তার মধ্যেই মালতী আবার এক সময় নিঃশ্বাস ফেলে আপনমনে বলে, একদা এই সজনেপাতা থেকেই দুই মনিষ্যি মনের খেদে বেরিয়ে পড়েছিলুম যা আছে ললাটে বলে, আজও আবার সেই ঘটনা, সেই বিত্তান্ত।

তাসের ঘর

কথাটা তুলিল তরঙ্গিণী সকালবেলা কুটনো কুটিতে বসিয়া। মমতা জ্বলন্ত উনানে হাঁড়ি চাপাইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল, চাল ধোওয়ার গামলাটা নিয়ে কুটনো কুটতে বসেছ ঠাকুরঝি! দাও দিকি চট্ করে।

ঠাকুরঝি কথাটায় কান না দিয়া আঙ্গুলের আগায় থোড়ের সূতা জড়াইতে জড়াইতে কহিল—দাদা কাল কত রাতে বাড়ি এল বৌ?

মমতা থমকিয়া কহিল, কই কাল তো আসেননি ভাই। বিয়ে বাড়ির হাঙ্গামে খেয়ে দেয়ে ন'টার গাড়ি ধরা কি সহজ? ভোরের দিকে একটা ট্রেন আছে বলছিলেন, তা'তেই বোধ হয়—

তরঙ্গিণী চোখে মুখে বিস্ময় ফুটাইয়া বলিল—দাদা আসেন নি কাল? বল কি বৌ! আমি যে নিজের কানে শুনলাম—

কি শুনলে?

ভারী ভারী গলার আওয়াজ, ভাবলাম ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেছে বোধ হয়। রাত তখন দুটো আড়াইটে হবে, ফিরে গিয়ে হিমিকে বললাম 'তোর বাবা বোধ হয় বাড়ি এল—নারে হিমি?'

মমতার বড় মেয়ে হিমানী কাছে বসিয়া হেঁট মুখে শাক বাছিতেছিল, পিসির কথার উত্তরে সাড়াও দিল না, মুখও তুলিল না।

তাহার পানে এক নজর চাহিয়া অল্প বিরক্তভাবে মমতা বলিল, আজগুবি গল্পগুলো পরে হবে, এখন দাও তো গামলাটা, ভাতের জল ফুটে গেল।

ভাত সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া তরঙ্গিণী না-ছোড়ভাবে কহিল, তা ছাড়া পষ্ট দেখলাম যে বৌ, ভবানীর ঘরের দেওয়ালে তোমার জানালা থেকে ছায়া পড়েছে; দুজন মানুষের ছায়া—নারে হিমি? ও, ও উঠলো কিনা জল খেতে।

বারে বারে কন্যাকে সাক্ষ্য মানায় মমতার হঠাৎ খেয়াল হইল তরঙ্গিণীর ইহা নিছক কৌতূহল মাত্র নয়, খুঁচাইয়া জেরা করিবার মতো। রাগে আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া যায়।

তবে বোধ করি ভূত দেখে থাকবে ঠাকুরঝি—দেখ রাম নামের মাদুলিটা হারিও না যেন—বলিয়া কঠিন মুখে রুষ্ট হাসি হাসিয়া গামলাখানা উঠাইয়া লইয়া গেল।

তখনকার মতো কথাটা ওইখানেই চাপা পড়িল। সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া গেলে হয় তো গোল মিটিয়া যাইত, কিন্তু কথাটা 'পাঁচ কান' করিবার ইচ্ছা মমতার ছিল না। তরঙ্গিণীকে বলা আর

'দৈনিক আনন্দবাজার'-এ ছাপাইয়া দেওয়ার মধ্যে বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। সময়ই বা কোথা? সেজ দেওর আটটায় ভাত খায়, হিমুর স্কুলের 'বাস' আসে সাড়ে আটটায়। তাহার পর, পরে পরে চলিতে থাকে, সাড়ে দশটা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না।

স্কুলের ছেলে কয়টাকে চালান করিয়া দিয়া তবে ছুটি, তখন দুই দণ্ড পা মেলিয়া বসিয়া, চা খাওয়া, জল খাওয়া, গল্পগাছা করা চলিতে পারে।

প্রায় নয়টার সময় তরঙ্গিণীর দাদা সুধাংশু আসিয়া পৌঁছিল।

পকেট হইতে এক তাড়া 'প্রীতিউপহার' বাহির করিয়া ভগ্নির দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, তরু, দে তো একটু তেল, নেয়ে নিই। খাওয়া আর হচ্ছে না—যাক দরকারও নেই, যা সাংঘাতিক রাত হল কাল বাপস্! ভদ্রলোকে যায় রেলের রাস্তায় নেমন্তন্নে? রাম বলো। কই গামছা?

আধ মিনিটে স্নান সারিয়া উপরে উঠিয়াই হাঁক পাড়িল—আমার কাপড় কোথা গেল? খোকা—বল তো আমার কাপড় কই?

মমতা রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, খোকন, বল তো আনলাতেই তো আছে সরু মুগাপাড় ধুতিখানা—যা ব্যস্তবাগীশ মানুষ, দেখতে পেলে হয়।

লোভ হইল এই ছুতায় উঠিয়া গেলে হয় একবার, প্রায় আঠারো উনিশ ঘণ্টা দেখা নাই, বিরহ লাগে বই কী। কিন্তু লজ্জা করে, অল্প বয়সের চাইতে এখন বেশি বয়সের লজ্জার বাধা আরো দুর্লঙ্ঘ্য।

সুধাংশু অবশ্য ততক্ষণে আর একখানা কাপড় সংগ্রহ করিয়া নামিয়া আসিয়াছে।

অতঃপর আর আধ মিনিট ভাতের থালার সামনে একবার বসিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়!

কিন্তু বিধাতাপুরুষ ব্যক্তিটি রসিক। এই শান্তিপূর্ণ নিরীহ সংসারটির স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার উপর কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহার সহসা বোধকরি রহস্য প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল—

মমতার ছোটবোনের ভাসুরপো নিমাই ম্লানমুখে আসিয়া কহিল, বড় মাসিমা, মা বললেন আপনাকে এখুনি একবার যেতে—খুড়িমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

মমতা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল, তাই নাকি! কখন থেকে রে নিমাই? খুব বুঝি বেশি কষ্ট হচ্ছে?

হুঁ বোধহয়। মা পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে নিয়ে যেতে।

মমতার ছোট বোন সবিতার শ্বশুরবাড়ি এবাড়ি হইতে অধিক দূর নয়। তাহার বড় জা ভীরু স্বভাবের লোক, আগেই বলা ছিল সবিতার প্রসবকালে মমতাকে লইয়া যাইবেন।

ভিজা হাত গামছায় মুছিতে মুছিতে মমতা বলিল, তা'হলে একখানা রিক্‌শ ডাক্ না বাবা।

ছোটকাকা গাড়ি নিয়ে এসেছেন যে। আপনাকে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার বাড়ি যাবেন। নিন তাড়াতাড়ি।

মমতা তরঙ্গিণীকে ডাকিয়া কহিল, তাহলে তুমি একবার এদিকে এস ঠাকুরঝি, সবই হয়ে গেছে, মোটা চালের ভাতটা হবে শুধু, আর চচ্চড়িটা চড়ানো রইল, নামিও। মা বোধহয় আহ্নিকে বসেছেন, বোলো ব্যাপারটা...কখন ফিরতে পারি বলা যায় না। ভালোয় ভালোয় যাতে হয় তাই বল...কইরে নিমাই চল্ বাবা, দুর্গা। দুর্গা।

তরঙ্গিণী ভ্রাতৃবধূর গমনপথের পানে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া অস্ফুট সুরে মন্তব্য করিল, 'ঢলানি!'

অথচ কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তরঙ্গিণী এমন উক্তি মুখে আনিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না।

বিজলী ছেলের দুধের বাটি লইতে আসিয়া রান্নাঘরে তরঙ্গিণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বড়দি কোথা গেলেন ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি নিজের জন্য ও মায়ের জন্য দুইটি বড় পাথরের গ্লাসে চা ছাঁকিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়া কহিলেন—

এ সংসারে কে কখন আসে যায়, সব খবর তো রাখা দায় মেজবৌ! রাখলেও বিপদ।

'ভূত দেখার' উপহাসটা তখনও হজম হয় নাই।

বিজলী কথাটার তাৎপর্য না বুঝিলেও দাঁড়াইবার সময় ছিল না, ছেলে কাঁদিতেছে।

সুশীলাবালা আহ্নিকপূজা সারিয়া এতক্ষণে নীচে নামিলেন, তৃষ্ণার্তের মতো পাথরের গ্লাসের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, বড়বৌমাকে দেখছিনে কেন তরি।

বাবা, তোমার বড়বৌমার হিসেব দিতে দিতে গেলাম। বোনাই-বাড়ি গিয়েছেন গো, বুনের দেওর আদর করে গাড়ি করে নিয়ে গেলেন।

সুশীলাবালার নাকি মেয়ের চাইতে বৌয়ের উপর টানটা অধিক, এমনি একটা বদনাম ছিল; বিশেষ করিয়া বড়বৌমাকে যে অত্যন্ত সুনজরে দেখিতেন একথা মিথ্যা নয়।

শুধু তিনি বলিয়াই নয়—সদা হাস্যমুখী, নিরলস, কর্তব্যপরায়ণা বধূটিরও যেমন গুণের সীমা ছিল না, তেমনই ঘরে পরে এমন কেহ ছিল না যে, তাহাকে ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারে।

হাসিয়া গল্প করিতে, যত্ন করিয়া খাওয়াইতে, রোগের সেবা করিতে, তাহার জুড়ি ছিল না। লজ্জা-সরমের হয়তো একটু কমতি ছিল, কিন্তু তাহার সরল নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের কাছে 'বেহায়া' নামটা ঘেঁষিতে সাহস পাইত না।

কন্যার রাগে হাসিয়া ফেলিয়া সুশীলাবালা প্রশ্ন করিলেন—তোর তাই হিংসা হচ্ছে না? বোনের ব্যথা উঠেছে বুঝি? আহা তা যাবে বই কী, কথায় বলে—মা বোন। মা নেই, কাছের গোড়ায় বোন রয়েছে, যাবে না?

তবে আর কি, ধেই ধেই করে ছুটতে হবে যার তার সঙ্গে, তোমার আস্কারাতেই তো গোল্লায় গেল। বুকের পাটা কত।

খালি গ্লাসটা নামাইয়া একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে মা বলিলেন—অমন কথা বলিসনে তরু, বৌমা আমার লক্ষ্মী।

কাজ নেই অমন লক্ষ্মীতে, লক্ষ্মীর গুণ জানলে আর-তরঙ্গিণী মুখখানা বাঁকাইল।

অতঃপর 'গুণ জানাজানি' হইয়া গেল, সারাদিন ধরিয়া অপরাধিনীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়িতে আলোচনার ঝড় বহিতে থাকিল। এবং বিজলী ভিন্ন প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বাস করিতে কষ্ট হইলেও করিতে দ্বিধাবোধ করিল না, বড়বৌয়ের স্বভাব চরিত্র সন্দেহজনক। দুর্ভাগ্যবশত এমন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যাহার উপর আর কথা চলে না।

আঠারো বৎসর যাবৎ মমতা যে শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভালোবাসা, সুনাম অর্জন করিয়া আসিতেছে, মুহূর্তের অবিবেচনায় তাহার ভরাডুবি করিয়া বসিল।

হিমাংশু বৌকে সাবধান করিতেছিল—'দিদি, দিদি', করে অত গলে পড়া চলবে না, বুঝলে? উনি যদি সাবধান না হন অগত্যা আমাকেই পথ দেখতে হবে।

বিজলী উত্তেজিত হইয়া বলিল, মাগো তোমরা বাড়িসুদ্ধ সব পাগল হয়ে গেলে নাকি? এই কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে?

প্রবৃত্তি হয় না-ই বটে, তবে মেয়েমানুষকে বিশ্বাসও নেই।

বিজলীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—তবে আমাকেও ঘাড় ধরে বিদেয় করে দাও না—বিশ্বাস কি, মেয়েমানুষ বইতো নয়!

দরকার হলে তাও পারি, আমি দাদা নই!

অতিমাত্রায় পত্নীপ্রেমিক বলিয়া সুধাংশুর বরাবরই একটু অখ্যাতি ছিল।

বিজলী বিরক্তি গোপন করিতে পারিলি না, কহিল—দাদার মতন হলে তরে যেতে। সে যাক, তোমার বোনটিও তো মেয়ে বই পুরুষ নয়, বিশ্বাস কি? যদি মিথ্যে করে বলে থাকে?

লাভ তার?

দিদির ওপর ওর চিরকাল হিংসে।

কাপড়জামাগুলো হিংসে করে কুড়িয়ে এনেছে বোধ করি?

বিজলীর আর উত্তর জোগায় না।

রহস্যই বটে।

সবিতারও আক্কেল দেখ, আজিকার দিন ছাড়া আর দিন পাইল না। দিদি থাকিলে বিজলী কাঁদিয়া পায়ে ধরিয়া রহস্যের মূলসূত্র বাহির করিয়া ছাড়িত। কিন্তু তাহা হইবার নয়। যিনি জট পাকাইবার তিনি বসিয়া বসিয়া পাকাইতেছেন। কে ছাড়াইবে।

সুশীলাবালা কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন—আমি তখনি জানি ও মেয়ে একদিন কি সর্বনাশ ঘটাবে। মেয়েমানুষ অত বাচাল। মাথার কাপড় ফেলে রাজ্যির লোকের সঙ্গে পাটি পেড়ে গল্প, 'হ্যা, হ্যা' করে হাসি, কে বা জানে আপন, কে বা জানে পর। যে আসছে তাকেই চা খাওয়ান, জল খাওয়ান, আদর উথলে পড়ে। মেয়েমানুষ অত লোকমজানে হওয়া কি আর সুলক্ষণ?

মমতার ছেলেটার অনেক ভাগ্য তাই ম্যাট্রিক একজামিন দিয়ে বড় পিসির বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছে। হিমানীর সম্মুখে কেহ 'রাখিয়া ঢাকিয়া' বলিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিল না।

যাহাকে লইয়া এই তুমুল আন্দোলন, সে বেচারি সারাদিন দুশ্চিন্তায় অনাহারে যমে-মানুষে টানাটানি করিবার পর শিশু ও প্রসূতিকে নার্সের হেফাজতে রাখিয়া গঙ্গাস্নানান্তে যখন বাড়ি ফিরিল রাত্রি তখন অনেকটাই হইয়াছে।

স্নানান্তে উহাদের বাড়ি হইতে আহার করিয়া তবে ফিরিবার কথা ছিল, ফিরিবার পথে মমতাই জোর করিয়া বাড়ির দুয়ারে নামিয়া পড়িয়াছে। স্বামীর উপর সূক্ষ্ম একটু অভিমানের সহিত উৎকণ্ঠাও জাগিতেছিল। নিশ্চিত জানিত সুধাংশু আসিয়া খবরটা শুনিলে, সবিতার বাড়ি ছুটিবে। কি জানি, গত রাত্রের অনিয়মে শরীর ভালো আছে কিনা।

সবিতার সেই ছোট দেওর পৌঁছাইতে আসিয়াছিল, হাসিয়া কহিল—দেখছেন তো মমতাদি, বাড়িতে আপনাকে কারুরই দরকার নেই। সকলেই খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। বেশ হয়েছে, খেতে পাবেন না। সারাদিন জলস্পর্শ করলেন না—বৌদি ভারী দুঃখিত হবেন কিন্তু।

রাগ দুঃখু করতে মানা কোরো ভাই, আমি একদিন গিয়ে চেয়ে খেয়ে আসব, সবু ভালো হোক।

বাড়ির চাকর আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিতেই নজর পড়িল বাহিরের ঘরে কে ক্যাম্প খাট পাতিয়া শুইয়া আছে। বিস্মিত হইয়া কহিল—শুয়ে কে রে সুবোধ?

আজ্ঞে বড়বাবু।

বড়বাবু! সেকি নীচে কেন রে?

কেন তাহা সুবোধও জানে না, বিছানা নামাইয়া আনার হুকুম তামিল করিয়াছে মাত্র। বুদ্ধি খাটাইয়া কহিল—আপনি আসবেন বলে বোধ হয়।

মর্ মুখপোড়া—মৃদু হাসিয়া ভিজা কাপড়খানা চাকরের হাতে দিয়া মমতা ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে আন্দাজি শায়িত ব্যক্তির পিঠে হাত রাখিয়া বলিল, আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছ

বুঝি? সেই জোগাড়ই হয়ে উঠেছিল আর কি—আসতে দেবে না কিছুতে। আমার তো আবার জানই, রাত্তিরে বুড়োটিকে ছেড়ে থাকতে পারিনে—লোকের ঠাট্টা তামাসায় কান না দিয়ে চলেই এলাম।

সুধাংশু পিঠটা সরাইয়া লইল মাত্র, কথা কহিল না।

মমতা ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, বুড়ো বয়সে অভিমান তো কম নয়! হয়েছে, ওঠ। একবার গেলে না ও-বাড়ি—কি কষ্টই পেলে 'সবিটা'—হলেন তো এক মেয়ের 'ঢিপি'—ভোগান্তির একশেষ।

এত কথার একটিও উত্তর না পাইয়া বিস্মিত মমতা বিছানার একপ্রান্তে বসিয়া স্বামীর হাতখানা কোলের উপর টানিয়া লইয়া সস্নেহস্বরে বলিল, কি হয়েছে গো, শরীর ভালো নেই?

বিরক্ত করো না, বাড়ির ভিতর যাও। হাত ছাড়াইয়া পিছন ফিরিয়া শুইল সুধাংশু।

মমতা আহত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এত রাগের কারণ কী! আপনার লোকের বিপদে আপদে মানুষ যাইতে পাইবে না নাকি?

কিন্তু এ সব মান অভিমানের পালা লোকচক্ষে প্রকাশ করিয়া এ বয়সে খেলো হইবার মতো স্বভাব তো স্বামীর নয়। ব্যাপার কি? আরো কোমল অনুনয়ের স্বরে কহিল, যাচ্ছি, কিন্তু তুমি সত্যই এখানে শোবে না কি? ওঠ ঘরে চল।

ওঘরে ঢোকবার প্রবৃত্তি আমার নেই, তোমার সঙ্গে কথা কইবারও নয়, যাও সরে যাও।

অনাহারক্লিষ্ট শ্রান্ত শরীরে স্বামীর এরূপ অভূতপূর্ব নিষ্ঠুর আচরণে মমতার চোখে জল আসিল, ধরা পড়িতে না দিয়া কহিল, অপরাধটা শুনতে পাই না?

অপরাধের প্রমাণ ঘরে পুষে রেখে যে ন্যাকামির ভান করে, তার সঙ্গে তর্ক করবার রুচি আমার নেই। চালাকি শিখেছিলে বটে, তবে শেষরক্ষা হল না।

মমতার এতক্ষণে মনে হইল—তরঙ্গিণীর সকালবেলার জেরার সহিত ইহার সংযোগ থাকিতেও পারে। কিন্তু—ছিঃ-ছিঃ। মাতালের মতো টলিতে টলিতে উঠিয়া অপরাধের প্রমাণ খুঁজিতে হঠাৎ চোখে পড়িল খাটের পাশে একখানা কাদামাখা অর্ধমলিন খদ্দরের ধুতি ও তদনুরূপ একটি পাঞ্জাবি জড় হইয়া পড়িয়া আছে। ...ব্যাধতাড়িত পশুর মতো পুলিসের তাড়া খাইয়া যে ছেলেটা গতরাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য এঘরে আশ্রয় লইয়াছিল, সে যে নিজেকে নিরাপদ করিতে এক ফাঁকে পরিচ্ছদগুলা বদলাইয়া লইয়াছিল সেই খবরটাই মমতার জানা ছিল না। হয়তো যখন বাহির করিয়া দিবার আগে কেহ জাগিয়া আছে কিনা দেখিতে গিয়াছিল—

স্তব্ধ অনড় মমতার কেমন করিয়া যে বসিয়া বসিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল সে কেবল তিনিই জানিলেন, যিনি অলক্ষ্যে বসিয়া সকলের সুখ-দুঃখের হিসাব লইতেছেন।

* * * *

রুদ্ধশ্বাস বিজলী শুনিতে শুনিতে চমকিয়া বলিল, বল কি দিদি, তোমার মামাতো ভাই! বোমার মামলার সেই নিখিলেশ! জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছে।

হ্যাঁ।

বিজলী বড়জাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—কেন তুমি চুপ করে থাকবে দিদি, কেন সবাইকে বলবে না বুঝিয়ে? শুধু শুধু নিজেকে শাস্তি দেবে?

মমতা শুষ্ক হাসি হাসিল, সে কাল হলে বলতাম মেজবৌ, আজ আর হয় না।

কেন হয় না দিদি, ধর্ম কি নেই? এই অবিচারটা স্বচ্ছন্দে চলে যাবে?

তবে চল্ তোকে উকিল খাড়া করে, করযোড়ে ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করিগে।

এত দুঃখেও ঠাট্টা-তামাসা আসে দিদি? ধন্যি বটে, ভূতেই পেয়েছে তোমায়, বিনা প্রতিবাদে এই মিথ্যেটা মেনে নেওয়াই কি বুদ্ধির কাজ হ'ল?

কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা সব সময় সহজ নয় মেজবৌ! এতদিন যাকে পরম সত্য বলে জেনে এসেছি, দেখছি কি মিথ্যেই সেটা! আজ যদি মিথ্যেটাই সত্যি হয়ে দাঁড়ায় ক্ষতি কি?

ক্ষতি তোমার মুণ্ডু—হিমুর মা তুমি বিনি দোষে এই অপমানটা সইবে?

অপমান যা হয় তা আর ফেরে না বিজলী, কি বোঝাব ওদের? যদি বলে "বিপদে পড়ে এখন একটা গল্প রচনা করে এলে", সে অপমান সইবে না।

বিজলী বোকা, বিজলী অবুঝ, চোখের জল তাহার সস্তা। বলে, তাই কি হয়?

কিন্তু হইবে না কেন, আঠারো বছর ঘর করার পর মমতা সম্বন্ধে যাহাদের একথা বিশ্বাস করিতে বাধে নাই, ওটুকু তাদের কাছে খুব বেশি কি?

* * * *

যে হতভাগ্য ছেলেটা দুইদণ্ড আশ্রয় লইতে আসিয়া তাহার চিরদিনের আশ্রয় ভাঙিয়া দিয়া গেল, বিজলীর মতো মমতা তাহার উপর রাগ করিতে পারে না।

যে ভঙ্গুর ঘরখানা নিয়মিত একটি ফুৎকারে ধূলি গুঁড়ি হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর মমতার আর মমতা নাই।

* * * *

যাইবার বেলায় সুধাংশু বলিয়াছিল, এরকম ভাবে চলে গেলে আমাদের মান সম্ভ্রম কোথায় থাকবে বুঝতে পারছ?

মমতা উত্তর করিয়াছিল—পারছি, কিন্তু ও জিনিসটা যে শুধু তোমাদের একলারই নেই, সেটাও ভুলতে পারছি না।

মেয়ের বিয়ে দেওয়া দায় হবে তা জান?

হয়তো হবে—কিন্তু আমার নয়। এ সংসারের উপর আমার আর কোনো দায় নেই।

মানুষের মন কঠিন হইলেও দুর্বল বই কী। সুধাংশুর চোখে জল আসিতে চায় কেন?

কোথায় যাবে ঠিক করেছ মমতা?

মমতা তাকায় নাই, মুখ ফিরাইয়া বলিয়াছিল, ঠিক কিছুই করিনি। এত বড় পৃথিবীটায় একটা মেয়েমানুষের ঠাঁই হয় কি না সেটাই একবার দেখব ঠিক করেছি।

ত্রাণকর্তা

মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখতে চেষ্টা কর দেবু, জগতে সবাই সত্যি অসৎ নয়। হয়তো পরিবেশের চাপে—

সত্যব্রত তাঁর স্বভাবগত ভারী আর খাদে-নামা গলায় বললেন, আমি বলছি ছেলেটা জাত অপরাধী নয়। পরিবেশের চাপেই—

সত্যব্রতর গলার স্বর যেমন গভীর গম্ভীর, পুত্র দেবব্রতর গলার স্বর তেমনি হালকা আর চড়া। দেবব্রত অনেকটাই তার মার মতো। মায়ে ছেলে দুজনেই সত্যব্রতকে 'মিনমিনে' এবং ভাববিলাসী বলে অভিহিত করে থাকে।

অতএব এখন বাপের এই মানবিকতায় আশাবাদী বাক্যটি দেবব্রতর কাছে 'অমৃতং বালভাষিতং এর মতোই মনে হল। এবং নিজস্ব স্বাভাবিক চড়া গলাকে আর একটু চড়িয়ে বলে উঠল দেবব্রত, আপনার ওই সত্যযুগমার্কা মহৎ চিন্তাটিন্তা এযুগে অচল বাবা। পাজিটাকে থানায় জমা দিয়ে তবে আমার কাজ। বিশ্বাস।। মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখবার চেষ্টা করতে হবে! কোথায় আছেন আপনি এখনও? কোন স্বর্গীয় স্বপ্নলোকে বাস করছেন?

সত্যব্রত একটু হাসলেন। বললেন, হয়তো মুর্খের স্বর্গেই। তবু 'স্বর্গসুখটা' তো লাভের খাতায় জমা পড়ছে। অগাধ অনন্ত নরকের থেকে এমন কি খারাপ?

দেবব্রত আরও চড়ল। বলে উঠল, আমি বলি—খুব খারাপ। একটা মিথ্যা রঙের রঙিন চশমা পরে সংসারটাকে দেখে সন্তোষ পাওয়া শুধু বোকামিই নয়, মিথ্যাচারও। আপনি কি বলতে চান আজকের পৃথিবীতে আপনি সব মানুষকে বিশ্বাস করেন?

সত্যব্রত আবারও হাসলেন। বললেন, 'করি' এমন কথা বলতে পারব না, তবে বিশ্বাস করার, বিশ্বাস রাখার চেষ্টা করি। অবশ্য আজকের 'কেসে' চেষ্টা করে নয়, আমি সত্যিই বিশ্বাস করছি, ছেলেটা জাত অপরাধী নয়।

দেবব্রতর গলার স্বরে ব্যঙ্গের আভাস ফুটে উঠল। দেবব্রতর ঠোঁটের কোণটা একটু কুঁচকে গেল।

দেবব্রত বলে উঠল, যদিও ছেলেটা পাকা চোরদের মতোই রেন্‌ওয়াটার পাইপ বেয়ে ছাতে উঠে বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকেছে।

আহা সে তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে—

'কথাটা কি হচ্ছে' সেটা আর বলে উঠতে পারলেন না সত্যব্রত। রান্নাঘরের দিক থেকে

চলে এসেছেন নীহারকণা। পিতা পুত্রের বাক্যালাপের কিছুটা তাঁর কানে ঢুকেছে। তাই এই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব।

নীহারকণার হাতে একটা ভিজে গামছা, সেটাকে ঝাড়তে ঝাড়তেই চলে এসেছেন, এবং সেটাকে অহেতুকই ঝাড়তে ঝড়তে বলে ওঠেন, কী কথা হচ্ছে রে দেবু? ওই লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটাকে পুলিসে না দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে?

দেবব্রত ব্যঙ্গ আর ক্ষোভের গলায় বলে ওঠে, ছেড়ে দিতে হলেও তো ছিল ভালো! ওকে বাড়িতে রাখতে হবে, মহৎ ব্যবহারের দ্বারা ওকে সংশোধন করা হবে।

নীহারকণা চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, তাই তুই শুনবি? লোকটার মাথাটা যে একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, তা টের পাচ্ছিস না? রাখ ওর কথা। এই দণ্ডে মিচকেটাকে থানায় জমা দিয়ে আয়। কে বলতে পারে, ওর সূত্র ধরেই একটা বড় গ্যাং ধরা পড়ে যাবে কি না! নে, চা খেয়েই বেরিয়ে পড় সন্তোষকে নিয়ে। হাতের বাঁধন খোলার আগে একবার দেখে নিস, পকেটে ছুরিফুরি আছে কিনা?

সত্যব্রত চমকে উঠে বললেন, হাত বেঁধে রাখা হয়েছে না কি?

নীহারকণা জোর গলায় বললেন, তা হবে না? হাত খোলা থাকলে কি না কি করতে পারে ঠিক আছে?

সত্যব্রতর খাদে নামা গলা থেকে একটা কথা উঠে এল, ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা দেওয়া হয়েছিল কিনা?

তা তো ছিল। বলি তালা খোলা মাত্তর যদি ছুরিফুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাপকে বিশ্বাস করতে আছে? দেবু যা। বৌমা চা নিয়ে বসে আছে। খেয়ে নিয়েই, ওই পাপকে বিদেয় করে আয়।

নীহারকণা যত সহজে বলতে পারলেন, 'লোকটার' মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওর কথা ছাড়, দেবব্রত অবশ্য তত সহজে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

স্ত্রী যত সহজে দাপুটে কথা বলতে পারে, পুত্র তা পারে না। কারণ একজনের হতমান্য হলেও অপমান নেই, অপরজনের এতটুকু এদিক-ওদিকেই অপমান। বিশেষ করে বিবাহিত পুত্রের।

তাই দেবব্রত মায়ের এই জোরাল নির্দেশের পরও বাঁকা গলায় বলল, বাড়ির কর্তার হুকুম না পেলে তো আর যাওয়া সম্ভব নয়।

বলে চলে গেল। বোধহয় চা নিয়ে অপেক্ষা তার উদ্দেশে।

ব্যাপারটা জটিল।

গতকাল রাত্তিরে, প্রায় মাঝ রাত্তিরেই, এক ঘুম থেকে উঠে নীহারকণার মনে হল, জানলা দিয়ে যেন আসন্ন বৃষ্টির মতো জোলো জোলো হাওয়া আসছে। এইটি মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাল সন্ধ্যাবেলা কুলের আচারের থালাটা ঘরে তোলা হয়নি।

বুকের ওপর দিয়ে বৃষ্টি বয়ে গেলে, কুলের আচার যে, 'কুলাঙ্গার' হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নাস্তি। ত্যাজ্য করা ছাড়া উপায় থাকবে না। মনে হতেই নীহারকণা আলস্য ত্যাগ করে সেই রাত দুপুরেই মরতে মরতে ছাদে উঠেছিলেন।

সিঁড়ির দরজায় ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া থাকে। সেটা খটাৎ করে খুলে ফেলে যেই না দরজাটা হাট করেছেন, স্পষ্ট দেখতে পেলেন চোখের সামনে থেকে কে যেন একজন ফস করে সরে গেল।

নীহারকণা এমন ভীতু নন যে ভূত ভাববেন। অতএব ফট্ করে ছাদের সামনের আলোর সুইচটা অন্ করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে র‍্যা? কে ওখানে?

ওখানে 'যে', সে অবশ্য সরে এসে বলে উঠল না, 'আমি'। নীহারকণা তাই পরিত্রাহী চিৎকার করে উঠলেন 'চোর!' 'চোর!'

অতএব আশেপাশে 'বাতায়ন খুলি যায় ঘরে ঘরে, ঘুমভাঙা আঁখি ফুটে থরে থরে—' আর এদিকে বাড়ির সবাই হন্তদন্ত হয়ে (শব্দ লক্ষ করে) ছাদে উঠে এসেছে। প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু হাতিয়ার! কর্তার ছেলের বৌমার এবং ভৃত্য সন্তোষের।

বেচারি চোরটার আর পালাবার উপায় রইল না, হাতে হাতে ধরা পড়ল।

বছর বারো তেরোর একটা কাদাখোঁচা চেহারার হ্যাঙলামার্কা ছেলে। পরনে একটা সুতো ঝুলে পড়া হাফপ্যান্ট আর গায়ে একটা পিঠছেঁড়া গেঞ্জি।

সন্তোষ তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে আলোর মুখোমুখি দাঁড় করাল। আর সেই সময় সকলেরই মনে হল, মুখটা যেন চেনা চেনা লাগছে।

কে তুই?

ছেলেটা ঘাঁড় গুজে সন্তোষের বজ্রমুষ্টি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল কেউ না।

কেউ না! ব্যাটা পাজি শয়তান। বল কে?

বলানো অবশ্য গেল না। তবে নীহাকণার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রশ্নের উত্তরটাই আবিষ্কার করে ফেলল। নীহারকণার চাঁচাছোলা গলার প্রশ্নটা রাতের আকাশকে বিদীর্ণ করে ঠিকরে উঠল, তুই পারুলের ছেলে কানাই না?

ছেলেটা ঘাড় গুঁজে থেকেই এবং হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে কিছুক্ষণ পরিচয়টা অস্বীকার করার চেষ্টা করল। 'পারুল' কে তা কস্মিনকালেও জানে না, বলল, তার পরই হঠাৎ কেঁদে ফেলে গর্জন করে উঠল, হাতটা ভেঙে দেবে নাকি? ছেড়ে দ্যাও বলচি।

সত্যব্রত বললেন, ছেড়ে দাও সন্তোষ। ওই পাঁকাটির মতো হাড় ভেঙে যেতেও পারে।

সন্তোষকে অতএব ছাড়তেই হল।

ছেলেটা হাতটায় ফুঁ দিতে দিতে বলে উঠল, উঃ। এমন মোচড় দেবে! যেন ইস্‌কুরুপের প্যাঁচ মারচে। আঙুল না সাঁড়াশি।

নাঃ। এ ছেলে পারুলের ছেলে কানাই না হয়ে যায় না। কথার ভঙ্গিই সঠিক চিনিয়ে দিয়েছে।

পারুল একদা এ সংসারে বাসনমাজুনি ছিল। কানাই নামের বছর আড়াই তিনের ছেলেটাকে নিয়ে কাজ করতে আসত। এবং ছেলেটার হাতে ধরিয়ে দেওয়া বাসি রুটি অথবা শুকনো পাউরুটির টুকরোটা শেষ হওয়া মাত্রই এমন চেঁচাতে শুরু করত যে, সত্যব্রত হাতের খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে বিপন্ন গলায় বলতেন, ওরে বাবা, এ কানাই না সানাই! তো ওকে কিছু দাও না।

নীহারকণা রেগে বলতেন, আসা মাত্তরই দেওয়া হয়েছে।

তবু আবার দিতেনও চারটি মুড়ি মুড়কি, কি দুখানা মিয়োনো বিস্কুট। না দিয়ে উপায় কী? ছেলের চেঁচানির জ্বালায় যদি কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে যেতে বাধ্য হয় পারুল। ভারি পেয়ারের লোক পারুল নীহারকণার। যেমন পরিষ্কার কাজ, তেমনি নম্র ব্যবহার। যত বেশি কাজই পড়ুক, কখন বেজার হতে জানত না।

নীহারকণা বলতেন, তার ছেলেটা আর একটু বড় হলে ইস্কুলে ভর্তি করে দেব পারুল, চেঁচানি কমবে।

তা বড় হয়ে চেঁচানি ক্রমশ কমেছিল। তবে ইস্কুলে ভর্তি করে নয়। ইস্কুলের নামে কানাই শতহস্ত দূর। সেই ভয়ঙ্করের হাত এড়াতে কানাই, 'গেরস্থর' কাজ করতে বসত টেনে টেনে।

ইঃ। দাদুর জুতো জোড়া কি ধুলো ধুস্কুস্তি। বাড়িতে কি একখান বুরুশও নাই?

খুঁজে পেতে বুরুশ এনে ঝাড়তে বসত।

ইস। খবরের কাগজগুলো সিঁড়িতে ডাঁই করে কে রাখে? দেখতে বিচ্ছিরি লাগে না?

বসে বসে চোস্ত করে কাগজগুলো পাট করে, থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখত সিঁড়ির জানলায়। চটজলদি কাজও করত।

ওরেব্বাস। এখেনে জল ফেলে ঢেউ দিয়েচে কে? মানুষের আচাড় খেতে খুব মজা হবে কেমন?

কোথা থেকে একটা ন্যাতার টুকরো জোগাড় করে মুছতে বসত!

তো এই ছেলেকে কে ইস্কুলে পাঠাতে যাবে? ক্রমেই বালক ভৃত্যের পোস্টটা প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল। তখনও এ সংসারে সন্তোষের আবির্ভাব ঘটেনি। আবির্ভাব হয়নি 'বৌমার'ও। বড় আরামেই দিন যাচ্ছিল নীহারকণার। কিন্তু এমনি কপালের ফের নীহারকণার, ভরন্ত বয়েস জলজ্যান্ত পারুলটা কিনা একদিনের 'ভেদবমি' হয়ে মরে গেল।

নীহারকণা কপালে করাঘাত করে লোকের কাছে আক্ষেপ করতে লাগলেন, 'বাসনমাজুনি কাপড়কাচুনি কাজের লোকেরা ছেড়েই যায় জানি, 'মরে' যায় এমন শুনেছ কখনও? মনে মনে ভাবতুম, এবার ওর মাইনেটা একটু বাড়িয়ে দেব।'

তা বেচারী পারুল তার স্নেহময়ী মনিবানির মনের এই শুভবাসনাটির খবর না জেনেই চলে গেল। নীহারকণার চোখে সর্ষেফুলের ক্ষেত! কানাইয়ের মা মরায় পিসি এসে নিয়ে গেল। তখন কানাইয়ের বছর সাতেক বয়েস!

এতদিন পরে সেই কানাই।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। প্রবল জেরার মুখে।

চোর হয়ে উঠেছিস পাজি? আর এই বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিস? নেমকহারাম পাজি।

পাজিটার জোর গলার প্রতিবাদ, কখনও সে চুরি করতে ঢোকেনি। শুধু—

কী শুধু? বল! বল শয়তান শুধু কী?

ওরা বলল, তুই এ বাড়ির সন্দান সুলুক জানিস, কোনও প্রকারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে দুয়োরটা খুলে দে। তালে পাঁচটা ট্যাকা পাবি। উঃ! খুব শিক্ষে হয়েচে। ট্যাকা তো জুটবে কাঁচকলা, লাভের মধ্যে হাতখানাই গেল।

এহেন বাক্যিবুলির পর ছোঁড়াটা যে চড়চাপড় গাঁট্টা খাবে না, এমন তো হতে পারে না। বিশেষত যেখানে দেবু এবং সন্তোষ উপস্থিত। বেশ মোক্ষম মোক্ষম থাপ্পড়ই পড়েছে। এবং তার সঙ্গে পুলিসে দেবার শাসানি।

প্রহারের বহর দেখে সত্যব্রত না বলে পারেননি, এখানেই যদি হতভাগাকে ফিনিশ করা হয় দেবু, তো কাকে আর পুলিসে দেবে? আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়াও একটা অপরাধ জানো তো? পুলিস যদি ওর গায়ে মারের দাগ দেখে, হয়তো আমাদেরও ধরে চালান করে দিতে পারে।

পুলিসের ভয়ে না হোক বাবার প্রতিবাদে বিরক্ত হয়েই প্রহারটা ছেড়ে দিয়েছিল দেবু। অগত্যা সন্তোষও। এবং তখনি নীহারকণা নির্দেশ দিয়েছিলেন নেমকহারামটাকে এখন সিঁড়ির নীচে কয়লার ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দে দেবু। সকালে পুলিসে দিয়ে আসবি।

তখন পাপিষ্ঠ কানাই সতেজে প্রতিবাদ করে উঠেছিল, পুলিসে ক্যানো? আমি তোমার কিছু চুরি করিচি?

এ সময়ে সত্যব্রত বলে উঠেছিলেন, চুরি না করেছিস, চুরির সাহায্য করেছিস কি না? দরজা খুলে দেওয়ার মানে কি? জানিস না, মানে? ছি! ছি পাঁচটা মাত্র টাকার লোভে তুই—

কানাইয়ের তেজের আগুনে জল পড়ে গিয়েছিল। আর সেই জলের কয়েক ফোঁটা তার চোখ দিয়ে ঝরে পড়েছিল।

'পাঁচটা মাত্তর ট্যাকা'। আহা! তিন দিন পেটে দানা না পড়লে বুজতে ঠ্যালা।

নীহারকণা কড়া গলায় বলেছিলেন, দেখছ আস্পদা। বলি পেটে তিনদিন দানা পড়ে নাই বা কেন? তোর বাপটাও মরেছে নাকি?

তা একপ্রেকার মরেইচে। কোতা থেকে একখান খান্ডারনীকে নিয়ে এসে সংসারে পিতিষ্টে করেচে। নিজের হাড়ির হাল। তো আগের পক্ষের ছেলে।

ওঃ। কথার জাহাজ। বলি বয়েস তো হয়েছে, কাজকর্ম করিস না কেন কিছু?

কানাই অবজ্ঞা ভরে বলেছিল, ওঃ কাজ। দেশসুদ্ধু সবাই আমার জন্যে 'কাজ' নিয়ে বসে আচে। দ্যাওনা একখান কাজ জুইটে। দেকি কত বাহাদুর।

এই বাচালতা আর যার হোক নীহারকণার বৌমার সহ্য হয় না।

সে এই জটলাকে উদ্দেশ করে অথবা আত্মগতভাবেই বলে ওঠে, সারারাত ধরেই এই মুক্তাঙ্গন নাটক চলবে নাকি? আমার আর ধৈর্য নেই বাবা। শুতে যাচ্ছি।

বলে হাই তুলে নেমে যায়।

পরক্ষণেই নাটকে যবনিকা পড়ে যায়। দেবু সন্তোষের সাহায্যে তড়িঘড়ি ছেলেটাকে সিঁড়ির তলার সেই ঘরটায় ঢুকিয়ে দিয়ে তালাবন্ধ করে দিয়ে আসে। যে ঘরটায় একদা কয়লা ঢালা থাকত বলে এখন কয়লার ঘর নামেই চিহ্নিত।

ঘরটায় এখন কী আছে?

কী নেই? কয়লা বাদে, সবই আছে অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় ফালতু মাল। যে সব জিনিস কোনো কালেও কাজে লাগবে না অথচ, কোনো কালেও প্রাণে ধরে ফেলা হবে না। তবে ঘরটায় সব থেকে যেটা বেশি আছে সে হচ্ছে আরশোলা।

সত্যব্রত একবার ক্ষীণ স্বরে বলেছিলেন, আরশোলায় রাতারাতি সাবাড় করে ফেলবে না তো ছেলেটাকে?

দেবব্রত বলেছিল, তবে না হয়, আপনার ঘরেই নিয়ে গিয়ে শুতে দিন।

বেহায়া সত্যব্রত এরপরও (অধিকতর ক্ষীণস্বরে অবশ্য) নীহারকণার কাছে আর্জি করেছিলেন, তিনদিন খায়নি না কি বলছিল, ঘরে কিছু নেইটেই?

নীহারকণা ভস্ম করার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, কী? ওকে এখন পিঁড়ি পেতে বসিয়ে খাওয়াতে হবে? বলিহারি যাই। তিনদিন খায়নি। সেই কথা বিশ্বাস করলে তুমি? খলের ছলের অভাব আছে?

এই হচ্ছে গতরাত্রির ইতিহাস।

আর সকালের ইতিহাস এই, সত্যব্রত তার পুত্রের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কানাইকে থানা পুলিস না করে, পূর্বকালের মতো ফাইফরমাসের কাজেই লাগিয়ে দেখা হোক।

দেবব্রতর চড়া গলার নিরীহ উক্তি, কী দেখবেন? কোনও একদিন ওর সেই গ্যাংকে ডেকে এনে বাড়িসুদ্ধু খতম করে দিল কিনা?

আর সন্তোষ ঝেড়ে জবাব দিল, ওটাকে রাখলে আমায় ছাড়তে হবে দাদাবাবু। শেষে ওর অপকর্মে চোরের দায়ে পড়ে মরব?

তথাপি হারবিহীন সত্যব্রত বলে উঠছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখতে চেষ্টা করো দেবু। জগতে সবাই 'সত্যি' অসৎ নয়। পরিবেশের চাপেই হয়তো—

আরও বলেছেন, আমি বলছি ছেলেটা 'জাত অপরাধী' নয়। ওকে একটা চান্স দিয়ে দেখাই যাক না। হয়তো একটা জীবন শুধরে উদ্ধার হয়ে যেতে পারে।

নীহারকণা অবশ্য একথা পাগলের প্রলাপ বলেই উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু দেবু ঘোষণা করে গেল বাড়ির কর্তার হুকুম না পেলে তার দ্বারা কিছু সম্ভব নয়।

কিন্তু কেউ ভাবেনি এহেন মোক্ষম সময়ে সত্যব্রত এমন একটা দুঃসাহসিক কথা বলে বসবেন। কিন্তু বললেন। একটু হেসে বললেন, 'বাড়ির কর্তা' এই বদনামের দায়ভারটা যখন বইতেই হচ্ছে, তখন একবার না হয়, সেই ভারের কিছুটা উসুল হোক।

অর্থাৎ?

তার মানে?

তার মানে কানাই এ বাড়িতেই থাকুক।

ওঃ। কিন্তু এর পর যদি—

যদি তেমন কোনও ঝামেলায় পড়তে হয় তোমাদের, তো চোর গুন্ডার সহায়ক বলে আমাকেও ওর সঙ্গে থানায় চালান দিও।

নীহারকণা অনুভব করলেন হঠাৎ ইস্পাতের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে তাঁকে। অতএব আর কিছু করার নেই, একমাত্র দর্পহারীর কাছে আপ্রাণ প্রার্থনা করা ছাড়া।

কানাই রয়ে গেল।

তাকে পরবার জন্যে জোগাড়যন্ত্র করে কিছু দিতেও হল এবং সকলের আগে তাকে পেট ভরে চা পাউরুটি খাওয়ানোও হল। হাড়গিলে মুখটায় পরিতৃপ্তির ছাপটা হল দেখবার মতো।

পরাজিতা নীহারকণা দর্পহারীকে কাতর প্রার্থনা জানালেও সন্তোষকে নির্দেশ দিলেন, তুই একটু চোখে চোখে রাখবি।

সন্তোষ উদাসীন গলায় বলল, আমি আর কী চোখে চোখে রাখব? যা দেখছি—ও তো বাবুর চক্ষের মণি হয়ে উঠবে। যা 'কানাই-কানাই' রব চলছে।

আর বললে বিশ্বাস হবে না, কানাই রীতিমতো অভিযোগের ভঙ্গিতে বলল, আমার খাবার সেই কলাই থালাটা নাই? ফেলে দেচো? কী কামড়াতেছিল সেটা তোমায় দিদ্‌মা? ন্যাও এখোন আবার অন্য থালা খুঁজে মরো। একখান ফাটাচটা কলাই থালা, ওই তোমার কয়লার ঘরের মধ্যে রাখলেই হত। শুদু শুদু কাজ বাড়া।

এই হচ্ছে কানাইয়ের বাকভঙ্গি।

সত্যব্রত নামের এক আত্মস্থ প্রৌঢ় ব্যক্তি কি ওর ওই বেপরোয়া বাকভঙ্গিতেই আকৃষ্ট হয়ে মরছেন? না কি এ তাঁর একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপাদান?

তবু তাই বলে এত তাড়াতাড়ি পরীক্ষায় নেমে পড়াটা কি বেশি দুঃসাহস নয়? এখন তো নীহারকণা তাঁর দর্পহারীর ক্যাপাসিটি দেখে উল্লসিত হচ্ছেন। ছেলে বৌ আড়ালে হাসাহাসি করছে এবং সন্তোষ নামক পাজি ছেলেটা সামনেই দাঁত বার করে বলছে, কচি শশা খেতে এখন আপনাকে অনেক অপেক্ষা করতে হবে মেসোমশাই। আপনার সাধের নাতি গেরামে গিয়ে শশাগাছ লাগাবে, জল সেঁচবে, গাছ বাড়িয়ে মাচা বাঁধবে, তারপর গিয়ে কচি কচি শশা এনে আপনাকে খাওয়াবে।

হ্যাঁ। ব্যাপারটা ওই কচি শশা নিয়েই। তিন চারটে দিন না যেতেই সত্যব্রত কানাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শশা চিনিস কানাই? কচি কি পাকা বুঝতে পারিস?

ওমা। শোনো কতা। চিনব না আবার কেন? ফুলকচি হলে দুধে রং নোখ ফোটালেই বিঁদে যাবে। আর বুড়ো পাকা হলে—

আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। বুঝেছি চিনিস। তো যাদবপুর বাজারটা চিনিস তো?

শোনো কতা। ওইখানেই বলে বলতে গেলে জন্মোকম্মো।

বেশ। দেরি করবি না তো?

মোটে না। যাব আর আসব। দ্যাও ট্যাকা দ্যাও।

সত্যব্রত ওর উৎফুল্ল মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে একখানা কুড়ি টাকার নোট এগিয়ে দিয়েছিলেন।

কানাই একটু থমকে বলেছিল, উরিব্বাস। এ যে অনেক ট্যাকা। অ্যাতো শশা কে খাবে দাদু?

দূর বোকা। সব টাকারই আনবি নাকি? পাঁচ টাকার নিবি। তো হিসেব মিলিয়ে বাকি টাকাটা ফেরত আনতে পারবি তো?

কেন পারবনি? শশা কিনে নিয়ে অগ্রে বাঁ হাতে পনেরোটা ট্যাকা দোকানির কাচ থেকে নিয়ে তবে ডান হাতে এই নোটটা ধরে দেব।

দেখিস। দোকানি তোকে ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকাবে না তো?

ইস। ঠকালেই হল আর কী।

ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আবার ঘুরে দাঁড়াল, দাদু, একটা শক্ত দেকে ঠোঙা দিতে পারবে? দোকানিরা যা বিছিরি ঠোঙা দেয়। মাজ পতেই হয়তো ছিঁড়ে ছইড়ে যাবে।

সত্যব্রত বলেছিলেন, সেরেছে। ঠোঙা আবার কোথায় পাবো আমি।

তারপরই সদ্য আসা একখানা বিদেশি ম্যাগাজিনের মোটা ব্রাউন খামটা খুলে কানাইয়ের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন।

পরক্ষণেই কানাই হাওয়া।

বলা বাহুল্য, এই নাটকীয় দৃশ্যটা নীহারকণার অগোচরে থাকেনি। ওত পেতেই বসেছিলেন তিনি। ছেলেটা ছুটে বেরিয়ে, যাবার পর শান্ত গলায় বললেন, হঠাৎ কচি শশা খাবার এত ইচ্ছে হল যে?

সত্যব্রত হেসে বললেন, এমনি। মনে হল শশা দিয়ে মুড়ি খেলে মন্দ হয় না।

তাই পাঁচ টাকার শশা।

আহা আমি কি আর একা খাব? সবাই খাব। পাঁচ টাকায় অনেক হবে না কি?

নীহারকণা অগ্রাহ্যের গলায় বলেছিলেন, সবাই খেলে এমন কিছু না। তো সন্তোষ আনতে পারত না?

পারবে না কেন? ভাবলাম, ছেলেটাকে একটু তালিম দেওয়াও তো দরকার।

হুঁ। তা পাঁচ টাকার নোট ছিল না বুঝি?

হাতের কাছে ছিল না।

ভালো। দেখো এখন কানাকুঁজো দুটো শশা এনে খালি হাতে এসে না বলে, দোকানি বাকি টাকাটা ফেরত দিল না।

সত্যব্রতর বুকটা যে একটু দমে যায়নি তা বলা যায় না। ছেলেটা যে রকম তিরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ব্যস। গেল তো গেলই। সকাল গেল, বিকেল গেল, রাত গেল, না শশা, না কানাই।

এর মধ্যে সন্তোষ বার দুই তিন যাদবপুর বাজারের পুরো তল্লাটটা ঘুরে এসেছে। এবং আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে বুড়ো আঙুল নাড়তে নাড়তে বলেছে, কানাইবাবুর টিকিটাও দেখলুম না মাসিমা।

এই দেড়দিন ধরে সত্যব্রত এখন সংসারের একটা হাসির খোরাক হয়ে রয়েছেন।

কিন্তু সে সব গায়ে মাখছেন না সত্যব্রত। শুধু ভাবছেন, এতটা হার হল তাঁর? একটি নিশ্চিত বিশ্বাসের এমন শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটল? তবে মানতেই হবে মস্ত একটা ভুলই করেছিলেন সত্যব্রত।

আশ্চর্য। সামান্য কুড়িটা টাকার লোভে, একটা নিরাপদ আশ্রয়, একটা নিশ্চিত অন্নের আশ্বাস, সব চুলোয় গেল? এদের মূর্খ বলা হবে, না অপরাধী বলতে হবে? না কি এরাই জাত-অপরাধী?

সত্যব্রতর বড় বেশি মুষড়ে পড়া ভাব দেখে, দেবুও আর বিদ্রূপহাস্যরঞ্জিত মুখে বাবাকে জ্ঞান দিতে আসতে কুণ্ঠিত হচ্ছে। শুধু নীহারকণা এক একবার বলে উঠছেন, আখের বুঝলি না মুখপোড়া? কুড়ি টাকায় তোর কদিন চলবে? অ্যাঁ? রামরাজত্ব করে খাচ্ছিলি। নাতির আদরে থাকছিলি।

কানাইকাহিনী এইখানেই সমাপ্ত হতে পারত। নতুনও কিছু না। এমন তো কতই হয়।

কিন্তু জের টানল সেই ব্রাউন পেপারের মোটা খামটা।

একেই হয়তো বলে 'দৈবচক্র।'

না হলে গাড়ি চাপা পড়া রোগা হ্যাংলা ছেলেটাকে রাস্তার যে লোকেরা কর্তব্যপরায়ণ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে গিয়েছিল, তারা এত কর্তব্যপরায়ণ হল যে, ছেলেটার বুকে আঁকড়ানো ঠোঙাটা থেকে ছড়িয়ে পড়া চারটি ধুলোমাখা শশাকে কুড়িয়ে তুলে, আবার ঠোঙায় ভরে সেটাকেও হাসপাতালে জমা দিয়ে রেখে গেল।

আবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরও এত এনার্জি হল যে, সেই খামটা থেকে নাম ঠিকানা পেয়ে সত্যব্রত সেন নামের লোকটাকে জানিয়ে দিলেন, দেখতে চান তো চটপট চলে আসুন। আর বেশিক্ষণ নয়।'

এ সবই দৈবক্রম নয়?

তো বেশিক্ষণ না হলেও ছিল কিছুক্ষণ।

সত্যব্রত কাতরভাবে বললেন, যাদবপুর বাজারে না গিয়ে ঢাকুরেয় এলি কেন কানাই?

কানাই কষ্টে উত্তর দিলে, ওখেনে যে তেমন কচি শশা ছেলো না দাদু। তো একটা লরি পাজি—

সত্যব্রত কি নিজের মাথায় নিজে মেরে একটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করবেন? তা তো সম্ভব নয়। তাই শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন ওই মৃত্যুমলিন মুখটার দিকে তাকিয়ে। নিশ্বাসটা পড়ছে এখন। আর বেশিক্ষণ পড়বে না।

বেদনায় বিদীর্ণ হচ্ছিলেন সত্যব্রত তবু মুখের রেখায় যেন একটি প্রশান্তির আলো। এ আলো বুঝি কৃতজ্ঞতার। ছেলেটার কাছেই হয়তো কৃতজ্ঞ হচ্ছিলেন সত্যব্রত, যে নিজে মরে সত্যব্রত নামের মানুষটিকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

পৃথিবীর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা সত্যব্রত আর কোথায় আশ্রয় পেতেন? হয়তো পেতেন না আশ্রয়। দিনে দিনে শুধু ক্রুদ্ধ, রুক্ষ আর তিক্ত হতে থাকতেন।

নীলকণ্ঠ

কমলাকে দেখে চট্ করে বোঝা যায় না, ও বিধবা কি কুমারী।

অবিশ্যি বেশভূষা দিয়ে মেয়েদের অবস্থার পরিচয় দেওয়ার সেকেলে প্রথাটা এখন আর নেই। এখন সধবা, কুমারী—উভয় দলই পছন্দ করে নিয়েছে বৈধব্যের বাহুল্যহীন পরিচ্ছন্নতা।

অলঙ্কারের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পদমর্যাদার বিজ্ঞাপন দেবার চেষ্টাটা এ যুগে কম। অন্তত সভ্যসমাজে নেই। এমন কি, পতিগরবিনীর হাতি-পাড় শাড়ি ক্রমশ ক্ষীণতর হ'তে হ'তে ... ইঞ্চি পাড় ... নরুণ পাড় ... চুল পাড় ... অবশেষে নির্মূল পাড়ের রূপ নিয়েছে।

দোকানে গিয়ে অনায়াসেই বলা যায়—"খানকতক থান-শাড়ি বার করুন তো—"

শুনে দোকানি চমকে উঠবে না।

বিশ-বাইশ গাছা চুড়ির পরিপূরক হয়তো—কেবলমাত্র একটি ঘড়ি। কিছুদিন আগেও কর্ণভূষণটা ভূষণ হিসেবে গণ্য হত—সভ্যসমাজেও হত, সম্প্রতি তার জাত গিয়েছে।

লোহা-সিঁদুরের কথাটা হাস্যকর। ও বস্তু দু'টো শুধু ত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি মেয়েরা, জোর আন্দোলন চালাচ্ছে—ওই বর্বর প্রথার চিহ্ন দু'টোর বিরুদ্ধে। কেন মেয়েরা অকারণ এই দুঃসহ লৌহভার বহন করবে? আর কেনই বা অনর্থক খানিকটা রং লাগাবে মাথায়? ... গালে মুখে চোখে নখে যে রং মাখা হয়, তার তো তবু মানে আছে।

তবু এত করেও সম্পূর্ণ ধোঁকা দেওয়া যায় কি?

পরিচ্ছদটাই তো সব নয়!

কুমারী তরুণীর নয়নকোণে অজানিত সম্ভাবনার যে বিদ্যুদ্দীপ্তি কারণে অকারণে ঝলসে ওঠে, বিবাহিতা নারীর আঁখি-প্রান্তের সৌভাগ্যগর্বিত স্থির শিখার সঙ্গে তার প্রভেদ ঢের।

আর বিধবা যুবতীর?

তার দৃষ্টির শ্রেণি-নিরূপণ করা শক্ত। সে দৃষ্টিতে বহু কৃত্রিম বর্ণচ্ছায়া। সে দৃষ্টি কখনও সমবেদনার আশায় ছলছলিয়ে ওঠে, কখনও আবার সহানুভূতির আশঙ্কায় কঠিন হয়ে থাকে। সে দৃষ্টি আপন ভাগ্য-দেবতাকে কখনও অভিযোগ জানায়, কখনও ধিক্কার দেয়, কখনও বা ব্যঙ্গ করে, কখনও আবার দুঃসহ স্পর্ধায় অগ্রাহ্য করতে চায়। ....

বিমলার মুখে চোখে সেই বহুবর্ণের আভাস।

তাই ও যখন টান্ টান্ করে চুল জড়িয়ে, সরুপাড় শাড়িখানা পরে, সরু একগাছা চুড়ি-পরা হাত নেড়ে কঠিন মুখে একটানা সংসারের কাজ করে যায়, তখন ওকে দেখলে বিধবা ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। যেন অনেক পথ পার হয়ে, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে। মুখের রেখায় রেখায় সেই পথশ্রমের ক্লান্তি, সেই অভিজ্ঞতার গাম্ভীর্য।

কিন্তু সব সময় কি ওই এক ভাব বিমলার? বদল হয় না?

দোতলার ভাড়াটেদের ছেলে যখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে? ... বাড়ি-ওয়ালার ভাইটা যখন বাড়ির ভাড়া আদায় করতে আসে? ... মাঝে মাঝে আসে দূর সম্পর্কের কোনও সমবয়সি আত্মীয়? ... কাকিমার বোনপো, কি ভাইপোরা?

হ্যাঁ, ওরকম কেউ এলেই চোখ-মুখের চেহারাটা হঠাৎ বদলে যায় বিমলার। চুলের ভঙ্গি শিথিল হয়ে আসে, শাড়ি পরার ধরনটা মার্জিত চেহারা নেয়, চোখের কোণে জ্বলে ওঠে সেই অজ্ঞাত সম্ভাবনার বিদ্যুৎ-শিখা।

যে-ঘরে অতিথিরা আসন গ্রহণ করে, বার বার সেই ঘরের সামনে দিয়ে আনাগোনা করতে থাকে বিমলা দ্রুত ব্যস্ত ভঙ্গিতে। ... হয়তো বা হঠাৎ কি যেন দরকার পড়ে যায় ওই ঘরেই। ... কেন কে জানে —চায়ের কি চিনির কৌটা ভাঁড়ার ঘর থেকে উধাও হয়ে যায়। ... হয়তো বা ঠিক সেই মুহূর্তেই দেশলাইয়ের শেষ কাঠিটি নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাই কাকার জামার পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজে বার করতে হয়।

কাকিমা সুবর্ণলতা দাঁতে দাঁত পিষে অস্ফুট মন্তব্য করে, নয়তো বা নিজের ভাইপো-বোনপো-জাতীয় কেউ হলে, তার কাছে তিক্ত স্বরে হিসেব দাখিল করে—'দেখছিস তো? ওই দেখ? "মা রক্ষেকালী" বলি কি সাধে? ভেবে দেখ, ওইটি আমাদের গলায়! বিয়ে আর হয়েছে ওর! চিরকাল আমাদের হাড়মাংস পুড়িয়ে খাবে, এই আর কি।"

নিরপেক্ষ কেউ থাকলে দৈবাৎ হয়তো বলে—'কিন্তু খাটতে পারে খুব বোধ হয়? সব কাজকর্মই তো—'

কথা অবিশ্যি শেষ করতে পায় না সে—সুবর্ণলতার সতেজ প্রতিবাদে।

পরবর্তী বাকি সময়টুকু মুখর হয়ে ওঠে বিমলার প্রসঙ্গে। বিমলা যে কত শয়তান, কত বজ্জাত, কত সাংঘাতিক, তার উদাহরণ দিতে দিতে সময়ের জ্ঞান থাকে না সুবর্ণলতার।

বিমলার কানে যে তার ছিটেফোঁটা না যায় তা নয়, খুব বেশি গলা খাটো করে না সুবর্ণলতা। কেনই বা করবে? বিমলার ভয়ে? কেন, বিমলা তাকে ফাঁসি দেবে? ... ফাঁসি দেবার ক্ষমতা না থাক, তবে এসব অপমানের শোধ নিতেও ছাড়ে না বিমলা। শোধ নেয়—অহিংস প্রতিশোধ। হয়তো—হঠাৎ অফিসের বেলায় অসমাপ্ত রান্না ফেলে, কুটনোবাটনা ছড়িয়ে রেখে 'ভীষণ পেট ব্যথায়' অস্থির হয়ে একেবারে বিছানা নিতে হয় বিমলাকে। .... হয়তো—সন্ধ্যার মুখে উনুনে আগুন ধরিয়ে দিয়েই নিজের মাথাতেও আগুন ধরার প্রমাণ দেখাতে ঘটি ঘটি জল মাথায় থাবড়ে মাদুর হাতে করে চলে যেতে হয় ওদিকের রোয়াকে বিশ্রামের প্রয়োজনে। ... কাকির ছেলেমেয়ে দু'টো কাছেপিঠে থাকলে তা'দের মেরে হাড় গুঁড়ো করবার ভয় দেখিয়ে তাড়াতে হয়, এত যন্ত্রণা! ... হয়তো বা বাসন-মাজ ঠিকে ঝিটা কামাই করেছে দেখলেই কম্প

দিয়ে জ্বর আসে বিমলার। বোশেখ-জষ্ঠির দিনে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে পাঁচ দিন সাত দিন ধরে চলে—এই অহিংস সংগ্রাম। ...

আবার হয়তো কোনওদিন কেউ আসে, হয়তো—দোতলার ভাড়াটেদের নীরেন উপর-নীচ করবার সময় বিমলাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করে—হেমন্তবাবুর জ্বর হয়েছিল—আছেন কেমন?—কি হেমন্তবাবু অফিস থেকে ফিরেছেন কিনা। ...

চট করে বদলে যায় বিমলা, দ্রুত ভঙ্গিতে আনাগোনা করে রান্নাঘর থেকে ভাঁড়ার ঘরে, তৎপর হয়ে ওঠে সংসারের কাজে। কাকিকে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় শোবার ঘরে। ...

সবটাই খামখেয়াল। ...

মধ্যবিত্ত পরিবার।

সুবর্ণলতার শরীর খারাপ। কাজেই বিমলার পড়াশোনার কথা ওঠেই না। কবে নাকি সে কোন্ তামাদি যুগে ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়েছিল, 'মেয়েদেখাবার' সময় সেই ঘটনাটার উল্লেখ করেন হেমন্তবাবু, বলেন—'বাড়ির অসুখ-বিসুখে স্কুলটা ছাড়িয়ে নিতে হয়েছে, কিন্তু ভারি পড়ার ঝোঁক মেয়ের। এ বছর ম্যাট্রিক দেবে বলে প্রাইভেট পড়ছে।' বলতে গিয়ে কেন যে হাসি পায় না হেমন্তবাবুর! তবু এই সুযোগে মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়, কোনো এক সময় বিমলা বইখাতা হাতে করে বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেত! ... ছুটোছুটি করত স্কুলের মাঠে, গাছে বাঁধা দোলনায় চড়ত, ... দড়িলাফ খেলতো ... আর বাড়িতে এসে পরম আনন্দে এক গোছা রুটি শুধু গুড় দিয়ে খেয়ে যেত পাড়া বেড়াতে। অনিলাদের রোয়াকে ছিল ঘুটিঙ্ খেলার আড্ডা, বাসন্তীদের বাড়ির ছাতে 'কানামাছি' কুমির কুমির' খেলার।

অনিলাদের আড্ডায় যোগ দিলে—খুব বেশিক্ষণ খেলা হত না। সন্ধে না হতেই—অনিলা খেলা ছেড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেত মাস্টারের কাছে পড়তে, আর বাইরে থেকে জানলার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে বিমলা সেই পড়ার দৃশ্য দেখত। জোর আলো জ্বলছে ঘরে, টেবিলের সামনে চেয়ার পেতে বসেছে অনিলা মুখ নিচু করে। কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর দেখায় তার মুখ। মনে হয়, অন্য জগতের জীব। তবে যেদিন পড়ার ভুল হত, বাঘা মাস্টারমশাই হুঙ্কার দিয়ে ধমক দিতেন, চোখ ছলছল করে আসত অনিলার, বিমলার সেদিন ভারি মজা লাগত।

বাসন্তীদের বাড়ির ছাতে গিয়ে জুটলে সন্ধে হ'তেই টেনে নামাতেন বাসন্তীর মা নিজের মেয়েকে, পাড়ার মেয়েদের। সবাই হুড়মুড় করে নেমেই ছুট দিত বাড়ির দিকে। শুধু বিমলাই ওদের বাড়ি থেকে নড়তে চাইত না। অথচ কথা নেই মুখে।

বাসন্তীর মা একরকম ঠেলেই তাড়াতেন। বলতেন—'যাও, খুকি, বাড়ি যাও। তোমার কাকা আবার খুঁজতে আসবেন! বকুনি খাবে বাড়িতে।'

সেরকম ঘটনাও যে ঘটেনি তা নয়। 'বকুনি'টা ভদ্রভাবে বলা।

রাত্তির হয়ে গিয়েছে দেখে, কাকা পাড়া তল্লাস করে ভাইঝিকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছেন, গিয়ে পিঠের ছাল তুলেছেন তার। একধার থেকে মেরেছেন আর মৃত ভ্রাতা আর ভ্রাতৃবধূকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেছেন—কী শত্রুতা ছিল তাঁদের হেমন্তর সঙ্গে? ...

তা এসব এখন তামাদি কথা। এখন পাত্রপক্ষের কাছে কমিয়ে কমিয়েও বয়েসটাকে আর বাইশের নীচে নামানো যায় না বিমলার।

গলার কাঁটা উদ্ধার করতে বিয়ের চেষ্টা করেন বই কী হেমন্তবাবু, প্রায়ই করেন, কিন্তু বিমলাহীন সংসারে সুবর্ণলতার চেহারাটা কল্পনা করে চেষ্টাটা কেমন স্তিমিত হয়ে আসে।

আর সত্যি, উৎসাহের তোড়জোড় হবেই বা কোথা থেকে? যারা মেয়ে দেখে যায়, তারা খুব জোর বাড়ি গিয়ে খবর দেবার আশ্বাস দিয়ে যায় বা 'কোষ্ঠীটা' পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে যায়, এর বেশি তো নয়?

কী করবেন হেমন্তবাবু? হাত দিয়ে তো ঠেলে এগোবার নয়?

অনিলার বিয়ে হয়ে গেছে কোন্ যুগে, তিন-চারটি ছেলেমেয়ে তার, বড়টি তো স্কুলে যাচ্ছে। বাসন্তীও এই দ্বিতীয়বার ছেলেপিলে হাতে এসেছে মায়ের কাছে!

ওদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে খুব করে বিমলার, ভালোবেসে নয়—কৌতূহলের বশে। ... ছেলেবেলায় যেমন জানলার বাইরে থেকে গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে দেখত, তেমনি দেখা—সত্যিকার অন্য জগতের জীব হয়ে গেছে যে সহপাঠিনীরা, তাদের জীবনের দিকে।

কিন্তু ইচ্ছে হলে কী হবে? সুবর্ণলতার ধিক্কারে যাওয়া হয় না। যেতে চাইলেই, গলায় দড়ি দেবার পরামর্শ দেন তিনি বিমলাকে।

তা' খুব অসঙ্গত কথাও তিনি বলেন না। দোতলার ভাড়াটেদের যে মেয়েটাকে ছেলেবেলায় কোলেপিঠে করেছে বিমলা, সেই ফুলিরও এই সেদিন বিয়ে হয়ে গেল! ঘটা করেই হত, কিন্তু বিয়েতে আজকাল ঘটা হয় না, তাই।

অবিশ্যি ঘটা না হোক, ল্যাঠাটা তো ঠিকই আছে? বিনি খরচের আচার-অনুষ্ঠানগুলো এখনও এরকম বজায় আছে। ... তা' সেই সব অনুষ্ঠানে বিমলা কী বলে হাসিমুখে যোগ দেয়? সাধে কি আর বিমলাকে গলায় দড়ি দেবার পরামর্শ দেয় সুবর্ণলতা?

কিন্তু বিয়েতে ঘটা না হোক, জামাই-নেমন্তন্নের ঘটা আটকায় কে? এখনও তো ও রীতিটার ওপর আইন জারি হয়নি? পর পর বার বার জামাইকে নেমন্তন্ন করে পারুলবালা যেন দেখিয়ে দেয়—কত বড় রন্ধন-শিল্পী সে।

মধ্যবিত্ত সংসারে ভালো রান্নাবান্নার ব্যাপার আজকাল উঠেই গেছে একরকম। ফুলির মার জামাই-নেমন্তন্নর দিন হলেই পূর্বপরিচিত সব মসলার সুগন্ধ বাতাসে ভেসে এসে উতলা করে দিয়ে যায় হেমন্তবাবুকে। সেদিন তিনি অজস্র খুঁত খুঁজে পান বিমলার রান্নায়। ছি-ছিকার করেন বিমলাকে। এতো বড় বুড় ধিঙ্গি মেয়ে, ফুলির মার কাছে গিয়ে দু'-চারটে ভালোমন্দ রান্না এতকালেও শিখে নিতে পারল না, দেখে মেন অবাক্ হয়ে যান।

বেশি কথা কয় না বিমলা।

শুধু বলে—শান্ত ভাবেই বলে—'কাল না হয় সেরটাক মাংস আর কিছু ঘি-মসলা, আদা-পেয়াঁজ কিনে রেখে যেও কাকা, দেখি যদি ওপরের বৌদিকে ডেকে—'

হেমন্তবাবু খিঁচিয়ে ওঠেন—'আর কিছু নয়? একেবারে মাংস! সেই যে বলে না—কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থ লেখা সাধ,—এ তাই। আমি দশ টাকা খরচ করে মাংস এনে দিই, আর তুমি আমার জন্যে পিণ্ডি সেদ্ধ করে রাখো। বলি ভাত সেদ্ধ করতে শিখেছিস? এ কি, হয়েছে কি? এ ভাতের পিণ্ডি তুলে রাখ বিমলি, আমি মরে গেলে ছেরাদ্দর কাজে লাগবে।'

বিমলা এত বড়ে কটূক্তিতেও দমে না কিন্তু, নিতান্ত সহজভাবেই বলে—'এবারে রেশনে ওই রকম চালই যে দিয়েছে কাকা, হয়তো পিণ্ডি দেবার সময় মিহি দাদখানি ছাড়া জুটবে না। যেমন সব উল্টো পাল্টা ব্যবস্থা।'

আর কথা বাড়াবার সময় নেই, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিতে হবে বিমলাকে। অন্যদিন হলে—হয়ত আর কিছু কথার আমদানি হত, কিন্তু আজ আর দাঁড়ায় না, আজ তাড়া আছে। বরের ঘরে যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কেমন দেখতে লাগে ফুলিকে, তা দেখবার জন্যে বিকেল থেকে উচাটন হয়ে আছে সে।

ওদিকে ফুলির মা পারুলবালা মেয়েকে তাড়া লাগায়—'যা যা চট করে শুয়ে পড়গে দিকিন, এখুনি বিমলি এসে হাজির হবে। আর সেই সাত-সতেরো কথা কইবে, শুনলে গায়ে বিষ ছড়ায়। কোন্ লজ্জায় সে আসে। ওইঃ। ওই—হল তো? ... আসছেন নাচতে নাচতে ...'

মেয়েকে একরকম ঠেলেই ঘরে ঢুকিয়ে দেয়, পারুল, প্রায় বিমলার সামনেই।

বিমলা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বসে পড়ে, বলে—'ওমা। শুয়ে পড়ল বুঝি? মেয়েকে কেমন সাজিয়ে গুজিয়ে দিলে, একবার দেখতাম।'

পারুল নীরস স্বরে বলে—'এখনকার মেয়েদের আবার সাজিয়ে দেওয়া!'

কুৎকুতে চোখ দুটো হাসিতে কুঁচকে বিমলা বলে—'নিজেই সাজল বুঝি?'

—'নতুন করে আবার সাজবার কী আছে?'—পারুল যেন উত্তরটা ছুড়ে মারেঃ 'সেজেই তো থাকে চব্বিশ ঘণ্টা! ঢাকাই শান্তিপুরী ছাড়া আর কিছু পরে? না—এসেন্স, সাবান, স্নো-পাউডারের কমতি আছে কোনও দিন? ফুলি তো তাই বলে—'বিমলা পিসি যে কি কিম্ভূতকিমাকার হয়ে থাকে।' সত্যিই এখনকার মেয়েরা তো থাকে না এরকম।'

এখনকার মেয়েরা হয়তো থাকে না। কিন্তু বিমলা কি এখনকার?

কে জানে, কখনকার সে। নিজেরই কি কোনও বোধ আছে তার? আর থাকলেই বা কি? ঢাকাই শান্তিপুরী যোগাচ্ছে কে?

আজে বাজে এটা সেটা গল্প করতেই থাকে বিমলা, উঠতেই চায় না। পারুল এক সময় হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—'যাই বাবা শুয়ে পড়িগে। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে—সারাদিন যা খাটুনি।'

—'তা সত্যি!'—বিমলা উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'জামাই এলে যা রান্নার ঘটা তোমার। কী কী রাঁধলে বৌদি?'

—'কাল শুনো ঠাকুরঝি।—' বলে চলে যাবার ভান করে ফুলির মা, কিন্তু যায় না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলেই ছোট দেওর নীরেনের ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হবে বিমলাকে।

নীরেনের ঘরের দরজা এখন খোলা, আলো জ্বলছে।

নীরেনকে বিমলার কাছ থেকে আগলে বেড়ানোটাও পারুলের একটা কাজ।

দেওরকে তো আগলে বেড়ায় পারুল, কিন্তু জামাইকে সামলাতে পারল কই? অন্তত সেই অভিযোগই তো করে বিমলা।

ভোরবেলা বাড়ির কারুর যখন ঘুম ভাঙেনি, বিমলা একা একা উঠে গিয়েছিল তিনতলার ছাতে একটু হাওয়া খাওয়ার আশায়, ঠিক সেই সময়ই নাকি তাক বুঝে জামাইবাবুরও হাওয়া খাওয়ার শখ হয়েছে।

বোঝো এখন!

বিমলা জিভ কেটে চুপি চুপি বলে—'লজ্জায় মরে গেলাম বৌদি, ভোরের গরমের জ্বালায় একটু এলোমেলো হয়েই গেছি, হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে দেখি—ফুলির বর। উঠি তো পড়ি করে নেবে এসেছি! কী ঘেন্না মাগো।'

পারুল গম্ভীরভাবে বলে—'ওসব কী রকম কথাবার্তা তোমার বিমলা? ওদের তো এখনও দরজাই খোলেনি।'

—'আবার খিল দিয়েছে।'—বিমলা মুচকি হাসে, 'আমায় ছুটে পালাতে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে তো।'

আরও গম্ভীর হয়ে পারুল বলে,—'তা ছাতে যদি গিয়েই থাকে, তা জেনে তো যায়নি, তুমি আছ? আর তাও যদি যায়—এত লজ্জা ঘেন্নারই বা কী আছে বিমলা? সময়ে বিয়ে হলে ফুলির মতে একটা মেয়ে তো তোমার নিজেরই হতে পারত? শঙ্করের মতো জামাইও হত।'

এটা অবশ্য একটু অত্যুক্তিই করে ফুলির মা। ফুলির চেয়ে বিমলা আট ন' বছরের বেশি বড় নয়। কিন্তু বিমলার মুখের ওপর শুনিয়ে দিতে এর চেয়ে তীব্র ও তীক্ষ্ণ কটূক্তি আর কী হতে পারত।

বিমলা অন্ধকার মুখে উত্তর দেয়—'কী হলে কী হত, সে হিসেব তো হচ্ছে না বৌদি। শঙ্করের চালচলনগুলো তেমন ভালো নয়, তাই বলছি।'

রাগে দিশেহারা হয়ে যায় পারুল, কিন্তু চেঁচাতে তো পারে না, সামনের ঘরে জামাই। তাই চাপা গলায় বলে—'শঙ্কর এলে—শুধু শঙ্কর এলেই বা কেন, এমনিও—দোতলা-তেতলায় তুমি আর উঠো না বিমলা। অত রূপের ডালি নিয়ে পাঁচজনের সমানে বেরোনই ভালো। ... মুনিরই মন টলে যায়, তা সামান্য মানুষ।'

আর কী করবে ফুলির মা? চাবুক মারার চেয়ে বেশিই তো করেছে!

না করবেই বা কেন?

বিমলার আস্পর্ধা যে আকাশ ছাড়িয়ে উঠেছে।

বিমলা নেমে গেলে রাগে ফুলে ডবল হয়ে, বিমলার এই অসম-সাহসিক ধৃষ্টতার কথা ব্যাখ্যান করে পারুল—বরের কাছে, দেওরের কাছে। বলে—ওর নিজের ননদ যদি হত বিমলা, তো-জ্যান্ত পুঁততো তাকে। দেওরের কাছেই বেশি বলে। বড় গম্ভীর মানুষ নীরেন, কথা কয়ে মোটে সুখ নেই।

কিন্তু অদ্ভুত একটা সর্বনেশে কথা নীরেন বলে। বলে—হ্যাঁ, ভোরের দিকে শঙ্করকে নাকি তিনতলার ছাতে উঠতে দেখেছে সে।

পারুল ক্রুদ্ধ স্বরে বলে—'তার মানে ঠাকুরপো?'

—'মানে খুবই প্রাঞ্জল। ভদ্রসন্তানের হয়তো—ফ্যানের তলায় ঘুমোন অভ্যাস, আমাদের পিঁজরেপোলে ঢুকে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছিল।'

—'তা হলে—ওই রাক্ষুসীই জেনে শুনে পরে গিয়েছিল।'

একেবারে নিশ্চিন্ত রায় দেয় পারুল।

—'তা হতে পারে'—নীরেন হাসে ঃ 'তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে "রাক্ষুসী" তোমার বেয়াইয়ের ছেলেটিকে খেয়ে ফেলেনি।'

রাগে গমগম করে চলে যায় পারুল।

দেওরের ওপরও চটে গিয়েছে সে।

ঠাট্টা করে বটে নীরেন, কিন্তু অবাক্‌ও একটু হয় সে।

অনেকদিন ধরেই দুটি পরিবার একই বাড়িতে বাস করছে, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে বিমলাকে, একটা হাস্যকর বস্তু ভিন্ন আর কোনও ধারণাই তো ছিল না তার ওপর। হঠাৎ সে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কোন্ ফাঁকে? স্বেচ্ছায় নিজেকে কেন্দ্র করে একটা বিশ্রী আবহাওয়া সৃষ্টি করবার অর্থ কী?

আচ্ছা, বিমলার ওপর নীরেনের এটা অবিচার নয়?

বিমলা আবার ভয়ঙ্কর হল কোথায়? পৃথিবীটাই যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে বিমলার কাছে।

বিমলার দোতলায় ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে বটে, ছাব্বিশ বছরের মেয়েকে ঠ্যাং খোঁড়া করবার ভয় দেখিয়ে রেখেছেন হেমন্তবাবু, কিন্তু নীচের তলাতেই কি বিপদের অভাব?

বাড়িওলার ভাইটা যে সেদিন ভাড়া রসিদ দিতে এসে আর একটু হলেই বিমলার হাতখানা ধরে ফেলেছিল, তার কি? .... সামনের বাড়ির নতুন ভাড়াটেদের ছেলেটা যে ঠিক বিমলার রান্নাঘরের জানলার সামনে দিয়েই সিনেমার গান গাইতে গাইতে যায়, কী বিহিত হচ্ছে তার?

হেমন্তবাবুর অফিসের যে ছোকরা এ পাড়ায় থাকে, কালে কস্মিনে হয়তো যাবার সময় হেমন্তবাবুর খোঁজ নিয়ে যেত, আজকাল নিত্যিই তার আসার ধুম পড়েছে কেন? হেমন্তবাবুর শরীর খারাপ তো তার কী মাথাব্যথা? ওসব ছল ছাড়া আর কি? ... কড়া নাড়লেই তো দরজা খুলতে সেই বিমলা? দরোয়ান তো নেই দোরে? তবে?

সাধে বলছি, পৃথিবীটাই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে বিমলার পক্ষে।

অথচ বলতে গেলে খুড়ীর কাছ থেকে এক ফোঁটা সহানুভূতি জোটে না বিমলার, বরং ঠোঁট উল্টে ব্যঙ্গ করে সুবর্ণ বলে—'ছোঁড়াগুলো যে তোর হাঁটুর বয়সি বিমলি, বলতে ঘেন্না হয় না?'

নয়তো আরও কুৎসিত করে বলে—'রূপ দেখে জ্ঞান হারায়, তাই সামলাতে পারে না বোধ হয়। এবার থেকে বরং বোরখা পরে থাকিস বিমলি।'

একা বলে সুখ হয় না, পারুলকে ডেকে ডেকে বলে আর হাসাহাসি করে।

পারুলের আবার সব গল্প ঠাকুরপোর সঙ্গে করা চাই। বিয়ের কনেবেলায় এসে নীরেনকে দেখেছিল বারো বছরের নাবালক বালক। দেওরের সম্বন্ধে সেই নাবালক-বোধটা এখনও সমানেই প্রায় রয়ে গেছে পারুলের। ও যে এম.এ. পাস-টাস করে এখন দিব্যি মাতব্বর প্রফেসর হয়ে বসেছে, নিজস্ব গল্পগুলো করবার সময় সেটা মোটেই ভাবে না পারুল।

তাই আজকাল ওর গল্পের বেশ ভালো খোরাক যোগাচ্ছে বিমলা। নীরেনকে হাতের গোড়ায় পেলেই সেইসব সভ্যভব্য কথার আমদানি করে বসে। বলে—'শুনছো ঠাকুরপো, আমাদের "পরীর" আজকের কাহিনী? কে নাকি জানলা দিয়ে ওকে চিঠি ছুড়ে দিয়ে গেছে। রাজ্যিসুদ্ধ লোকের এমন মরণ-দশাও ধরেছে গো? বাবাঃ! বানিয়ে এতও বলতে পারে!'

নীরেনও অবশ্য এক আধ সময় যে হাসে না, তা নয়। হেসে বলে—'চিঠিটা বোধ হয় নিজের হাতেই লিখে দেখিয়েছে?'

—'ঘোড়ার ডিম। মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। চিঠি কোথায়? ... জেরা করতে বলল—রাগ করে নাকি উনুনে ফেলে দিয়েছে। বোঝ এখন? সত্যি, এসবে তো বুদ্ধি বেশ খোলে। মাথায় আসেও তো উত্তুরগুলো।

আবার হয়তো কোনওদিন—আরও কোনও—আরো কারুর—আরও বেশি বেশি বে-আইনি ব্যবহারের নালিশ ওঠে—বিমলের দিক থেকে। পারুল তার বিশদ ব্যাখ্যা করতে বসে। হেসে কুটি কুটি হয়ে বিমলার রচনাশক্তির তারিফ করে। সব সময়ই যে উত্তরের প্রত্যাশা করে, তা নয়—বলেই আমোদ।

নীরেন এক একবার তাড়া দেয়, বলে—'হঠাৎ বিমলা তোমার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠল কেন বল তো? ওর কথা ছাড়া আর কথা নেই? এবারে 'ক্ষ্যামা' দাও। বিমলা সম্বন্ধে তুমি যত ইন্টারেস্টেড্, আমি ঠিক তা নই। সত্যি, পরচর্চায় কি পরমসুখ তোমাদের?'

কদাচিৎ বা হাসে, বলে—'এ তোমার অন্যায় বৌদি। গল্প-রচনা করছে, তাই বা ধরে নিচ্ছো কেন? ত্রিসংসারে কি মন্দ ব্যক্তি নেই। সবাই আমার মতো মহাপুরুষ?'

পারুল হেসে গড়ায়, বলে—'তোমার মতো মহাপুরুষ না হোক, ছিষ্টিসুদ্ধ লোক পাগলও তো নয় ঠাকুরপো? প্রেমপত্তর, গোলাপ ফুল সিল্কের রুমাল—ছুড়ে দেবার উপযুক্ত পাত্রী আর কোনওখানে কারুর জুটছে না?'

—'আহা। অত অবিচারই বা কেন তোমাদের? কালো কি কেউ হয় না? আমাদের 'সাগর পিসি'র মূর্তিটা কল্পনা কর, আমাদের সাগর পিসেমশাই তো—সেই গিন্নি নিয়েই—'

পারুল তর্ক শুরু করে, বলে—'তাদের আমলে ছেলেবেলায় বাপ-মায়ে বিয়ে দিত। লোকে জানত—এই রত্নটিই আমার একমাত্র। সে আর করবে কি? তাই বলে—সেই মূর্তি দেখলে কারুর প্রেমে পড়বার শখ হবে?'

'হবে না কেন? তোমরাই তো বলো,—এক্ষেত্রে হাড়িডোমও অচল নয়।'

পারুল দুই চোখ বড় বড় করে বলে—'ও ঠাকুরপো। তুমি ওর হয়ে যা ওকালতি করছ—দেখে ভয় লাগছে!'

'লাগছে নাকি?'

—'তা কে জানে বাবা? হাড়িডোমের উদাহরণ দেখাচ্ছ—'

বলে আর হেসে গড়িয়ে পড়ে পারুল।

কালো কুৎসিত বোকা শয়তান—যাই হোক, বিমলাকে নিয়ে কেউ কখন মাথা ঘামাতও না, শয়তানীর এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে বিমলাই অপরের মাথার টনক নড়িয়েছে।

পারুল আর সুবর্ণ বিমলার স্বজাতি বলেই বোধ হয় নিষ্করুণ চিত্তে শুধু সমালোচনা করেই মজা দেখে, পুরুষের স্বাভাবিক মমত্ববোধে নীরেন একটু অস্বস্তি পায়। মনে মনে চটে যায় হেমন্তবাবুর ওপর, কানা-খোঁড়া বাদ দিয়ে, যা হোক একটা সাপ-ব্যাং ধরে, মা-বাপ-মরা ভাইঝিটার সদ্‌গতি করে ফেললেই তো পারেন ভদ্রলোক।

কিন্তু আশ্চর্য। এই অদ্ভুত কুৎসিত বটতলার উপন্যাস রচনা করবার শখ কেন বিমলার? কী লাভ? কারণটাই বা কী? ওর ওই প্রায়-যৌবনোত্তীর্ণ জীবনে কেউ কখনও ওকে নারীত্বের স্বীকৃতি দিল না বলেই কি, সেই খবরটা সম্বন্ধে অপরকে সচেতন করে তোলবার এই বিকৃত

সর্পিল পন্থা আবিষ্কার করছে বিমলা? ... পুরুষ জাতটা যে ওর সম্বন্ধেও মোহমুক্ত নয়, এই প্রমাণ দেখবার জন্যেই কি তার চেষ্টার আর অন্ত নেই?

কে জানে। কুরূপা নারীর হৃদয়রহস্য বিশ্লেষণ করবার শখ আর সময় কার থাকে? অতএব বিমলার চিন্তা বাতাসে উড়ে যায়।

হলে হবে কি, তখনকার মতো যায়, আবার বিমলা ফিরিয়ে আনে তাকে। লোক যত উপহাস করে, ততই আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অঘটন ঘটতে থাকে বিমলার জীবনে। সে বৃত্তান্ত বলে বেড়াবে না সে? ... এই যে —সুবর্ণর বোনপো বারো মাস আসে যায়,—হঠাৎ যে সে চা নিতে গিয়ে বিমলার হাতখানা চেপে ধরল, সে ঘটনা হজম করে যাবে বিমলা? কেন? তার বুঝি মান-মর্যদা নেই। ফিসফিস করে পারুলের কাছে বলবে না?

আর কেউ নয় সুবর্ণলতার বোনপো!

এরপরও সুবর্ণলতা হাসাহাসি করবে—এমন আশা করা যায় না। নিজে বিমলার গায়ের ওপর গেলাস ছুড়ে মেরে কালশিটে পড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, হেমন্তবাবুকে দিয়ে আগা-পাছতলা চাবুক মারাবে,—এ আশ্বাস দিয়ে রাখে বিমলাকে।

সশব্দেই ঘোষণা করে।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে—এ মেয়েকে কেন তার মা আঁতুড়েই গলা টিপে মারেনি?'

সুবর্ণলতার বোন্‌পো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, রূপের কান্তি ছেলে। বয়সে বিমলি লক্ষ্মী-ছাড়ীর চেয়ে কোন্ না পাঁচ বছরের ছোট। তার নামে এত বড় অপবাদ। ও মেয়েকে কেটে কেটে নুন দিলেও রাগ সত্যিই যায় না।

দুঃসাহসেরও তো একটা সীমা আছে? বিমলা দুঃসাহসের সীমা ছাড়িয়েছে বলেই তার ওপর লাঞ্ছনাটাও সীমা ছাড়ায়। দোতলা-তেতলা—সব ছাপিয়ে বোধ করি আকাশে ওঠে বিমলার লাঞ্ছনার বার্তা।

তা উঠলেই বা কী?

স্বয়ং ভগবানের কানে পৌছলেই কি এই হাত-হাবাতে হতচ্ছাড়া মেয়েটার ওপর তাঁর এক ফোঁটা সহানুভূতি জাগবে?

দুর্ভাগার উপর সহানুভূতি আসে—দুর্বুদ্ধির ওপর আসবে কেন?

এইবারে সত্যিই উঠে পড়ে লেগে বিমলার বিয়ের চেষ্টা করেন হেমন্তবাবু।

সুবর্ণলতা শাসিয়েছে—'ও মেয়ে যদি একদিন ঘর ভেঙে পালায়, আমি কিন্তু তার দায়িক হব না, বলে দিচ্ছি! ভালো চাও তো দূর করো—'

কয়েকদিন ধরে আবার অহিংস সংগ্রাম চলছে বিমলার। তাই এত বেশি হিংস্র হয়ে উঠেছে সুবর্ণলতা।

অথচ সত্যিই কি সব দোষ বিমলার?

পুরুষের লুব্ধতার যে কাহিনী সে প্রকাশ করে বেড়ায়, সে সমস্তই কি মিথ্যা গল্প? তবে—নিজের চোখে তার সপক্ষে প্রমাণ পেলেন কী করে হেমন্তবাবু? ... নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারেন না?

প্রায় নিশুতি রাত্রে, রান্নাঘরের সবকিছু কাজ মিটিয়ে পরদিনের কুটনোগুলো পর্যন্ত কুটে রেখে বিমলা যখন রান্নাঘরের শেকল লাগাচ্ছে, ... নীরেন নিঃশব্দে দোতলা থেকে নেমে এসে পেছন থেকে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখল কেন?

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে বিমলা মুখ ফিরিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল। এ পর্যন্ত সমস্তই স্পষ্ট দেখতে পেলেন হেমন্তবাবু, কিন্তু ধৈর্য ধরে আর কিছু দেখতে পারলেন না। আজন্মের সংস্কারে বাধল। ... তাই হঠাৎ বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতসারেই নকল কাশির আওয়াজে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করে বসলেন।

এই নির্বুদ্ধিতার জন্যে সুবর্ণলতার কাছে যথেষ্ট মুখনাড়া খেলেন ভদ্রলোক। আর একটু অপেক্ষা করে, একেবারে হাতেনাতে ধরতে পারলেও তো একটা কাজ হত! হয়তো নীরেনকে কাদায় ফেলে বিয়ের একটা সুরাহা হতে পারত। ...

—'সাধুপুরুষ! চিরকুমার থাকবেন। এতই যদি সাধুতা, তো—এসব কী?'

হেমন্তবাবু কিন্তু ভাবেন অন্য কথা!

মানুষ জিনিসটা সত্যিই এমন গোলমেলে? নীরেনকে তো অনেকদিনই দেখছেন তিনি, সত্যিই যাকে হীরের টুকরো ছেলে বলে, তা-ই। বয়সে ছোট হলেও তাকে যথেষ্ট সমীহ—শ্রদ্ধা করেন হেমন্তবাবু। তার প্রকৃতির সঙ্গে এ ব্যবহারের সামঞ্জস্য কোথায়?

আবার দেখ—বিমলা। ওর প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি অভিযোগই যে মিথ্যে করে বানানো, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ ছিল না বরং তার নিজেরই রীতি-প্রকৃতি প্রশংসনীয় নয়। অথচ হেমন্তবাবুর গলার আওয়াজ পেতেই নীরেন যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল, বিমলা সিঁড়ির সব নীচের ধাপটায় বসে পড়ে অমন নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল কেন? খুব বেশি মর্মাহত না হলে কি মানুষ অমন নিঃশব্দে কাঁদে? নীরেনের ব্যবহারে যে সে আচমকা খুব আঘাত পেয়েছে, তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন হেমন্তবাবু। ঠিক মাথার ওপরই লাইটটা জ্বলছিল, দেখার ভুল হয়নি।

হিসেব মেলে না।

বিচলিত চিত্তে তক্ষুণি গিয়ে সুবর্ণলতাকে না বলে ফেললে হয়তো পরে চেপেই যেতেন তিনি, কিন্তু আর তো চারা নেই। একবার সুবর্ণর কানে উঠলেই তো হয়ে গেল! ...

নেহাৎ নাকি ঘটনাকালটা রাত্তির, তাই কথাটা পারুলের কানে যেতে ঘণ্টা কতক দেরি হল।

এবারে রাগের পালা পারুলের।

নীরেন তার বোনপো না হলেও কম 'আঁতের' জিনিস নয়। তা ছাড়া—দেওরকে সে সত্যিই মহাপুরুষের দরে দেখে। দেখছে তো ছোট থেকেই, চাঁদে কলঙ্ক আছে তো নীরেনে নেই।

তাই মুখ অন্ধকার করে বলে—'নিজের চোখে দেখলেও একথা বিশ্বাস করব না 'ভাই, আমার দেওরকে আমি জানি না? একদিকে সোনা, আর একদিকে ঠাকুরপোকে ওজন করো, তুল্যমূল্য হবে।'

সুবর্ণ দুই ভুরু টেনে বলে—'অত সোনা তো আমাদের গরিবের ঘরে নেই পারুল, তুলনা করবার সুবিধে কোথায়? তবে কথায় বলে—মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, তা' মানুষ কোন্ ছার!'

মতিভ্রম-সৃষ্টি করবার কারণটাও যে উপযুক্ত হওয়া চাই, সেই কথাটাই শুধু উল্লেখ করে পারুল। কিন্তু সুবর্ণ সে কথা গায়েও মাখে না। 'রূপে'র সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে গাঁথা পরবর্তী শব্দটার

সম্বন্ধে অবহিত করিয়ে দিয়ে বলে —'আমার কথা ওড়াতে পার, এনার কথা তো পারবে না? ইনি নিজে দেখেছেন।'

কথায় কথায় তর্ক, অবশেষে বচসা!

সুবর্ণ মুখরা, পারুলও কথায় হারবার মেয়ে নয়। যথেচ্ছই বলে সে। এতদিনের বন্ধুত্বডোরে আবদ্ধ দু'টি নারী, যেন কলহের নেশায় মাতাল হয়ে ওঠে। একথাও বলতে ছাড়ে না পারুল—বিয়ে তো ইচ্ছে করেই দিচ্ছে না সুবর্ণরা। বছরে দুখানা ট্যানা আর দৈনিক এক থালা ভাত দিয়ে—তিনটে লোকের কাজ পাওয়া যাচ্ছে যখন!

কিন্তু আশ্চর্য, বিমলা যেন একেবারে পুতুল হয়ে গেছে। এত কাণ্ড, এত কথা, ও একেবারে চুপ!

পুরুষ জাতির দুর্বলতার এত বড় একটা জ্বলন্ত প্রমাণ হাতে পেয়েও সদ্ব্যবহার করে না তারা কেন? অন্তত একথা তো বলতে পারত, —'দেখ পুরুষচিত্তে মোহ-সঞ্চার করবার ক্ষমতা কোনও রূপসী তরুণীর চেয়ে বিমলার কিছু কম নয়।'

আর সে চিত্ত কি যেমন তেমন?

বিমলার কাছে—আকাশের চাঁদ!

কিন্তু না, এত সুযোগ পেয়েও চুপ করে থাকে বিমলা। সাড়া পাওয়া দূরের কথা, দেখতেই পাওয়া যায় না তাকে।

পারুল ঝগড়া করে করে ক্লান্ত হয়ে চুপচাপ শুয়ে ছিল নীরেনের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়। দাদার চেয়ে অনেক আগেই ফেরে সে। ফিরতেই পারুল বিদ্যুৎবেগে উঠে একেবারে 'ঝটিকা আক্রমণে'র ভঙ্গিতে বলে—'বলি ঠাকুরপো, তুমি নাকি কাল রাতদুপুরে অভিসারে গিয়েছিলে?'

রাগলে পারুলের মুখের আগল থাকে না নীরেন জানে, তাই কিছুমাত্র না চমকে মৃদু হেসে উত্তর দেয়ে—'তা' ওটাই প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু সে খবরটি ইতিমধ্যেই কর্ণগোচর হয়েছে তোমার?'

পারুল গালে হাত দিয়ে বলে—'এমন গায়ে হাওয়া দিয়ে কথা বলছ, মানে? ব্যাপারটা কী শুনি?'

নীরেন গায়ের জামাটা খুলে সামনের দড়িতে টাঙাতে টাঙাতে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে—'আমি আর কতই বলতে পারব? আমি যা জানি, তার চেয়ে বেশিই শুনে ফেলেছ, আশা করছি।'

পারুল চোখ পাকিয়ে বলে ওঠে—'ঠাকুরপো, রাগিও না বলছি—সোজা-সুজি জবাব দাও, কী হয়েছে কাল?'

'সে কো তনিজেই তুমি বলেছ আগে!'

—'বলেছি বলে, তাই বিশ্বাস করব আমি? সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না ঠাকুরপো, মন-মেজাজ, আজ মোটে ভালো নেই আমার। হেমন্ত-গিন্নি ডেকে নিয়ে গিয়ে না-হক কতকগুলো অপমান করল।'

ভাজের উত্তেজিত ভঙ্গিতে ভারি যেন কৌতুক বোধ করে নীরেন, হেসে ফেলে বলে—'বাঃ, অপরাধ করলাম আমি, আর অপমান করল তোমাকে? কেন?'

'অপরাধ করলে তুমি? স্বীকার করছ নিজের মুখে?'

পারুল হতবাক্ হয়েও এটুকু উচ্চারণ করে।

—'তা অস্বীকার করে লাভ কি?'—কেবলি হাসে নীরেন ঃ 'অব্যাপারেষু ব্যাপারং তো? লোক-জানাজানি হয়ে একাকার। কে জানে বাবা, বুড়ো তখনও জেগে বসে আছে?'

এ আবার কোন্ ধরনের পরিহাস নীরেনের। পরিহাসেরও তো একটা সীমা সভ্যতা থাকা উচিত!

ওর এই উৎকট পরিহাসের ভঙ্গিতে বাক্‌পটু পারুলও বোকা বনে যায় যেন, তাই বোকার মতোই বলে—'তবে যাও না—যাও, বিমলিকে বিয়ে করো গে?'

—'তা ছাড়া আর উপায় কি?'—অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করে নীরেন ঃ 'বলে এলাম তাই হেমন্তবাবুকে!'

—'তা হলে—সত্যিই তুমি? ঠাকুরপো! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

—'নাঃ ঠিক অতদূর পৌঁছাইনি বোধ হয়।

—'আরও কী হবে ঠাকুরপো? আর কী হতে পারে? শেষ পর্যন্ত কি না বিমলিকে? ছি ছি ঠাকুরপো, গলায় দিতে দড়ি জুটল না তোমার?'

ঠাকুরপো সশব্দে হেসে ওঠে—'গলায় দিতে দড়িই তো একগাছা জুটল বৌদি, ফুলের মালা আর জুটল কই?'

পৃথিবীতে যত সব অঘটন ঘটে, তারই নমুনাস্বরূপ সত্যিই একদিন নীরেনের সঙ্গে বিমলার বিয়ে হয়ে গেল।

এরপর সহজেই মনে করা যেতে পারে, বিয়ে-পাগলা বিমলা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠেছে। কিন্তু কই? সেই রাত থেকে—সেই যে মৌনব্রত নিয়েছে বিমলা সে ব্রত-ভঙ্গই হল না যে।

বারো বছর সময়কে যদি এক যুগ বলে ধরা হয় তো—একটা যুগ ব্যাপী আকাঙ্ক্ষার শেষ হল তো তার?

সুদীর্ঘ কাল ধরে—কত জনের দেখে, কত জনের শুনে, মনে মনে কত কল্পনাই যে করে রেখেছিল বিমলা এই রাত্রিটির জন্যে! অনেক আশায় গড়া, অনেক কামনার রঙে রাঙানো ফুলশয্যার রাত্রি। সে কি শুধু, বরের পায়ের কাছে পড়ে পড়ে চোখের জল ফেলবার জন্যে? এই কি পরিকল্পনা ছিল বিমলার?

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদতে দিয়ে নীরেন ওর মাথার ওপর একটা হাত রেখে মৃদু হেসে বলে—'এবার থামো। চোখের জলটা সমস্ত খরচ করে ফেললে, ভবিষ্যতের জন্যে রাখবে কী? বৌদির এক্তারে ঘর করতে হবে সেটা ভুলো না!'

তবু বিমলা মুখ তোলে না, তেমনি মুখ ঢেকেই বলে—'তুমি কেন এমন করলে? কেন আমাকে চাবুক মারলে না? কেন আমাকে একেবারে মেরে ফেললে না?

নীরেন হেসে উঠে বলে—'একেবারে মেরে ফেলবার ইচ্ছেটা মাঝে মাঝে প্রাণে জাগত সত্যিই, কিন্তু ফাঁসির ভয়টাও তো উড়িয়ে দেবার নয়? ভেবে চিন্তে—এই সমাধানটাই সহজ মনে হল।'

—'এত শাস্তি যে আমি সইতে পারছি না। আমি কী করব?'

—'শাস্তি। কি আশ্চর্য। হায় বিধি, এই ছিল ললাটে আমার।'—

বেশ স্পষ্ট করেই হেসে ওঠে নীরেন: 'এমনিই দুর্ভাগা আমি যে, আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা শাস্তি।'

—'হ্যাঁ শাস্তি! একশো বার শাস্তি। শাস্তি ছাড়া আর কি?'

শরাহত বন্যপশুর মতো নীরেনের পায়ের কাছে বিছানায় মুখ ঘষতে থাকে বিমলা। তার আবেগের অভিব্যক্তির ধরনটাই হয়তো এমনি অস্বাভাবিক।

পিঠের ওপর ভারী আর কোমল একখানা গভীর হাতের স্পর্শ পায় বিমলা, হয়তো এই স্পর্শের মধ্যেই ছিল তার প্রশ্নের উত্তর, তবু মৃদুগম্ভীর একটি স্বর কানে আসে—'ওরকম করতে হয় না, ছি! এস—উঠে এস। নিজেকে অত বেশি ছোট ভাবতে নেই, বিমলা।'

নীল ছায়া

রিসিভারটা হাত থেকে পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল। আর্তনাদ করে উঠল টুলু, 'অ্যাঁ', সে কী? কী বলছ, কী!'

আর্তনাদের শব্দে টুলুর বর কান্তিকুমার ও-ঘর থেকে ছুটে এল। বলল, 'কী হ'ল! এমন চেঁচিয়ে উঠলে যে? কে ফোন করছে?'

'ছোড়দা!' টুলু কাঁপা গলায় বলে, 'বলছে সেজবৌদি মারা গেছেন!'

শুনে কান্তিকুমারও টুলুর মতোই আর্তনাদ করে উঠল, 'অ্যাঁ! তার মানে!'

'মানে বুঝতে পারছি না। ধর তুমি, আমার মাথা ঘুরছে।' রিসিভারটা বরের হাতে তুলে দিয়ে বিছানায় বসে পড়ল টুলু। কান্তিকুমারের একতরফা কথা থেকেই যেটুকু 'মানে' বুঝতে পারা যায় যাক। এখুনি তো ছুটতে হবেই, পৌঁছতে হবেই অকুস্থলে। শুধু যাবার আগে একবার জেনে নেওয়া, এমন আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ কী!

কান্তিকুমার বলে চলেছে, 'কী বললে? এইমাত্র!.... ডাক্তার ডাকবার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায়নি? কী আশ্চর্য! অমন শরীর! গত রাত্রেও যথারীতি খেয়েছেন, শুয়েছেন? সেজদার কথা কী বললে?..... ও একেবারে পাগলের মতো করছেন ? তা তো করবেনই। এ-রকম ক্ষেত্রে পাগলামিটাই তো স্বাভাবিক। উঃ, ইস্‌স্‌। একেবারে চিকিৎসার সময় পর্যন্ত পেলেন না। আচ্ছা আমরা এখুনি যাচ্ছি। কয়েক মিনিট পরেই। এদিকে টুলুর আবার শুনেই মাথা ঘুরছে।'

তা এ-সংবাদ শুনে মাথা ঘুরল আজ বহুজনের। টুলুর সেজবৌদির ভক্ত, অনুরক্ত, গুণগ্রাহীর সংখ্যা তো কম নয়। টুলুর সেজবৌদি মানে শুধু টুলুর সেজদার বৌ নয়, সে যে অনেক কিছু। সে হচ্ছে দেশের একজন, দশের একজন। কত যশ, কত সম্মান, কত প্রতিষ্ঠা তার! সুবিখ্যাত গায়িকা আহরিকা রায়ই তো টুলুর সেজবৌদি। যাঁর গানের নামে ছেলে-বুড়ো সবাই পাগল। গতকাল সন্ধ্যাতেও যিনি রেডিওতে গান গেয়ে এসেছেন, তাঁর সুধাকণ্ঠের মাধুরী ছড়িয়ে। তাঁর ভক্ত শ্রোতারা নির্দিষ্টকালে রেডিওর চাবি খুলে নিষ্ঠার সঙ্গে শুনেছে সে-গান। স্বপ্নেও ভাবেনি তারা, হঠাৎ আজ সকালেই শুনতে হবে এই মর্মান্তিক সংবাদ, শুনতে হবে সেই সুধাকণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গিয়েছে। বিশ্বাস হতে চাইছে না কারও।

টুলুর ছোড়দা মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকেই ফোন করতে শুরু করেছিল আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে। কিন্তু ক্রমশ আর তারযন্ত্রের মধ্যস্থ আদান-প্রদানটা মাত্র আত্মীয়-বন্ধুর মধ্যেই

সীমাবদ্ধ রইল না, এ-খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতার সর্বত্র। তাই মুহুর্মুহু জবাব দিতে হচ্ছে টুলুর ছোড়দাকে এ-খবর সত্যি কি না।

সত্যি যদি তো—'কখন, কেন, কী অবস্থায়?'

উত্তর দিতে দিতে ভাষাটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে—টুলুর ছোড়দার।

'এই খানিকক্ষণ আগে। গতকালও গান খেয়ে এসেছেন, আজও যথারীতি সকালের চা'টা খেয়েছেন, হঠাৎ বললেন, শরীরটা খারাপ লাগছে।..... না, ডাক্তার ডাকবার সময় আর হল কই? দুর্ভাগ্য।'

টুলুর ছোড়দার কথাটা সত্যি, দুর্ভাগ্য বই কী। না হলে রায়বাড়ির সামনের ওই সরু রাস্তাটা ওই রকম বড় বড় গাড়িতে ভরে যায়? এই এত এত গাড়ি, সব কিছু আর টুলুর ছোড়দাদের আত্মীয়বর্গের নয়? এ-সব টুলুর সেজবৌদির ভক্তজনের। কেউ শুধু একবার শেষ দেখা দেখতে এসেছে, কেউ বা এসেছে সদ্যমৃতাকে মাল্যদান করতে।

টুলুর সেজদা প্রথমটা পাগলের মতোই হয়ে উঠেছিলেন, এখনও চোখে-মুখে, চোয়ালের রেখায়, অবিন্যস্ত চুলে উদ্‌ভ্রান্তের ভাব স্পষ্ট, তবু নিজেকে সামলে নিয়েছেন ভদ্রলোক, সামলে নিতে হয়েছে। আগন্তুকদের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করতে হবে তো? তাই ভিতরে ভিতরে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেও শান্ত মার্জিত নরম গলায় বলতে হচ্ছে তাঁকে, 'ঈশ্বরের বিধান। মাথা হেঁট করে মেনে নিতেই হবে, উপায় কী। আপনাদের ক্ষতির কাছে আমার ক্ষতিটা যেন ছোট হয়ে আসছে।'

ভিতর-বাড়িতে মেয়েমহল আছড়াচ্ছে তখনও। সেজবৌ নেই, এ যেন কেউ চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না। এ-বাড়ির মধ্যমণি হচ্ছে সেজবৌ, রূপে-গুণে আলো করা। মধুর স্বভাব, হাসিখুশি, চঞ্চল, উজ্জ্বল। তার গুণ বর্ণনা করে করে ফুরোতে পারছে না এরা। এর সঙ্গে ভাবনা সেজদাকে নিয়ে। এরপর সেজদাকে কি আর বাঁচান যাবে? সেজবৌদি-হারা সেজদা, এ যে ভাবাই যাচ্ছে না।

বৌ হেঁটে গেলে তাঁর বুকে বাজে, বৌ হাসলে তার মুখে আলো জ্বলে, বৌ একটু গম্ভীর হলে তাঁর চোখে ত্রিভুবন অন্ধকার।

বৌয়ের এই গান-গান বাতিকে কতটুকুই বা পেতেন তিনি বৌকে? নিত্যদিনই এখানে-সেখানে জলসা, বিচিত্রানুষ্ঠান। তবু তাতেই ধন্য, তাতেই মুগ্ধ তিনি।

'তবু তো—' টুলুর বড়দি বলছিলেন গলা নামিয়ে, 'তবু দেখ, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা তো অনেকদিন থেকেই নেই। দুজনে দুঘরে। আমাদের বরং একটু অসহ্য লাগত ; কিন্তু শিশিরকে এজন্যে একটি দিন ক্ষুণ্ণ হতে দেখিনি।'

টুলুর মামাতো বোনেরা, যারা কালেভদ্রে এ-বাড়িতে আসে, তারা চমকে উঠে উদ্‌গ্রীব হয়ে বলে, 'সে কি? কেন?'

টুলুর বড়দি আরও গলা নামালেন, 'শুনেছি, সেজবৌয়ের গানের গুরুর নির্দেশ। ব্রহ্মচর্য না করলে—'

কেউ অস্ফুটে বলল, 'বাবা।' কেউ স্ফুটতর করে বলল, 'শিশিরদাকে ধন্য বলতে হবে। মেনে নিয়েছিল একথা?'

টুলুর বড়দি চোখ গোল করে বলে উঠেছিলেন, 'ও বাবা, তা আবার নেবে না? বৌয়ের গানের উন্নতি-উন্নতি করেই তো—'

টুলু থামিয়ে দিল, 'ওকথা যাক্ বড়দি, তুমি বরং ও-ঘরে যাও, সেজবৌদিকে সাজিয়ে দাওগে—'

'আমি পারব না টুল,' বড়দি কেঁদে ওঠেন, 'বিয়ের কনেটিকে এনে বৌ সাজিয়ে বসিয়েছিলাম আমিই, আবার শেষ সাজ সাজাব? তোরা যা।'

বললেন, তবু উঠেও গেলেন।

জানেন তিনি না গেলে ঠিকমতো হবেও না। এ-কাজ তাঁর একচেটে। আত্মীয়কুলের যেখানে যখন এ-দুর্ঘটনা ঘটে, তিনিই এ-ভার নেন।

শোকে মুহ্যমান হয়ে আছে বাড়ির নীচের তলায় পুরুষ আত্মীয়ের দলও। ক্রমশ বহিরাগতরা বিদায় নিয়েছে, এখন শুধু নিকট আত্মীয়েরা। বাড়ির দু-একজন ভাগ্নে আর জামাই গিয়েছে ফুল, মালা আর পালিশকরা খাট আনতে।

আরও কেউ কেউ এখানে সেখানে, আর সবাই শান্ত স্তব্ধ, শোকাহত।

এই সময় ডাক্তার এলেন।

না—চিকিৎসা করতে নয়, সার্টিফিকেট দিতে। দেহটা পুড়িয়ে ছাই করতেও ছাড়পত্র চাই যে! মরে গিয়েও পার আছে নাকি আইনের হাত থেকে? তার বোধহীন অনুভূতিহীন অসাড় দেহটার উপরেও আইনের অধিকার, তাই মরবার পরেও চিকিৎসক। ডাক্তার টুলুর সেজদার বন্ধু বলতে গেলে এ-বাড়ির পরিজনেরই একজন। প্রথমে আসতে চাননি, শিশিরের টেলিফোনে অনেক ডাকাডাকিতে এসেছেন শোকার্ত বিবর্ণ মূর্তিতে।

এসে দাঁড়াতেই এরা উঠে দাঁড়াল। ডাক্তার ম্লানকণ্ঠে বললেন, 'শিশির কই?'

শিশিরের বড় ভাইপো করুণ কণ্ঠে বলল, 'সেজ কাকিমার গানের সেই ছোট্ট ঘরটায়। সকাল থেকে ক্রমাগত বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খুব টায়ার্ড হয়ে পড়েছেন তো।'

ডাক্তার অস্ফুটে কী একটা বলে ধীরে ধীরে উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। পরিচিত ঘরবাড়ি, অবারিত দ্বার।

উঠে এসে একবার মৃতার ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। নীল-ছায়াচ্ছন্ন সুন্দরী শুয়ে আছে এখনও নিজের খাট-বিছানায়। টুলুর বড়দির সাজানো পর্ব তখন সবে মিটেছে। নতুন শাড়ি আর সিঁদুর চন্দনের চাকচিক্যেও নীল আভাটা কি ঢাকা পড়েনি? নইলে ডাক্তার অমন শিউরে স্তব্ধ হয়ে গেলেন কেন?

টুলুর বড়দি ডুকরে উঠলেন, 'ডাক্তার, এ কী হল ভাই?'

ডাক্তার নীরবে একবার কপালে হাত ঠেকিয়ে বারান্দায় ও-কোণে সেই ছোট্ট ঘরটায় এসে ঢুকলেন। সেজবৌয়ের সেই গানের ঘরে।

একটা টেবিলের ধারে বসে রয়েছে শিশির।

ডাক্তার ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তার কাঁধটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে চাপা গর্জনে বলে উঠলেন, 'কী করেছ কী তুমি? শয়তান পশু।'

টুলুর সেজদা একটু নড়ে-চড়ে বসে পরিষ্কার গলায় বললেন, 'লিখে এনেছ?'

ডাক্তার ওর এই নিরুত্তাপ ভাব একটু সামলে নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'ডেড্‌বডি না দেখে লিখব কী করে?'

'ও, ওটা বুঝি আইন নয়? তোমরা ডাক্তাররা যে আবার সর্বদা আইন বাঁচিয়ে চল। যাক্ দেখা হয়েছে তো?'

'না, হয়নি।' ডাক্তার আবার উঠলেন, 'দেব না আমি সার্টিফিকেট, পুলিসে হ্যান্ড ওভার করব তোমায়।'

শিশিরের মুখে অদ্ভুত একটা হাসি খেলে গেল 'পাগল। তাই কখন পার?'

কাগজ আননি? এনেছ? লেখ 'সহজ স্বাভাবিক নির্ভেজাল সাধারণ মৃত্যু!' ওই যে কী একটা আছে তোমাদের—মৃত্যুর কারণ বুঝতে পা পারলেই যেটা বল—হ্যাঁ করোনারি থ্রম্বোসিস। ওটাই বসিয়ে দাও না? দেখতে শুনতে ভালো হবে।'

'শাট-আপ্!' চাপা রূঢ় কণ্ঠে ধমকে উঠলেন ডাক্তার, 'তোমাকে আমি ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারি তা জান?'

'পারো তা জানি'—প্রায় শব্দ করে হেসে উঠল টুলুর সেজদা, 'আবার কিছুতেই পারো না সেটাও জানি। চাল মারছ কেন? দাম চাও নাকি? চাও তো বল কত? পাঁচশো, হাজার?

ডাক্তার ক্রুদ্ধ গর্জনে আর একবার ওর কাঁধটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, 'শয়তানির কি একটা সীমা থাকবে না?'

'কই আর থাকে?'

'তুমি—' রাগে হাঁপাতে থাকলেন ডাক্তার, 'তুমি একটা জঘন্য জানোয়ার।'

'নিশ্চয়! হেসে উঠল শিশির 'নইলে আর তোমার বন্ধু হই? নেবে না তাহলে টাকা? নিলেও পারতে। কিন্তু ডাক্তার, তুমি ডাক্তার হয়েও এই সায়েন্সের যুগে এমন কেয়ারলেস না হলেও পারতে।'

ডাক্তারের মুখটা হঠাৎ ভয়ানকভাবে ঝুলে পড়ল। রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এ-কথার মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?'

'কিছু না ব্রাদার, কিছু না। পত্নীবিয়োগে মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে দু-একটা ভুল বকছি। কিন্তু ও নিয়ে মন খারাপ করে আর দেরি করো না। কে বলতে পারে কোথাও কোনও শত্রু বসে আছে কি না। এখুনি হয়ত পুলিসে খবর দিয়ে বসবে।'

ডাক্তার হঠাৎ সমস্ত উদ্ধত ভাব ছেড়ে বসে পড়লেন, ধরা গলায় বললেন, 'সত্যি কথা বলো শিশির, আত্মহত্যা না খুন?'

'পাগল?' টুলুর সেজদা আর একবার হেসে উঠলেন, 'তাই কখনও বলি? আমি চিরজীবন একটা প্রশ্নের ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকি আর তুমি সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত হবে? তাই কখনও হয়?'

মাথা হেঁট করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার ঝোলা ঝোলা মুখে। আর সেই দিকে চেয়ে রইলেন সুবিখ্যাত গায়িকা আহরিকা রায়ের স্বামী শিশির রায়। অদ্ভুত কঠিন ব্যঙ্গমিশ্রিত একটা তিক্ত হাসি ঠোঁটে নিয়ে।

এ-ব্যঙ্গ বুঝি শুধু ডাক্তার বন্ধুকেই নয়, ব্যঙ্গ সমাজকে, সভ্যতাকে, হয়ত বা নিজেকেও।

আর পরোলোকগতাকে?

না, তার জন্যে এখন আর ব্যঙ্গ নেই, বিদ্রূপ নেই, আগুন নেই, আছে এতটুকু একটু করুণা। এখন মনে হচ্ছে হয়ত এতটা না করলেও হত। আরও মানিয়ে নিয়ে চলা যায় কি না, তার পরীক্ষা দিলেও হত।

তারই বা বেশি দোষ কী!

কজন শিল্পী আর জীবন-শিল্পী হয়।

নেশা

বহুবিধ নেশার মধ্যে মানুষও যে একটা নেশার বস্তু, এ সত্যটা বোধ করি উপলব্ধি করবার অবস্থা থাকে না—অন্য সব নেশার মতো—মনুষ্য-নেশাসক্তদেরও। তাই নেশার ঘোরে যা কিছু বিসদৃশ ব্যাপার তারা ঘটায়, তার মধ্যে বিসদৃশ কিছু দেখতে পায় না।

সমস্ত পৃথিবীটা যে কেবলমাত্র রাশি রাশি চোখকানে ভর্তি, আর সেগুলো অপরের সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ, এ হুঁশ তো থাকে না ওই সব নেশাহত অন্ধদের।

হুঁশ থাকলে ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত সব কিছু মাথায় করে অথবা তুচ্ছ করে পার্থ প্রত্যহ সন্ধ্যায় কৃষ্ণাদের পারিবারিক আসরে যোগ দিতে আসত না।

কিছুই না—শুধু একটু আড্ডা দিতে আসা।

সরল বেচারা, ভাবতেই পারে নি অতি সাধারণ এই ঘটনাটির ভেতর থেকে দোষণীয় কিছু আবিষ্কার করে বসা কারও পক্ষে সম্ভব।

কী আশ্চর্য।

সে কি কেবল কৃষ্ণার সঙ্গেই আড্ডা দিতে আসে? বরং সে সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে। যত কিছু কাজ কৃষ্ণার, সবই তো জমানো থাকে এই চমৎকার সন্ধ্যাটুকুর জন্যে।

পার্থর তো তাই মনে হয়।

কৃষ্ণার মেয়েটিকে ফরমাশ করতে পেলে আর ছাড়েন না! সব ভালো ভদ্রমহিলার, ওই এক দোষ।

তারপর ধর—কৃষ্ণার বাবা আছেন প্রায় সব সময়। ছোট ভাইবোনেরা আছে। সকলের ওপর আছে শান্তা।

কৃষ্ণার বিধবা ছোট পিসি শান্তা।

যক্ষির মতো পাহারা দিচ্ছে সারাক্ষণ। নড়ে না চড়ে না, একটিবার ওঠে না। অবাক হয়ে যায় পার্থ, ওঁর কি কোনওদিন কোনও কাজ থাকতে পারে না এ সময়? কোনও কর্তব্য নেই—এই আড্ডাটা পাহারা দেওয়া ছাড়া?

তা পাহারা নয় তো কী? বললেই যা শুনতে খারাপ। সেই যে জানলার ধারে বেতের মোড়াটির ওপর বসে আছে এতকাল পশম আর লোহার দুটো কাঁটা নিয়ে, এ দৃশ্যের আর ব্যতিক্রম নেই।

অথচ এ আড্ডায় ওর আকর্ষণীয় কী আছে? ঘরে যদি দুশো রকমের আলোচনা হয়, একটি মন্তব্য করে না শান্তা। কোনওদিন ওর গলার স্বর শোনেনি পার্থ। ...ওর ওই নেহাত মেয়েলি সরু সরু আঙুল কটি যদি অমন মৃদু অথচ দ্রুত ভঙ্গিতে ওঠাপড়া না করত—অনায়াসে স্ট্যাচু বলে চালান যেত।...সেল্‌ফের ওপর সাজানো পাথরের বুদ্ধমূর্তিটার মতোই প্রায় অনড় গম্ভীর ভারিক্কি।...

শুধু নিতান্ত যখন পার্থর চড়া গলার দরাজ হাসিতে ঘর ভরে যায়, তখন পশমের ঘর থেকে একটিবারের জন্যে চোখ তুলে তাকায়। না, হঠাৎ চমকে উঠে তাকিয়ে ফেলে না, "যুগাবতারে"র ভঙ্গিতে ঊর্ধ্বমুখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। ...যেন বুঝতে পারছে না—পৃথিবীতে এত হাসি কেন, এত কথা কেন! যেন এতক্ষণ এ ঘরে অনুপস্থিত ছিল শান্তা, এইমাত্র এসে দাঁড়াল...চিনতে দেরি লাগছে সবাইকে।

আবার চোখ নামিয়ে নেয় দ্রুত আর নির্ভুল চলতে থাকে আঙুল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এই একইভাবে চালাচ্ছে শান্তা।

আশ্চর্য অধ্যবসায়!

অনেকদিন ভেবেছে পার্থ, শান্তার এই 'পোজ'-এর একটা ফোটো তুলে পেটেন্ট ওষুধের বিজ্ঞাপনের মতো ছাপিয়ে দিলে হয় কাগজে। শান্তার মতো কমবয়সি বিধবাদের কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

সামান্য দুটো লোহার কাঁটা পশমের গোলা যে বৈধব্য-যন্ত্রণার অমোঘ ঔষধ এটা কি জানে সবাই? এই নিয়েই তো স্বামীর স্মৃতি ভুলে আছে শান্তা।

"—আহা, আরও একটু বিস্মৃতি যদি আসত," পার্থ ভাবে মাঝে মাঝে—'শুধু স্বামীর স্মৃতি নয়, পার্থ আর কৃষ্ণাকেও যদি ভুলে থাকতে পারত শান্তা।"...ছাদে, বারান্দায়, সিঁড়িতে, বাড়ির আরও অন্য ঘরে বসলেই হয় কোথাও, একদিনে 'গোলা' পরিণত হোক 'গুলি'তে, কেউ তো কিছু জ্বালাতন করতে যাবে না শান্তাকে। তবে?

তবে কেন ভাবশূন্য মুখখানি নিয়ে এই ঘরেই সারাক্ষণ সে বসে থাকবে জানলার গোড়ায় বেতের মোড়াটি টেনে নিয়ে। বসে থাকবে যতক্ষণ থাকবে পার্থ।

পাহারা দেওয়া ভিন্ন আর কী অর্থ করা যায় এর?

পার্থর অভিমত শুনে কৃষ্ণা অবিশ্যি হাসে।

মানে প্রতিদিন যখন 'দৈবাৎ' দেখা হয়ে যায় ওদের নিচের তলায়, পার্থ চলে যাবার সময় রাস্তার দরজাটা বন্ধ করতেও তো আসার দরকার। কে আর দোতলা একতলা করতে রাজি হবে—কৃষ্ণার মতো কাজের মেয়ে ছাড়া?

কৃষ্ণা হাসে, বলে, না গো না, ও ঘরের 'বাল্‌ব্‌'টাই যে সব চাইতে পাওয়ারফুল। পিসেমশাই মারা যাবার পর থেকে ছোট পিসির চোখটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে কিনা। আহা বেচারা! আমার চাইতে কতই বা বড়? অথচ সব শেষ হয়ে গেছে। মায়া হয় না তোমার?

হত—পার্থ বলে—খুবই হত, যদি উনি তোমার চাইতে নিজেকে অনেক বেশি বিচক্ষণ না ভাবতেন।

তা এসব কথা কিছু আর শান্তার কানে যায় না। আর দোতলার ঘরে শান্তার চোখের সামনে, শান্তার চোখ এড়িয়ে কি এমন প্রেমালাপ তারা করতে পারছে যে, হঠাৎ একদিন সন্দেহ করে বসা হল তাদের?

পার্থ আর কী করে জানবে? কৃষ্ণাই বলল। ওই সেদিনও যখন দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল নীচের তলায়। বলল, তুমি আর কাল থেকে এস না, খবরদার।

ঠাট্টা মনে করে হাসল পার্থ : তা হলে তো আজ আর যাওয়া হয় না। থেকেই যেতে হয়।

বাজে বকো না—আস্তে কথা বলবার জন্যেই বোধ হয় পার্থর অত কাছে সরে আসে কৃষ্ণা : তোমার রোজ রোজ হাজরে দেওয়া নিয়ে অনেক কথা উঠেছে বাড়িতে।

পার্থ একটু গম্ভীর হল : কেন? কে কী বলেছে শুনি?

কে কখন প্রথম কী বলল জানি না, এখন তো দেখছি সবাই বলছে। আমার গতিবিধির ওপর কড়া পাহারা বসাবার পরামর্শ চলছে। শুনছি, তাতেও যদি কাজ না হয়—স্পষ্ট নিষেধ করা হবে তোমাকে। অতএব সসম্মানে নিজের পথ দেখ।

না হলে তোমার কিছু মন-কেমন করবে না তো?

নেহাত ছেলেমানুষি সুর বাজল পার্থর কণ্ঠে।

আমার? আমার কী জন্যে মন-কেমন করবে? করলে তো গার্জেনদের সন্দেহকেই সত্য করে তোলা হয়। হয় না?

কৃষ্ণার মুখ নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠল চুল, দুলে উঠল কর্ণাভরণ। পার্থর মনটা কি কোনও সূত্রে বাঁধা ছিল ওদের সঙ্গে? তা নয়তো অমন করে দুলে উঠছে কেন?

পারব না কৃষ্ণা।

কী পারবে না?

না-এসে থাকতে। —ভারী হয়ে এসেছে সুর।

তোমায় কেউ কিছু বলবে, সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না যে।

গুম হয়ে গেল পার্থ।

'কেউ কিছু বললে' অবশ্য তারও সইবে না। পুরুষের কাছে প্রেমের চাইতে আত্মসম্মান অনেক বড়।

রাগ করলে?

আরও কাছে সরে এসেছে বুঝি কৃষ্ণা? নইলে অত মৃদু স্বর পার্থর কানে পৌঁছল কী করে?

তোমার ওপর? রাগ করেছি তোমার ওপর?

আমিই তো বারণ করছি।

আস্ত পাগল তুমি একটি। কিন্তু এখন? কেন এলে এখানে? কেউ কিছু বলবে না তোমাকে?

হয়তো বলবে।

তবে যাও। লক্ষ্মীটি কৃষ্ণা, পালাও। বেশ, কথা রইল আর আসব না।

ওই তো—তুমি রাগ করলে?

বাক্‌চাতুরী ফুরিয়ে আসছে কৃষ্ণার, জল এসে পড়েছে চোখে।

এই দেখ কাণ্ড। সাধে বলছি, আস্ত পাগল। সত্যিই যদি কোনও কথা ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য! কে কী বুঝল। কটা কথাই বা আমাদের কইতে দেখেছে লোকে?

আমিও তো তাই ভাবছি—

ভারি অসহায় লাগছে কৃষ্ণাকে।

নিশ্চয় তোমার ওই ছোট পিসির কারসাজি।

খুব মিথ্যে নয়—কৃষ্ণা উত্তর দেয়, তুমি রাগ করবে বলে বলেছিলাম না। ছোট পিসিই বাধিয়েছেন কাণ্ডটি। তুমি যে বল 'পাহারা দেওয়া' সেটা দেখছি সত্যি। কে জানে বল, আমাদের চালচলন মুখচোখ সবকিছু ওয়াচ করেন উনি! হেঁট মুখে তো পশমই বোনেন বসে বসে। অথচ উনিই অনেক কিছু বলেছেন মাকে আমাদের সম্বন্ধে।

আমি বরাবরই বুঝতে পারি। কী রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে যে তাকান মাঝে মাঝে। ...কিন্তু...পালাও কৃষ্ণা, এভাবে দুজনকে দেখলে—। চললাম।

চলে গেলেও ফিরে না তাকিয়ে কে কবে যেতে পেরেছে?

কোনওদিনই আর আসবে না?

এখন বলতে পারছি না।

বলে যাও—কী করে কাটাব সন্ধ্যাটা? কীসের প্রত্যাশায় কাটাব সারাটা দিন?

সে প্রশ্ন তো আমারও কৃষ্ণা? কীসের প্রত্যাশায় কাটাব সারাটা দিন!...কী জানি হয়তো পারব না, হয়তো—

না না, তা করো না। পারব, ঠিক থাকতে পারব আমি।...আচ্ছা, যাচ্ছি। এখনি হয়তো কেউ দেখবে কথা কইছি তোমার সঙ্গে। পৃথিবীটা কী খারাপ জায়গা!

সত্যি কৃষ্ণা, ভারি খারাপ।

পৃথিবী জায়গাটা যে কত খারাপ, সে বোধ ছিল না বলেই বোধ করি অত নিশ্চিন্ত চিত্তে কাটাচ্ছিল বেচারারা। কাটাচ্ছিল—প্রত্যাশিত দিন, ব্যাকুল সন্ধ্যা, আর স্মৃতিসুরভিত রাত্রির নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে।

কী করে আশঙ্কা করবে 'পাথরের বুদ্ধমূর্তি'রও চোখ-কান সজাগ হয়ে উঠবে। মুখর হয়ে উঠবে রসনা!

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতের তীব্রতা পার্থকে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় বিধুর করে না তুলেও ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। ফেরার সময় পথে চলতে চলতে শান্তার ওপর অপরিসীম রাগ ছাড়া আর কোনও ভাবই ঠাঁই পাচ্ছিল না তার মনে।

আঃ, একবার যদি ভদ্রমহিলাকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেবার সুযোগ হত। বিধবা হলেই যে কী সাংঘাতিক হিংসুটে হয়ে যায় মেয়েরা!

রাত্রির অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কৃষ্ণা ভাবছিল অন্য কথা। ভাবছিল, আরও একটু সাবধান হয়ে চলাই উচিত ছিল বোধ হয়। শুধু দরজাটা বন্ধ করতে আসার পক্ষে সময়টা একটু বেশিই নেওয়া হয়ে যাচ্ছিল যেন। মাকে অতটা অবোধ আর বাবাকে অত বেশি বেহুঁশ না ভাবলেই ভালো হত।

আর ছোট পিসি। বাস্তবিকই অবোধ্য।

পাথরের পুতুলেরও বোধশক্তি থাকে?

পৃথিবীর মাটি ছড়িয়ে অত উর্ধ্বলোক থেকেও পৃথিবীর ধুলোর স্পর্শ লাগে?

কৃষ্ণার মা ভাবছিলেন, আজকালকার মেয়েদের খুরে নমস্কার। দেখে মনে হয় কী ছেলেমানুষ। ভেতর ভেতর পাকামিটা দেখ। ছেলেটাই বা কী শয়তান গো। কেমন সাদাসিধে ভাবে 'মাসিমা মাসিমা' বলে গল্প করে, কে বুঝবে তলে তলে আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করেছেন! তবু তো আমি পারতপক্ষে এ সময়টা কৃষ্ণাকে এ-দিকে আসতে দিই নে। নিজেও ঘাঁটি আগলে থাকি যতটা সম্ভব। ন্যাকা বোকা মায়েদের এত এলিয়ে দিলে যে কী হত!

কী যে হতে পারত, সে কথা ভেবে মনে মনে শিউরে উঠে ননদিনীকে ধন্যবাদ দেন ভদ্রমহিলা। ভাগ্যিস সময় থাকতে সাবধান করে দিল শান্তা।

কৃষ্ণার বাবা ভাবেন, মেয়েমানুষের মনগুলো কি বিশ্রী প্যাঁচালো। কৃষ্ণা নাকি একটা মানুষ। ওই তো ঘুরে বেড়াচ্ছে—মঞ্জু অঞ্জুর চাইতে কি এত বড় লাগছে? ওকে নিয়ে এত সব বাজে বাজে আলোচনা।

বালিকা মঞ্জু শিশু অঞ্জুকে চুপি চুপি বলে, এই, দিদিকে জ্বালাতন করিস নি, দিদির মন খারাপ। দেখছিস না পার্থদা আসেন নি।

শুধু পাথরের পুতুলের মনের ভাব বোঝা যায় না।

কাটল কয়েকটা দিন।

পার্থর অনুপস্থিতিতে আড্ডাটা তেমন জমে না। কৃষ্ণার বাবা কয়েকটা সিগারেট ধ্বংস করে এক সময় উঠে পড়ে বলেন, বাজার দোকানের কিছু চাই নাকি তোমাদের? বেরুচ্ছি একটু, চাই বল এই বেলা।

কৃষ্ণার মা ঘাঁটি আগলানোর কাজ থেকে ছুটি পেয়ে নিশ্চিন্ত-চিত্তে রান্নাঘরে গিয়ে বামুন ঠাকুরের 'হাড়মাস ভাজা-ভাজা' করতে থাকেন। কৃষ্ণা হঠাৎ আবিষ্কার করেছে, সন্ধ্যাবেলা ছাদের খোলা হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

মঞ্জু অঞ্জু খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে এক সময় বলে ওঠে, কী, ভালো লাগছে না?

ওরই মধ্যে একদিন—হাতের বোনাটা আর কাঁটা দুটো ফেলে রেখে আড়ষ্ট আঙুলগুলো মটকাতে মটকাতে শান্তা মুখ তুলে চাইল। না, কারুর দিকে নয়, পাওয়ারফুল বাল্‌ব্‌টার দিকে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে স্বগতোক্তি করল, আলোটা কি বদলানো হয়েছে?

কৃষ্ণা তখন ছাদ থেকে নেমে এসেছে, উক্তিটাকে একটা প্রশ্ন ভেবে উত্তর দেয়, আলোটা? কই না তো।

কী জানি, চোখটা আরও বেশি খারাপ হচ্ছে বোধ হয়।

হওয়ার অপরাধ নেই বাপু—কৃষ্ণা বলে—সারাক্ষণ ওই চোখের কাজ।

চোখের কাজ!—শান্তার যেন বুঝতে দেরি হচ্ছে কথাটা ঃ চোখের কাজ। তুলে নিল কাঁটা দুটো।

আরও কয়েকটা দিন পরে—

বামুন ঠাকুরের মুণ্ডপাতপর্ব শেষ করে কৃষ্ণার মা এসে বসেছেন ঘরে, কর্তা বেড়িয়ে ফেরেন নি, শান্তা বসে আছে চুপচাপ জানলার দিকে মুখ করে, পঁচাত্তর বাতির আলোটা জ্বলে যাচ্ছে আপন মনে।

শান্তার বুঝি আজ পশম ফুরিয়েছে?

হাতের পানটা মুখে ফেলে ধীরে সুস্থে প্রশ্ন করেন কৃষ্ণার মা।

পশম? ও, না। চোখটা কেমন যেন—মানে চশমার পাওয়ারটা না বদলালে, কাজকর্ম সবই বন্ধ করতে হবে মনে হচ্ছে।

ও মা, সে কি? তবে তোর দাদাকে বলছিস না কেন কিছু?

নিজের জন্যে কাউকে কিছু বলতে চাই না আমি।

কৃষ্ণার মা অপ্রতিভ হয়ে যান, যেন শান্তার চোখটা যে বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সে ত্রুটি তাঁর। অল্পবয়সি বিধবা ননদিনীটিকে নিয়ে অস্বস্তি অনেক। তাও যদি বা সাধারণ ধরনের হত!

মেয়ে তো নয়, যেন একটা অপার্থিব বস্তু।

আচ্ছা, আমি বলব ওঁকে। ভুলে মরি এই মুশকিল।...কৃষ্ণা কোথায়?

ছাদে। ছাদেই তো থাকে এ সময়।

ওই এক মেয়ে, ধিঙ্গি অবতার। রাত দুপুর অবধি ছাদে কী হচ্ছে?—সরোষ মন্তব্য করেন কৃষ্ণার মা।

মনটা বোধ হয় খারাপ থাকে—উদাসীন ভঙ্গিতে বলে শান্তা, পার্থ-টার্থ আসত সন্ধ্যাবেলাটায়, মন বসত।

ছেলেমানুষ!

এই ভাবেই কথা কয় শান্তা। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না, হালকাভাবে একটু অঙ্গুলিনির্দেশ করে শুধু। বিষয়টার ওপর সামান্য একটু আলোকপাত করা, এই আর কি।

বিয়ে-থাওয়ার তো চেষ্টা করবেন না মেয়ের—অনুপস্থিত স্বামীর ওপর সব ঝালটা ঝাড়েন ভদ্রমহিলা।

বিয়ে! বিয়ের কথা ভাবতেই পারি না আমি।

কৃষ্ণার মা দ্বিতীয়বার অপ্রতিভ হন। শান্তার ভাগ্যবিড়ম্বনাও কর্তার মেয়ের বিয়েতে অনুৎসাহের একটা কারণ।

তবু মেয়ে জিনিস।—অপ্রতিভ ভাবটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেন কৃষ্ণার মা ঃ বিয়ে তো দিতেই হবে।

তা তো সত্যি।

এ প্রসঙ্গের ওপর পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেয় শান্তা।

এ সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ সাংসারিক কথা সহ্য করতে পারে না সে।

পার্থকে তোমরা নিশ্চয়ই কেউ কিছু বলেছ!

আর ক'দিন পরে গৃহিণীর প্রতি এই অভিযোগটি আনেন কৃষ্ণার বাবা।

বললাম আবার কখন? অভিযুক্ত ব্যক্তি সরবে অভিযোগ অস্বীকার করেন; ঘরে ঘরে নিজেরাই যা বলাবলি করেছি, একটি অক্ষরও তার সামনে বলি নি।

তবে হঠাৎ এরকম একেবারে আসা বন্ধ করে দিল, মানে কী? রোজ আসত।

সে তো আমিও দেখছি। এখনকার ছেলেরা চালাক তো কম নয়? মুখ দেখে মনের কথা টের পায়।

উঁহু। —কর্তা অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়েন : পার্থ সে ধরনের ছেলে নয়। তোমরা 'ইয়ে' কর বটে, আমার কিন্তু ছেলেটাকে মানে—ভারি সাদাসিধে ছেলেটা।

গিন্নি সায় না দিয়ে পারেন না : তা আমারও মনে হয়। তবে সব দিক না দেখলেও তো চলে না। বয়সের ধর্ম বলে তো কথা আছে একটা।

যেতে দাও ওসব বাজে কথা। —মেয়েলি মন্তব্যে চটে ওঠেন কর্তা : আমি ভাবছি, একদিন যাব ওর মেসে। বিদেশ-বিভুঁয়ে একলা থাকে বেচারা, আসত এক আধবার, বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গিয়েছিল।

মন-কেমন কি আমারই করে না?—নিজের হৃদয়বত্তার পরিচয় দেন কৃষ্ণাজননী : করলে কী হবে? বোঝ না তো সব। এই যে মেয়ে সারা সন্ধে ঠিকরে ঠিকরে ছাদে ছাদে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কারণ কি এর? লক্ষ করেছ কোনওদিন?

খেয়েদেয়ে তো কাজ নেই আমার। —কর্তা সবিরক্তি মন্তব্য প্রকাশ করেন : তাই কে কখন ছাদে যাচ্ছে, আর কে কতক্ষণ রান্নাঘরে বসে আছে, তার তদ্বির করে বেড়াব। মোটকথা এই সামনের রবিবারে ওকে নেমন্তন্ন করে আসব আমি।

মেয়ের সম্বন্ধে এই সব অপছন্দকর আলোচনা বেশিক্ষণ বরদাস্ত করতে পারেন না ভদ্রলোক।

অবশ্য নেমন্তন্ন করাটা একেবারে নতুন কাণ্ড নয়। আগে আগে ছুটি-ছাটার দিন অথবা বাড়িতে 'ভালোমন্দ' কিছু রান্না হলেই খেতে বলা হত পার্থকে।

তবে ইদানীং পার্থর এই 'হাজরে দেওয়া'র অবিচল নিষ্ঠায় সকলেরই (অবশ্য কৃষ্ণা বাদে) কেমন যেন একটা অবহেলা এসে গিয়েছিল।

আগে আগে কৃষ্ণার কাকা পার্থকে দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখতেন না। সরকারের ভুল নীতি, উদ্বাস্তু-সমস্যা, আর চোরাকারবারি-সমস্যা, এইসব ধারালো অস্ত্র নিয়ে তেড়ে এসে তর্ক জুড়ে দিতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তিনি আজকাল আর দেখা হলে কথাও কন না। মুখ ঘুরিয়ে চলে যান।

নেমন্তন্ন করার পাট উঠেই গিয়েছিল।

বড় গলায় ঘোষণা করলেও সামনে রবিবার আর নেমন্তন্ন করা হল না, কর্তার নিজেরই নেমন্তন্ন হয়ে গেল কাদের পুকুরে মাছ ধরবার।

তবে পনেরোই আগস্ট করা হোক।—বললেন কৃষ্ণার মা, তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে।

ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা নয়।—কর্তা বঁড়শিতে সুতো বাঁধতে বাঁধতে নিবিষ্টভাবে বলেন, কী হল ছেলেটার সেটাও তো খোঁজ নেওয়া দরকার, কিছু বলো-টলো নি বলছ যখন।

বলি নি আমি কিছু। —কৃষ্ণার মা আবার প্রতিবাদ জানান।

তুমি বলো নি, শান্তা বলেছে।—কর্তা নিশ্চিত সুরে বলেন।

শান্তা? কী যে বল তার ঠিক নেই। ও সংসারের কোন্ কথাটায় থাকে?

নিজের নামটা দু-দুবার কর্ণগোচর হওয়াতেই বোধ করি শান্তার 'সমাধি' ভাঙে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলে, আমাকে বলছ কিছু?

না, বলছি না কিছু—স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া সস্নেহে বলেন, তোর দাদার কথা শুনছিস? আমরা নাকি পার্থকে যা-তা বলে তাড়িয়েছি। শুনলে গা জ্বলে যায় না? বলেন কি না—'তুমি না বল শান্তা বলেছে'।

আমি আজ পর্যন্ত পার্থর সঙ্গে কোনও কথা বলি নি।

শান্ত নম্র গলায় শুধু এইটুকু বলে শান্তা। প্রতিবাদের তীব্রতা নেই, কেবলমাত্র জানিয়ে দেওয়া।

পনেরোই আগস্ট সন্ধ্যাবেলায় আবার পার্থকে দেখা গেল এ ঘরে।

নেমন্তন্ন করলে আসবে না, এমন হাঁদা ছেলে সে নয়। একটু যে অপ্রতিভ ভাব প্রকাশ করবে, এমন নির্বোধ নয়। নিজেই দোষ স্বীকার করে : সন্ধ্যার দিকে একটা টিউশনি নিয়ে ফেলে এত মুশকিল হয়েছে মাসিমা, মোটে আসতে পারি নে।

রবিবারেও পড়াও নাকি?—মাসিমা প্রশ্ন করেন।

তা অবশ্য নয়।—পার্থ হাসে : আলস্য এসে যায়। সপ্তাহে একটা মোটে দিন। আবার মজা দেখুন না, এ মাসে মেসের ম্যানেজার গিয়েছেন মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে, আর ম্যানেজারিটি দিয়ে গেছেন আমার স্কন্ধে। সে এক বিরক্তিকর ব্যাপার।

একেবারে নিশ্ছিদ্র কৈফিয়ত।

মঞ্জু অঞ্জু এসে আবদার ধরেছে : পার্থদা, অনেকদিন আস নি—হ্যাঁ, আজ নিশ্চয়ই একটা গল্প বলতে হবে।

হবে নাকি? কীসের গল্প? বাঘের?

আড়চোখে একবার শান্তার দিকে তাকায় পার্থ, বাঘের মাসি তো বসে আছেন সামনে।

কে জানে কৃষ্ণা কোথায়? বাড়িতে আছে তো? এতক্ষণের মধ্যে তো চুলের ডগাটাও দেখা গেল না মহারানির। নাকি কর্তা-গিন্নির-কারসাজি? মেয়েটিকে কোথাও চালান করে দিয়ে পার্থর সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা হচ্ছে।

বুড়ো-বুড়িগুলো কি ঘোড়েলই হয়! উঃ!

আসর ছেড়ে কৃষ্ণার মা ওঠেন।

মালাইকারির দফা কতটা গয়া করতে পারল ঠাকুর, দেখা দরকার।

'জলযোগে'র-দই আনা যাক কিছু। —কর্তা জানান দেন : একটু বেরুচ্ছি আমি। বোস পার্থ।

বসব না? পার্থ হেসে ওঠে : জলযোগের দই এসে পৌঁছবার আগেই পালাব?...মনে মনে বলে, যান না একটু, কিছু দুঃখিত হব না। শুধু যদি কৃষ্ণার সন্ধানটা দিয়ে যেতেন।

ততক্ষণে পুরোনো আবদারের জের টানছে মঞ্জু : বাঘের গল্প বিশ্রী, সেই ডিটেকটিভ মোহনের গল্পটা বল।

আচ্ছা। তার আগে কিন্তু একটু চা খাওয়াতে হবে—নইলে বুদ্ধি খুলবে না। ভেবে-চিন্তে বুদ্ধিটা আগেই খুলিয়েছে পার্থ।

চা তৈরি করবার ভারটা একান্তই যার নিজস্ব, যদি তার সন্ধান পাওয়া যায় এই ছুতোয়!

চা? খুব পারব। —মঞ্জু মহোৎসাহে আশ্বাস দেয় : আমি তো আজকাল চা তৈরি করতে পারি। দিদি তো খালি তিনতলার ছাদে উঠে বসে থাকে। কাকা এলে চা করে দিই আমি। দিই না রে অঞ্জু? দিদি নেবে এসে বলে, ওমা, কাকা এসে পড়েছেন। যাই—

আমিও পারি। —বলে দিদির পশ্চাদ্ধাবন করে অঞ্জু, পার্থকে নেহাতই অনাথ করে রেখে।

তিনতলার ছাদে।

এতক্ষণে রহস্য প্রকাশ হয়। আহা, অভিমানিনী কৃষ্ণা হয়তো পথের দিকে তাকিয়ে থাকে হতাশ দৃষ্টি মেলে। হয়তো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পার্থর কঠিন হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে।

এতটা না করলেও হত। পার্থ ভাবে, মুখের ওপর কেউ তো কিছু বলে নি পার্থকে। এক-আধদিন এলেও হত। বড্ড বেশি 'শো' করা হয়ে গেছে যেন, কর্তা নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এলেন!

কিন্তু পার্থর কাছে কি ছাদের দরজা একেবারেই বন্ধ? ঘরের ছেলের মতো পার্থ গরম লাগলে ছাদে উঠে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আসতে পারে না একটু?

অন্তত এক মিনিটের জন্যেও?

কৃষ্ণার মার রান্নাঘর তদারকি, আর কৃষ্ণার বাবার 'জলযোগ' থেকে ঘুরে আসার মধ্যবর্তী সময়টুকু অবসরে কয়েকটা সিঁড়ি পার হওয়া কি একেবারে অসম্ভব?

অসম্ভবই।

পাথরের পুতুল পাহারা দিচ্ছে পার্থকে।

হায়, শান্তা যদি বিধবা না হত!

বর থাকলে অবশ্যই কৃষ্ণাকে আগলানো ছাড়া অন্য ডিউটি থাকত তার। শান্তা-বিহীন এই বাড়িটা কল্পনা করতে চেষ্টা করে পার্থ। 'নিষ্কণ্টক' কথাটা শুনতে ভারি খারাপ, না?

আড়চোখে একবার তাকাল পার্থ।

কোলের উপর পড়ে আছে খালি হাত দুখানা। কেন, পশমের গোলা কোথায় গেল শান্তার? কোথায় গেল লোহার কাঁটা? শুধু বসে থাকা শান্তাকে কেমন যেন নতুন লাগছে।

মিনিটের পর মিনিট কাটছে...ঘরে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। আলোটা যেন বড্ড বেশি প্রখর।

এক পেয়ালা চা আনতে মঞ্জুর এত সময় লাগবে জানলে 'খাল কেটে কুমির আনত' না পার্থ। এর চাইতে ঢের বেশি সহজ ছিল, 'ডিটেকটিভ্ মোহনে'র গল্প বলা।

দূর ছাই, না এলেই হত।

কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হবে না, আর বোকার মতো বসে বসে একগাদা গিলতে হবে তাকে? হয়তো বা তারিফ করতে হবে মালাইকারি আর মাংসের কোর্মার। রাবিশ!

মনে করে তেতো হয়ে উঠছে মন।

এই নেমন্তন্ন করার মধ্যেও কোনও কূটনীতি আছে কিনা কে জানে। হয়তো তাই। বোধ করি পার্থকে স্পষ্ট করে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া—দেখো তোমার অধিকারক্ষেত্র কতটুকু! এস বোস খাও দাও, কিন্তু খবরদার তার বেশি নয়। ওর চাইতে উঁচুতে নজর দিও না।

তবে কি এই অবসরে চলে যাবে পার্থ? কাউকে কিছু না বলে? যে যাই ভাবুক?

নাঃ, তা হয় না। ভদ্রতার দায় নাগপাশের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। ওর থেকে মুক্ত হবার ওষুধ সভ্য মানুষদের হাতে নেই।

যাক্‌গে, ঘর থেকে উঠে বারান্দায় গিয়ে হাঁফ ফেলা যাক একটু।

এরকম বিরক্তিকর অবস্থায় স্থির হয়ে বসে থাকা অসম্ভব।

উঠে পড়তেই পিছনে খস্‌খস্ শব্দ।

না, পার্থর নিজের পায়ের শব্দ নয়, শান্তার।

উঠে পড়েছে শান্তাও।

শোনো, চলে যাচ্ছ?

পাথরের পুতুলের কণ্ঠে স্বর, আর সে স্বর এত দ্রুত এত লঘু এত ব্যগ্র?

অবাক হয়ে তাকায় পার্থ, আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ। বলছি, একদম আসো না কেন আর? দাদা দুঃখিত হন, বলেন—'বিশ্রী ফাঁকা লাগে সন্ধেটা।' তোমার আসা অনেকটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল! এস, বুঝলে? যেমন আসতে রোজ। আসবে তো?

আরও দ্রুত আরও লঘুভঙ্গিতে সেল্‌ফের ওপর থেকে পেড়ে নিয়েছে শান্তা পশম আর কাঁটা, অনেকদিন ধরে খোলা পড়ে থেকে ধুলো জমছিল যেটায়।

কিন্তু এতদিন অনভ্যাসে বোনার ঘরগুলো এলোমেলো হয়ে যায় নি? অমন নির্ভুল আর অত দ্রুত চলছে কী করে সরু সরু আঙুল কটি?

আর চোখ? চোখের জন্যে যে কাজকর্ম সব বন্ধ হতে বসেছিল শান্তার! আলোটা কত কম লাগত!

কোন্‌টার পাওয়ার বেড়ে গেল হঠাৎ!

আলোর, না চোখের?

পত্নী ও প্রেয়সী

কলেজে ঢুকিয়া ইস্তক প্রেমে পড়িবার জন্য অমানুষিক চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, অথচ আজ পর্যন্ত পড়িতে পারিলাম না। পারিলাম না, অর্থাৎ পাইলাম না। মাত্র একটি তরুণীর অভাবে (কুমারী, বিধবা অথবা সধবা যাই হউক) 'হৃদয়-বৃক্ষে প্রণয়-কুসুম' ফোটে ফোটে হইয়াও ফুটিল না।

গলা না থাকিলেও গান গাওয়া চলিতে পারে, বৌ ব্যতিরেকে শ্বশুরবাড়ি যাওয়াও খুব বেশি অসম্ভব নয়, কিন্তু তরুণীর উপস্থিতি ব্যতীত প্রেমে পড়া? আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তাই বলিতেছিলাম, আমার অ-যৌবন সাধনা, আপ্রাণ চেষ্টা, শরৎ, রবি, শেলি, কীটস, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল একটি মাত্র তরুণীর অভাবে।

হায় নির্দয় বিধাতা।

তাই বলিয়া আপনারা সিদ্ধান্ত করিবেন না নির্দয় বিধাতা তাঁহার রাজ্য হইতে 'তরুণী' নামক একটি প্রয়োজনীয় জীবনকে চিরদিনের মতো নির্বাসন দিয়াছেন।

তরুণী আছে। অফুরন্ত আছে।

কোথায় নয়?

পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, থিয়েটারে-সিনেমায়, স্কুলের দোরে, কলেজের ঘরে—তরুণীর হরির লুঠ। কিন্তু হাতের কাছে একটিকেও পাইলাম না। লক্ষ লক্ষর মধ্যেও অলক্ষ্য রহিয়া গেল।

এদিকে হতভাগ্য আমি'র বয়স বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়িয়া চলিতেছে ; একবারও ফেল করিতে পারি নাই বলিয়া কলেজের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিতেছে, অর্থাৎ ডানা মেলিয়া খোলা আকাশে ওড়ার দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

এহেন সময় জানিতে পারিলাম— পিতা-মাতা আমকে 'স্ত্রী' নামক একটি উপসর্গ জুটাইয়া দিবার তালে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

হায়। স্ত্রীর ন্যায় প্রেমে পড়িবার এতবড় প্রতিবন্ধক আর কী আছে ?

বিবাহ—মানে মুক্ত আকাশ হইতে উদ্দাম পক্ষ যুগল গুটাইয়া আনিয়া, চিরদিনের মতো একটিমাত্র বৃক্ষের কোটরে কবরিত হওয়া। নীড় বাঁধিবার উপযুক্ত কিছু খড়কুটা সংগ্রহের নিমিত্তই বাঁচিয়া থাকা, খাইবার এবং খাওয়াইবার উপযুক্ত কিছু পাকা ফল জুটাইতে পারিলেই চরিতার্থ হওয়া।

এককথায় সমস্ত সম্ভাবনার ইতি, সমস্ত কেরিয়ারটাই মাটি।

যাক যাহা মাটি হইবার তাহা হইবেই, বিশ্বসুদ্ধ লোকের যাহা হইতেছে। আমার বেলাতেই তাহার ব্যতিক্রম হইবে এমন আশা করি না। আক্ষেপ শুধু এই—'মাটি' হইবার পূর্বে আশা মিটাইয়া খাঁটি প্রেমের আস্বাদ পাইলাম না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাগসই লাইনগুলি মুখস্থ করিয়া করিয়া অবশেষে ভুলিতে বসিয়াছি, গভীর রাত্রে জানলার ধারে মোমবাতি জ্বালাইয়া শেলি পড়ার অভ্যাস ক্রমশ ছাড়িতেছি, বাড়ির লোকেরা ঘুমাইয়া পড়িলে, চন্দ্রালোকিত নির্জন ছাদে বেড়াইবার স্পৃহা এখন ক্ষীণ, শুধু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ হিসাবে বৈষ্ণব বনিতেছি, দুধ খাওয়া ত্যাগ করিয়াছি, পেট ভরিয়া ভাত খাওয়া বন্ধ করিয়াছি, রাত্রে গব্ গব্ করিয়া ডাল-ভাত গিলিবার বদলে খানকয়েক 'ফুলকা লুচি' খাইতেছি।

আরও নানাবিধ কসরৎ এখনও ধরিয়া আছি, যদি সহসা ভাগ্য-গগনে চন্দ্রোদয় হয়। কিন্তু কই? ঈশ্বরের অবিবেচনায় আস্ত একটি তরুণী তো দূরের কথা, তাহার একটু চুলের ডগা পর্যন্ত দেখিতে পাইলাম না।

প্রেমে পড়া। প্রেম করা।

একখানা অতি সাধারণ, অতি সস্তা, অতি তুচ্ছ ব্যাপার। যাহা যদু করিতেছে, মধু করিতেছে, রাম শ্যাম গোপাল গোবিন্দ, চটকলের কুলি, সাঁওতালি মজুর, কয়লাকাটা ভূত, পদ্মাপারের মাঝি, মুখ্যু গাধা উজবুকেরা পর্যন্ত বিনা চেষ্টায় অনায়াসে করিয়া চলিয়াছে, তাহা আমি—এই শ্রীযুক্ত 'অমুক'....... এম. এ. একবারের জন্যও করিবার সুযোগ পাইলাম না, এ যন্ত্রণার সান্ত্বনা কোথায়?

এদিকে বিবাহের 'দিন' নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে।

হায়! এই বিদ্যাবুদ্ধি, কাব্য অনুভূতি, এই অগাধ অসীম অনন্ত হাহাকার, এই যৌবন বেদনারসে উচ্ছল দিনগুলি লইয়া অবশেষে কিনা স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করিব। স্রেফ স্ত্রী, ছিঃ। ছিঃ।

সেই নারী!

যাহার সহিত ফার্স্টক্লাস ট্রেনের নির্জন কামরায়, স্বপ্নময় ড্রইংরুমে, সিমলা-শিলং গারো পাহাড়ে, অথবা কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় 'সহসা দেখা' নয়। দেখা সেই ঘটক-ঘটকী দেনা-পাওনা, দরদস্তুর নাপিত-পুরুত ইত্যাদি বহু ঘাটের লোনাজল খাইয়া চিরাচরিত প্রথায় ছাদনাতলায়।

মানে আমার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এবং তস্য তস্যরাও যাহা করিয়া আসিয়াছেন, আমিও তাহাই করিব?

তবে রবীন্দ্রনাথ জন্মাইলেন কেন?

জয়দেব কলম ধরিলেন কেন?

শেলি, বায়রন, কীটস এবং আরও আরও অন্যরা ('সিলেবাসে' না থাকায় যাঁহাদের নাম জানি না) তাঁহারা জন্মিয়াই মরিলেন না কেন?

প্রেমে পড়িবার চেষ্টা কি আজ করিতেছি?

সেই কৈশোরকাল হইতেই তো ওই একটিই বাসনা। তখন ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে চোখ খারাপ হইয়াছে, লাটাই সূতা খরচ হইয়াছে, কিন্তু কোনও রূপসী কিশোরী সেই সূতার জালে আটক পড়ে নাই।

আশপাশের বাড়ির জানলায় আর বারান্দায় তাকাইয়া তাকাইয়া পাড়ায় সমস্ত মেয়েগুলোর শাড়ির পাড় মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটা মেয়েরও মুখ মুখস্থ করিবার অবকাশ পাই নাই।

তাছাড়া চিরকালের বসতবাড়ির এই পাড়ায় জন্মিয়া অবধি যে মেয়েগুলোকে পেনি পরা মূর্তিতে রাস্তায় দাগ টানিয়া এক্কা দোক্কা খেলিতে দেখিয়াছি, তাহাদের তো—এখন তাহারা বেণী দুলাইয়া এবং আঁচল দুলাইয়া স্কুলে গেলেও টেপি খেঁদি ভূতি মেনি ছাড়া ভাবিতেই পারি না। অতএব আমার মনের দরদালানে দাগ পাড়িবার ক্ষমতা হয় নাই তাহাদের।

একদিন পাশের জগৎবাবুদের ছাদে হঠাৎ একটি অপরিচিতা তরুণীর দেখা পাইয়াছিলাম! রূপসী না হইলেও তরুণী তো বটেই, অতএব সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পড়িবার জন্য 'আলগোছ' হইয়া উঠিয়াছিলাম—অর্থাৎ অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিতে ছিলাম, যদি তাহার দৃষ্টিপথে পড়ি।

তা পড়িয়াও ছিলাম।

কিন্তু পরের ইতিহাস যৎপরোনাস্তি করুণ। স্বকর্ণে শুনিলাম তরুণীর কলকণ্ঠ, 'দেখ দিদি দেখ, ওই লাল বাড়িটার ছাদে একটা ল্যাগবেগে ছোঁড়া কী রকম অসভ্যের মতো হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে!'

শিহরিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

জগৎবাবুর স্ত্রী নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, 'আরে চুপ। ও তো ভাদুড়ীদের—'। থাক—ডাকনামটা প্রকাশ করিতে চাহি না, তবে এটা বলিতে পারি পিতা-মাতারা ছেলেমেয়ের ডাকনাম করণের সময় বোধ করি স্বপ্নেও ভাবেন না, ইহারা ভবিষ্যতে একদিন তরুণ তরুণী হইবে।

জগৎবাবুর স্ত্রীর বাক্যের শেষাংশ শুনিতে পাইলাম, 'ওটা তো নেহাৎ বাচ্চা রে! ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়ায়, দেখিস না? ছেলেমানুষ।'

অপর কণ্ঠ—ছেলেমানুষের মতো ভাবভঙ্গি তো নয়। টেরির বাহার দেখে তো তাক লেগে যাচ্ছে। পাড়ায় থাকো, এইসব হতচ্ছাড়া ডেঁপো ছোঁড়াদের শায়েস্তা করতে পারো না?'

কখনও কোনও কাব্যে-নাটকে নায়ক সম্পর্কে নায়িকার এরূপ জোরাল উক্তি শুনি নাই। 'বেত্রাহত' কীসের মতো যেন ঘাড় নিচু করিয়া ছুটিয়া নামিয়া আসিলাম।

ব্যস, বাড়ি বসিয়া প্রেমে পড়িবার স্বপ্ন ওইখানেই — ইতি।

অতএব পথে।

সর্বদাই বাসে চড়িবার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পয়সা লইয়া উঠিয়াছি, কখনও কোনও মেয়েকে মানিব্যাগ হারাইয়া কী বলে—'ভীতচকিত নেত্রে' ইতস্তত চাহিতে দেখি নাই। রাস্তার পাশ ছাড়িয়া মাঝখান দিয়া চলিতে চলিতে অপেক্ষা করিয়া করিয়া হাল ছাড়িয়াছি, কেহই 'রোলস্‌রয়' কি 'মিনার্ভা'খানা চাপা দিতে দিতে সাদরে গাড়িতে তুলিয়া লয় নাই, একদিন একটা ড্রাইভার 'কালা' বলিয়া গালি দিল, তদবধি আবার ফুটপাথ দিয়া হাঁটিতেছি।

শুধুই কি কলিকাতায়?

সিমলা শিলং পুরী রম্‌না গারোহিল কালিম্পঙ্‌ কোথায় না গিয়াছি? হাতের কাছের গিরিডি মধুপুর দেওঘর দার্জিলিঙের নাম আর নাই করিলাম।

বেড়াইতে নয়, বায়ু পরিবর্তনের জন্য নয়, কেবলমাত্র একটি 'তরুণী'র জন্য। কিন্তু কৃতকার্য হই নাই। বুঝিয়াছি ওরা শুধু গল্পে উপন্যাসেই থাকে।

বাস্তবে কি আদৌ থাকে না?

থাকে। আছে। কিন্তু যেমন তরুণী আছে, তেমনি তাহার আশেপাশে গোঁফ আছে দাড়ি আছে, বর্ষীয়সী জননীর শ্যেনদৃষ্টি আছে। (অথচ গল্পে-উপন্যাসে এসব কিছুই থাকে না।)

নাই। নাই!

নাই—জঙ্গলাকীর্ণ 'টিলা'র উপর ক্রন্দন-নিরতা উদাসিনী, নাই—জ্যোৎসা-প্লাবিত

বালুবেলায় রহস্যময়ী একাকিনী। নাই—বেওয়ারিশ সমাজ সংস্কারিকা, নাই—বোহেমিয়ান দুঃসাহসিকা। অতএব কিছুই নাই।

জীবনের রস নাই, যৌবনের রং নাই।

সাধে বলিতেছি—পৃথিবীটা একটা ঘষা পয়সার মতো লাগিতেছে। (কথাটা কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম!)

মনের অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয় ঠিক সেই সময় বিবাহ হইল। পাঠক লক্ষ করিবেন বিবাহ 'করিলাম না', 'বিবাহ হইল'।

ভাদুড়ি বাড়ির আর পাঁচটা ছেলের যেমন করিয়া বিবাহ হয়, ঠিক তেমনি করিয়া। সেই ঘটক-ঘটকী, দেনা-পাওনা, অধিবাসের তত্ত্ব, ফুলশয্যার তত্ত্ব, লুচি, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া, পান্তুয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। লোকজন ভোজ খাইয়া অনেক সুখ্যাতি করিল। কোনওখানে ত্রুটির নামমাত্র রহিল না।

কেহ একবার আমার ব্যথাহত হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিল না। আমিও অগত্যা যথারীতি সাজসজ্জা করিয়া রওনা হইলাম।

সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হয়, স্ত্রীকে দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসিয়া ফেলিলাম।.... না না, ভুল করিবেন না, ভালোবাসিয়াছি, তাই বলিয়া প্রেমে পড়ি নাই। ভালোবাসা এক, প্রেমে পড়া আর এক। স্ত্রীকে কে না ভালোবাসে? আপনারাই কি বাসেন না? তাই বলিয়া তাদের সহিত প্রেমে পড়িতে গিয়াছেন কি? সময়ে চা না পাইলে, অথবা হাতের কাছে গামছা না পাইলে স্ত্রীর উপর অনায়াসেই এক-আধটু বিরক্ত হওয়া যায়, অথবা বাজারখরচ বেশি করিলে বা নিশীথরাত্রে ছেলে ঠেঙাইলে তিরস্কার করা যায়, ছাদে দাঁড়াইয়া চুল শুকানো অথবা বারান্দা হইতে ফেরিওয়ালা ডাকা সম্বন্ধে শাসন করাও চলিতে পারে, কিন্তু পারিবেন আপনার রহস্যময়ী প্রেমিকার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে? তখন ছাদে চুল শুকাইতে দেখিলে ভোরের শুকতারার সহিত তুলনা করিয়া ধন্য হইবেন, বাজেখরচ করার মধ্যে একটি অলৌকিক সারল্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন এবং এক পেয়ালা চা (তা সে যত দেরিতেই হোক) পাইলেই কৃতার্থ হইবেন।

অবশ্য ঠেঙাইবার মতো ছেলে তাঁহার না থাকাই উচিত। থাকিলেও এটা ঠিক, তিনি আপনার সম্মুখে রণচণ্ডীর ভূমিকায় না নামিয়া বড়জোর বলিবেন, 'দুষ্টু ছেলে, চকোলেট পাবে না।' নায়িকার পক্ষে যাহা বলা শোভন।

যাই হোক, স্ত্রীর সহিত যে প্রেম হয় না এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। তিনি সাঁঝের তারকাও নয়, ভোরের যূথিকাও নয়, স্বপ্নও নয়, মায়াও নয়, দস্তুরমতো একটা জলজ্যান্ত জীব। আজীবন ভাত-কাপড়ের দায় লইয়া যাহার সহিত ঘর-কন্না করিতে হয় তাহার সম্পর্কে 'প্রেম' শব্দটাই তো মশাই ন্যাকামি।

স্ত্রীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম যত, বিধাতাপুরুষকে গালি পাড়িলাম তত। হায়! ইহাকেই দুইদিন আগে একবার দেখাইলে কী ক্ষতি ছিল। একবার প্রেমে পড়িয়া জীবন সার্থক করিতাম।..... এই — অষ্টাদশ বসন্তের মালাগাছি'কে বিবাহ করিয়া বসার মতো বর্বরতা আর কী আছে?

কোথায় জ্যোৎস্নালোকিত নির্জন প্রান্তে উন্মুক্ত আকাশতলে পাখির কাকলির মধ্যে সহসা চারিচোখে দেখা, আর কোথায় পাঁচশত কৌতূহলী চক্ষের সম্মুখে মাথার উপর চাদর চাপাইয়া ইডিয়ট নাপিতটার অশ্রাব্য গালি গালাজের মধ্যে বলিয়া কহিয়া শুভদৃষ্টি।

আরে ছোঃ।

যাক প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া নির্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া জীবনের বাকি কয়টা

দিন কাটাইয়া দেওয়াই স্থির করিলাম। এতদিনের আশাতরুকে নির্মূল করিতে কষ্ট হইল বই কি! কিন্তু সুখের মূল্যেই শান্তি কিনিতে হয়, সংসার এমনই ঠাঁই।

স্ত্রীর কাছে এমনভাব দেখাইতেছি—যাহাতে তিনি ধারণা করিতে পারেন, জীবনে কখনও 'নারী' শব্দটাকে হৃদয়ের ত্রিসীমানাতেও আসিতে দিই নাই।

এই ভাবেই সংসারসমুদ্রে জীবনতরণীখানি ভাসাইয়াছি, সহসা বিনামেঘে বজ্রাঘাত!

না, বজ্রাঘাত ছাড়া বাংলাভাষায় আর কোনও তুলনা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

ঘটনাটি কীরূপে জানিতে পারিলাম শুনুন।

বন্ধুবর্গ লইয়া জোর আড্ডা বসাইয়াছি, সহসা বাড়তি একজোড়া তাসের আবশ্যক হইল। ভিতরে গিয়া স্ত্রীর নিকট আর্জি করিতেই তিনি আলগোছে ভুরে শাড়ির আঁচল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া আমার হাতে দিলেন। দেখি তাঁহার আশেপাশে স্তূপীকৃত মোচার খোলা, দুটি হাত মোচার আঠায় কলঙ্কিত।

ব্যাপারটা বড়ই দৃষ্টিকটু ঠেকিল।

না হয় স্ত্রী! নেহাৎই স্ত্রী মাত্র।

তবু আঠারো বছর বয়েস তো?

যাহারা একটি আঠারো বছরের মেয়ের চাঁপার কলির মতো আঙ্গুল দিয়া মোটা কোটায়, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী?

ভাবিতে ভাবিতে ঘরে গিয়া স্ত্রীর বাক্স খুলিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে খোলা বাক্সটা যেন দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল।

হ্যাঁ মহাশয়, জড়পদার্থও খিঁচাইতে পারে, ভেঙচাইতে পারে। বাক্স খুলিতেই চোখে পড়িল একটা চ্যাঙড়া ছোঁড়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে।

ছোঁড়া মানে, ছোঁড়ার ফোটো।

ইচ্ছা হইল ফোটোখানা লইয়া টানিয়া ডাস্টবিনে ফেলিয়া দিই, কিন্তু না, তদন্ত করা আবশ্যক।

চাকর দিয়া বাহিরে খবর পাঠাইলাম, হঠাৎ কলিক্‌পেন ধরিয়াছে, বিছানায় পড়িতে হইয়াছে।

চুলায় যাক তাসের আসর।

বন্ধুদের মনে করা?

তাহাতেই বা কী আসে যায়?

ঘরে যাহার আগুন লাগিয়াছে, তাহার আবার সামাজিকতা?

কিছুক্ষণ পরে স্ত্রী আসিলেন।

আঁচলে ভিজে হাত মুছিতে মুছিতে, দিব্য হাসি-হাসি মুখে। মুখের কোথাও অপরাধীর চিহ্নমাত্র নাই। মনে মনে বলিলাম, 'নারী। তোমার অসাধ্য কাজ নাই।'

স্ত্রী প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, 'তাস নিয়ে গেলেন না যে বড়? পাতা বিছানা দেখে লোভ হল বুঝি?'

বলা বাহুল্য শয্যাগ্রহণই করিয়াছিলাম, কথাটা কানে যাইতেই লাফাইয়া উঠিলাম।

এ কী!

কাহার বিছানায় অঙ্গ ঢালিয়াছি?

বাঁচিয়া থাক আমার ইজিচেয়ার। তৎক্ষণাৎ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম।

বিচারকের স্বরে কহিলাম, 'শুনে যাও এদিকে।'

স্ত্রী কৌতুক হাস্যে কহিলেন 'আরে ব্যস। আষাঢ়স্য প্রথম দিবস যে!
কী ব্যাপার?'

কৌতুকে কর্ণপাত করিবার সময় নয়, জলদ গম্ভীর স্বরে কহিলাম, 'এটা কী?'

সঙ্গে সঙ্গে ফোটোখানার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশও করিলাম অবশ্য।

'বাতাহত কদলীবৃক্ষবৎ' পড়িয়া যাওয়াটা বড়ই সেকেলে হইয়া গিয়াছে, অতএব—আন্দাজ করিলাম তাঁহার প্রফুল্ল শতদলের মতো মুখখানি কাগজের ন্যায় সাদা, অথবা বাসি গোলাপের মতো কালো হইয়া যাইবে, কারণ ভালো ভালো গল্প উপন্যাসে সেইরূপই লেখা থাকে।

কিন্তু?

আশ্চর্য হইলাম তাঁহার ব্যবহারে।

হেজলিন মার্জিত মুখ, সৌন্দর্যের এতটুকু পরিবর্তন হইল না, পলকমাত্র সেদিকে তাকাইয়া অনায়াস উত্তর দিলেন 'ওটা? ফোটো।'

দেখুন ধৃষ্টতা।

কিন্তু আমিই কি অল্পে ছাড়িব?

কহিলাম, 'ফোটো তা জানি। কিন্তু কার?'

'ওঃ। এক ভদ্রলোকের।'

শুনুন মহাশয়। পরস্ত্রীর বাক্সে যাহার ফোটো থাকে সেও 'ভদ্রলোক'।

কটুস্বরে বলি, 'ভদ্রলোকের নামটি জানিতে পারি কি?'

'একটু কষ্ট করলেই জানা যায়।'

কুঞ্চিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম— (যেটা এতক্ষণ দেখি নাই) ফোটোর গায়েই কোণের দিকে লেখা রহিয়াছে, 'তোমার বিনয়'।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কথা শুনিয়াছি, নিজের মধ্যে তাহা স্পষ্ট অনুভব করিলাম।

টেবিলের উপর চাপড় দিয়া কহিলাম—তোমার কাছে ওর ছবি থাকে কেন?'

'থাকবে না—কেন শুনি?'

এ কী। এ যে স্পষ্ট বোহেমিয়ান ভাব। তার মানে রীতিমতো সাহসিকা।

যে সাহসিকাকে সেই হাফ্‌প্যান্ট পরার বয়স হইতে খুঁজিয়া খুজিয়া হয়রান হইয়াছিলাম, তাহাকে অবশেষে কিনা নিজের ঘরের মধ্যেই পাইলাম?

কিন্তু 'বিবাহের পূর্বে ও পরে'—অনেক তফাত। যদুর স্ত্রীকে মধুর হাত ধরিয়া অজানার উদ্দেশে যাত্রা করিতে দেখিলে, সেই মহান প্রেমের চরণে অবশ্যই মাথা নোয়াইব, তাই বলিয়া নিজের স্ত্রীর বাক্সে অপরের ফোটো।

সহ্য করিতে হইবে?

অসম্ভব।

পৌরুষ-গর্ব গর্জন করিয়া উঠিল 'না, থাকবে না। থাকতে পারে না। নিজের হাতে আমার সামনে দেশলাই জ্বেলে পোড়াও।' স্ত্রী কোনো কথা না কহিয়া ছবিখানি লইয়া বাক্সের ডালা খুলিয়া নীচের খোপে রাখিলেন, ধীরেসুস্থে চাবি লাগাইলেন। চাবির রিং ডুরে শাড়ির আঁচলে ভালো করিয়া বাঁধিলেন, তাহার পর বিছানার ধারে পা ঝুলাইয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, আর কী হুকুম আছে?

কী অদ্ভুত নির্লজ্জতা।

সহসা বাসনা জাগিল সেই নিটোল তাজা গালের উপর দিই এক চড় কসাইয়া (সম্পাদক মহাশয় সাবধান। পত্রিকাখানা আবার বাড়ির ঠিকানায় পাঠাইবেন না।)

কিন্তু এটা অতি আধুনিক সভ্যযুগ তাই কষ্টে বাসনা সংবরণ করিলাম। তবে স্বীকার করুন আর নাই করুন, বর্বর যুগের পুরুষরা অনেক সুখী ছিল। সভ্যযুগের দুঃখী পুরুষের হাতে 'বচন' ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নাই।

অতএব সেই অস্ত্রই হানি।

'এই বিনয়'টি তোমার কে?'

স্ত্রী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'তা'ও বোঝোনি এতক্ষণে? ধন্য বুদ্ধি তো!'

'তাহলে ও তোমার প্রেমিক?'

'অভদ্র ভাষায় বলতে চাও তো তাই বলো, নচেৎ বন্ধুও বলতে পারো।'

'রেখে দাও তোমার ভদ্রতা। বিয়ের আগেই তাহলে প্রেমে পড়ে এসেছ?'

'কী মুস্কিল। বিয়ের আগে পড় না তো কি, বিয়ের পরে পড়ব?'

'ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করল না? স্বামী ছাড়া অন্য একটা পুরুষকে—'

'উঃ। হাসালে তুমি! মাথা নেই, তার মাথাব্যথা। বিয়ের আগে স্বামী কোথায়?'

'কিন্তু—কিন্তু তুমি না হিন্দুর মেয়ে? অনূঢ়া অবস্থায়—'

স্ত্রী একবার নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া, কিছু গম্ভীর ভাবে কহিলেন, 'হিন্দুর মেয়ে' বলতে তোমাদের ধারণাটা কী? 'নীতি রত্নমালার' একটি পরিচ্ছেদ? হিন্দুর মেয়ে তার আইবুড়ো বেলাটাও ভবিষ্যৎ পতি দেবতার নামে উইল করে রাখবে, এই আশা?'

ক্রোধে মুখে উচিত কথা জোগাইল না। উল্টে বলিলাম, 'আমি অন্তত তাই মনে করি। তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি কি কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিলাম?'

পাঠক, দেখুন মিথ্যা কথা বলি নাই।

স্ত্রী কিন্তু লজ্জিত মাত্র না হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'করোনি, সেটা তোমার বুদ্ধুমির জন্যে, আমার জন্যে নিশ্চয় নয়। তবে করলে—আমি তোমার টেবিলের ড্রয়ারে দু'খানা পুরোনো প্রেমপত্র, কি চুলের কাঁটা অথবা খ্যাঁদামুখী একটা ফোটো দেখলে মূর্ছা যেতাম না।'

দেখছেন তো?

এখনকার মেয়েদের সহিত কথায় পারিবার জো কোথায়? উপন্যাস পড়ার কুফল আর কি।

গুম্ হইয়া গিয়াও হঠাৎ দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলাম, 'বটে। মূর্ছা যেতে না?'

'না।'

উঃ—একটা দস্তুরমতো প্রেমে পড়িয়া যদি দেখাইতে পারিতাম। দেখিতাম ঈর্ষা বস্তুটি কেমন। কিন্তু নাঃ। জমার ঘরে মোটা অঙ্ক থাকিতেই যাহা পারি নাই, আজ এখন খরচের খাতায় নাম লিখাইয়া—

তাছাড়া আর কি।

'বিবাহ' মানেই তো খরচ হইয়া যাওয়া।

স্ত্রী কী মনে করিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন, 'মিথ্যে মনখারাপ করছ কেন বলো তো? যাও বন্ধুরা বসে রয়েছে, খেল গে।'

আশ্চর্য! এই কোমলতার মধ্যে ছলনার আভাস পাইলাম না।

তবু স্বামিত্বের অভিমান।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলাম, 'মিথ্যে মিথ্যে মনখারাপ? তার মানে, দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতাও মান না?'

'ও বাবা! মানি না আবার? বিলক্ষণ মানি। মানি বলেই তো বিয়ের দিন তিনখানা ডাকটিকিট খরচ করে লম্বা লেকচার দিয়ে এলাম, পূর্ব কথায় যবনিকাপাত হোক। এখন আমার পবিত্র দাম্পত্যজীবনের মাঝখানে নাক গলাতে এস না।'

রূঢ় হইতে গিয়াও কেমন পারিলাম না। খাপছাড়া গলায় কহিলাম, 'তা তাকেই বিয়ে করলে না কেন?'

'বিয়ে।' স্ত্রী হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, 'কী সাংঘাতিক। সাংঘাতিক। অমন একখানা খাঁটি প্রেম, বিয়ে করে নষ্ট করতে আছে ? বিয়ে মানেই তো প্রেমের জবাই।'

রণক্ষেত্রে নীতি মানিলে চলে না। তাই বলিয়া উঠিলাম, 'কেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা থাকে না?'

'ভালোবাসা! থাকতে পারে। থাকেও। তাই বলে প্রেম? নাঃ, তুমি হাসিয়ে ছাড়লে দেখছি।'

দেখুন? আমারই অস্ত্রে আমাকেই ঘায়েল। উঃ! অথচ এযাবৎ ভাবিয়া আসিয়াছি, আমার চিন্তাধারা কী মৌলিক।

বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা আর কাহাকে বলে।.....কিন্তু পুরুষের মুখে মানায় বলিয়া, কিছু আর সব কথা স্ত্রীলোকের মুখে মানায় না।

রাগভরে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

কিন্তু কতক্ষণের জন্যই বা?

রাস্তার বাহির হইয়া যাওয়া চলে, রাস্তায় থাকিয়া যাওয়া চলে না।

ফিরিতেও হইল, খাইতেও হইল।

খাইলাম বটে, কিন্তু রাগ যে একটুও পড়ে নাই তাহা জানাইয়া দিতে মুখ ভার করিয়া রহিলাম।

রাত্রি হইল, শুইতে আসিতেও হইল।

হায়! সেই শয্যাতেই, যে শয্যায় ওই অপরাধিনী স্ত্রীও শয়ন করেন। কিন্তু কী করিব, ঘরে যে দ্বিতীয় জায়গা আর নাই।

ক্রমশ বুঝিতে পারিলাম, তিনি আসিলেন। চুড়ির রুনুঝুনু বাজিয়া উঠিল।..... একান্ত কাছে কে বসিল। কাহার উষ্ণ স্পর্শ আমার গণ্ডদেশে ?

চোখ মেলিয়া চাহিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, সেই ধৃষ্ট অপদার্থ বিনয়টা ঠিক মেয়ের সঙ্গেই প্রেম করিয়াছিল।

গৌর-ললাটে একটি ছোট্ট সিঁদুরের টিপ্, ঈষদ্ভিন্ন হাস্যরঞ্জিত অধরপুট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে চমৎকার মুক্তার মতো দাঁতের আভায়।

'এই নাও—' বলিয়া তিনি আমার হাতে একতাড়া কাগজ তুলিয়া দিলেন। কী এ? সেই হতভাগার চিঠির তাড়া বুঝি?

ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে যাইতেছিলাম, চোখ আটকাইয়া গেল। ছি ছি , কী লজ্জা! এ যে আমারই আজন্ম বিরহী কৌমার-চিত্তের উচ্ছ্বাস।

না চাহিয়াও বুঝিলাম পত্নী হাসিতেছেন।

আবার কণ্ঠস্বর ঃ 'আর এই নাও বিনয়ের ছবি। ইচ্ছে হয় পুড়িয়ে ফেলতে পারো। বিনয়-টিনয় কেউ নেই, ছবিখানা হচ্ছে বায়োস্কোপের—'

তাহাকে আর কথা কহিতে দিলাম না। কাছে টানিয়া লইলাম।

তাহার পরে—নাঃ, থাক।

পাঠকগণকে অনেক কথা বলিয়াছি, এইবার একটি শেষ কথা বলিয়া বিদায় লই—পত্নীর সহিত প্রেমও অসম্ভব নয়।

পৃথিবী চিরন্তনী

এ কটা জরুরি ফোন করার কথা। অস্থিরতা রয়েছে রীতার স্বামীর অপারেশনের ব্যাপারে কী হল জানবার জন্যে। কিন্তু ফোনটাকে হাতে পাচ্ছে না পারমিতা। পান্টি প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ফোনটাকে কব্জা করে নিয়ে আড্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। ছাড়বার নাম নেই। রিসিভারটাকে ধরে কখনও হাত-বদল করছে, কখনও ঘাড়টাকে ডাইনে-বাঁয়ে দুদিকে কাত করে-করে ঘাড়ের পেশিদের ঠিক রাখতে চেষ্টা করছে। আর তার সঙ্গেই অনর্গল কথা বলে চলার মাঝখানে মাঝখানে হাসির ফুলকি ছিটচ্ছে, যেটা এ-ঘর থেকেও পারমিতার অধৈর্য অবস্থার ওপর এসে পড়ে দাহ ধরাচ্ছে।

ভেবেছে কী বেপরোয়া মেয়েটা? আড্ডা দিতে বসে কাণ্ডজ্ঞানের বালাই রাখবে না? কার সঙ্গেই বা এত মৌজি আড্ডা? কোনও একটা ছেলেই নিশ্চয়। কোন্‌টা? ডজনখানেক বান্ধব বান্ধবী নিয়ে তো সর্বদা ঘোরাফেরা মেয়ের।

ধৈর্যের পরীক্ষায় প্রায় ফেল হবার মুখে পান্টির কলকণ্ঠ থামল। রিসিভারটা নামিয়ে রাখার ঠক্‌ শব্দটা কানে এল।

পারমিতা এ-ঘরে চলে এসে চড়া-গলায় বলে উঠল, ব্যাপারটা কী পান্টি? কার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প চালান হচ্ছিল?

পান্টি টেলিফোনের সামনের শান্তিনিকেতনী বেতের মোড়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মাকে জায়গা দেবার ভঙ্গিতে সরে এসে বলে, মা তোমার এই রাজাসনটি বদলও তো। একটা চেয়ার টেয়ারের ব্যবস্থা কর। উঃ। ঘাড়টা শূন্যে খাড়া রেখে কথা বলা যে কি অসুবিধে। উঃ। ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়।

কী কথার কী উত্তর।

পারমিতা রেগে উঠে বলে, ও। ফোনের সামনে একটা আরাম কেদারা দরকার? তাহলে আরও দু-ঘণ্টা চালান যায় কেমন? ভীষণ একটা দরকারি ফোন করবার জন্যে সেই থেকে অস্থির হচ্ছি—আর তুমি ...

মাই গড। সে কথা বলবে তো?

তা আর নয়? তোমাদের কথার মাঝখানে ডিসটার্ব করার জন্যে ফাঁসির হুকুম হয়ে যাক আর কী আমার। কথার জবাবটার কী হল?

মা! তোমার 'ভীষণ দরকারি' একটা ফোন করবার কথা।

মেয়ের এই গা গড়ানে স্বরের কথায় রেগে আগুন হয়ে গিয়ে পারমিতা রিসিভারটা হাতে তুলে নিতে নিতে বলে, 'আচ্ছা, হচ্ছে পরে।' তারপর ডায়াল করতে থাকে।

পান্টি খুব নিরীহ গলায় বলে, তাহলে কি এখন আমার বেরনো চলবে না, মা? জবাব দেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে?

কী? এখুনি আবার বেরনোর চেষ্টা হচ্ছিল?

'আবার' কী মা? 'একবারই' তো। এই তো মাত্র সকাল হয়েছে। মাত্র সকাল মানে অবশ্য নটা বেজে যাওয়া।

ছুটির দিনে পান্টিকে আটটার আগে বিছানা থেকে ওঠানো যায় না।

কিছু একটা বলতে যাওয়ার মুখেই ওদিকে রিং হল।

পারমিতাকে সেদিকে মন দিতে হল।

হ্যালো রীতা? ... ও রীতা বাড়ি নেই? তুমি কে কথা বলছ? নন্দিনী? বুঝেছি। কোথায় গেছে তোমার বৌদি? .... কোন্ হাসপাতালে? নাম জান না? ... কেউ সঙ্গে গেছে? ... ও, তোমার বৌদির ভাইরা? হুঁ ... হুঁ ... ও, দাদাবাবুর অনেক সব আপনজনেরা? ঠিক আছে। পরে ফোন করব। বাড়িতে আর কে আছে? ... কেউ না? তুমি একা? .... বৌদিরা কখন ফিরবে বলে গেছে? ... বলেনি? অচ্ছা রাখছি। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল পারমিতা, পান্টি গড্ডুর অবতারের ভঙ্গিতে দুহাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

এর মানে?

মানে? মানে আর কী? সওয়ালের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

পান্টি। আমি তোমার ইয়ার বন্ধু নই।

ও-মা। সে কথা কে বলছে? ওদের সামনে কী আমি এমন করজোড়ে দাঁড়াই? গাঁট্টা মেরে ভিন্ন কথা বলি না।

পারমিতা ক্রুদ্ধ এবং প্রায় রুদ্ধ গলায় বলে ওঠে, সেটা আমার ক্ষেত্রেও। আমার সঙ্গেও কি গাঁট্টা মেরে ছাড়া কথা বল তুমি?

পান্টি একটু নরম গলায় বলে, দোহাই তোমার মা, গলার সুর স্যাঁতস্যাঁতে করে বসো না। 'রৌদ্ররসটাই' আমার ভালো সহ্য হয়। ... তো কী বলছিলে? কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলাম? কেউ না। এমনি একটা ছেলের সঙ্গে।

'ছেলে', তা তো বুঝতেই পারছিলাম। কোনও মেয়ের পক্ষে এতক্ষণ ধরে এক পক্ষের কথাই শুনে যাওয়া সম্ভব নয়। মাঝেমাঝে অপর পক্ষকে থামিয়ে ছাড়তই। তো ছেলেটা কে?

বললে তুমি চিনবে?

যাতে বললেই চিনতে পারি, সেটাই আমি চাই পান্টি। সেটা জানা আমার দরকার।

পান্টি এখন সোফায় বসে পড়ে বলে ওঠে, এতজনকে জানতে হলে, সিগারেটের ধোঁয়ায় তোমার যে অ্যাজমা বেড়ে যাবে-মা। তুমি যে একটা অ্যাজমা পেসেন্ট, সেটা তো আমায় মনে রাখতে হবে? শেষ পর্যন্ত যেটাকে জানা জরুরি, সেটাকে ঠিকই তোমার সামনে ধরে এনে দেব। এমনি আসতে না চাইলে, গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনব।

পারমিতাও বসে পড়ে হতাশভাবে বলে, পান্টি! এই জেনারেশনের তোরা কী সবাই এই ভাষায় কথা বলিস?

পান্টি হঠাৎ জিভ কেটে, দু কানে হাত ছুঁইয়ে বলে, ইস্! তাই কখনও হয়? কত সব গুড়ি গুড়ি ছেলেমেয়ে রয়েছে, তোমার রীতার মেয়ের মতো, বাপীর মেজমাসি, ছোটমাসির ছেলেমেয়েদের মতো! যারা সব জমার ঘরের হিসেবে পড়বে। আমাদের মতো এইসব উড়নচন্ডেরা তো খরচের খাতায় গো মা!

পারমিতা গম্ভীর গলায় বলে, পান্টি! তুই আমার একমাত্র সন্তান, সেটা ভুলে যাসনি।

ওই তো-ওইটিই তো হচ্ছে আমার একমাত্র জ্বালা মা। সেকালের মহিলাদের মতো দশবিশটাকে পৃথিবীর আলো দেখাতে, পৃথিবীর মাটিতে নিয়ে এনে ফেললে, উভয়পক্ষেরই এত টেনশন থাকত না। তোমাদের মন প্রাণের যত শখ সাধ স্বপ্ন বাসনা একটু শেয়ার হয়ে যেত। একটা মাত্তরের ওপর সেই সবগুলো চাপিয়ে চাপিয়ে এই বেচারার জীবনটাকে ধোপার গাধার তুল্য করে ছাড়ত না!

পারমিতা মেয়ের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলে, তোমার জীবনটা ধোপার গাধার তুল্য?

আহা, সে তো আমি নিজের প্রোটেকশনে ততটা হতে দিইনি। কিন্তু মা তোমার মেয়ের মতো এত শক্তি কটা ছেলেমেয়ে ধরে? তারা ওই ধোপার গাধা হয়েই মরে, মা বাবার ইচ্ছের বোঝা বয়ে বয়ে।

পারমিতা অবজ্ঞার গলায় বলে, মা বাবার ইচ্ছের বোঝা! তোমার ক্ষেত্রে অন্তত, বাবার কথা ওঠে না! তোমার বাবা আবার কবে মেয়ের কেরিয়ার গড়বার চিন্তা করতে বসেছে?

আহা,সে বেচারি ভদ্রলোক তেমন সময়টা পেল কখন, বল তো? নিজের কেরিয়ার গড়ে তোলার তালে তালকানা হয়ে ছুটে বেড়িয়ে অবশেষে দিকনির্ণয় করে ফেলে, তবেই না একখানা মন্ত্রী হয়ে বসেছে? মেয়ে নিয়ে মাথা ঘামাতে বসলে হত?

পারমিতা বেজার গলায় বলে, তা জানি। আমাদের দিকে কোনও দিন তাকিয়েও দেখেনি ও! আমিই একা নিজের চেষ্টায় তোমায় গড়ে তুলেছি।

তা হয়ত তুলেছ! তবে সেই যে কী বলে—শিব গড়তে বাঁদর, তাই গড়ে বসেছ, এই আর কী!

পারমিতা এখন প্রতিবাদী গলায় বলে ওঠে, বটে? সে কথা কেউ বলুক দেখি? কোন বিষয়ে তুই কম? লেখাপড়ায়, নাচে-গানে, খেলাধুলোয়, ছবি আঁকায়—

পান্টি হতাশভাবে বলে, ওই তো! ওইখানেই তো আমায় 'কপাল' মানতে বাধ্য হতে হয় মা! ছেলেবেলা থেকে কেবলই সংকল্পে কঠোর হয়েছি, তোমায় জব্দ করতে সবকিছুতে ফেল হয়ে ছাড়ব। কিন্তু কী করেই যে উল্টো হয়ে হয়ে বসেছে, সেটাই রহস্য। শেষে রেগেমেগে ওই 'কপাল'-কেই মানতে বাধ্য হতে হয়েছে। আর ধরে নিয়েছি কপাল দোষেই আমায় 'মন্ত্রীকন্যে'র টিকিট কপালে সেঁটে সমাজে ঘুরে-বেড়াতে হচ্ছে।

কপালদোষে?

পারমিতা হঠাৎ হেসে ফেলে বলে, তা কথাটা সেই মন্ত্রী-পিতার সামনে বলতে যেতে পারিস না? তার বেলা তো ভয়, যত তড়পানি মায়ের কাছে।

ভয়? নাঃ। ভয়-টয় কিছু না মা! বরং অন্য কিছুই। তা সে আর তোমার সামনে বলে ফেলে তোমায় আহত করতে চাই না বাবা! তাই ভদ্রলোককে আমি অ্যাভয়েড করে চলাটাই সুবিধের বলে মনে করি।

পারমিতা একটু ব্যঙ্গের গলায় বলে, তবু সেই লোকটার দৌলতেই তো তোমার বন্ধুসমাজে এত মান্যি বাবা!

পান্টি ছিটকে ওঠে! বলে, কী? ওই জন্যে বন্ধুসমাজে আমার মান্যি? আমার বন্ধুদের তুমি এইরকম হ্যাংলা ভাব? তারা নিজেরাও কেউ কিছু কম নয়, বুঝলে? তোমাদের ওইসব পদমর্যাদাকে তারা 'হ্যাটা' করে! আমাদের দলটি হচ্ছে একটা কী বলে, তোমাদের খবরের কাগজের ভাষায়? হ্যাঁ, 'বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী!' আমরা নিজেদের মতো করে বাঁচতে চাই!

পান্টি!

কী? কী হল? হঠাৎ গভীরে নেমে এলে কেন?

পান্টি, তোদের নিজেদের মতো করে বাঁচাটা কী, তাই বল তো?

বললে তুমি বুঝবে?

বোঝবার চেষ্টা করব। করতেই হবে!

তাহলে একটু সময় দিতে হবে! সেটা হচ্ছে—

ঠিক এই মোক্ষম সময়েই রান্নার মেয়েটা এসে দাঁড়াল!

কী? কী বলছিস গীতা? এখন আবার কী দরকার হল?

বলছি—কাল বেশি রাতে কারা যেন সেই যে অনেকগুলো বড় বড় চিংড়িমাছ দিয়ে গেছল, সেগুলো কি ফ্রিজ থেকে বার করে রাখব?

পান্টি হেসে বলে, যাও মা ডিউটি পালন করো গে। যাদের 'নিজের মতো করে বাঁচবার' অধিকার নেই, জাল ফেলে ধরে এনে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে ফ্রিজের মধ্যে ভরে ফেলা হয়-ভবিষ্যতে তারিয়ে তারিয়ে খাবার জন্যে, তাদের সদগতি করবার চেষ্টা কর গে।

বাধ্য হয়েই চলে যেতে হয় পারমিতাকে। সময়ে অসময়ে এমন বিবিধ উপঢৌকন তো আসেই, স্রেফ 'ভক্তের পূজা' বা 'ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে।' জিনিসগুলো নিয়ে পারমিতার জ্বালা বই সুখ নেই! সেই তাদেরকে যথাযথরূপে বিন্যাস করিয়ে পারমিতাকেও আবার উপঢৌকনস্বরূপ বিলি করতে হয় উপযুক্ত-উপযুক্ত জায়গায়!

চলে আসে রান্নাঘরে। ব্যবস্থাপত্র দেয় গীতাকে। গীতা চৌকস মেয়ে বেশি শেখাতে হয় না। .... তাই মনের মধ্যে মেয়ের ব্যাঙ্গোক্তিটা পারমিতার পাক খেতে থাকে, "যাদের নিজের মতো করে বাঁচবার অধিকার নেই, তাদের জাল ফেলে ধরে এনে—আর ফ্রিজের মধ্যে ভরে ফেলে ...

পান্টি কি সত্যিই শুধু ওই ভেড়ির চিংড়িগুলোর কথাই বলল? না কী পান্টির কথার মধ্যে অন্য ব্যঞ্জনা ছিল?

আর একবার রীতার বাড়িতে ফোন করতেই সর্বাঙ্গ ঠান্ডা হয়ে গেল পারমিতার! খবর খারাপ। খুব খারাপ। রীতার বর নিখিলেশের অপারেশনের আগেই বাড়ি থেকে বেরোবার পরই গাড়িতেই হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে শেষ। হাসপাতালে 'মৃত' বলে রায় দিয়েছে।

কী ভয়ানক! এমন কী করে হল? ভয়ে না কি? মানুষটা কি এত নার্ভাস ছিল? ... দেখে তো তা মনে হত না! বরং বেশ আত্মস্থ, আর খাঁটি মানুষ বলেই মনে করে তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখে থাকে পারমিতা! .... এই তো কিছুদিন আগে কবে যেন রীতা হাসতে হাসতে বলেছিল, এই পারমিতা, তোর মন্ত্রীকর্তার হাতেই তো চাবিকাঠি,তাকে ধরে আমাদের একটা ফ্ল্যাট পাইয়ে দে না বাবা!

নিখিলেশ তাড়াতাড়ি বলেছিল, ধরাধরি করার কী আছে? দরখাস্ত তো করে রাখা আছে। সময় হলেই—

আমার জীবদ্দশায় পেয়ে যাব, এমন আশা আছে তোমার? ও বরকে একটু ধরলেই—

নিখিলেশ রাজি হয়নি। বলেছিল, 'পাইয়ে দেওয়া' আর 'পেয়ে যাওয়া' এ দুটোতেই আমার অশ্রদ্ধা রীতা, তা তো জান তুমি!

রীতা বলেছিল, জানি মশাই জানি। ঠাট্টা করে ওকে একটু বাজিয়ে নিচ্ছিলাম।

না না, ঠাট্টারই বা দরকার কি? বাজানোরই বা মানে কী? উনি তো সত্যি ভেবে একটা দায়বদ্ধতায় পড়ে যেতে পারেন।

পারমিতার দিকে কটাক্ষ হেনে রীতা বলেছিল, দেখছিস তো এই কট্টর বুদ্ধু লোকটাকে নিয়ে ঘর করতে হয় আমায়।

পারমিতার বলে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল সেটা ভাগ্যি বলে মেনে নে! বলেনি অবশ্য। শুধু একটু হাসি দিয়ে কাজ সেরেছিল। এই একটি অমোঘ অস্ত্র অথবা মহৌষধ আছে সকল পরিস্থিতি সামাল দেবার! বহুবিধ ব্যঞ্জনাময় হালকা একটু হাসি!

বিশেষ করেই একটু শ্রদ্ধা এসেছিল সেদিন পারমিতার মানুষটার ওপর! এযুগে কাউকে শ্রদ্ধা করতে পাওয়াও তো একটা দুর্লভ প্রাপ্তি!

সেই মানুষটা মারা গেল?

অথচ সামান্যই একটা অপারেশনের কথা ছিল। জীবনমরণ সমস্যার মতো নয়! .... এমনি এমনিই মারা গেল! কী আশ্চর্য।

রীতার কী হবে?

রীতার কী হবে ভাবতেই মনে হল এক্ষুনি তো তার যাওয়া দরকার।

অবনীশের কাছে এসে দাঁড়াল। ছুটির দিন তাই পেল। তবে ছুটি বলেই যে সহজে পাওয়া যায় তা নয়। সর্বদাই তো অবনীশ লোকবেষ্টিত থাকে! নানারকম লোক। তাদের বেষ্টনী ভেদ করে স্বামীকে পাওয়া ভার। ভাগ্যক্রমেই আজ পেল!

কিন্তু পারমিতার আবেদনকে একেবারে নাকচ করে দিলেন 'স্বামী অবনীশ' এবং 'মন্ত্রী অবনীশ।'

না না, এখন ওই একটা বিশ্রী ভিড়ভাট্টার মধ্যে—তুমি কোথায় যাবে? একটা সাধারণ হসপিটালে, আজেবাজে কত লোক সর্বক্ষণ মারা যাচ্ছে—সেখানে তাদের মধ্যেই তো—

পারমিতা একবার বলল, আমি তো তোমার গাড়ি নিয়ে যেতে চাইছি না! ভাবছিলাম একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিমাইয়ের সঙ্গে চলে যাব! কে চিনবে?

চমৎকার! সেটা তো আরোই অদ্ভুত হবে! নিমাই আমার লোক এটা কে না চেনে জানে? কী যে বল? নিমাইকে সবাই চিনে রেখেছে?

রাখেনি? হা হা! বলে নিমাইকে ধরেই কত লোক বৈতরণী পার হবার চেষ্টা করে! তা জান?

কিন্তু এই খবর পেয়েও একবার গেলাম না, এতে রীতা কী মনে করবে?

মনে করার আবার কী আছে? তুমি তো আর তাঁর নিকটাত্মীয় নও যে শোনামাত্রই ছুটতে হবে?

'আত্মীয়তা' আর 'নিকটত্ব' কী কেবলমাত্র রক্তের সম্পর্ক দিয়েই বিচার হয়?

অবনীশ চট করে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে ওঠে, তর্ক করে যদি নিজের বিবেচনাকেই শ্রেষ্ঠ মনে কর, যেতে পার। কিন্তু নিমাইকে নিয়ে নয়। আর কাউকে যোগাড় করতে পার তো দেখো! তবে আমার বিবেচনায় মনে হচ্ছে—ওইসব আত্মীয়স্বজনদের কান্নাকাটির মধ্যে গিয়ে পড়ে নিজেই অকোয়ার্ড পজিশনে পড়ে যাবে। .... তাও যদি একটা ভালো নার্সিংহোম টোমে হত! ওই বাজে মার্কা একটা হসপিটালে—। রাবিশ!

অগত্যাই নিবৃত্ত হতে হল পারমিতাকে।

ভাবল—তা সত্যি! কান্নাকাটির মধ্যে একটা অপর লোক গিয়ে পড়ে হয়ত তাদের অসুবিধেই ঘটান হবে।

এইভাবে মেনে নিয়ে আর মনকে মানিয়ে নিয়ে চলাতেই অভ্যস্ত হয়ে যেতে হয়েছে। এখন অবনীশের মেজাজের পারা চট করে চড়ে ওঠে! এককথায় রেগে আগুন হয়ে যায়!

সেই রাগের ভয়ে নয়, অপমানিত হবার ভয়েই মেনে নেওয়ার অভ্যাসে দুরন্ত হয়ে যেতে হয়েছে পারমিতাকে।

কাজেই 'রীতার কী হবে?' ভাবতে ভাবতেই রাত্রে খাওয়ার টেবিলে অবনীশের বিশেষ প্রিয় বড় গলদাচিংড়ি পরিবেশন করবার সময় বলতেও হল 'মাছগুলো দারুণ।' .... আর তার সঙ্গেই একটু ক্ষুব্ধ অনুযোগও শুনতে হল, এমন মাছগুলো রান্নার মেয়ে গীতার হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে।' .... মস্ত একটা শ্বেত পাথরের টেবিল, তার ওপর থরে থরে খাদ্যবস্তু সাজানো।

তবে হাঁপানিরুগি পারমিতার চিংড়ি বারণ!

পান্টিও খেল না দেখে অবনীশ বলেন, তুই খেলি না যে?

পান্টি তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে, আমার তো চিরকালই চিংড়িতে অ্যালার্জি। চিংড়ি, কাঁকড়া, ডিম!

তোরাই দুঃখী বাবা!

বলে অবনীশ চামচ করে আর একটা মাছ তুলে নেয়।

পান্টি মুচকে হেসে বলে, আমাদের মতো কিছু দুঃখী লোক আছে বলেই তো আপনাদের মতো কিছু লোক সুখী হবার সুযোগ পাচ্ছে স্যার!

অবনীশ কপাল কুঁচকে বলেন, হঠাৎ হঠাৎ আমায় আপনি, আজ্ঞে, স্যার' এসব বলিস কেন বলতো?

সবাই 'স্যার স্যার' করে দেখে, দারুণ মহিমা-মহিমা লাগে কিনা। তাই বলতে ইচ্ছে করে! 'অদ্ভুত!'

বলে অবনীশ নিজের কাজে মন দেন।

মেয়েটাকে বিশেষ ঘাঁটাতে চান না। ওর যেন কেমন প্রতিপক্ষ-প্রতিপক্ষ ভাব অবনীশের প্রতি। ... কেন? কীসের অভাব রেখেছেন অবনীশ ওর? অবনীশের সর্বস্ব তো ওরই ভোগে লাগবে। এ খেয়াল রাখে না? যাকগে—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই অবনীশের। ... তবে মনে মনে একটা ছেলেকে মেয়ের জন্যে পাত্র হিসেবে ঠিক করে রেখেছেন অবনীশ এবং সেই ছেলের বাবার সঙ্গে দহরম মহরম রেখেছেন। কোটি কোটিপতি লোক! তবু মাঝে মাঝে মন্ত্রীর দ্বারস্থ হতেও আসতে হয়! তার সেই ছেলেটা এখন বিদেশে গেছে পড়তে। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, রাজপুত্তুরের মতো চেহারা! অবনীশ তাই তার বাপটাকে হাতে রাখেন এবং মাঝে মাঝে ইশারা ইঙ্গিতে নিজের ইচ্ছেটি ব্যক্ত করেন যেন কৌতুক ছলে।

তার মানে পারমিতা যে বলে, অবনীশ স্ত্রী কন্যার কথা একেবারেই মাথায় রাখে না, সেটা পারমিতার ভুল ধারণা।

পাশাপাশি দুখানা সরু খাট দু দেওয়ালের ধারে। পারমিতা একখানায় শুয়ে পড়েছে, পান্টি তখনও শোওয়ার প্রস্তুতি সারছে। এই রাত্তিরেই তো তার খাটো করে ছাঁটা চুলগুলো 'বিনুনির গড়নে বাঁধা পড়ে। ... হাতে মুখে এটা ওটা কীসব মাখে। দিনের পোশাক ছেড়ে রাতের পোশাক পরে।

পারমিতার এত সব কিছু অভ্যাস নেই! পারমিতা চির অভ্যাস মতো যা শাড়ি জামা পরা ছিল তাই পরেই শুয়ে পড়েছে।

ঘরে হালকা নীল আলো জ্বালা।

আধুনিক বিলাস-বসনের ঘাটতি কিছু নেই।

তবে পান্টি একথা বলে না, 'এসব চাই না।' পান্টি যেন সবকিছু নিয়ে ভোগ করে তার মা বাপকে কৃতার্থ করে।

পান্টি নিত্য অভ্যাস মতো শুয়ে পড়বার আগে মায়ের বিছানায় একবার বসে পড়ে, মায়ের গায়ের ওপর একটু গড়িয়ে নিয়ে 'শুভ রাত্রি' জানাতে গিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে, আচ্ছা মা! তোমার যখন বিয়ে হয়েছিল, তোমার বর খুব গরিব ছিল না?

আমার বর! আচ্ছা পান্টি, তোর কী কোনও কালেই কথায় ভব্যতা-সভ্যতা আসবে না? আমার বর! তোর বাবা না?

আহা তখন তো আর আমার বাবা হয়নি? .... তো যাকগে বল না? খুব গরিব ছিল?

পারমিতা বলে, তা গরিব তো ছিলই। ওর বাবা বরাবর চরকা কেটেছেন, আর জেল খেটেছেন, একা মা-ই সংসার চালিয়েছেন, ছেলেকে মানুষ করেছেন।

মানুষ করেছেন। ও হ্যাঁ—তারপর? মানে তাহলে তো—

পারমিতা বলে তবে আমার বিয়ের সময় অত গরিব ছিলেন না শ্বশুর। ওই চরকা কাটা আর জেল খাটার দৌলতে তখন 'স্বরাজ' পাওয়া দেশে একটু থিতু হয়ে বসে দুধে-ভাতে আছেন। কিন্তু-গিন্নিটি গত হয়েছেন। তাই তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে। তো বাদ সাধল ছেলে! যেচে দারিদ্র্য ডেকে আনল। 'আরাম আয়েস খাওয়া মাখা' কে ঘৃণ্য বোধে ত্যাগ করল। ....বাবার সুখ-সুখ সংসারে বসে কৃচ্ছ্রসাধন। .... পার্টির তাই নির্দেশ। বাবা রেগে বললেন, —'আমার বাড়িতে বসে, তোমার এসব পার্টি-ফার্টি চলবে না। ওসব ছাড়।' ছেলে বলল, 'ওসব তো ছাড়া সম্ভব নয়। তাহলে তোমার বাড়িটাকেই ছাড়ছি।'

বাঃ। এ তো রীতিমতো আদর্শবাদীর কথা!

পারমিতা একটু নিঃশ্বাস ফেলে বলে, ওই কথার মোহেই তো-! যাক শ্বশুর বললেন, 'ওই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে তুমিও যেতে চাইছ বৌমা? তাহলে কি আর ওর মতিগতি ফিরবে? বাড়ির গৃহিণী চলে গেছেন, সব শূন্য। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুমি থাক!' ... বললাম, তা কী করে হয় বাবা?'

'ওর সঙ্গে গিয়ে তোমার হাঁড়ির হাল হবে বৌমা! ও তোমায় উপোস করিয়ে মারবে!' ... দেখে কষ্ট হচ্ছিল খুবই। তবু বললাম, 'সেটাই মেনে নিতে হবে বাবা।' .... তিনি রেগে উঠে ছেলেকে বললেন, 'যাবে তো যাও। তবে জেনে যাও, এবাড়ির দরজা তোমার কাছে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।' .... তারপর আর কী? সত্যিই হাঁড়ির হাল। ... সবদিন পুরো খাওয়া জোটে না। একখানা টিনের চালাঘরে বাস। বিছানা মানে একটা মাদুর আর কিছু পুরোনো খবরের কাগজের বান্ডিলের বালিশ। ... খবরের কাগজ বিছিয়ে রুটি খাওয়া, মুড়ি খাওয়া। বাসন তো নেই। জুটলে, মাঝে মধ্যে পাইস হোটেলে ভাত খেয়ে আসা।

সত্যি? সত্যি বলছ মা? এত গরিব ছিলে তোমরা?

পান্টি অভিভূত হয়ে তাকায়!

পারমিতা আস্তে বলে, সত্যিই। তবু মাঝে মাঝে কী প্রশ্ন আসে জানিস? তখন বেশি গরিব ছিলাম, না এখন বেশি গরিব হয়ে গেছি।

ঠিক! আমিও তাই ভাবছি।

অথচ পান্টির চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মস্ত এক শ্বেতপাথরের টেবিল, তার ওপর থরে থরে নানান খাদ্য সাজানো। হঠাৎ যেন 'বাবা' নামের লোকটার ওপর একটা করুণা আসে পান্টির। একটু বুঝি মমতাও।

গিয়ে শুয়ে পড়ে নিজের খাটে!

কিছুক্ষণ ঘর স্তব্ধ। শুধু পাখার ব্লেডগুলোর হাওয়া কাটার শন শন শব্দ। ...

মনের মধ্যে কার কী কথার ঝড় বইছে কে জানে।

পান্টির বলে উঠতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমি? আমি কখন এসে গেলাম? সেই ছেঁড়া মাদুরের বিছানা, আর খবরের কাগজের বান্ডিলের বালিশে? না কি তখন তোমাদের অবস্থা ফিরে গেছে?

কিন্তু বলে উঠতে পারছে না!

মনে হচ্ছে মা যেন আজ বড় ক্লিষ্ট।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল দুপুরে বেরবার সময় একটা মস্ত দুর্ঘটনার খবর শুনে গেছল। ... মা বলেছিল, 'আমি এক্ষুনি যাই।'

এসে জিজ্ঞেস করা হয়নি। ধেৎ। আমি যে একটা কী?

হঠাৎ বলে ওঠে মা! রীতামাসি খুব ইয়ে হয়ে গেছে? মানে খুব ভেঙে পড়েছে?

পারমিতা আস্তে বলে, কী জানি। পড়তেই পারে। সেটাই স্বাভাবিক। মাথার ওপর কেউ তো রইল না! বাড়িটা ভাড়াটে, ছেলেটা, নাবালক, মেয়েটা বিয়ের যুগ্যি।

তা 'কী জানি' বলছ কেন? দেখে কী মনে হল?

দেখলাম আবার কখন? যাওয়াই হয়নি তো।

যাওয়াই হয়নি? তখন যে বললে তক্ষুনি যাচ্ছ!

বলেছিলাম তো। তো-তোর বাবা বলল, আজ আর ওই ভিড়ের মধ্যে আর কান্নাকাটির মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। কাল কোনও একসময় গেলেই হবে।

ওঃ। বুঝেছি। স্যারের হুকুম মেলেনি!

হুকুম আবার কী? জিজ্ঞেস করায় বলল—এখন এসময় না গেলেই ভালো!

তোমার কি ধারণা ছিল ওকথা ছাড়া আর কিছু বলবেন বাবা?

তা জানি না। জিজ্ঞেস তো করতেই হবে একবার?

করতেই হবে? জিজ্ঞেস না করে এক পা বেরনো চলবে না? তুমি কি জেলখানার কয়েদি?

কী যে আজেবাজে বলিস। এ কী মার্কেটে কেনাকাটা করতে যাওয়া যে ইচ্ছে হল বেরিয়ে পড়লাম। তাও সেটুকুও বাড়িতে থাকলে—না বলে বেরোই না কি? আর এ তো একটা বিশেষ জায়গায়! জিজ্ঞেস না করে যাওয়া যায়?

যায় না? আচ্ছা কেন যায় না বলত মা? বাবা তোমায় বলে সব করে?

কী যে বলিস। ও যে কী করে আর না করে আমি কী কিছুই জানি? তবে আমার ওটাই অভ্যাস।

অভ্যাসটা ছাড়বার চেষ্টা করে দেখেছ কখনও? করোনি নিশ্চয়।

ছাড়বার কথা ভাবনাতেই আসেনি।

তার মানে আষ্টেপৃষ্ঠে দাসত্বের মনোভাবের শৃঙ্খল। কিন্তু কেন বলো তো?

পান্টি উঠে বসে। শক্ত গলায় বলে, কেন একজন অন্য একজনের দাস হয়ে থাকবে? 'তুমি' তোমার নিজের মালিক হবে না? অন্য একজন তোমার মালিক হবে? কেন? কেন? কীসের জন্যে নিজেকে এত খাটো করে রাখা? ... এই জন্যেই আমরা নিজের মতো করে বাঁচা'র আন্দোলন গড়ে তুলতে একাটা অ্যাসোসিয়েশন করেছি মা! 'মুক্ত হাওয়ার বারান্দা!'

পারমিতা আস্তে বলে, এই পৃথিবীতে সত্যিই কী কারও নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার আছে রে পান্টি? প্রতি পদেই তো নিজেকে বিসর্জন দিতে দিতে চলা! আইনের শাসন, সমাজের শাসন—নিজের অভ্যাসের শাসন!

ওইসব পচা পুরনো হিসেব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমরা নতুন পৃথিবী গড়ব মা!

নতুন পৃথিবী!

হ্যাঁ। নতুন পৃথিবী। যে পৃথিবীতে প্রতিমি মানুষ হবে নিজেই নিজের মালিক। তাদের অন্য কোনও মালিক থাকবে না। থাকবে না খবরদারি করবার কেউ!

ঘর আবছা আলোয় ছায়া ছায়া মায়া মায়া। মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু মেয়ের আত্মবিশ্বাসে ভরা গলার স্বরটি শুনতে পেয়ে অনুমান করতে পারে পারমিতা, তার চোখে প্রত্যয়ের আলো!

মনে মনে একটু করুণার হাসি হাসল পারমিতা।

যুগে যুগে এই একই লীলা চলে আসছে। কিছুজন তাদের ধ্যানধারণা আর বিশ্বাসের মশালটি জ্বালিয়ে ডাক দেয়, 'এস সবাই। চলে এস। আমার আলোয় পথ চেনো। দেখো আমরা পচা পুরোনো পৃথিবীকে আমূল বদলে ফেলে, 'নতুন পৃথিবী' গড়ব। সেখানে কারও কোনও অভাব থাকবে না, দুঃখ থাকবে না। সবাই সমান হয়ে যাবে।'

তা সে ধর্মের জিগির দিয়েই হোক আর কোনও রঙিন মতবাদের জিগির দিয়েই হোক। আর সেই পরমা শান্তি আনার জন্যে কী চরমমূল্যই ধার্য করা হয়! .... শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে রক্তের বন্যা বয়, অসংখ্য প্রাণ বিনষ্ট হয়। রক্তের বিনিময়ে মুক্তি কিনে ফেলার দুরন্ত নেশা! পৃথিবীর বদল ঘটিয়ে ছাড়বে তারা!

কিন্তু দুনিয়া বদলায়। পৃথিবীর বদল ঘটে না!

পৃথিবী নিজের নিয়মে চলে!

মনুষ্য ধর্মের চিরন্তন শিকার মানুষ, ক্ষণিক উন্মাদনার শেষে আবার মনুষ্য ধর্ম পালন করে চলে! পঞ্চ ভূতের তৈরি মানুষের মধ্যে পাঁচ ভূতুড়ে কাণ্ড!

পারমিতাও কী একদিন 'নতুন পৃথিবীর' হাতছানিতে মোহগ্রস্ত হয়ে, 'পুরোনো পৃথিবীকে' ছেড়ে চলে আসেনি? কলেজ পালিয়ে পালিয়ে, সেই একজন 'নতুন পৃথিবী' গড়ে তোলার ফর্মুলা বানানেওলার কাছে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকেনি? ... তারপর একটি জ্বলন্ত মশালের পিছু পিছু চলে আসেনি পুরোনো পৃথিবীর ঘর ছেড়ে?

'নতুন পৃথিবী' হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, 'কিন্তু এখন গড়ার সময়, দুঃখ, দুর্দশা, অভাব, অনটন, অনাহার মৃত্যু!'

পারমিতা হেসে বলেছিল, 'মৃত্যু' তো অবধারিত পরিণতি! তার বেশি কিছু তো হতে পারবে না?

পুরোনো পৃথিবী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিল—নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনছ, তা মনে রেখ!

পারমিতা হেসে বলেছিল, 'সর্বই নেই তা তার নাশ। আমরা তো সর্বহারার দলে!' চলে এসেছিল একটা জ্বলন্ত মশালের আলোয় চোখ ফেলে ফেলে।

কিন্তু তখন কি টের পেয়েছিল মশালটা রংমশাল? যার মধ্যে বারুদের সম্বল সামন্যই! খানিকক্ষণ কিছু রঙিন আলোর ফুলকি ছড়িয়ে নিভে ঠান্ডা হয়ে যাবে?

ধীরে ধীরে টের পেতে লাগল।

প্রথম প্রথম অবাক হয়েছে পারমিতা, তারপর আহত! মর্মাহত!..... অতঃপর ক্ষুব্ধ ধিক্কারে উত্তাল হয়েছে। ক্রমশ আবার থিতিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে মেনে আর মানিয়ে নিয়ে নিয়ে চলে ও চলেছে। তখন তো পান্টি এসে গেছে। পারমিতার চোখেই আর এক বস্তুকে গড়ে তোলার স্বপ্ন।

এই মেনে আর মানিয়ে নেবার শক্তির জোগানদার কে?

ভালোবাসা? .... না শুধু অভ্যাস?

কে জানে। এখন আর উত্তর খোঁজে না পারমিতা। তবু জানে মোহভঙ্গের মতো যন্ত্রণা আর কিছু নেই।

পারমিতার মেয়েটাকেও কি সেই যন্ত্রণার শিকার হতে হবে একদিন?

নাঃ। পারমিতাকে দেখতেই হবে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে পান্টি। কেমন তাদের রীতিনীতি? সাবধান করে দিতে হবে।

পান্টি তাকে জ্বালাতন করবার জন্যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের অভিনয় করলেও, চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেতে পারে না তো পারমিতা! মান-অভিমান করে মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকতে পারে না।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আস্তে বলে ওঠে, পান্টি, ঘুমিয়ে পড়লি?

না তো! কেন?

না, এমনি!

রীতামাসির কথা ভেবে খারাপ লাগছে মা?

কথাটা শুনে হঠাৎ চোখে জল এসে যায় পারমিতার। অবনীশের একথা মনে পড়েনি। মনে পড়েনি আবাল্যের বন্ধুর এই ভাগ্য বিপর্যয়ে পারমিতার মন খারাপ হতে পারে। তা ওদের 'নীতিপাঠে' তো আবার 'মন' বলে বস্তুটা থাকার কথা নয়। সব 'পাঠ' বিসর্জন দিয়ে বসেছে, ওইটুকু মনে রেখেছে। কোনওখানে একটু মমতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে না।

তবু অবনীশের মেয়ের মধ্যে রয়েছে একটু।

আস্তে বলে, তাই ভাবছি। কী হয়ে গেল!

কী আর করবে বল? মনকে শান্ত করে ঘুমোবার চেষ্টা কর।

একটু চুপ করে থাকে পারমিতা।

আবার হঠাৎই বলে ওঠে, পান্টি! একদিন তোর বন্ধুদের বাড়িতে ডাকবি?

পান্টি চমকে উঠে বলে, বন্ধুদের এ বাড়িতে? হঠাৎ একথা বলছ যে?

এমনি। ইচ্ছে হয়, কাদের সঙ্গে তোর এত ভাব? কারা নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার শপথ নিয়ে বসেছে? তাদের দেখি।

ওঃ। গোয়েন্দগিরি করতে চাও?

ছিঃ পান্টি।

তবে? ঠাট্টা করছ?

না রে না। ঠাট্ট নয়। ভাবনা হয়।

ভাবনাটা কীসের? সন্দেহ হচ্ছে আমরা বোমা বানাচ্ছি, না ব্যাঙ্ক ডাকাতির পথ ধরেছি?.... ওসবকে আমরা ঘেন্না করি মা। আমরা শুধু প্রত্যেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চাই! সে তুমি বুঝবে না বাবা!

বুঝতে পারছি না বলেই তো তাদের দেখতে চাই!..... ভাবছি পাছে ঠকে যাস।

তা ঠকতে হয়ত পারি! ভুল করে ফেলে ঠকা অসম্ভব নয়। তবে জেনো ঠকলে নিজেরাই ঠকব। অন্যকে ঠকাতে বসব না—স্বর্গের ধোঁকা, দিয়ে, বৈকুণ্ঠের ধোঁকা দিয়ে!... কিন্তু রাত দুপুরে কী হল তোমার? ভূতে পেল? ঘুমোও তো!

তখন পান্টির গলায় ধমকের সুর!

আচ্ছা বাবা ঘুমোচ্ছি। তবে ডাকিস বাপু একদিন তাদের। দেখতে ইচ্ছে আছে।

তাদের এই বাড়িতে আসতে দায় পড়েছে।

আসবে না?

বললাম তো দায় পড়েছে। কিন্তু তুমি ঘুমোবে কী ঘুমোবে না? মাথায় ঠান্ডা জল ঢেলে দেব?

আচ্ছা বাবা আচ্ছা, এই ঘুমোলাম।

... কিন্তু ঘুমোতে কি পারল?....

আর পান্টির অহঙ্কার কী টিকল?

আসতেই হল না কি তাদের মধ্যের দুজনকে এই ধিক্‌কৃত বাড়িটায়?

ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠল পাশের ঘরে।

যে ঘরের অপর পাশে অবনীশ। তিনিই উঠলেন।

ফোনটা ধরে প্রথমটা অলস গাম্ভীর্যে ঘুমজড়ানো গলার ভঙ্গিতে বলেন হ্যালো। কাকে চান?....

তারপরই প্রায় ঠিকরে উঠে তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠেন, কী? এই রাতে পান্টিকে? স্টুপিড। রাস্কেল! বদমাশ! হারামজাদা!

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ছুটে আসে পান্টি অবনীশের হাত থেকে রিসিভারটাকে ফস করে ছিনিয়ে নিয়ে বলে ওঠে, কে? কী বলছিস? অ্যাঁ? কার অ্যাক্সিডেন্ট? কার কী হল, লাট্টু আর জোজো? কে আসছিল আমায় নিতে? ঠিক আছে। এক্ষুনি যাচ্ছি, চলে আয়।'

ফোনটা হাত থেকে ফেলে ছুটে ঘরে চলে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে, ওগো মাগো! লাট্টু আর জোজো দু'জনে-মরে গেছে। ওমা আমি কী করব মা?

কোনওমতে একটা শাড়ি জড়িয়ে নেমে যেতে যায় নীচের দিকে! কিন্তু কোলাপসিবলে তালা লাগান।

বাবা! তালা খুলে দাও।

না!

কী বললে? না? অ্যাঁ? না? না মানে?

নীচে ট্যাক্সির হর্ন শোনা যায়। অসহিষ্ণু অস্থির। বাবা! খুলে দাও বলছি! ওরা এসে গেছে।

আমি বলছি এসব হচ্ছে বদমাইসি! ষড়যন্ত্র।

আঃ। বলছি ওরা আমার চেনা! খুব চেনা!

অবনীশ কঠোর গলায় বলেন, চেনা হলেও, এই রাত্রে তোমায় ওদের সঙ্গে যেতে দিতে পারি না আমি। কত রাত হয়েছে জানো?

জানি! সাড়ে বারোটা!..... কিন্তু এখন না গেলে যে ওদের দেখতে পাব না বাবা! বলছে, ডেডবডি মর্গে নিয়ে চলে যাবে। তোমার পায়ে পড়ছি বাবা!

পান্টি! আমি বলছি ওসব মিথ্যে কথা। সাজানো কথা! আমি এক্ষুনি ফোন করে পুলিস, ডেকে ওদের অ্যারেস্ট করাচ্ছি।

কথাটা অবাস্তব। তবু জেনেও বলেন।

কিন্তু পান্টি ফুঁসে ওঠে, কী? তুমি ওদের অ্যারেস্ট করাবে? বলছি ওরা আমার বন্ধু! খুলে দাও বলছি গেট। নইলে চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করব!

কী? তুমি আমার শাসাচ্ছ?... লোক তো ইতিমধ্যে জড়ো হয়েই গেছে জানলায় জানলায়। বেশ যত চেঁচাতে পার চেঁচাও।

আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব। দেখি তুমি কী কর!

পান্টি! কী হচ্ছে কী? থাম? চুপ কর।

নেমে এসেছে পারমিতা। শান্তগলায় বলছে, পাগলামি করছ কেন?....

অবনীশ যেন ধড়ে প্রাণ পান। যাক পারমিতাও হাল ধরতে এসেছে। তাকিয়ে দেখলেন নিমাই আর গীতাও একপাশে দাঁড়িয়ে! সবটাই অবনীশের পক্ষে বুকের বল।

কিন্তু এটা কী হল? পারমিতা তেমনই শান্ত দৃঢ় গলায় বলে উঠলে, নিমাই! চাবি তো তোর কাছে। খুলে দে তালা।

কী? খুলে দেবে?

দেবে। দিতেই হবে! নিমাই—

নিমাই তার স্যারের মুখের দিকে না তাকিয়ে খুলে দেয় সদরের কোলাপসিবলের তালা।....

বাইরের গেটের তালা। সঙ্গে সঙ্গে পান্টি গিয়ে ঝাঁপিয়ে গাড়িতে চাপে।

অবনীশ খাঁচায় বন্দি বাঘের মতো গর্জন করে ওঠেন, তোমার মেয়েকে জানিয়ে দাও, এ গেটে যেন আর না মাথা গলাতে আসে!

পারমিতা স্থির ভাবে বলে, সেটা তাহলে শুধু ওকেই নয়, নিজেকেও বলতে হবে।

তার মানে? তা-তার মানে?

পারমিতা হাতের ইসারায় গাড়িটাকে জানান দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলে তার মানে হচ্ছে পাগল ছাগল যাই হোক আমি তো আর মেয়েটাকে দূর হয়ে যা বলে, একা রাস্তায় ছেড়ে দিতে পারি না।

হঠাৎ অবনীশ শরীরে একটা মোচড় দিয়ে, শুধু পায়জামা আর হাতাকাটা গেঞ্জি পরা অবস্থায় লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে বলে ওঠেন, এই নিমাই। উল্লুকের মতো দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চাবিটাবি বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে যা! অর শোন্ পাড়ার লোক তো মুখিয়ে আছে, জিজ্ঞেস করলে বলবি, দুটো ডাকাত গাড়ি চড়ে এসে গেট ভাঙতে চেষ্টা করছিল, তাদের ধরে ফেলে থানায় জমা দিতে যাওয়া হয়েছে।

গাড়ি স্টার্ট দেয়।

ছেলে দুটো ইস্পাত-ইস্পাত গলায় বলে ওঠে, স্যার কি আমাদের থানায় নিয়ে যাবার মতলব করছেন। সেটা করলে কিন্তু ভালো কাজ হবে না।

অবনীশ অগ্রাহ্যের গলায় বলেন, ভালো তো সবই হচ্ছে। পরিস্থিতি দেখে তাই সন্দেহ হচ্ছে তোমাদের? বাঃ পান্টি তোর বন্ধুরা তো খুব বুদ্ধিমান।

পান্টি অবশ্য ফুলে ফুলে কেঁদে চলেছে।

কিন্তু পান্টির মা?

হায়! লজ্জা হারিয়ে তাঁর কেন মনে হচ্ছে, বুকের মধ্যে আচমকা এসে চেপে বসা ভারী পাথরের চাঁইখানা নেমে গেল! সেই ফাঁকা জায়গাটা দখল করে বসল অনেকখানি বল, ভরসা নিশ্চিন্ততা।

ফল্গুধারা

আমাদের প্রতিদিনকার পথে কত ঘটনা ঘটে, কত মানুষ আসে যায়, যারা পথ হ'তে সরে যায় তাদের কাউকে আমরা একেবারে হারিয়ে ফেলি, ভুলে যাই; আবার কাউকে কখনও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'তে পারিনে; কারণে অকারণে মনে পড়ে যায়, আর হারানোর ক্ষতিটা যেন বড় বেশি লাগে। কত তীব্র অনুভূতি কোমল হয়ে আসে, সন্ধ্যামেঘের মতো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। আবার তুচ্ছ কোনও ঘটনা চিরদিনের মতো মনে দাগ রেখে যায়।

ছোটবেলার কথা ভাবতে গেলেই আমার সব প্রথম মনে পড়ে তুষার-মামির কথা। তিনি সকলের মধ্যে থেকেও কেমন যেন অসাধারণ ছিলেন, আর তাঁর সেই সাদা পাথরে গড়া প্রতিমার মতো মুখে এমন একটা মহিমময়ী ভাব ছিল, যা আমাকে অভিভূত করে দিত। কিংবা সেটা হয়তো আমার অভিভূত হবারই বয়স। নইলে সকলেই তো তুষার-মামিকে দেখেছে; মুগ্ধ হওয়া দূরের কথা, সকলের মুখেই তাঁর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনাই শুনেছি।

আমার অন্য মামিরা বলতেন 'তুষার বৌ'য়ের নাকি অত্যন্ত অহঙ্কারী স্বভাব। কেউ বলতেন রূপের, কেউ বলতেন বিদ্যের। তা' ছাড়া আর তো অহঙ্কার করবার ভগবান তাঁর জন্যে রাখেন নি কিছু।

আমি তাঁকে দেখি আমার মামার বাড়িতে এক রকম আশ্রিতার মতো। দূর-সম্পর্কের জ্ঞাতিদের বৌ তিনি, স্বামী নাকি তাঁর তখন নিরুদ্দেশ। বুড়ো এক শ্বশুর ছিলেন; আমার মামার বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে তাঁদের পুরোনো আমলের দোতলা কোঠা—অনেক জায়গা ভেঙে চুরে গিয়েছে—সেইখানে তুষার-মামি প্রতিদিন দুবেলা শ্বশুরকে খাবার নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আসতেন। পরের অন্ন গ্রহণ করতে তাঁর লজ্জা ছিল না, কিন্তু পরের বাড়ি এসে প্রতিদিন পাত পেতে খেতে তাঁর নাকি অপমান বোধ হ'ত। রান্নাঘরের পিছন দিয়ে একটা রাস্তা ছিল, সেই রাস্তা দিয়ে গেলে তুষার-মামিদের বাড়ি খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যেত। রান্নাবান্না শেষ হলেই ভাত বেড়ে নিয়ে বাড়ির একটা ছোট ছেলেকে সঙ্গে করে তিনি শ্বশুরকে খাওয়াতে যেতেন। একদিনের জন্যও তার ব্যতিক্রম হ'ত না।

পরে শুনেছিলাম তুষার-মামির শ্বশুর, মার ঐ ছোট কাকা নাকি ভয়ানক মাতাল ছিলেন বলেই মামি সেখানে থাকতে পারতেন না। সত্যি তাঁর রাজরানির মতো গম্ভীর মুখের ভাবে আশ্রিতার দীনতা একেবারেই স্পর্শ করত না। তাই পরের বাড়ি থাকাটা যেন তাঁকে মোটেই

মানাত না। আমার ছেলে-বয়সের কল্পনাপ্রবণ মনে মনে হ'ত—ইচ্ছে করলেই তুষার-মামি এখুনি অদ্ভুত একটা কিছু করে ফেলতে পারেন; সকলে দেখবে "যা'কে আমরা নেহাৎ সাধারণ মেয়ে বলে ভেবেছি, সে এক ছদ্মবেশিনী রাজকন্যা। শ্বেত হস্তী এসে পিঠে তুলে নিয়ে যাবে।" এমন আরও সব রূপকথায় পড়া ঘটনার সঙ্গে তুষার-মাকে মিলিয়ে অনেক কিছু কল্পনা করেছি।

তুষার-মাকে আমি দেখেছিলাম মাত্র মাস চারেক। তারপরই তাঁর জীবন-নাট্যের শেষ যবনিকা পড়ে গেল। বাবার সঙ্গে থাকতাম দূর প্রবাসে, জ্ঞানে প্রথম বাংলাদেশে আসি তেরো বছর বয়সে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে মার আবার সন্তান-সম্ভাবনায় বাবা ব্যস্ত হয়ে আমাদের মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেন। দাদামশাই দিদিমা তখনও বেঁচে। আসবার সময় আমার যে কি একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল তা' বর্ণনাতীত। ছোটবেলার জীবনটা আমার বেশির ভাগ কেটেছে বইয়ের মধ্যে—তাই সব জিনিসে কল্পনার রং চড়িয়ে দেখা আমার স্বভাব ছিল। তাই এই প্রথম মামার বাড়ি যাওয়া ও বাংলাদেশ দেখার মধ্যে যে উত্তেজনা ছিল তা' আমার বয়সের মেয়েরা ঠিক অনুভব করতে পারবে না।

মাকেও দেখলাম—বাসা থেকে আসবার আগে ক'দিন ধরে যে বিষণ্ণ নিরানন্দ ভাব ঘিরে রেখেছিল সেটা গাড়িতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই কমে এল। খানিকটা দূর যেতেই বাপের বাড়ির আত্মীয়-স্বজনের কথায় ছোটবেলার খুঁটিনাটি গল্পে একেবারে মেতে উঠলেন। বাবা প্রথমটা না হুঁ করে উত্তর করছিলেন, এক সময় দেখলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাবার মুখের দিকে চেয়ে কষ্ট হ'ল। আহা আমরা না হয় নতুন জায়গায় যাব, কত সব নতুন কিছু দেখব বলে এত আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু বাবাকে তো আবার দু'দিন পরে এই পথ দিয়ে একলা ফিরতে হবে। আমাদের মীরাটের বাসায় বাবা আছেন, অথচ আমরা নেই একথা যেন ভাবাই যাচ্ছিল না। কিন্তু মার আনন্দেও দোষ দেওয়া যায় না? মা নাকি এই ন বছর পরে বাপের বাড়ি যাচ্ছেন। যেমন আমার তেমন তো তাঁরও, বরং আরো বেশী—ভাই বোন দাদা দিদি আরও কত কি তাঁর কাছে যা আমার নেই।

বাবা ঘুমিয়ে পড়ার পর মার সঙ্গে চুপি চুপি গল্প করতে করতে—মামার বাড়ির প্রায় সকলকেই চিনে নিলুম এবং মনে সন্দেহ রইল না, দিদিমা দাদু মামা মাসিদের কথা তো ছেড়েই দাও, গ্রামের সকলের সঙ্গেও তেমন আর নতুন করে পরিচয় করতে হবে না।

মার নতুন ঠানদি 'রাঙাখুড়ি' 'পদ্মদিদি' 'বিপিন ভাইপো' 'ও বাড়ির ছোট কাকা' আর রাজীব দাদাকে অনায়াসেই চিনে ফেলতে পারব। এমন কি সন্দেশের দোকানে চিন্তামণি ময়রাটাকে পর্যন্ত, যদি বেঁচে থাকে। মা তো বলেন তখনই খুব বুড়ো ছিল। মা বললেন, চিন্তামণির ছোট ছেলে লালমোহনের সঙ্গে মা নাকি ছোটবেলায় অনেক খেলেছেন। আশ্চর্য রকমের অবাক হয়ে যাই। মার এখনকার এই জীবনের সঙ্গে এ কথাটাকে যেন কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না।

মায়ের এদিকটা যেন একটা চাবি দেওয়া বন্ধ বাক্স ছিল, হঠাৎ ডালা খুলে গিয়ে সব এক সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে চায়। এত কথাই বা মার সঙ্গে কবে কইতে পেয়েছি? সেখানের সেই রুটিন বাঁধা সময়ে লেখাপড়া, সেলাই, গান ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে মাকে যতটুকু পেতাম তাতে সম্পূর্ণতা ছিল না। কোনও কোনও ভদ্রমহিলা বেড়াতেও আসতেন মাঝে মাঝে, তাঁদের সঙ্গে মার যা গল্প সে আমি মুখস্থ বলে দিতে পারতাম—এমনি কেতাদুরস্ত একঘেয়ে কথাবার্তা।

মামার বাড়ি গিয়ে কি করতে হবে না হবে, সে সবও কিছু শিক্ষা হ'ল। যদিও সেটা নেহাত গণ্ডগ্রাম নয়—কলকাতারই কাছাকাছি একটা জায়গা, তবু বাংলা দেশের পল্লিগ্রাম তো—আমাদের দূর-দুরান্ত প্রবাস-জীবনের সঙ্গে অনেক প্রভেদ।

গাড়ি থেকে নেমেই সেটা কিছু কিছু বুঝতে পারলাম। আমরা আসব বলে পাড়ার অনেক লোক মামার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন—কারণ মার বাপের বাড়ি আসাটা একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। গাড়ী থেকে নামতেই একটু মেন যেন হাসাহাসির ভাব দেখলাম সকলের মধ্যে। দমে গেলাম বেশ কিছু। একেই তো আমার মুখচোরা স্বভাবের জন্যে এত লোক দেখেই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, তার পর এই হাসাহাসি। পরে জেনেছিলাম বাবার আদর করে দেওয়া প্রকাণ্ড 'ডল্‌টা' কোলে করে নামাই নাকি আমার ভয়ানক ভুল হয়ে গিয়েছিল। এতবড় লম্বা মেয়ে ফ্রক পরে চুলে 'রিবণ' বেঁধে পুতুল কোলে গাড়ী থেকে নামা—এসব দিকের লোকের চোখে বিসদৃশ ঠেকবে মা বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু বাবার ভয়ে কিছু বলতে পারেননি। বাবা ফিরে যাবার পর আমি বেশির ভাগ সময়ই শাড়ি পরে কাটিয়েছি।

প্রণাম আশীর্বাদ নানারকম কাণ্ড কারখানা একটু কমতেই দিদিমা আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, মেয়ে যে তোর মাথা ছাড়াল কমলি। খুব তো মেম তৈরি করছিস দেখছি, সায়েব জামাই পাবি তো? মা হাসলেন।

দিদিমাকে দেখলে মোটেই মনে হয় না আমার মায়ের মা। ছোটখাট রোগা গড়ন, খন্‌খনে গলা। তবে বেশ হাসিখুশি ভাব, মোটের উপর মন্দ লাগে না। এই সময় প্রথম দেখি তুষার-মাকে, একটা থামের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন; এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বললেন, 'চল মীরা হাত-মুখ ধোবে। মাকে সুন্দরী বলে আমার মনে মনে বেশ কিছু গর্ব ছিল, তুষার-মামকে দেখে সে গর্ব অনেকটা কমে গেল; ওঁর এই তুষারের মতো সাদা রঙের জন্যই নাকি এই নাম। বড় হয়ে মনে হ'ত মনটাও তার চির-তুষারাবৃত।

তাঁর সঙ্গে ঘরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তিনি আমার হাত থেকে পুতুলটা নিয়ে একটা আলমারির মাথায় তুলে রেখে বললেন, এটা এখন এখানে থাক্, পরে খেলা কোরো—বুঝলে? এসে মুখ ধুয়ে জামা-টামা ছাড়বে; শাড়ি নেই তোমার?

বললাম, আছে আমার সুটকেশে, কিন্তু সিল্কের।

সিল্কের? আচ্ছা তা' হোক তোমরা অনেকদিন পরে এসেছ কিনা, নানা রকম লোক আসবে দেখতে, শাড়ি পরে থাকলে বেশ দেখাবে কেমন?

নেহাৎ বোকা ছিলাম না, উদ্দেশ্য যে খালি ভালো দেখানোতেই নয়, কিছু কিছু বুঝলাম। সেই মুহূর্তেই তুষার-মামিকে খুব আপনার বলে মনে হল।

এই তুষার-মামীর কথা মার মুখে আগে শুনিনি, মোটে নাকি সাত বৎসর তাঁর বিয়ে হয়েছে, তার পক্ষে কিন্তু একটু বড়ই দেখায়। মার সেই রাজীব দাদার স্ত্রী ইনি। রাজীব মামা নাকি চিরকালই একটু উড়ো উড়ো স্বভাবের। অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থেকে হঠাৎ বাড়ির লোককে না জানিয়ে এই বিয়ে করে আনেন। হয়তো মার অসাধারণ রূপ তার কারণ। তারপর কিছুকাল বেশ ভালো ভাবে নাকি সংসার করেছিলেন, চাকরিও করেছিলেন কিছুদিন! তবে বাপ মাতাল বলে বাপের সঙ্গে তাঁর বন্‌ত না; মাঝে মাঝে ঝগড়া করে পালিয়ে যেতেন। এখন প্রায় একবৎসর হ'ল আর আসেননি।

গ্রামে রাষ্ট্র যে সন্ন্যাসী হয়ে নাকি এক সাধুর সঙ্গে চলে গেছেন। কিন্তু তলে তলে সকলেই বলত স্বদেশি দলে নাকি যোগ ছিল তাঁর, পুলিসের ভয়ে লুকিয়ে আছেন। কিন্তু মামিকে আর কেউ ভালো চক্ষে দেখতে পারল না, যেন এই দুর্ঘটনার জন্য মামিই দায়ী। মামির শ্বশুরও দুটিবেলা খেতে বসে এমন সব দুর্বাক্য বলতেন—আমার রাগে মনে হ'ত—মা যদি ভাত নিয়ে না আসেন বুড়ো না খেয়ে শুকিয়ে থাকে তো বেশ হয়। আমি আসার পর থেকেই সঙ্গে আসাটা আমার অবশ্য কর্তব্যে দাঁড়িয়েছিল। এই পথটুকু মামিকে একলা নিজস্ব করে পাব সেই লোভে। এক একদিন রাত্রে বুড়ো এমন 'বে-এক্তার' হয়ে থাকতেন যে খাবার ছড়িয়ে বাটি গেলাস ছুড়ে চেঁচিয়ে মেচিয়ে একাকার করতেন; মামির কিন্তু বিরক্তি দেখিনি; তিনি নিঃশব্দে বাসনগুলো কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসতেন। আমি প্রায় জিজ্ঞেস করতাম, মামা, তোমার রাগ হয় না? তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতেন। সকলের থেকে তাঁর হাসিটা যেন আলাদা ছিল। কেমন লজ্জা করত। কোন দিন বা বলতেন, গুরুজনের ওপর কি রাগ করতে আছে? সহ্য করতে হয়।

এই শিক্ষাই তো তাঁর ছিল; কিন্তু শেষকালটায় যা করলেন তা' যেন রহস্যাচ্ছন্ন হয়ে রইল আমার কাছে।

আমার নিজের বড়মামিকে কিন্তু মোটেই ভালো লাগত না। সব সময়ে তাঁর মুখে চোখে একটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভাব লক্ষ করেছি। মার সঙ্গে অবশ্য তাঁর পরিহাসেরই সম্বন্ধ; কিন্তু পরিহাস আর উপহাস এক জিনিস নয়, সেটা তখন বেশ বুঝতে পারতাম।

আমি সর্বদা তুষার-মামির কাছে থাকতে ভালোবাসতাম বলে বড়মামি প্রায়ই নানারকম কথা বলতেন—একদিন স্পষ্টই বললেন, বিদুষী কলাবতীর কাছে দিনরাত্তির থেকে থেকে মেয়েটির তোমার পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল ঠাকুরঝি। এইবেলা সাবধান হোয়ো। আমি তো বাড়ির একটা মেয়েকেও ওদিক মাড়াতে দিই না।

মা হেসে বললেন, তুষার-বৌ নাকি বোনার কাজ বেশ জানে, তাই শেখে ভাই; লেখাপড়ার দফা তো গয়া হচ্ছে বসে বসে, একটা কাজের যদি চর্চা থাকে মন্দের ভালো।

বড়মামি মুখ টিপে হেসে—ভালো হলেই ভালো, বলে চলে গেলেন। মার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালাম, কিন্তু মা বারণ করলেন না কিছু।

আর একদিন দিদিমার বোনঝি, মার পদ্মদিদি আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, দিনরাত ও ছুঁড়ির সঙ্গে ফুস্‌ফুস্ গুজ্‌গুজ্ করিস কীসের লা? 'ছেলে' 'ছেলের' সঙ্গে থাকবে, তা নয় সমবয়সি খেলুড়িদের সঙ্গে ঠ্যাকারে কথাই কওয়া হয় না। দিনরাত বুড়োমাগির ন্যাজ ধরে থাকা। ওর সঙ্গে মিশোনা বাছা, পেটে ওর অনেক শয়তানি।

আমার কিন্তু মনে হ'ল আসলে তুষার-মামির দোষ ছিল না? রাজীব মামা চলে যাওয়াতে উনি গলগ্রহ হয়েছিলেন বলেই সকলের জাতক্রোধ।

সমবয়সিদের সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করে দেখেছি—কোথায় যে বাধে বুঝতে পারি না, কিন্তু মিশতেও পারিনি। তাই সকলের বারণ সত্ত্বেও আমার এই নিরাপদ আশ্রয়টি আঁকড়ে ধরে রইলাম।

মা বলতেন, তুষারমামি স্বামীকে দেবতার মতো দেখেন। তখন ঠিক বুঝতে পারতাম না কিন্তু কিছু যেন অনুভব করতাম; কখনও কোনও সময়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে রাজীবমামার কথা উঠলে মুখটা যেন তাঁর আলো হয়ে উঠত। একদিন বললেন, মীরা তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভালো লাগে, তুমি এখানের মেয়েদের মতো পাকা নও; এইরকম সরল মেয়েই আমার পছন্দ হয়।

অথচ বড়মামি মেজমামি যখন তখন বলতেন, এতবড় মেয়ে তোমার কি 'ন্যাকা' ঠাকুরঝি?

তুষার-মামির গলায় একটা লকেট দেওয়া সরু সোনার চেনহার ছিল। আমার যেমন সব সৃষ্টিছাড়া প্রশ্ন ছিল—একদিন বললাম, আচ্ছা মামিমা, রাজীবমামা কি রকম দেখতে ছিলেন? মামি একটু ইতস্তত করে লকেটটা খুলে দেখালেন। ছোট্ট ফোটো, ভালো বোঝা গেল না, মুখটা তো ভালোই মনে হ'ল। মামী লকেটটা বন্ধ করে মাথায় ঠেকিয়ে সেমিজের মধ্যে নামিয়ে দিলেন; তার পরই অন্য কথা পেড়ে সে কথা চাপা দিয়ে ফেললেন। নিজেকে প্রকাশ করতে চাইতেন না তিনি মোটেই। রাজীবমামা যে তাঁকে এত দুঃখের মধ্যে ফেলে রেখে গেছেন, তার জন্য অনুযোগ করতেন না কখনও। মাসের মধ্যে দু'টি দিন ছিল তুষার-মামির ছুটি; ওঁর শ্বশুর শহরে যেতেন পেন্সন আনতে; কোন্ বন্ধুর বাড়ি উঠতেন জানি না, পরদিন আসতেন। পেন্সন যা পেতেন তা'তে নাকি তাঁদের দুজনের স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারত; শুধু মদ খেয়ে নষ্ট করতেন বলেই ওঁদের এত কষ্ট।

এমনি একদিন সন্ধেবেলা একটা হ্যারিকেন হাতে করে তুষার-মামি আমায় বললেন, মীরা একবার যাবে আমার সঙ্গে ও বাড়ি?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কেন আজকে তো ছোট ঠাকুর্দা নেই?

তা' হোক—এমনি চল না, ঠাকুরঘরে আলো দিয়ে আসব আজ লক্ষ্মীপুজো কিনা।

আমরা বেরুচ্ছি, পদ্মমাসি হেঁকে বললেন, কি গো, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ভরসন্ধেবেলা?

এত সামান্য কথায় ভয় পাবার কী আছে। দেখলাম তাঁর মুখটা ভয়ে নীল হয়ে গেছে। শুকনো গলায় বললেন, আজ লক্ষ্মীপুজো, ঠাকুরঘরে একবার 'সন্ধেদীপ' দেব তাই—

আমরা বেরুতেই শুনলাম পদ্মমাসির গলা—'নক্ষীর' কপাল আজ ফিরল লো বড়বৌ। বলে না সেই "রাখালি কত খেলাই দেখালি।" সাত জন্মে তো এসব হুঁশ হয় না। দু'টি ধিঙ্গিই হয়েছেন সমান। কম্‌লি মেয়ের আখেরটি খেলে। আরো কি বললেন কে জানে, আর শুনতে পেলাম না।

আমিও কিন্তু সেদিনকার ব্যবহার ভালো বুঝতে পারলাম না। ওবাড়ি গিয়ে তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে, ঠাকুরঘরে প্রদীপ দিয়ে, বেরিয়ে এসে মামিমা হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন—তুমি একবারটি এখানে একলা থাকতে পারবে মীরা, লক্ষ্মী মেয়ে আমি শুধু ওপরটা দেখে আসব!

সত্যি কথা বলতে কি এই অন্ধকার পোড়ো-বাড়ির দিকে চেয়ে আমার সাহসে কুলোল না, ভয়ে ভয়ে বললাম, আমিও যাই না! মামিমা কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন, না না, লক্ষ্মী মেয়ে সোনা মেয়ে তুমি আলোটা নিয়ে থাক, আমি এমনি যাচ্ছি একবারটি—পারবে না? কি মিনতির স্বর।

বুকের রক্ত হিম হয়ে এলেও ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলাম। মামিমা অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটু পরে যখন এলেন, স্পষ্ট দেখলাম হাত পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। গলার স্বরও কাঁপা, বললেন, মীরা, লক্ষ্মী মেয়ে—আমি ওপরে গিয়েছিলাম বলো না কাউকে? তুমি যদি আমায় একটুও ভালোবাস, বলো না, তা'হলে ভয়ানক বিপদ হবে। বলবে না বল, এই আমার হাত ছুঁয়ে বল।

এরকম কথাবার্তা তাঁর মুখে কখনও শুনিনি; ঘাড় নেড়ে রাজি হলাম, কিন্তু মনের মধ্যে খট্‌কা থেকে গেল। গেলেই বা ওপরে, নিজেরই তো বাড়ি, এতে দোষ কি? আজও বুঝতে পারি না—কি হয়েছিল সেদিন। আরও একদিন ছোট ঠাকুর্দাকে ভাত দিয়ে আমায় বললেন, মীরা একটু দাঁড়া আসছি আমি, বলে ওঁদের যে একটা গোয়ালের চালা ছিল তার পাশ দিয়ে

কোথায় চলে গেলেন। যখন এলেন, দেখি মুখ রাঙা চোখ ছলছলে ভারী। আর চুলে গায়ে ছোট ছোট খড়ের কুটি লেগে রয়েছে; মুখ দেখে প্রশ্ন করতে সাহস হ'ল না—মনে হ'ল খড়ের গাদায় পড়ে কেঁদেছেন নাকি।

ক'দিন পরে হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি—বাড়ির যেন কি রকম একটা বিশ্রী থম্‌থমে ভাব—সকলেই চুপ। মা আমাকে ডেকে বারণ করে দিলেন—তুষার-মামির ঘরে যেন না যাই বা তাঁর সঙ্গে না মিশি।

একটু পরে বড়মামি এলেন আমাদের ঘরে, বললেন, দেখলে তো ঠাকুরঝি, তখনি বলেছিলাম? তোমার ভাই, সাদা মন, ওসব বুঝতে পারনি। ওই দুঃখে রাজীব ঠাকুরপো দেশত্যাগী হ'ল; নইলে অমন সুন্দরী বৌ—আপনি পছন্দ করে বিয়ে করলে মানুষ কি আর অমনি ছেড়ে চলে যায়?

মা গম্ভীরভাবে বললেন, কি জানি বড়বৌদি, মানুষ চেনাই দায়। প্রতিমার মতো মুখ; দেখ কে বলবে তা'র ভেতরে পাপ আছে।

বড়মামির দেখলাম যেন খুব খুশি খুশি ভাব, বললেন, ওগো ওই রূপ দেখে সবাই মজে। জন্ম জন্ম যেন এমনি কুচ্ছিত হই বাবা। হুঁঃ।

ছোটদের কাছে কেউ কিছু না বললেও দেখলাম—জানতে কারুর বাকি নেই ব্যাপারটা! আমিই বোকা। মামাতো বোন বিভা আমারই বয়সি হবে—আমায় চুপি চুপি বললে, জানিস—তুষার-কাকি রাত্তিরে চুপি চুপি কোথায় চলে গিয়েছিল, ভোরবেলা এসেছে।

আমি থতমত খেয়ে বললাম, তাতে কি হয়েছে ভাই? বিভা মিনা শৈলি ঠেলাঠেলি করে হাসতে লাগল, বললে, কি বোকা রে 'মিরিটা'? তুষার-কাকি 'খারাপ মেয়েমানুষ'। ওই জন্যেই তো আমরা মিশি না বুঝলি?

'খারাপ মেয়েমানুষের' অর্থ ভালো করে বোধগম্য হবার বুদ্ধি আমার ছিল না তখন; তবু কি যেন একটা অজানা আশঙ্কায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

রান্নাঘরে দুধ খেতে গিয়ে দেখি পদ্মমাসি রান্না চাপিয়েছেন। অন্যদিন তুষার-মামিই রান্না করেন। আমার কেন জানি না চোখে জল এল—দুধ না খেয়ে পালিয়ে এলাম।

পদ্মমাসি পিছন থেকে তাড়া দিয়ে উঠলেন-চলে গেলি ক্যান্ লা! দুধ খেয়ে যা? বাব্বাঃ কম্‌লির মেয়ে যেন ধিঙ্গি-অবতার। রূপসী হ'লেই অনেক ঠাট্ হয়।

তুষার-মামির ওপর একটা অবোধ অভিমানে আমার সমস্ত দিন বারে বারে চোখে জল আসছিল। কেন তিনি অত ভালো হয়েও 'খারাপ মেয়েমানুষ' হলেন? যদি খারাপ মেয়েমানুষ হলেন, কেন আমাকে অত ভালোবাসলেন?

সমস্ত দিন তুষার-মামিকে কেউ খেতেও ডাকলে না। একবার একবার দেখছিলাম ভাঁড়ার ঘরের পাশের ছোট্ট ঘরটায়, যেখানে রাজ্যের পুরোনো লেপ। তোশোক ভাঙা বাক্স টাক্স গাদা করা আছে—চুপ করে বসেছিলেন জানলায়। আমার এক একবার মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন সেই অশোকবনে সীতার ছবিটা।

সারাদিনই বাড়িতে একটা চাপা কথাবার্তা, তলে তলে কি যেন সব কাণ্ড ঘটতে লাগল।

সন্ধেবেলা আবার বিভা হাঁপাতে এসে বললে, জানিস্ রে, তুষার-মামিকে আর আমাদের বাড়ি রাখা হবে না। দাদুটাদু সব্বাই বলেছেন। আমি বাইরের ঘরের পিছনের জানালা দিয়ে শুনলাম লুকিয়ে লুকিয়ে। দাদু বললেন, 'খারাপ দৃষ্টান্ত' না কি—দৃষ্টান্ত মানে কী রে?

আমার তখন মানে বলবার অবস্থা নয়। কানে একটা কথা বাজছিল 'এ বাড়িতে আর রাখা হবে না'। বললাম, তা'হলে কোথায় থাকবেন?

বিভা অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টে বললে, যেখানে ইচ্ছে। ছোট্দাদুও ত বলেছে, বাড়ি ঢুকলে জুতো পেটা করব হারামজাদিকে—

বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে বোধ হয়।

পরদিন সকালে কিন্তু আর কিছু চাপাচাপি থাকল না; তুষার-মাসি নাকি নিজেই চলে গেছেন রাত্রে। শুধু তাই নয়, দিদিমার বাক্স থেকে নাকি দশটা টাকা চুরি করে নিয়ে গেছেন; এখন যার যা ইচ্ছে হ'ল তাই বলতে লাগল। বিন্দু ঝি পর্যন্ত বললে, ওনার পেটে পেটে অনেক 'ছেনালি' গো—আমি বলি উনি ঘরের বৌ, আমি ঝি মনিষ্যি—বললে ভালো দেখাবে না তাই চুপ করে থাকি। এই ক'দিন আগে রেতের বেলা দেখি কাপড়ের তলায় কলাপাতে মুড়ে কী নিয়ে হন্ হন্ করে চলেছে পুকুরঘাটের পানে। আমি বলি, হেঁগা বৌদিদি, রাতদুপুরে কোথায় যাচ্ছ? দেখে যেন ভূত দেখলে এমন চম্‌কানি, বললে "এই ছেলেদের এঁটোপাত কখানা নিয়ে একেবারে ঘাটে যাচ্ছি গা ধুতে। রান্নার পর গা না ধুলে ঘুম আসে না, যা গরম।" আমি বলি হবেও বা, কিন্তু কেমন সন্দ হ'ল। চোখে না দেখলে তো কিছু বলতে নেই মা।

কে নাকি পাড়ার একজন গিন্নি একদিন ভাঙা শিবমন্দিরের ওখানে লুকিয়ে দুজন মানুষকে কথা বলতে শুনেছিলেন—এমনি আরও সব ছাইপাঁশ কথা। এর পর একবাক্যে স্থির হয়ে গেল, ওরকম খারাপ স্ত্রীলোক গ্রামে আর নেই। বিদেয় হয়েছে লোকের হাড় জুড়িয়েছে। না হলে নাকি গাঁয়ের সর্বনাশ হ'ত।

কিন্তু গ্রাম থেকে বিদেয় তিনি হ'ন নি; একটু বেলা হ'লেই সে কথা জানা গেল।

'চোধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপ' বলে একটা ভাঙা মতন দালান ছিল মামার বাড়ির কাছে; তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল তুষার-মামিকে। কড়ির গায়ে ঝাড় লণ্ঠন ঝোলাবার যে বড় আংটা লাগানো ছিল তাতেই দড়ির ফাঁস লাগিয়ে গলায় দিয়ে ঝুলছেন। সে কি বীভৎস! অত সুন্দর মুখ ওরকম হয়ে যায়—এ শুধু দেখেছি বলেই বিশ্বাস করতে পারি।

তারপর যেন একটা ঝড় বয়ে গেল মামার বাড়ি ওপর দিয়ে। পুলিস এল, দারোগা এল। পাড়ার লোক ভেঙে পড়ল। মামারা ছুটোছুটি করতে লাগলেন। মাকে সকলে বারণ করেছিল দেখতে, তবু নাকি ছাদ থেকে দেখেছিলেন। ভয়ে কেবল মূর্ছা হতে লাগল মার; ভোর রাত্রে শুনলাম, আমার নাকি একটি ভাই হয়েছিল মরা। মার শরীরও খুব খারাপ। অনেক ডাক্তার আসতে লাগল। এর জন্যও সবাই তুষার-মামিকে দায়ী করতে লাগল। আমারও তখন সে কথা মনে হয়েছিল; ভাইটিকে দেখতে পেলাম না বলে এত কষ্ট হয়েছিল যে তুষার-মামিকে হারানোর দুঃখ কমে গেল। রাখা হল তাঁর ওপর, তিনি এই সব কাণ্ড না করলে তো মার কিছু হ'ত না? বড় হয়ে বুঝেছি, যার যা নিয়তি তা' ঘটবেই, যা'র কপাল মন্দ সেই নিমিত্তের ভাগী হয় মাত্র।

তুষার-মামি এমনি দুর্ভাগিনী ছিলেন, যে মরেও কারুর করুণা পেলেন না।

এর পরই আমরা বাবার সঙ্গে মীরাটে চলে এলাম। মার অসুখ শুনেই তিনি ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন–আসবার সময় দিদিমা কাঁদতে লাগলেন। বললেন, "বাবা বড় মুখ করে রেখে গিয়েছিলেন—আমার কপাল মন্দ তাই এমন হ'ল।" বাবা অবশ্য মুখে বললেন, আপনি কি করবেন যা' ভাগ্যে ছিল হবে তো? কিন্তু আর কখনও পাঠাননি আমাদের মামার বাড়ির দেশে, যা গিয়েছি কলকাতায় ছোটমামার বাড়ি।

মা একদিন তুষার-মামির কাহিনী বলেছিলেন বাবাকে, বাবা কিন্তু শুনে বললেন, তোমাদের নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে, মন্দ হ'লে গলায় দড়ি দেবেন কেন? চলে গেলেও তো পারতেন?

মা বললেন, হয়তো সাহস হয়নি, নয়তো যার ভরসায় যাবে সে উপযুক্ত নয়।

বাবা বললেন, তা'কে ভালো হবার সুযোগ না দিয়ে লাঞ্ছনা করে সকলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে! তুমি সৎসাহস দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসতে পারলে বুঝতুম!

মা হাসলেন; বললেন, দেখনি তাই বলছ। তাহ'লে হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাকেই গলায় দড়ি দিতে হ'ত।

বাবা কি উত্তর দিলেন শুনিনি; বললেন, মীরা এক গ্লাস জল আনো।

এসে আর সে কথা শুনলাম না।

রহস্যময়ী তুষার-মামি আমার কাছে চিররহস্যই রয়ে গেলেন। কত দিন চলে গেল, আজও মামার বাড়ির সেই রান্নাঘরের রোয়াকটা স্মরণ করলেই মনে হয়—তুষার-মামি মুখ বাড়িয়ে হেসে বলছেন, কি মীরা দুধ খাবে? মুখ ধোওয়া হয়েছে?

ধব্‌ধবে মুখ—আগুন তাতে রাঙা হয়ে উঠেছে, আর সেই ফোটো দেওয়া লকেটটা সকালের রোদ প'ড়ে ঝকঝক করছে। সেই প্রতিমার মতো মুখ, সে কি কলঙ্কিনীর?

মৃত্যুমলিন বীভৎস ভয়ানক মুখ সে যেন আর কারোর—আমার তুষার-মামির নয়।

* * * *

কিছুদিন পরে চিঠিতে জানলাম, রাজীব মামা নাকি নিজে ইচ্ছে করে পুলিসে ধরা দিয়েছেন। মরুকগে যাক্, কে তাঁর কথা নিয়ে মাথা ঘামায়?

তুষার-মামিই যখন নেই, তখন আর—?

রাহু

ট্যাক্সি থেকে নামতে না নামতেই সাড়ম্বর অভ্যর্থনার ধুম পড়ে গেল।....অবশ্য ধুম পড়ে যাবে তা বিকাশের জানা, অপ্রত্যাশিত নয় ব্যাপারটা। কলকাতায় তাকে আসতেই হয় মাঝে মাঝে আর এলে এদের বাড়িতে ওঠাই সুবিধে। নানা দিক দিয়েই সুবিধে।... কাজ পড়ে প্রায়ই এই অঞ্চলে তা ছাড়া ট্রাম বাস কাছে, দু'চারজন বন্ধুর বাড়িও এই দিকে, বলতে গেলে অনেক বলা যায়।

তা যখন আসে—আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হয় না।

এদের সঙ্গে বিকাশের কী সম্পর্ক, কিম্বা আদৌ কোনও সম্পর্ক আছে কিনা সেটা আর এখন কারও মনে নেই। বিকাশ এলেই 'তটস্থ' হয়ে উঠবে সকলে, এই নিয়ম।

বাড়ির গিন্নি সত্যবতী বিগলিত স্নেহের স্বরে বলে ওঠেন—কী বাবা, এতদিনে মনে পড়ল? এবারে কিন্তু তুমি বড্ড দেরি করলে বাছা।

সুট-পরা আড়ষ্ট শরীরটাকে নিচু করা কষ্ট হলেও পায়ের ধুলোটি নেওয়াই চাই, কসরৎ সেরে হাস্যোজ্জ্বল মুখে উত্তর দেয় বিকাশ—হ্যাঁ কাকিমা, এবারে অনেক দিন পরেই বটে, কী করি বলুন, কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম তো? মন কেমন করলেই বা করছি কী ? .... ইয়ে হ্যাঁ, এই যে কী নাম তোর? রতন বুঝি? ট্যাক্সি থেকে সব জিনিস কটা নামিয়েছিলি তো ? না কি দু'চারটে ছেড়ে দিয়েছিস? তা তোরা সব পারিস, তোদের বিশ্বাস নেই বাবা!.... ফলের টুকরিটা কোথায় রাখলি? .... এই যে-কাকিমা, এই আপনার ঠাকুরের জন্যে দুটো কলা-মুলো, নির্ভয়ে ভাঁড়ারে তুলতে পারেন, ভীষণ পবিত্রভাবে এসেছে।.....

সত্যবতী ক্রোধপ্রকাশের ভঙ্গি করেন—এই দেখ, আবার ওই সব কাণ্ড করেছ? নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না, বাছা, যখনই আসবে তখনই একগঙ্গা টাকা খরচ করবে একি অন্যায় বাপু! ওমা—হরি হরি! এর নাম কলা-মুলো! এই অসময়ের আম, আনারস, আপেল, বেদানা, মিশ্রী-মেওয়ার গাদা—সোজা দাম এ-সবের? ছি ছি, তুমি বাছা বড্ড উড়ন-চণ্ডে!....

—আশ্চর্য কি? লক্ষ্মীছাড়ারা তো উড়নচণ্ডেই হয় কাকিমা!..... টাকা তো খরচ করবার জন্যেই তাই না? জমান টাকা আর রাস্তার ঢিলে তফাৎ কী? সামান্য ফল, তার জন্য আবার—এ কিন্তু আপনার একলার, বুঝলেন? ভাগ দেবেন না কাউকে—

সত্যবতী হাসেন—এই একঝুড়ি ফল একলা খাব আমি?

—কেন খাবেন না? ওদের জন্যে অন্য জিনিস নেই? .... কই রে রতন, বড় সুটকেস্‌টা কী করলি? দোতলায় তুলে দিয়েছিস? ওস্তাদ। রতন নইলে আর এমন বুদ্ধি! ... এই বাচ্চু, বীণা, পুঁটি, নমিতা, মনু, রাখাল—চল্‌ সবাই। তোদের নৈবিদ্যি বার করি!

ছোট ছেলেরা মহোৎসাহে চাপা হাসির সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে ওঠে।

বিকাশ-কাকার মতো মহানুভব লোক তারা দেখেনি আজ-পর্য্যন্ত। ঠিক জানে সুটকেস্‌ থেকে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা বেরোবে দামি বিস্কুটের টিন, প্যাকেট প্যাকেট চকোলেট, নতুন নতুন খেলার সরঞ্জাম। মেয়েদের জন্যে নিশ্চয়ই আছে...... প্রসাধনের এটা-ওটা টুকিটাকি, পাথরের মালা কি পুঁতির দুল, প্লাস্টিকের চুড়ি কি জরির ট্যাসেল।....

নিঁখুৎ পছন্দ! অদ্ভুত হুঁশ। বাড়ির কারুর কথা ভোলে না, কাউকে বঞ্চিত করে না! চমৎকার লোক বিকাশ-কাকা।

অপূর্ব্ব ভালো। বিকাশ-কাকা এলে হৈ চৈ পড়ে যাবে এ আর বিচিত্র কি? ভালো বই কী, এত ভালো দেখা যায় না।.... সুট না ছেড়েই সুটকেস্‌ খুলেছে সে।

—এই যে কাকিমা, আপনার জন্য মটকার থানধুতি একখানা। দোহাই কাকিমা, বকুনি দেবার জন্য চোখ পাকাবেন না। বহরমপুরের দিকে যেতে হল সেবার, সস্তা পেলাম, নিয়ে রাখলাম একখানা আপনার জন্য। পুজোটুজো করেন আপনি, কাজে লাগবে।.... আর এই ভাগলপুরীথান একটা, গ্র্যাণ্ড পাঞ্জাবি হয়। শ্রীকান্তবাবুর কাজে লাগবে।... মেজদা, আপনার জন্যে কিন্তু চমৎকার একটা জিনিস আছে, বিরাট কিছু নয় অবশ্য, কিন্তু ডি-সেন্ট। এই যে-নিন।.....

চমৎকার একটি সিগার-কেস!

বিকাশ কল্পতরু।....

ওর্‌ সুটকেস্‌, এ্যাটাচিকেস্‌, হোল্ডঅল মায় বেডিং থেকে উপহারের বস্তু ঝরতে থাকে।....

নয়? বাড়ির বৌদের জন্যে কটকি শাড়ি, তরুণী মেয়েদের জন্যে ব্লাউসের সিল্ক।

কোম্পানির কাজে সর্ব্বত্র ঘুরতে হয় বিকাশকে..... আর যেখানে যা সৌখিন জিনিস চোখে পড়ে সব জমা করতে থাকে। ... কবে আসবে কলকাতায়, কবে উঠবে এ বাড়িতে, এই আশায়। ....

ওর আড়ালে মন্তব্য চলে-

—অসাধারণ ছেলে এই বিকাশ।

—টাকা থাকলেই হয় না শুধু, দেবার মন থাকা চাই। থাকা চাই রুচি পছন্দ।..... বিনয় থাকা চাই বই কী, ওর উপহারের মধ্যে অহঙ্কারের খাদ মেশান থাকলে কে নিতে পারবে এমন অনায়াসে?

কী মায়াবী ছেলে! নইলে রতনের কথাও ভোলেনি। ওর জন্যে এনেছে দিব্যি একখানি নিকষ-নীল হাওযাই শার্ট। গায়ের রঙের সঙ্গে কাছাকাছি হলেও ক্ষতি নেই রতনের, কাকাবাবুর পায়ের ধুলো না নিয়ে ছাড়বে না সে।

বিকাশকে অবহেলা করবে কে?

বিকাশের জন্যে সারা বাড়ি অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠবে না তো কি? সাজানো অনুযোগ আর আদুরে অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে চলে বিকাশের জন্যে ব্যস্ততা।....

বিকাশের একটু সুখ-সুবিধের জন্যে মরতে পারে বাঁচতে পারে এরা।

এদের বাড়িতে উঠবে না তো কোথায় তবে উঠবে বিকাশ? কলকাতায় যখন আসতে হয় তাকে মাঝে মাঝে।

এ বাড়ির বড়বৌ কল্পনাই শুধু ছুটে আসেনি ব্যস্ত হয়ে, ছাদে বসে বড়ি দিচ্ছিল নাকি কে জানে। একজনকে নিয়ে বাড়িসুদ্ধু সকলের মাতামাতি তার দু'চক্ষের বিষ। .... অথচ হিসেব মতো তারই যাওয়া উচিত আগে। বিকাশের সঙ্গে সম্পর্ক কিছু যদি বার করতেই হয় তো কল্পনার বাপের বাড়ির দিকটাই হাতড়াতে হবে।

নীচের গোলমাল তার কানে এসেছে, আলসে থেকে ঝুঁকে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার পরে আর নীচে নামবার গা নেই তার। হাতের কাজ সারা হলেও বসেই আছে দিব্যি শীতের রোদে পা ছড়িয়ে।

—বৌমা, তুমি এখানে?....

হাঁফাতে হাঁফাতে সত্যবতী ছুটে এসেছেন ছাতে—বিকাশ এসেছে যে!

যেন বিকাশ আসার পর আর কারুর রোদে পা ছড়িয়ে বসে থাকবার আইন নেই। কী যেন বে-আইনি কাণ্ড করে বসেছে কল্পনা।

অবশ্য শাশুড়ির এই উত্তেজিত অভিযোগে খুব বেশি বিচলিত হয় না কল্পনা, নিশ্চিন্ত ভাবেই বলে—তাই বুঝি? ও—তাই ছেলেমেয়েগুলোর হৈ চৈ কানে আসছিল।

—টের পেয়েছ? তা যাও এবার নীচে।

—যাচ্ছি। হাতমুখ ধুয়েছেন তো?

—কোথায়? সত্যবতী আরও হাঁসফাঁস করতে থাকেন—সেই অবধি তা বাক্স পেঁটরা খোলাখুলি করছে, তুমি যাও এবার? তেল সাবান গামছা তোয়ালে, কী লাগে না লাগে—

সত্যবতীর কথার সুরে যেন একটা বিশেষ জোর—যেন কল্পনা ব্যবস্থা না করে দিলে আজ আর স্নানই হবে না বিকাশের।

কল্পনা এবারও গায়ে মাখে না।

—হ্যাঁ বিকাশদার আবার কী লাগে না লাগে! নিজের সব কিছু গোছানো থাকে ওঁর!

সত্যবতী বিরক্ত হন—নিজের আছে বলে নিশ্চিন্দি হয়ে থাকতে হবে? কি যে বল বৌমা! যাও, শ্রীকান্ত খুঁজছে তোমাকে।

—বাবাঃ, বাড়িতে এত লোক থাকতে—

রাগ করেই নেমে যায় কল্পনা।

আর কেমন একটা জ্বালা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সত্যবতী.....

ডালবাটার কাঁসি গামলা সব কিছু ফেলেই চলে গেল কল্পনা। এই সব আবার বয়ে নিয়ে যেতে হবে সত্যবতীকেই।

—কত ঢং। দেখান যেন—কতই—

অস্ফুট মন্তব্যটার শেষাংশ আর শোনা যায় না।

—কোথায় ছিলে তুমি?

শ্রীকান্তর ব্যস্ত স্বরে ফিরে তাকায় কল্পনা।....

—বড়ি দিচ্ছিলাম ছাতে, রোদটা বেশ লাগছিল—

—চমৎকার! এদিকে তোমার বিকাশদা এসে বসে আছেন—কখন তার ঠিক নেই।

—বসে আছেন মানে? আমি গেলেই দাঁড়িয়ে উঠবেন?

হাসবার চেষ্টা করে কল্পনা।

—বাজে বকো না, তুমি একবার না গেলে মনে করবেন কী?

—কি আশ্চয্যি! আমার যে এখন রান্নঘরের কাজ অনেক বাকি। যে 'গপ্পে' মানুষ, গেলে আর রক্ষে আছে? ততক্ষণ বরং তোমরা—

শ্রীকান্তর মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে—আমরা আবার কী করব! রান্নঘরের কাজ করবার আরও লোক আছে। এতক্ষণের মধ্যে তুমি একবারও গেলে না—ভাববেন কী?

—নাঃ বাপু, তোমরা জ্বালালে আমায়। মেজ বৌয়ের শরীর ভালো নেই, আবার ওর ঘাড়ে কতকগুলো কাজ চাপবে। বিকাশদার কবলে পড়লে তো আর সহজে—

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই এগোয় কল্পনা।

—ন্যাকামি!

শ্রীকান্তর মন্তব্যটা প্রায় অনুচ্চারিত!

—কটকি শাড়ি পেয়ে বর্তে গেলে?

মেজবাবু মেজগিন্নির হাতের দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে দেখেন।....

হাতের শাড়িখানার আঁচলার দিকটা খুলে খাটের উপর বিছিয়ে দিয়ে মেজগিন্নি মুখ টিপে হাসে—মন্দ কি! "ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে।" শাড়িখানা কিন্তু চমৎকার! টেস্ট আছে তোমাদের বিকাশবাবুর।

—সব সময় নয়।..... কী বলব, বাড়িসুদ্ধু সকলে একেবারে গদগদ তাই কিছু বলিনে নইলে—দেখিয়ে দিতাম। আমাকে পর্যন্ত ঘুষ দিতে আসে, ইচ্ছে হচ্ছিল সিগার-কেসটা মুখে ওপর ছুড়ে মারি।

—ইচ্ছা হচ্ছিল? মারোনি তো?

—ওই যে বললাম, সকলের ভয়ে। .... আশ্চর্য যে, দাদা সুদ্ধু গাধা ব'নে বসে আছেন। আমি হলে—

—থাক্, তুমি হলে কী হত সে কথা জাহির করতে হবে না, পুলিস কেসে পড়বে। এখন যাও একবার রতনকে নিয়ে বাজারে, মা বললেন।

—আমি পারব না।

—ওমা, সে কি গো? অতিথি-সৎকারে ত্রুটি হবে যে। মালাইকারি ভালোবাসেন উনি নতুন এঁচড় দিয়ে গলদাচিংড়ির ডালনা—

—ভালোবাসেন তো কৃতার্থ করেছেন। মাকে বলোগে সময় হবে না আমার।

—ওরে বাবা! মাকে বলতে-টলতে পারব না আমি।

—বোলো না, আমি বলছি গিয়ে।

—আঃ, থাক্ না বীরপুরুষত্ব! ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে কেন? বেশ তো চলছে, মন্দ কী? মাঝে মাঝে তবু মুখটা বদলায়।.....

হেসে গড়িয়ে পড়ে লতিকা।

ছোট বৌ শ্যামলী হেসে গড়াতে গড়াতেই আসে।—কী হল তোমার?

ছোটবাবু সুকান্ত হাতের খবরের কাগজখানা ফেলে দিয়ে তাকায়।

—আমার আবার কী হবে? শত্রুর হোক। ..... "আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে, ওগো ললিতে—" আবার গড়িয়ে পড়ে শ্যামলী।

—কই গো ছোট বৌদিদি, কুটনো কুটে দেবে বললে যে?.....

বামুন ঠাকরুণ এসে হাঁক পাড়ে।

—এই যে যাই।.... শ্যামলী উঠে দাঁড়ায়। গম্ভীর হয়ে ছোটবাবুকে বলে—তোমার আর কী—বসে বসে চা খাও। আমিই মরব 'আতান্তরে'। রান্নার ফিরিস্তিটি তো কম নয়। বড় বৌদির দাদা এসেছেন তো? তাঁর তো হয়ে গেল আজকের মতো।

—তুমি কি আমাকে বাঁচতে দেবে না?—চাপা গর্জনে আগুন হয়ে ওঠে কল্পনা—আমার ইহকাল পরকাল সব খাবে তুমি?

—তা আর পারলাম কই? বিকাশ গলা ছেড়ে হেসে ওঠে—পারলে এ উঞ্ছবৃত্তির দরকার কী ছিল?

—তোমার পায়ে পড়ছি বিকাশ, আর আমার সর্ব্বনাশ কোরো না তুমি।

—তোমার সর্ব্বনাশ? মাই গড্। "পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী ; কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি"—। তোমার সর্ব্বনাশ করব—আমি ! সাধ্য কি?

—আঃ বিকাশ, হাত ছাড়। লজ্জা করে না বেহায়া হতভাগা কোথাকার? দেয়ালেরও চোখ আছে তা জান?—বিহ্বল হয়ে বলে কল্পনা।

—জানি বই কী—বিছানায় এলিয়ে পড়ে সিগারেট ধরায়, চোখেই তো পড়ল এক আধটা চোখ।...তবে সুখের বিষয় জিভ নেই, ওটা চিনির রসে জড়িয়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

—তাই বলে চিরদিন তুমি এইভাবে অপদস্থ করবে আমায়? ... কেন আস তুমি? কে আসতে বলে?

—তুমি বাদে সবাই বলে। .... দেখ না কাকিমাকে? কী অসীম স্নেহ আমার ওপর।

—গলায় দড়ি! তুমি কি ভাবো কিছু সন্দেহ করেন না ওঁরা? কেউ বোঝে না কিছু?

—সন্দেহ? বল কি কল্পনা! সন্দেহের অবকাশ আছে নাকি কিছু? সবাই সব বোঝে। চার আনার ওপর বারো আনা রং চড়িয়ে দিয়ে বোঝে।..... দেখতে পাও না, হঠাৎ কেমন একটি নিভৃত পরিবেশ উপহার দেওয়া হয় আমাদের।... ছোট ছেলেমেয়েগুলোর সুদ্ধ পাত্তা নেই।

—ছি ছি, কী লজ্জা! জান কী ছোট হয়ে যাই আমি! কেউ কিচ্ছু বলে না, তবু—তুমি চলে যাওয়ার পরেও পাঁচ সাত দিন মুখ তুলে কথা কইতে পারিনে আমি।

—মোটে পাঁচ সাত দিন। তার পরে পারো তো? পুরোনো বন্ধুর জন্যে এটুকু ত্যাগস্বীকার করতে পারবে না? ..... ছিঃ, অত দূরে কেন? কী ভীষণ নিষ্ঠুর তুমি কল্পনা। শুধু একটু সান্নিধ্য, একটু স্নেহস্পর্শ, এইটুকুর লোভে চারশো মাইল দূর থেকে ছুটে আসি, সেটুকু দাক্ষিণ্যও নেই?....

— না না, তোমার ওপর কোনও দয়া-দাক্ষিণ্য নেই আমার। ... তুমি আমার সৌভাগ্যের শনি, আমার জীবনের রাহু।

—তা রাহু ব্যক্তিটিও তো খ্যাতনামা প্রেমিক।

—হাসতে লজ্জা করে না তোমার?

—কিছু না। লজ্জা করে বোকাদের, লজ্জা করে চাষা-ভূষোর। বুদ্ধিমান্ ভদ্রলোকের আবার লজ্জা কি? তুমি যে হাসালে কল্পনা!

—কিন্তু এতে তোমার কী লাভ বিকাশ?.....

—লাভ ? সত্যি তাও ভাবি মাঝে মাঝে। পকেটে পয়সার বালাই নেই, ধার করে প্রিয়া-সন্দর্শনে আসা!

—আবার ধার করেছ? ধার করে করেছ এই সব কাণ্ড?

—তা ছাড়া?

—কেন? সামর্থ্য নেই, তবু কেন তুমি এই সব বাজে খরচা কর?

—নাঃ, বড্ড হাসাচ্ছ কল্পনা। .... তোমার ঘরের চোকাঠ ডিঙোতে পাবার সৌভাগ্যের দাম নেই? ... কোলটা পাতো, অনেকদিন শুইনি কোলে মাথা রেখে। ... অনেকদিন হাত বুলোওনি কপালে গালে... দেখি এখনও তেমনি ঠান্ডা আছে কি না—

—বাড়াবাড়ি কোরো না বিকাশ, ছাড় ছাড় বলছি হাত.... আঃ বিকাশ.... চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব আমি বলে দিচ্ছি—

—হাঃ হাঃ হাঃ! ওইটি পারবে না কল্পনা। .... ওইখানেই তো ভরসা আমার। হাজার হোক তোমার তো একটা মান-মর্যাদা আছে। বাড়ির বড়বৌ, উকিলবাবুর গিন্নি।.... আচ্ছা থাক্ দেশলাইটা কোথায় গেল? একটু এগিয়ে দাও না? ...... দেবে না? ..... ছিঃ কল্পনা, পুরো আঠারোটি মাস বিরহযন্ত্রণা ভোগ করেও মন-কেমন করে না তোমার?

—না না, করে না। তুমি আর কোনওদিন না আস, জন্মের শোধ বিদেয় হও এই চাইছি আমি। তুমি মরে গেলেই বাঁচি আমি।

—আ ছি ছি, মনকে চোখ ঠেরো না কল্পনা, আমি মরে গেলে পাগল হয়ে যাবে তুমি। .....

—কখনও নয়।... তাড়িয়ে দিলাম সেবার, দিব্যি দিলাম, আবার এলে বেহায়ার মতো। শয়তান রাক্ষস!..... কদিন থাকতে এসেছ? আজই চলে যাও—

—চলে যাব? বল কি কল্পনা। এত তোড়জোড় করে আজই চলে যাব? আমি তো পাগল নয়।.... অনেক কিছু, বেশি কিছু তো চাই না তোমার কাছে, অগাধ সমুদ্রের দ্বারে হাত পেতে এক গণ্ডূষ জল মিলবে না—এও কি সম্ভব?

—তুমি কী চাও?

—কিছু না কল্পনা, কিছু না। শুধু দুটোদিন তোমার একটু সান্নিধ্য .... আর কিছু টাকা। বে-আন্দাজি ধার করে ফেললাম।

—আর পারব না আমি তোমার এই খেয়ালের খেসারত যোগাতে। জানো—গয়নাগুলোর জন্যে কত সময় কত মিথ্যে কথা বলতে হয় আমাকে?

—সামান্য একটু মিছে কথা? ছোঃ, ওর জন্যে আবার ভাবনা! এস একটু কাছে, অত দূরে বসে থাকলে চুলের গোড়ায় হাত বুলোবে কী করে?

—না, এইখানেই বেশ বসে আছি।

—বাজে মেজাজ দেখিয়ে এই অমূল্য সময়টুকু নষ্ট করো না কল্পনা। একটু কোলে মাথা রাখতেও না দেবে যদি, ওরাই বা তোমায় পাঠাল কেন কাজের সময় ছুটি দিয়ে?... শ্রীকান্তবাবুর যেটুকু দয়া আছে, তোমার তাও নেই? হ্যাঁ এই তো—আঃ! .... তোমার মেজাজটা এত কড়া হয়ে গেছে, কিন্তু কোলটা ঠিক তেমনি নরম আছে—ভারি আশ্চর্য নয়? নাঃ, তুমি বড্ড বুড়ো হয়ে যাচ্ছ কল্পনা।—

—বিকাশ, সত্যি বলছি, বাড়াবাড়ি করলে চেঁচাব আমি—

—লাভ হবে না কিছু, বড়জোর শ্রীকান্তবাবু এসে মাথায় ঠান্ডা জল ছিটোবেন। .. কেলেঙ্কারি বাড়বে বই কমবে না। থাক্ গে—তার চেয়ে বরং দুটো সুখদুঃখের গল্পই করা যাক্। .... সেবারে তো তুমি মাথার দিব্যি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে—বুঝলে কল্পনা, মনে ভা-রি ধিক্কার এল। বীরপুরুষের মতো আমিও প্রতিজ্ঞা করে বসলাম, 'আর আসব না'। উঃ তারপর সে কি যন্ত্রণা ... খেয়ে শুয়ে স্বস্তি নেই ... মনে হত তুমি বুঝি আর নেই, মরেই গেছ বুঝি।... আঃ কি চমৎকার ঠান্ডা হাতটা তোমার.... হ্যাঁ, কপালে ঠান্ডা হাত আমার সব সময় ভালো লাগে, শীতকালেও। ... কী বলছিলাম—কিছুদিন সে কী যন্ত্রণা! তারপর প্রত্যেক দিন একটু করে শিথিল হচ্ছে প্রতিজ্ঞার মূল। ... আঠারো মাস সময়টা কি কম কল্পনা? প্রতিদিন একটু করে গোড়া খুঁড়লে পাহাড়ও ধ্বসে যায়।.... ও কি, ও কি অমন ছিটকে উঠলে কেন?

—কেন? ... দেখতে পেলে না ওই জানালার পর্দার ওদিকে ছোটবৌকে? হেসে সরে গেল। বিকাশ বিকাশ, আবার দিব্যি দিচ্ছি তোমায়—আর এস না তুমি..... জন্মের শোধ বিদেয় হও

তুমি আমার জীবন থেকে। তোমার ওই লক্ষ্মীছাড়া জীবনের কালোছায়া ফেল না আমার সুখের ঘরে।... অনেকদিন যখন না আস, আস্তে আস্তে... ভুলে যায় সবাই, আমিও ভুলি। যেমন করে দুঃস্বপ্নকে ভোলে লোক।... আবার মুখ তুলে চাই, সংসারের ওপর প্রভুত্ব করি বড়র মতো..... ফের তুমি আস ধুমকেতুর মতো, ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় সব।.... এর কি শেষ হবে না?

—সত্যিই তবে শেষ চাও কল্পনা?

—চাই চাই। কতবার আর বলব।.... আমাকে বাঁচতে দাও তুমি। রেহাই দাও। জীবনে যেন তোমার মুখ আর দেখতে না হয় আমায়।

—আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু—কী হয় জানো কল্পনা? তোমার মুখের কথায় আর চোখের দৃষ্টিতে কখনও মিল খুঁজে পাই না, তাই বারে বারে এই ধৃষ্টতা ঘটে।.... হয় তো—কিছুই নয়, হয় তো ওটা আমারই দৃষ্টির ভ্রম।... আচ্ছা, কিন্তু আমার জিনিসপত্রগুলো একটু দেখেশুনে নিতে হবে যে! তোমাদের রতনবাবু তাদের কোথায় প্রতিষ্ঠিত করেছে কে জানে।

—আজই যাবে নাকি?

—আজই মানে? এখুনি—এই তো সাড়ে বারোটায় ট্রেন রয়েছে।

—কেউ কিছু মনে করবে না তো?

—পাগল! ছন্নছাড়া একটা লোক, তার আসা-যাওয়ার স্থিরতা থাকবেই এমন কি কথা!

—আমি তো এমন কথা তোমায় বলিনি বিকাশ, 'এই দণ্ডে দূর হও'!

—পাগল, তাই কখনও বলতে পার? আমার কাজ রয়েছে সত্যিই। লোভে পড়ে ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম।... আচ্ছা তোমার সঙ্গে বোধ হয় এই শেষ। গুড্‌বাই।... কই হে রতনবাবু, আমার বিছানা বাক্স কোথায় পাচার করলে বাপু, এখুনি যেতে হবে আমায়।....

যেতে হবে!

শুনে আপত্তি আর উপরোধে মুখর হয়ে ওঠে সারা বাড়ি।...

সে কি কথা! তাও কি হয়! পাগল নাকি! ছাড়ছে কে? কিন্তু উপায় কি, বিকাশের যে ভীষণ জরুরি কাজ।.....

সে কথা বিশ্বাস করছে কে?.... নিশ্চয় কিছু হয়েছে। রাগ.... অপছন্দ ... কলহ... কে জানে কী? অগত্যা... .আবার কল্পনা।

—তুমি একবার ভালো করে বলে দেখ না বড়বৌমা, হঠাৎ কী হল—

—ওমা কি আশ্চয্যি, হবে আবার কি? বললেন যে ভীষণ জরুরি কাজ!

—উহুঁ।... সকালে এসে কিচ্ছুটি বলল না! — তুমি একবার বলোই না ভালো করে।

—নাঃ মার এক কথা। আপিসের কাজের ওপর আবার অনুরোধ উপরোধ চলে নাকি?—আমি দেখিগে বামুন-দিদি ভাত বাড়বার কী কতদূর করল।...

ছুটে এল শ্রীকান্ত—মার কথা শুনলে না কেন? তোমার বিকাশদাকে ভালো করে বলো গে না একটু—

—কি মুস্কিল! শুনছ কাজ রয়েছে!

—আঃ তবু বলোগে-না একবার।

—কি যন্ত্রণা! তোমরা বলো না যত পারো।....

—আমাদের বলা হয়েছে। তোমার একবার বলা উচিত।...

—বাবা রে বাবা! একদা আমার বাপের বাড়ির পাড়ায় বাস করত বলে কী যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছি আমি।..... শুনবে না কিছু না, শুধু শুধু—

—রাগ দেখিয়ে আজই চলে না গেলে পারতে।.... সবাই বলছে, আর একটা দিন অন্তত

—সবাই বলছে? তুমি নয় তো?

—না। যাকগে—শোন, কত ধার হয়েছে তোমার এবারে? কথার স্বর নয়, ফিসফিস একটা আওয়াজ শুধু।...

—সাড়ে তিনশো। ... কেন? পারবে নাকি কিছু দিতে?

—উপায় কি!..... এই নাও, ভরি তিনেক আছে বোধ হয় মফচেনটায়, যা হয়। আর কিছু নেই আমার।

—বাঁচালে কল্পনা।.... কিন্তু.... কী করে চালাচ্ছ ? ধরা পড় না?

—এখনও তো পড়িনি।.....

—যাক-এই শেষ। ধন্যবাদ দাও তোমার ঈশ্বরকে।.... চললাম।

—মাঝে মাঝে চিঠি দিলে পারো... না না আমাকে নয়, খবরদার। বাড়িতে আর কাউকে।

—শ্রীকান্তবাবুকে নাকি?

—তুমি সবই পারো। .... দাঁড়াও একটু—

বাতাসে পাতা নড়ার মতো..... মৃদু ফিসফিস শব্দ।

—কি? ... আরে আরে, আবার নমস্কার কেন?.... কী ..... কী বললে?

—কিছু বলিনি।... চলে যাচ্ছ?.... হ্যাঁ বলছি.... আবার কবে আসবে?

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা

ঘুম ভাঙিতেই প্রথম মনে হইল সকালের আলোটায় "আলো"র পরিমাণ যেন অন্যদিন অপেক্ষা অনেক বেশি। কাহারও সহিত দেখা না হইতেই ছুটিয়া গেল রাধা ছাদে। কেন গেল সে-ই জানে, অথবা সেও জানে না।

কলিকাতার বাড়ির ছাদে উঠিয়াই যে রাধা সহসা মনোরম একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সূর্যোদয়ের অপূর্ব বর্ণচ্ছটা দেখিয়া মুগ্ধ হইল এমন মনে করিবার হেতু নাই। তবু সে অহেতুক আনন্দে উচ্ছ্বসিত মুগ্ধ হৃদয়ে মনে মনে উচ্চারণ করিল, বাঃ। শ্যাওলা পড়া ছাদের আলিসা ধরিয়া কিছুক্ষণ আনমনে দাঁড়াইয়া থাকিল। আবার চঞ্চলচিত্তে গুনগুন করিয়া একটা বহু পুরাতন গানের এক কলি গাহিতে গাহিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, "নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরান হবে খুশি, যে পথ দিয়া চলিয়া যাবো—সবারে যাবো তুমি'। বাতাস, জল, আকাশ, আলো—সবারে কবে বাসিব ভালো—হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা'—

অকস্মাৎ খোঁপায় 'হ্যাঁচ্‌কা' এক টান খাইয়া মাথাটা পিছনের দিকে ঝুলিয়া পড়িল এবং রবিবাবুর মর্যাদা ভুলিয়া রাধা গানের মাঝখানে চিৎকার করিয়া উঠিল—উঃ।

আক্রমণকারী ততক্ষণে নিরীহভাবে বইখাতা লইয়া গুছাইয়া বসিবার বাসনায় ছাদে একখানি মাদুর বিছাইতেছে ; রাধা বিরক্তকণ্ঠে কহিল, এটা কী হল শিশির?

যোলো বছরের ছেলেকে যুবক বলিলে যদি শ্রুতিকটু না হয়ত উক্ত বালক—নিজের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ আশা করিয়াছিল একটি অগ্নিবর্ষণকারী তীব্র রুষ্ট এবং একটি উত্তপ্ত কণ্ঠের মর্মভেদী ডাক—"শিশির"!

সেস্থানে রাধার বিরক্তিপূর্ণ প্রশ্নটা অনেক কোমল বলিয়া বোধ হইল। কাজেই আরও ক্ষেপাইবার উদ্দেশ্যে কহিল—কোনটা? ওঃ, চুলটানা! শ্রীরাধা ধ্যানে মগ্ন, অথচ চায়ের জল প্রতীক্ষা করে করে শীতল হয়ে উঠছে—তাই।

রাধা ঝাঁঝিয়া উঠিয়া কহিল—শিশির, ফের তুমি ওই রকম ইয়ার্কি মেরে কথা বলছ? কলেজে ঢুকে তোমার বড় বাড় বেড়েছে, না? দিদির সঙ্গে আবার ঠাট্টা কী?

শিশির সবিনয়ে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া কহিল—ও 'সরি' ছোটমাসিমাতা ঠাকুরাণি, চায়ের জলটা আপনার আশায় থেকে হতাশ হয়ে উঠেছে— দয়া করে যদি বেচারাকে কেটলির পেট থেকে মুক্তি দেন।

রাধা কিঞ্চিৎ নরম হইয়া কহিল,—দাদা উঠেছেন নাকি? কতই বা বেলা হয়েছে?

আপনার কি আজ সময়ের জ্ঞান আছে? ধ্যানমগ্ন হয়ে কতক্ষণ ছিলেন সেটা যদি ঘড়ি ধরে দেখতেন?

শিশির, ভারী অসভ্য হয়েছ তুমি, চল বড়দির কাছে তোমায় মজা দেখাচ্ছি।

'বড়দির নামে শিশির সবিনয় শিথিলতা ত্যাগ করিয়া, তীক্ষ্নকণ্ঠে কহিল — কী মজা দেখাবে শুনি? অসভ্যতাটা কী করা হয়েছে? 'ধ্যানমগ্ন' কথাটা বুঝি খুব অসভ্য? সাধু-সন্ন্যাসীরা ভোরবেলা নির্জনে বসে ঈশ্বর-চিন্তা করেন না? তুমি যদি নিজের মনের মতন মানে বের করো, কী করবো? ষেই যে বলে না— চোরের মন বোঁচকার দিকে, তোমার তাই হয়েছে দেখছি! চল তুমিই চল, সবাইকে জিজ্ঞেস করি গিয়ে—

'সবাইকে জিগ্যেস' করিবার নামেই রাধার বীরত্ব কমিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মুখে স্বীকার না করিয়া মাসিগিরি বজায় রাখিয়া কহিল—আচ্ছা খুব হয়েছে—সকালবেলা বুঝি লেখাপড়া নেই ? ফার্স্ট ইয়ারে ফেল্ করলে খুব মুখ উজ্জ্বল হবে—কলেজের ছেলেরা চাঁটি মেরে বের করে দেবে যখন, তখন দেখবে মজা। বলিয়াই বোধ করি নিজেই চাঁটি খাইবার ভয়ে দুড়দুড় করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

শিশির হাসিয়া পাঠে মনঃসংযোগ করিল; অন্যদিন হইলে চুল টানার অজুহাতে একটা খণ্ডপ্রলয় ঘটিয়া যাইত সন্দেহ নাই, কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র।

রাধার কপালে আজ অনেক দুঃখ, বড়দি যে বড়দি এত গম্ভীর মানুষ, তিনি আজ পর্যন্ত রাধাকে দেখিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—রাধা-রানির যে রাত না পোয়াতেই ঘুম ভেঙেছে দেখছি! কে জাগালে গো ?

এ কি অন্যায় বল তো—রাধার না হয় 'ঘুম-কাতুরে' বলিয়া একটু বদনাম আছে, তাই বলিয়া কি না ডাকিলে কোন দিনই ওঠে না? এই তো সেদিন— কবে যেন ভালো—রাধা ভোরবেলা উঠিয়া বড়দিরই খোকাকে পাউডার মাখাইল, টিপ কাজল পরাইল, কোলে করিয়া সাত রাজ্য ঘুরিয়া বেড়াইল—বড়দির তখন অর্ধেক রাত! ইতিমধ্যেই সে সব ভুল—অকৃতজ্ঞ হইলেই এইরকম হয় বটে।

আজ একটু সকাল সকাল ঘুম ভাঙিয়াছে বলিয়া পরিহাস কীসের বাপু? ছেলে তো এদিকে ধ্যানমগ্নটগ্ন কত কি যা-তা বলিয়া বসিল। বাঃ রে, রোজই বুঝি ডেকে দিতে হয়? বলিয়া রাধা সরিয়া পড়িল। কিন্তু পড়িল একেবারে বাঘের মুখে—বড়ো জামাইবাবু যে ট্রেনের 'ধকলে' সারাদিন কাটাইয়া রাত্রি বারোটায় শয্যাগ্রহণ করিয়া সকালবেলাই সেই শয্যার মায়া ত্যাগ করিবেন এটা রাধার কল্পনারও অতীত। জামাইবাবুর পক্ষে রাধাকে গ্রেপ্তার করা এমন কিছু কঠিন নয়, যার জন্য রাধ ভদ্রলোককে "লোহার থাবা" নামে অভিহিত করে। হাত ছাড়িবার কিছুমাত্র লক্ষণ না দেখাইয়া ভদ্রলোক এমন সব অশিষ্ট কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন যাহা দাঁড়াইয়া শোনা অসম্ভব বলিলেও হয়। ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে রাধা বিরক্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—আপনি যে বড় আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেন? আপনার ছেলেই বলে আমার চেয়ে বড়, হ্যাঁ। ভারী একেবারে—

তাতে কি? শ্যালী ইজ শ্যালী, ছেলের চেয়ে ছোট বলে শ্যালীকে নাত-বৌ বলতে হবে নাকি? লজিক পড়া বরের সঙ্গে মিশে এই বুদ্ধি হচ্ছে বুঝি? এঃ হে হেঃ!

লাগছে, ছাড়ুন বলছি, আঃ—অনেক কষ্টে শৃঙ্খল ভাঙিয়া দে ছুট। রাধার পিছনে সকলে মিলিয়া এমন করিয়া লাগিবার হেতুটা কী? বেচারাকে কি কাঁদাইয়া ছাড়িবে?

জামাইবাবুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রাধা প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়াই স্নানের ঘরে ঢুকিল, সন্দেহ হইতে পারে, হয়তো বা কাঁদিতেই গেল। কিন্তু স্নানের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আর্শিটা যদি আর্শি না হইয়া ক্যামেরা হইত, তাহা হইল হয়তো বিপরীত সাক্ষ্য দিয়া লোকসমাজে তাহাকে অপদস্থ করিয়া ছাড়িত।

বহুক্ষণ ধরিয়া জল মাখাইয়া ছিটাইয়া রাধা যখন বর্ষা-ধোয়া শ্যামল লতার মতো একটা স্নিগ্ধশ্রী লইয়া স্নান সারিয়া বাহির হইল, তখন আপানর তনুর কমনীয়তার আপনা-আপনি মনটা তাহার অপূর্ব পুলকে মুগ্ধ বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সুন্দর স্নানের পর, বাদামী সিল্কের ব্লাউসের সহিত রূপালী জরিপাড় মিহি নীলাম্বরী শাড়িখানি পরিলেই অবশ্য মানায় ভালো; কিন্তু পরিলে বাড়ির সকলে তাহাকে 'আস্ত' রাখিবে কিনা সে বিষয়ে রাধার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অগত্যাই ঈষৎ ক্ষুণ্ণ মনে নিত্য ব্যবহৃত শাড়ি ব্লাউস পরিয়া সারিতে হইল।

চুল আঁচড়ানো অথবা টিপ পরা অবশ্য প্রাত্যহিক কর্মের মধ্যে পড়ে—করিলে নিন্দা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু রাধার ভাগ্যে আজকে হয়তো লোকচক্ষে তাহারও একটা বিশেষ অর্থ বাহির হইবে, কাজ নাই বাপু।

বরং ইচ্ছা করিয়াই চুলগুলা একটু এলোমেলো করিয়া রাখিল; মায়ের চক্ষে পড়িলে যদি কিছু সুরাহা হয়। হায়, এত ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা সত্ত্বেও ঘর হইতে বাহির হইতে মেজদা অনায়াসে বলিয়া বসিল—রাধি যে খুব ফরসা হয়েছিস দেখছি। সকাল থেকেই পাউডার মাখতে আরম্ভ করেছিস বুঝি?

দেখিলে একবার আক্কেলখানা? কবে আবার 'রাধি' সক্কালবেলা পাউডার মাখিয়া বেড়ায়, তাই আজই অমনি মাখিয়া বসিবে। যা নয় তাই। ইহারা দেখছি রাধাকে বাড়ি-ছাড়া করিয়া ছাড়িবে। মেজদাকে উপযুক্ত উত্তর দিবার আগেই সে অবশ্য চলিয়া গিয়াছে ড্রয়ার হইতে কাঁচিখানা বাহির করিয়া লইয়া।

রাধা হাঁকিয়া বলিল, বড় কাঁচি নিচ্ছ যে মেজদা? মা বকবে কিন্তু, কী করবে কাঁচি?

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে মেজদা বলিয়া গেল, এক ভদ্রলোকের নাক আর কান কাটা হবে। শুনিলে কথা ? সাধে বলিয়াছি রাধাকে ইহারা বাড়ি ছাড়া না করিয়া ছাড়িবে না। এমন করিয়া যদি—দূর ছাই, তার চেয়ে ভাঁড়ার ঘরে মা ঠাকুমার কাছে গিয়া বসা যাক নিরাপদ দুর্গ।

রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল, সেখানে বিরাট ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। তিনটা উনুন জ্বালিয়া বামুনঠাকুর যেন কল্কি অবতারের দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় 'ম্লেচ্ছ-নিধন' ছাড়িয়া মৎস্য-নিধন কার্যে লাগিয়াছে। মশলার গন্ধে রন্ধনশালা ভরপুর। একদিকে আবার তোলাউনুন জ্বালিয়া মা পায়েস চড়াইয়াছেন। বাবা বাবা ! বিয়ে নাকি বাড়িতে? প্রসন্ন মুখে কোনও রকমে অপ্রসন্ন ভাব টানিয়া আনিয়া রাধা ভাঁড়ারঘরে ঢুকিয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল—বাবারে বাবা, ঠামা যে একেবারে খাবারের বৃন্দাবন করে বসেছ, আমাদের বুঝি খিদে পায় না? বারে!

ঠামা ঝুড়ি দুয়েক ফল মিষ্টি লইয়া রেকাবিকে 'বাটা' সাজাইতেছিলেন, রাধাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া হাসিয়া হাত নাড়িয়া গাহিয়া উঠিলেন—'রাধার কুঞ্জবনে, আজ গোপনে, আসবে শ্যামরায়। বলি রাধালতার আজ 'বার' নেই কেন গো? অন্যদিন যে এতক্ষণে সাতবার দেখা মেলে!

ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া রাধা মার কান বাঁচাইয়া কহিল—ঠামা তো বেশ কেত্তন গাইতে পারো। ভালো লোককে শোনাতে পারলে বক্‌শিশ পেতে।

ওলো, ভালো কি আর আছে? ভালো কালো হয়ে গেছে, সব গোপিনী ভাসিয়ে দিয়ে রাধার পায়ে পড়ে আছে। আমাদের কপালে ভালো আর নেই গো রাধালতা। পাথরবাটিটা দে তো ভাই ওদিক থেকে।

পাথরবাটি সরাইয়া দিয়া রাকা কৌতুককণ্ঠে কহিল—কেন, তোমারটি তো আর কেউ কেড়ে নেয়নি বাবু?

আর দিদি, সেকাল কি আছে যে একটি কথা কইবার জন্যে মুখখানি একটু দেখবার জন্যে চাতক পক্ষীর মতন ঘুরঘুর করে বেড়াবে? এখনি না হ'ক কত মুখনাড়া দিয়ে গেল, বুড়ী বলেই না!

রাধা হাসিমুখে আর কিছু বলিতে যাইতেছিল, মা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন—ন'খুড়ি পায়েসের কিসমিস ক'টা বাছা হয়েছে নাকি? হয়ে থাকে তো দাও।

ঠামা নিবিষ্ট মনে শশার চাকায় ফুল কাটিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন—কিসমিস পেস্তা বাদাম এলাচ কর্পূর সব তো বোমা রেখে এসেছি। জলচৌকির নীচে রেকাবে আছে।

রাধার মা কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন, রাধা, কোথায় ছিলি রে? সকলের 'ষাটের জল' নেওয়া হয়েছে, শুধু তোরই বাকি আছে, ছুটে যেন পালাসনে। 'ষাটের জল' দেব—মিষ্টি হাতে দেব। আসছি পায়েসটা নামিয়ে।

রাধা বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; সত্যই কি তাহার স্নানের ঘরে এত দেরি হইয়া গিয়াছে? 'ঠামা' রাধার লজ্জিত ভাব লক্ষ না করিয়া আপনার মনেই কহিতে লাগিলেন—এদের সব এখনকার ধরনধারণ বুঝিনে; রান্না-বান্না করে ব্যস্ত, এদিকে মেয়েটা একখানা ময়লা কাপড় পরে বেড়াচ্ছে তা ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাদের কালে যদি জামাই নেমন্তন্ন হয়েছে তো সাত পাড়ার বউ-ঝি জড়ো হয়েছে মেয়ে সাজাতে। তা এখনকার মেয়েদের করেই বা দেবে কি? নিজেরাই কত সাজতে জানে। যা লো রাধা যা, মনের মতো করে একটু সাজসজ্জা কর্‌গে, পায়ে একটু আলতা ছোঁয়াস। টিপ্ কাজল কতই তো পরিস লো, আজ এমন যোগিনী বেশ কেন? কী যে সেই গাস তোরা "যোগিনী হইয়ে যাবো সেই দেশে", তাই বুঝি?

রাধা মুচকি হাসিয়া কহিল, ঠামার যেমন সব অদ্ভুত কথা, যোগিনী বেশ কোথা দেখলে? এই তো ডুরে শাড়ি পরেছি।

তা হোক দিদি, বচ্ছরকার দিন নতুন বর আসবে, একখানি ভালো কাপড় পরতে হয়—ওলো অ' শান্তি। এই যে শিশির, তোর মাকে ডেকে দে তো? দিক্ এসে মেয়েটাকে সাজিয়ে গুজিয়ে—রাধারানি তো আমার এখনকার মেয়েদের মতন নয়।

একটা দুর্ভাবনা ঘুচিল, বড়দির কাছে কৌশল করিয়া রাধার তবু নীলাম্বরী শাড়িখানির কথা উল্লেখ করিতে হইবে। নীলাম্বরীর একটা মধুর ইতিহাস আছে বলিয়াই না রাধার এত চিন্তা। মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, নাঃ, রাধা মোটেই একেলে নয়—ভারি সেকেলে।

বড়দি না ডাকিলে তো যাওয়া যায় না; তা' ছাড়া মা নিষেধ করিয়া গেছেন ছুটিয়া পলাইতে; রাধা অন্যমনস্ক ভাবে কহিল—আচ্ছা ঠামা, তোমার বিয়ে হয়েছে কত দিন হল?

কেন রে—হঠাৎ এ খোঁজ কেন? সে কি আজকের কথা? ন বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, আর এই উনষাট হল ; পঞ্চাশ বছরের কথা, চার যুগ বেরিয়ে গেছে। বলিতে বলিতে বৃদ্ধা ঠাকুরমাও কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, অতীতের কোন দৃশ্য কল্পনা করিয়া না-জানি শিরাবহুল শীর্ণ মুখে একটু মধুর স্নিগ্ধতা ফুটিয়া উঠিল।

আচ্ছা ঠামা, দাদু তোমায় খুব আদর করতেন?

আ মোলো! কি পাপ! সক্কাল বেলা ছুঁড়ির মাথা বিগড়ে গেল নাকি? সর, সর, কাজ আছে।

ও ঠাকুমা বল না, তোমাার দুটি পায়ে পড়ি—

ওলো করতো লো করতো, এখনকার ছোঁড়া সোহাগের জানে কি? 'বিশবছুরে' কনে সব—তারাই থাকে হাঁ করে, বর পেয়ে বর্তে যায়। তখনকার এতটুকুন মেয়ে—পাখি পোষার মতন করে বশ করতে হ'ত, তবে না মনের মতনটি হত? সে সব সোহাগের মর্ম তোরা বুঝবি কি?

রাধার অবশ্য বিশ বছর বয়স নয়, তাই শ্লেষটা গায়ে মাখিল না ; বলিয়া উঠিল—তবে এখন যে দাদুর সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া করো বড়? উনিও তো তোমায় কেবলি বকেন?

রাধা, তোর কথায় বাছা মরা মানুষেরও হাসি পায়। বকবে না তো কি এখনও কোলে বসিয়ে সোহাগ করবে? সকালবেলা রাজ্যের ছিষ্টিছাড়া কথা নিয়ে কাজ ভন্ডুল। নে সর, কত কাজ বাকি এখনও। ওই আসছেন তাড়া দিতে। বসে বসে তামাক খাবার যম। খালি ফোঁফোর দালালি।

অসিতেছেনই বটে, চটিজুতার শব্দে পাড়া মুখরিত করিয়া দাদু আসিয়া দর্শন দিলেন—কি, এখনও তোমাদের হয়নি তো? আঃ, আজ আর দেখছি তোমরা ভদ্রলোকের ছেলেদের বেলা দুটোর আগে খেতে দিচ্ছ না! পিত্তি পড়িয়ে অসুখ করাবে আর কি—

যাট্ অসুখ করবে কী দুঃখে? কথার কি ছিরি, মরে যাই। বেলা দশটা না বাজতেই নিজের যদি পিত্তি পড়ে যায় তো গিলে নাওগে। ভদ্দর লোকের ছেলেরা এসেছে সবাই?

আসা-আসি আর কি, সুধাংশু তো রয়েইছে—বিজয়ও এসে পড়বে এখুনি রবিবার আছে, খালি মনোজ—তাকে আনতে যাবে, তবে তো? কথা কয়টা কহিয়াই 'দাদু' বারকতক তামাকে টান দিয়া লইলেন, বোধ হয় শ্রম লাঘব করিতে।

যেতে হবে তো—যাও না? বসে বসে তো তামাকের ছেরাদ্দ করছ গেরস্থর একটা কাজে লাগলেও তো হয় ? দিবারাত্তির "ভুড়ুক ভুড়ুক" দেখলে যেন হাড়পিত্তি জ্বলে যায়!

শীর্ণ মুখ বিকৃত করিয়া ঠামা এমনভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন যে দেখিলে 'পিত্ত জ্বলিয়া' যাওয়া সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না।

রাধা অবশ্য জন্মাবধি এই দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছে এবং দাদু যে কোনও কালে ঠামার 'বর' পরিচিত ছিলেন, ঘণ্টাখানেক আগে পর্যন্ত একথা তাহার কখনও মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ যেন আজকেই বিশেষ করিয়া কথাটা স্মরণ হইয়া তাহার বড় আশ্চর্য বোধ হইল। এই দন্তহীন কেশহীন বিকৃত-দর্শন বৃদ্ধ একদা যুবকরূপে তরুণী পত্নীকে ভালোবাসিয়াছে, আদার

করিয়াছে, যেমন করিয়া মনোজ তাহাকে—! কী ভীষণ? এই রকম হইয়া যাইবে মনোজ? তাহাকে আর ভালোবাসিবে না, আদরে ডুবাইয়া দিবে না এতটুকু মনখারাপ করিলে শত প্রকার সাধ্য-সাধনায় মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিবে না! কথায় কথায় গঞ্জনা দিবে, কলহ করিবে?

আর রাধা? রাধাও এমনি শিরাবহুল শীর্ণ হাত নাড়িয়া সারাদিন সংসারের কাজ করিবে? আর রাত্রে নাতি-নাতনীর পাশতলায়, যেখানে সেখানে একটু স্থান করিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইবে অসম্ভব! রাধা কখনও বুড়ী হইয়া বাঁচিবে না। কিন্তু মনোজ? তাহার সম্বন্ধে ও কথা ভাবিতে নাই, সে বাঁচিয়া থাকুক, কিন্তু বুড়া হইবে? ছিঃ!

ঠামা রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিয়াছেন, দাদুর চটির শব্দ কখন মিলাইয়া গেছে রাধা অন্যমনা—শিশিরের সশব্দ হাস্যে চৈতন্য ফিরিল বেচারার।

বাবা! মেয়েকে সকালে কি একটু বলেছিলাম বলে তো তেড়ে মারতে এলেন, ধ্যান ছাড়া এটা কী হচ্ছে ছোট মাসি?

রাধা মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র, কিছু বলিল না।

শিশির রাধার প্রকৃতি-ছাড়া ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইল। ছোটমাসি আবার গম্ভীর হইবে! বিবাহ ব্যাপারটা যে মেয়েদের পরকাল ঝরঝরে করিয়া দিবার প্রধান 'কল' তাহাতে আর শিশিরের সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

মেয়েদের যে কতই ঢং। নাও, মা তোমার জন্যে রাজ্যের বেনারসী শাড়ি ছড়িয়ে বসে ডাকাডাকি করছেন। কী যে সব বুঝি না বাবা! বলিয়া দুইখান হাত যতটা সম্ভব উল্টাইয়া মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেল। মূল কথা, ছোট মাসির সঙ্গে ভালোমতন একটা ঝগড়া না বাধানো পর্যন্ত তাহার মনে একবিন্দু শান্তি নাই। ভোজের ব্যাপারটি বেশ লোভনীয় হইয়াছে দেখা যাইতেছে, হজম হইবে কীরূপে? লাগিবে নাকি মেজমামার সঙ্গে একবার? নাঃ বড় লায়েক হইয়া গিয়াছে আজকাল সে—শিশিরের সঙ্গে কথা কয় যেন পিঠ চাড়াইয়া, তেমন জমিবে না। ছোট মেসোমশাইটি আসিলে হয়। লোকটি তবু ভদ্র আছে ; সে দিন খাসা হারিয়াছিল 'ক্যারমে'।

বড়দির কাছে আবার ডাক খাইয়া রাধা। উপরে গেল।

বড়দি ট্রাঙ্ক খুলিয়া খানকতক রঙিন শাড়ি বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, দেখিয়া বলিলেন—রাধা শোন্, দেখ তো কোনো কাপড়টা দেব?

রাধার মত ভালো থাকিলে বড়দিন সামনে একটু লজ্জার অভিনয় করিয়া জানাইত—বেশতো সাজ আছে তাহার। মনটা তাহার সহসা এমন ভারগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে যে নিরুৎসাহভাবে শুধু বলিল, দাও না যা হয়। নীলাম্বরীর কথা মনেই পড়িল না।

বড়দি বাছিয়া বাছিয়া একখানা বেগুনি ছাপা ছিটের শাড়ি ও ব্লাউস পরাইয়া চুল আঁচড়াইয়া টিপ্ পরাইয়া আলতা পরাইয়া বলিলেন—বসে থাক সভ্য ভব্য হয়ে। এখুনি যেন শিশিরটার সঙ্গে মারামারি করে রণচণ্ডী বেশ করিসনে বাপু।

শিশিরের সঙ্গে? তাহার সম্মুখে বাহির হইতে হইলে তো রাধা মরিয়াই যাইবে। কাহার সামনেই বা নয়? বাবা, দাদু, মেজদা, জামাইবাবু—উঃ সর্বনাশ আর কি?

তিনতলায় দাদার ঘরটা খালি পড়িয়া আছে। দাদা বউ লইয়া শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, অথবা বৌদি বর লইয়া বাপের বাড়ি। রাধা আসিয়া জানলার ধারে ইজি-চেয়ারটা টানিয়া শুইয়া পড়িল।

কালই তো মনোজের চিঠি আসিয়াছে ; হাতের কাছে না থাকিলেও রাধার প্রায় মুখস্থ। ওই যে লিখিয়াছে, রানি আমাদের ভালোবাসা চিরনবীন চিরসুন্দর, অক্ষয়, যুগযুগান্তর আমরা পরস্পরকে ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সমস্তই তাহা হইলে অসার কবিত্ব? যুবক 'দাদু' ও তরুণী "ঠাকুমা" এমন একটা হাস্যকর চিত্র কল্পনা করিয়া হাসিয়া লুটোপুটি খাওয়ার পরিবর্তে এত দুশ্চিন্তা কেন? হইল কী রাধার!

শিশির মিথ্যা বলে না, "মেয়েদের সব ঢংই" বটে।

রাধার চিন্তাজাল ভেদ করিয়া সুধার কলকণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিল নীচের তলায় —ছোড়দি আসিয়াছে? আসিবার কথা ছিল না কি? রাধার কী কিছু হুঁশ পর্ব ছিল না? না—ওই যে সুধার শানানো সাধা গলার প্রত্যেকটি কথা শোনা যাইতেছে, রাধা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, ছোড়দি আসিলে রাধার ঝড়ে উড়িয়া নীচে পড়িবার কথা, কিন্তু বলিতেছে কি? — হ্যাঁ গো তাইতো এলাম। আমি না থাকলে নতুন জামাইয়ের কান মলবে কে? তোমাদের বাপু আচ্ছা আক্কেল, ঘরের মেয়েকে বাদ দিয়ে পরের ছেলেকে নেমন্তন্ন! রাধি' এসেছে— বড়দি রয়েছে—আমি না এসে থাকতে পারি? রাত থেকে ঘুম হচ্ছিল না, নিয়ে আসবে প্রতিজ্ঞা করিয়ে তবে ঘুমোই। কই গো দাদু, তোমাদের 'চাঁদের হাট-বাজার' দেখলে? তিনটি রত্ন তোমার ঘরের তিন কোণ আলো করে বসেছেন, এইবার তুমি গিয়ে এগিয়ে বসলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

শেষের কথা কয়টা কানে ঢুকিবার পথ না পাইয়া ভাসিয়া গেল ; রাধার কানে শুধু বাজিতে লাগিল—"তিনটি রত্ন" -মনোজও আসিয়াছে তাহা হইলে? অত করিয়া লিখিয়াছিল মনোজ, ঠিক দশটা দশ মিনিটের সময় ছাদের পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে থেকো লক্ষ্মীটি, আমি দূর থেকে আসতে আসতে দেখব—অভিসারিকা শ্রীরাধার মতো তোমার সেই নীল শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে থাকবে তো? আমি ঠিক মোড়ের মাথায় গাড়িটা ইচ্ছে করে বিগড়ে ফেলব, আর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হবে ওপর দিকে তাকিয়ে কেমন? লোকের কিছু মনে করবার হেতু নেই, গাড়িই যখন চলছে না? সত্যি রানি, তোমাদের বাড়ির সেই জনারণ্য ভেদ করে কখনও যে দেখা হবে—" মনোজ ছাদের দিকে চাহিতে চাহিতে আসিয়া হতাশ হইয়া গিয়াছে? কোন্ তুচ্ছ কথায় ভুলিয়া এমন প্রয়োজনীয় কথা ভুলিল রাধা? হইয়াছিল কী তাহার? এতক্ষণের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন একটা পথ পাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

রুদ্ধ কপাট

যে ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া, সুদীর্ঘকালের সৌহার্দবদ্ধ দুইটি পরিবারের বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল, সেটা এমনি অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে! উপলক্ষটা নিতান্তই উপ-লক্ষ্য।

'খেলিতে চাহিলে যে কানাকড়ি লইয়াও খেলা অসম্ভব নয়' এই পুরাতন প্রবাদটিকে হল্‌দেবাড়ির বড়গিন্নি এমন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়া দিলেন যে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

লালবাড়ি প্রথমটা অপ্রতিভ হইলেন, তাহার পর অবাক হইলেন, অবশেষে হাল ধরিলেন। অতঃপর স্তব্ধ-মধ্যাহ্নের নিঃশব্দ শান্তি বিদীর্ণ করিয়া, চিরদিনের মধুবর্ষি দুইটি কণ্ঠ হইতে যে তীব্র বিষ উদ্‌গীরণ হইয়া গেল তাহা যেমনি আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত। সম্বন্ধ-বন্ধনহীন দুই পরিবারের মধ্যে অনেক দিনের আসায় যাওয়ায়, আদানে প্রদানে, বিপদে সম্পদে, হাসি কান্নায় গড়া প্রীতির সম্বন্ধটি এই রূঢ় আঘাতে ভূমিসাৎ হইয়া গেল!

এবং ইহারই পর লাল ও হলদে বাড়ির সংযোগ-সেতু খোলা জানলা দুটি যেন পুনর্মিলনের সমস্ত সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করিয়া দিতেই আঠারো বৎসর পরে আজ প্রথম কপাট রুদ্ধ করিয়া দিলি। ....

ইহার পর রুদ্ধ কপাটের কঠিন দেয়ালে কেহ মাথা খুঁড়িয়া মরিতে চায় মরুক্, সে দায়িত্ব তাহার নয়!

হল্‌দে বাড়ির বড়-জা ঘরে আসিয়া ছোট-জাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—

আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি! এইবার যদি আদিখ্যেতা ঘোচে। চব্বিশ ঘণ্টা—

—'কাঞ্চন কাঞ্চন কাঞ্চন।'— "কাঞ্চনকে একবার আসতে বলবেন তো মাসিমা"

— "কাঞ্চনকে একবার পাঠিয়ে দেবেন তো মাসিমা"—"কাঞ্চন একবার শুনে যাও তো ভাই"—ভেঙচানির সুরে ও বাড়ির জ্যোতির্ময়ীর নকল করিয়া নিজস্ব ভঙ্গিমায় মুখ বাঁকাইয়া কাঞ্চনের হিতৈষিণী জ্যেষ্ঠতাতা পত্নী কহেন—কাঞ্চন যেন ওঁর খানাবাড়ির খানসামা? ঘরে ধিঙ্গি এক মেয়ে পুষে রেখেছেন— বিয়ে দেবার নাম নেই। ভয় আছে? না লজ্জা আছে? মুখে 'আসে আসে আর চুপ করে থাকি, আজ একেবারে আচ্ছা করে টিট্ করে দিয়েছি।

আর বোধহয় কিছু বলিতেন তিনি, শুধু ছোট গিন্নির—অর্থাৎ কাঞ্চনের মার, মৌখিক উৎসাহের অভাবে একটু থামিয়া যান।

তিনি থামিলেও 'দোয়ার' দিবার লোক ছিল। কাঞ্চনের বড়দি, বড় গিন্নির কন্যা বীণা, যিনি সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়াছেন এবং আসিয়া পর্যন্ত লালবাড়ির বিরুদ্ধে হলদে বাড়ির ধুমায়িত ক্ষীণ অসন্তোষকে অনুকূল বাতাসের সাহায্যে জ্বলিয়া উঠিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, তোমরা যে এতদিন এসব সহ্য করে আসছ এই আশ্চয্যি। তোমায় এই বলে রাখছি মা, সময় থাকতে যাই প্রতিকার হল তাই রক্ষে, নইলে শেষ অবধি একটা কেলেঙ্কারি না ঘটে ছাড়ত না। ওদের ওই 'নাস্তি' ছুঁড়ি কি কম বেহায়া! অতবড় মেয়ে—দিন রাত্তির আসছেন কাঞ্চনদার কাছে পড়া জানতে। এদিকে খুকিপনা দেখায়, আসলে এক নম্বরের পাকা। আড়াল থেকে ওদের ভাবভঙ্গি দেখে আমি তো বাবা গালে হাত দিই! আমাদের সময় অমন হ'লে—

এতক্ষণে কাঞ্চনের মা কথা কহেন, বলেন—জন্মে থেকে দু'জনে দু'জনকে দেখে আসছে— লজ্জা আর কোথা থেকে আসবে বাছা? তবে হ্যাঁ, বড় হয়েছে—অতটা মেশামেশি ঠিক নয়। আমিই ক'দিন ভাবছিলাম কাঞ্চনকে একটু সাবধান করে দেব। পর শাসন করবার আগে ঘর শাসন করাই ভালো।

বড়গিন্নী যেন ইহাতে একটু অপমানিত বোধ করেন, গম্ভীর গলায় টানিয়া টানিয়া কহিলেন, তবে তাই এতদিন করলে না কেন ছোটবৌ? আমি মাঝে থেকে বদনামের ভাগী হ'লাম। ছেলেটি যে তোমার একদিন নাস্তি'কে না দেখলে চোখে অন্ধকার দেখে, এত বাবু কারুর চোখ এড়ায় না? ঘরে থাকলেই ন্যায্য কথা বলতে হয়।

ছোটগিন্নি তাড়াতাড়ি বলেন, আমি তো তোমায় কিছু বলছি না বড়দি, কাঞ্চনের কথাই বলছিলাম। নাস্তির চাইতে ও বড় বই তো ছোট নয়, ওরই ন্যায় অন্যায় বোধ হওয়া উচিত। যাক্‌গে ও এক রকম ভালোই হয়েছে, বিয়ে দেবার উপায় নেই যখন।

বীণা চোখ টানিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, তুমি কি বিয়ের কথাও ভাবছিলে নাকি কাকিমা?

স্বঘর হ'লে দোষ কি ছিল বীণা?

অরুচি! অপরূপ ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টাইয়া বীণা উত্তর করে—নাস্তি তো একেবারে রূপের প্রতিমা। বাড়ির মধ্যে একটা বৌ হবে, ওই রকম রূপের বৌ আনলেই হয়েছে। মা বাপ নেই, ভাইয়ের পুষ্যি। দেবেথোবেও তো কত? তার চেয়ে আমার ভাগ্নের মেয়েটিকে দেখ দিকিন? দেখে বলবে—হ্যাঁ বিনি বলেছিল বটে।" লক্ষ্মীঠাকুরুনের মতন মেয়ে, পদ্মফুলের মতন হাতপায়ের গড়ন। বাপ তো খরচ করবার জন্যেই ব্যস্ত। বলে—'ছোটমামি, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে লাগিয়ে দাও, ফুলির বিয়েতে পনেরো ষোলো হাজার টাকা আমি বে-ওজরে খরচ করব।"

পনেরো ষোলো হাজার কথাটা এমনই চিত্তাকর্ষক যে আলোচনার স্রোতটা অজ্ঞাতসারেই সেই 'খাতে' প্রবাহিত হইয়া যায়।

লালবাড়ির রুদ্ধ করিয়া ফেলা কপাটের ভিতরের দৃশ্যটা অন্য ধরনের। জানলা বন্ধ করিয়া দিয়াই জ্যোতির্ময়ী পিছন ফিরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

'নান্তি' ওরফে নমিতা এই ঘরেই বসিয়া নির্বিকারচিত্তে সামান্য দুইটা কাঁটার সাহায্যে একতাল পশমকে ব্লাওসে রূপান্তরিত করিতেছিল, এত কাণ্ডেও না তুলিয়াছে মুখ, না কহিয়াছে কথা। এতক্ষণে মুখ তুলিয়া ঠোঁটের আগায় এক টুকরা হাসির আভাস আনিয়া কহিল, কি বৌদি, এতক্ষণ তো বেশ হ'ল, এখন আবার কেঁদে মরছ কেন?

জ্যোতির্ময়ী এবার যেন জ্বলিয়া উঠিলেন, তীব্রস্বরে কহিলেন, 'মরছি কেঁদে'! দেখেছিস তুই? কাঁদতে আমার দায় পড়েছে। না হক্ কতকগুলো কথা শুনলে নাচতে ইচ্ছে করে মানুষের নও না? এতখানি বয়েস হল এমনধারা দাঁড়িয়ে অপমান কখনও হইনি, কান্না পাবে না?

জ্যোতির্ময়ীর সামঞ্জস্যহীন কথাবার্তায় ভারি কৌতুক অনুভব করে নমিতা, হাসিয়া ফেলিয়া বলে—তুমিও তো কিছু বলতে ছাড়নি বাপু?

বেশ করেছি বলেছি, কেন বলব না? কারুর চালে তো বাস করি না। বলতে গেলে কাঞ্চনকে হাতে করে মানুষ করলাম আমি, আর আজ কিনা—

থাক্ থাক্ বৌদি, আর নয়, আবার কেঁদে ফেলবে তুমি।

খুব করব কাঁদব। হাসতে লজ্জা করছে না বেহায়া মেয়ে? তুই তো যত নষ্টের মূল।

তা' ভালো—অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো মুখ করিয়া নমিতা কহিল, নিজের ছেলে লোকের বাড়াভাত নষ্ট করে বেড়াবে, দোষ হল আমার। খোকার বলটাই বরং যত নষ্টের মূল।

হু' বলটা তো ছুতো—আমি আর বুঝি না কিছু? তুই দেখে নিস্ নান্তি, আর যদি এ জানলা খুলি আমি, আর যদি ওদের মুখ দেখি—

রূঢ় একটা প্রতিজ্ঞা করিতে গিয়া থামিয়া যান জ্যোতির্ময়ী।

বদ্ধ জানালার ইতিহাস এ পর্যন্ত। কোনও পক্ষ হইতেই আর কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। রুদ্ধ কপাট দুই জোড়া যেন অনুচ্চারিত তিরস্কারের মতো কঠোর ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া থাকে, এক ঝলক্ হাসির সঙ্গে খুলিয়া ছড়াইয়া পড়ে না।

লালবাড়ির খোকার যে ফুটবলটা দৈবাৎ বেহিসাবি লাফ্ মারিয়া হলদে বাড়ির গিন্নির বাড়াভাত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই অপরাধী জড়-বস্তুটা নিরুপায় বিস্ময়ে আকাশের পানে চাহিয়া হলদে বাড়ির উঠানে পড়িয়া থাকে।

কেহ ফিরাইয়া দিবার প্রয়োজন অনুভব করে না, কেহ চাহিয়া লইবার সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারে না।

দিন কয়েক পরে। খোকাকে একটা নতুন ফুটবল লইয়া মহোৎসাহে খেলিতে দেখিয়া জ্যোতির্ময়ী সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করেন—বল কোথায় পেলি রে বাব্লা?

বাব্লু সহজাত বুদ্ধিতেই কেমন যেন বুঝিতে পারে খাঁটি উত্তর দিলে তিরস্কারের সম্ভাবনা আছে, বলটা হাতছাড়া হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই দুই হাতে সেটাকে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতায় বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কাতরভাবে বলে—কাঞ্চনদা দিলে যে—

বটে? আবার বুঝি গিয়েছিলি ওদের বাড়ি? হ্যাংলা ছেলে, কখন গিয়েছিলি বল শিগ্‌গির?

ওদের বাড়িতে আবার কখন গেলাম?—খোকা এবার সরোষে অস্বীকার করে, কাঞ্চনদা তো পার্কে বেড়াচ্ছিল ফুটবল নিয়ে।

আর তুই চাইলি—ক্যাংলার মতন? কেমন?

কই চাইলাম? কক্‌খনো না। কাঞ্চনদা বললে যে—আয় বাবলু বল খেলি খেলে টেলে তা'পর বললে, 'তোর জন্যেই কিনেছি ওটা, নিয়ে যা'।

খোকা অবশ্য ইহার মধ্যে অযৌক্তিক যা অপরাধজনক কিছু খুঁজিয়া পায় নাই, তাহার খেলনার ভাঁড়ার তল্লাস করিলে কাঞ্চনদা প্রদত্ত উপহারের অভাব নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া এখন তো আর জ্যোতির্ময়ী সেটা বরদাস্ত করিতে পারেন না? তাই বীর বিক্রমে ছেলের কাছ হইতে বামাল কাড়িয়া লইতে অগ্রসর হ'ন।

দালানের ওদিকে বসিয়া নমিতা এতক্ষণ সুপারি কাটিতেছিল, কথা কহে নাই, এবার মুখ তুলিয়া কহিল, কি ছেলেমানুষী হচ্ছে বৌদি?

ছেলেমানুষী আবার কি? ও বল আমি ফেরত দেব। চুকেবুকে তো গেছে সব, আবার আমার ছেলেকে খেলনা দিতে আসা কেন?

আমিই বলেছিলাম দিতে।

তার মানে? কখন তুই বললি মুখপুড়ি? জ্যোতির্ময়ী যেন ক্ষেপিয়া যান,—তা' হলে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখাশোনা চলছে এখনও?

আঃ কি করো বাবলুর সামনে? লুকিয়ে আবার কি? রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে বললাম—'কাঞ্চনদা, খোকার বলটা তোমাদের উঠোনে পড়ে আছে, দিয়ে দিও।' বলটা হারিয়ে ক'দিন ছেলেটা মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছিল। তা' কাঞ্চনদা নতুন একটা কিনেই দিয়েছে দেখছি, বাড়ি থেকে নিতে সাহস হয়নি বোধ হয়। অল্প হাসিয়া চুপ করে নমিতা।

হাসির ভঙ্গি দেখিয়া জ্যোতির্ময়ী আরও জ্বলিয়া যান, বলেন, হবেই বা কেন? তোমার মতন পাহাড়ে ডানপিটে তো সবাই নয়? ডেকে কথা কইতে তো লজ্জা হল না রাক্ষুসী?

পেটের মেয়ে নয়, ননদিনী, তাও স্বামীর সহোদরা বোন নয়, বৈমাত্রেয়। এত শাসন করিবার অধিকার জ্যোতির্ময়ীর থাকার কথা নয়, কিন্তু অধিকার যে কখন কোন সূত্রে জন্মায়, সাদা চোখে সে হিসাব মেলানো কঠিন।

নমিতা রাগ করে না, তেমনি প্রায় হাসিমাখা মুখে উত্তর করে—লজ্জা করবার কী আছে? আমি তো কারুর সঙ্গে কোঁদল করে আসিনি।

আর আমিই বুঝি পাড়া বয়ে কোঁদল করে আসি—না? বড্ড তোর বাড় বেড়েছে নান্তি, রোস্‌ আজ আসুক তোর দাদা, এর একটা বিহিত করে তবে ছাড়ব।

কি করবে আমার? হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতবে?

তাই পুঁতব। বলিয়া মানসিক উত্তেজনার ভারেই বোধকরি জ্যোতির্ময়ী ধপাস করিয়া বসিয়া পড়েন, দাঁড়াইতে পারেন না। নমিতা উঠিয়া নিঃশব্দে একখানা হাতপাখা আনিয়া হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া আবার সুপারি লইয়া বসে।

বাতাস খাইবার প্রয়োজনই বোধ করি ঘটিয়াছিল জ্যোতির্ময়ীর তাই সেখানা তুলিয়া লইতে বিলম্ব করেন না এবং নাড়িতে নাড়িতে ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন—সতাতো ননদ, ভারি তো টানের জিনিস, তার জন্যে আবার ভাবনা। আমারও যেমন মরণ নেই। এই মাসের মধ্যেই যদি না তোকে বিদেয় করি তো কি বলেছি। কালো, কুচ্ছিত, মুখ্যু গরিব কিছু বাছব না, যাকে পাই তাকেই ধরে দেব।

কাটা সুপারি ক'টা নিবিষ্ট চিত্তে একটা বোতলে ঢালিতে ঢালিতে নমিতা কৃত্রিম গম্ভীর মুখে বলে—

তার চেয়ে বরং সেকালের মহারানিদের মতন প্রতিজ্ঞা ক'রো বৌদি, কাল সকালে উঠে যার মুখ দেখব, তার হাতেই—

ফের তুই আমার সঙ্গে ইয়ারকি কচ্ছিস নান্তি? আমি তোর ইয়ারকির যুগ্যি?

বৌদি, দুটো সুপারি খাও না ভাই।

বোতলটা জ্যোতির্ময়ীর সামনে বসাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইয়া যায় নমিতা।

জ্যোতির্ময়ী মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করেন নাই। স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া শোরগোল তুলিয়া নমিতার বিবাহের ব্যবস্থা পাকা করিয়া তোলেন তিনি।

এত ব্যস্ত হইবার হেতু অবশ্য সত্যই নমিতাকে শাস্তি দেওয়া নয়, কতকটা বরং ওবাড়িকে টেক্কা দেওয়া। বিবাহ হলদে বাড়িতেও লাগিতেছে যে। বাক্যালাপ না থাক তবু এক বাড়ির আসন্ন বিবাহের বার্তা অন্য বাড়িতে পৌঁছাইতে বিলম্ব হয় না। কাঞ্চনের বিবাহ, বীণার ভাগিনার দুহিতার সহিত। ঘটা হইবে সন্দেহ নাই।

'ঘটকিনী' বীণার মোটর চাপিয়া যখন তখন আনাগোনাটাই যে পাড়ার মধ্যে একটা সমারোহের আভাস আনিয়া আশপাশের বাসিন্দাদের সচকিত করিয়া তুলিয়াছে।

জ্যোতির্ময়ীও যেমন তেমন করিয়া সারিবেন না, তাঁহার অনেক সাধ অনেক বাসনা। কন্যার সাধ ননদিনীকে দিয়াই মিটাইতে হইয়াছে চিরকাল, আজও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কারণ নাই।

কিন্তু তিনি যেমন হাঁফাইয়া উঠিতেছেন। ও বাড়ির বিচ্ছেদ বিরহ এতদিনে যেন আসল চেহারা লইয়া উঠিয়াছে তাহার সামনে।

সমারোহ করিয়া লাভ কী? কাহাকে দেখাইয়া সুখ? কাহাদের খাওয়াইয়া তৃপ্তি? কাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলে স্বস্তি? কাঞ্চন ভিন্ন মনের মতন জিনিস আনিয়া দেয় কে? বাজারের নূতন হালচাল, নূতন নূতন ফ্যাসানের খবর আসিবে কাহার কাছ হইতে? ঝগড়া হইয়াছে হৌক, কিন্তু দুই বাড়ির বিবাহ চুকিয়া গেলে যদি হইত? বিবাহ চুকিয়া গেলে যে ঝগড়ার প্রয়োজনই হইত না, সে খেয়াল থাকে না। কাঞ্চনের বিবাহে জ্যোতির্ময়ী কড়ি খেলাইবেন না, নান্তির বিবাহে মাসিমারা ভাঁড়ার আগলাইবেন না—এ কি অসঙ্গত কথা! এর স্বপক্ষে যে কোনও যুক্তিই নাই।

মনে মনে যেন ভাঙিয়া পড়েন জ্যোতির্ময়ী। তবু চেষ্টাকৃত উৎসাহে একলাই সাতজনের কাজ করিতে থাকেন। শুধু এক এক সময় নমিতার মুখ দেখিয়া কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়, হাতপায়ের বল কমিয়া যায়। অন্ত পাওয়া ভার মেয়েটার, কেমন যে এক ভাবব্যঞ্জনাহীন মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, সুখ-দুঃখে বুঝিবার উপায় নাই। কাঞ্চনের সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ কি তাঁহারও ছিল না? নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই না সে কথা মনে আসিতে দেন নাই! হতাশ প্রেমে নান্তি লুকাইয়া দুই দণ্ড কাঁদিতেছে প্রমাণ পাইলেও জ্যোতির্ময়ীর শান্তি ছিল বরং। কিন্তু সে তো দূরের কথা—বিবাহ উৎসবের শাড়ি গহনার আলোচনাতেও মাঝে মাঝে তাহার উৎসাহের অভাব দেখা যায় না।

ঠিক এ রকমটা কি আন্দাজ করিয়াছিলেন জ্যোতির্ময়ী?

ও বাড়িতেও উৎসবের আয়োজন চলে, তবে এ বাড়ির জন্য খুব বেশি কাতর কেহই বড় হয় না। তাঁহাদের লোকবল আছে, তা' ছাড়া বীণা তো একাই একশো।... রুদ্ধ কপাট তেমনি মৌন মুখে চাহিয়া থাকে, এত বড় উপলক্ষ্যের সুযোগেও কেহ একবার তাহার মৌনতা ভাঙিয়া দেয় না।

বৈশাখের দুরন্ত ঝড় উহাকে ধাক্কা দিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, শ্রাবণ রাত্রির ক্ষুব্ধবর্ষণ উহার গায়ে আছড়াইয়া মরিয়াছে, আশ্বিনের সোনার রোদ হাসিয়া উঁকি মারিতে আসিয়া পিছলাইয়া পড়িয়াছে। খুলিতে পারে নাই।

খোলে হেমন্তের শ্রীহীন জীবনহীন থমথমে সকালে। না খুলিয়া উপায় ছিল না তাই খুলিতেই হয়। কাঞ্চনের মা আসিয়া খোলেন, অনেক দিনের ধূলাবালি জমিয়া কঠিন হইয়াছিল, সজোর ধাক্কায় যেন একটা আর্তনাদ করিয়া রুদ্ধকপাট খুলিয়া পড়ে।

মুখ বাড়াইয়া কাঞ্চনের মা কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন—বাবলু, অ-বাবলু। নান্তি ! নান্তি! বৌমা! বাবলুও আসে না, নান্তিও আসে না, আসেন বৌমা।

শ্রাবণ আকাশের মতন মেঘগম্ভীর থমথমে মুখ লইয়া জ্যোতির্ময়ী আসিয়া জানালা খুলিয়া দাঁড়ান।

বিপদে পড়িলে নাকি লজ্জা থাকে না মানুষের। তাই জ্যোতির্ময়ীর অনিচ্ছা-মন্থর ভঙ্গিকে আগ্রহ্য করিয়া কাঞ্চন-জননী ব্যগ্রভাবে বলেন—বড়ছেলে কি বাড়ি আছেন বৌমা?

বড়ছেলে, অর্থাৎ জ্যোতির্ময়ীর স্বামী।

জ্যোতির্ময়ী মাথা নাড়িয়া জানান বাড়ি নাই।

তা'হলে কী হবে বৌমা ? ইনি গেছেন অফিসের কাজে পাটনায়, বড়ঠাকুর ক'দিনের জন্য দেশে গেছেন, বাড়িতে একটি পুরুষ মানুষ নেই, আর এই বিপদ।

তূষ্ণীভাবে ছাড়িয়া জ্যোতির্ময়ী এতক্ষণে কথা কহেন—কী হয়েছে?

কাঞ্চন কাল রাত থেকে বাড়ি আসেনি বৌমা। বায়োস্কোপ দেখব বলে বেরলো—রাত তখন ন'টা। খেতে বললাম, বললে—'ক্ষিদে নেই'। ঘরে খাবার ঢাকা থাকল, ঠাকুর দুয়োর খুলে দেবে জানি, তাই নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমিয়েছি সবাই। সকালে উঠে দেখি যেমন খাবার তেমনি ঢাকা পড়ে, ছেলে বাড়ি আসেনি। এতখানি বেলা অবধি দেখলাম—আর তো মনকে প্রবোধ দিয়ে রাখতে পারছি না মা। যে ভয়ঙ্কর রাস্তা এখনকার। ছোটগিন্নির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া আরও কিছু বলিবার পূর্বেই জ্যোতির্ময়ী সহসা এতক্ষণকার কষ্টার্জিত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠেন—সে সব কিছু নয় ছোট মাসিমা, সর্বনাশই হয়েছে বোধ হয়— নান্তি হতচ্ছাড়িকেও দেখতে পাচ্ছি না সকাল থেকে।

বাকি খাজনা

এমন একটা ভবিষ্যযুক্ত দেশ নয় যে স্টেশনে নেমেই চোখে পড়বে আরোহী প্রার্থী অপেক্ষামান ট্যাক্সির সারি। এতখানি আশা করেও আসে নি এরা—সোমেন আর সীতা।

তাই বলে এতটাও আশঙ্কা করে নি যে যানবাহনজাতীয় কিছুই থাকবে না, একখানি চাকরও চিহ্নমাত্র নয়। স্টেশন মাস্টারের খুপরিখানার সামনের এই গজ কয়েক টিনের শেড্‌টার নীচে জিনিসপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে অসহায় দৃষ্টি মেলে অদূরে চোখের সামনে মাঠ আর জঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পেলে না বেচারারা। ট্রেন থেকে যে কয়েকজন লোক নেমেছিল ওদের সঙ্গে, বলা বাহুল্য ওদের মতো সম্ভ্রান্ত চেহারা নয়, তারা কাঁটাতারের বেড়া টপ্‌কে ওই গাছপালার মধ্যে কখন যে অদৃশ্য হয়ে গেল কে জানে। একমেবাদ্বিতীয়ম কুলিটাকেও আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

একটা আস্তানা মিলবে এখানে? মেলা সম্ভব?

টাইম্‌টেবল থেকে একটা অজ্ঞাত অপরিচিত স্টেশনের নাম খুঁজে নিয়ে টিকেট কিনে ট্রেনে চড়ে বসবার মতো ছেলেমানুষীর গুরুত্বটা এতক্ষণে যেন উপলব্ধি হয় সোমেনের। বাড়ি থেকে যখন পালিয়ে এসেছিল—তখন কেবলমাত্র পালিয়ে আসার চিন্তাটাই ছিল মুখ্য, অবস্থাটা কী রকম হবে এ চিন্তা ছিল গৌণ। 'পকেটে টাকা থাকলেই যাহোক একটা উপায় হয়—এমনি একটা ধারণা ঝাপ্‌সাভাবে ছড়িয়ে ছিল মনের মধ্যে, ট্রেনে এসেছে বাষ্পের বেগে, তাই চিন্তাটাও তেমন দানা বাঁধতে পায় নি।

'না হয় একটু অসুবিধে হবে, না হয় একটু কষ্ট'—এই তো? কিন্তু কষ্ট আর অসুবিধের ভয়ে কাতর হবার মতো বিলাসিতা এখন কি আর মানায় ওদের? স্টেশনের চেহারা দেখে কিন্তু ধারণার চেহারাটা বদলাচ্ছে। পকেটের টাকার বাহুল্য ভরসার চাইতে ভয়ই যোগান দিচ্ছে যেন।

—আসা তো গেল, আস্তানা জোটানো সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না—

এক্ষেত্রে সীতাকেই সাহস দেখাতে হয়, তাই সহজ গলায় বলবার চেষ্টা করে—

জিজ্ঞেস করে দেখ না স্টেশন মাস্টারকে, একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না? গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে কিছু উপায় হবেই। নেহাত না হয়—গাছতলা তো কেউ নেয় নি কেড়ে?

হাসবার চেষ্টা করে সীতা।

—তাও কেড়ে নিতে পারে। দেশে আর কিছু না থাক, 'থানা-পুলিস' গোছের কিছু একটা অবশ্যই আছে।

—বাঃ থানা-পুলিসের কথা উঠছে কেন? আমরা চোর না কি?

সোমেন গম্ভীরভাবে একটু হাসে—নয়, তার প্রমাণ কী? তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, এটা বিশ্বাস করাতে হলেও তো কলকাতার আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে যেতে হবে।

—ও আবার কি কথার ছিরি। তার মানে?

সীতা ভুরু কুঁচকোয়।

—তার মানে পৃথিবীর প্রত্যেকটি ব্যক্তি অবিশ্বাসের প্রস্তুতি নিয়েই চড়ে বেড়াচ্ছে। 'কামিনী আর কাঞ্চন' এই দুটো বস্তুর সঙ্গে 'গাছতলায় বাস'টা কি ঠিক খাপ্ খাওয়াতে পারবে কেউ? উঁহু। পুলিস লেলিয়ে লেলিয়ে দেবে। দেখছি নেহাতই ছেলেমানুষী হয়েছে কাজটা।

সীতা তীক্ষ্নস্বরে বলে—তবে তুমি কী চাও? ফিরতি ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যেতে?

—এখনি অতটা নয়, তবে—মনে হচ্ছে বিপদে পড়তে হবে হয় তো।

—বিপদ!

সীতা শান্ত স্থির দৃষ্টিতে সোমেনের দিকে তাকালো— এখনো বিপদের ভয় করো তুমি?

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল সোমেন।

ক্ষণপূর্বের অসতর্ক চাপল্য অতর্কিত আঘাতে মাথা হেঁট করল যেন। এতক্ষণে যেন খেয়াল হল কেন পালিয়ে এসেছে এখানে।

কী লজ্জা। কী লজ্জা। রহস্যালাপের অভ্যাসটা এখনও কেন ভুলে যায় নি সেমেন!

স্যুটকেসটার ওপর চুপ করে বসে থাকে দুজনে।

মনে হচ্ছে এমনি করেই বুঝি বসে থাকবে যুগান্তর ধরে। বুকে চাপানো আছে অনন্তকালের পাষাণভার, চোখের দৃষ্টিতে অনন্তকালের নিরুপায় প্রশ্ন—কোথায় গেল' 'কেন গেল?'

নাঃ, ওদের আর হাসবার অধিকার নেই, অধিকার নেই হালকা রহস্যালাপের। আনন্দের জগত থেকে নির্বাসন হয়েছে ওদের। চিরদিনের প্রাণপ্রাচুর্যে চঞ্চল মুখর স্বভাব, অসতর্ক মুহূর্তের পরেই তাই এমনি চাবুক খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

শ্যামলী নেই, ওরা রইল, এ অপরাধের কি শেষ আছে?

একমাত্র সন্তান শ্যামলী।

সতেরোটি বছরের শরৎ-বসন্তে গড়া ফুটন্ত ফুল। সে ফুল কী অদ্ভুতভাবে ঝলসে শুকিয়ে গেল। পেন্সিলের ছুরিতে হাত কেটে কেউ কখনও মারা যায়? কাউকে মারা যেতে শুনেছে কেউ? কোথায় ছিল এত বিষ, যে শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়ে নীলে নীল করে দিল তাজা রক্তের স্রোত। স্তব্ধ করে দিল তার গতি।

কিন্তু সীতা কি সত্যি বুঝতে পেরেছে, শ্যামলী মারা গেছে!

এই সমস্ত বই খাতা পেন্সিল কলম পড়ে থাকবে শ্যামলীর, সেই ছুরিটাও থাকবে অবিকৃত, শুধু শ্যামলীরই চিহ্নমাত্র থাকবে না ? এই বিরাট পৃথিবীর কোনও একটু কোণেও নয়? ..... আকাশে নয়, মাটিতে নয়, জলে নয়, নিমেষের জন্য একটু ছায়াও পড়বে না কোথাও?

অসংখ্যা শাড়ি ব্লাউস আর অজস্র উপকরণে ঠাসা প্রকাণ্ড আলমারিটার দু'খানা কপাটই হাট করে খুলে ধরে সীতা যখন বোকার মতো তাকিয়ে থাকে এক এক সময়, ও কি বুঝতে পারে এগুলো কোনওদিন পরবে না শ্যামলী? খুলবে না স্নো আর সেন্টের শিশি?

বোধহয় বুঝতে পারে নি, তাই সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে অবাক্ করে দিয়ে অমন চুপচাপ ছিল এতদিন। নাকি তারাই বুঝতে দেয় নি? আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সীতার বুদ্ধিবৃত্তি অনুভূতিকে।

শ্যামলী চলে যাবার ছত্রিশ দিন পরে অজ্ঞান অপরিচিত এই অদ্ভুত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে, পড়ন্তবেলার চিতা-সাজানো আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এতদিনে কি নিশ্চিত হল সীতা, শ্যামলী সত্যিই মারা গেছে। কাঁদা উচিত ওর! নিঃশব্দ অশ্রুজল ফেলে নয়, তীব্র আর্তনাদ করে।

চমকে উঠল সোমেন। সীতার কান্না। চিৎকার করে কাঁদছে সীতা। সে চিৎকার এত ধারালো, এত তীব্র।

এই অদ্ভুত আর্তনাদ কোথায় লুকানো ছিল সীতার কণ্ঠের মধ্যে? হঠাৎ কি পাগল হয়ে গেল সীতা? কই, এতদিনে তো এমন করে নি একবারও। ওর এই কান্নার অভাবটাই কি কম পীড়া দিয়েছে হিতৈষী আত্মীয় বন্ধুদের। একমাত্র সন্তান হারিয়ে যে মেয়েমানুষ চুপ করে বসে থাকে, অভ্যাগতদের অভ্যর্থনাও করতে ছাড়ে না, কুশলপ্রশ্ন করে তাদের, শ্যামলীর কথা বাদে আর যত অবান্তর কথা আছে সংসারে, বেছে বেছে সেই কথাগুলোই কয়—আড়ালে তার সমালোচনায় পঞ্চমুখ হবে না, এমন হৃদয়হীন পাষণ্ড তো আত্মীয়রা নয়।

একটু অস্বস্তি সোমেনেরই কি না হয়েছে? কাঁদাই তো উচিত ছিল সীতার? সেইটাই সঙ্গত। পাঁচজনের মুখ চাপা দেওয়া যায় না।

দুর্ঘটনার রাত্রে—খবর পেয়ে যখন আত্মীয়-আত্মীয়ার দল নিশ্চিন্ত নিদ্রার আরাম তুচ্ছ করে হুড়মুড় করে এসে পড়লেন ওদের বাড়িতে, আর সীতাকে জাপটে ধরে ওর চোখেমুখে জল, আর মাথায় বাতাস দেবার জন্যে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিলেন, তখন সুকৌশলে তাঁদের নিয়ে শামলীর চুলগুলো নিয়ে আঁচড়াতে বসা সীতার পক্ষে বড্ড বেশি বেমানান হয় নি কি? মার হাতে কক্‌খনো কারোর হাতে চুল বাঁধতে ভালোবাসত না শ্যামলী, এটা না হয় সীতাই জানে, কিন্তু যাঁরা শ্যামলীকে সাজিয়ে পাঠিয়ে দেবেন বলে স্নো সেন্ট চিরুনি পাউডার হাতে করে বসে রুইলেন, তাঁরা তো জানতেন না!

'ধন্যি শক্ত মেয়েমানুষ'—এ মন্তব্য তখন অস্ফুট থেকে স্ফুটতর যদি হয়েই থাকে, দোষ দেওয়া যায় না কাউকে।

যাই হোক—সীতা তার কর্তব্য পালন না করুক, আর পাঁচজনে তাঁদের কর্তব্য পালন না করে ছাড়বেন কেন? তাই—সীতা মূর্ছা না গেলেও তার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে সচেতন করে ছাড়লেন তাঁরা, অধৈর্য না হলেও বুকে জাপটে ধরে— অধৈর্য হয়ো না মা, সোমেনের মুখ চাও, পৃথিবীর নিয়মই এই, অধৈর্য হলে চলবে কেন মা, কী করবে?

সবই কর্মফল—" ইত্যাদি ভালো ভালো উপদেশ দিতে শুরু করলেন।

অতঃপর সেই চলেছে ছত্রিশ দিন ধরে।

কর্মফলের লীলাকীর্তন।

শ্যামলীর এই অসঙ্গত মৃত্যুটা যে বিধাতার হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা নয়, ভগবানের অন্যায় অবিচার নয়, শয়তানের ক্রুর হিংসা নয়, 'দৈব' নামক কুৎসিত খেয়ালি লোকটার জঘন্যতম খেয়াল নয়, কেবলমাত্র সীতার "কর্মফল" এই কথাটি বুঝিয়ে ছাড়বার জন্যে দিনের পর দিন বেড়াতে আসছেন তাঁরা নিজেদের কাজের ক্ষতি করে। গাঁটের পয়সা খরচ করে গাড়িভাড়া দিয়েও আসছেন। ফেরার সময় সোমেনের গাড়িই পৌঁছে দেবে তাঁদেরকে। দেবে না-ই বা কোন্ মুখে? তাঁরা এতটা ভদ্রতা করছেন, আর এটুকু পারবে না সোমেন?

সংসারে যে এত আত্মীয় এত হিতৈষী, এতো সমব্যথী ছিল তাদের একথা কী কোনওদিন জানত এরা? যারা জীবনে কোনওদিন ছায়া মাড়ায় নি ওদের পায়ের ধুলো দেয় নি ওদের বাড়ি, 'বড়লোক' বলে নাক কুঁচকেছে, তারাও ছুটে আসছে মনের গলদ কাটিয়ে। এদের সোনা রুপো আর ঝকঝকে গাড়ি বাড়ির জৌলুস আজ আর ম্লান করতে পারছে না তাঁদের। এখন আর পিঠে হাত বুলিয়ে দেবার নির্মল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে চান না কেউ।

'আহা!' 'আহা!' সমবেদনায় মুখর হয়ে উঠেছে প্রত্যেকের মুখ।

এতদিন সুখ সৌভাগ্য আর স্বভাবগর্বে ঠিকরে বেড়াত সীতা, এইবার আয়ত্তে পাওয়া গেছে তাকে।

"মানুষের সুখ পদ্মপত্রে জল বই তো নয়।"

"এই তো সবই গেল, আর কি রইল বলো?—কথায় বলে 'একসন্তান'। অনেক জন্মের মহাপাপ না থাকলে এমন হয় না ভাই।"

"কী করবে বলো মা, যা করে এসেছ তার ফল ভুগতে হবে তো?"

"সবই প্রাক্তন। দুনিয়ার নিয়ম এই .... আহা।"

প্রত্যেকে এই একই ধরনের কথাগুলো শিখে ফেলল কী করে এইটাই আশ্চর্য। কেউ বাদ যায় না, ছোট বড় সবাই ওই বড় বড় কথা বলে।

শুধুই কি আত্মীয়? ঘুঁটেওয়ালি, গয়লানী ও বাড়ির রাঁধুনি, পাশের বাড়ির ঝি, সবাই আসছে সীতার পিঠে হাত বুলোতে। আসছে 'আহা' করতে। শ্যামলী যেন খুলে নিয়ে গিয়েছে ওর আভিজাত্যের বর্মখানা। অবিশ্যি ভালো ভেবেই আসছে তারা। একমাত্র সন্তানহারা জননীকে সান্তনা দিতে আসবে না? সমাজ, গোষ্ঠী, মনুষ্যত্ব—এসব শব্দ তবে আছে কেন?

সীতা যদি ওদের মহানুভূতিতে বিগলিত না হতে পারে, কাঠের পুতুলের মতো বসে থাকে, না হয় তো অভ্যাগতদের চা-জলখাবারের যোগাড় করতে বসে, সে কি তাঁদের দোষ? সীতার নির্জলা চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁদের চোখের জল শুকিয়ে যেতে বাধ্য হয় অবিশ্যি, তবে বাংলাভাষায় অনেক ভালো ভালো বাক্য আছে, আছে অনেক সদুপদেশ বাণী, তাই রক্ষা।

কাঁদাতে যদি নেহাতই না পারা যায় সীতাকে, সীতার পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির বোঝা সম্বন্ধে অবহিত করানো তো যাবে। দেওয়া যাবে তত্ত্বজ্ঞান। এমনিতে সীতা 'আহার নিদ্রা ত্যাগ'

করবার সংকল্প করত কি না ঈশ্বর জানেন, কিন্তু না করে উপায় কী? ভোর থেকে রাত অবধি কেউ না কেউ তো উপস্থিত আছেনই, সীতাকে 'একটু কিছু' মুখে দেবার জন্যে অনুরোধ উপরোধ করতে।

এক ফোঁটা সরবৎ নিয়ে কেউ যদি সাধাসাধি করতে থাকে, জানাতে থাকে করুণ মিনতি, 'এটুকু গলায় না ঢাললে শুকিয়ে নির্ঘাত মারা যাবে সীতা' বলে আক্ষেপ করতে থাকে, কোন্ মুখে আর তাদের সামনে ভাত ডাল খাবার বায়না ধরবে সীতা? কোন্ লজ্জায় বলবে একটু চায়ের অভাবে মাথার যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছে না সে?

নিদ্রার সময় আছেন জেঠতুতো খুড়শাশুড়ি। দুঃসংবাদের বার্তা পেয়ে যিনি দেশ থেকে ছুটে এসেছেন একটি ক্ষ্যাপাটে ছেলে, দুটি আইবুড়ো মেয়ে, বিধবা বৌ, আর গুটি তিন-চার নাতি নাতনি নিয়ে। একেবারে নিকট আত্মীয় বলেই ফেলে যেতে পারছেন না।

সীতাকে কাছে নিয়ে শোবার ভার নিয়েছেন তিনি।

অদ্ভুত অধ্যবসায় ভদ্রমহিলার, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। ঘুমকে এমন কণ্ট্রোল রাখা কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। প্রায় সারারাত ধরে তিনি বোঝাতে থাকেন সীতাকে ইহলোক পরলোক, জন্ম-জন্মান্তর, লীলাময়ের লীলা, আর ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার নিগূঢ় তত্ত্ব। সাড়া না পেলেই গায়ে হাত বুলিয়ে করুণকণ্ঠে শুধান—বৌমা, ঘুমিয়ে পড়লে না কি মা? আমার সেই মামাতো ভাইঝির কথা বলছিলাম, তিন মাসের মধ্যে স্বামী গেল, বাপ গেল, জোয়ান জোয়ান দুই ছেলে গেল, 'ঘরণি গিন্নি' মেয়েটা দুম করে বিধবা হল। এখন আমার ভাইঝি একরকম ভিক্ষে করেই দিন কাটাচ্ছে। অথচ কী সুখ ঐশ্বয্যি ছিল—

এ রকম ভালো ভালো অনেক উদাহরণ আছে তাঁর স্টকে। সুবিধে পেলেই আমদানি করেন। গায়ে হাত দেবার পরও যদি সাড়া না মেলে, ঠেলা দিলেও ঘুম না ভাঙে নিতান্তই তখন হাই তুলতে হয় তাঁকে।......ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা, ঘুমই ওষুধ, সর্বসন্তাপরিণী নিদ্রা। তা বৌমার মনটা খুব ভালো তাই, নইলে আমার কেষ্ট যেতে ছ'মাস চোখে পাতায় এক করতে পারি নি। ঠায় বসে রাত কাটিয়েছি—বলে অবশেষে চোখে পাতায় এক করেন।

এই সন্দেহ আবেষ্টন থেকে মাথা তুলে কি করে—কোন্ লজ্জার মাথা খেয়ে বলবে সীতা, সোমেনের কাছে না শুলে তার ঘুম আসে না। শ্যামলীকে হারিয়েও না। উনিশ বছরের অভ্যাস, এত বড় আছাড় খেয়েও গুঁড়ো হয়ে যায় নি।

হিসেব করে দেখল সীতা—শ্যামলী যাবার পর সোমেনের সঙ্গে ওর প্রথম দেখা হয়েছে হাওড়া স্টেশনে। সত্যিকার দেখা। পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা যে কীভাবে কখন করতে পেরেছিল, এলোমেলোভাবে গুছিয়ে নিয়েছিল স্যুটকেস দুটো, নিজেরই সেটা স্মরণ নেই ভালো করে। শুধু অনবরত মনের মধ্যে ধ্বনি উঠেছে... পালাতে হবে—পালাতে হবে—যেখানে হোক। যে-কোনো চুলোয়! একটি বার সহজ ভাবে হাঁফ ছাড়তে পারবে যেখানে। যেখানে একটিবার শুধু পাশাপাশি বসতে পারবে দুজনে। নিবিড় সান্নিধ্যে সোমেনের কোলে একটু মাথা রাখতে পারবে সীতা। তাই কাউকে না জানিয়ে গভীর রাত্রের ট্রেনে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা। জানতে পারলে কেউ দয়া করে সঙ্গ নিতে চাইবে কি না কে বলতে পারে।

স্টেশনে এসে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সীতা। অস্বাভাবিক ভাবেই হেসে উঠে বলেছিল—খুব ঠকিয়ে আসা হল সবাইকে, কী বলো?

—ঠকিয়ে ? — অবাক্ হয়েছিল সোমেন।

—তা নয় তো কি? সকাল বেলা এসে সকলে দেখবে পাখি পলাতক, কি মজা।

—খুড়িমাকে সুদ্ধু না জানিয়ে আসাটা—কেমন হল কে জানে? সোমেন বলেছিল একথা। এতটা অ্যাডভেঞ্চার বোধহয় তার ঠিক ধাতস্থ হচ্ছিল না।

—যা হল, তা হল। উঃ বাবা, বাঁচা গেছে। কর্মফলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল তো তবু।

ট্রেনে চড়েও সারা পথ নানান ছেলেমানুষী করল সীতা, ডালমুট কিনে খেল কোনও একটা স্টেশনে, খেল মাটির ভাঁড়ের অখাদ্য চা।

সোমেন কি ক্ষুব্ধ হয়েছিল তাতে?

না।

ক্ষতির পরিমাণ যতই প্রবল হোক, যত তীব্র হোক্ বেদনা, পুরুষ চায় তাকে চাপা দিতে, চায় বিস্মৃত হতে। বরং ক্ষতিকে সহ্য করে নিতে পারে, সহ্য করতে পারে না শোককে। আর পুরুষের কাছে ভারাক্রান্ত নারী-হৃদয়ের চাইতে ভয়াবহ বস্তু আর কি আছে? তাই ভেবেছিল বোধহয় সামলাতে পেরেছে সীতা। ভাবতে পারে নি আচমকা এমনি বুকফাটা আর্তনাদে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। হারিয়ে ফেলবে নিজেকে।

থামাবার চেষ্টা বৃথা হল। আরও বেড়ে যাচ্ছে তাতে, উথলে উঠছে উত্তাল সমুদ্র। ছত্রিশ দিন পরে সত্যি করে অনুভব করল সোমেন, শ্যামলী মারা গেছে।

কিন্তু—এ কী!...... কোথায় ছিল এত লোক।

এই জনবিরল প্রান্তরের মাঝখানে মুহূর্তের মধ্যে কী করে জমে উঠল জনতা?

মাটি ফুঁড়ে উঠল না কী? কুলিকামিন, ঝাড়ুদার, স্টেশন মাস্টার ফায়ারম্যান, সিগন্যালার—কে নয়?

আশ্চর্য।

কিন্তু এতগুলো কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে কী করে বরদাস্ত করবে সোমেন নিজের কোলের উপর সীতার এলোচুল ছড়ানো মাথাটাকে। কী করবে নিষ্ঠুরের মতো ঠেলে তুলে তাকে বসিয়ে না দিয়ে। স্টেশন মাস্টার লোকটি বয়স্থ। দায়িত্বটাও তাঁরই বেশি। কাজেই সোমেনকে ডেকে প্রশ্ন না করে ছাড়েন না তিনি। সোমেন প্রশ্নের উত্তরে হতাশ প্রশ্নই করে—নেহাতই শুনতে চান কারণটা ?

—দেখুন, আবার তো একটা ডিউটি আছে। কিছু যদি মনে না করেন.... আপনার স্ত্রী বোধহয়? ইয়ে—মাথার একটু দোষ আছে মনে হচ্ছে ঠিক না?

সোমেনের ইচ্ছা হল বলে—হ্যাঁ তাই। কিন্তু অসুবিধা তাতে বাড়বে বই কমবে কি? অগত্যা খুলেই বলে কারণটা, বলতে বাধ্য হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতিতে শিউরে গলে পড়েন ভদ্রলোক।

—অ্যাঁ বলেন কি। ইস! আর মা লক্ষ্মীকে এইভাবে—উঃ।..... এখানে উঠবেন কোথায়?

—কিছুই স্থির করে আসি নি, হঠাৎ খেয়ালের বশে—

—বিলক্ষণ, তা তো হবেই। বলেন কি, একমাত্র সন্তান? এতে যে পাগল হয়ে যায় মানুষ। তা বেশ চলুন এই গরিবের বাসায়, তারপর একটা ব্যবস্থা আমি করে দেব। চলুন—চলুন—

সোমেন বিব্রতভাবে বলে—আবার আপনার বাসাটায় উঠে ব্যস্ত করা। কাইন্ডলি যদি তাড়াতাড়িই একটু অন্য কোনও ব্যবস্থা—মানে, টাকাকড়ির জন্যে আটকাবে না—

—সে বুঝতে পেরেছি মশাই, চেহারা দেখেই বুঝতে পারা যায়, কিন্তু তা বলে—এই বিদেশে বিভূঁয়ে বাঙালি আপনি, এই দুঃসময়ে অমনি ছেড়ে দিতে পারি। আমরাও তো ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি মশাই। আচ্ছা আমিই গিয়ে বলছি মা লক্ষ্মীকে—

বৃদ্ধ ভদ্রলোকে এগিয়ে যান সীতার দিকে, যেখানে সীতা কান্না থামিয়ে অবাক হয়ে শুনছিল জনৈক ঝাড়ুধারিণী হরিজন মহিলার অপূর্ব বাংলা ভাষা।

—সংসাঁর মে হরদম ওহি তো এক ঘটনা হোচ্ছে দিদি, আসছে—ফিন্ যাচ্ছে। ভাগমনিকো কুচ্ছু দোষ না আছে, এত তুমকো করমফল। ও হি জনম মে তুম—স্টেশন মাস্টার মশাইয়ের আগমনে তার বাক্যস্রোতে বাধা পড়ে।

করুণাবিগলিত কণ্ঠে মস্টোর মশাই বলেন—বুড়োছেলের কথাটি যে রাখতে হবে মা লক্ষ্মী—

সীতা আরও অবাক হয়ে তাকায়—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ মা, তোমাকেই বলতে এসেছি। শুনলাম সমস্তই। কি আর করবে বলো মা, সবই—

—জানি, সবই আমার কর্মফল—সীতা শান্ত গলায় বলে—ওর হাত এড়াবার জো নেই, তাও বুঝতে পারছি এবার। এখন শুধু দয়া করে বলতে পারেন কলকাতায় ফেরবার নেক্স্ট্ ট্রেন কখন?

বেহায়া

তিথি চলছে আঁধারের, চাঁদের আলোর দাক্ষিণ্য নেই। আকাশ থেকে এসে পড়া কোটি কোটি যোজন দূরবর্তী নক্ষত্রদের আলোটুকুই ভরসা করে দাওয়ার ধারে ভাত খেতে বসেছে অটল ঘোষ।

অনর্থক কেরোসিন খরচা করে 'লম্প' জ্বেলে খেতে বসার বিলাসিতার বিশেষ বিরোধী অটল। মানদা একটু খুঁতখুত করে, বলে, আঁদারের মধ্যে মুখে গেরাস তোলা। পোকামাকড় কিছু ঢুকে গেলে?

অটল বলে, পোকামাকড়ই বা ঢুকতে যাবে কেন? ভাত বেড়েছিস তো তুই, তোর তো আর আমার মতো চক্ষে ছানি পড়ে নাই।

তারপর আবার বুঝ দিতে বলে, দু'চারটে দিন পরেই তো আবার জ্যোছ্ছোনার দিন আসবে গো।

তিনপুরুষের ভারী কাঁঠালকাঠের পিঁড়িখানা আর টানতে পারে না বলে একখানা খুরসি পিঁড়ির ওপর হাঁটু উঁচু করে উবু হয়ে বসেছে অটল। এইভাবেই বসে। অথচ অটলের ঠাকুর্দা অর্জুন ঘোষ আশি বছর বয়েস অবধি ওই পিঁড়িটায় বসে ভাত খেয়ে গেছে, আর খেয়ে উঠে চলে যাবার আগে শক্‌ড়ি হাত মুঠিয়ে বাঁহাতে পিঁড়িখানাকে তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দেয়ালে ঠেসিয়ে রেখে তবে ঘাটে নেমেছে আঁচাতে।

ঠাকুর্দার সেই ভঙ্গিটা যেন চোখ বুঝলেই দেখতে পায় অটল। কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়িখানার মতোই চওড়া মজবুত আর তেল-তেল পিঠখানার রংটাও ছিল তেমনি।

অটলের দেহে সে ঐতিহ্যের ফিটেফোঁটাও নেই। ঠার্কুদার বয়েস পেতে অটলের এখনও এককুড়ি বছর বাকি, তবু এখনি চোখে 'সর' পড়েছে ; কানে তালা পড়ে আসছে।

হাঁটু উঁচু করে ভিন্ন বাবু গেড়ে বসতে পারে না।

এ অবস্থা ঘটেছে অটলের অবশ্য কালের গুণে, আর ভাগ্যের দোষে। নইলে কাঠামোখানায় এখনও বংশের ধারার ছাপ মেলে। তবে হাড়সার, এই যা!

বাপ-ঠাকুর্দা দুধ দই ঘি-মাখনের ব্যাবসা করে গেছে বটে, তবে নিজেদের জন্যেও তার থেকে কিছুটা বরাদ্দ রেখেছে। ঠাকুর্দার সেই বড় একটা জামবাটি ভর্তি দু'হাতে মুখে তুলে খাওয়ার দৃশ্যটাও এখানও চোখে ভাসে। ... বাপের দৈনন্দিনের ছবিটার থেকে ঠাকুর্দারটাই বেশি স্পষ্ট, কারণ ঠাকুর্দার সময়ে অটলের শৈশব-বাল্য। প্রতিক্ষণ ঠার্কুদা'র সঙ্গে সঙ্গে। বাপের আমলে নিজেও ব্যবসায় জুতে গেছে, সর্বদা অত দেখার সুযোগ হত না। ..... তারপর তো ক্রমশই কালের বদল ঘটেছে।

কালের গুণে গরুতে দুধ ছাড়ে না, পুকুরে মাছ বাড়ে না। গাছের ফলে পূর্বের স্বাদ মেলে না। গরুর খাদ্যের দর আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা চালিয়ে চলেছে, গরু চরবার মাঠগুলোয় কলকারখানার ইমারৎ বসছে। ..... গোয়াল ক্রমেই হালকা হতে বসেছিল, তবু—ব্যাবসাটা তো একেবারে লাটে উঠে যায়নি। এখন গেছে, ভাগ্যের দোষে।

এখন শূন্য গোশালটা অটলের হাতবদল হয়ে সাত্যকীবাবুর পোলট্রি হয়েছে। খুব রমরমা। ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম চালান যায় রাণাঘাট লোক্যাল ধরতে।

গোশালটা যেদিন বেচে দিতে হয়েছিল, সেদিন অটল উঠোনে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিল, সাতপুরুষের জাত-ব্যাবসার 'লক্ষ্মীর স্থান' মুরগি চরাতে দিয়ে এলাম খোকার মা।

মানদা মন শক্ত করে বলেছিল, আবার হবে। সব্বস্বান্ত হয়ে নড়তেচো, বেফল যাবে? ধর্ম নাই? ভগমান নাই? লোকের চকক্রান্তই বড় হবে?

কিন্তু ক্রমশই যেন বিশ্বাসের মুল শিথিল হয়ে আসছে মানদার। 'ধর্ম আছে, ভগবান আছে—এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

এই কিছুদিন আগেও মানদা অটলের ভাতের পাতে একহাতা দুধ জোর করে ঢেলে দিয়েছে, বলেছে, আপিং খাওয়া শরীল, একছিট্টেখানি দুদ পেটে না পড়লে টেঁকবে কিসে?

কিন্তু এখন আর সেটুকুও জোটে না।

ঝড়তি-পড়তি যে দুটো গরু গোশালা ছেড়ে বাসবাড়ির উঠোনের চালার তলায় আশ্রয় পেয়েছিল, উচিতমতো যত্নের অভাবে তাদের দুধের সম্ভার ক্রমেই শূন্যের অঙ্কে পৌঁছচ্ছে অথচ এখনও তারাই এই সংসারের অন্নদাত্রী।

তবু তো সংসারের আসল খাওয়ার মুখটা—

কথাটা মনে পড়তেই অটল হাতে তোলা ভাতের গ্রাসটা ভাতের থালার ওপরই রাখল।

তিনপুরুষের পিঁড়িখানা বাতিল হয়েছে বটে, কিন্তু তিনপুরুষের এই ভাত খাওয়া পাথরখানা এখন চলছে।..... ঠাকুর্দা অর্জুন ঘোষ শেষজীবনে একবার বারোদোলের মেলায় গিয়ে নিজের জন্যে গাবদাগোবদা অথচ প্লেন পালিশ এই কানাউঁচু পাথরখানা কিনে এনেছিল। বলেছিল, একজন বলতেছেলো, পাতরে ভাত খেলে প্রেরমাই বাড়ে। তো নে এলাম একখান। চেরজন্মো তো কাঁসা-পেতলেই খেয়ে আসতেচি, দেকি যদি পাতরে খেয়ে আর কিচুদিন 'প্রেমাই' টানতে পারি। .... অ্যাকটা বৈ তো ব্যাটা নাই, য্যাদ্দিন খাটি ত্যাদ্দিনই ব্যাবসার লাভ।.....

আর বলেছিল, চাকদার এই ঘোষেদের সাতপুরুষ যাবৎ অ্যাক ব্যাটার বংশ, মেয়ে হয় গুচ্ছির, ছেলে অ্যাক বৈ দুই না। কে জানে কোন ভগমানের নিদ্দেশ।.... তো ওই একজনাকেই

তো খেটেপিটে ব্যাবসা রখ্যে করতে হবে। .... এই পাতর খানা হাত থে' ফেলে না ভাঙলে পুরুষানুক্রম চলবে। ঘরের মেয়েছেলেদের হাত সাবধানের দরকার, বংশধরেদের পরমায়ু বেশি হওয়া জরুরি। ... অর্জুন ঘোষেদের বিশ্বাসের জগৎ এইরকমই ছিল।

বালক অটল বলেছিল, তুমি মরে গেলে, আমি এই থালাটায় ভাত খাব ঠাকুর্দা?

আহা আমার পর তোর বাবা খাবে, তা'পর তুই। আর তা'পর তোর ছেলে, তা'পর তার ছেলে। .... হেসে উঠেছিল হা-হা করে।

তা 'ওই' এক ব্যাটার নির্দেশের বিরুদ্ধে ভগবানের বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে অনেক নালিশ-ফরিদ মানতটানত করেছিল অটলের ঠাকুমা, পিসি, মা এবং পরে মানদাও। কিন্তু কী এক রহস্য, অটল ঘোষ নিজেও বাপ অঘোর ঘোষের এক ব্যাটা এবং অটল ঘোষেরও—

* * *

প্রাণটা হাহাকার করে উঠল অটলের। সোম্সারের আসল মুকটা নাই অ্যাখোন, কিন্তু আমার পেটের রাক্কোসটা তো মরতেচে না।...এই পাতরে কত সমারোহো করে পাঁচ বেন্নুন সাজিয়ে খেয়ে গেলেন আগের মানুষরা, আর এই লক্ষ্মীছাড়া অটল ঘোষ? পান্তো আর কাঁচালঙ্কা সার, তবু খাওয়ায় বেরাগ বেতরাগ তো আসতেচে না।..... কান যাচ্চে চোক যাচ্চে শরীলের ক্ষ্যামোতা যাচ্চে, অথচো রাবণের চিতুর অগ্নিটা যাচ্চে না।

তা' সত্যি সংসারে যত দুঃখ-দুর্দশা বাড়ছে, অটলের পেটের জ্বালাটাও যেন ততই বাড়ছে। ... ভাত চাইতে মাথা কাটা যায়, তবু এদিক ওদিক তাকিয়ে অমলের বৌটা ধারেকাছে আছে কিনা দেখে নিয়ে মানদার দিকে কেমন বোকাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আর দুডো হবা নাকি?

আর অমলের বৌ মালতী ঘরের মধ্যে দাঁতে দাঁত পিষে বলে, পিচাশ! পিচাশ! এখনো অ্যাতো পেটের জ্বালা! হায়া নাই, লজ্জা নাই।

আজও মালতী অটলের জলসুদ্ধু পান্তাভাত মুখে তোলার শপ্‌শপ্ আওয়াজ শুনতে পেয়ে মনে মনে বলছিল, ওই 'পাতর' আর বন্‌শের ধারার জন্যি রেকে যাবে না তুমি বুড়ো। নিজিই খেয়ে খেয়ে ক্ষয় করে দে' যাবে। চুলোয় যাক্। মালতীর জীবনে সব নতুন হবে।

তারপর আচ্ছন্নের মতো আর এক স্বপ্ন দেখতে থাকে মালতী।.... ঝকঝকে খাগড়াই কাঁসার নতুন থালায় এক শিশুর অন্নপ্রাশনের ভাত বাড়া হয়েছে, লোক-জনের ভিড়ে ভিড়ারণ্য, মালতী সাজানো-গোজানো সেই ছেলেটাকে কোলে করে বসেছে, দীর্ঘকায় সুন্দর মানুষটা অসুরের মতো খেটে বেড়াচ্ছে, আর মাঝেমধ্যে এসে হেসে দুটো কথা কয়ে যাচ্ছে। ... বলছে, উঃ! সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলান মনে কর মালতী আরটু হলে তো হয়েই যাচ্ছিলুম, তো নেয্য বিচারটা হল তাই—

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল মালতী।

হঠাৎ অটলের গলায় একটা আর্তস্বর শুনতে পেল মালতী, কে? কে ওখেনে?

হ্যাঁ, প্রায় আর্তস্বরেই চেঁচিয়ে উঠেছিল অটল ঘোষ, যখন উঠোনের ধারে বাতাবিলেবু গাছটার কাছে একটা দীর্ঘ ছায়া দেখতে পেয়েছিল।

কোটি কোটি যোজন দূর থেকে নেমে আসা অনন্তকোটি মৃত আত্মার বিষণ্ণ করুণ দৃষ্টির আলোতেও চিনতে ভুল হয় না, তবু আচমকা ওই ছায়ামূর্তিকে দেখে নিরাপত্তার প্রশ্ন ভুলে

চেঁচিয়ে উঠল, কে? কে ওখেনে?

ছায়ামূর্তি, না প্রেতমূর্তি?

হয়তো প্রেতই, নইলে দ্রুত সরে এসে অটলের ভাত-খাওয়া শক্‌ডি মুখটাই চেপে ধরল কি বলে?

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, কপাটে হুড়কো লাগিয়ে দিয়ে চৈকিতে বসে পড়ে অটল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এ কী সব্বনাশা বুদ্ধি করলি বাপ? বিপদডা বুঝলি না?

ছায়ামূর্তি বিরক্ত গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল, উঃ কত কাণ্ড করে কত কাঠখড় পুড়িয়ে অ্যাকবার জন্মের শোদ দ্যাকা করতে আসলাম। তা' আনন্দ নাই? সর্বনাশ টাকতে বসলে তুমি?

ষাট ষাট!

মানদা ছেলের পিঠে একটু হাত ঠেকিয়ে বলে উঠল জন্মেরশোদ ক্যানো বাপ? বেনোদ উকিল তো বলতেচে, মামলায় জিৎ হবে।

মিথ্যে কথা।

মানদার ছেলে মানদার অজানা-অশ্রুত একটা কদর্য গালাগাল উচ্চারণ করে বলে উঠল শালা, বদমাস! টাকা খাওয়ার যম! ও-পক্ষের ঘুষ খেয়ে মামলা ফাঁসাচ্ছে—

'কে ? কে ওখেনে?' শুনেই মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কাঠের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। অটল যখন ছেলেকে নিয়ে দাওয়া থেকে উঠে এসে ঘরের দরজায় হুড়কো লাগাচ্ছে, তখন ঢুকে এসেছিল তার শ্বশুর-শাশুরির ঘরে, যে ঘরে আজ তিন সন সে পা ফেলেনি।

তিন সন? তা'তিন সনই তো। তদবধিই তো মামলা চলছে।.... কিন্তু এই ঘরটার দোষ কী?..... দোষ কিছু না, আক্রোশ। ছেলেকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে, আর স্বামী-স্ত্রী এক ঘরে শুতে ঢুকছে দেখে বিষ ওঠে মালতীর।

অথচ প্রথম দিনেই তো মানদা কেঁদেকেটে বলেছিল, আমি তোর ঘরে থাকি বৌ।

মালতী অকারণ রূঢ় গলায় বলেছিল, না।

কাঁচা বয়েসের মেয়েছেলে, অ্যাকা থাকাডা ভালো না বৌ।

বৌ উদ্ধত উত্তর দিয়েছিল, ক্যানো? আমার চারিত্তিরে বিশ্বাস নাই?

দুগ্‌গা দুগ্‌গা! ই কি কতা। বলতেচি সোমত্ত মেয়ে হাওয়া-বাতাস, দেবতা-অপোদেবতা, কত দিকে কী! সাবদানডা হওয়া ভালো!

ওসব হাওয়া-বাতাস আপোদেবতা-ফেবতা আমার কিছু করতি পারবো না। যমেও ছোঁবা না আমায়। তুমি তোমার জায়গায় যাও গিয়ে?

এরপর আর কী করবে মানদা?

অথচ মানদা যেই সকল দিকেই কাজকর্ম সেরে পাশের ঘরটায় ঢুকে কপাটটা চেপে দেয়, মালতীর ইচ্ছে করে নোড়া ছুঁড়ে ওই পলকা কাঠের কপাটখানা ভেঙে দু-হাট করে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, তোমরা কী? তোমরা কী? হায়া নাই? নজ্জা নাই? মান্‌ষের রক্ত গায়ে নাই?

তা' মালতীর শ্বশুরের বোধ করি সত্যিই নেই ওসব। তা নইলে মানদা যখন ফিরে এসে বলল, বৌ তো ওর কাচে থাকতে দেল না—

তখন অটলের মধ্যে অত দুঃখেও একটা আহ্লাদের ভাব খেলে গিয়েছিল কী করে?

বলেছিল, না দিলে আর তোর কী দোষ? তোর কোর্তব্য তুই করেচিস। নে চেরকালের জায়গায় শুয়ে পড়।

তাই শুয়ে পড়েছিল।

তাই শুচ্ছে এযাবৎ।

এই তিন বছর কাল মালতী তার নিজের ঘরে একাই থাকে। মামলার বিবরণ নিজে থেকে জিজ্ঞেস করে না, শুধু শ্বশুর-শাশুড়িতে মিলে এক এক দিনের এক এক বিবরণ বলাবলি করে, কান খাড়া করে শুনে নেয়। .. দু'বার সাক্ষী দিতেও যেতে হয়েছে ওই শ্বশুরেরই সঙ্গে, তবু যেন কেমন ছাড়াছাড়া ভাব। মালতীর মনে হয় বুঝি তেমন চেষ্টা করা হচ্ছে না।... মনে মনে বলে, হবার গরজ কী? নিজেদের জেবনটি তো ঠিকই আচে।

ওই ঠিকটাই বোধ করি মালতীর আক্রোশের মূল।

তাই এ ঘরে ঢোকে না।

প্রথম প্রথম মানদা কোনোদিন বলেছে, এ ঘরডায় কী গোলান্যতা পড়ে নাই বৌ?

বৌ বলেছে, না। বলেছে রূঢ় কঠোর ভঙ্গিতে।

মানদা আর কিছু বলেনি, নিজেই সেরে নিয়েছে।

আর সুযোগ পেলেই তার ঠিক জীবনের মূল কেন্দ্রে গিয়ে চুপি চুপি বলেছে, এক দিনের তরে সুকের সুকী দুঃখের দুখী হল নাই। .... শুদু ওনারই বুক ফাটতেচে? আমার ফাটতেচে না? তুই ক'দিন পেইচিস কদিন দেকেচিস? অ্যাঁ? আর মায়ের যে বৎতিরিশ নাড়িছোঁড়া ধন।

সেই বত্রিশ নাড়িছেঁড়া ধন মানদার আজ তিন-তিনটে বছর মিথ্যে খুনের দায়ে হাজতে পড়ে পচছে।

কিন্তু কেন পচছে?

নিরীহ অটল ঘোষের নতুন বিয়ে হওয়া হাল্কা স্ফূর্তিবাজ ছেলেটা, কারো সাতে পাঁচে নেই, হঠাৎ তার ঘাড়ে খুনের দায় এল কেন? কে চাপাল?

কে আর?

চাপাল তারা, যাদের একটা 'হত্যাকারী'র দরকারটা জরুরি ছিল। তা' এরকম দরকার তো থাকেই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসার অপরাধে কোনো 'দাদাকে' তো আর ফাঁসিতে ঝোলানো যায় না? একটা 'হত্যাকারী সমাজবিরোধীকে? সংগ্রহ করে ফেলতে হয়। পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

তা' ব্যাপারটা কিছু নতুন নয়, বছরের পর বছর কেউ কারো ঘানি ঘোরানোর প্রক্সি দিচ্ছে, অথবা মাঝেমধ্যে ফাঁসির মঞ্চে ওঠার প্রক্সি দিচ্ছে, এ তো চিরকেলে ব্যবস্থা। তবে সব কিছুর বাড়বাড়ন্তর যুগে ঘটনা-ফটনাগুলোও বাড়বাড়ন্ত।

অটলের বোকা ছেলেটা যদি স্রেফ কৌতূহলের বসে একটি সংঘর্ষের ধারেকাছে উঁকি দিতে যায়, তাহলে সেই সুবর্ণ সুযোগটা ছাড়বে কেন তারা, যারা একটা প্রক্সিদার খুঁজছে।

একটা কাউকে ঝুলিয়ে ফেলতে পারলেই যে জেরটা মিটে যায়, এ আর কে না জানে?

একটার জন্যে তো দুটোকে ঝোলানো যায় না? পরে প্রকৃত অপরাধীকে পেলেও।

'একের বদলা দশ'এ শ্লোগান তো আর ধর্মক্ষেত্রে পুণ্যক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের দরবারে উঠতে পারে না।

উদ্যোক্তারা অবশ্য ভেবেছিল ব্যাপারটা অতি সহজেই মিটে যাবে, অটল গোয়ালা যে এভাবে দাঁতে মাটি কামড় লড়ে যাবে তা' ভাবেনি।

তাছাড়া খুনের কেসকে গড়িয়ে দেওয়াই তো ধর্মক্ষেত্রের নীতি। গড়াতে গড়াতে ক্রমশই গতিবেগ কমে যায়, এটা নিশ্চিত নিয়ম। অতএব লড়ুয়েদেরও মনোবল কমে যায়।.....

সেই গড়ানোর সীমান্তে এসে প্রতিপক্ষের উকিলকে হাত করে ফেলে ব্যবস্থাটা পাকার মুখে এগিয়ে নিয়ে ফেলেছেন 'দাদা' এবং তাঁর সম্প্রদায়।

শুধু রায় বেরনোর দিনের অপেক্ষা।

অটল ঘোষ কি এই অবস্থায় এসে পৌঁছানোর খবরটার আঁচ পায়নি? পেয়েছে, কিন্তু ব্যক্ত করেনি কারো কাছে। অটল এখনো 'মা সিংহবাহিনী'র প্রতি বিশ্বাস রাখছে। কে বলতে পারে অলৌকিক একটা কিছু ঘটে গিয়ে বেকসুর খালাস পেয়ে আসবে কিনা ছেলেটা।

কিন্তু অটলের ছেলে অমল তা' মনে করে না।

'একদা'র বোকা ছেলেটার এই তিন বছরে বুদ্ধিতে অনেক শান পড়েছে। সে বুঝে নিয়েছে কুমিরের কামড়ের ছাড়ান নেই। তাই সে এই একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়ে জন্মের শোধ একবার তার ফেলে যাওয়া জগতটাকে দেখতে এসে দাঁড়িয়েছে তার ভিটের উঠোনে।

অমল। খোকা!

এই ভিটের 'এক ছেলের' বংশধারার শেষ প্রদীপটি। মানদার বত্রিশ নাড়ি ছেঁড়া ধন। কিন্তু দাঁড়ানো মাত্র ভয়ে কাঁটা হয়ে যাচ্ছে কেন মা-বাপ? কার বিপদের ভয়ে? যার ওপর যম থাবা বসিয়ে রেখেছে, তার?

ছেলের বিরক্তিতে অটল থতমত খেয়ে বলল, কাজডা ভালো কর নাই বাপ সেইডাই বলচি। তা' এডা সম্ভব হল কী ভাবে?

সে অনেক কথা। শেষ রাত্তিরের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে, এই গ্যারান্টি দিয়ে তবে—

সহসা ঘরের দেয়ালের ধারে দপ্ করে জ্বলে উঠল একটা আগুনের ঝলক। যেন অনেকক্ষণ ধোঁয়ানো কাঠ হঠাৎ বাতাস পেয়ে জ্বলে উঠল।

সেই আগুন চাপা আক্রোশের গলায় বলে উঠল জেলখানা থেকে অ্যাকবার পেলিয়ে এসে, আবার তার মদ্যে সেদুতে যাবা তুমি?

পালিয়ে আসিনি, অনুমতি নিয়ে এসে তবে—

সে অ্যাকই কতা। সেই গরাদের মধ্যে থেকে বেইরে তো এয়েচ। অ্যাতো বড় পিথিমিতে পেলিয়ে যাবার জন্যি এট্টু ঠাঁই জুটবেনি!

মালতী একটু দেহাতি গ্রামের মেয়ে, তার কথার সুরে টান বেশি, ঝাঁজ বেশি।

অমল তাকিয়ে দেখল সেই ঝাঁজটার দিকে।

যদিও এখন আর তাকে 'অমল' বলে চেনার উপায় নেই। মনে হচ্ছে তার প্রেতাত্মা।

তবু 'অমল' ছাড়া আর কি বা বলা যাবে? তাই বলতে হচ্ছে।

অমল বলে উঠল, তা' হয় না। কতা দিয়ে এয়েচি।

কারে কতা দেচো?

যারে দিলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে তারেই দেচি।

ওই ছোটলোক রাক্কোসদের কাচে কতা দেওয়াটাই বড় হল তোমার? আর আর কিচু নাই?.... রাতের মধ্যে অনেক ধুরে কোতাও পেলিয়ে যাও পারবেনি চোট্‌পায়ে হাঁটতে?..... বনে-জঙ্গলে গে' নুকিয়ে থাকগে—

অমল কিছু বলার আগেই অটল ঘোষ গভীর আক্ষেপের গলায় বলে উঠল জেলখানার আসামি কি পুলিসের হাত থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারে মা?

'মা' একটি কঠোর দৃষ্টি হেনে বলল, ওঃ! আর সুড়সুড়িয়ে গে আবার ওদের হাতে ধরা দিলেই প্রাণডা বাঁচবা, কেমন?

অমলের মধ্যে এখন একটা দুরন্ত ইচ্ছে, ওই অভিমানিনী নাগিনীকন্যাকে সাপটে ধরে তুলে নিয়ে যায় এখান থেকে, পিষে গুঁড়ো করে ফেলে এতদিনের বুভুক্ষার জ্বালা মেটায়।

কিন্তু এটা সভ্য সমাজ। তাই অমলকে বলতে হয় ও তুমি বোঝবা না।

বোঝালে বুঝি।

এ তক্কাতক্কি বৃথা, অটল বলে উঠল, ছেলেডা ঘরে এল কিচু খেতে দাও খোকার মা!

বলেই সাবধান হল অটল, আস্তে বলল, খাওয়া-দাওয়া তো মিটে গ্যাচে, হাঁড়িতে ভাত আর আচে নাকি?

মানদার মুখটা একটু শুকিয়ে গেল। যা আছে তা কি ছেলের সামনে ধরে দেবার মতো?

নিজের জন্যে যে যৎসামান্যটুকু রাখা আছে, তাই। মালতীর সন্ধেবেলা ঘুম ধরে, তাই তাকে সন্ধের মুখে খাইয়ে দ্যায়। সে কোনওদিন খায় কোনওদিন ফেলে দেয়। অটলের খাওয়ার পর আর কি বা থাকে? তবু মানদা তাড়াতাড়ি বলল, আচে বই কী। নে 'আসছি। নেবুর আচার দে' খাবি খোকা? আর কচি শসা কেটে দিই?

খোকা বলল, নাঃ ভাত-ফাতে কাজ নাই। নাড়ু নাই?

বলল মাত্র, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষায় কি মায়ের মুখের দিকে তাকাল? দুটো অগ্নিবর্ষী চোখের দিকে তাকিয়ে আটকে গেল না?

মানদা অবশ্যই উত্তর দিল।

মনে মনে বলল, 'নাড়ু' বলে যে অ্যাকটা জিনিস ছেল জগতে সেডা তো ভুলে গেচি বাপ। নারকেলগাচগুলো তো সব জমা ধরানো। মুখে বলল তুমি ঘরে নাই, কার জন্যে আর নাড়ু করি বাপ?

খোকা সে কথায় কান দিল না, প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, বলল, আসার পথে গোয়ালবাড়ির মদ্যে থেকে মোরগের ডাক শোনলাম মনে হল! কী ব্যাপার!

শুনে অটলের বুকটা জুড়িয়ে গেল।

এই সূত্রে তবে নিজের এতদিনের প্রাণান্তকর সংগ্রামের ইতিহাসটার কিছুটাও শোনাতে পারবে ছেলেকে। নড়েচড়ে বসে বলল, গরু-মোষ তো অ্যাকে অ্যাকে সবই গ্যালো, দুটো মাত্তর পড়েছিল, তো সাত্যকীবাবু ধরল বাথানটা ওনারে বেচে দিতে—

অমল ভুরু কোঁচকালো, সব গরু-মোষ গ্যালো কীসে? মড়ক ধরেছিল?

অটল একটু দার্শনিক হাসল, তা' ধরেছেলো। মড়ক ধরেছেলো তোর বাপের ট্যাঁকে।..... সাত্যকীবাবু কিনে পোল্‌টি বানাল।, মা ভগবতীর থানে মুরগি।

কিন্তু অমন কি এ উত্তরের মধ্যে ঢুকতে পারল? অমল কি আদৌ এ সংসারের সুখ-দুঃখের মধ্যে আর ঢুকতে পারবে?

অমল হঠাৎ অন্য কথায় চলে গেল।

বলল, কেশবের বিয়ে হয়ে গেছে?

কেশব? কোন্ কেশব?

কেশব আবার কটা আছে? পালেদের কেশবের কথা বলচি।

অমলের স্বরে অসহিষ্ণুতা, ভঙ্গিতে অস্থিরতা।

অটল বলল, অ, তো সে তো সেই ত্যাখোনই—বরযাত্তিরের নেমন্তন্ন ছেলো তোমার না সেইদিন। আর তো একটা ছেলেও হয়ে গেচে।

হুঁ!.....

অমল আবার সহসা বলে উঠল, তা' তুমি তো আর হাজতে পচো নাই, তোমার চ্যাহারা অ্যামোন হল ক্যানো?

আমার চ্যাহারা?

অটল একটু ক্ষুব্ধ হাসি হাসল, বাজপড়া তালগাচ দেখিস নাই?

বাজপড়া তালগাছ!

তা হয়তো দেখে থাকবে অমল ঘোষ। তাদের ঘাটের ধরেই তো আছে একটা। কিন্তু তিন বছর যাবৎ 'ফাঁসির দড়িতে' ঝুলে থাকা লোকটার কি এই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী উত্তর মাথায় ঢুকবে? ঢোকা সম্ভব?

তবে এই বাবদ একটা কথা বলে উঠল সে।

বলল, হরামজাদা শুয়োর বিনোদ উকিল বুঝি নিংড়ে নিংড়ে টাকা নিয়েচে? শালাকে হাতে পেলে খুন করে ছাড়তাম।

টাকার কথাটা ছেলের মাথায় একটু ঢুকেছে দেখে কিছু শান্তি পেল অটল, কিন্তু এ কী 'মুখ' হয়েছে তার ছেলের? এত কদর্য ভাষা অমলের মুখে?

তাছাড়া শেষ কথাটায় শিউরে উঠল। বলল, এসব ভয়ঙ্করী কতা কোয়ো না বাপ!

শালা, অ্যাকবার বই তো দুবার ফাঁসি হবে না।

দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি করতে শুরু করল। দরজার কাছে কাঠের পুতুলের মতো এক নারী। যার দুচোখে আগুন।

অথচ অমনকে এখন এইসব আবোল-তাবোল কথায় তার কোহিনুর হীরের দামের মতো দামি সময়টুকু খরচা করতে হচ্ছে।

আশ্চর্য, এরা বুঝছে না কেন? বুড়ো হয়ে কি মানুষ এতও বোকা হয়ে যায়?

তা' হয়তো যায়। অন্তত মানদার মতো মানুষ। তাই মানদা বলে ওঠে, বলে কয়ে এসেচিস য্যাখোন, ত্যাখোন এমন অস্তির হচ্ছিস ক্যানো বাপ? বোস্ না একটু থির হয়ে আমার কোলের গোড়ায়। গায়ে মাতায় একটুক হাত বুইলে দিই।

প্রথমটায় মানদা খুব সঙ্কুচিত হয়ে ছেলের গায়ে হাত ঠেকিয়েছিল। ছেলেকে হঠাৎ মনে হয়েছিল একটা অপরিচিত বিভীষিকার মূর্তি। তা'ছাড়া আজন্মের সংস্কার, জেলখানার আসামি, না জানি কি নোংরা জামা-কাপড়। ক্রমে মনকে ছেড়ে দিচ্ছে।

ছেলেটার হাতে যে একটু খাবার জিনিস ধরে দিতে পারল না, তাতেই হাহাকার করা প্রাণটা, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজতে চাইছে। ভাবছে, ঠাকুর ঘরের কোনওখানে কিছু নাই আমার গো! কোতায় কী পাই এই রাতে?

বোকা! নীরেট বোকা!

মানদার ভয়ানক ক্ষুধার্ত ছেলেকে ধরে দেবার মতো এক উত্তম খাদ্যবস্তু যে তার ঘরেই মজুত রয়েছে তা খেয়াল করছে না।

অথবা হয়তো বোকা নয়।

খেয়াল করছে না নয়, খেয়াল না করার ভান করছে।

কে জানে কোনটা ঠিক! তবে ছেলের গায়ে স্নেহের হাতটি রেখে বলছে, বোস না বাবা আমার কাচডায় একটু থির হয়ে।

দুটো আগুনের গোলা যে এখন স্থির হয়ে আছে এই সীমাহীন ধৃষ্টতার দিকে তা লক্ষ করছে না।

কিন্তু আর একজন তো লক্ষ করছে? যার নিজের মধ্যেও ধ্বকধ্বকিয়ে জ্বলছে লেলিহান আগুন। অতএব বসল না সে। অস্থির ভঙ্গিতে বলল, নাঃ বসব না আর, একটু শুয়ে পড়ি গে। বিশ্রামের দরকার।

সে তো নিয্যস দরকার—অটল ঘোষ সহসা কেমন একটা ভারী-ভারী নিরেট গলায় বলে উঠল, অতটি রাস্তা হেঁটে এয়েচো, আবার অতটি রাস্তা হেঁটে রাত থাকতে ফেরা। বিনে কারণে অ্যাতটা তজ্‌দি, অ্যাতটা ঝুঁকি।..... তো শুয়ে পড়। এখেনে টানটান হয়ে শুয়ে পড়।

বলে অটল ঘোয নিজের চৌকিতে পাতা বিছানাটা হাত ঘষে টান-টান করে দিয়ে আবার বলে উঠল, শুয়ে-শুয়েই অ্যাতোদিনের বিত্তান্ত-বেবরণগুলো শোনা একটু।

বিবরণ শুনিয়ে আমার কি ঘোড়র ডিম হবে? শরীর টানচে। আপন ঘরে একটু লম্বা' হয়ে শুয়ে পরিগে।

বলে মানদার সেই একদার লাজুক লাজুক ছেলেটা পরম নির্লজ্জের মতো, সেই অগ্নিবর্ষী চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে স্পষ্টই আমন্ত্রণ জানিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ল।

কিন্তু অটল ঘোয?

সেই বা নির্লজ্জতায় কি কম গেল?

সেই বা কী বলে ছেলের এই অস্থিরতা দেখেও ছেলের গায়ের কাছে এসে পড়ে, প্রায় আটকানোর ভঙ্গিতেই বলে উঠল, এ সোমসারের সকল ঘর-দুয়োরই তো তোমার বাপ! বেশিআরাম নাগলে চোকের আবল্যি ছাড়বে না। এখেনে বরোং আমি ডেকে তুলতে পারব। টাইমের একটুক হেরফের হলেই তো সোমুহ বেপদ মানিক!

অটলের কণ্ঠে স্নেহ ঝরে পড়ে।

কিন্তু 'স্নেহ' জিনিসটা কি সব সময় বরদাস্ত হয়?

আমার যখন 'স্নেহ'র প্রয়োজন হবে (অথবা 'যদি' প্রয়োজন হয়), তোমার কাছে এসে দাঁড়াব, দিও তোমার যা সম্বল আছে। কিন্তু তোমার স্নেহের ঝুলি নিয়ে আগ বাড়িয়ে ঢালতে এসো না আমায়, এই সাফ কথা। তা যদি আস, তোমার ওই স্নেহ-সুধাই আমার বিষ লাগবে। মাংসাশী প্রাণী কি দুধে তুষ্ট হয়?

অতএব অটলের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়া ওই "স্নেহধারা এখন বিষ লাগল অটলের ছেলের। দীর্ঘদিনের অনুপস্থিত পুত্র, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যবর্তী চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে, তবু তার মুখভঙ্গিতে সেই বিষের স্বাদেরই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

অটলের সঙ্গে মিলানো নাম অমল! চাকদার এই ঘোষেদের ঘরে এমন সৌখিন নামটি আর দ্বিতীয় নেই, সেই অমলের সমস্ত ভঙ্গিতে কী বিকৃত মালিন্য! কাকে বলছে না ভেবেই বলে উঠল, দূর শালা! নিকুচি করেছে। কত কারখানা করে এই আসা, তো উটোনে পা দেওয়া এস্তক বেপদ!..... বেপদ! ফাঁসির ব্যাবোস্থা তো হয়ে গ্যাচে, আর কতটা কী বেপদ হবে?

অ্যাঁ! কী বলতেচ?

হঠাৎ একটা চেরাফাটা গলা চাপা চিৎকার করে উঠল ওরে মা রে!

একটা গলা? না দুটো?

আশ্চর্য! দুটো দু'বয়সের মেয়েমানুষ একসঙ্গে একই ভাষায়, একই ভঙ্গিতে শিউরে চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু অটলবিহারী অটল।

ব্যাবোস্থা হয়ে গ্যাচে বলচ কেন বাপ? রায় তো বের হয় নাই।

না হোক! যা বেরবে আমার জানা হয়ে আচে।.... বেপদ হয় আমি বুজব।

নির্লজ্জ বেহায়া ছেলেটা আবার তার আপন ঘরের দিকে পা বাড়াল, যেখানে ইতিমধ্যেই এখান থেকে একটা বেতডগা সাপ ফস করে পিছলে চলে গিয়ে ঢুকে গেছে।

কিন্তু অটল ঘোষ যে লজ্জাহীনতায় তাকেও হারাল। হারাল নিজের বিকৃত বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া ছেলেটাকেও। ছেলের পথ আগলে একটা কঠিন ধাতব গলায় বলে উঠল, ওই ঘরের মদ্যে তো অ্যাখোন তোমারে ঢুকতে দেওয়া চলে না খোকা।

অটল ঘোষের কণ্ঠ শুধু ধাতব কঠিনই নয়, বোদা বিস্বাদ।

খোকা ছিট্‌কে উঠল, তার মানে? ঘরে ঢুকতে দেবে না ? তুমিও কি আমারে খুনী ভাবো নাকি?

আমি? তোমারে?

অটলের গলার স্বর একটু বদলাল।

বলল, আমি তোমারে খুনী ভাবলে তোমারে খালাসের চেষ্টায় পতের ভিকিরি হয়ে যেতুমনি বাপ। কিন্তু কতা হচ্ছে, ঠারে-ঠোরের কতা য্যাখোন বুজচো না, ত্যাখোন পষ্টাপষ্টিই বলতে হয়, রক্তমান্‌সের শরীর, কাঁচা বয়সের ধর্ম, আর এতদিনের খিদাতেষ্টা, ঘরে ঢুকলে কি নিজেকে রুক্‌তে পারবা? অ্যাকটা অঘটন হয়ে যেতে কতক্ষণ? তা'লে? ত্যাখোন?

অমল নামের দুরন্ত ক্ষুধার্ত মানুষটাও সহসা যেন হোঁচট খেল। একবার বোকার মতো তাকাল। তারপরই হিংস্রভাবে বলে উঠল, ঠিক আছে, আমি তা'তে চললাম।

কিন্তু চিরদিনের সভ্য-শালীন এই ঘোষ-বাড়িটায় কি আজ নির্লজ্জ বেহায়ামির প্রতিযোগিতার আসর বসেছে?

তাই অন্ধকার ঘর থেকে সেই বেতডগা সাপটা বেরিয়ে এসে চেপে ধরে ফেলল চলে যেতে উদ্যত মানুষটার একটা হাত। ধরে বলে উঠল, না, যাবা না! শুদোও তোমার বাপেরে, 'অঘটন' ক্যানো? শুভ ঘটনা নয় ক্যানো? ওনার ঠাকুদ্দার পাতোরে ভাত খেতে অ্যাকডা বন্‌শোধরের দরকার নাই? আসবা না সে?

হাতটা চেপে রইল শক্ত করে।

অন্ধকারটুকুই যা একমাত্র আবরণ।

বংশধর!

মাটিতে বসে পড়ল অটল।

রুদ্ধ গলায় বলল, এলে তারে আমি 'বংশোধর' বলে পরিচয় দেতে পারব? তিন সনের জেল হাজতের আসামি, হঠাৎ অ্যাকদিন একটুক্ষণ পালিয়ে এয়েছেলো, এ কতা পাঁচজনায় মানবা?

পাঁচজনায় না মানলো, তোমরা তো মানবা? ভগবান তো মানবা? ... অন্ধকারে মালতীর চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না, শুধু সাপিনীর হিসহিস ফোঁস-ফোঁসটা শোনা যাচ্ছে—হিংস্র, রুক্ষ, তীব্র, আবার বুঝি স্যাঁৎসেঁতেও। .... চাপা চেঁচানোর গলায় বলছে, ধমমো তো মানবা? পিত্রিপুরুযজনা তো মানবা? আর আমি তো জানবা—

শেযটায়, গলা বুজে গেল।

কিন্তু 'অটল' নামের মানুষটা?

সে যে তবুও অটল, অনমনীয়। তার কণ্ঠস্বর যে আবার ধাতব, সে য্যাতো যাই হোক, সমাজ মানবা না। গায়ে ধুলো দেবা, মুকে চুনকালি দেবা, মাতাডা হ্যাঁট করে দে' ছাড়বা!..... বাপ খোকা, তুমি বুজো—

ছাড়! ছেড়ে দে—

ক্ষিপ্ত হিংস্র ভঙ্গিতে হাতটায় ঝটকান দিল জেল-পালানো আসামিটা।

কিন্তু ওই তিন বছর জেলখানার ভাত খাওয়া জীর্ণশীর্ণ লোকটা কি পেরে ওঠে একটা সদ্য-যুবতী পাথুরে-গতর গ্রাম্যমেয়ের মরণকামড় শক্তির সঙ্গে?

মরণ-কামড়ই।

সে তো জানছে, এই ছেড়ে দেওয়া মানেই, সেই মুহূর্তে চিরতরে হারিয়ে ফেলা। এ জীবনে আর ওই হাতখানা তার হাতের নাগালের মধ্যে আসবে না। তাই তার পুরু ভারী থাবাখানার মধ্যে খটখটে সরু কব্জিটা জব্দ হয়েই রয়েছে।

যদিও ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছে অমল, কিন্তু সেই চেষ্টার মধ্যে কি আপ্রাণের ভাব আছে? 'ভাব' আছে কিনা কে জানে, তবে ভঙ্গিটা রয়েছে।

অসব্যোতা ছাড় বলচি, ছেড়ে দে হাত।

না!

নাগিনী ফণা তোলে।

চিরে যাওয়া গলায় বলে ওঠে, ক্যানো ছেড়ে দেবা? এই জেবনে আর তোমারে পাবা আমি? তোমার মা-বাপ সমাজ নে ধুয়ে জল খাক! স্বাথ্যোপর নিষ্ঠুর! নিজিদের মুক হ্যাঁটটাই দেকতেচে। আর নক্কীছাড়ি মালোতীর প্রাণডা? না না, ভগোবান তোমারে পেঠিয়ে দেচে—ছাড়বা না।

হাঁপাতে থাকে, কিন্তু মুঠো শিথিল করে না।

মানদা এতক্ষণ চুক করে ছিল, এখন তীব্র ধিক্কারে বলে ওঠে, হায়ানজ্জার মাতা অ্যাকেবারে খেয়চিস বৌ? ধিক ধিক।

কিন্তু এ ধিক্কারে কি লজ্জা পেল মালতী নামের মেয়েটা?

পেল না। পেলে কি আর বলে উঠতে পারত, হ্যাঁ খেয়েচি। নিজের হলে বুজতে।

সিদিকে তো ষোলো আনা বজায়।

বলেই উন্মাদ হয়ে যাওয়া মুখ্যু গ্রাম্য মেয়েটা আজকের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে বসে।

আর সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটে যায় কিনা তার শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে।

ফণাধরা নাগিনী হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে, ওরে মা রে, আমি কী করব রে। বলতেচে ফাঁসির ব্যাবোস্তা হয়ে গ্যাচে—

আর কথাটা শেষ না হতেই ধৃত আসামিকে এক ঝটকায় ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে ফেলে।

শুধু তাই?

দু-দুজোড়া হতভম্ব চোখের সামনে দরজার কপাটজোড়া ধমাস করে বন্ধ করে দেয়।

হুড়কো লাগানোর শব্দটা জোরালো, তার সঙ্গে ভিজে ভিজে গলায় আর্তনাদটাও জোরালো,—তবে? এ জেবনে তবে সে নিদি আমি কোতায় পাব? তোমার ঠাকুদ্দার বনশের বনশোধর!

একেও যদি হাড়বেহায়া না বলবে তো কাকে বলবে?

ভালোবাসার নাম প্রতারণা

'বললি তুই নিজের মুখে এই কথা?'

বন্ধুর মুখের চামড়াটা ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ল, বন্ধুর চোখ দুটো কপালের উপর থেকে নামল না, আর হাঁ-টা খোলাই থাকল।

হাতের সিগারেটের অনেকক্ষণ জমে ওঠা ছাইটা ছাইদানীতে ঠুকে ঝরিয়ে পরাশর হেসে বলল, 'হাঁ-টা বুজে ফেল জ্যোতি, মুখের মধ্যে মশা ঢুকে যেতে পারে।

দেদার মশা ঘরে এসো। সন্ধ্যাবেলা জানালা বন্ধ না করলে—।'

'আরে রেখে দে তোর মশা, জ্যোতি প্রায় খিঁচিয়ে উঠে বলে, 'আমি জানতে চাই তোর কথাটা সত্যি কি-না?'

পরাশরের কৌতুকের গলা, কোন্‌টা সত্যি? যা বলেছি সেটা? না আদৌ বলেছি কিনা!

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই কথাটাই জিগ্যেস করা হচ্ছে। নিজ মুখে বললি এই অদ্ভুত কথাটা!

'বললাম তো।'

পরাশর নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'এছাড়া আর কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না ভাই। ছুটোছুটি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি।'

'অসম্ভব নয়'—পরাশর উদার হাসি হেসে বলে, 'করতেও পারে। হয়তো করছেও। আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেছে সেই অবধি।'

জ্যোতি একটু নড়ে চড়ে বসে গলার স্বর নামিয়ে বলে, 'শান্ত হয়ে গেছে কেন? তোকে উৎখাত করছে না ডাক্তারের কাছে যাবার জন্যে?'

পরাশর বলে, 'না সেটা করছে না। এটাই আশ্চর্য ঠেকছে বলে ফেলেই তো ওই ভয়টাই ঘাড়ে চেপে বসেছিল। কিন্তু বলল না অপেক্ষা করে করে কত কাল থেকে নিজে থেকেই—'

পরাশর আর একটা সিগারেট বার করে ঠুকলো, 'লাইটার' বার করল ধীরে সুস্থে।

অধৈর্য জ্যোতি বলে ওঠে—"সিনেমার নায়কের মতো কায়দা করিস নে পরাশর, যা বলবি চটপট বলে ফেল। কী বললি নিজে থেকে?' ওই কথাই বললাম আর কি—' এক মুঠো ধোঁয়া ঘরের সিলিঙের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পরাশর বলল, 'মানে ডাক্তারের কাছে গিয়ে একটা পরামর্শ টরামর্শ—'

'আবার থামছিস? স্পিডের মাথায় থামিস না পরাশর। কী বলল শুনে?'

'বলল, 'থাক'।'

'থাক? শুধু থাক?'

'তাই তো বলল।'

'তারপর তুই আর কিছু বললি না?'

'না।'

পরাশর আস্তে আস্তে টেবিলের ওপর আঙুল ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'আর কিছু বলতে পারলাম না। সবটাই কেমন বাঁধানো মনে হল। তাছাড়া ওর মুখটা দেখে কেমন সাহস এল না। মনে হল যেন ও আমাদের এই জগতে নেই, যেন অন্য কোথাও চলে গেছে।'

'তার মানে গুম্ হয়ে গেছে—

'সাধু বাংলায় তাই বলে বোধহয়।'

'জ্যোতির নাকটা কুঁচকে ওঠে।'

জ্যোতি হাঁটু দুটো নড়াতে নড়াতে বলে, 'আমি ভেবে পাই না এর মধ্যেই অত অস্থির হয়ে উঠল কেন 'মালাই'। এখনই কি হাল ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর-দেবতার চরণে মাথা ঠুকতে যাবার সময় হয়ে গেছে? কত দিন বিয়ে হয়েছে তোর?'

'তোর বিয়ের তিনমাস আগে। অর্থাৎ বছর আষ্টেক।'

'রাবিশ।'

জ্যোতি খুব চটা গলায় বলে ওঠে, 'যেমন রাবিশ সেটা, তেমনি বুদ্ধু তুমি। বলতে পার নি, এখনও অগাধ সময় পড়ে আছে, এখন থেকেই হতাশ হবার কিছু নেই। কত লোকের বিয়ের বিশ বছর পরেও—'

'বলেছি রে তাই বলেছি। না বলে কি আর ওর পাগলামির হাতে আত্মসমর্পণ করেছি? অনেক নজির দেখিয়েছি, অনেক কারণ বুঝিয়েছি, শরীরতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্বের অনেক বাখ্যা শুনিয়েছি—'

কথাটা না শেষ করেই শেষ করে পরাশর।

জ্যোতি অস্থির গলায় বলে, 'আমার যে হয়েছে মুশকিল। শুধু তোর বউ হলে, মানে অন্য কোনওখানের মেয়ে টেয়ে হলে, ধরে একবার আচ্ছা করে বুঝিয়ে ছাড়তাম।'

'বুঝত না।'

'আরে বাবা তুই বোঝাতে বসলে, না বুঝতেও পারে, কিন্তু অপর লোকের বুঝ দেওয়া আলাদা ব্যাপার। কিন্তু মালা'টা আমার বোন হয়েই যে হয়েছে মুশকিল। ওইখানেই দারুণ অসুবিধে। প্রসঙ্গটা তো ঠিক ছোটবোনের সঙ্গে আলোচনার মতো নয়।'

অবশ্য জ্যোতির এটা একটু অধিক শুচিবাই। পরাশরের বৌ মালা মোটেই জ্যোতির নিজের ছোট বোন নয়। জ্যোতির খুব দূর সম্পর্কের মামাতো বোন। তবে ওর নিজের ভাই নেই বলেই 'জ্যোতিদা' বলে প্রাণ বার করত। এখনও করে, ভাই-ফোঁটায় নেমন্তন্ন করে ধুতি-টুতি দেয়।

পরাশর বলে, 'তোর বোনকে বিয়ে করে আমার একদিক থেকে লোকসানই হয়েছে জ্যোতি। তুই ছিলি আমার একেবারে নিজস্ব চিরকেলে সম্পত্তি, আমার স্ত্রী আমার সেই

অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে সমীহ করবে, খাতির করবে, এবং হিংসে করবে, একটাই হত স্বাভাবিক, তা নয় তুই প্রায় আধখানাই আমার হাতছাড়া হয়ে গেলি। মনে হবে আর্ধেকেরও বেশি। অধিকার বোধটা যেন ওর দিকেই পচাঁত্তর পয়সা।'

'অর্থাৎ হিংসেটা তোর দিকে এসে যাচ্ছে।'

'একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। কোথায় আমার বউ আমার বন্ধুকে ডেকে যত্ন-টত্ন ঠিক মতো করছে না বলে তার ওপর সদ্দারি চালাব তা নয় বাড়িতে বড় কুটুম্বুর আদর-যত্নের ঘটা দেখছি ফ্যালফেলিয়ে।'

'তাছাড়া আমি তোর বউকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' না করে 'তুই, তুই' করছি। সেটাও একটা লোকসান।' বলে হেসে ওঠে জ্যোতি।

কিন্তু এ ধরনের হাসি-খুশির দিন সেই বিয়ের প্রথম দিকে। বড়জোর বছর তিন-চার। তারপর আর আবহাওয়া এমন হালকা থাকল না।

হঠাৎ একদিন শনি হয়ে এল এক শখের জ্যোতিষী। ছেলেটা পরাশরেরই এক আত্মীয় গোছের, কিরোর বই-টই পড়ছে, মহোৎসাহে হাত দেখতে ওনাদের কাছে গিয়ে গিয়ে ধর্না পাড়ছে।

তা ওই 'হাত দেখা' জিনিসটা এমনি মোহময়, বিশেষ করে মেয়েদের কাছে, যে কেউ যদি বিনা বিদ্যায় মিছিমিছিও কারো হাত নিয়ে বসে বোলচাল দেয়, 'বাজে' বুঝেও হাতটা তার দিকে এগিয়ে দেবেই মেয়েরা।

মালাও দিয়েছিল।

বলেছিল, 'খুব যে জ্যোতিষী হয়ে উঠেছ দেখছি, কই আমার হাতটা দেখ তো।'

ভাগ্নে হয়তো মালার থেকে বয়সে বেশ কিছু বড়ই হবে, কিন্তু পদমর্যদার জোরে মালা তাকে মালা 'তুমি' করেই কথা বলল।

ভাগ্নে অতএব বয়সের মর্যাদা খাটানো 'আপনি'র দিকে গেল না।

মামির পেলব সুকুমার হাতখানি উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বলে উঠল, মামির তো দেখছি একেবারে 'অতি সুখী পরিবার' যোগ। বাচ্চা কাচ্চা 'চ্যাঁ ভ্যাঁর বালাই-ই দেখছি না। সন্তান স্থানে শূন্যি।

মালা ফট্ করে হাতটা টেনে নিয়ে বলে উঠল, 'যাক বাবা বাঁচলাম। তোমার মামারও তাহলে কোনও ঝামেলা রইল না। সারা জীবন শুধু বই কিনবেন আর সিগারেট খাবেন।'

'আরে বাবা আর সব কী আছে হাতে দেখি?'

'মালা একটু রহস্যময় হাসি হাসল, আর দেখবার কী আছে? 'অতি সুখী' অবস্থা যখন। আচ্ছা দেখ তো ধর্মস্থানে কী আছে?'

ভাগ্নে অভিনিবেশ সহকারে দেখে বললো, 'ধর্মস্থান বেশ ভালই। সদগুরু যোগ রয়েছে কিন্তু মামি, এই বয়সে হঠাৎ ধর্মচিন্তা মনে এল যে?'

'কেন এল সে তো তুমিই বলবে,' মালা হাতটা আবার টেনে নিলে 'তোমাদের কাছে তো অজানা কিছুই থাকে না। লোকের ভাগ্যরহস্য, চরিত্র রহস্য সবই তো তোমাদের নখদর্পণে।'

মনে হল ঠাট্টা করেই বলছে, কিন্তু আর কোনওদিন ভাগ্নের সামনে হাতটা বাড়িয়ে ধরে নি মালা।

অবশ্য পরাশরের জন্যেও হতে পারে। পরাশর বলে, 'এই বয়সে খুব ভাঁওতা দিতে শিখেছিস তো বাঁটুল। তা বুজরুকিটা আর ঘরের মধ্যে কেন? একখানা সাইন-বোর্ড লটকে বসে পড়গে যা বাপের ভিটের বৈঠকখানা 'রুমে' আর খেটে খেতে হবে না। তোর মামিরও যেমন, হাত দেখাবার আর লোক পেল না।' তা মালা বোধহয় ঘোরতর পতিব্রতা, তাই ভাগ্নের সামনে আর হাতটা বাড়িয়ে ধরল না কোনওদিন, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরা ব্যাধিটা তাকে কবলিত করে ফেলল।

'জ্যোতিষ, জ্যোতিষ এক বাতিক হল মালার।'

কাগজের বিজ্ঞাপনের, পাঁজির বিজ্ঞাপনে এর ওর তার মুখে মুখে 'হস্তরেখাবিদ ও কোষ্ঠীকারকের নাম শুনল কি ছুটল সেখানে।

তার বাঁটুলের ভাগ্যক্রমে তার গণনারই সমর্থন আসতে লাগল। বাঁটুল যে একটা হেলা-ফেলার লোক নয়, সেটা প্রমাণিত হয় ওই সব মোটা-সোটা দক্ষিণা গ্রহণকারী জ্যোতিষশাস্ত্রী, জ্যোতিষার্ণব মহোদয়দের গণনায়।

সন্তান যোগ নেই, তবে ভগবানের দয়ায় কী না হয়?

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা পরাশরের গোচরীভূত হয় নি।

প্রথম দিকে তো মালা প্রায়ই বাপের বাড়িতে যেত-টেত। সেখানে সঙ্গী জুটত ছোটকাকি আর ছোট ভাই। ছোটকাকিরও ভবিষ্যৎ দর্শনে, প্রবল উৎসাহ।

কিন্তু ক্রমশই বাপের বাড়ি যাওয়ার হার কমে আসে। মেয়েরা যে দাবিতে বাপের বাড়ি গিয়ে চেপে কিছুকাল বসে থাকতে পায়, সে দাবি আর মালার জীবনে এল না। অতএব মালা পরাশরের সংসারেই স্থায়ী আসন নিয়ে বসে গেল।

কিন্তু মালার মন বসল কই?

মালার ওই বাতিক মালাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় যাদবপুর থেকে দমদম, দমদম থেকে শিবপুর, শিবপুর থেকে বড়শে বেহালা! কোথায় অমুক চট্টোপাধ্যায়, কোথায় তমুক চক্রবর্তী, কোথাও বা দেবের গোড়ায়।

জানতে দেরি হল না পরাশরের ব্যাপারটা পরাশরের চিত্তজগতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নেই, তাই পরাশর ওকে ঠাট্টা করল, ধিক্কার দিল বাধা দিতেও চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে চলল, নতুন কোনও লক্ষ্যে।

নিয়ে না গেলে মালা নির্জীবের মতো ঘুরে বেড়ায়। কথা বলে কম, খায় কম, এ এক জ্বালা।

যদিও মালা হেসে হেসে বলবার চেষ্টা করত। 'আরে বাবা, আমি কি আর সত্যিই ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে মরে যাচ্ছি? আমি শুধু যাচাই করে দেখছি, বাঁটুল শিখেছে কিনা, বাঁটুলের কথার সঙ্গে অন্যের কথা মিলছে কি না।'

'সেটার কি খুবই দরকার আছে? ধরে নাও বাঁটুল, খুব শিখেছে। মিলল তো অনেকের সঙ্গে।'

মালা কেমন বোকার মতো বলেছে, 'অমিলও তো হতে পারে?'

'তাতেই বা কী হাতি-ঘোড়া হল?' পরাশর মালার হৃদয়তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি ফেলে নি, পরাশরও বোকার মতো বলেছে, বাঁটুলের বিদ্যে নিয়ে তোমার এত মাথা ঘামানো কেন?'

অবশেষে একদিন ধরতে পারল, কেন মাথা ঘামানো।

উত্তরপাড়ার এক জ্যোতিষী বললেন, 'সন্তান যোগ প্রায় নেই সত্য কথা। সাড়ে পনেরো আনাই নেই, কিন্তু ওই আধআনাটুকুই ভরসা। কবচ-টবচ ধারণ করলে, অথবা দৈব টৈব করলে হতেও পারে ভালো ফল। 'বক্রেশ্বরের উষ্ণকুণ্ডে গিয়ে স্নান করে দেখুন—'

বাস ধরে পড়ল মালা, বক্রেশ্বর যাবে।

পরাশর অন্যমনস্ক বই কী।

পরাশর বইয়ের অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মানুষের সব কথা বুঝতে ভুলে গেছে। তাই পরাশর তখন অবাক হয়।

অবাক হয়ে বলে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আছ এখানও নাকি? উষ্ণকুণ্ডে স্নান করে ছেলে মেয়ে হবে? অদ্ভুত। তাছাড়া এটাই বলি—সুখে থাকতে ভূতের কীল খাবার বাসনা কেন? বেশ তো আছি বাবা। শুধু মোরা দুজনে। শুধু কলকূজনে জীবন কাটাব বলে ভেবেছি—

মালা অভিমানভরা গলায় বলে, 'বাঃ একটা বাচ্চা না থাকলে আবার বাড়ি?'

'সেই চিরন্তন নারী প্রকৃতি। সে আদি ও আরক্তিম ক্ষুধা। আরে বাবা, আজকের যুগ অবিরত 'তাল' করে মরছে কী করে লোকসংখ্যা কমাবে, কী করে দরজায় ধাক্কা মারা অতিথিদের দরজা থেকেই তাড়াবে। আর তুমি কিনা—নাঃ তুমি একবারে গাঁইয়া। তুমি না একটি পোস্ট গ্রাজুয়েট মহিলা। তোমার না ফিলজফিতে অনার্স ছিল?'

লুকোচুরি, চাপাচাপি, রাখাঢাকা সব কিছু খুলে ছড়িয়ে পড়ে, মালা রুষ্ট ক্ষুব্ধ গলায় বলে ওঠে, 'যাদের ফিলজফিতে অনার্স থাকে, যারা এম.এ. পাস করে, তাদের বুঝি 'মা' হতে দেখো নি কখনও? অথবা পণ্ডিত ব্যক্তিদের 'বাবা' হতে?'

পরাশর ওই আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে প্রমাদ গোনে। পরাশর তাড়াতাড়ি বলে, 'আরে বাবা আমি যুগের কথা বলছি। এ যুগে তো মানুষ ঝাড়া-হাত-পা থাকবার বাসনাতেই বহুবিধ চেষ্টায় মাথা ঘামাচ্ছে। নইলে সেকালে তো যত যত দার্শনিক, পণ্ডিত, মহাশয় ব্যক্তিরাই—থাক ওসব পাপকথা, তবে কথা হচ্ছে একালের লোক অনেক বুদ্ধিমান হয়ে গেছে কিনা, তাই—'

'তাই শুধু নিজেরা থাকব, আর কেউ আসবেন না, কেমন? তা হলে ধরে নাও আমার বুদ্ধি কম।' বলল মালা লাল লাল মুখে।

অতএব পরের ছুটিতেই বক্রেশ্বর যেতে হলো পরাশরকে মালাকে কণ্ঠে ধারণ করে।

চলল কিছুদিন প্রতীক্ষা।

বাড়ল মালার পুজো, পাঠ, তারপর একটা শূন্যতা।

তারপর আবার ছোট 'দেবীফুল্লরার' মন্দিরে!..... তারপর বিষ্ণুপুরে 'ধর্ম ঠাকুরের স্থানে, তারপর 'বাবা দক্ষিণরায়ের ঠাঁই'....... তারপর 'কামদেবপুর ফকির আশ্রম', তারপর নবদ্বীপে 'পোড়া মা তলা' ... তারপর 'সতীমা' তারপর 'বরদায়িনীর পীঠ'... তারপর 'বাসনাষষ্ঠী'... তারপর আরো কত কত জায়গায়।

দূরে নিকটে, কখনও বাসে, রেলগাড়িতে, কখনও টানা মোটরে!... কোথাও ঘোড়া মানত, কোথাও টিন বাঁধা, কোথাও 'ক্ষীরের পুতুলে'র প্রলোভন দেখানো,

কোথাও ষোড়শোপচারের প্রতিশ্রুতি।.....

একটি সন্তান হলেই হল।

ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক।

এ যেন একটা নেশার মতো।

অথবা একটা জেদের মতো।

যেন প্রবঞ্চক দেনাদারের কাছ থেকে প্রাপ্য পাওনা আদায় করে নেবার কঠোর সংকল্প।

নেবেই নেবে মালা আদায় করে সেই ঠগ জোচ্চোর দেনদারের কাছ থেকে তার প্রাপ্য সম্পদ, হৃত সম্মান।

সম্মানই তো!

'কেউ নিচ্ছে না, কেউ ঠেলে ফেলে দিচ্ছে—'সেটা আলাদা জিনিস। যেমন সেদিন মালার ননদ কৃষ্ণা কালনা থেকে কলকাতায় চলে এসে ভাইয়ের বাড়িতে থেকেই অপারেশন করিয়ে গেল।

'অপারেশন ছাড়া আর কোনও পথ নেই?' ক্রুদ্ধ মালা প্রশ্ন না করে পারে না। কৃষ্ণা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলেছে, 'চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?' তোমাদের আর কী বাবা, ভয়-ডর নেই হাওয়ার পানসিটি ভাসিয়ে চলেছ।..... আমাদের—? সর্বদাই ভয় ওই আসে 'ওই অতি ভৈরব হরষে—'

মালার মনে হয় কৌতুকের ছল করে কৃষ্ণা তাকে ব্যঙ্গ করছে। মালার অক্ষমতার দিকে ভালো করে চোখ পড়িয়ে দিচ্ছে।

মালা আরও ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

বলেছিল, 'তোমাদের তো অনেক দিন বিয়ে হয়েছে। আলাদা থাকলেই পারো।'

এবার কৃষ্ণার ক্রুদ্ধ হওয়ার পালা।

কৃষ্ণা ভারী মুখে বলেছিল, 'নিজেরা দিব্যি আছ, তাই বলতে পারলে। অপরকে বলা যত সোজা, কাজে করা তত সোজা নয় বুঝলে হে। আমাদের অবস্থায় পড়লে, বুঝতে পারতে। আমি তো তাই ভগবানকে বলি, আমি তো বাপু ঠেলে ফেলে দিতে চাই, তবু আমার কাছেই পাঠাও কেন বলো তো? যারা চেয়ে চেয়ে মরে যাচ্ছে তাদের কাছে যাও না—'

তারপর থেকে ননদের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ মালার।

কেন কইবে?

যে ইচ্ছে করে অপমান করতে আসে তার সঙ্গে কীসের খাতির?

অপমান বই কী, আমি পাচ্ছি না যে নিধি তুমি ফেলে দিচ্ছ, আমি তার জন্যেই মরে যাচ্ছি। এ কথা যদি গায়ে পড়ে বলতে আস তো যাও দূর হও।

রাস্তার ভিখিরি মেয়েটারও যে ঐশ্বর্য আছে, আমার তা নেই।

এ কী দৈন্য!

এ কী লজ্জা!

না, মালা শুধু একটা বাচ্চার জন্যেই মরে যাচ্ছে না, মালা মরে যাচ্ছে অগৌরবে। পরাশর বন্ধ্যা মালার এই মনস্তত্ত্ব বোঝে না। পরাশর বলে, 'যা পাচ্ছো না তার জন্যে মন খারাপ না করে, মন ভরাবার অন্য উপায় আবিষ্কার করো মালা। একটা কাজ করো। 'মহিলা শিক্ষণ কলেজ' না কী যেন একটা কলেজ আছে হাওড়ায়। তাতে একটা ভেকেন্সি আছে, আর জামাইবাবু নাকি তার বোর্ডে আছেন—

মালা কড়া গলায় বলে, 'হাওড়ায় গিয়ে মহিলা ঠেঙিয়ে মন ভরাবার মতো কি দরকার পড়েছে আমার, এত দূর নাই ভাবলে?'

'কিন্তু অনবরত এই ইঁট-পাথর গাছ নদী সকলের কাছে ছুটোছুটি করে গিয়ে মাথা খোঁড়া, আর ব্যর্থ হওয়া, এও তো আর পারা যাচ্ছে না।'

'বেশ তুমি আর পেরো না, আমি একাই যাব।'

কিন্তু ওটা তো অভিমানের কথা।

পরাশর কি তার বউকে একা ছেড়ে দেবে?

অথবা ছেড়ে দেবে তার পাড়ার মাসিমা বা বাসন মাজা ঝিয়ের সঙ্গে?

সংবাদদাত্রী ওরাই।

ওরাই জানে কোন্‌খানে ভরা চতুর্দশীর রাত্রে অশ্বত্থ ডালে ঢিল বাঁধতে হয়।

কোথায় শুক্ল প্রতিপদে কাঁচাদুধে ধোওয়া শেকড় ধারণ করতে হয়।

পরাশর হতাশ হয়ে বলে, 'লেখাপড়া কি কোনও কাজেই লাগে না মালা।'

মালা গম্ভীর হাসি হেসে বলে 'দেখছি তো তাই। এমন কোনো বিদ্যে তো দেখলাম না যে আমাকে আমার প্রার্থিত বস্তুটা দিতে পারে।'

পরাশর ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'না-না তা পারবে না। তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমার সঙ্গে একটি নিষ্ঠুর কৌতুকের খেলা খেলেছেন! তোমাকে একটা দরকারী যন্ত্র দিতেই ভুলে গেছেন।'

কিন্তু বলে উঠতে পারে না।

কারণ পুরুষের মন কোমল।

পুরুষের প্রাণ মমতাশীল।

পরাশর তাই বলে, 'অথচ আশ্চর্য, আমার সেটি মনেই হয় না বস্তুটা আসলে প্রার্থনা করার মতো। পেলে ভালো, না পেলেই বা অসুবিধে কোথায়? এও তো একরকম প্রার্থনার জীবন। মুক্তপক্ষ পাখির জীবন।

জ্যোতি রেগে রেগে বলে, খুব দেখাচ্ছিস বাবা তোরা। ছুটি নেই অছুটি নেই টুক্ করে দু'জনে শুধু একটা 'কিট-ব্যাগ' নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। এখনও এত রোমান্স? দিন দিন যেন বাড়াচ্ছিস মনে হচ্ছে।'

পরাশর বলে, 'কারণ আছে।'

না, আবাল্যের বন্ধু, একান্ত বন্ধু জ্যোতির কাছেও পরাশর তাদের এই ধারাবাহিক ব্যর্থ অভিযানের ইতিহাস বলতে পারে নি কোনও দিন।

বলতে পারে নি হয়তো লজ্জায়।

শুনলে জ্যোতি পরাশরের গায়েই ধুলো দেবে, তাতে আর সন্দেহ কি। এই লজ্জার ইতিহাস, দুর্বলতার ইতিহাস, নিতান্ত আপনজনকেও বলতে বাধে বই কী।

তাই জ্যোতি যখন বলে, 'কী সেই কারণটি শুনি?'

তখন পরাশর কারণের এক গল্প ফাঁদে।

স্রেফ্ গল্প।

বলেও গল্পের ভঙ্গিতে, 'আর বলিস নে ভাই, উনি নাকি 'বাংলার দেব দেউল' নিয়ে রিসার্চ করবেন, তাই এখন তার মাল-মসলা সংগ্রহ হচ্ছে। ...... যত বোঝাই ওসব অনেক হয়ে গেছে

বাবা, বোঝে না। বলে, 'কোন্ বিষয়টা নিয়ে অনেক হয়ে যায় নি, সেটা তুমি আমায় বোঝাও তো।' আর কি করবার আছে বলো আমার? গিন্নি ঘাড়ে করে করে দেব-দেউলে ধর্না দিতে যাওয়া ছাড়া?'

কথা!

কথাই তো তাঁতের সুতো। যা দিয়ে কাপড় বোনা, যা দিয়ে লজ্জা নিবারণ আর আবরণ। কথার ফুলঝুরি কেটেই অন্ধকার মুখে রোশনাই করা।

পরাশরও তাই লজ্জা ঢাকতে, নিজের নগ্ন দৈন্যকে আবরণ দিতে কথার চাদর বোনে, কথার ফুলঝুরি কাটে।

জ্যোতি সেই আবরণটাই দেখতে পায়।

জ্যোতি বলে, এতদিন পড়ে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা? লেখাপড়ার কাজ তো ছেড়ে দিয়ে বসে আছে দশ-বারো বছর? তা কার আস্তারে করছে?'

'জানি না ভাই ওসব আমায় জিজ্ঞেস করো না, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হয়তো—ওসব এখনও ঠিকই করে নি।'

'কিন্তু তোর তো খরচের খরচান্ত হচ্ছে, প্রতি সপ্তাহে আউটিঙ্। একি সোজা খরচ নাকি?'

'তা আর কী করা।'

পরাশর বশংবদ স্বামীর চেহারা আপন চেহারায় ফুটিয়ে তুলে বলে, 'গিন্নির ইচ্ছায় কর্ম।'

'ভালো কর্তাটি পেয়েছিল আমার ভগিনীটি।'

ঘরে গিয়ে মালাকে সাবধান করে দেয় পরাশর। মালা যেন হাটে হাঁড়ি ভেঙে না দেয়। মালা যেন পরাশরের বানানো গল্পটার খেইটুকু হাতে করে বসে থাকে।

কিন্তু হাটে একদিন ভাঙলই হাঁড়িটা।

সত্যিকার হাটে।

মালা এসে বলল, 'এই শুনছো আমার একটা বিশ্বাসী সঙ্গী ঠিক করে দেবে?'

পরাশর মনে মনে ঠোঁট কামড়ায়।

তবু পরাশর বলে, 'বিশ্বাসী সঙ্গী? এই অধম ছাড়া তো ত্রিভুবনে আর কোথাও দেখছি না। তা গন্তব্যস্থলটা কোথায়?'

গন্তব্য স্থানটা জানা হয়।

আমতা লাইনে কোথায় যেন বুড়ো শিবতলা, সেখানে এক জাগ্রত দেবীমূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে, তিনি—অতএব। কিন্তু কে জানত সেখানে যানবাহন বলতে কিছু মেলে না। কে জানত স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল রাস্তা, আর কে জানত, শ্রাবণ সংক্রান্তির দুপুরেও একখণ্ড মেঘ আকাশের কোনো কোণ দিয়ে ভেসে চলে পর্যন্ত যাবে না।

যাতায়াতে দশ মাইল।

পাহাড়ের রাস্তা নয় যে মানুষের পিঠে চড়ে বসেও প্রাণ রক্ষা করবে।

ধর্মশালা নেই, চটি নেই।

ধুলো ওঠা পা, খড়ি ওঠা মুখ মালা একটা গাছতলায় বসে সঙ্গে ফ্লাস্ক থেকে জল নিয়ে চোখে কপালে দিতে দিতে হাঁপিয়ে বলে, 'লোকে বারোমাস কী করে বলো তো? শুনলামও তো দূর দূর গ্রাম থেকে আসে লোক।'

পরাশর রাক্ষসের মতো জ্বলন্ত আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'যারা আসে, তাদের কাছে এই পাঁচ-সাত মাইলটা কিছু নয় মালা, তারা এতে অভ্যস্ত। ভেবে দেখ, যারা তোমার পাশে বসে হাতে তাগা বাঁধছিল, তারা কেউ তোমার শ্রেণির কি না?'

মালা ওই আকাশের দিকেই তাকায়, ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে, 'আমার শ্রেণিই বই কী। তুমিই ভালো করে ভেবে দেখ।'

তখন হ্যাঁ ঠিক তখনই নিজে মুখে কথাটা বলেছিল পরাশর। বলেছিল মাথা নিচু করে।

আর মৃদু গলায়।

'মালা তোমার এই কষ্ট আর দেখতে পারছি না, আজ আমি আমার পাপ স্বীকার করতে চাই।'

মালা চমকে উঠেছিল, 'কী বললে?'

'বলছি ত্রুটি তোমার নয় মালা, ত্রুটি আমার।'

মালা ওর হাতটা খামচে ধরেছিল। আবার চেঁচিয়ে উঠেছিল। 'কী বললে? বলো কী বললে?'

'যা বললাম, তাইই। আমি পরম পাপী মালা, তোমার এই যন্ত্রণা দেখেও চুপ করে থেকেছি। নিজে মুখে নিজের কথা বলতে পারি নি।'

মালা ওর খামচানো হাতটা ছেড়ে দিয়ে আস্তে বলেছিল, 'বাজে কথা বলছ কেন? আমার উৎপীড়নে তুমি ডাক্তারকে দেখিয়েছিলে।'

'দেখিয়েছিলাম।'

পরাশর নির্লিপ্ত চোখে সামনের রোদে জ্বলা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বলে, কিন্তু ডাক্তারটি যে আমার বন্ধু, তোমাকে দেখাবার জন্যে একটা ফলস্ সার্টিফিকেট দিয়েছিল সেটা বলি নি।'

'তুমি সত্যি বলছ?'

আশ্চর্য রকমের শান্ত হয়ে গিয়েছিল মালা, বলেছিল, 'এই দেবস্থানে খোলা আকাশের নীচে সূর্যের দিকে মুখ করে বলছ, যা বলছ সত্যি।'

'কিন্তু—' পরাশর বলল বন্ধুকে, আমি ওসবের কিছুই মানি না, তা তো তুই জানিস জ্যোতি? তাই বললাম, 'হাঁ এই দেবস্থানে, এই খোলা আকাশের নীচে—

ইত্যাদি।

'নিজের মুখে বললি এই ভয়ানক বাজে কথাটা?'

'বললাম তো—' সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে ফেলে পরাশর বলে, 'যন্ত্রণা আর দেখতে পারছিলাম না।

'কিন্তু এখন থেকে ও তোকে ঘৃণা করবে তা জানিস? তোর এই মহত্ত্বের কোনও মূল্যই পাবি না। বরং এতদিন ধরে তুই ওকে ঠকিয়েছিস ভেবে অভিশাপ দেবে—।'

'জানি। সব জানি। কিন্তু ও তো স্বস্তি পাবে।'

ভীষ্ম

প্রথমে বিশ্বাস করি নি, পরে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

অবশ্য স্তব্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পৌঁছবার কথা নয়, অবিশ্বাস করেই থেমে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু বিজয়দার যুক্তিই আমাকে এতদূরে ঠেলে নিয়ে এল। যুক্তির মধ্যে ভুলও নেই, ও বলল—এ যুগে 'অসম্ভব' 'অবিশ্বাস্য' ইত্যাদি শব্দগুলোর কোনও অর্থ আছে? নেই! নইলে আর—

বললাম—রাখ তোমার উদাহরণ, তা' বলে সঞ্জয়দা?

বিজয়দা ভুরু কুঁচকে বলল—ওহে বাপু, মানলাম তোদের সঞ্জয়দা পরম মহাপুরুষ, অন্তত ছিলেন তাই, কিন্তু একেবারে ভীষ্ম হওয়া বড় শক্ত হে।

বেদপুরাণ খুলে দেখ্‌গে যা পদস্খলন মুনি ঋষি মহাপুরুষদেরই হয়ে থাকে। হ'বেই নিষিদ্ধ ফলের লোভ চিরদিনই দুর্বার। নইলে আর বিশ্বামিত্র—

আবার বললাম—উদাহরণ রাখ, সঞ্জয়দার কথাই ভাবছি আমি। কিছুতেই যে হিসেব মেলাতে পারছি না।

বিজয়দা এবার গম্ভীরভাবে বলে—হ্যাঁ, তোর মতো আমিও প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি, বারবার ভেবেছি শাস্ত্রে যতই ঘি আর আগুনের গুণাগুণ বর্ণনা করুক, 'তাই বলে দাদা'? তবু তো শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হল। অবিশ্বাস করবার পথ রইল কই? ধর্মের ধ্বজা যে বাতাসে উড়ল। শেষ পর্যন্ত সে লক্ষ্মীছাড়ী তো নিজেই স্বীকার করল। আগে অবিশ্যি কিছুতেই কিছু বলে নি, খালি নাকিকান্না কেঁদে কেঁদে মায়া কাড়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তোর বৌদি হ'ল গিয়ে শক্ত ঘানি, সর্ষে পিষে তেল আদায় করতে জানে।

অগত্যা বিশ্বাস করতেই হল। তবু বললাম—বৌদি যদি এত শক্ত, তবে বাড়িতে এরকম বেচাল সম্ভব হল কী ক'রে?

বিজয়দা কপাল চাপড়াল—হায়, হায়! সে বাড়িতে থাকলে কি আর? হুঃ! তোর বৌদি যে দু-আড়াই মাসের জন্যে সিউড়ি গিয়েছিল! বাপের বাড়ি যাবার নামে তো আর জ্ঞান থাকে না। অবিশ্যি বেচারা ভাববেই বা কী করে? ছুঁড়িটাকে তো এনেছি অনেকদিন, কাজকর্মও

করছিল, খাসা, হাবভাব দিব্যি ভালো, কে জানে যে ভেতরে ভেতরে এত! দেশের মেয়ে, ছেলেবেলার খেলুড়ি, খেতে পাচ্ছিল না, ভাবলাম থাকুক এসে আপনার লোকের মতো, খাক পরুক খাটুক খুটুক, ওরও লাভ আমারও লাভ! তোর বউদির শরীরের জন্যে রাঁধবার লোক একটা না রাখলেও তো চলে না? তা' সেইটাই বিবেচনার ভুল হয়েছিল আমার! অথচ তখন ওই দাদাই কত আপত্তি করেছিলেন। কিনা 'দেশের মেয়ে—পুরুত বংশের মেয়ে, কি মান অপমান হবে, হয়ত মনঃক্ষুণ্ণ হবে কিম্বা দেশে গিয়ে নিন্দে করবে' এই সব। আর এখন? এখন নিন্দে হচ্ছে না? এখন তো তাকে আর তার সেই কীর্তির ধ্বজাটিকে নিয়ে ভিটেয় গিয়ে বাস করছেন। শুনিস নি কারো মুখ? যাস নি বুঝি অনেকদিন বাঁশবেড়েয়?

মাথা নাড়লাম।

যাই নি বটে অনেকদিন, কিন্তু ইত্যবসরে যে আবার জ্ঞাতি জ্যাঠামশাইয়ের ভাঙা ভিটেয় এতবড় একটি নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছে তা' কে জানত!

আমি মাথা নাড়তেই বিজয়দা আহত লজ্জিত মুখে আত্মধিক্কারের ধ্বনি তুলে বলে—কী যন্ত্রণা যে আমার হয়েছে! বাঁশবেড়ে থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি তো অনেকেই করে, যারা সাতজন্মে কখনও আসত না তারাও হয় অফিসে নয় এখানে এসে এসে পাঁচকথা বলে যাচ্ছে। কৌতূহলের শেষ নেই সব। আর হবেই তো এমন মজাদার একটি ঘটনা। আমি বাবা সব্বাইকে সাফ খবর বলে দিচ্ছি, আর প্রতিজ্ঞা করেছি আর ও ভিটের চৌকাঠ মাড়াব না। আশ্চর্য, লজ্জার লেশমাত্র নেই! দিব্যি বললেন, "রুণুদের নিয়ে আমি বাঁশবেড়েতে গিয়েই থাকব ঠিক করেছি, দুটো মজুর মিস্ত্রি লাগিয়ে যা হোক করে খানিকটা সাফ করে নেব। খরচপত্রের দিক থেকে তোর একটু অসুবিধে হবে বুঝছি, কিন্তু ওদিকে খরচ চালিয়ে বেশি কিছু তো বাঁচবে না!" খরচের কথা তুলে আমাকে ভয় দেখানো হল আর কি।

বিজয়দার মাইনে বেশি নয় জানতাম, কলকাতায় বাসা করে থাকা সম্ভব হয়েছে সঞ্জয়দার ভরসাতেই। বৈমাত্র ভাই, কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ কখনও টের পেত না সে কথা। চিরকুমার সঞ্জয়দার বিলাসব্যসনের বালাই মাত্র নেই, বরাবর নিজের উপার্জনের সর্বস্ব ছোট ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে খালাস। জানতাম সবই, কিন্তু হঠাৎ এ কী অদ্ভুত ছন্দপতন?

একটু চুপ করে থেকে বললাম—রুণু'দের মানে?

—মানে বুঝছিস না? ইয়ে —সেই হতচ্ছাড়া বাচ্চাটা আর কি!

—'ওঃ' বলে চুপ করে গেলাম। কিন্তু মনের মধ্যে ভীষণ একটা যন্ত্রণাবোধ হতে থাকল। বরাবর দেবতার মতো ভক্তি করে এসেছি সঞ্জয়দাকে। আমি বলে নয়, সকলেই। অথচ আবার অগাধ প্রশ্রয় ছিল তাঁর কাছে। আমাদের চাইতে কম সে কম দশ বারো বছরের বড় তিনি, তবু কী সরল সুন্দর শিশুর মতোই ছিলেন। হায়—প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে এ কী শোচনীয় পরাজয় তাঁর?

আর রুণু?

ভাবতে ভাবতে চললাম—সত্যিই কি ত'ালে জগতে 'অসম্ভব' বা 'অবিশ্বাস্য' কথাটা অর্থহীন?

রুণুকে আমি চিনতাম। বরাবর তার খবরও জানি। গ্রামের ভটচায্ মশাইয়ের মা-মরা ভাগ্নী। হয়ত আমাদের বয়সীই হবে, কারণ নেহাৎ ছোটবেলায় আমাদের দলে এসে খেলাটেলাও

করেছে মনে হচ্ছে। তবে পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার, একটু বড় হতেই—ছেলেমহল থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তারপর যথারীতি পাঁচজনের সাহায্যে একটা 'অগাবগা'র সঙ্গে বিয়েও হয়েছিল, এবং পল্লিগ্রামের দুঃখীগরিবের রীতিমাফিক কিছুদিনের মধ্যে বিধবাও হয়েছিল। অগত্যা মামার সংসারে জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ সব কিছুর বদলে ভাতকাপড়ে ছিল। মামা মারা যেতেই আশ্রয় ভাঙল। মামাতো ভাইরা নিতে চাইল না, সেই সুযোগে বিজয়দার বউ ওকে এনে নিজের.সংসারে ভর্তি করে নিয়েছিল। রুণুর বয়সের কথা ভেবে হয়ত যদি বা একটু দ্বিধা এসে থাকে, বোধকরি তার গতরের কথা ভেবে সে দ্বিধা দূর হয়েছিল। দুবেলা দুটি খাওয়ার বদলে ঝি রাঁধুনি ধোবা আয়া এতগুলো লোকের শ্রম পাওয়ার লোভ কি সোজা? আর বিজয়দার সংসারে এত ভয়েরই বা কি ছিল? সঞ্জয়দাকে তো ঋষিতুল্য বলেই জানা ছিল, আর বিজয়দা? তার নিজের ভাষাতেই বলি, "তাই তো বলছিলাম রে পদস্খলন কি তোর আমার হতে যাবে? যাদের স্ত্রী-পুত্র আছে তাদের পায়ে তো পাহাড় বাঁধা, স্খলনের জো কোথায়?"

হায় আমাদের একান্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র সঞ্জয়দার পবিত্র প্রাণে শনি প্রবেশ করল কোন্ রন্ধ্রপথে?

বিজয়দার বউ এসে চায়ের কাপ হাতে তুলে দিয়ে হাত জোড় করে বলল—

দোহাই বিনু ঠাকুরপো, আর যা গল্প করো করো, ভাসুর ঠাকুরের প্রসঙ্গ তুলো না আমার কাছে। তোমার এই দাদাকে তাই বলেছি নুন ভাত খাই শাকভাত খাই সেও ভালো, তোমার দাদার পিত্যেস আর রেখো না। কি বলব ভাই দেবতার মতো ভক্তি করতাম! তা' খুব শিক্ষা হ'ল।

অতএব সমস্ত দ্বিধা দূরে ফেলে সঞ্জয়দাকে ঘৃণা করতে করতে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু যাকে ঘৃণা করতে কষ্ট হয় তাকে ঘৃণা করতে বাধ্য হওয়ার মতো যন্ত্রণা বোধ হয় পৃথিবীতে অল্পই আছে। তাই ক'দিন ধরে সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করে করে একটা সংকল্প স্থির করে ফেললাম। সামনেই দু'দিন ছুটি ছিল, সুবিধেও হ'ল। সঞ্জয়দাকে মুখোমুখি একবার দেখব।

ভোরের গাড়িতে রওনা দিলাম দেশের বাড়ির উদ্দেশে।

'বাড়ি' বলতে হয় তাই বাড়ি বলা, নইলে প্রকৃতপক্ষে দেয়ালে-গাছ-গজানো মেঝেয়-খোয়া-ওঠা তিনেক ঘর আর একটু দাওয়া মাত্র সম্বল আমার। থাকেও না কেউ। আমিই কদাচ্ কদাচ্ কখনও একবেলার জন্য যাই, গেলে প্রথমেই সন্ধান করতে হয় পাড়ার কার হেঁসেলে একমুঠো ভাত পাওয়া সহজ হবে।

পাঁচ শরিকের বাড়ি। একটা উঠোনকে ঘিরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো কতকগুলো অংশ। পূর্ব দিকটায় আমার ভাগ, উত্তর দিকটা বড় জ্যেঠামশাই বা সঞ্জয়দাদের। দক্ষিণ দিকটা যাঁদের ভাগে তাঁরা বহুকাল প্রবাসী। তাঁদের ঘরগুলো বেশি ঝড়ের সময় দোলে, আর মাঝে মাঝে কার্নিশের চাপড়া ভেঙে ভেঙে পড়ে। তবু দরজায় দরজায় তালা আঁটা আছে। কিন্তু বর্ষা আর উইপোকার মিলিত চেষ্টায় দরজার উপর-নীচ দু' দিকটাতেই রীতিমতো 'খাবোল', সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সিমেন্ট-চটে-যাওয়া মেঝেয় উর্বরতার সুযোগে ঘরের মধ্যেও আগাছার শ্যামলশ্রী।

পশ্চিমের অংশে আমাদের ছোট ঠাকুর্দার মেয়ে রাজুপিসি থাকেন একা বাপের ভিটে আশ্রয় করে।

ছোট্ট সুটকেসটাকে নিজের জঞ্জাল ভর্তি দাওয়ায় নামিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করতে না করতেই রাজুপিসির গলার সাড়া পাওয়া গেল কুয়োতলার ওদিক থেকে। "কে রে ওখানে? কে শব্দ করছে?"

তাড়াতাড়ি বললাম—পিসিমা আমি।

—ওমা তাই নাকি? বিনু এসেছিল? তবু ভালো বাপের ভিটেকে মনে পড়েছে—বলতে বলতে রাজুপিসি এদিকে এসে দাঁড়ালেন। সেই আদি-অন্তকালের চেহারা। হাঁটুর কাছাকাছি বহরের কেটে ধুতি, ছোট করে ছাঁটা চুল, পায়ে হাজা। কাছে আসতেই প্রণাম করতে হ'ল। 'থাক থাক' বলে তিন পা পিছিয়ে গিয়ে পিসি একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললেন—একলা, না সঙ্গে কেউ আছে?

—সঙ্গে? —হাসলাম—নাঃ সঙ্গে আর কা'কে পাবো?

—পেলেই হল—রাজুপিসি উত্তর দিকটায় কটাক্ষপাত করে একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন—ওই তো একজন এসেছেন। ধর্মের ডালি মাথায় বয়ে নিয়ে ভিটেয় এসে বাস করছেন।

গম্ভীরভাবে বললাম—সঞ্জয়দার কথা বলছ?

—তা' ছাড়া ? আমি একা কেন, দেশ সুদ্ধু লোকই বলছে। টি টি পড়ে গেছে একেবারে! আরে বাবা যা করছিলি কলকেতায় করছিলি, আবার চুনকালি মেখে দেশে এসে বাস করার শখ কেন বলত বাছা? বিজয় বোধ হয় তাড়িয়ে দিয়েছে। আর দেবে না তো কি করবে? তাকে তো বউ ছেলে নিয়ে ঘর করতে হবে।

আমার বুকটা যেন হিম হিম লাগছিল। রাজুপিসির কণ্ঠস্বরে আর যাই হোক মৃদুতা-দোষ নেই, আর আজ ছুটির বার, অবশ্যই সঞ্জয়দা উপস্থিত আছেন। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গান্তরে আসতে বললাম—পিসি তোমার আজ একাদশী টশী নয় তো?

—ওমা শোনো কথা! এই ত বুধবার একাদশী গেল। আর, তাই যদি হ'ত, তোর জন্যে আর এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারতাম না?

হাসলাম। আর একটু বেশি তোয়াজ করতে বললাম—চালতার অম্বল রাঁধবে?

হেসে উঠলেন রাজুপিসি, বললেন—রাঁধব রাঁধব। চিরকাল একরকম গেল তোর। তাই তো বলি এই রকমই তো ছিল সবাই, সঞ্জয়টারও গুণের তুলনা ছিল না, কী মতিচ্ছন্নই ধরল মুখপোড়ার! এই জন্যেই লোকে বলে সোজাসুজি বিয়ে-থা করে সংসার করাই ভালো। ভীষ্ম হয়ে থাকা বড় সোজা নয়। আর সোজাই যদি হবে তা'হলে এই চারকালের মধ্যে শুধু একা ভীষ্মের নামই জেগে থাকত না বুঝলি ? কিন্তু এও বলি—দেশে এসে লোক রাষ্ট্র করবার কী দরকার ছিল তোর? মতিভ্রম আর কি। শনিতে যখন ধরে, অমনি বুদ্ধিই হয়। রুণি হারামজাদীরও বুকের পাটা তেমনি। মামার বংশের মুখে কালি নেপে দিব্যি এখানে বাস করছে গো! লজ্জা নেই সরম নেই!

পথে বেরিয়েও ওই একই প্রসঙ্গ।

আজ ছুটির দিন, অনেকের সঙ্গেই দেখা হ'ল, সকলেই ব্যঙ্গমিশ্রিত হাস্যে সঞ্জয়দার গুণকীর্তন করলেন। তাঁর শরীরে নাকি হায়া লজ্জার এত অভাব যে, সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে

কথা বলতে আসেন, রুণুকে নিয়ে বারোয়ারী তলায় পুজো দেখতে যান, রুণুর ছেলের অসুখ করলে বিনা দ্বিধায় ডাক্তারকে ডাকতে আসেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। উপসংহারে এই আক্ষেপ শুনি 'একালে সমাজও নেই সমাজপতিও নেই, কে কাকে এক-ঘরে করে? অতএব যা খুশি তাই চলছে।'

নাঃ, মন ক্রমশই কঠিন হয়ে এল। এখন যেন আর ঘৃণা করতেও যন্ত্রণা টের পাচ্ছি না। রাজুপিসির ভীষ্মঘটিত অকাট্য যুক্তিটাও মনে লেগেছে। তা ছাড়া—সত্যিই বটে 'অসম্ভব' 'অবিশ্বাস্য' ইত্যাদি শব্দগুলো। অর্থ কি আর আছে?

ভোরবেলা গাড়ি চাপবার সময় মনে করেছিলাম, প্রথমেই এসে সঞ্জয়দার সঙ্গে দেখা করব, আর—আর রুণুকেও একবার দেখব। দেখব মানুষের কতটা পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেল।

জীবনে আর সঞ্জয়দার মুখদর্শন করব না এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে অনেক বেলায় পাড়া বেড়িয়ে ফিরলাম। তাড়া নেই, জানি রাজুপিসি বেলা বারোটার আগে উনুন জ্বালেন না!

ফিরছি অভ্যস্ত পথে সেজ্ জ্যেঠামশাইদের রান্না-ঘর ভাঙা ইঁট-পাটকেলের স্তূপ ডিঙিয়ে। হঠাৎ দেখি উঠোনের জামরুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সঞ্জয়দা! কোলে একটি নধর নিটোল মাস কয়েকের মতো ফুটফুটে ছেলে? থামকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, কেন তা জানি না। অথচ ঘৃণায় লজ্জায় সর্বশরীর রী রী করে উঠল! উঃ সত্যি কী বেহায়া, কী বেহায়া।

বেহায়াই বটে। আমাকে দেখেই সহাস্য বদনে কাছে এগিয়ে এসে বললেন কি না—সকালের গাড়িতেই তো এসেছিস শুনলাম, এসে অবধি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস যে? সঞ্জয়দার জন্যে কী এনেছিস, দড়িকলসি? না বিষবড়ি?

ভগবান জানেন কেন হঠাৎ চোখে এক ঝলক জলের মতো এসে গেল। তাই উচিত ছিল— বলে ভাঙা ইঁটের ওপর দিয়ে হন হন্ করে যেতে গিয়ে হোঁচট খেলাম।

—আহা হা কী মুস্কিল—সঞ্জয়দা একটা হাত বাড়িয়ে আমাকে খপ্ করে ধরে ফেলে বললেন—পালাচ্ছিস কেন? কে তোকে মারতে আসছে? পড়ায় ঘুরে মাথাটা গরম করে এসেছিস বুঝি? আয় এদিকে আয়!

শান্ত স্পষ্ট সস্নেহ স্বর।

কোথাও জড়তা নেই।

সঞ্জয়দার কোলের ছেলেটার দিকে তাকাতে পারছিলাম না, ঘাড় বাঁকিয়ে কঠিনভাবে বললাম—মানুষকে ডেকে ঘরে বসাবার দাবি কি রেখেছ?

সঞ্জয়দা হেসে উঠলেন, বললেন—মানুষকে ডাকবার দাবি রেখেছি বই কী, তবে অমানুষদের কথা আলাদা। আয়।

তবু পা সরতে চায় না, ওই ছেলেটা সঞ্জয়দার নাম খাবলাচ্ছে। ঘাড় আর চোখ আরও ফিরিয়ে বললাম—কী দরকার? বেশ তো আছ তুমি? আমাদের জন্যে কিছু এসে যাচ্ছে না তোমার।

সঞ্জয়দা এবার একটু গম্ভীর হাসি হাসলেন, বললেন—বড্ড রেগে গেছিস মনে হচ্ছে। হ্যাঁ কি বলছিলি, বেশ আছি ? তা' অবশ্য মিথ্যে বলিসনি, সত্যিই বেশ আছি। তবে তোমার জন্যে

কিছু এসে যাচ্ছে না বললে ঠিক বলা হবে না। তুই যদি না বুঝে সুঝে রাগঝাল করে চলে যাস, একটু এসে যাবে। আয়!

মন্ত্রাহতের মতো পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি উঠোনের উত্তরদিক লক্ষ্য করে। সঞ্জয়দাও এগোতে থাকেন সঙ্গে সঙ্গে। ছেলেটার খাবোল থেকে নাক বাঁচাতে বাঁচাতে মৃদু হেসে বলেন—রুণুর সঙ্গে দেখা না করে গেলে সেও ভারি কষ্ট পাবে রে। ছেলেবেলার খেলুড়ি তোরা, কত গল্প করে তোদের। ছেলেটা রুণুর মতোই ফর্সা হয়েছে দেখেছিস?

অবাক! অবাক!

মনের মধ্যে সমুদ্রের কল্লোল উঠছে। সে কল্লোলের মূল ধ্বনি, 'এত বেহায়াও মানুষ হয়?'

সঞ্জয়দার ঘরে এসে বসলাম।

সরু চৌকিতে ফালি একটু বিছানা, ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল আর একটা চেয়ার বসানো, কোণের দিকে বুক-সেলফটা, কলকাতার বাড়িতে যেমন ছিল, যথাযথ তেমনি। ভাবলাম 'উঃ কী চালাক!'

দালানের ওদিকটায় একটা বেতের দোলা টাঙানো রয়েছে, কাজেই তার সামনের ঘরটার ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কে জানে সে ঘরের চেহারা কেমন।

সঞ্জয়দা ডাক দিলেন—রুণু রুণু, আয় দেখ কে এসেছে!

'আয়।'

আবার ভাবলাম, 'উঃ কী চালাক।'

ওঘর থেকে রুণু এসে দাড়াল। বহুদিন পরে দেখা, তবু প্রায় একই রকম মনে হল। সেই শান্ত নম্র ভীরু ভীরু ভাব, সেই পাতলা রোগা গড়ন, সেই খালি হাত থানপরা। বাবারে বাবা, দু'জনেই কি এত চালাক হতে হয়! সঞ্জয়দা ছেলেটাকে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এই নে তোর ছেলে। উঃ কী ছেলে! আমার বাঁশি নাক খ্যাঁদা করে দিল! আর দেখ্ বিনুর জন্যে একটু চা বানিয়ে ফেল!

আমি সহসা বুনো গোঁয়ারের মতো বলে বসলাম—এখানে আমি কিছু খাব না।

মনে হ'ল রুণুর দেহটা কেঁপে উঠল। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে সঞ্জয়দা হঠাৎ ধমকে উঠলেন—নোঙ্‌রামি করিসনে বিনু। যা রুণু, শুধু চা কেন, চা জলখাবার যা আছে তোর সংসারে সব নিয়ে আয়।..... আচ্ছা ছেলেটাকে নয় রেখেই যা, ওকে নিয়ে কি কোনও কাজ হবে?

তবু রুণু ত্রস্তভাবে ছেলেটাকে নিয়েই চলে গেল।

সঞ্জয়দা গম্ভীর ভাবে বলেন—তোর সুদ্ধু এতটা অধঃপতন হবে ভাবিনি বিনু।

—অধঃপতন। আমার? আমি হাঁ করে তাকাই।

—না তো কি আমার? সঞ্জয়দা স্বভাববশে আবার হেসে ওঠেন—তুইও যে একটা অসহায় মেয়েকে তাঁর সব চেয়ে দুঃসময়ে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়ার সপক্ষে রায় দিয়ে রেখেছিস তা ভাবিনি।

দশ বছরের বড় বলে মনে থাকে না, ক্রুদ্ধভাবে বলি—তাঁকে দুঃসময়ের দরজায় ঠেলে দেবার সময় এই বিবেকটি চাপা রাখলেই ভালো হত না সঞ্জয়দা?

উঠে পড়বার জন্যে ছটফট করছিলাম, তবু উঠতে পারলাম না।

সঞ্জয়দা এক মিনিট আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন স্থিরভাবে, তারপর বললেন—এরপর তোকে আর কিছু না বলাই আমার উচিত ছিল, আর পাঁচজনের মতো তোকেও 'যা খুশি ভাব্‌গে 'যা' বলে উড়িয়ে দিলেই পারতাম, কিন্তু মনে হচ্ছে এর জন্যে পরে তুইই মনে যন্ত্রণা পাবি। তখন হয়তো লজ্জায় আসতেও পারবি না।

'উঃ কী চালাক' ভাবতে গিয়েও ভাবতে পারলাম না— তাই একটু থতমত খেয়ে বললাম—যা খুশি ভাবগে যা!' মানে? ওর জন্যে তবে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

—মাথা থাকলেই তাতে সময় সময় ব্যথা হয় রে বিনু। কৌতুকের হাসি হাসেন সঞ্জয়দা।

আমি এতক্ষণে অন্য সিদ্ধান্তে আসি। ওঃ তা'হলে বিজয়দার কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, অপরাধিনী রুণুকে দয়া দেখিয়েছেন মহাপুরুষ সঞ্জয়দা। কিন্তু বিজয়দার সেই কথাটাও যে মনের মধ্যে কাঁটার মতো ফুটছে—"শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীছাড়ী নিজে মুখেই স্বীকার করল!" সবটা কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে।

সঞ্জয়দা তেমনি কৌতুকের হাসি হেসে বলেন—অঙ্ক মিলছে না, তাই না? ছেড়ে দে না সে চেষ্টা, যাকে ভালোবাসিস তাকে বিশ্বাস করে বাঁচ, স্বস্তি পাবি।

—স্বস্তি পাচ্ছি না—আমি গম্ভীরভাবে রুণুর ঘরের দিকে কটাক্ষপাত করে বলি—অপরাধীকে দয়া দেখাতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করার কোনও মানে হয় না। যে অপরাধ করেছে তাকে তার শাস্তিও পেতে দেওয়া উচিত।

সঞ্জয়দাও ওদিকে তাকান, বোধহয় দেখে নেন অপরাধিনী এসে পড়ছে কি না, তারপর মৃদু গম্ভীর হাস্যে বলেন—আমার ক্ষতি? সে করবার সাধ্য কারো নেই। আমারও না। কিন্তু অপরাধের শাস্তির কথা বলছিস? কথা হচ্ছে কি— শাস্তি জিনিসটা ভারি গোলমেলে রে। পেতে হলে যে দোষী সে তো পাবে না, শাস্তি পাবে তার স্ত্রী-পুত্র। তবে? কোন দিক থেকে হিসেব কষবি?

চমকে উঠলাম। যাকে বলে 'বিস্ফারিতলোচন' সেই ভাবে বললাম—তার মানে?

—অত কথার মানে ছেলেমানুষকে জানতে নেই। তার চেয়ে চা খা, নারকেল নাড়ু খা—

মাথা নেড়ে বললাম—ওসব পরে হবে, আমার মাথার মধ্যে কী রকম করছে সঞ্জয়দা। বিজয়দা যে বললে রুণু নাকি—

নিজে মুখে স্বীকার করেছে এই তো? সঞ্জয়দা ক্ষোভের হাসি হেসে বলেন— সব্বাইকে তাই বলে বেড়াচ্ছে হতভাগা, ভয় পেয়ে গেছে তো। অথচ এ বেচারাই বা করে কি? হতভাগাটা নাকি শাসিয়ে রেখেছিল সত্যিকথা প্রকাশ করে দিলে ছেলেটাকে গলা টিপে শেষ করে দেবে!

অ্যাঁ!

—সেই তো! বিশ্বাস করা যায় না। বেচারার মায়ের প্রাণ কি রকমটা হয় বল্? এদিকে আবার বিজয়ের বউ—একটু ব্যঙ্গ ভাব ফুটে উঠল সঞ্জয়দার মুখে—

—জানিস। তা আমাদের বউমাটিকে? তিনি একেবারে সত্যিকথা আদায় করতে উঠে পড়ে লেগে রসাতল করছিলেন। আদায় করতে পারলে যে আবার কী করতেন ঈশ্বর জানেন, হয়তো গলায় দড়ি দিয়েই বসতেন। দেখেশুনে মেয়েটাকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি

বললাম—তুই আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপা দিদি, কিচ্ছু দোষ নেই। দিনে রাতে কত মিছে কথা কইছি আমরা, আর এই একটা তুচ্ছ মিছে কথায় যদি একটা সংসার বাঁচে, একটা প্রাণ বাঁচে, দোষ কী?

প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না, পরে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বললাম—সঞ্জয়দা, তুমি কি পাগল ?

—তাই সম্ভব!

—নিন্দের বোঝা চুলোয় যাক, কিন্তু এতবড় একটা দায়িত্বের বোঝা—

—কী করি বল, বাড়ির ছেলেটাকে তো আর ভাসিয়ে দিতে পারি না। আর ওই মেয়েটা —এই যে রুণু দিদি সব কমপ্লিট? গুড্ গার্ল। নে খা বিনু।

শুধু চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে বললাম—ওসব খেয়ে আর খিদে নষ্ট করতে চাই না রুণু, আজ তোমার রান্নাঘরের আইটেম্‌টা কী শুনে নিই।

রুণু ভীরু ভীরু গলায় বলে—বড়দা বলছিলেন আজ আর মাছের হ্যাঙ্গামায় কাজ নেই, শুধু—

মহোৎসাহে বলি—শুধু আলোচাল আর কাঁচকলা কেমন? ঠিক আছে। তাতেই রাজি।

—সে কি রে বিনু, রাজুপিসির চালতার অম্বল?

—পচুক।

—আর রাজুপিসি?

—চেঁচান!

নাঃ বিজয়দার কথাই ঠিক। 'অসম্ভব' বলে কোনও কথা নেই জগতে।

মফস্বল-বার্তা

রাত্তিরে শুতে এসে ঘরের ভেজানো দরজাটায় হাত দিয়েই চমকে উঠল নীলা। দরজাটা এখন আর শুধু ভেজানো নেই, ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ। চমকে উঠেই ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে নীলার। কে? কে? বাড়িতে কেউ নেই, ভিতর থেকে ঘর বন্ধ করল কে? কোন্ দুর্বৃত্ত কী মতলবে নীলার নিভৃত নির্জন শয়নমন্দিরে ঢুকে পড়ে খিল লাগিয়ে বসে আছে?

চিন্তা বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী, সন্দেহ নেই তাতে। নিমেষে মনের মধ্যে সহস্র চিন্তার ঝড় বয়।

সন্ধানী চোর। নিশ্চয় সন্ধানী চোর। জানে, আজ রাত্রে নীলা বাড়িতে একা। তাই নীলার কোনও অসতর্ক মুহূর্তে টুক করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং একেবারে আশ্রয় নিয়েছে শোবার ঘরে। অবিশ্যি শোবার ঘর ছাড়া ঘর আর কই? নীলা এতক্ষণ যেখানে ছিল, যাকে রান্নাঘর বলা হয় সে তো ঘর নয়, বারান্দার কোণ মাত্র। কিন্তু এখন নীলা কী করবে? এত কথা অবিশ্যি এক লহমাতেই ভাবা হয়ে গেল। ভাবল, চেঁচামেচি করা ঠিক নয়, তার চাইতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে—

ভাবলে কী হবে?

ততক্ষণে অভ্যাসগত প্রেরণা কণ্ঠের পথ ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে একটা আর্ত প্রশ্ন—কে? কে ঘরের মধ্যে?

স্বর আর্ত কিন্তু অস্ফুট।

ঘরের মধ্যে অবস্থিত লোকটা কি দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই অমন অস্ফুট প্রশ্নটাও কানে পৌঁছল তার? সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে ততধিক মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, আমি—আমি নীলা, আমি।

আমি! আমি কে? কার কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হল এই 'আমি'?

নীলা কি জেগে আছে? না শয়তান লোকটা নীলার বিভ্রান্তি ঘটাতে এই এক সর্বনেশে ফাঁদ পেতেছে? হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই। কিন্তু তবু নীলা ছুটে চলে যেতে পারল না কেন? ওর পা দুটো কি কেউ পেরেক দিয়ে পুঁতে রেখেছে ওই বন্ধ দরজার সামনে?

দরজাটা খুলে গেল নিঃশব্দে।

হাওয়ার শনশনানির মতো শব্দ, দোহাই নীলা, চেঁচিয়ে উঠো না। ভেঙে দিও না আমার জীবনের স্বপ্ন।

বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘরের মধ্যে পা ফেলল নীলা, নিজের অজ্ঞাতসারেই দরজাটা ফের ভেজিয়ে দিল। বাড়িতে কেউ নেই, বাইরের দরজা বন্ধ, তবু এই সাবধানতা কেন কে জানে! তা সাবধানতা মানুষ সহজে ছাড়ে না, নইলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েও দুটো পাল্লার মাঝখানে চারটে আঙুল আটকানো থাকল কেন নীলার? এ-ভঙ্গি দরকার হলে চট করে খুলে বেরিয়ে পড়বার।

লোকটা আর-একবার মিনতি করে—সব কথার আগে মিনতি করছি নীলা, ভুল বুঝে চেঁচামেচি কোরো না। অনেক দুঃখের সমুদ্র পার হয়ে তোমার কাছে এসে পৌঁছেছি।

আলো জ্বালব আমি?

নিঃসংশয় হতে চাও?— মৃদু একটু হাসির শব্দ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে—লাইট জ্বেলো না দেওয়ালেরও চোখ আছে, আলো আমি জ্বালাচ্ছি।

ফস করে জ্বলে উঠল একটা দেশলাইকাঠি, তার থেকে জ্বলল একটা মোমবাতি। আর এগোরো বছর পরে নীলা প্রথম প্রশ্ন করল—কুশল প্রশ্ন নয়, দীর্ঘ বিরহ-কালের কোনও দুরবস্থার প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন করল, বাতি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ? হয়তো এইটাই স্বাভাবিক। ভিতরে যখন অজস্র কথার ঝড় বইতে থাকে, তখনই সব থেকে মূল্যহীন কথা মুখে আসে।

নীলার আর নিজের মাঝখানে বাতিটা উঁচু করে তুলে ধরল লোকটা। বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, চিনতে পারছ, না কি স্মৃতি থেকে মুছে ফেলেছ?

বিস্ফারিত দুই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল নীলা বাতির-আলো-পড়া বিষণ্ণ সেই মুখটার দিকে, মাথা থেকে খসে পড়ল ওর নরুনপাড় ধুতির বেষ্টনীটুকু, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তার প্রান্তভাগ, সাদা-লংক্লথের ব্লাউস-পরা বুকটা কাঁপতে লাগল থরথর করে, থরথর করে উঠল সর্বাঙ্গ।

এক মিনিট-দেড় মিনিট—সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ল নীলা তার বুকের উপর—তুমি! তুমি! তুমি সত্যি ফিরে এলে?

বাতিটা ছিটকে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। অন্ধকার? ক্ষতি কী! দুটি নরনারী যেন স্পর্শের মধ্যে পরস্পরকে ফিরে পেতে চায়, যেন পরীক্ষা করতে চায় এই মুহূর্তের নিকট-সান্নিধ্যে দীর্ঘ এগারো বছরের ব্যবধান লুপ্ত করে ফেলা যায় কি না?

কী ভাবছ আমাকে? প্রেতাত্মা?

আঃ! কী বলছ? কিন্তু দোহাই তোমার! একটিবার আলো জ্বালতে দাও আমায়। শুধু একটিবার। বিশ্বাস করতে দাও, সত্যি তুমি এসেছ।

সে ইচ্ছে তো আমারও করছে নীলা, কিন্তু বড় ভয়—বড় ভয়। জানলাগুলো ভালো করে বন্ধ করে দাও তবে। এতটুকু ফুটো থাকে না যেন, এক বিন্দু আলোর রেখা বাইরে যায় না যেন।

বন্ধ জানলাগুলো একবার টেনে টেনে দেখে সুইচের শব্দ না করে আলো জ্বালয় নীলা, আর আরও একবার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখতে থাকে, কতটা পরিবর্তন হয়েছে বিশ্বজিতের। খাটের উপর এসে বসে বিশ্বজিৎ। অকারণে একবার বিছানার শুভ্র চাদরটার উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করে, এখানে শোও বুঝি?

এও এক অর্থহীন প্রশ্ন।

নীলা খাটের পাশটা চেপে দাঁড়িয়ে আছে, স্খলিত আঁচলটা তুলে জড়ো করে নিয়েছে বুকের উপর, কালো চুলের অরণ্যের মধ্যে পদচিহ্নরেখার মতো সরু সিঁথিটা বিছানার চাদরখানার মতোই শুভ্র।

মৃদু হাসির রেখা দেখা দেয় ওর মুখে; বলে, তা শুই। এগারো বছর কাল বিছানা ত্যাগ দিয়ে মাটিতে শুয়ে কাটিয়েছি এ-কথা বললে হয়তো ভালো শোনাত, কিন্তু সত্যি কথা হত না। জানো তো চিরদিন আমি সব কষ্ট সইতে পারি, পারি না খারাপ বিছানায় শুতে।

খুকু আর তুমি শোও?

মুহূর্তে মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে নীলার ; রূঢ় কণ্ঠে বলে, তা ছাড়া আর কী শুনতে চাও?

থতমত খেয়ে যায় বিশ্বজিৎ, তাড়াতাড়ি বলে, আমি কিছু ভেবে বলি নি নীলা, কিছু ভেবে বলি নি। শুধু কথা খুঁজে পাচ্ছি না বলেই যা হোক কিছু বলে ফেলেছি।

কঠিন রেখা কোমল হয়ে আসে, কাছে বসে পড়ে নীলা রুদ্ধকণ্ঠে বলে, কথার সমুদ্র ভেতরে নিয়ে কথা খুঁজে পাচ্ছ না? তাই বটে। আমিও তো এখনও জিজ্ঞেস করি নি—এতদিন কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে? আর এমন করে এলে কী করে?

তারপর উথলে ওঠে পূর্ণিমার জোয়ার।

কথা আর কথা।

অর্থহীন অন্তহীন খেইহীন কথা।

খুকু তোমার ছবিতে রোজ নমস্কার করে, জানো? স্কুলে যাবার সময় আর ঘুম থেকে ওঠে। ছবিতে মালা পরায় তোমার জন্মদিনে, আর—

আর কী? কী বলতে গিয়ে থামলে নীলা? জন্মদিনে, আর? মৃত্যুদিনে বুঝি? বুঝতে পেরেছি, তোমার সাজ দেখেই বুঝতে পেরেছি। বেচারা খুকুকে পিতৃহীন করে রেখে দিয়েছ।

বালিশের উপর লুটিয়ে পড়ে নীলা কম্পিত স্বরে বলে, তা ছাড়া আর কী উপায় ছিল? বল, আর কী উপায় ছিল তোমাকে তার কাছে বাঁচিয়ে রাখবার? কী জবাব দিতাম আমি তার কাছে যদি শাড়ি চুড়ি পরে ঘুরে বেড়াতাম, আর—

ঠিকই করেছ নীলা।—বিশ্বজিৎ সস্নেহে ওর মাথায় একটা হাত রেখে বলে, ঠিকই করেছ। আমার মৃত্যু দিয়ে তুমি ওর কাছে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ। প্রকৃত ঘটনা জানলে আর যাই হোক, বাপের ছবিতে ফুলের মালা পরাবার বাসনা খুকুর জাগত না। কিন্তু এখন কী করবে?

এখন? নীলা বিহ্বলভাবে বলে, তুমি কি ওকে দেখা দেবে?

দেখা দেব। দেখা দেব কি না জিজ্ঞেস করছ?—অনুচ্চ একটু হেসে উঠে বিশ্বজিৎ বলে, ঠিক করেছি এবার তোমাদের কাছেই থেকে যাব। আর এমন করে পালিয়ে বেড়াতে পারছি না। তোমাদের কাছে তাই এসে পড়লাম, স্বাস্থ্যটাও একেবারে ভেঙে গেছে।

নীলা ম্লান দৃষ্টিতে একবার ওর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, সে অপরাধ স্বাস্থ্যের নয়। কিন্তু কিছু মনে কোরো না, একটা কথা বলছি, ওয়ারেন্ট কি তুলে নিয়েছে?

তুলে! এ-জীবনে নয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাড়া করে বেড়াবে।

তবে?

তা জানি না, ঠিক করেছি—যা থাকে কপালে। পরিচয়টা ঠিক করে ফেল। স্বামীর বন্ধু? দূর সম্পর্কের ভাই? যা হোক। কলকাতা থেকে এত দূরে, এই ছোট্ট মফস্বল-শহরটুকুকে কে আমাকে চিনে রেখেছে?

চিনে রাখবে! —নীলা ম্লান হেসে বলে, ছোট একটু মফস্বল শহর বলেই তো ভাবনা। সবাই সে সবাইয়ের তত্ত্বতল্লাশ করে। বিধবা স্কুল-মাস্টারনির একক ঘরে স্বামীর বন্ধুকে অথবা দূর-সম্পর্কের ভাইকে বাস করতে দেখলে কে উদাসীন থাকবে?

ওই ছুতো করে তাড়িয়ে দিতে চাইছ? খুনী আসামির সঙ্গে ঘর করবার সাহস হচ্ছে না?

তা তো বলবেই।—নীলা একটা নিশ্বাস ফেলে।

আচ্ছা নীলা, খুব সত্যি করে একটা কথা বলবে?

হ্যাঁ, বলব। আর তুমি যা জিজ্ঞেস করবে জানি।

তা হলে বলো। বলো, জীবনে একদিনও কি তুমি আমাকে খুনী বলে ঘৃণা করো নি?

না!

কিন্তু কেন করো নি?

জানি, তুমি খুন করলেও অন্যায় করো নি।

নীলা, নীলা! শুধু এই জন্যে! শুধু এই জন্যেই এই ঘৃণিত পলাতক জীবনের, ছদ্মজীবনের বোঝা বহন করে চলেছি—মাসের পরে মাস, বছরের পর বছর। কিন্তু আর পারছি না পালিয়ে বেড়াতে। জীবনকে আমি আবার ফিরে পেতে চাই নীলা। যে জীবন ফুলস্পিডে চলতে চলতে হঠাৎ পাথর চাপা পড়ে থেমে গিয়েছিল, তাকে পাথর খুঁড়ে আবার উদ্ধার করে বাঁচাতে চাই। ফিরে পেতে চাই আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, আমার সংসার।

নীলা অস্ফুট কণ্ঠে বলে, কিন্তু পুলিস—

সে-ভয়কে আমি জয় করেছি নীলা। অনেক দূরে পাহাড়ের কোল-ঘেঁষা এক দেশে বেঁচে উঠেছি আমি, সেখানে নিয়ে যাব তোমাদের।

আমাদের নিয়ে যাবে?

হ্যাঁ, অবাক হচ্ছ কেন? এখানে থাকলে তো ভয় নিয়ে বাস! পুলিসের ভয়, লোকনিন্দার ভয়, অনাহারের ভয়। সেখানে নির্ভয়ে তুমি, আমি আর খুকু নতুন করে জন্মাব। কিন্তু খুকু আমায় চিনতে পারবে তো? তার কাছে তো আমাকে মরিয়ে রেখেছ?

নীলা মৃদু হেসে বলে, বললেই তো—'নতুন করে জন্মাবে'।

রাত শেষ হয়ে আসে। নীলা বলে, খুকুটা আজ রাতে বাড়ি নেই ; এ ভগবানের আশীর্বাদ। নইলে—

নেই সে খবর জেনেই এসেছি নীলা।

ও, তাই বুঝি?—নীলা হেসে ওঠে, একেবারে পাকা চোর!

হাসির হাওয়া পালে এসে লেগেছে, তবু নিশ্চিন্ত কই? সব কথা সব হাসির অন্তরালে ঢেউ উঠছে অস্বস্তির, দুর্ভাবনার। এ-রাত যদি কোনও দিন শেষ না হত!

অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না এই রাত্রি, অনন্তকালের গায়ে স্থির হয়ে থাকতে পারে না এই রুদ্ধদ্বার নির্জন ঘর?

কিন্তু তা হয় না, তা হবার নয়।

রাত্রি এক সময় শেষ হয়, খুলতে হয় রুদ্ধ কপাট।

ও মা, মা গো মণি! তুমি গেলে না, কী মজা যে হল! হৈ হৈ করতে করতে বাড়ি ঢোকে খুকু। শাড়ির আঁচল স্খলিত, আলগা করে বাঁধা বেণী উস্কোখুস্কো, বিপর্যস্ত। মুখে ক্লান্তি আর স্ফূর্তির অপূর্ব সমন্বয়। তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে তবু ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরে উৎফুল্ল স্বরে বলে, জানো মা, মন্টির বরের আমি নাকি শাশুড়ি হলাম। বাসরঘরে কত গান হল! আমায় বলছিল গান গাইতে। আমি যেন গান গাইতে জানি।

আপন খুশিতে উচ্ছল খুকু ; মায়ের ভাবান্তর তার নজরে পড়ে না।

তার বারো-তেরো বছরের নিস্তরঙ্গ জীবনে এই বিবাহ উৎসবের বৈচিত্র্য তুলেছে এক নতুন তরঙ্গ। পাড়ার সূত্রে মাসিমা, তাঁর নাতনির বিয়েতে নেমন্তন্ন ছিল মাতা-কন্যার। নীলা যায়নি। দুর্ভাগ্যের পরিচয়লিপি অঙ্গে এঁটে উৎসব-গৃহে যেতে ইচ্ছে তার করে না। অনুরোধে পড়ে মেয়েকে পাঠিয়েছিল ঝিয়ের সঙ্গে। এবং খুকুর বেশি রাতে মাঠ পার হয়ে বাড়ি আসার চাইতে বরং বিবাহ-বাড়িতে থেকে যাওয়াই সমীচীন ভেবে রাতে আসতে বারণ করেছিল।

খুকুর জীবনে এ এক নতুন আস্বাদ।

একে তো উৎসবের খাতিরে ফ্রক ছেড়ে পরেছে মায়ের একখানা সিল্কের শাড়ি, যে-শাড়ি সামলাতে অস্থির হয়ে গেলেও নিজেকে ভারিক্কি ভেবে ভারি ভালো লাগছিল—একদিনেই যেন বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে উঠেছে খুকু।

এতগুলো কথা বলার পর মার ভাবান্তর খুকুর চোখে পড়ে। একটিও কথা বললেন না মা! খুকুর এত বড় বিজয়-অভিযানের অন্তে মার এই নীরবতা কী অদ্ভুত, কী অস্বাভাবিক! ও, খুকু রাত্রে আসে নি বলে অভিমান হয়েছে বুঝি? মাকে একা থাকতে দেবে না—এই ভেবেছিলেন বুঝি?

আপন মনে প্রশ্নোত্তর। তবু অভিমানে চোখে জল এসে পড়ে।

মা, রাগ করেছ?

রাগ? রাগ করব কেন?

তবে কথা বলছ না কেন?

বলছি তো।

ওই তো ওই রকম করে বলছ। নিশ্চয় রাগ করেছ। সত্যি মা, তোমার একলা থাকতে খুব খারাপ লেগেছে, না?

নীলা এবার যেন আত্মস্থ নয়, নড়ে-চড়ে স্থির হয়ে বলে, একা তো থাকি নি, একা থাকতে হয় নি। রাত্রে একজন এসেছিলেন।

রাত্রে এসেছিলেন! কে এসেছিলেন মা?—উৎসুক প্রশ্ন করে খুকু, লাবণ্য পিসি বুঝি?

না।

না? তবে কে মা?

তুমি চেন না, আমাদের খুব নিকটজন।

ইস্, খুব নিকটজন, আর আমি চিনি না। চালাকি করা হচ্ছে। নিশ্চয় লাবণ্য পিসি।

খুকুর জ্ঞানে ওই একটি মানুষকেই কদাচ কখনও আসতে দেখেছে খুকু। নইলে রেলভাড়া

দিয়ে নীলাকে দেখতে আসবে আত্মীয়স্বজনের কাছে নীলা এত দামি নয়। লাবণ্য পিসি সত্যি করে আত্মীয় নয়, তাই। তিনিই নীলার ছিন্নভিন্ন ছত্রখান জীবনটাকে কুড়িয়ে তুলে নিয়ে অনেক চেষ্টায় কোনও রকমে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তাঁর প্রাণপণ চেষ্টাতেই মফস্বলের এক সেলাইস্কুলের এই সামান্য চাকরিটুকু নীলার। তাঁর চেষ্টাতেই এই কোয়ার্টারটুকু।

কখন-সখন তিনিই এসে দু-চারদিন থেকে যান।

নীলা মাথা নেড়ে বলে, বললাম তো লাবণ্যদি নয়।

তা হলে বলো কে?

বলব পরে। তুমি আগে মুখ হাত ধোও।

উঃ একটা কথা বলতে অত ভূমিকা করছ কেন মা? যাচ্ছি আমি, দেখে আসছি—

শোবার ঘরের দিকেই অগ্রসর হয় খুকু। আগন্তুককে অবশ্য মহিলা ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারে না সে।

নীলা ওর শাড়ির কোণটা ধরে ফেলে। বলে, এখখুনি যেয়ো না আগে শোনো কে তিনি।

খুকু হতাশভাবে বলে, নাঃ, তুমি আজ একেবারে রহস্য-রোমাঞ্চ।

ধপ করে পরে বসে পড়ে সে আবার।

নীলা যেন খেই পায় না, কোন্ দিক থেকে শুরু করবে কথাটা! এত সহসা কেমন করে বলবে, জ্ঞান অবধি তুমি যাকে মৃত বলে জান, সেই ব্যক্তি সশরীরে এসে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে তোমার মায়ের শয্যার একাংশে?

তা ছাড়া তাতে আশঙ্কা ঢের।

তাই ইতস্তত করে বলে, শোনো, তুমি তাঁকে ছেলেবেলায় দেখেছ, কিন্তু এখন ঠিক বুঝতে পারবে না, তবে আপাতত শুনে রাখ, উনি আমাদের বড় বন্ধু।

তোমার বাবাকে জানতেন উনি।

বেটাছেলে?—অসতর্কে মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়ে যায় খুকুর।

নীলার মুখটা লাল হয়ে যায়। ও শুধু মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানায়।

খুকু নির্বাক।

নাও, এখন মুখটুখ ধোও। উনি ঘুমচ্ছেন, উঠলে প্রণাম করবে।

এই যে খুকু!—বিশ্বজিতের কাছে সহাস্যে পরিচয় করিয়ে দেয় নীলা, দেখুন কত বড় হয়ে গেছে। প্রণাম করো খুকু।

গত রাত্রেই এরকম ঠিক করে রেখেছিল ওরা, চট করে পরিচয় প্রকাশ করা চলবে না খুকুর কাছে। কারণ, ছেলেমানুষের বুদ্ধি, হয়তো এখুনি কার কাছে গল্প করে বসবে আর কোন্ ফাঁক দিয়ে আসবে বিপদ! তার চাইতে বিদেশে চলে গিয়ে, সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে তবে বলবে। তাই এই 'আপনি' সম্বোধনের ছল।

বিশ্বজিৎ সস্নেহ গম্ভীর কণ্ঠে বলে, এখনও ওর নাম শুধু খুকু?

নাঃ, তা কেন? পোশাকী নাম তো একটা আছে। মধুমিতা। ভাতের সময় যে নাম হয়েছিল। —বলেই থেমে যায় নীলা। খুকু কিন্তু মায়ের নির্দেশে প্রণাম করে না, কেমন এক অনমনীয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

একান্তই তাদের মায়ে-ঝিয়ের ঘরের মধ্যে নিতান্ত শুচিস্নিগ্ধ বিছানায় এই লোকটাকে বসে থাকতে দেখে তার মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

কই রে্ খুকু, প্রণাম কর। কী বোকা মেয়ে রে তুই?

মেয়ের অভদ্রতার ত্রুটিটুকু সামলে নিতে চেষ্টা করে নীলা।

গজখানেক দূর থেকে প্রণামের মতো একটা ভঙ্গি করে খুকু।

মেয়ে দেখে বিশ্বজিৎ যেন হতাশ হয়ে যায়।

কিন্তু কেন? ওর কি বাস্তববুদ্ধি ছিল না? দু বছরের মেয়েকে রেখে এগারো বছর পরে ঘুরে এলে, সে কি সেই মূর্তি নিয়েই ছুটে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে? সে কি জানবে, তোমার চিত্ত কত তৃষিত হয়ে আছে সেই কচি কোমল স্পর্শটির আশায়?

নাকখ্যাঁদা ভুরুবিহীন তুলোর পুতুলের মতো সেই অদ্ভুত সুন্দর মেয়েটা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে বুঝে ফেলে যেন শোকাহত হয়ে গেছে বিশ্বজিৎ।

কোন্ ক্লাসে পড়?

খুকু নীরব।

নীলা তাড়াতাড়ি বলে, কই, বল্? বল্ কোন্ ক্লাসে পড়িস।

তথাপি নীরবতা অব্যাহত থাকে।

লজ্জায় পড়ে গেছে।—খুকুর মাথা ডিঙিয়ে বিশ্বজিতের চোখে চোখে একটা ইশারা করে বলে নীলা, কোন ছেলেবেলায় দেখেছে আপনাকে, মনে তো নেই।

কিন্তু মাথা ডিঙোতে পারলেই কি বিপদ ডিঙনো যায়? সামনের আরশিটার দিকেই যে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল খুকু, পিছন থেকে এ-কথা কেমন করে জানবে নীলা? আরশিতে-দেখা মায়ের হাস্যোৎফুল্ল মুখখানা যে তাকে ক্রমশই কঠিন করে তুলছিল তা-ই বা বুঝবে কেমন করে?

মায়ের এমন মুখ কবে দেখেছে খুকু?

তাঁর বিষণ্ণ মূর্তিটাই প্রধান। অবিশ্যি কারণে-অকারণে হাসে নাকি আর? উচ্ছ্বসিত হাসিও হাসতে দেখেছে বই কী, কত সময় দেখেছে। কিন্তু না হেসেও এমন আলো-ঠিকরে-পড়া মুখে তাকাতে দেখেছে কবে?

নীরবতাটা অস্বস্তিকর।

বিশ্বজিৎ আবার বলে, কই, বললে না তো কোন্ ক্লাসে পড়?

ক্লাস নাইনে।

ক্লাস নাইন! রীতিমতো বড় মেয়ে। আর একবার আহত হয় বিশ্বজিৎ। ওর মনে হয়, কোথায় যেন একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে ওর। যেন যে-ব্যাঙ্কে ওর আজীবনের সঞ্চয় গচ্ছিত ছিল, হঠাৎ সেই ব্যাঙ্কটা ফেল হওয়ার খবর পেয়েছে সে।

কথা এগোয় না।

আমি যাই।—বলে এক সময় চলে যায় খুকু।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হয় নীলাকে।

বিলাসী বলে, যা হোক তবু নিরুদ্দিশ রাজার স্মরণ হয়েছে, ভেয়েরা মাকে নিতে পাঠিয়েছে। ইনিও কি তোমার আপন ভাই মা?

নীলা গম্ভীরভাবে বলে, আপন ভাই আমি কোথায় পাব বিলাসী? আপন ভাই কি আমার আছে? তাকে তো ভগবান অনেক দিনই নিয়েছেন।

কিছু মনে কোরো নি মা, এমনি শুধচ্ছিলাম।—বিলাসী অপ্রস্তুত হয়ে বলে, ক দিনের জন্যে যাচ্ছ?

দেখি! দু-দশ দিন হবে হয়তো।

দেরি কোরো নি মা।—বলে বিলাসী স্কুলের কাজে চলে যায়।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়ে নিয়ে আসা তার আসল কাজ। সকাল-সন্ধ্যা নীলার কাজ করে।

নীলা রান্না করে পরিপাটি করে, তবু হাতে পায়ে মনে যেন অভিসারিকার চাঞ্চল্য। প্রতীক্ষা করে খুকু কতক্ষণে স্কুলে যাবে। নিজে আজ আর যাবে না সে। চলে যেতে হবে এখান থেকে, কতদিনের বিরহ-নিঃশ্বাসক্ষুব্ধ ঘরখানা একদিনের জন্য মিলনের সৌরভে প্রাণ পাক। রাত্রে তো খুকু আছে, আছে অনেক সমস্যা।

নিঃশব্দে ভাত খেয়ে নিঃশব্দেই বই-খাতা গুছিয়ে বেরিয়ে গেল খুকু। নীলা আড়ে আড়ে ওর জলদগম্ভীর মুখখানা দেখছিল। বুঝছে ব্যাপারটা খুকুর বিশেষ পছন্দ হয় নি। না হবারই কথা। আহা! এই দণ্ডে যদি সত্যি কথাটা বলা যেত।

কী ভয়ানক খুশি হত খুকু।

কী ভয়ানকভাবে চমকে যেত। চমকে গিয়ে কী রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত! না কি সহজে বহন করতে পারত না সেই প্রচন্ড আনন্দের ভার। তা হলে হয়তো এই-ই ভালো।

মেয়ে চলে গেলে পরিপাটি করে স্বামীকে খাওয়াল নীলা, বিশ্বজিতের অনেক অনুরোধেও একত্র খেতে বসল না, বসল পরে। অনুরোধ রাখল—অশনে নয়, বসনে। নরুনপাড় ধুতিখানা ছেড়ে পরল পুরনো দিনের একখানা ঢাকাই শাড়ি, চিকনের-কাজ-করা ব্লাউস। শেষ বিবাহ-বার্ষিকীর দিন যে শাড়ি জামা উপহার দিয়েছিল বিশ্বজিৎ। সিঁথেয় সিঁদুর দিতে ভয় করে, খুকু আসার আগেই তো ছেড়ে ফেলতে হবে এই বাসরসজ্জা। অনেক দিনের অনভ্যস্ত হাতে কপালে আঁকল ছোট একটি সিঁদুর-টিপ।

বাইরের দরজায় ভালো করে খিল এঁটে এসেও স্বস্তি হয় না, ঘরের দরজা জানলা আঁটিতে হয়। কে কোন্ দিক থেকে দেখে ফেলবে, কে জানে। সাবধানের মার নেই।

কোথা নিয়ে কেটে গেল অত বড় দুপুরটা, কখন বেলা গেল গড়িয়ে। গতকালকের সারারাত্রিব্যাপী অনিদ্রার শোধ নিতে বেলা তিনটের সময় যে নিদ্রা এসে মায়াকাজল বুলিয়ে দেবে চোখে, তা-ই বা কে ভেবেছিল?

প্রচন্ড একটা দোর ঠেলার শব্দে তন্দ্রার জগৎ থেকে ছিটকে এসে পড়ল নীলা, আর ধড়মড় করে ছুটে চলে গেল দরজা খুলতে।

কপালের সিঁদুর-টিপটা যে লেপে গেছে সারা কপালে, আর পরনে আছে ঢাকাই শাড়ি আর চিকন-করা ব্লাউস—এ-কথা ভুলেই ছুটল। এত অসহিষ্ণু করাঘাত কার? খুকুর? এ-রকম তো কোনওদিন—?

নীলা ভুলে যায় এ-রকম দিনই বা এসেছে কবে? নীলা নিজের সেলাই-স্কুল-ফেরত খুকুর স্কুলের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। খুকুর আগে হলে, সে আসে সেলাই স্কুলের দরজায়।

খিল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে ঠেলে দরজাটা হাট করে দিয়ে খুকু অস্বাভাবিক চিৎকার করে ওঠে, কী, হয়েছিল কী?

পরক্ষণেই মায়ের দিকে তাকিয়ে পাথর।

শাড়ির পাড়ের কথা প্রথমটা মনে পড়ে নি নীলার, থতমত খেয়ে বলে খুব বুঝি ডেকেছিস? হঠাৎ কী রকম ঘুমিয়ে—

পরক্ষণে সেও পাথর হয়ে যায় মেয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে। এ কী সর্বনেশে ভুল করে বসল সে!

হাতের বইগুলো রান্নাঘরের দাওয়ায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে গটগট করে উঠে গেল খুকু ছাদে, একতলা এই বাড়িটুকুর যা পরম সম্পদ হাত দেড়েক লম্বা চিলেকোঠাও আছে কিনা একটা।

ছাদটা ন্যাড়া ছাদ বলে মেয়েকে একা বড় উঠতে দেয় না নীলা ; তা ছাড়া এখন তো পড়ন্ত বেলার কড়া রোদ্দুর। কিন্তু নিষেধ করবার সাহস হয় না নীলার।

খুকুর মনে কি শুধুই অপছন্দের বিরক্তি?

না কি সন্দেহ জেগেছে মনে? জগতের সবচেয়ে কুটিল সন্দেহ?

নাঃ, দেরি করে দরকার নেই, আজ রাত্রেই সত্যি কথাটা ওকে বলে দিতে হবে।

চিলেকোঠা থেকে নামানো গেল না খুকুকে, ওর নাকি ভীষণ মাথা ধরেছে। নীচে এসে বিপন্নমুখে বলে নীলা, খুকুটা তো মুশকিল বাধাল।

বিশ্বজিৎ ক্ষুব্ধহাস্যে বলে, তাই দেখছি। বেশ ছিলে তোমরা, আমিই এসে মুশকিল বাধালাম।

আঃ! কী যে বলো! শোনো, আমি ভাবছি ওকে জানিয়ে দেওয়াই হোক, নইলে যাবার সময় গোলমাল বাধাতে পারে।

বেশ, শুধু—

কী শুধু?

নাঃ! হঠাৎ মনে হল, আকাশের স্বপ্ন মাটিতে আছড়ে ভেঙে পড়বে না তো? কেমন যেন আতঙ্ক হচ্ছে।

ও-কথা কেন? এখনও তুমি তেমনি কবি-কবি আছ। উঃ!

কিন্তু সত্যি কথাটা কীভাবে জানিয়ে দেওয়া যাবে?

খুকুর মুখে চোখে, বোধ করি, সর্বাঙ্গের রেখায় রেখায় সন্দেহ আর বিদ্রোহ যেন নীলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে উদ্যত হয়ে আছে। রাত কেটে গেল খুকুর চিলেকোঠার ঘরে। অগত্যা নীলারও কাটল খোলা ছাদে মাদুর পেতে শুয়ে। আর রীতিমতো শঙ্কিত হল নীলা, পরদিন যখন সেই ঢাকাই শাড়িখানা পাট করে তুলে রাখতে এসে দেখল, সেটাকে কে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কেটে ফালি ফালি করে রেখেছে।

পরিবেশ সৃষ্টি করবার অবকাশ আর নেই। অবকাশ আর নেই অবকাশ নেই রইয়ে-সইয়ে বলবার। বিশ্বজিৎ বলেছে এখানে থাকবার সাহস ওর আর নেই, আজ রাত্রেই রওনা দিতে হবে। অতএব আচমকাই বলতে হবে।

খুকু, আজ আর স্কুলে যাস নি।

কী হয়েছে—ভুরু কুঁচকে তাকাল খুকু।

বলছি আজ আর স্কুলে যাস নি। অনেক কথা আছে, আছে অনেক কাজ।

আমার সঙ্গে কারও কোনও কথা নেই, কোনও কাজও নেই।

কৈশোর ছাড়িয়ে খুকু কি যৌবনে পৌঁছল সহসা?

আছে কথা, আছে কাজ। নীলা ধমকের ভান করে—আজ রাত্রের গাড়িতে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে—

খুকু সহসা মুখ ফিরিয়ে ঠিকরে ওঠে। দুই চোখে জ্বলে ওঠে সন্দেহ, ব্যঙ্গ আর ঘৃণার আগুন।

তোমার যেতে ইচ্ছে হয়, তুমি যাও গে, আমি কী করবে যাব?

কী? কী বললি? বল্, কী বললি?

উদ্ধত স্বরে খুকু বলে, আমি যাব না।

রাগ করছিস কেন খুকু? কান পেতে শোন্ না আমার কথাটা। কাছে আয়।

এখান থেকেই বেশ শুনছে পাচ্ছি, বলো না কী বলবে?

যাকে দেখে অত রাগ করছিস, যার সঙ্গে যেতে চাইছিস না, সে কে জানিস?

জানি না। জানতে চাই না।—বলে খুকু জুতোয় পা গলায়।

শোন্ খুকু চলে যাস নি। ও আমাদের সবচেয়ে আপনার লোক, ও তোর—

কখ্খনো না,—ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মতো ফুঁসে ওঠে তেরো বছরের খুকু—কখ্খনো না। ও আমাদের কেউ না। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি মিথ্যে কথা বলবে, বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে। বিলাসীর মতো বোকা নই আমি।

বইখাতাগুলো উঠোনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যায় খুকু। আর স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে নীলা খোলা দরজার দিকে। উত্তপ্ত নিশ্বাসে কান মাথা আগুন হয়ে আসে, সমস্ত শরীর থরথর করতে থাকে।

বিশ্বজিৎ এত কথার কিছুই জানে না। গা-ঢাকা দেবার পক্ষে সুবিধাজনক ভেবে চিলেকোঠায় আশ্রয় নিয়েছে সে সকালবেলাটা।

শহরের পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার অপবাদ সর্বজনবিদিত, মফস্বলের পুলিস চৌকিদাররা তো দারুব্রহ্ম, তবু দারুব্রহ্মেরও টনক নড়ে, বালিকা একটা মেয়ে যদি দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসে আর সে মেয়েটা যদি ওদের চেনাজানা হয়। স্কুলে যাবার পথে থানা। যেতে আসতে দু বেলা ওর কোল মাড়িয়ে হাঁটতে হয় খুকুকে। ছেলেবেলায় কত আদর করেছে ওই বুড়ো চৌকিদারটা। হ্যাঁ, সেই মেয়ে যদি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এসে বলে, আমাদের বাড়িতে একটা বদমাস লোক ঢুকে পড়েছে, আমার মা একা আছেন, শিগগির চলো তোমরা, তখন একটু নড়াচড়া করতে হয় বই কী। আর সত্যি যুদ্ধ দাঙ্গা সব কিছু মিটে যাবার পর বড় বেশি মিইয়ে গেছে তাদের কাজকর্ম, তবু একটা খোরাক জুটল। একা একজন মহিলার বাড়িতে বদমাস লোক ঢুকে পড়ার ফয়সলা করার মতো পছন্দসই খোরাক।

খুকু আর উদ্‌ভ্রান্ত নেই। আত্মস্থ হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। হ্যাঁ, মাকে রক্ষা করতে হবে তাকে। এ-দায়িত্ব খুকুরই।

কিছুতেই মাকে উচ্ছন্নে যেতে দেবে না সে।

কে? কে?

চমকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল নীলা। উঠোনে গোটা তিন-চার লাঠিধারী পাহারাওলা আর রক্তমুখী খুকু।

কোথায়! ডাকু বদমাস কোথা?

খুকু নিঃশব্দে চিলে কোঠার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখায় শাণিত ছুরির নির্মম দৃষ্টি নিয়ে।

মফস্বলের নিজস্ব সংবাদদাতা সংবাদটা পাঠায় ধীরে-সুস্থে। সে-খবর শহরের খবরের কাগজে ছাপা হয় আরও ধীরে-সুস্থে। 'অমুক জেলা'র নানা সংবাদের মধ্যে ছাপা হয় এক 'চাঞ্চল্যকর সংবাদ' ঃ "দিবা দ্বিপ্রহরে জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর উপর দুর্বৃত্তের আক্রমণ। বালিকা কন্যার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে জননীর সম্ভ্রমরক্ষা।" অতঃপর পুলিসের কৃতিত্বের একটি জোরালো কাহিনী বর্ণনান্তে জানানো হয়, "জানা যায়, উক্ত দুর্বৃত্ত একজন পলাতক খুনী আসামি, পুলিস বহুদিন হইতে তাহার সন্ধান করিতেছিল।"

এর থেকে বেশি কথা সংবাদপত্র বলে না।

এর পরের কথা বলার দায়িত্ব নীলার কাহিনীকারের। কিন্তু বলবার আর আছেই বা কী? এখন তো নীলা নিত্যনিয়মে সাদা লংক্লথের উপর নরুনপাড় ধুতি জড়িয়ে সেলাই-স্কুলে যাতায়াত করে, এখন নিত্যনিয়মে তাড়াতাড়ি করে খুকুর স্কুলের ভাত বাঁধে। গোটা কয়েক দিন ওকে নিয়ে পাড়ায় যে হাসাহাসি উত্তেজনা আর সমালোচনা চলেছিল, সেও ঠান্ডা মেরে গেছে।

সত্যি কথাটা আজ পর্যন্ত আর খুকুকে বলা হয়ে ওঠে নি নীলার। কিন্তু বলে লাভই বা কী? বিশ্বাস করাতে না পারলে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলার অপরাধে মায়ের উপর ঘৃণা আরও বাড়বে খুকুর। বিশ্বাস করাতে পারলে বাপের উপর জন্মাবে ঘৃণা। তা হলে ও-বেচারারই বা আশ্রয় কোথা?

চির-আশ্রয়টা তো ধসেই গেছে। মায়ের আর খুকুর মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে এক পাথরের প্রাচীর।

হয়তো এমনি করেই জগতের অনেক সত্য কথা মিথ্যার জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা পড়ে থাকে, এমনি দ্বিধার জন্যই অনেক সত্য কথা অনুক্ত থেকে যায়। মানুষের হাতে প্রতিকার নেই, তাই তারা শুধু আর-একটু রোগা হয়ে যায়, আর-একটু কোলকুঁজো হয়ে পড়ে।

মনের গহনে

ধপধপে রং দপ্‌দপে মুখ, নিটোল গঠন, আর অটুট স্বাস্থ্য। এক দিনের জন্য কেন মাথা ধরিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখে নাই।

চওড়া করিয়া পরা সিঁথির সিঁদুরে, চওড়া লাল পাড় গরদের শাড়িতে, আর সকলের উপর, মুখের চিরস্থায়ী হাসিটিতে দেখিলেই মা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হয়।

গায়ে অলঙ্কারের প্রাচুর্য নাই; শুধু দুই হাতে বাইশ ভরি ওজনের মিছরিদানা চুড়ি, গলায় মোটা গোট হারের গোছা।

বনেদি বংশ, ঠাকুর দেবতা, ক্রিয়াকর্ম, বারোমাসে বাহান্নপার্বণ—সেমিজ ব্লাউজ পরিয়া সাজিয়া বেড়াইবার অবসর নাই, রুচিও নাই।

এই বৃহৎ পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী হইবার মতো বুদ্ধি ও যোগ্যতা তাঁহার আছে।

বড়তরফের ছোটগিন্নি।

ছোট বটে, আসলে তিনিই সর্বেসর্বা; বড়কর্তা ও বড়গিন্নি অনেককাল মরিয়াছেন। তাঁহাদের সাত বছরের ছেলের 'মা' সাজিয়া যোলো বছর বয়স হইতে ছোটগিন্নি সেই যে সংসারের হাল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যও সে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই।

এখন একমুহূর্ত 'ছোট মা'কে না দেখিলে যেন এতবড় জমিদারবাড়ি অচল হইয়া দাঁড়ায়।

দেব দ্বিজ, গুরু পুরোহিত, আশ্রিত প্রতিপাল্য—সকলের উপর সমান স্নেহ, সমান সজাগ দৃষ্টি। 'আমার প্রতি এতটুকু ত্রুটি রহিয়া গেল' এমন কথা কাহারও বলিবার জো নাই। দেওয়ান গোমস্তা—কাছারিবাড়ির কর্মচারীরা হইতে বাগ্‌দি পাইক পর্যন্ত 'ছোট মা' বলিতে অজ্ঞান।

সত্য হিসাব ধরিলে বয়স বোধহয় আজও ত্রিশ পার হয় নাই। সেকথা স্বীকার করে কি? কথায় কথা উঠলে হাসিয়া বলেন,—পাগল হয়েছ তোমরা। বয়স কী কম হ'ল? হিরণ-ই আমার যেঠের কোলে কত বড়টি হ'ল বল তো?

আড়ালে হয়তো কেহ বলে 'বাড়াবাড়ি', কেহ ঠোঁট উল্টাইয়া বলে 'আদিখ্যেতা'—যাহারা বলে তাহারা হয়ত উপকার বেশি পায় তাই এত উদারতা সহিতে পারে না, তবু শ্রদ্ধা সকলেই করে, ভালোও সকলে বাসে।

হয়তো বিশেষ কাহারও 'মা' বলিয়া গণ্ডি কাটা নাই বলিয়াই সকলের মা হওয়া সহজ হইয়াছে; তাই বন্ধ্যাত্বের জন্যও ক্ষোভ ছিল না। উপযাচক হইয়া যাহারা "অঘটন ঘটন

পটিয়সী" শিকড়বাকড়, মাদুলী, কবচ আনিয়া দিবার জন্য জেদ করিয়াছে ছোটগিন্নি তাহাদের মিষ্ট কথায় নিবৃত্ত করিয়া জানাইয়াছেন, হিরণ তাঁহার একাই একশো'। সন্তানের অভাব কী?

সম্প্রতি হিরণের বিবাহ দিবার একটা দৃঢ় সঙ্কল্প যেন তাঁহাকে নেশার মতো পাইয়া বসিয়াছিল। এ বাড়িতে কোনও পুরুষে কেহ কখনও বিদ্যার্জন করিতে বাড়ি ছাড়া হয় নাই, প্রথম হিরণ-ই বোধহয় রেকর্ড ব্রেক করিয়াছে। ছেলের শিক্ষার জন্য, ছোটকর্তার চাইতে ছোটগিন্নির চেষ্টাই অধিক ছিল। ছিল বটে, কিন্তু হিরণ যখন কলিকাতায় গিয়া কলেজে ভর্তি হইল ছোটগিন্নির দিন চলা ভার হইয়া উঠিল। এতবড় সংসার তিলার্ধ অবসর নাই, তবু তো মন খাঁ খাঁ করিতে থাকে, কোনও কাজে মন বসে না। তাহার অনুপস্থিতির অভাব পূরণ করিতেই বিবাহ দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

ইচ্ছাকে মনের মধ্যে লালন করিয়া পুষ্ট করিয়া তুলিতেই কিছুদিন কাটিয়া গেল; ভবিষ্যৎ সংসারের রঙিন ছবি কল্পনার রঙে নিত্য নূতন হইয়া উঠিতেছিল; হিরণ বি এ, ক্লাসে উঠিতেই সংকল্প আসরে নামিল।

কথাটি উঠিল ছোটকর্তা তখন আহারে বসিয়াছেন। প্রকাণ্ড রূপার থালায় ও আট দশটি রূপার বাটিতে পরিপাটি করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন সজ্জিত।

এ বিষয়ে ছোটগিন্নির বরাবরের শখ—নিত্য নূতন আসন না পাতিলে, মাজা বাসন আপনি বসিয়া না মাজিলে, নিজের হাতের দুই চারখানা ভালো রান্না করিয়া না খাওয়াইলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। স্বামীর জন্য সুগন্ধি দিয়া পান সাজিতে, দাসীদের পাতা বিছানা উল্টাইয়া পাতিতে আলস্যও ছিল না। ইহাতে কেহ কিছু লজ্জার কিছু দেখিতে পাইত না; কারণ গৃহিণীর সহজ সপ্রতিভভাব সকলকে গৃহকর্তার মর্যাদা ও অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিত মাত্র।

প্রত্যহের মতো আজও ছোটগিন্নি রেশমি ঝালর-দেওয়া পাখাখানা নাড়িতে নাড়িতে এটা ওটা গল্প করিতেছিলেন। আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; যেন সহসা স্মরণ হইল এমনভাবে বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ ভালোকথা, ক'খানা কুষ্ঠি হাতে এসেছে, ঠাকুরমশাইকে একবার ডেকে দিও তো, মিলিয়ে দেখবেন একবার—কুষ্ঠির মিল হ'লে তবে মেয়ে দেখা।

ছোটকর্তা জগদীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় চল্লিশ ছাড়াইলেও মুখে চোখে আজও যেন একটা শিশুসুলভ অসহায়ভাব রহিয়া গেছে; ফর্সা রং আর গোল-গাল চেহারার সহিত এই নিরীহভাবটা মিশিয়া তাঁহাকে যেন একটি বড় মাপের ছোট ছেলের মতো দেখায়। বড়ভাই অকালে মরিয়া বিষয়সম্পত্তির দায়ে জড়াইয়া যে তাঁহাকে পরম বিপদে ফেলিয়া গিয়াছেন সেকথা আজও ভুলিতে পারেন নাই এবং 'ছোট বৌ' যে সেই বিপদের উদ্ধারকর্ত্রী সেকথা সর্বদা মনে রাখেন। এতটুকু ঝঞ্ঝাট দেখিলেই তাঁহার হৃৎকম্প হয়।

কুষ্ঠির নামে চমকিয়া কহিলেন—বিয়ে কার? কুষ্ঠি কীসের?

বিবাহের কথা ভিতরে ভিতরে অনেকদূর অগ্রসর হইলেও ছোটকর্তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কেহ যে তাঁহার কাছে চাপিয়াছে তাহাও নহে, কথা তাঁহার কাছে চাপিতে হয় না, কানের ভিতরে ঢালিয়া না দিলে জানাইবার উপায় নাই। দিলেও যে মনে রাখিবেন এমন কথা জোর করিয়া বলা কঠিন।

ছোটগিন্নি স্বামীর স্বভাব ভালোই জানেন। করিবার যাহা, তিনি-ই সব করিবেন, তবে যথাসময়ে একবার জানানো দরকার; বলিলেন, আকাশ থেকে পড়লে যে? হিরণের ছাড়া আবার কার?

হিরণ?—ছোটকর্তার কপাল কুঁচকাইয়া আসে—এখুনি বিয়ে কী ওর? ক্ষেপলে না কি?

আমি ক্ষেপিনি, তুমিই ক্ষেপেছ। কেন ছেলের বিয়ের বয়স হয়নি না কি!

কত বয়স হ'ল?

কত বলে মনে হয়? মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসি চাপিলেন ছোটগিন্নি।

জগদীন্দ্র আন্দাজ করিবার একটা চেষ্টা করিলেন—কত হবে? ষোলো সতেরো বোধ হয়?

ছোটগিন্নির হাসি থামে না—দিন দিন ভীমরতি ধরছে; এবার নিজের বয়েস বলতে কোনওদিন পঁচিশ বলে বসবে দেখছি। কিছু হিসেব থাকে না; হিরণ যে গেল আশ্বিনে কুড়ি পেরিয়ে একুশে পা দিয়েছে গো!

বলো কি! সেদিনের বাচ্ছাটা, সে যাই হোক, বিয়ের তাড়াতাড়ি কি? পড়াটা শেষ হোক না।

না অত সবুর আমার সইবে না। বিয়ে ওর এই বো'শেখে আমি দেবই। শুধু দুটো বুড়ো বুড়ি দিয়ে সংসার মানায়? ছেলে তো এখন বিদেশবাসী হ'ল।

...বুড়ো বুড়ি! তা' সত্যি, জগদীন্দ্র দুষ্ট-হাসি হাসিলেন, কিন্তু নিজেকে যতই বুড়ি বলে জাহির করো ছোটবৌ, রূপ তো বাড়ছে বই কমছে না; দিন দিন মনে হয় যেন চির-যৌবনের বর—

আঃ, কেলেঙ্কারি আর কোরো না বাবু, হাসি দেখলে গা জ্বলে যায়। চিরদিন-টা একরকম গেল! একটু গম্ভীর হ'তে শেখো দিকি! শেষ পরে আবার ছেলের বৌর সামনে কি না বেয়াদপি করে বসো এই আমার ভাবনা। তা' হলে আর বৌ মানবে না।

ছোটকর্তা একটু ক্ষুণ্ণভাবে হাসিলেন, তাই তো বলছি এখুনি ছেলের বৌ এনো না। সত্যিই বুড়ো হতে হ'বে তা'লে।

আহা কথার শ্রী দেখ। নিজের কথাগুলো ভাবো একবার : উনিশ বছর থাকতে যে বিয়ে হ'ল? সেসব দিনের কথা মনে পড়ে? না ভুলে গিয়েছ?

ভুলে যাইনি ছোট বৌ; কোনও দিনই ভুলিনি! মনে হয় আজও যেন সেই বয়সেই আছি! শুধু তুমিই দিন দিন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছ।

মুহূর্তের জন্য ধপধপে মুখখানা একবার রাঙা হইয়া উঠিল, হয়তো চোখের দৃষ্টি একটু গভীর হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই, বিচলিত হইবার মেয়ে ছোটগিন্নি নয়।

পাখাখানা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তাই হয় গো, তাই নয়, এখন ওদের আমোদ-আহ্লাদ করবার সময়, আমাদের দেখেই সুখ। যাক ভালো লোকের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলাম বটে; আপনার কথাই সাত কাহন। তোমায় কিছু করতে হবে না তো; বিয়ের দিন নেমন্তন্ন খেয়ো। তা'হলেই হ'বে। ছেলের বিয়ের নামে মুখ শুকিয়ে আমসি। আমার ছেলের বিয়ে আমিই দিতে পারব।

তা গর্ব করিলে অন্যায় হয় না এমন বৌ আনিলেন ছোটগিন্নি। এ তল্লাটে অমন একটা খুঁজিয়া পাওয়া দায়। সমারোহ যা হইল তাহাও বহুকাল কেহ দেখে নাই বলিলে মিথ্যা বলা হয় না।

তবু নববধূর রূপের খ্যাতি তলাইয়া গিয়া ছোটগিন্নির গুণের খ্যাতিতে নূতন করিয়া দেশ ভরিয়া গেল।

যাহারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বারবার বলিতে লাগিল, "সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা", "স্বয়ং লক্ষ্মী", তাহারা মুখের কথা বানাইয়া বলে নাই, মনের কথাই বলিল। অবশ্য মেয়েমহলে ততটা নয়; কারণ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মেয়েমানুষে করিবে এমন আশা করা অন্যায়। ছোটগিন্নিরও আনন্দের অবধি ছিল না। সহস্র কাজের মধ্যে কখনও বধূর ঘরে আসিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছেন, চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অভ্যাগতা কুটুম্বিনীগণকে ডাকিয়া কহিতেছেন, মুখ দেখেছ, একবার? যেন

ভাস্করের হাতে কুঁদে কাটা মুখ। দুধে আলতা গোলা এমন রংই বা কটা দেখেছ তোমরা বলো সব। বিধাতা নির্জনে বসে গড়েছেন।

লোকে আপ্যায়িত করিয়া বলিল, তা' এমন না হলে মানাবে কেন। শাশুড়ির পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি হওয়া চাই তো!

শাশুড়ির সঙ্গে তুলনা কোরো না বাবু, কীসে আর কীসে?

একজন পিস-শাশুড়ি আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, তা' হোক, শাশুড়ির মতন গুণ পেলে তবে বলি ধন্যি; রূপ তো দুদিনের, গুণ চিরদিনের।

আর শাশুড়ির মতো গুণ পেতে হবে না। তোমরা আশীর্বাদ করো বৌমা আমার বছরের ভেতর ছেলে কোলে করে বসুক, আমিও নাতি বুকে ক'রে বাঁচি। ব্যস্ত হইয়া ছোটগিন্নি অন্য কাজে প্রস্থান করেন।

বিবাহের গোলমাল চুকিতেই জমিদারবাড়ি আবার একটা বড় উৎসব লাগিল। কুলগুরুকে ভাটপাড়া হইতে আনাইয়া, ছোটগিন্নি ঘটা করিয়া দীক্ষা নিলেন।

লোকজন আবার বিস্তর আসিল; কাজ চুকিতে আপন আপন স্থানে ফিরিয়াও গেল, শুধু পিসতুতো ননদ কমলমঞ্জরীকে ছোটগিন্নি ছাড়িতে চাহিতেছিলেন না। কমলের স্বামীর চাকুরি বিদেশে বিদেশে, আসা বড় একটা ঘটিয়া উঠে না; বিবাহেও কোলের ছেলের অসুখ বলিয়া আসিতে পারে নাই। এই উপলক্ষে আসিয়াছে।

কমল এবাড়ির ভাগিনেয়ী, আগে প্রায়ই এখানে যাওয়া আসা ছিল। ছোট-বৌর সহিত একই বয়স; বধূজীবনে তাহার সাহচর্য ছোটগিন্নির একান্ত কাম্য ছিল। বাড়ির লোককে লুকাইয়া স্বামীর সহিত গোপন মিলনের সহায়তা করিতে, আবার বেচারা বরকে নাকাল করিবার নিত্য নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া দিতে তাহার জুড়ি ছিল না। মনের কথা ব্যক্ত করিবার এমন অন্তরঙ্গ সখীও আর ছিল না।

এ বয়সে সে অন্তরঙ্গ সখীত্ব আর থাকে না সত্য; কিন্তু, তবু বহুকাল পরে দেখিলে আনন্দ হয়। হাসিয়া নন্দাইকে বলিলেন, এখন ভাই একলাই ফিরতে হ'বে, ননদটিকে ছাড়ছি নে। একচেটে অধিকার করে রেখেছ একেবারে, আমাদেরও কিছু ভাগ আছে।

ভদ্রলোককে অগত্যাই কাষ্ঠহাসি হাসিতে হয়—বেশ তো রাখুন না যতদিন ইচ্ছে! এরপর উনি নিজেই না আপনাকে ব্যস্ত করে তোলেন, এই ভয়।

ইস্ তা বই কী, আমরা অমন নই, নিজেরাই এক মুহূর্তের বিরহে জগৎ অন্ধকার দেখ।

স্বামীকে বিদায় দিয়া কমলের মন ভালো ছিল না। আহা, মুখখানি ম্লান করিয়া ফিরিয়া গেল। কত অসুবিধা হইবে, কত কষ্ট পাইবে। ভোরবেলা উঠিতে পারে না, না ডাকিলে ঘুম ভাঙে না। হয় তো তাড়াতাড়িতে না খাইয়া কাজে যাইবে।

অন্ধকার ঘরে শুইয়া কোলের ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কমল ভাবিতেছিল : চলিয়া গেলেই হইত। কই আগের মতো তেমন ভালোও লাগে না তো এখানে থাকিতে! তখন মামার বাড়ি আসার সে এক আলাদা স্ফূর্তি; এখন থাকা—কতকটা যেন চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া।

সহসা দরজার শব্দে চমকিয়া কহিল, কে?

আমি গো আমি, ভয় পেলে নাকি?

নাঃ, ভয় আবার কি? দোর দেব বলে উঠি উঠি করছিলাম; তুমি আজ আবার এখানে কি করতে? কাজকর্মও চুকলো, কুটুম্ব সাখ্যেত সব বিদেয় হ'ল, ছোড়দা বেচারাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন, আমাকে আগলাতে হবে না—একলা বেশ থাকব।

পাশের বিছানায় ধপাস করিয়া শুইয়া পড়িয়া ছোট গিন্নি কহিলেন, তোমায় ছোড়দাকে ত্যাগ দিয়েছি—

কথার ছিরি দেখ। যা বেরো—দূর হ'।

যাব কোথায়? এইখানেই স্থিতি।

তার মানে?—কমলের স্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে।

ছোটগিন্নি হাসিতে থাকেন!—তুইও যেমন ঠাকুরঝি, বুড়ো বয়সে আর বরের মন জোগানো পোষায় না। ছেলে, বৌ বা মনে করবে কি? ম্যাগো ছিঃ। ছেলের বিয়ে থেকেই এ ব্যবস্থা বহাল।

কমল বড় বিরক্ত হইল। তিক্তস্বরে কহিল, 'ছেলে ছেলে' করে বাড়াবাড়ি করিসনে ছোটবৌ, যা রয় সয় তাই ভালো। তাই কদিন দেখছি ছোড়দা বেচারার যেন মনে সুখ নেই! আমি বলি কাজের ঝঞ্ঝাট তাই। তোমার ভেতর এত ভীটকিলেমি তা' কে জানে।

ছোট গিন্নির স্বভাবসিদ্ধ হাসি আরও বাড়ে—ওদের কথা বাদ দে ঠাকুরঝি, বেটাছেলে ষাট বছরেও সাবালক হয় না, তাই বলে' আমাদের ধম্ম কম্ম করতে হবে না? গুরুদেব বলেছেন, একপ্রহর রাত থাকতে জপ অভ্যাস করতে পারলে তবে যদি কিছু হয়।

হয় তোমার মাথা। মুখের কথা বলতে তো পয়সা লাগে না, বলি গুরুগিন্নির কোলের ছেলে তো এখনও হামা টানছে নিজের চক্ষে দেখলাম।... কম বয়স হইতেই কমলের বড় মুখ, রাগিলে বলিতে কিছু বাধে না।

ছোট গিন্নি অন্ধকারে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বোধকরি কমলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইলেন। উত্তর দিলেন না।

কমল কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিয়া কহিল, গুরুর আদেশ না কি?

না তা' অবশ্য নয়, বৌমা ঘর করতে আসার আগে থেকেই, একটু গিন্নিধন্যি হওয়া ভালো লো, তা' নইলে বৌ ছেলে মানবে না!

সেই মান নিয়ে ধুয়ে জল খাওগে। সেই যে বলে না—"সর্বস্ব খুইয়ে পাকা টেঁকশাল"—তোর তাই হয়েছে।

ছোট গিন্নি কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া বলিলেন, সর্বস্ব খোয়াতে যাব কীসের দুঃখে—বালাই—আমার আবার অভাব কি? দান-ধ্যান, ক্রিয়া-কর্ম, এতবড় সংসার, ছেলে বৌ, দুদিন বাদে নাতির ঠাকুমা হ'তে হবে—তোর মতন জোড়ের পায়রাটি তো নয়!

কমল বাস্তবিকই চটিল; ঝাঁঝিয়া উঠিয়া কহিল, ওই বলে আপনাকে ভোলাগে যা ছোটবৌ, আমার কাছে পণ্ডিতি ক'রতে আসিস নে।

ছোট গিন্নি তাঁহার গায়ে একটা ঠেলা দিয়া কহিলেন, ঠাকুর জামাইয়ের জন্যে বড্ড মন কেমন করছে, না?

করছেই তো—তোমার মতন পাষাণ নই।—কমল পাশ ফিরিয়া শুইল; কালই চিঠি লিখিবে সে, চলিয়া যাইবার জন্য; এ রকম বিসদৃশ পাকামি দেখিলে যেন গা জ্বলিয়া যায়।

ছোট গিন্নিও মনে মনে হাসিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন : কমলটা চিরদিন একরকম গেল। উহাদের সঙ্গে তুলনা তাঁহার করিলে চলে না। অবস্থা যাহার অন্য প্রকার ব্যবস্থাও তাহার আলাদা করিতে হয়।

নূতন বধূ বিদ্যুৎলতারও গুণ আছে স্বীকার করিতেই হইবে; ইতিমধ্যে সেবায়, যত্নে, মিষ্ট ব্যবহারে সকলকে তুষ্ট করিয়া তো রাখিয়াছেই, শ্বশুরকে এমন বশ করিয়া লইয়াছেন যে,

বৌমা না হইলে ছোট কর্তার একদণ্ড চলে না। দুইবেলা খাওয়ার সময় বৌমার উপস্থিতি না থাকিলে খাইয়া পেট ভরে না। গল্প করিতে বৌমা, পরামর্শ করিতে বৌমা। মাছ ধরিতে যাওয়ার সরঞ্জাম গুছাইয়া দিবে বৌমা, জামা-কাপড়গুলো কখন বদলানো দরকার সে কথাও বৌমাকে ভাবিয়া রাখিতে হইবে।

ছোট গিন্নি কিন্তু এটা তত পছন্দ করেন না; হাজারই হউক সত্যই তো ছেলের বৌ নয়; বয়সও যথার্থ বুড়া নয়, অত বৌ বৌ করিয়া মাতামাতি করিলে লোকেই বা বলে কি?

কিন্তু মনের কথা খুলিয়া বলা যায় না। শুধু বধূর সহিত আপনার মর্যাদার অনুরূপ দূরত্ব রাখিয়া চলেন। রান্নাঘরে পুরোনো ঝি 'খোকার মাসি' বামুন ঠাকরুনকে উদ্দেশ করিয়া বলে—দাদাবাবুর বে বে করে ছোট-মা যেমন খেপেছেল মনে হ'ত বৌকে বুঝি মাথায় করে নাচবে, তেমনধারা কিছু লয়, দেখেছ গা বামুন জ্যেঠি?

বামুন জ্যেঠি চোখ বড় করিয়া বলে—তাইতো আমরা বলাবলি করি লো, ত্যাতো ছেলে ছেলে বাতিকও আর নেই। আগে ছেলে বাড়ি এলে যেন হাতে সগ্‌গো পেত, এখন তেমন নেই—গেল বার সেই যে খোকাবাবু বলা কওয়া নেই হুট ক'রে রাতের গাড়িতে বাড়ি এলো না? বললে, মাস্টার মরেছে বলে ছুটি করে দেছে—ছোটমা সে কথা বিশ্বেসই করলে না, আড়ালে কত গজ গজ থাকল—"পাশ করতে পারবে না, ফেল করবে লজ্জা সরম নেই এখনকার ছেলে-মেয়ের—" এই সব। তা সাত সকালে বে দেওয়াই বা ক্যানো! এ্যাঁ কি বলিস্ লা! তাই কি যেমন তেমন বৌ! যার নাম ডাকের সুন্দরী, আমরাই হাঁ করে মুখ পানে তাকিয়ে থাকি, তাতে বেটাছেলে, কাঁচা বয়েস, দোষ দেওয়া মিথ্যে।

খোকার মাসি চোখ টিপিয়া সাবধান করিয়া দেয়, ছোট গিন্নি আহ্নিক সারিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছেন।

বৌমা কোন্ দিকে দেখেছ বামুন দিদি?

হ্যাঁ মা এই যে—এখান থেকে শ্বশুরের জন্যে পল্‌তার বড়া ভেজে নিয়ে গেল। এ ঘরেই আছে বোধ হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা মতন হইয়া ছোটবাবু বাহির বাটিতে নামেন নাই, আপনার শয়ন কক্ষে ছিলেন। ছোটগিন্নি ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

দরজার কাছে একটু দাঁড়াইয়া পড়িতেই হয়; ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ বড় একটা নাই, সে অসঙ্কোচ ভাবও যেন কমিয়া গিয়াছে।

বিদ্যুৎ খিল খিল করিয়া হাসিতেছিল—হ্যাঁ বাবা, তবে যে বড় বল্‌লেন, জন্মে কখনও তেতো খান না? লতার বড়া খেলেন কী করে? খেলেই ভালো লাগে; আপনার যে তেতো বলে ভয়; আমার বাবা চায়ের সঙ্গে পল্‌তার বড়া খেতে খুব ভালোবাসেন—

জগদীন্দ্র কপট বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন—সর্বনাশ, ঠকিয়ে ঠকিয়ে আমায় পল্‌তা খাইয়ে দিলে বুঝি? বারে মেয়ে, আমি ভাব্‌ছিলাম তালের বড়া।

ওমা, বাবার যেমন কথা! তালের বড়া তো মিষ্টি।

আমার মা জননীর হাতে পড়ে তেতোও মিষ্টি হয়ে যায় যে, আমার কী দোষ বলো?

খুব হইয়াছে আদিখ্যেতা;—আগে এত কথার ছটা ছিল না—ছোট গিন্নি সশব্দে ঢুকিয়া পড়েন; বলেন—গোটা কতক দরকারি কথা ছিল, শোনবার সময় হবে কি?

বিলক্ষণ আমার তো সর্বদাই সময়, তোমারই সময় হলে হয়—

না হলেও করে নিতে হ'বে; বৌমা দেখগে দিকিনি পুরুতমশাই এসেছেন কি না, শ্রীধরের ঘরে যা যা লাগবে গুছিয়ে দাওগে—কাপড় ছেড়ে গরদখানা পোরো, তোমাদের তো আবার হুঁশ নেই, বিছানাছোঁওয়া কাপড়ে চন্নন পাটায় হাত দিয়ে বস্‌বে হয়তো—

জগদীন্দ্র বাধা দিয়ে বলেন, কেন বাড়িতে আর লোক নেই না কি? বৌমা এখন চারতলায় ঠাকুরঘরে যাবেন। না না তা ঠিক নয়,—এখন ওই সব সিঁড়ি ভাঙা? উঁহু ঠিক নয়, সম্পূর্ণ বিশ্রামের দরকার, বুঝলে? বৌমা, তুমি আর কাউকে বলে দাওগে পুজোর বন্দোবস্ত করে দিতে।

ছোট গিন্নি বিরক্ত হইয়া বলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, সে আমি বুঝবো অখন, তুমি থামো তো—

ছোট কর্তার বুদ্ধি সত্যই কম, ফস্ করিয়া বলিয়া বসেন—তুমি ও সবের ছাই বোঝ, আমি রঞ্জন ডাক্তারকে সব জিজ্ঞেস করেছি, সিঁড়ি উঠতে, ভারী জিনিস তুলতে একদম মানা—সাবধান হওয়া দরকার, বুঝলে ছোটবৌ, সাবধান হওয়া দরকার। একেই তো দেখছি দিন দিন কাহিল হয়ে যাচ্ছেন—

বধূ বেচারা লজ্জায় লাল হইয়া পলাইয়া বাঁচিয়াছে ততক্ষণে, ছোট গিন্নি স্বামীর উৎকণ্ঠায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত কহিলেন, কাহিল হবে না তো মোটা হবে কি দিন দিন? আমি যেন ওসব বুঝি না—যারা বোঝে তাদের না হয় জিজ্ঞেস কোরো।

ছোট গিন্নি আঁচলের চাবির গোছা পিঠে ফেলিয়া ফিরিয়া দাঁড়ান।

ছোট কর্তা বুঝিলেন রাগ; অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না না সে কি কথা? পাগল, এমনি কথার ছলে সেদিন—ডাক্তার এসেছিল, নাড়ি দেখতে—তাই আর কি, চলে যাচ্ছ যে, কী যে বলবে বলে এলে।

সে থাক, পরে হ'বে।

সাধ উপলক্ষে বধূর পিত্রালয় হইতে মাতা ও ভগিনীদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলে ভালো হয়, কি না, সেই কথা বলিবার জন্য আসা, বলা হইল না; কোন্ তুচ্ছ কথা যে মনের কোন্ কোমল স্থানে ঘা মারিয়া বসে কে তাহার হিসাব করিতে পারে?

ছোট কর্তা আপনার বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন, আমার কিছু মনে থাকে না বলে দোষ দাও খালি, এই দেখ।—বালিশটা ঠেলিতেই কয়েকখানা সুদৃশ্য চামড়ায় বাঁধা জুয়েলারের দোকানের ক্যাটালগ বাহির হইল; কলিকাতার প্রধান দোকান হইতে আনানো।

ছোট গিন্নি গমনোন্মুখ গতিকে ফিরাইয়া লইয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন, ও কী হবে?

বাঃ ভট্চায বলে গেল সাধ না কীসের দিন দেখা হচ্ছে—গয়না লাগবে না বুঝি? সকলে দেখে পছন্দ করে রাখ না।

ও সব এখন লাগে না, পরে হবে।—স্থির স্বর গম্ভীর হইয়া আসে।

আরে, আমি এত ব্যস্ত হয়ে আনালাম—হিরের একটা বালা আমার খুব মনে লেগেছে—আচ্ছা দিলে আর দোষ কী? "অধিকন্তু ন দোষায়" কী বলো?—ছোট কর্তা আপনার রসিকতায় আপনি হা হা করিয়া হাসিতে থাকেন।...

ছোট গিন্নি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যান।

অন্যমনস্কভাবে চারতলায় উঠিয়া যাইতে দেখেন সিঁড়িতে বিদ্যুৎ নামিতেছে—বিদ্যুৎ বিস্মিত হইয়া কহিল—হ্যাঁ মা, ঠাকুরঘরের ঝি যে বললে পুরুতমশাই অনেকক্ষণ হল পুজো করে চলে গেছেন!—

লালপাড় গরদের শাড়ি পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে বিদ্যুৎ; সেই দুধে-আলতাগোলা রঙের উপর ঈষৎ পাণ্ডুর আভা পড়িয়া কোমল মুখ যেন আরও কমনীয় হইয়া আসিয়াছে; মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ যেন দুই চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল, ছোট গিন্নি ত্বরিৎপদে ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া ভুলিয়া আবার আহ্নিক করিতে বসিলেন; কথার উত্তর দেওয়া হইল না।

মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ঠাকুরবাড়ির পেটা ঘড়ি বাজিয়া উঠিল—এক দুই তিন চার...হাঁ বারোটাই বটে।

প্রতীক্ষিত সময় অবশেষে আসিয়াছে তাহা হইলে? সন্ধ্যা রাত্রে মাথা ধরার অজুহাতে আপনার ঘরে আশ্রয় লইয়া এই কয় ঘণ্টা সময় একলা কাটাইতে মনে হয় যেন কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে।

এতখানি বয়সে—সংসারের দায়িত্ব ফেলিয়া এমন অসময়ে বিশ্রাম লইবার প্রয়োজন আর কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ। ...ডাকিতে নিষেধ ছিল, কেহই আদেশ লঙ্ঘন করে নাই।—কিন্তু সকলে কি খাইয়াছে? শ্রীধরের ঘরে সন্ধ্যারতি হইয়াছে তো? 'শীতল' পড়িতে কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই? কেহ আসিয়া ফিরিয়া যায় নাই তো? সব ঠিক ঠিক হইয়াছে? কেহ আসিয়া বলিল না যে, "ছোটমা এ আমাদের দ্বারা হ'ল না—" আশ্চর্য! ছোটগিন্নি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসেন।

অমাবস্যার রাত।

জানালার বাহিরে তাকাইতে হয় না; নিবিড় অন্ধকার যেন কাহাকে গ্রাস করিতে চায়, বড় বড় গাছের ঘনীভূত ছায়ারা যেন ক্ষুধিত প্রেতের মতো তীক্ষ্ণ দন্ত মেলিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

নিদ্রা জাগরণের মধ্যবর্তী একটা অদ্ভুত তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব যেন মাথার ভিতর সব জট পাকাইয়া দিয়াছে। কত এলোমেলো চিন্তা একসঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আলাদা করিয়া তাহাদের চিনিবার উপায় নাই, শুধু মনে পড়ে—হাঁ তীব্রভাবে মনে পড়ে কী একটা করিবার রহিয়াছে। লজ্জাকর? না ভীতিকর?

কাঁসর ঘণ্টার শব্দ আসে কেন? কী সর্বনাশ! গ্রামের বারোয়ারী তলায় রক্ষাকালীপূজা আছে না? জমিদার বাড়ি হইতে বিশেষ ভোগ পাঠাইবার কথা ছিল—কী হইল তাহার? আর কাহারও মনে পড়িবার কথা তো নহে।

কিন্তু তাঁহাকে কি ভূতে পাইয়াছে? নিজের উপর ধিক্কারে যেন চৈতন্য ফিরিয়া আসে। চোখে মুখে জলের ঝাপট দিয়া ছোট গিন্নি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ান।

সকল বাড়ি নিঃঝুম অন্ধকার, শুধু ছোটকর্তার ঘর হইতে আলোর একটা সরু রেখা বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। আজকাল প্রায়ই রাত্রে দেওয়ানজীকে আসিতে দেখা যায় বটে, কোন্ মহালে কীসের যেন গোলযোগ বাধিয়াছে। আগে তাঁহার অজানিত কিছুই ছিল না ; আজ কাল কেমন একটা প্রবল আলস্য সব সময় মুখবন্ধ করিয়া রাখে, কিছুই ভালো করিয়া জানিবার অথবা পরামর্শ দিবার, মতামত ব্যক্ত করিবার স্পৃহা হয় না। কেন এমন হয়? কেন আবার সহজ হওয়া যায় না? দূর ছাই, মনের ভিতর কতকগুলো ছাই-ভস্ম জমাইয়া রাখা কেন? আপদ বিদায় করাই ভালো। ছোট গিন্নি আঁচল খুলিয়া কি একটা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে যান, কিন্তু—? থাক না, ক্ষতি কি? ক্ষতি আছে বই কী!...মুখ দেখাইবার যে পথ থাকিবে না। ইহার পরও কি এতদিনের কর্তৃত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে? ছি, ছি, ভাবিতে দেহ মন সঙ্কুচিত হইয়া আসে।

'কেলেঙ্কারি'র বাকি থাকিবে কিছু?

এ বুদ্ধি তাঁহাকে দিল কে? সুরধুনি? নাঃ। তাহার আবার দোষ কী? হঠাৎ মতিচ্ছন্ন ঘটে যাওয়া ছোটগিন্নি তো নিজেই—

সুরধুনী বলিয়াছে—"তোমার সেই বুনঝিকে বোলো ছোটমা; এ একেবারে অব্যর্থ। একটি মাস পেরুতে দেবে না—বললে না পেত্যয় করবে ছোটমা এমনি গুণ; এই শেকড়ের টুকরো

নাল সুতো দে গাছের গায়ে বেঁধে দিলে জন্ম-বাঁজা গাছে ফল ধরে—তা' মনিষ্যি কোন ছার।" নিশ্চিত হয়? শিকড়ের এমনই গুণ? একটা ক্ষীণ বিদ্রূপের হাসি ছোটগিন্নির ঠোঁটে দেখা দেয়। এতদিনের অটুট মর্যাদা অবশেষে ধূলিসাৎ করিতে হইবে?

তবু কে যেন গলা টিপিয়া ছাদে টানিয়া লইয়া যায়। সুরধুনী বলিয়াছে—"শনি মঙ্গলবারের আমাবস্যেয় ভর-দুপুর রাতে এলো চুলে, এলো গায়ে, এলো জায়গায়" দাঁড়াইয়া খাইতে হয়।

ছাদে উঠিতে—হিরণের ঘর পড়ে; ঘর অন্ধকার কিন্তু ঘরের অধিবাসীরা যে এখনও ঘুমায় নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—মধ্যরাত্রির নির্জন অবসরের সুযোগে দম্পতির মৃদু প্রেম-গুঞ্জন মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়াছে। কি আশ্চর্য! হিরণ আসিয়াছে? কখন আসিল? আসিবার তো কথা ছিল না।

হিরণ আসিয়াছে—তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই? নিষেধ ছিল সত্য, কিন্তু সে কি নিজে একবার মা বলিয়া খোঁজ লইতে আসতে পারিত না? 'মা' বলিলেই কি মা হয়? হয় না, হয় না; বিধাতার নিয়ম উল্টাইবার সাধ্য কাহার?

গুরুজন হইয়া আড়ি পাতিতে নাই—কিন্তু কানে আসিয়া গেল উপায় কি? একটা স্বর মৃদু কোমল, লজ্জায় ভারী; অপরটা আবেগ ক্ষুব্ধ, চঞ্চল।।

"তুমি এমনি ঘন ঘন আস যে—লজ্জা করে না বুঝি?"

"বা-রে নিজের বাড়িতে আসতে মানুষের লজ্জা করে না কি? বেশ মেয়ে তো?"

"আর পড়ার কত ক্ষতি হয় যে—হয় না? রাগ করছো? পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়া বুঝি ভালো?"

"হ্যাঁ ভালো খুব ভালো, কেন নয়? সমস্ত ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষাকে চেপে রেখে মনের সুখ শান্তি নষ্ট করে পরীক্ষার গোটাকতক নম্বরি বেশি পাওয়াই কি সব চেয়ে ভালো?"

এ কথার উত্তর দিতে পারে মৃদু স্বরের এমন ক্ষমতা নাই, তবু দুর্বল অনুযোগের ভঙ্গিতে বলিতে যায়—"আমার কিন্তু বড়—" হয়তো বলিবার ইচ্ছা ছিল—"লজ্জা করে", কিন্তু কথার দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলে কথা কহা যায় কি?

আর দাঁড়াইতে সাহস হয় না; ছোটগিন্নি দ্বিধা কাটাইয়া ধীরে ধীরে ছাদে উঠিয়া আসেন।

অমাবস্যা কি এত অন্ধকার? আকাশে তারাও নাই না কি? এই নিদারুণ অন্ধকারে আপনাকে আপনি দেখিতে পাওয়া যায় না তাই রক্ষা।...দূরে কাহার জুতার শব্দ মিলাইয়া আসে, দেওয়ানজীর বোধহয় কাজকর্ম মিটিয়াছে। হাঁ সেই আলোর রেখাটাও কখন যেন নিভিয়া গিয়াছে। মানুষ কি এত শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়ে?

মণ্টি

মেয়েটার মা নেই বলেই হোক অথবা তার অদ্ভুত প্রকৃতির জন্যেই হোক ছেলেবেলা থেকে বরাবরই তাকে একটু প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি।

পাশের বাড়ির মেয়ে, বছর চার পাঁচ বয়সে মা-হারা। বাপ যথানিয়মে প্রথমবার বিরহ-জ্বালা নিবারণ করেছিলেন দ্বিতীয়াকে এনে তদবধি 'মণ্টি' প্রায় সরকারি সম্পত্তি।

শুনতে পাই নাকি মণ্টির বিমাতা মণ্টিকে স্নেহপাশে বদ্ধ করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি, কিন্তু মণ্টি সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে হয়ে উঠেছে উদ্ধত, অবাধ্য, পাড়াবেড়ানি। বাপও ওকে এঁটে উঠতে পারে না।

লেখাপড়ার ধার ধারে না, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পরের বাড়িতেই কাটায়, কচি মুখে পাকা পাকা কথা কয়, ঘরের কথা পরের কাছে ফাঁস করে।

তবুও কেন জানি না, ওর প্রতি আমার বিশেষ একটু স্নেহ আছে চলতি কথায় যাকে প্রশ্রয়ই বলা চলে।

ওকে আমি লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করি, ভূতের থেকে শুরু করে ভগবানের পর্যন্ত বহুবিধ গল্প বলি, খেলার জিনিস সরবরাহ করি।

ওর খেলার জিনিস মানে অবশ্য পুতুল খেলনা নয়। লাট্টু, মারবেল, ঘুড়ি, ক্যারাম বোড, সচরাচর এই সবই ওর দরকার। কারণ মণ্টির কোনও সঙ্গিনী নেই, সবকটাই সঙ্গী।

তবে মণ্টি অকৃতজ্ঞ নয়, লোকের কাছে আমার পরিচয় দেবার কালে বলে— "আমার বন্ধু"।

মাঝে মাঝে ওর ঔদ্ধত্যে আর দুর্দান্তপনায় বিরক্ত যে না হই তা নয়, তিরস্কারও করতে ছাড়ি না। মণ্টি তার প্রতিশোধ নিতে আমার লেখার কপি ছিঁড়ে দেয়, বইয়ের পাতায় কালি ঢালে, বিছানাপত্র লন্ডভন্ড করে চেয়ার উল্টে দিয়ে দুম্‌দুম্‌ করে চলে যায়। মনে হয় না আর কোনও দিন আসবে।

কিন্তু পরদিনই দেখি ভোরবেলাই এসে হাজির হয়েছে। হয়তো ভিজে ন্যাকড়ার টুকরো নিয়ে ঘষে ঘষে বইয়ের পাতার কালি তুলছে, নয় তো—গঁদের শিশি পেড়ে পাতলা কাগজ মেরে মেরে ছেঁড়া কপি জুড়ছে।

হাসব না রাগব বুঝে উঠতে পারি না, তবু রাগ দেখাতে বলি—মন্টি, তুমি আমার কোনো জিনিসে হাত দিও না।

বলা বাহুল্য 'তুমি' সম্বোধনটাই রাগ প্রকাশক।

'তুমি' শুনলেই মন্টি একটু ম্রিয়মাণ হয়ে যায়।

—আচ্ছা এইটা ঠিক করে দিয়ে চলে যাব—বলে হেঁটমুন্ডে কাজ করে চলে।

আমি বলি—চলে যেতে তো বলি নি, জিনিসে হাত দিতে বারণ করেছি।

মন্টি জিনিসটা নামিয়ে রেখে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—তার মানেই তাই। 'যার নাম ভাজা চাল তার নামই মুড়ি'। তোমার জিনিসে হাত দিতে পাবে না, আর তোমার ঘরে আসবে, লোকে কি ভিখিরি নাকি?

অগত্যা আমাকেই আবার একটু মিষ্টবচন প্রয়োগ করতে হয়, নইলে কেমন যেন অস্বস্তি হতে থাকে। খানিকক্ষণ পরেই মন্টি যে কে সেই!

আমাদের বড় বৌদি বলেন—মেয়েটা কী হ্যাংলা বাবা, মেজঠাকুরপো ধমকও তো বড় কম দেন না, তবু চোদ্দ বার ঘুরে ঘুরে আসে।—আর আমার খুকি? কেউ কোনও দিন দেখেছে, কখনও কাকা বলে আদর কাড়িয়েছে?

বৌদির 'খুকির' অনেক দিন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। যখন এ সংসারে ছিল, তখন তার মায়ের শাসনের দাপটে খুখি—কাকা কেন—স্বয়ং তার পিতৃদেবের কাছেও কোনওদিন আদর কাড়াবার কথা ভাবতে পারে নি। বৌদির মতে মেয়ে মানুষকে 'মানুষ' করবার কৌশল একমাত্র মেয়েমানুষেই বোঝে, পুরুষের এক্তারে ছেড়েছ কী মাথায় চড়ে বসে আছে।

আগে বৌদির এ থিয়োরির প্রতিবাদ করতাম, কিন্তু ইদানীং ফি-হাত মন্টির উদাহরণ দিয়ে বৌদি আমাকে মূক করে ছেড়েছেন।

এখন অবিশ্যি মন্টি বড় হয়েছে, কথঞ্চিৎ ভব্যিযুক্তও হয়েছে, তবে পুরনো অভ্যাসগুলো বিশেষ কিছু ছেড়েছে এমন নয়। রাগলে এখনও জ্ঞান থাকে না তার। লেখাপড়ার ধার ধারে নি কোনও দিন, কিন্তু বরাবর গল্পের বইয়ের যম। আর অলিখিত আইনে আমিই ওর বই সরবরাহর যন্ত্র।

কদিন বইয়ের জোগানটা ঠিক মতো হয় নি, মন্টি এসে ধপ্ করে একখানা পড়ে-ফেলা বই টেবিলে ফেলে দিয়ে বলে—লাইব্রেরী গিয়েছিলে কাল?

সত্যি বলতে কি, সময় পাই নি—বিনীতভাবে বলি—আজ ঠিক যাব।

—আজ যাবে কি না সে কথা তো জিজ্ঞাসা করা হয় নি, কাল গিয়েছিলে কি না তাই জানতে চাইছি।

—উঃ যেন জজ সাহেব এলেন, যাই নি যাঃ।

—বেশ! বেশ! ফের যে বই আনবে সে আমার মরা মুখ দেখবে।

রেগে বলি—দেখ্ মন্টি, দিন দিন বড্ড বাজে হয়ে যাচ্ছিস। এসব দিব্যি দিলেশা দিতে শিখছিস কোথায়?

মন্টি চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে অম্লান বদনে বলে—একটা ভালো বন্ধুর কাছে শিখেছি।

—ভালো বন্ধু! বাঃ বাঃ, 'ভালো' কথাটার নতুন মানে শিখলাম বটে। সে ভালো বন্ধুটি কে? তোর ওই বটু নাকু শিশির ফেলু এদের মধ্যে কোন্‌টি?

—ওদের মধ্যে! দূর, ওরা আমার বন্ধু না কি?

—ওরা তোর বন্ধু নয়? বলিস কি রে! আমি তো জানতাম ওরাই তোর প্রাণের বন্ধু।

—প্রাণের না হাতি। ওরা তো খেলার সঙ্গী, ওকে বন্ধু বলে না। প্রাণের বন্ধু আলাদা।,

চমৎকৃত হয়ে বলি—সেটা তাহলে কী রকম জীব? মানুষের থেকে বাড়তি দুটো পা আছে বুঝি তার?

মন্টি স্বচ্ছন্দে ভেঙিয়ে বলে—আহা আদিখ্যেতা। নভেল লেখেন আর 'প্রাণের বন্ধু' মানে জানেন না। যার সঙ্গে হৃদয়ের ভালোবাসা হয় তাকে কী বলে?

শুনে একটু গম্ভীর হয়ে যাই, বলি—হঠাৎ হৃদয়ের ভালোবাসাটা হল কার সঙ্গে?

আমার গাম্ভীর্যে মন্টির অভিমান—এই নিয়ম, তাই সেও অভিমান ভরে গম্ভীর হয়ে বলে—

—বলব না।

—শুনতে আমি চাইও না, তবে তোমার বাবাকে এ খবরটা জানিয়ে দিতে হবে। দেওয়া উচিত।

বাবার নামে যেন জ্বলে ওঠে মন্টি।

অবশ্য এটা নতুন নয়, বরাবরই জ্বলে, তবে ক্রোধ প্রকাশের ভাষাটা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এই আর কি।

কিন্তু আজকের ভাষাটা আমারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। 'বাবা! বাবা আমার কাঁচকলা করবে'—এইটাই শুনতে আশা করেছিলাম, কিন্তু ও স্বচ্ছন্দে বলে কিনা—বাবা! বাবা আমাকে শাসন করবে। কোন্ মুখে করবে শুনি? পাকা-চুল বুড়ো, এখন বৌ নিয়ে সিনেমা যাবার শখটি ষোলো আনা, উনি আবার লোককে শাসন করতে আসবেন।

রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল। নাঃ বৌদি ঠিকই বলেন। ক্রুদ্ধস্বরে বলি—

—দেখো মন্টি, তোমার তো আজকাল অনেক ভালো বন্ধু জুটেছে তাদের সঙ্গেই মেশো গে, এখানে আর আসতে হবে না।

মন্টি যেন অবাক হয়ে যায়, দুই চোখ গোল করে বলে—তাড়িয়ে দিচ্ছ?

—তাড়িয়ে দেওয়ার কথা হচ্ছে না, আমি এ সব পছন্দ করি না। কতদিন বলেছি মা বাপের সম্বন্ধে ভদ্রভাবে সমীহ করে কথা বলতে হয়। বলিনি?

—বলেছ।

—তবে?

—কত তো ভাবি তোমার কথা শুনব, ওদের ঢং দেখলে যে ভক্তি উড়ে যায়, কী করব!

হঠাৎ ভারি হাসি পেয়ে যায়, তবু কষ্টে হাসি চেপে বলি—আর ওইসব ভালোবাসাটাসা, ওসবও আমার দুচক্ষের বিষ বুঝলে? খুব খারাপ ওসব।

নিশ্চয় বুঝছি, কোনও হতভাগা বয়াটে ছোকরার পাল্লায় পড়েছে। যতই ধুলো মেখে রুক্ষু চুলে ঘুরে বেড়াক, তবু তো মেয়ে। চোদ্দ পনেরো বছর বয়েসও হল। কে জানে কোন্ ছেলেটা

'মণ্টি'কে 'মরামুখ' দেখবার দিব্যি শেখাচ্ছে। পাড়ায় নতুন নতুন ভাড়াটে আমদানি হয়েছে বটে কিছু কিছু।

মণ্টি আমার কথা শুনে কোনও কথা না বলে গালে হাত দিয়ে চেয়ার ছেড়ে মাটিতে বসল।

—কী হল? হঠাৎ মাটিতে বসলি যে?

—তুমি এই সব পছন্দ কর না? তোমার এসব দুচক্ষের বিষ! তবে এসব লেখা হয় কেন ঝুড়ি ঝুড়ি? তোমার সব গপ্‌পতেই তো খালি ভালোবাসা—আর ভালোবাসা।

অনেক কষ্টে হাস্য দমন করে বলি—ও সব বইতে লিখতে হয়। সত্যিকার মানুষ কি বইয়ের গল্প?

মণ্টি একটুক্ষণ করে বসে মাটিতে আঁচড় কাটে, অতঃপর মুখ তুলে বলে—আচ্ছা বেশ। ওকে তাহলে তাই বলব।

অবোধ জীবটাকে নিয়তির হাতে ভাসিয়ে দেওয়া যায় না, শত রাগ হলেও না তাই শান্ত ভাবে বলি—কিন্তু 'ও' টা কে?

—ওই তো হলদে বাড়ির নতুন ভাড়াটের ছেলে।

যা ভেবেছি তাই। চিনে রাখতে হবে ছেলেটাকে।

বললাম—কত বড়ো ছেলে?

—তোর চাইতে তো আমিও বড়ো—ধমকে উঠি আমি—বয়েস কত? লেখাপড়া করে? না শুধু পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে?

মণ্টি করুণভাবে বলে—বয়েস জানি না। লেখাপড়া তো করত, দুবার ফেল করেছে বলে ওর বাবা রাগ করে বলেছে পড়া ছাড়িয়ে নেব। আর কারুর সঙ্গে ভাব করে নি, শুধু আমার সঙ্গে।

যত শুনি তত চমৎকৃত হয়ে যাই।

ভেবেচিন্তে বলি—যে ছেলে দুবার ফেল করে সে তো বাঁদর তার সঙ্গে মিশিস কেন? মিশবি না খবরদার।

মণ্টি নিজ স্বভাবে ফিরে আসে, উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে বলে—ইস। তাই বই কী। ফেল করলে মানুষে আর মানুষ থাকে না, বাঁদর হয়ে যায়। ওকথা আমি বিশ্বাস করি না। সবাইয়ের যদি ঘ্যান ঘ্যান করে পড়তে ভালো না লাগে।

—যাদের ভালো লাগে না, ভদ্রলোকে তাদের বাঁদরই বলে।

মণ্টি অবশ্য বিনা প্রতিবাদে ওর প্রাণের বন্ধু সম্বন্ধে এ অপবাদ সহ্য করে যাবে এমন আশা করি নি।

ও সতেজে বলে—বলুক গে, বলতে তো আর পয়সা লাগে না। ফেল করেছে বলে কি আর বুদ্ধি নেই ওর? তুমি তো শুধু গপ্‌প লেখ, ও গপ্‌পও লিখতে পারে, পদ্যও লিখতে পারে।

হো হো করে হেসে উঠি, হেসে বলি—তাহলে তো দেখছি আমার অন্ন মারা গেল। তা এতদিন এসব শুনি নি তো। কবে থেকে ভাব হয়েছে?

—আগের রোববার থেকে!..... ভাব হওয়ার কথা কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছিল যে তিলু।

—তবে বললি কেন?

—তোমাকে না বলে স্বস্তি হচ্ছিল না যে। তিলুটার একটা কিন্তু ভারি দোষ আছে, তোমাকে দেখেনি তবু তোমার ওপর রাগ।

পরম কৌতুক অনুভব করি। এ তো মন্দ নয়, একটা মজার গল্পের প্লট পাওয়া গেল। গম্ভীর হওয়ার ভানে বলি—কেন আমার অপরাধ?

—ওই তো মজা, শুধু শুধুই। বলে—"ও বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা যাস কেন? যে বুড়োটা বই লেখে সে তোর কে হয়?" এই সব।..... আমিও আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছিলাম, বললাম—ও আমার চিরকালের বন্ধু হয় তা জানিস। শুনে রাগ করে এক ঘণ্টা কথাই কইল না, তার পর পায়ে পড়ে রাগ ভাঙাই।

আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলি—ছি ছি ছি। তোমার একটু মান অপমান জ্ঞান নেই?

—মান অপমান?

মন্টি একটু সমঝে নেয়, তারপর অগ্রাহ্যভরে বলে—তাতে কি? আগের দিন তিলুও তো আমার পায়ে পড়েছিল।

পাড়ায় এ হেন একটি রত্নের আবির্ভাব-সংবাদ জেনে বিমোহিত হয়ে যাই। বুঝি—'রতনে রতন চেনে' এ প্রবাদটি কত সারগর্ভ।

তবু মনটা দমে যায়।

কান্ডজ্ঞানহীন এই মেয়েটার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। খাওয়ার সময় পার হয়ে যাচ্ছে বলে মন্টিকে বাড়ি থেকে ডাকতে আসায় ও চলে যায়, আর আমি বসে বসে অনেক কিছু ভাবতে থাকি।

তিলু-নামধারী গুণনিধিটিকে একবার দেখা দরকার, কোন্ বংশের কুলতিলক কে জানে। অন্তত তার বাপটিকে ডেকে এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করা উচিত।

আগুন তো আবোধরাই জ্বালে, কিন্তু অবোধের হাতে জ্বালানো বলে সে আগুন কিছু আর তার স্বভাবধর্ম পালন করতে ছাড়ে না।

পরদিন কোর্ট থেকে ফিরে দেখি মন্টি এসে নিবিষ্ট হয়ে আমার একটা অসমাপ্ত লেখা পড়ছে।

এইটা আমার ভারি বিরক্তিকর, বারণও করেছি ঢের দিন। বিরক্তি গোপন না করেই বলি—মন্টি ফের?

মন্টি তাড়াতাড়ি ওটা চাপা দিয়ে বলে—বাবাঃ বাবাঃ খেয়ে তো ফেলি নি, এই থাকল। .... সকালে বলেছিলাম ওকে সে কথা।

অবাক হয়ে যাই, কাকে কী কথা বলি বুঝে উঠতে পারি না?

—হ্যাঁ হয়ে যাচ্ছ কেন, তিলুকে সেই কথাটা বলবার ছিল না?

তিলু!

ওঃ।

কিন্তু—কী কথা! মনে করতে পারলাম না। বললাম—কী বলো তো?

—আহা সেই যে বলেছিলে না, 'মানুষ তো আর গল্প নয়' সেই কথা বললাম ওকে, শুনে ও—

হঠাৎ মণ্টি ঢোক গিলে চুপ করে যায়।

মণ্টিও বলতে থামে এমন কী কথা? জননী বাগবেদী ওর রসনাকে যে স্বাধীনতা দিয়ে পাঠিয়েছেন সে তো দেবেরও অপ্রাপ্য।

—শুনে ও কি? ......বলি আমি।

—ও বলেছে আমাকে বিয়ে করবে।

বাঃ! চমৎকার! এ যে প্রতাপ দেবদাস সবাইকে হার মানাল..... বিদ্রূপের তীক্ষ্ম হাসি না হেসে পারি না।

—ঠাট্টা করছ?

মণ্টি হাস্যবদনে পরিতৃপ্ত স্বরে বলে, হ্যাঁ! তিলু বলে বইয়ের গল্প তো আকাশ থেকে পড়ে না, সে গল্প মানুষের জীবনেরই ছবি।

যাক্ উপযুক্ত উপদেষ্টা জুটেছে তাহলে মেয়েটার, ওর ভবিষ্যৎ জীবনটা ঝরঝরে করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করবে বোঝা যাচ্ছে।

ভেবেছিলাম এ ব্যাপারের একটা উপসংহার হওয়া দরকার এবং সে 'সংহারকার্যে' আমাকেই একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। কারণ মেয়েটাকে যথার্থই স্নেহ করি।

মাতৃহীন বলেই হোক আর অদ্ভুত স্বভাবের জন্যই হোক, কে জানে কেন!

নিরবধিকাল মানুষের চিন্তায় আর বিধাতার কাজে যে বিরোধিতা চলে আসছে, তারই ফলে সেই দিনই একটি ট্রাম দুর্ঘটনার অংশীদার হতে বাধ্য হলাম।

প্রথমটায় খানিকটা বিস্মৃতি, তারপর খানিকটা গোলমাল, তারপর খুব খানিকটা যমযন্ত্রণা। এইগুলোর পর যখন ধাতস্থ হলাম তখন দেখলাম হাসপাতালের খাটে শুয়ে আছি।

তিন সপ্তাহ থাকতে হবে।

দাদা বৌদি দেখতে আসেন....ভাইঝি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে দেখে যায় ... বন্ধু-বান্ধবদের আসার বিরাম নেই, কিন্তু মণ্টিকে দেখি না। যদিও ভেবেছিলাম ও কি আর না এসে ছাড়বে। একদিন বৌদিকে 'বলি-বলি' করেও থেমে গেলাম। নাঃ বৌদি মণ্টির ওপর যা প্রসন্ন সে তো আমার অবিদিত নেই।

শুয়ে শুয়ে ভাবি..... কি জানি সেই হতভাগা মেয়েটা আরও কি 'কাব্যি' করছে।

দিন বাইশ পরে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলাম।

বাড়িতেও বিছানা পাতা আছে—আরও কিছুদিন শুয়ে থাকতে হবে। পায়ে এখনও প্লাস্টার করা।

দাদা বৌদি আমার যত্নের ত্রুটি হবার কোনও ছিদ্র রাখেন নি দেখলাম। নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আর কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম দরজায় মণ্টি।

আমি না দেখার ভান করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকি, দেখি বেচারা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ধীরে ধীরে দরজা থেকে সরে যায়।

আহা, আর নিষ্ঠুরতা সাজে না, হাঁক দিয়ে বলতে হয়—চলে যাচ্ছিস যে?

এইটুকুরই অপেক্ষা ছিল, মুহূর্তে মন্টি ঘরে ঢুকে বিছানার এক পাশে বসে পড়ে বলে—তুমি তো কথা কইবে না।

আমি গম্ভীরভাবে বলি—না কওয়াই উচিত ছিল। আর কেউ হলে কইত না।

আমার এই তুচ্ছ কথাটা যে এমন বিপর্যয় ঘটাবে তা কে জানত।

সহসা বিছানার একাংশে উপুড় হয়ে পড়ে মন্টি, এবং উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের মধ্যে উচ্চারণ করে—আমার কি দোষ, আমি কি নিজে যেতে পারি? আমি কি জানি হাসপাতাল কোথায়? আমার কি মন কেমন করত না?

মন্টির কান্না!

মন্টির চোখে জল!

এ কী অভূতপূর্ব দৃশ্য! নাঃ কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। অপ্রতিভ হতে পথ পাই না। ব্যস্ত হয়ে বলি—আরে আরে কি মুস্কিল, ঠাট্টা করেছি রে বাপু! আমি কি জানি না তোর খুব মন-কেমন করছিল। সত্যিই তো কি করে যাবি, তোকে কী কেউ নিয়ে গিয়েছে।

মন্টি উঠে বসে, জলভরা চোখ ঝঙ্কার দিয়ে বলে—তিলে মুখপোড়াকে বললাম—নিয়ে চ, উজবুকটা বলে কিনা—আমিই বা কি করে জানব কেমন করে হাসপাতাল যেতে হয়।

শোনো কথা! কানাকড়ার ক্ষ্যামতা নেই ওনার, আবার বিয়ে করবার শখ। গলায় দড়ি অমন বেটাছেলের! সেই দিনই জন্মের আড়ি করে দিয়ে এসেছি। খুব খোশামোদ করতে এসেছিল, আমি বলে দিলাম—যাঃ বেরো, তুই তো একটা মেয়েমানুষ। মেয়েয় মেয়য়ে বিয়ে হয়!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম—তা তুই নিজে তো একটা বেটাছেলের সামিল— বলা হল না, বৌদি ঘরে ঢুকলেন। গম্ভীরভাবে বললেন—মন্টি বাড়ি যাও, তোমায় ডাকতে এসেছে।

—পরে যাব।

—রাত্তির নটা বাজে, দেখেছ?

—দেখেছি।

—আচ্ছা বেহায়া মেয়ে বাবা! বাপ যে সেদিন বিতিয়ে লাল করে দিল, একখুনি ভুলে গেলি? ফের এ বাড়িতে এলে মেরে পিঠের ছাল চামড়া তুলে দেবে বলে নি? বলি কচি খুকি সাজবার পথ আর রেখেছিস?

মন্টি কাঠের মতো মুখ করে বসে আছে।

শুনে ভয় হয়ে যায়, কি জানি কি করে বসেছে। জানিই তো অবোধেই আগুন জ্বালে।

ভয়ে ভয়ে বলি—কী হল হঠাৎ?

—কী হয়েছে ওকেই জিজ্ঞেস করো, বলুক নিজে মুখে। —বলে বৌদি একটু তিক্ত হাসি হাসেন।

আর সেই হাসিই বোধকরি মন্টির গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেয়। বৌদি ঠিকই বলেন মেয়েকে মেয়েই বোঝে! বৌদি বুঝেছিলেন এই হাসিটুকুই ওকে ক্ষেপাবার পক্ষে যথেষ্ট।

কারণ কথার সঙ্গে সঙ্গেই মন্টি দাঁড়িয়ে ওঠে আহত বাঘিনীর মতো ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে—বলব তার ভয়টা কী? বলতে আমি ভয় পাই নাকি? বলেছিই তো..... ওই আমার আসল প্রাণের বন্ধু। ওকেই আমি বিয়ে করব।

স্তম্ভিত হয়ে বলি—তবে যে একখুনি বলছিলি—"তিলে মুখপোড়া! বললি—জন্মের আড়ি হয়ে গেছে ওর সঙ্গে?"

মন্টি বৌদিকে ছেড়ে আমার দিকে মুখ ফেরায়, সেই একই বাঘিনীর ভঙ্গিতে বলে—তিলের কথা কে বলছে, আমি তো তোমার কথা বলছি। তোমাকেই আমি সত্যি ভালোবাসি। তুমি কদিন ছিলে না, কেঁদে কেঁদে মরছিলাম আমি। কই তিলে মামার বাড়ি যাওয়ায় তো কান্না পায় নি। সেই থেকেই তো ধরতে পারলাম তোমাকেই আমি—

বৌদি মুখে আঁচল দিয়ে টিপে টিপে হাসতে থাকেন, আর আমি বীরোচিত গর্জনে ধমকে উঠি—বটে, এই সব পাকামি শেখা হচ্ছে? পাড়ার যত হতচ্ছাড়া ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে উচ্ছন্নে গেছ একেবারে? যা বাড়ি যা! খবরদার এ-মুখো হবি তো দেখে নেব। বেয়াদপ বেয়াড়া মেয়ে।

হয়তো বৌদি দাঁড়িয়ে ওরকম বিশ্রীভাবে না হাসলে এতটা রূঢ় হতাম না, হয়তো হেসে ফেলতাম, কিন্তু এখন আর হাসি আসছে না।

মন্টি মুহূর্ত খানেক বোকার মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যায়। "আস্ত পাগল" বলে বৌদিও বেরিয়ে যান, শুধু আমিই ভাঙা পা নিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকি নিরুপায় চিত্তে।

কিন্তু পা না ভাঙলেই বা কী উপায় করা সম্ভব হত? মন্টি যখন পেরাম্বুলেটারে চড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়াত, আমি তখন রীতিমতো চালের সঙ্গে নির্ভুল টাই বেঁধে কোর্টে যাওয়া-আসা করছি। কালসমুদ্রের এই দুস্তর ব্যবধান ও এমন অনায়াসে লঙ্ঘন করল কী করে।

এও একটা কৌতুককর গল্পের প্লট বই কী, কিন্তু এ প্লটকে কাজে লাগাতে পারব বলে মনে হয় না, কোথায় যেন একটা বিরাট ক্ষতির গভীর শূন্যতা অনুভব করছি।

নিশ্চয় টের পাচ্ছি—ভোর না হতেই ছুটে এসে, জল-ন্যাকড়ার টুকরো ঘষে ঘষে নিজে ঢালা এই কালির দাগটা মুছতে বসবে না মন্টি।

ছেলেবেলায় রাগ হলেই ও নিজের খেলার জিনিস নিজে ভেঙেচুরে তছনছ করত, ভাবতে চেষ্টা করছি আজও হয়তো শুধু রাগ করেই.... কিন্তু কই, তাতেও ঠিক মন থেকে সায় পাচ্ছি না যেন। এও এক আশ্চর্য!

মৃত্যুবাণ

আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবর্গের অভিনন্দন দেওয়া শেষ হতে রাত প্রায় দশটা বাজল। কম লোক তো আসেনি, সর্বদা যাদের এ বাড়িতে আনাগোনা ছিল, তারা তো বটেই, যাদের আবির্ভাবটা দৈবাতের ঘটনা ছিল, তারাও।

আসবেই তো, সুনন্দাকে একবার না দেখে কে খেয়ে ঘুমিয়ে স্বস্তি পাবে? সুনন্দা আজ একটা অপূর্ব দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে যে। অবিশ্যি একদিনে একযোগে সকলে এসে আক্রমণ হয়তো করত না, একে একে আসত। নিজের নিজের সুবিধা মাফিক সকালে সন্ধ্যায়, দুপুরে বিকেলে, আজ কাল পরশু তরশুর দীর্ঘায়িত ক্ষেত্রে। একসঙ্গে ভিড় জমানোর কৃতিত্বটা নিরঞ্জনের।

সুনন্দাকে না জানিয়ে লুকিয়ে সকলকে—মানে যাদের পক্ষে আসা সম্ভব—চায়ের নিমন্ত্রণ করে এসেছিল নিরঞ্জন।

হারিয়ে-যাওয়া বৌকে ফিরিয়ে পাওয়া, এ কি সোজা কথা? কজনের ভাগ্যে ঘটে এমন সৌভাগ্য? তাই কি যেমন তেমন বৌ? বৌয়ের মতন বৌ। রূপেগুণে, বুদ্ধিতে, বাক্‌পটুতায়, আবার ব্যবহারের সৌজন্যে সুনন্দার জুড়ি বৌ একটা বের করুক দিকিন কেউ? সুনন্দার জন্যে নিরঞ্জন অনেকেরই ঈর্ষার পাত্র।

বেলা তিনটে নাগাদ যখন নিরঞ্জন বড় বড় কয়েকটা বাক্স বোঝাই করে সন্দেশ, বিস্কুট আর কেক এনে হাজির করল, তখন সুনন্দা তো অবাক।

—কী হবে এসব?

—খাবে পাঁচজনে।

—তার মানে? হঠাৎ পাঁচজনে তোমার বাড়ি এসে সন্দেশ খাবে কেন?

নিরঞ্জন মুখ তুলে চাইলে সুনন্দার দিকে, মুচকে হেসে বললে—বাঃ খাবে না? আনন্দ প্রকাশের পদ্ধতিই তো এই। পাঁচজনকে সন্দেশ খাওয়ানো।

আহ্লাদে আব্দারে যেন গলে পড়ে সুনন্দা, ঠোঁট উল্টে আলতো গলায় বলে—এঃ ভারি তো একটা পচা পুরোনো বৌ, হারিয়ে যেত আপদ যেত, দিব্যি একটা আধুনিকা তরুণীকে ঘরে আনতে আবার।

—আবার? বলো কী।

নিরঞ্জনের কথার সুরটা ঠিক ধরতে পারে না সুনন্দা, অমন চালাক চতুর চৌকষ মেয়ে হয়েও নয়। তাই এমনি খানিকটা হেসে নিয়ে বলে—করতে না বই কী, ইস! চিরবিরহী হয়ে থাকতে? এত আর নয়।

নিরঞ্জন সন্দেশের বাক্সের দড়িগুলো খুলে টেবিলে গুছিয়ে রাখতে রাখতে গম্ভীরভাবে বলে—বিয়ে করতে চাইলেই বা পেতাম কোথায়? বৌ-হারানো হতভাগাকে আবার মেয়ে দেবে কোন্ হতভাগা?

—ওমা! সুনন্দা হেসে ভেঙে পড়ে—বৌ কি তোমার নিজের দোষে হারিয়েছিল? বৌয়ের নিরেট বুদ্ধির দোষ। বড়জোর বলতে পারো তোমার ভাগ্যের দোষ। এই এত কষ্ট, ঝঞ্ঝাট, দুশ্চিন্তা, অর্থদণ্ড—এগুলো তো ভোগ করতে হ'ল তোমাকেই? তোমার ভাগ্যে না থাকলে—

—আমিও তো সেই কথাই বলছি—নিরঞ্জন প্যাকেট-মোড়া কাগজের টুকরোগুলো মুচড়ে হাতের মধ্যে পিষতে পিষতে বলে—দোষ একটা আমারই আছে কোনওখানে, কিন্তু বাজল ক'টা? তিনটে বেজে গেছে? যাই চায়ের অর্ডারটা দিয়ে আসি, আর দেরি করা ঠিক নয়।

সুনন্দা চোখ বড় করে বললে—আবার চায়ের অর্ডার? কত পয়সা খরচ করবে খামোকা? এমনিতেই তো কত খরচ হয়ে গেল আমার জন্যে।

নিরঞ্জন হাসল—এও তো তোমারই জন্যে। তোমাকে ফিরে পাবার আনন্দটা একলা ভোগ করব? সবাইকে জানাব না?

সুনন্দা ভ্রূভঙ্গি করে—বেশ, তা যেন বুঝলাম, কিন্তু পাঁচজনে জানবে কি করে তুমি বাড়িতে কেক সন্দেশ মজুত করে চায়ের অর্ডার দিতে যাচ্ছ? হাত গুনবে বাড়ি বসে?

—আমার উইলফোর্সে আনব সবাইকে—বলে আবার জুতোটায় পা গলায় নিরঞ্জন।

আর নিরঞ্জনের ইচ্ছাশক্তির প্রমাণ পেতে থাকে সুনন্দা বেলা পাঁচটা থেকে।

যেন নতুন করে আবার বৌভাত হবে সুনন্দার।

নিরঞ্জনের নির্দেশে চমৎকার একখানা শাড়ি পরেছে সুনন্দা, লাল পাড়ের, তার সঙ্গে ম্যাচ করে লাল একটা ব্লাউস। সিঁথিতে সিঁদুর জ্বলছে ডগ্ ডগ্ করে, আর ফর্সা কপালের উপর সযত্নে আঁকা বিরাট আকারের সিন্দুরের টিপটা যেন সগর্বে ঘোষণা করছে সুনন্দার সৌভাগ্য।

সৌভাগ্যবতী সুনন্দার নতুন আর ডবল সৌভাগ্য।

সুনন্দার জন্যে নিরঞ্জন যেমন অনেকের ঈর্ষার পাত্র, তেমনি নিরঞ্জনের অগাধ পত্নীপ্রেমও অনেক মেয়ের ঈর্ষার বস্তু।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করছে সুনন্দা, অজস্র হাসছে, অনর্গল কথা কইছে, পাঁচ সাত বছর বয়স কমে গেছে যেন ওর।

বাবা! এই বৌকে হারিয়ে ফেলেছিল নিরঞ্জন!

যে দেখছে সেই ভাবছে একবার করে কথাটা।

মোটা শরীর নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠছে পিসতুতো ননদ বাসন্তী। হাঁফটা জিরিয়ে নেবার অপেক্ষা করে না, হাঁফাতে হাঁফাতেই বলে—ধন্যি বাবা! খুব দেখালে যা হোক! দাদাটিকে আমাদের পাগল করে ছেড়েছিলে।

সুনন্দা মিষ্টি করে হাসে—সে কি আজ নতুন? চিরদিনই তো করছি।

—তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বাবা...তা বলে—যাই বলো ভাই, এবারে কিন্তু তোমার নন্দাইকে খুব একচোট নিয়েছি।

—কেন, সে ভদ্রলোকের অপরাধ?

—অপরাধ নয়? বরাবর কেবল আমাকে বলা হয়—'হাঁদা বোকার ঢিপি'! সুনন্দা-বৌদির বিদ্যে-বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ! এবার? এবার কি হ'ল? আর যাই হোক—এ পর্যন্ত তো ঘরেই আছি। জোচ্চোরে ভুলিয়ে ঘরের বার করে নিয়ে যেতে পারেনি।

নন্‌দাইটি বোধহয় 'ঢিপি' প্রেয়সীটিকে সিঁড়ির মুখে ছেড়ে দিয়ে নীচেই ছিলেন এতক্ষণ, এবারে দেখা গেল আসছেন! তাঁর দিকে এক নজর তাকিয়ে সুনন্দা স্বভাবসিদ্ধ টেপাহাসি হেসে বলে—তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে হলে তো লরী ভাড়া করতে হবে, সেটা কি আর নিঃশব্দে হ'ত?

—ওই শোনো! হয়েছে?—হা হা করে হেসে ওঠেন নন্‌দাই।

বাসন্তী রেগে গিয়ে আরও হাঁফায়—তাহলে আমার মতন ঢিপসি হাতিই ভালো বাবা! মুটেভাড়া দেবার ভয়ে কাছে এগোবে না কেউ।

সুনন্দা ওর রবারের মতো গালটা টিপে দিয়ে হেসে ওঠে খিলখিল করে।

মামাতো দেওর নীতীশ উঠে এল লাফাতে লাফাতে—এই যে বৌদি সশিরে জ্বলজ্যান্ত আছেন তাহলে?

—থাকব না? সুনন্দা ওর গায়ে রুমালের ঝাপটা মেরে হেসে ওঠে—কেন, তোমার দাদা আমার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নেমন্তন্ন করে এসেছিলেন নাকি? তাই জ্বলজ্যান্ত দেখে চমকে যাচ্ছ?

—তা অবশ্য নয়। কিন্তু যা কীর্তি দেখালেন! ...সত্যি কিন্তু আপনার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত হয়নি এটা। শেষে কিনা খবরের কাগজের রদ্দি খবরের মতো শুনতে হ'ল—"জুয়াচোরের কবলে সুনন্দা দেবী!" যা তা করলেন একেবারে! সত্যি আপনার একবার সন্দেহ মাত্র হ'ল না? অপরিচিত একটা লোকের সঙ্গে চলে গেলেন ধাঁ করে? চাকরটা ফিরে আসা পর্যন্ত দেরি সইল না—দোর খুলে রেখে—

সুনন্দা রহস্যময় সুরে বলে—তোমার কাছে আমিও কিন্তু এ-রকম মাথা-মোটা কথা শোনবার আশা করিনি নীতু ঠাকুরপো! ওই রদ্দি গল্পটা তুমিও দিব্যি বিশ্বাস করে বসে আছ?

—তার মানে? বিশ্বাস করব না মানে? আরও কিছু আছে নাকি এর ভেতর?...

...নিরঞ্জন আসছে হন্তদন্ত হয়ে, রেস্টুরেণ্ট থেকে চা-বাহী চাকর পাঠিয়ে দিয়েছে, টাকাটা দিতে হবে তাকে—নীতুকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে তিন লাফে ওপরে উঠে গেল ও, ততক্ষণে সুনন্দা হাসিতে ভেঙে খান্‌খান হয়ে গেছে—না তো কি সত্যি কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গেল আমাকে? কেটে পড়েছিলাম হে, নিজের ইচ্ছায় কেটে পড়েছিলাম। তোমার দাদার ট্যাঁক থেকে খসে পড়েছিলাম। তারপর—এই তোমাদের সব মনে পড়ে গেল। ফিরে এলাম।

—ভাগ্যিস তোরা ছিলি—

পার্সটা হাতে নিয়ে ছুটে-নেমে যাবার সময় বলে যায় নিরঞ্জন।

পাত্রভেদে সুনন্দার ধরন আলাদা। বয়োজ্যেষ্ঠাদের কাছে বসে রয়েছে সুনন্দা। নম্র কোমল শান্ত মুখে একটা বিগত ক্লান্তির ছায়া।

শাড়ির টকটকে পাড়টা, ব্লাউজের উজ্জ্বল লালটা, সিঁদুরের ডগডগে রেখাটা এখন আর সৌন্দর্যের উপর একটা উগ্র ছাপ এনে দিচ্ছে না, ফুটিয়ে তুলেছে সতী-সাধ্বীর স্নিগ্ধ সুষমা।

রঙটাকে অমন মিইয়ে আনতে পারল কি করে সুনন্দা?

—সেদিনের কথা মনে আনলে কি আর জ্ঞান থাকে মাসিমা? ভদ্রলোকের মতো দেখতে—গাড়ি চড়ে এসেছে—কী করে ভাবব জোচ্চোর ডাকাত? যখন বলল—"মেডিকেল

কলেজ থেকে আসছি আমি, আপনি যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হন, হয়তো শেষ দেখাটাও হবে আপনার স্বামীর সঙ্গে।...মোটর অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপার, যা দেখে এসেছি তাতে তো আর ভরসা হয় না"—তখন...ভাবুন আমার অবস্থা? ...মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গিয়ে চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী একদম অন্ধকার হয়ে গেল।

মাসিমা 'আহা হা' করে ওঠেন মাঝখানে।

সুনন্দা কথার জের টানে—বুক থরথর করছে...হাত পা কাঁপছে, গলা শুকিয়ে কথা বেরুচ্ছে না মুখে—তবু বুদ্ধি খাটিয়ে বললাম—এ বাড়ি আপনি চিনলেন কী করে? লোকটা একখানা নোট-বুক বার করে দেখাল—তাতে নাম-ঠিকানা লেখা। আপনারই বোনপোর নোট-বুক। কিছুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল, কী করে যে জোগাড় করল! বললে পকেটে ছিল। তাও আবার কেমন যেন থ্যাঁথলানো, কাদা মাখা।—বলুন আর স্থির থাকা সম্ভব?

মাসিমা দ্বিতীয়বার 'আহা হা' করে ওঠেন—সত্যিই তো স্বামী হেন বস্তু! এমন সংবাদ শুনলে মাথার ঠিক আর থাকে? তবু তুমি যাই—খুব বুদ্ধিমতী সতীলক্ষ্মী মেয়ে, তাই সে শয়তানের ফাঁদ থেকে ইজ্জত বাঁচিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছ। তা এ পাঁচদিন কী করলে বৌমা?

কী করলাম? ঈশ্বর জানেন মাসিমা, আমি নিজেই জানি না কীভাবে কাটিয়েছি পাঁচ-পাঁচটা দিন। দশ-দশটা বেলা উপোস করেই বা থাকলাম কী করে ভগবান জানেন।

ঝর ঝর করে একরাশ জল ঝরে পড়ে সুনন্দার বড় বড় চোখের কোণ বেয়ে।

...আহা হা, ইস্, উঃ, নারায়ণ...আক্ষেপ আর সহানুভূতির একটা স্রোত বয়ে যায় ঘরে।

কৌতূহলী একটি বালিকা প্রশ্ন করে—সে লোকটা তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল কেন রাঙাপিসি?

—কেন আবার! সুনন্দা তার মাথায় বাঁধা রিবনটা ধরে নাড়া দিয়ে ছেলেমানুষী সুরে বলে—ডাকাত যে! দেখছিস না, সমস্ত গয়না কেড়ে নিয়েছে আমার। কত চুড়ি, কি সুন্দর হার, কেমন লাল আংটি সব ছিল আমার, মনে নেই তোর? সব নিয়ে নিল!

—স-ব?...বালিকা হতাশ নিশ্বাস ফেলে—তুমি কাঁদলে না?

—কাঁদলামই তো! কাঁদলাম বলেই তো ছেড়ে দিলে, তা নয় তো কেটে কুচি কুচি করে ফেলত।

—তা হলেও তো ভালো ছিল—জ্ঞাতিদের বড় জা একটি সতপ্ত নিশ্বাস ফেললেন—কেটে ফেললে তো বালাই যেত, পোড়া মেয়েমানুষ জাত, তার যে আবার অনেক জ্বালা। তায় আবার তোমার ওই আগুনের মতন রূপ।....এ আমরা আবলুশ কাঠ আছি, একরকম আছি ভালো। তা গয়নাগুলো কি মেরে ধরে কেড়ে নিল ছোটবৌ?

আশান্বিত দৃষ্টিতে তাকান তিনি; অধিকতর কোনও লাঞ্ছনার কাহিনী শোনার আশায়।

সুনন্দার মুখে নেমে আসে বিষাদের গাঢ় ছায়া—মারে-ধরেনি অবিশ্যি। নিজেই হাতে করে ধরে দিয়েছি। তবু ভগবানের দয়া যে বিশ বাইশ ভরি সোনা ছিল গায়ে। আজকের দাম তো বড় কম নয়। হাতে পায়ে ধরে, সেইগুলো ঘুষ দিতে তবে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে রাজি হ'ল হতভাগা।...যা বলেছ বড়দিনও, মিথ্যে নয়। কালো-কালো বুড়ো-হাবড়াদের কোনও জ্বালা নেই।

বড়দি কালো মুখ আরও কালো করে তালশাঁস সন্দেশখানি তুলে নেন হাতে।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন...উত্তর দিতে দিতে চোস্ত হয়ে গেছে সুনন্দার মুখ।...

ভর দুপুরবেলা যখন বদমাইশ ছোকরাটা আচমকা এসে ওকে মিথ্যে ধাপ্পা দিয়েছিল, তখন না হয় মাথাটা গিয়েছিল বেঠিক হয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। এখন তো তা নয়, এখন সুনন্দা নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে অনেকের মাঝখানে।

এখন মাথার বেঠিক তো হবে না, কথারও না। সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে হেসে হেসে নিরঞ্জনকেও সেই কথাই বলে—তোমাকে যদি কেউ ধাঁ করে এসে বলত—আমি মাথা ফেটে হাসপাতালে পড়ে আছি, বুদ্ধি বিবেচনা ঠিক থাকত তোমার? হুঁশ থাকত—সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে? বাড়িতে তালাচাবি লাগিয়ে যেতে? ছুটতে না ঊর্ধ্বশ্বাসে?

নিরঞ্জন বলে—সে-রকম শুনলে ছুটতাম বই কি! কিন্তু কই আমি তো তোমাকে দোষ দিইনি একবারও।

আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবর্গের অভিনন্দন-পর্ব শেষ হতে রাত দশটা বাজল।...

শুতে আসতে আরও কতক্ষণ!

খাটের উপর বসে আছে সুনন্দা, নিরঞ্জন এসে চেয়ারে বসল।

নতুন শাড়ি ব্লাউজটা এখনো ছাড়েনি সুনন্দা, কপালের টিপটা সমান জ্বলজ্বল করছে। ফর্সা মুখ বলেই কি সিঁদুর-টিপটা অমন অবিকৃত থাকে? কত মেয়েরই তো দেখা যায় এতটুকু টিপটা কোন্ ফাঁকে নাক থেকে শুরু করে সারা কপাল জুড়ে মাধুর্য বিস্তার করে রয়েছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আশির দিকে নজর পড়ে, তাকিয়ে দেখছে সুনন্দা, নিজের কাছেই নিজেকে লোভনীয় মনে হচ্ছে....লাল রঙটার আকর্ষণীশক্তি একটা আছেই সত্যি।

কথা সুনন্দাই কইলে প্রথম—বাবাঃ! লোকের ওপর লোক, উঃ! কথা কইতে কইতে হাঁপিয়ে গেছি একেবারে। এত সবাইকে জড় করবার কী যে দরকার হ'ল তোমার!

নিরঞ্জন উঠে পাখার রেগুলেটার ঠেলে দিয়ে আবার এসে বসে—ভালোই তো করলাম। আসত তো সকলেই অন্তত একবার করে? এ তবু একদিনে সব বলাটা শেষ করে নিতে পারলে, গল্পটা যথাযথ মনে থাকল। আচমকা যখন-তখন বলতে গেলে ভুলচুক হয়ে যেতে পারত।

—ভুল? ভুল হয়ে যাবে?

চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল টলটল করে ওঠে সুনন্দার, তবু মুখে হাসি টেনে এনে বলে—আজ আমাদের বৌ-ভাত, তাই না?

একটু নড়ে চড়ে বসে নিরঞ্জন—উৎসবটা দেখতে সেই রকমই হ'ল বলে।

সুনন্দা মাথার কাপড়টা ভালো করে বেড় দিয়ে ঘিরে দু'খানি শিথিল হাত কোলের উপর রেখে ভারি কোমল ভঙ্গিতে বসে। শোবার ঘরে মাথায় কাপড় রাখার অভ্যাস নেই সুনন্দার, তাই হয়তো মুখে ফুটে উঠেছে অমন শান্ত শ্রী।

নিরঞ্জন আর কথা বাড়াচ্ছে না। চুপ করে তাকিয়ে আছে সুনন্দার জ্বলজ্বলে টিপটির দিকে। নিরঞ্জন দুচক্ষে দেখতে পারে না টিপ পরা, তবু পরে সুনন্দা। কেন? একবিন্দু রঙের ছাপ! কী অদ্ভুতভাবে বদলে দিতে পারে মুখের চেহারা!

কত ছোট্ট একটু কালির আঁচড় পৃথিবীর চেহারাটাই বদলে দেয়।

সুনন্দার রেখাহীন শুভ্র মসৃণ ললাটে ওই ছাপটা যদি না থাকত,—কেমন দেখতে লাগত ওকে? কেমন দেখতে লাগত পৃথিবীকে—নিরঞ্জনের পকেটে যদি না থাকত—কুণ্ডলীকৃত ঘুমন্ত সাপের মতো ক'টা কালি ছাপ?

—কী দেখছ অমন করে? সুনন্দা মিষ্টি করে হাসে—দেখনি কখনও?

—কী জানি? বোধহয় না।

...তা' ভালো—এখন আরও বেশি করে দেখ—কী বল? এখন তো ডবল দাম বেড়ে গেছে আমার, তাই না? বিয়ে করে ঘরে আনার চাইতে অনেক বেশি খরচা করলে বোধহয়।

—তা' হবে। তোমার গয়নাগুলো ধরলে—হাজার পাঁচ ছয় গেল বই কী?

—পাঁচ ছ'হাজা—র!

সুনন্দা বড় বড় চোখ আরও বড় করে তাকায়—এত টাকা নষ্ট করেছ?

—নষ্ট? তা যদি বল তো তাই। অবিশ্যি কিছু কিছু পেতে হলে দাম তো কিছু দিতেই হয়।

—পেলে তো ভারি এক অপূর্ব রত্ন—সোহাগে গলে-পড়া স্বরে কথাটা শেষ করে সুনন্দা—কিন্তু এত টাকা করলে কি? পুলিস? ডিটেক্‌টিভ? বিজ্ঞাপন? গাড়ি ভাড়া?—সুযোগ বুঝে সবাই দাঁও মেরেছে তো?

—তা মারবে বই কী, সেই তো নিয়ম। এই দেখ না কেন, সামান্য ক'লাইনের চিঠিখানা—চোদ্দ শ' টাকার কমে ছাড়ল না।

—চিঠি!

অবাক হয়ে তাকায় সুনন্দা।

—ওঃ তোমায় বুঝি বলা হয়নি সেকথা? এই যে—নির্বিকার ভাবে পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে খুলে ধরে নিরঞ্জন—আঠারো শ' বলেছিল, চোদ্দর কমে কিছুতেই হ'ল না।

—কী এ?

আর্তনাদের মতো একটা আওয়াজ বেরোয়।

শান্ত সুনন্দা হঠাৎ বাজপাখির মতো ঝাপট মারে নিরঞ্জনের প্রসারিত হাতের উপর, বাজপাখির মতোই তীব্র তীক্ষ্ণ স্বর বেরোয়—কী এ?

নিরঞ্জন অবশ্য হাতের জিনিস সামলে নিতে পেরেছে—অদ্ভুত একটা হাসি দেখা দেয় মুখে—চিনতে পারছ না? কেন? খুব পরিষ্কার করেই তো লেখা,—নিজের লেখা চিনতে ভুল হওয়া—আশ্চর্য তো! কেন—তোমার লেখা বলে মনে হচ্ছে না? আমি তো দিব্যি পড়তে পারছি—

কাগজটার দুটো কোণ শক্ত করে চেপে ধরে পড়তে পারার প্রমাণটাই বোধহয় দেখাতে চেষ্টা করে নিরঞ্জন।

ছোট্ট কাগজের টুকরোটা হঠাৎ যেন যত ইচ্ছে বড় হতে থাকে...বড় হচ্ছে আরও বড় হচ্ছে...ঢেকে ফেলছে—নিরঞ্জনের হাত মুখ...সর্বাঙ্গ,...ঢেকে ফেলেছে এই ঘরবাড়ি...সুনন্দাকে, ...ঢেকে ফেলল সুনন্দার সমস্ত ভবিষ্যৎ।

কাগজ, না সুনন্দার মৃত্যুবাণ?

আকাশে বাতাসে সারা জগতে কোথাও একটু ফাঁক নেই—শুধু কালো কালির কয়েকটি লাইন সর্বত্র কিলবিল করে বেড়াচ্ছে—সুনন্দার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে।

—ছিঁড়ে ফেল—ছিঁড়ে ফেল তুমি ওটা—

—ছিঁড়ে ফেলব? বলো কী! আরও অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে নিরঞ্জনের চোখ মুখ প্রত্যেকটি রেখায়—এত দামি জিনিসটা ছিঁড়ে ফেলে মানুষ? থাক্ না—আমার কাছে থাকাই

তো সেফ, জগতের আর কারুর চোখে পড়ার আশঙ্কা রইল না।

সযত্নে পাট করে চিঠিটা পকেটে পুরে ফেলে নিরঞ্জন।

যে চিঠিটা—ক'দিন আগে ঐ চেয়ারটাতে বসেই লিখেছিল সুনন্দা বাল্যসহচর কমলাক্ষকে। যাতে—একান্ত মিনতি ছিল,—বেচারি সুনন্দাকে এই বন্দীর খাঁচা থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবার। অভিনয় করে করে আর পারছে না সুনন্দা, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, উদ্ধার পেতে চায়। সংসার সমাজ সব কিছুর বাইরে—ছোট্ট একটু নীড়।—টাকা না থাক সুনন্দার গহনাগুলো তো আছে—

তা কিছুটা অনুরোধ রেখেছিল বইকী কমলাক্ষ; সুনন্দার "নীড়" বাঁধার বায়না মেটাতে বোধ হয় বায়না স্বরূপ নিয়েছিল গয়নাগুলো, কিন্তু "ছোট্ট নীড়ে ভীড় বাড়ানোটা পছন্দ করেনি বলেই সুনন্দাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল একটা মফস্বল শহরের ওয়েটিং রুমে!

—ক্লান্ত হয়ে পড়লেও—অভিনয়টা যে এখনও সাকসেসফুলিই চালিয়ে আসছে সে কথা বলতেই হবে সুনন্দা। কন্‌গ্র্যাচুলেট করছি তোমায়। বুদ্ধির জোরে বজায় রেখেছ আমার মান-সম্ভ্রম, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—

—আর তুমি—

আর্তনাদ করে ওঠে সুনন্দা—আর তুমি—যত্ন করে তুলে রেখে দেবে—আমার মৃত্যুবাণ!

—মৃত্যুবাণ? বাঃ বলেছ তো মন্দ নয়!—গলা ছেড়ে হেসে ওঠে নিরঞ্জন —বেশ ভালো ভালো কথা জোগায় তো তোমার? অনেক নভেল নাটক পড়ো কিনা। পকেটের উপর সযত্নে হাত বুলিয়ে যেন পরীক্ষা করে নেয় নিরঞ্জন—আছে কিনা। আছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বলে—নামটা নির্বাচন করেছ খাসা, কিন্তু—কার, তাই ভাবছি—

রাজি?

এ কটা মেয়ে এসে একটা ছেলেকে ডেকে প্রথমে কথা কইল, 'আমায় বিয়ে করতে রাজি আছেন?' এমন ঘটনা জগতের আর কোথাও ঘটেছে কিনা ভগবান জানেন, তবে শমিত জানে না। অথচ শমিতের ভাগ্যে তাই ঘটল।

মেয়েটা যে একেবারে অপরিচিত তা নয়, শমিতদের দক্ষিণ খোলা বাড়িটার দক্ষিণ চেপে যে তিনতলা বাড়িখানি বেশ কিছুদিন ধরে তৈরি হয়েছিল, এবং মাস ছয়েক আগে রীতিমতো রাজকীয় ভাবে তার মালিকের 'গৃহপ্রবেশ' ঘটেছিল, মেয়েটি সেই বাড়িরই মেয়ে।

ওই বাড়িরই মেয়ে, সেটা দেখছে শমিত এই মাস ছয় ধরে তবে জানে না—মেয়েটা মালিকের মেয়ে না ভাইঝি, ভাগ্নী, অথবা আশ্রিত জন।

কারণ মেয়েটাকে শমিত নানা সময় নানা অবস্থায় এবং নানা সজ্জায় দেখে। কখনও দামি শাড়ি টাড়ি পরে সস্ত্রীক মালিকের সঙ্গে তার ঝকঝকে অ্যামব্যাসাডার খানায় চেপে হাওয়া হয়ে যেতে দেখে, কখনও দেখে যেমন তেমন শাড়ি পরে নিজেই গাড়িখানা ড্রাইভ করে বেরিয়ে গেল, আবার কখনও লাট হওয়া একখানা শাড়ি পরে উস্কো খুস্কো চুলে কাগজের ঠোঙা হাতে চিনে বাদাম চিবোতে চিবোতে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে।

কৌতূহল হয় না তা নয়।

কিন্তু এগিয়ে গিয়ে পরিচয় করবার সাহস হয়নি কোনওদিন। যখন ওভাবে রাস্তায় ঘুরতে দেখে তখনই সাহস করা যেতে পারত। কিন্তু ঠিক তখনই যেন বাঘিনী বাঘিনী দেখায় ওকে। যেন কথা বলতে গেলেই আক্রমণ করে বসবে।

কিন্তু পাগল নয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোনও কোনও দিন যখন একপাল মেয়ে জুটিয়ে রাস্তা আলো করে, অথবা বলতে পারা যায় হাসির ধমকে রাস্তা খান খান করতে করতে যেতে দেখে, তখন দেখে ওই রোগা লম্বা কালো মেয়েটাই যেন দলের মধ্যমণি। তাছাড়া নিয়মিত কলেজ-টলেজও যায় মনে হয়। নচেৎ বই ফই নিয়ে যায় কোথায় রোজ। অথচ নিত্য একই সময় নয়, কে জানে ইউনিভার্সিটিতেই পড়ে কিনা, মেয়েদের তো আবার বয়েস বোঝা যায় না।

অন্তত শমিত বুঝতে পারে না। পাড়ায় যে মেয়েটাকে স্কুলের ক্লাস নাইন টেন-এর ছাত্রী ভেবে অগ্রাহ্য করেছে, একদিন জানল সেই বেণী ঝোলানো মেয়েটা নাকি স্কুলের দিদিমণি।

আবার একটা দিগ্‌গজ মেয়েকে দিদিমণি ভেবে সমীহ করে 'আপনি' বলে কথা বলে, জানতে পারল মেয়েটা ক্লাস এইট-এর ছাত্রী। বয়েস মাত্র চোদ্দ। শমিতের অবশ্য ঘোরতর সন্দেহ হয়েছিল বয়েস কিছুটা চুরি করে রেখে বলেছে। কিন্তু কতটাই বা চুরি করবে?

শমিতদের বাড়ির সামনে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি আছে। তাই অনেক বয়সের আর অনেক রঙের মেয়ে দেখতে পায় শমিত। কখনও সখনও বাস-স্টপ-এ দেখা হয় কারো সঙ্গে, উঃ কী ভীড়। মানুষের ভারে কলকাতা শহর এবার ভেঙে পড়বে। ইস কী গরমই পড়েছে। এত বৃষ্টি হচ্ছে তবু গরম কমছে না। এই রে আজ দেখছি ভেজাবে, আকাশের যা অবস্থা। এমনি সব স্বগতোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এক আধটা কথা হয়ে যায়, পরিচয় হয়ে যায়।

'আপনি তো ওই সামনের বাড়িটায় থাকেন?'

'আপনারা ওই আট নম্বর ফ্ল্যাটে নতুন এসেছেন, তাই না?'

কিন্তু ওই ধিঙ্গি মেয়েটার সঙ্গে?

কদাচ না।

ওকে কখনও বাঘিনী মূর্তিতে, কখনো মহিমময়ী মূর্তিতে, কখনও উদাসিনী মূর্তিতে, কখনও বিশ্ব নস্যাৎ মূর্তিতে শুধু দূরে থেকেই দেখেছে। দশ ফুটের মধ্যে আসেনি কখনও। কথাও নয় অতএব।

আর আজি কিনা একেবারে দু'ফুটের এলাকায় হানা দিয়ে বলে বসল, 'শুনুন আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে—'

শমিত সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল 'বলুন'।

মনে মনে অবশ্য কিঞ্চিৎ ভয় পেল।

কী জানি হঠাৎ না প্রশ্ন করে বসে, 'যখন তখন আমার দিকে তাকান কেন?'

হ্যাঁ এই আশঙ্কাটাই হল শমিতের, ওই ভয়ঙ্কর প্রশ্নের নয়।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর তৈরি রাখল শমিত।

'আপনার দিকে আমি তাকাই এ প্রমাণ দেখাতে পারেন আপনি?'

যদি বলে, 'এর আবার প্রমাণ কী? নিজের চোখেই দেখেছি।'

শমিতও বলবে, 'তার মানে আপনিও তাকান। এবং নিশ্চয়ই সেটা খুব অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। বহির্জগতে গাছ পাখি, গাড়ি, ছাগল, মানুষ গরু, বহু জিনিসই থৈ থৈ করে। চোখ থাকলেই চোখে পড়বে।'

তাতেও যদি বলে, 'না আপনি বিশেষ করে আমার দিকেই তাকিয়েছেন—'

তা'হলে শমিত ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলবে, 'এ সন্দেহ হবার কারণটা কী বলুন তো, নিজেকে বুঝি আপনার খুব দ্রষ্টব্য মনে হয়?'

কিন্তু মনে মনে এত সব কথা সাজানো বৃথাই গেল শমিতের।

মেয়েটা ওসব দিক দিয়েও গেল না।

'আপনার সঙ্গে কথা আছে' বলে দাঁড় করিয়ে বলে উঠল, 'আপনি আজ্ঞে করবার দরকার নেই। তুমি বললেও চলবে। আমি কিছু মাইন্ড করব না। জিজ্ঞেস করছি—আপনি আমায় বিয়ে করতে রাজি আছেন?'

শমিত যেন তিনতলা থেকে আছাড় খেয়ে পড়ল। এটা আবার কোন্ প্রশ্নের সূচনা?

তবু শমিত তাড়াতাড়িই সামলে নিল নিজেকে।

খুব গম্ভীর ভাবেই বলল, 'আশাকরি আপনি অথবা দু'জনের কেউই পাগল নয়।'

মেয়েটা মুহূর্তে তীক্ষ্ণ হল।

বলল 'তার মানে? আপনি কি বলতে চান পাগলে ছাড়া আমাকে কেউ বিয়ে করতে রাজী হবে না?'

'ঠিক উল্টো' শমিত সেই গাম্ভীর্য বজায় রাখবার চেষ্টা করে বলে বলছি, 'পাগল ভিন্ন আমার মতো হতভাগার কাছে কেউ বিয়ের প্রস্তাব করে না।'

মেয়েটা জেরার গলায় বলল, 'সেটা তো একদিকের ব্যাপার হল। যদিও তাতে আমাকেই পাগল বলা হল। কিন্তু সে যাক। দু'জনের কথা বললেন কেন?'

শমিত মনে মনে একবার এই জটিল অঙ্কটা কষে নিল।

তারপর মৃদু হেসে বলল, 'বললাম এই ভেবে, পাগল ভেবে হয়তো আমায় ক্ষ্যাপালেন। নচেৎ সাধারণত ঠিক এ ধরনের ঘটনা তো ঘটে না।'

'ঘটনা?'

মেয়েটা ভুরু কুঁচকে বলে, 'ও, এই প্রস্তাবটাকেই ঘটনা বলছেন?'

হাতে ঝোলানো ব্যাগটার মধ্যে থেকে দুটো টফি বার করে একটা শমিতের দিকে এগিয়ে দিয়ে, আর অপরটা মোড়ক খুলে নিজের গালে ফেলে মেয়েটা মাথা নাচিয়ে বলে, 'তা অবশ্য স্বীকার করছি। এভাবে কোনও মেয়ে নিজে থেকে এসে কোনও ছেলের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে না। কিন্তু আমি ও সব ফর্ম্যালিটি মানি না। একটা ছেলে যে কাজ করতে পারে, একটা মেয়ে সে কাজ করতে না পারবে কেন? আর এ যুগে পারছে না বা কোনটা?

শমিতও চকোলেটটার মোড়ক খুলে মুখে ফেলে বলে, 'সে তো ঠিকই, মেয়ে এবং ছেলের প্রকৃতিগত পার্থক্য ছাড়া অন্য পার্থক্য আমিও মানি না। তবে আমার জানা নেই কোনও ছেলে কোনো অপরিচিত মেয়েকে প্রথম সম্ভাষণ করে এ ধরনের প্রস্তাব করতে পারে কিনা।'

মেয়েটা হঠাৎ চটে উঠে বলে, 'অপরিচিত মানে? আপনি আমায় চেনেন না? না আমি আপনাকে চিনি না?'

শমিত অবশ্যই মজা পায়।

এবং এও সন্দেহ হয় তার হয়তো বা মাথার কোনওখানে চিড় খাওয়া আছে। অথবা স্রেফ চালাকি। সেকালে মেয়েরা ইচ্ছে করে হাত থেকে রুমাল ফেলে দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করত। একালে বেপরোয়া অভদ্রতা করে আলাপ জমায়। অন্তত সিনেমা টিনেমায় তাই দেখেছে।

অতএব সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মাথায় চিড় খাওয়া কি ঝানু নম্বর ওয়ান।

কিন্তু মজাটা মন্দ লাগছে না।

তাই উত্তর দেয়, 'আপনি আমায় চেনেন কিনা সেটা আপনি জানেন, কিন্তু আমি মোটেই চিনি না আপনাকে।'

'বললাম না, 'আপনি আপনি' করতে হবে না।' মেয়েটা প্রায় ধমকে উঠে বলে, 'দুচক্ষে দেখতে পারি না ওই সব সাজানো গোছানো কথা। চলবে না কেন, প্রফেসরকে বলব আপনি,

বাবার বন্ধুদের বলব। তোমার মতো একটা রাস্তার চ্যাংড়া ছেলেকে আপনি বলতে যাব কেন? আর তুমিই বা কেন তোমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট একটা মেয়েকে 'আপনি আপনি' করতে যাবে। ছাড়ো ওসব। এই তো আমি বলছি তুমি, তুমি, তুমি! হল? বাপ্‌স '[illegible]'? উঃ ছেলে গুলো হচ্ছে এক নম্বর ফিচেল। রাত দিন তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ক্ষওয়াচ্ছে আবার বলে কিনা চিনি না।'

শমিত হাত বাড়িয়ে বলে, 'আর একটা দেখি।'

'কী?'

'টফি।'

মেয়েটা উৎফুল্ল মুখে ব্যাগ থেকে আর দুটো বার করে সমভাগ করে নিয়ে এক গাল হেসে বলে, 'তুমিও আমার মতো টফি ভালোবাস বুঝি? ভালোই হল। বিয়ের পর ঝগড়া হবে না। দু-জনেরই একই পছন্দ।'

শমিত ব্যঙ্গ হাসি মাখা মুখে বলে, 'বিয়েটা তাহলে হবেই ধরে নিচ্ছ?'

'না হবার কী আছে?'

ও আবার চটে উঠে বলে, 'আমি কি একটা ফেলনা পাত্রী? আমি বাবার একমাত্র মেয়ে তা জানো?'

শমিত মাথা নেড়ে বলে, 'জানি না তো, তুমি যে কার মেয়ে তাই তো জানি না। তা একমাত্র।'

'তুমি এত মিথ্যুক।'

মেয়েটা চোখে আগুন জ্বেলে বলে, 'আমি ওই বাড়ির মেয়ে তা জান না তুমি?'

সত্যি চটেছে মনে হয়।

শমিত কৌতুক দৃষ্টি অন্য দিকে হেনে নিরীহ গলায় বলে, 'ওই বাড়ির মেয়ে তা অবশ্য জানি। কিন্তু বাড়ির মালিকের তুমি মেয়ে না ভাইঝি, ভাগ্নী না দুঃস্থ-আত্মীয়া তা কী করে জানব বলো?'

মেয়েটার রাগ রাগ মুখে হঠাৎ একরাশ হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

বেশ অন্তরঙ্গ গলায় বলে, 'তা যা বলেছ। বাবাও তাই বলে। বলে তোকে দেখে পাড়ার লোক ভাবে, তুই এ বাড়ির বাজার সরকারের মেয়ে। কী করব, সব সময় সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে থাকা আমার পোষায় না। ওই যে আমার মা। হি হি হি, স্নানের পর রুজ ক্রীম, লিপস্টিক, কাজলের পেন্সিল এ সবের যথাযথ ব্যবহার না করে ভগবানের সামনেও বেরোবে না। একবার না হি হি, মায়ের মাসির খুব অসুখ, এই মাসিকে মা ভীষণ ভালোবাসে, বলে ওর 'অবস্থা গুরুতর' বলে খবর পাঠিয়েছে। মা না সেই পড়ি তো মরি অবস্থায় এত ভুরু এঁকেছে হি হি, সবে স্নান করে বেরিয়েছিল কিনা তখন, আগেরগুলো সব মুছে গিয়েছিল, সেই ভিজে ভিজে ভুরুতে—।

শমিত গম্ভীর গলায় বলে, কেউ তার গুরুজন সম্পর্কে এ ধরনের শ্রদ্ধাহীন কথা বলে, এটা আমার ভালো লাগে না।

মেয়েটা রেগে ওঠে না, সঙ্গে সঙ্গে বরং মলিনই হয়ে যায়। সেই মলিন মলিন গলায় বলে, 'আমারও তো ভালো লাগে না। আমিও তো শ্রদ্ধাই করতে চাই কিন্তু বড় লোকের

বৌদের—যাক্ গে থাক ও কথা। তবে ওই যা বললাম, সাজ টাজ সব সময় ভালো লাগে না আমার। ইচ্ছে হলেও আমি যেমন তেমন ভাবে একটু রাস্তায় বেরোতে পাবনা, ফুটপাথে বিছোনো ভুট্টা পেয়ারা কি চিনে বাদাম কিনে খেতে পাব না, সব সময় গাড়ি চড়ে বেড়াতে হবে, ওজন করে কথা বলতে হবে। অঙ্ক কষে কষে লোকের সঙ্গে মিশতে হবে এ জীবনের কোনও মানে হয়?'

শমিত একটু হাসে।

বলে, 'অনেক মেয়ের কাছেই এ জীবন খুব মানে পূর্ণ।'

'হতে পারে।'

মেয়েটা উদাস মুখে বলে, 'আমার তো ওরকম জীবন ভাবলেই নিজেকে চিড়িয়াখানার বাঘ মনে হয়।'

'উৎকৃষ্ট তুলনা। তবে বাঘ নয় বাঘিনী।'

'ও একই।'

ও আরও উদাস উদাস গলায় বলে, 'আমার বন্ধুরাও বলে বটে, 'তুই একটা অদ্ভুত।' কিন্তু আমি ভেবে পাই না কী করে স্বাধীনতাহীন জীবন লোকের কাম্য হতে পারে। .... তুমি তো বললে গুরুজন সম্পর্কে সমালোচনার কথা বলতে নেই। কিন্তু দেখলে যে কষ্ট হয়। আমি জানি বাবা গরমের দিনে খালি গায়ে থাকতে ভালোবাসে, সেই অভ্যেসই ছিল বাবার, কিন্তু বড়লোক হয়ে এই দুর্দশা হয়েছে বাবার সব সময় অন্তত গেঞ্জিও গায়ে রাখতে হয় বেচারাকে।..... আরও অনেক রকমের কষ্টই আছে যে গুলো মায়ের ভয়ে করতে বাধ্য হয় বাবা। মানে এই বড়লোক হয়ে অবধি—।'

শমিত ঈষৎ চমৎকৃত গলায় বলে, 'কিন্তু তুমি তো দিব্যি স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি হয়ে—'

কথা শেষ করবার আগে আত্মস্থের হাসি হেসে ওঠে ও। বলে, 'আমাকে এঁটে উঠতে পারে না।'

'সেটা বিশ্বাস হচ্ছে।'

'হচ্ছে?'

'হুঁ। মনে হচ্ছে যে হতভাগা তোমায় বিয়ে করবে, তার জীবন মহানিশা।'

'যে হতভাগা মানে?'

ও ভুরু কুঁচকে বলে, 'বিয়েটা তো তোমার সঙ্গেই হচ্ছে—'

শমিত কষ্টে হাসি চাপতে গিয়ে কেসে উঠে বলে, 'কিন্তু আমি তো এখনো মনঃস্থির করে উঠতে পারিনি।'

'হয়ে যাবে। ও মুখে এসে পড়া রুক্ষ চুলগুলো হাত দিয়ে টেনে দিব্য প্রত্যয়ের সুরে বলে, 'হয়ে যাবে মনঃস্থির। তবে ওই সব 'হতভাগা' 'মহানিশা' শব্দগুলো আমি পছন্দ করছি না। যাক্ এতক্ষণ যে কথা হল আমার নামটাও জানলে না। না কি জানো?'

'কোথা থেকে জানব?'

শমিতও ভুরু কোঁচকায়।

মেয়েটা অম্লানবদনে বলে, 'না, মানে অনেক ছেলের আবার পাড়ার মেয়েদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের খুব উৎসাহ দেখা যায় কিনা? কী নাম, কোথায় পড়ে, কখন বাড়ি থেকে বেরোয়, কখন বাড়ি ফেরে, এই সব।'

'আমি তা'হলে সেই অনেক ছেলের দলে নয়।'

'ভালো, এতে আমি খুশি হচ্ছি। কিন্তু আমরা কি এই রকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব করব? কোথাও গিয়ে একটু বসলে হত না?'

শমিত বলে, 'কিন্তু ভাব করতেই হবে, এমন কথা তো ছিল না।'

'বিয়ের আগে কিছুদিন ভাব করতে হয় এটাই রীতি।' মেয়েটা গম্ভীর ভাবে বলে, 'রেস্টুরেন্টে, পার্কে, গঙ্গার ধারে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, এই সব জায়গায় আর কি। লেক্‌টা আগে ছিল, এখন পুরোনো হয়ে গেছে।'

'তুমি তা'হলে ধরেই নিচ্ছ, বিয়েটা হচ্ছে?'

মেয়েটা হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে, 'কেন, তুমি ধরে নিচ্ছ না? বলো ত'হলে এখুনি পষ্ট করে। রাজি না থাকলে আমি বাবা ভাবের মধ্যে নেই। অনেক ঠকেছি।'

শমিত মুখ গম্ভীর করে বলে, 'অনেক ঠকেছো? তার মানে অনেকের সঙ্গে ভাব করে বেড়িয়েছ।'

'তা আবার বলতে—'মেয়েটা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, সেই চোদ্দো বছর বয়েস থেকে তো ভাব করে বেড়াচ্ছি। কিন্তু ঝামেলা কি জানো? দিব্যি ভাব টাব হয়েছে, এক সঙ্গে এখান-ওখান বেড়াচ্ছি, এক ঠোঙায় চিনেবাদাম খাচ্ছি, ওমা, যেই বিয়ের কথা বলেছি, ব্যস', হাওয়া।.... তখন 'চাকুরি করছি না, বেকার..... তোমায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবো কি, এই সব ধানাই পানাই। এতই যদি দিব্যজ্ঞান তো মরতে ভাব করতে এসেছিলি কেন?'

শমিত বলে, 'কিন্তু আমারও তো সেই একই অবস্থা। বৌকে কী খাওয়াবো, সেই চিন্তা।'

মেয়েটা আত্মস্থের গলায় বলে, 'নাঃ সে সব খবর আমি নিয়েছি। আর ঠকব না ঠিক করেছি বলেই আগে খোঁজ নিয়েছি, তুমি পাস ফাস কিছু করেছ, কোনও একটা কলেজে যেন পড়াচ্ছও কিছুদিন। তোমার নাম শমিত সেন, রকে টকে আড্ডা ফাড্ডা দিতে না—তোমার নাম শমিত সেন—।'

শমিত মৃদু হেসে বলে, 'অনেক মেয়েরও তাহলে পাড়ার ছেলেদের তত্ত্ব নেবার উৎসাহ আছে?'

'উপায় কী?'

ও দিব্য সপ্রতিভ গলায় বলে, 'ঠেকে শিখেছি। একটা ছেলে বুঝলে, বছরখানেক ধরে পায়ে পায়ে ঘুরল বাড়িতে রাগারাগি, মা বলে, ঠাকুমার কাছে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে, বাবা বলে, ছেলেটাকে ধরে একদিন শিক্ষা দিয়ে দেবে, মহাঅশান্তি। তখন বললাম, 'আর সহ্য হচ্ছে না, চলো বিয়েই করে ফেলা যাক এবার। শুনে লক্ষ্মীছাড়াটা কী বলল জানো? বিশ্বাস করবে? বলল, 'তোমার মতো মেয়েকে যে বিয়ে করবে সে পাগল।'...... রেগে অবিশ্যি একটু খামচে ফামচে দিয়েছিলাম, কিন্তু শেষে ধিক্কার এল। ওরকম লোক কি রাগেরই যোগ্য। বলো? তাই ওকে খুন করে ফেলার ইচ্ছেটা সামলে নিলাম।'

শমিত বলে, 'ভালোই করেছ কিন্তু কোথাও গিয়ে একটু বসবার কথা হচ্ছিল না?'

'এই তো চলো না একটু এগিয়ে। ওই যে 'ওরিয়েন্ট কেবিন' আছে। ওইখানেই বসি আমরা। মানে যখন যার সঙ্গে ভাব হয়, সে আর আমি।'

শমিত এগোতে এগোতে বলে, 'আমি তোমার ক'নম্বরের বন্ধু হব?'

'ওরে বাবা, সে কি এখুনি বলা যায়? সম্প্রতি যে পাজিটা দাগা দিল, তার নাম তো ছিল অভী, আর আগে বিজন, তার আগে পার্থ, তার আগে নিত্যানন্দ, তার আগে—নাঃ ঠিক মনে পড়ছে না।'

'সবাই তোমায় দাগা দিয়েছে?'

খুব নিরীহ গলায় বলে শমিত।

মেয়েটা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'সে কথা তোমায় বলিনি আমি। আমিও তাড়িয়েছি দু'একটাকে। অসহ্য লেগেছিল। ন্যাকার রাজা, খোকার অবতার, এদিকে আবার পাকা ঢেঁকি, ওই সব ছেলেকে সহ্য করা যায়? বলো?'

শমিত ওর চরণছন্দে তাল রেখে এগোতে এগোতে বলে, 'এমনও তো হতে পারে তোমার সম্পর্কেও ছেলেরা ওই রকম ভাবে?'

মেয়েটা আবার তখনকার মতো থমকে দাঁড়ায়। বলে, 'কেন? তুমি ভাবছ নাকি তাই?'

'আহা আমি না ভাবলাম অন্য লোকে তো ভাবতে পারে?'

'অন্য লোকে ভাবলে কী হয়েছে? মেয়েটা নিশ্চিন্ত গলায় বলে, 'তুমি না বললেই হল। এখন যখন তোমাকেই কিন্তু তুমি কী আমার কথার উত্তর দিয়েছিলে? সন্দেহের গলায় বলে ও, 'কই মনে পড়ছে না তো?'

শমিত অবাক হয়ে বলে, 'কোন্ কথার?'

'ওমা এক্ষুনি ভুলে মেরে দিলে? তোমায় নিয়ে তো দেখছি পরে ভুগতে হবে আমায়। প্রথমেই কী বলেছিলাম আমি?'

শমিত যেন ভাবছে।

বেশ কয়েক সেকেন্ড ভাবে।

তারপর বলে ওঠে, 'ও হো হো। সেই বিয়ের কথাটা?

আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই। এবারে ওই কড়া দাগাটা খাবার পর ঠিক করেছি আগে কবুল করিয়ে নেব বিয়ে করতে রাজি কিনা। তবে তার সঙ্গে ভাব করব।'

শমিত গম্ভীরভাবে বলে, 'কথাবার্তা তো বেশ চৌকস, বুদ্ধিটা এমন ভোঁতা কেন? কথা দিয়ে যে কথা রাখব, এ গ্যারান্টি তোমায় দিচ্ছে কে? এখন আমি বললাম, হ্যাঁ রাজি, তারপর বেশ কিছুদিন তোমার পয়সায় চপ ফ্রাই চা কফি খেয়ে তারপর বললাম, 'তোমায় যে বিয়ে করে সে পাগল।'

মেয়েটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। গম্ভীর ভাবেই বলে, 'মাও ওই কথাই বলে। তোর পয়সায় চপ কাটলেট খাবে বলে ছোঁড়াগুলো তোর সঙ্গে ভাব জমায়। কিন্তু কী করব বলো বাবুদের সকলেরই যে ট্যাক গড়ের মাঠ। আর নিরিবিলিতে দুদণ্ড কথা বলবার জায়গা এ পৃথিবীতে আছে, এই রেস্তোরাঁগুলো ছাড়া?'

শমিত বলে, 'তা বটে। কিন্তু তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না। যদি আমিও পরে বলি তোমাকে কে বিয়ে করবে? যে করবে, হয় সে পাগল, নয় অবিলম্বে পাগল হয়ে যাবে। তখন কী করবে?'

মেয়েটা শান্ত বিশ্বাসের গলায় বলে, 'নাঃ, তুমি সেরকম করবে না। তুমি একটু ভদ্র আছ।'

'টেরিলিন প্যান্ট শার্ট পরলে সবাইকেই ভদ্র দেখায়।'

এই সেরেছে। মেয়েটা হেসে ওঠে, 'তুমি যে আবার আমার বাবার মতো মন্তব্য করছ। বাবাও ঠিক ওই কথাই বলে। মানে আমি আমার অমন বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ে, রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে মিশছি দেখে রেগে যায় তো? আমি যদি বলি ওরা ভদ্রলোকের ছেলে তখন বাবা রেগে মেগে ওই কথা বলে। হি হি হি মেয়েটা হঠাৎ হেসে কুটি কুটি হয়ে বলে, 'বাবা ভীষণ জব্দে পড়ে বসে আছে। মানে এই একটা বৈ মেয়ে নেই তো? আমার তো স্থির বিশ্বাস, আর ছেলে মেয়ে থাকলে বাবা নির্ঘাৎ আমায় ত্যাজ্য পুত্তর করত।'

ওরা 'ওরিয়েন্ট কেবিনের' সামনে এসে গিয়েছিল।

মেয়েটা বলে, 'এই একটু গম্ভীরভাবে ঢুকবে। যাতে ওরিয়েন্টের ওই ইয়ার ছোকরাটা বলে বসতে সাহস না পায়, এই যে দিদিমণি। ইনি বুঝি এই নতুন। এমন হাড় জ্বলানো কথা বলে।'

শমিত চড়া গলায় বলে, 'ওরকম কথা আমার সামনে বলতে আসুক দিকি। ঘুসি মেরে নাক ফাটিয়ে দেব না?'

'সত্যি? দেবে?' মেয়েটা যেন খুশিতে টগবগিয়ে ওঠে। তারপরই আবার একটু মিইয়ে গিয়ে বলে, 'সত্যি অবিশ্যি তা কোরো না। যাই হোক অনেকদিন চা খাইয়েছে আমায়, অনেক উৎপাত সহ্য করেছে। তবে এই যে তুমি বেশ বীরের মতো বললে কথাটা, এতেই আহলাদ হল। পুরুষ মানুষ যদি বেশ একটু বীর বীর না হল তো, হল কি। এই যে ঢোকবার আগে শেষ কথাটা হয়ে যাক। বিয়েয় রাজি? যদি রাজি থাক, তো চলো ভেতরে ঢুকি, অনাদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, ওই যে, যে, ওই রকম ইয়ার্কি মারে আর কি। পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভালো করে কিছু অর্ডার দিই। আর যদি রাজি না থাক, যাও এখান থেকেই কেটে পড়ো। ফর নাথিং তোমার সঙ্গে ঘুরতে পারব না।'

শমিত মৃদু হেসে বলে, 'আচ্ছা ধরে নাও না হয় রাজি আছি—'

'ধরে নাও মানে?' মেয়েটা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'আর আমি ওসব ধরে টরে নেওয়ার মধ্যে নেই। স্পষ্ট কথা চাই।' হয় 'রাজি' বলে কথা দিয়ে ঢোকো। নয় কেটে পড়ো।'

শমিত দাঁড়িয়ে পড়ে বলে 'বা তোমার সম্বন্ধে কিছু না জেনে রাজি অমনি হলেই হল? রূপ তো দেখতেই পাচ্ছি। কোয়ালিফিকেশানও তো জানা দরকার?'

দরকার? ওঃ।

মেয়েটা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'বাবু যেন সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর পাত্তর, গুছিয়ে গাছিয়ে পাত্রী দেখতে এসেছেন। রূপের কথা মুখে আনবে না। নিজে একটু সুন্দর দেখতে বলে, অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ছে না না? কোয়ালিফিকেশান মানে কী? লেখাপড়া? বি এ, পড়তে পড়তে কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলাম, বেজায় লাগত। এখন প্রফেসারের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পড়ছি। পরীক্ষাটা দিয়েই দেব। বাবা বলে, লোকের কাছে না কি মুখ থাকে না বাবার। বলে এখনকার ছেলে মেয়েগুলো যাচ্ছেতাই কীর্তি করে বেড়ালেও লেখাপড়াটা ঠিক চালিয়ে যায় বলে মা বাপের মুখটা তত হেঁট হয় না। তুই আমার একুল-ওকুল দু'কুল খেলি।' বলেছি বেশ বাবা যদি পাসগুলো করলেই তোমার মুখরক্ষে হয় করব তাই। তাই পড়ছি।'

'বেশ ভালো কথা।'

শমিত হাসি চেপে বলে, 'কিন্তু রান্না বান্না, সেটা জানা আছে?'

'মাথা খারাপ?'

'সেলাই?'

'রাবিশ।'

খেলাধুলো।'

'আগে করতাম ছেড়ে দিয়েছি।'

'মেজাজ?'

'সেটা মা বলতে পারবে। হল সব প্রশ্ন?'

'হল।'

শমিত হাতটা বাড়ায়।

'কী আবার টফি?'

মেয়েটা ব্যাগ খুলতে যায়।

শমিত বলে 'উহুঁ টফি নয়, হাত। পাণি গ্রহণের রিহার্সালটা হয়ে যাক।'

মেয়েটা একটু থতমত খেয়েই এক গাল হেসে বলে, 'ওঃ বুঝেছি।' হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

শমিত সেই হাতটা ধরে করমর্দনের ভঙ্গিতে ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে, 'রাজি।'

'বাঁচলাম! চলো এবার বসবে চলো।' ভিতরে ঢোকে।

অনাদিকে ডেকে অর্ডার দেয়, গুছিয়ে বসে বলে, 'তা তো হল, কিন্তু এখনও তো আমার নামটা জানলে না?'

শমিত নিশ্চিন্তভাবে চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বলে, 'জানি।'

'জানো?'

'হুঁ। নাম নাছোড়বান্দা।'

শোক

ছুটির দিনে বিশ্রাম সুখ, এমন বিলাসিতার কথা ভাবতেই পারে না দীপা। ছুটির দিনগুলোয় রাশি রাশি পরীক্ষার খাতা দেখে সে।

দীপা টেবিলের উপর সেই খাতার পর্বত জমিয়ে বসে দাঁতে দাঁত চেপে একটার পর একটা খাতা দেখে যাচ্ছিল। দীপার মাথা ঝিমঝিম করছিল, দীপার চোখের পাতায় যেন মৃত্যুঘুম নেমে আসতে চাইছিল।

ক্লান্তি ক্লান্তি, পাথরের চাঁইয়ের মতো বুকে চেপে বসে আছে এই ক্লান্তির ভার। এর থেকে বুঝি কোনওদিনই উদ্ধার নেই দীপার।

অথচ জয়দীপটা যদি একটু মানুষের মতো হত।

জয়দীপের নির্লজ্জতা দেখে দেখেই যেন দীপা এত ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। ক্লান্ত, বিষণ্ণ, মেজাজি। সত্যি আজকাল যেন মেজাজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বসেছে দীপা। ওর মেজাজ দেখে মা স্তব্ধ গম্ভীর, ছোট ছোট ভাই বোন তিনটে দিদিকে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়। সহজ ভাবে যা কথা, সেটা জয়দীপই কয়। কিন্তু সে সবই তো তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথা।

আশ্চর্য, কী অদ্ভুত বেহায়া হয়ে গেছে ছেলেটা।

যেন এ সংসার সম্পর্কে ওর কোনও দায়িত্বের প্রশ্ন নেই।

নিজের ঘরে বসেই টের পাচ্ছিল দীপা জয়দীপ বৈকালিক ভ্রমণে বেরোবার তোড়জোড় করছে। প্রথমে কলঘরে গিয়ে চৌবাচ্চার সব জলটা সাবাড় করে এসেছে, তারপর এখন ঘরের মধ্যে গুন গুন করে গান গেয়ে গেয়ে হাঁটাচলা করে বেড়াচ্ছে। তার মানে এ আর্শি ও আর্শি করে ঘুরে ফিরে দাড়ি কামাচ্ছে, পাউডার মাখছে, ঘাড়ে লতানো এক কাঁড়ি চুলের কেয়ারি করছে, জুলফির কায়দা বজায় আছে কি না দেখছে।

এরপর জামা প্যান্ট বাছাই করে পরা, তারপর সাজগোজ সেরে প্যান্টের পকেটে রুমাল পুরতে পুরতে এঘরের দরজায় এসে দাঁড়ানো।

সব মুখস্থ হয়ে গেছে দীপার।

এসে দাঁড়িয়ে কী কথা বলবে জয়দীপ তা পর্যন্ত।

তা সত্যিসত্যিই সেই মুখস্থ হয়ে যাওয়া কথাটাই বলল জয়দীপ দরজায় দাঁড়িয়ে।

লজ্জা চাপা দেবার যে বিশেষ বেপরোয়া ভঙ্গিটি আয়ত্ত করে নিয়েছে সে, সেই ভঙ্গিতে বলে ওঠে, এই দিদি খুব মাথা ঘামাচ্ছিস তো? কোনও দরকার নেই বাবা, স্রেফ একখানা করে খাতা ধর আর ঢেরা মেরে দে। দীপা মুখ না তুললেও টের পাচ্ছে, জয়দীপের মুখটা আহ্লাদে এখন টগবগ করছে। তার মানে সেই বান্ধবীটির বাড়িতে ছুটছে।

দীপার সারা শরীর রাগে রী রী করে ওঠে।

শুধু বেকার তবু সহ্য হয়, কিন্তু প্রেমে পড়া বেকার?

অসহ্য!

প্রেমে হাবুডুবু খাচ্চেন বাবু। নিজের পায়ের তলায় মাটি নেই, একটা টলমলে ফুটো নৌকোর ওপর ভর, অথচ—

আশ্চর্য! সবই তো জানে ও। দীপার জীবনের কোনও কিছুই তো অজানা নেই ওর। যখন দীপার জীবনে ভালোবাসা এসেছিল, তখন পিঠোপিঠি ছোট ভাইকে,

—যা যা পাকামি করতে আসিস নে, বড় যে দেখছি ডেঁপো হয়ে উঠেছিস—বলে শাসালেও পরে বলেও ফেলেছে সব, না বলে পারতো না বলেই বলে ফেলত।

সেই ভালোবাসাকে দীপা সরিয়ে দিয়েছে।

সেই সুখস্বপ্নকে স্বেচ্ছায় চোখ থেকে মুখে ফেলেছে। কারণ দীপার বাবা জোরকদমে চলতে চলতে হঠাৎ চলার পথে পূর্ণচ্ছেদ টেনে হঠাৎ বিদায় নিলেন, আর মা সেই ধাক্কায় প্রায় শয্যা নিলেন। অকাল-বার্ধক্যের শিকার মা-র পুরনো শান্ত মেজাজ গেল বদলে।

দীপা বড়, দীপার মুখের দিকে সমগ্র সংসার তাকিয়ে, অতএব দীপা নিজের মুখটার দিকে তাকাবার কথা ভুলে যাবার সাধনা করতে লাগল।

এ সমস্তই জয়দীপের জানা।

অথচ জয়দীপ এই সংসারের ক্ষীণ ভাঁড়ার থেকেই সাজছে গুজছে বেড়াচ্ছে আর প্রেম করছে।

দীপার শরীর রাগে রী রী করে উঠবে না ?

জয়দীপ একটু উসখুস করে বলে, 'এই দিদি তোর ওই সাবর্ডিনেটের প্রতি বস-এর ভঙ্গিটা ছাড় বাবা। দয়া করে একটু তাকা।'

দীপা বরফ বরফ চোখ তুলে শান্ত গলায় বলে, 'কী?'

'কী সেটা তো বুঝতেই পারছিস, মুখ দিয়ে না বলিয়ে ছাড়বি না?'

'আমার বোধশক্তিটা একটু কম,' দীপা বলে, 'যা বলবার স্পষ্ট করেই বলতে হবে।'

জয়দীপ একটু এগিয়ে এসে দিদির টেবিলের ওপর ঝুঁকে দঁড়িয়ে বলে, 'নেহাতই বলাবি? তবে স্পষ্ট করেই বলি—বলছি, কিছু মালকড়ি ছাড়।'

'ফের ওই রকম অসভ্যর মতো কথা বলছিস?'

দীপার স্বর কটু তীক্ষ্ণ।

জয়দীপের মা ছেলে বড় হয়ে ওঠা ইস্তক ছেলেকে ধমক দেবার কথা ভাবতে পারে না, জয়দীপের বাবা তো নিজ স্বভাববশেই কখনও ছেলেমেয়েকে উঁচু গলায় কথা বলত না, পিঠোপিঠি দিদিই ওর বরাবরের শাসনকর্তা। কারণ চিরদিনই ছেলেটা খেয়ালি বেপরোয়া, বেহুঁশ।

অতএব শাসনের দরকার ছিল, আর সেই শাসনভার দীপাই নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু আগে সেই শাসনের ভঙ্গিতে একটি কোমল লাবণ্য ছিল, এখন লাবণ্য অন্তর্হিত, কোমলতা শীতল কঠিন। দীপা অবাক হয়ে দেখে, তবুও ওর মধ্যে চেতনার চিহ্ন নেই।

তবে ওই বেহুঁশ বেপরোয়া ছেলেটা কখনো দিদির মুখের ওপর কথা বলে না। দিদির কাছে সে যেন একটা বড় মাপের ছোটছেলে। অতএব দিদির ধমকে ভয় পাওয়া ছোটছেলের মতোই বলে, 'আচ্ছা বাবা আচ্ছা, সুসভ্যর মতোই বলছি। দিদি রে গোটা পাঁচেক টাকা ধার দে। পকেট গড়ের মাঠ।'

'ধার?'

দীপা একটু তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হুল ফুটিয়ে হাসে।

তবে জয়দীপ হুলের জ্বালা গায়ে মাখে না।

বলে ওঠে, 'নিশ-চয়। তোর সব টাকার হিসেব রাখছি আমি। চাকরি হলেই সুদ সুদ্ধু ফেরত দেব।'

'রাধা নাচলে তো সাতমণ তেল পুড়বে?

'বুকটা দমিয়ে দিস নি দিদি। সত্যিই কি আর রাধা চিরদিন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে? কোনোদিন নাচবে না? নাচবে রে দিদি নাচবে। সেদিন দেখিস। টাকা মাটি মাটি টাকা, বুঝলি? নেহাত ভগবান মেরে রেখেছে তাই ওটা কাউকে দেখাতে পারছি না। যাক্ এখন তো দে পাঁচটা টাকা।'

দীপা জানে ওই বাকচাতুরী করেই দিদির মনটা ভেজাতে চায় ও, কিন্তু দীপা ভিজবে না। দীপা তাই খাতায় চোখ রেখে শুকনো খট্‌খটে গলায় বলে, 'আজ মাসের সাতাশ তারিখ।'

'জানি রে দিদি।'

জয়দীপ একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে, 'ওই তারিখগুলিই তো এখন জীবনের সম্বল হয়েছে। দোসরা থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত অসঙ্কোচ চাই, এগারো থেকে একুশ পর্যন্ত ঘাড়-চুলকে চাই, অর বাইশ থেকে তিরিশ লজ্জায় কাটা যাওয়া মাথাটা হাতে নিয়ে হাত পাতি।'

'লজ্জা।'

দীপা খাতা থেকে মুখ তুলে আর একবার ব্যঙ্গহাসি হাসে। 'লজ্জা শব্দটার বানান জানিস?'

'বানান?'

জয়দীপ সাবধানে ঘাড়ের লতানো চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে ঘাড় চুলকে বলে, বানানটা হয়তো ঠিক জানি না, কিন্তু মানেটা জানি রে। ভাবিস নে জিনিসটা আমার শরীরে নেই। আছে, 'জানতে পারিস না।'

'কী করে পারব?'

'তা বটে,' সেইভাবেই আবার ঘাড়টা চুলকে নেয়, 'পারা শক্ত! প্রমাণ তো দিতে পারছি না। তবু বিশ্বাস কর চেষ্টার ত্রুটি করছি না—।'

'ওঃ তাই নাকি ? চেষ্টা করছিস? একটা নতুন কথা শুনলাম বটে।'

'বলে নে বাবা বলে নে। বলবার দিন পেয়েছিস যখন। ভাগ্যটা বড়ই খারাপ বুঝলি? স্রেফ পদ্মপত্রের মতো। কিছুই লেগে যায় না। স্রেফ গড়িয়ে পড়ে যায়।..... কিন্তু সেই আহ্লাদী পুতুল

এসব কিছু বুঝবে না। 'দিব্যি দিয়ে বসে আছে আজ ওকে সিনেমা দেখাতেই হবে, না দেখালে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। বান্ধবীদের কাছে ওর না কি প্রেস্টিজ থাকছে না।'

রাগে হাড় জ্বলে যায় দীপার।

না হয় মাত্র দেড় বছরের বড় দিদি, তবু বড় তো। এভাবে বেহায়ার মতো কথা বলতে মুখে বাধছেও না তো।

দীপার কপাল কুঁচকে ওঠে।

দীপা কড়া গলায় বলে, 'পকেট তো গড়ের মাঠ, এত প্রেম করার শখ কেন?' জয়দীপ প্যান্টের ভাঁজ ভাঙার ভয় ভুলে দিদির বিছানার উপর বসে পড়ে বলে, 'এ প্রশ্ন তুই আমায় করবি কি, আমি নিজেই নিজেকে করছি রাতদিন। কিন্তু প্রেম কি আর কেউ শখ করে করে রে? ও তো কম্প দিয়ে জ্বর আসার মতো হঠাৎ এসে যায়। নিজেই কি জানিস না?' বলেই একটু অপ্রতিভ হয়ে যায় যেন।

দীপার মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে।

দীপা ঠান্ডা গলায় বলে, 'আমার কথার দরকার নেই। থাম।'

জয়দীপ চট করে উঠে পড়ে দুহাতে নিজের দুই কান ধরে 'এই মাপ চাইছি—' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

'এই পাজি ছেলে না নিয়ে চলে যাচ্ছিস যে বড়?'

জয়দীপ ঘাড় ফিরিয়ে ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'তুই তো সাতাশ তারিখ দেখিয়ে দিলি।'

বেশ করেছি। সাতাশকে কি সাত তারিখ বলব?

দীপা ড্রয়ার খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে বাড়িয়ে ধরে আর মুহূর্তে এগিয়ে এসে জয়দীপ সেটাকে প্রায় চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে প্যান্টের পকেটে পুরে বেশ নাটকীয় গলায় উচ্চস্বরে, 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন দিদিমণি।' বলে তিন লাফে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। বেরিয়ে এসে দালানে পড়া ছাড়া গতি নেই, যেখানে দীপাদের মা চৌকীর উপর জানলা থেকে এসে পড়া রোদটুকুতে পিঠ দিয়ে মুড়ি দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে বসে ছিলেন।

হাত পা যত গুটিয়ে যাচ্ছে তাঁর কানটা তত বেশি কার্যক্ষম হচ্ছে।

জয়দীপ বেরিয়ে আসতেই চাপা গলায় বলে ওঠেন, 'ভগবানের কথা কী বলছিলি?'

'ভগবান। আমি?'

জয়দীপ আকাশ থেকে পড়েই, দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'ওঃ হো। বলছিলাম ভগবান।

আমার ভাগ্যে এত দুঃখও লিখেছিলে।'

এই আক্ষেপবাণীটি দীপাদের মা-র অভ্যস্ত বুলি। কিন্তু তিনি সেটা ধরতে পারলেন না বলে উঠলেন, 'আবার বুঝি দিদির কাছে ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিলি?'

জয়দীপের হাতে সময় একটুও নেই, তবু দাঁড়িয়ে পড়ে মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাছাড়া উপায়? তোমার কাছে চাইতে এলে ভিক্ষে মিলবে?'

মা কপালে একটা থাবড়া মেরে বলেন, 'সেই কপালই বটে আমার। আমার ক্ষমতা থাকলে কি আর তোর এই দুর্দশা হয়।'

'দুর্দশা? মাই গড! আমায় দেখে কি তোমার দুর্দশাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে মা?'

'সে তুই নিজে সাবান কেচে নিজে ইস্ত্রি চালিয়ে হকচকিয়ে থাকিস তাই। নইলে ধমকের ওপরই তো আছিস। সামান্য দুটো চারটে টাকার জন্যে মুখনাড়া খাচ্ছিস। এত বড় একটা ছেলেকে কোন্ সাহসে সে ওভাবে ধমক দেয়।'

জয়দীপ দু'কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'কেন? সাহসের অভাবই বা হবে কেন? আমাকে ধমক দেবার রাইট নেই দিদির?'

'তা আছে বই কী।' মা বেজার গলায় বলেন, 'দিদি যখন খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে টাকাটা সিকেটা ভিক্ষে দিচ্ছে, রাইট থাকবে না?'

'হোপলেস!'

জয়দীপ সত্যিই হতাশ গলায় বলে, 'আচ্ছা মা, সব সময় তোমার এমন ছোট কথা কইতে ইচ্ছে করে কেন বলো তো?'

'ছোট কথা?'

'তা ছাড়া? ভালো কথা কও না, ভালো কথা কও, পরকালের কাজ হবে।'

'পরকাল।'

মা ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'আমার আবার পরকাল। মেয়ের হাত-তোলায় পড়ে আছি, মেয়ের মেজাজের ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি—'

'দ্যাখ মা, আমার এখন সময় নেই তাই তোমায় জ্ঞান দিতে পারছি না। তবে এই বলে দিলাম, দিদির মতন মানসিক অবস্থায় আমায় এই সংসার চালাতে হলে দেখিয়ে দিতাম মেজাজ কাকে বলে।'

বেরিয়ে যায় প্রায় ছুটে।

দীপার কানে এসব কথা পৌঁছয় না, এ দিকটায় শুধুই দেয়াল।

আর হয়তো বা দীপা তখন মেয়েদের পরীক্ষার খাতা থেকে চোখ সরিয়ে ডুব দিয়েছে নিজের জীবনের খাতার মধ্যে।

সেখানে বাইরের কোনও কথা পৌঁছচ্ছে না।

অনুপম আজকাল চিঠিপত্র দেওয়া খুব কমিয়ে দিয়েছে, যাও বা দেয়, হৃদয়ের উত্তাপ-বর্জিত সংক্ষিপ্ত। কেবল কাজের চাপের কথাই লেখে। কাজের চাপে সময় পাই না, আর তার সঙ্গে হয়তো ছোট্ট একটু হুল—'তোমারও তো লম্বা চিঠি পড়বার সময় নেই'।

সত্যিই হয়তো নেই।

সময় হারিয়ে যাচ্ছে, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।

অথচ বুঝি অকারণেই।

জয়দীপ একটু মানুষ হলে, জয়দীপ এ সংসারের দায়িত্ব নিতে পারলে, দীপা তো এমন করে নিঃশেষ হয়ে যেত না।

আশ্চর্য, ওর ভেতরে যে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। কখনও মনে হয় মায়ামমতা আছে একটু কখনও মনে হয় একেবারে অনুভূতিশূন্য চেতনাশূন্য। নইলে অনায়াসে মাসের সাতাশ তারিখে বান্ধবীকে সিনেমা দেখানোর জন্যে টাকা চেয়ে বসতে পারে? মা-র জন্যে একটা ওষুধ আনার কথা ছিল সেটা আর দুদিন হয়ে উঠবে না। মা-র ধারণা মেয়ে বলেই দীপা মা-র

শরীরের জন্যে তেমন উৎকণ্ঠ নয়, ছেলে রোজাগারি হলে মা-র সকল দুঃখ ঘুচত, মা রাজার হালে থাকত।

ঈশ্বর জানেন!

দীপা মনে মনে অজানা অদেখা সেই ঈশ্বরকে ডেকে বলে, মা-র ছেলেকে খুব একটা বড় চাকরি পাইয়ে দাও, মা-র সেই হালটা দেখে দীপা মুক্তি পাক।

দীপা আস্তে আস্তে সেই মুক্তি পাওয়া জীবনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। সেই স্বপ্নের দীপা তার মা-র কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, শান্ত গলায় বলে, মা এবার তাহলে আমার ছুটি? এবার তো তোমার ছেলে—'

কিন্তু দীপা কি সত্যিই এ স্বপ্ন দেখেছিল—তার পরদিনই তার মুখের ভাষাটা কেড়ে নিয়ে তার বেহুঁশ বেপরোয়া আত্মসুখী ভাইটা এসে বলে উঠবে, 'দিদি এবার তোর ছুটি।'

তাই বলল জয়দীপ।

মা-র কাছে আগে না গিয়ে আগে দিদির কাছে এল।

দীপা চিঠি লিখছিল, জয়দীপ দুমদাম করে এসে ওর খাটের ওপর বসে পড়ে বলল, 'কাকে চিঠি লিখছিস? অনুপমদাকে?'

দীপা রেগে উঠে কড়া গলায় বলে উঠল, 'হ্যাঁ, রাতদিন আমি তোর অনুপমদাকেই চিঠি লিখছি—'

'এবার থেকে লেখ লেখ—' জয়দীপ খাটে বসে জোরে জোরে পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'এন্তার চিঠি লিখে মরচে পড়ে আসা প্রেমটাকে ঝালিয়ে নিয়ে এবার এ-বাড়ি থেকে কেটে পড়ো। এবার তোর ছুটি।

'আমার ছুটি?'

দীপা যেন একটা যন্ত্রের মধ্যে থেকে কথা বলে।

জয়দীপ উঠে আসে, দিদির কাঁধদুটো ধরে নাড়া দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। দারুণ একটা চাকরি পেয়ে গেছি।'

দীপা অনুমান করে এটা একটা চালাকি জয়দীপের। দিদির মেজাজটা হালকা করে নেবার একটা কৌশল। এরপর বলবে, 'পেয়েছি অবশ্যই, তবে স্বপ্নে।' তারপর ওর সেই আহ্লাদী পুতুল বান্ধবীর গল্প ফাঁদবে।

মেয়েটার বা-বাপ নেই, কিন্তু এমন একখানা মামা আছেন যে, যে মেয়ে সর্বদাই আহ্লাদের সাগরে ভাসছে। মামা-মাসির নাকি ছেলেমেয়ে নেই। তা না থাক, দীপাদেরও তো একটা মস্ত কেষ্ট-বিষ্টু কাকা আছেন, যাঁর ছেলেমেয়ে নেই। নিজের কাকা, সত্যিকার কাকা।

তা তিনি দীপাদের বাবা মারা যাবার পর উপদেশ ছাড়া আর কি দিয়েছেন? না, আর কিছু মনে করতে পারে না দীপা। দীপাদের যে এখন সংসারের চাল খাটো করা উচিত, সুখের দিনের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলা উচিত, আত্মনির্ভর হওয়া উচিত, এই সবই জনে জনে বুঝিয়েছেন।, আর কাকিমা? তিনি বড় জায়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে গেছেন, 'শরীরটার একটু যত্ন নিও দিদি। আহা কী অবস্থাই হয়েছে দেহের।..... দীপা তুই বড়, মাকে একটু দেখিস মা।'

তারপর? তারপর আর কি ? কিছু না।

অথচ জয়দীপের ওই বান্ধবীর মামা?

আহ্লাদী ভাগ্নী চাঁদ চাইলে চাঁদ পেড়ে এনে দিতে প্রস্তুত।

ভগবান জানেন এসব বানানো কিনা। আর—কার বানানো।

জয়দীপের, না তার সেই ঘুঘু বান্ধবীর।

নিজের দর আর কদর বাড়াতে ওই বোকাটার কাছে হয়তো বলে এসব বানিয়ে বানিয়ে।

অথবা জয়দীপই দিদির কাছে নিজের দর ধাড়ায়। বেকার বলেই যে সে অমনি একটা সস্তামালের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে তা নয়।

আসল ঘটনাটা যাই হোক, জয়দীপের সেদিন উচ্ছ্বাসটা প্রবল হয়, দিদিকে খানিকটা না শুনিয়ে ছাড়ে না।

দীপার আজ ভালো লাগছিল না, দীপা ভিতরে ভিতরে নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বলে, কাঁধ দুটোর হাড় গুঁড়িয়ে গেল যে—'

'যাক, আহ্লাদে আজ আমার পৃথিবী গুঁড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।'

'এত আহ্লাদ ! তা হঠাৎ কে এতবড়ো চাকরিটা দিল?

জয়দীপ দিদির খাতাপত্রের প্রতি দৃকপাত না করে টেবিলে উঠে বসে বলে, 'আর কে? সেই মামা। সত্যি আমাদের ত্রিসীমানায় একটা এমন হৃদয়বান মামা কাকা মেসো পিসে কেউ নেই। অথচ লোকের কেমন থাকে টাকে। আমাদের থাকলে কি আর ওই আহ্লাদীর মামার দেওয়া চাকরিটা নিতে হত। তা যাকগে আমি তো আর চাই নি? নিজের গরজেই দিয়েছে। আহ্লাদী নাকি কাঠকবুল করে বসে আছে এই অধমের গলায় ছাড়া মালা দেবে না। অতএব? অতএব মামাবাবুকে নিজের প্রেস্টিজ রাখতেই নিজের ফার্মের ম্যানেজারের পোস্টটা দিয়ে দিতে হল আমায়। লোকসমাজে জামাইয়ের পরিচয় দিতে হবে তো। হাজার খানেক টাকা মাইনে না হলে, বলবে কী করে?'

হাজার খানেক!

দীপা ক্লান্ত গলায় বলে, 'জয়' আর কত ফাজলামি করবি? সর, খাতাপত্তরগুলো গেল।'

'গোল্লায় যাক তোমার খাতা।'

জয়দীপ আরও চেপে বসে বলে, 'তুই তাহলে ভাবছিস আমি ফাজলামি করছি?'

টেবিলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে বলে, 'তা ভাবতেই পারিস। আমিও প্রথমে ভাবছিলাম আহ্লাদী ফাজলামি করছে। তারপর যখন মামা ডেকে বললেন, 'বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে,' তখন তো আত্মাপুরুষ খাঁচা-ছাড়া। নির্ঘাৎ কৈফিয়ত চাইবে কার হুকুমে ওনার ভাগ্নীর সঙ্গে এমন লটবটি করছি আমি। এই শীতকালে ঘামছি। তারপর এই কথা। বলব কি, শুনে আমার সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়িকাট দাড়িওলা গালে একটা চুমু খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হল।'

'জয়, বাচালতা রাখবি?'

'আচ্ছা বাবা, রাখছি রাখছি। আহ্লাদে নাচতে ইচ্ছে করছে বলেই। তোর কাছে ছাড়া আর কাছে বলি বল? সত্যি বলছি রে দিদি, তোকে ছুটি দিতে পারব।

এই ভেবেই আরও—'

'চাকরিটা পাকা?'

'পাকা বলে পাকা! একেবারে কংক্রিটের গাঁথুনি।'

'মাকে বলেছিস?'

'মাকে?'

জয়দীপ বলে, 'মাকে বলা টলা ওসব তোর দায়। আমার দ্বারা হবে না। মাকে বলতে গেলেই হয়তো ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদতে বসবে—'

'তা হোক!'

দীপা দৃঢ় গলায় বলে, 'তুমি নিজে বলোগে যাও।'

'অগত্যা।'

জয়দীপ বেরিয়ে যায়।

জয়দীপ ভাবতে ভাবতে যায় ভাবী শ্বশুরের দেওয়া চাকরি বলেই কি দিদির তেমন আহ্লাদ হল না? হতে পারে। আমারই কি একটু ইয়ে হয় নি? তবে নিজের গরজেই তো দিয়েছে। আমি তো হ্যাংলার মতো চাইতে যাই নি। আর আহ্লাদীকে তো আমি সাফ জবাব দিয়েই দিয়েছিলাম প্রেম করছ প্রেম করো। বিয়ে টিয়ের কথা মুখে এনো না। তোমার মামার আদরের ভাগ্নী জামাই হবার মতো যোগ্যতা আমার কস্মিন কালেও হবে না। অতএব মামা যার গলায় ঝুলিয়ে দেবে, তার গলা ধরেই ঝুলে পড়ো, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলো, ব্যস। ..... ও যদি নিজের গরজে মামাকে ধরে পড়ে এসব করে থাকে, তাতে আমার কী বাবা? .... তা দিদি বড্ড মানী তো।

জয়দীপ তার দিদিকে জানে।

দীপা বড্ড মানী।

আর অত মানী বলেই হয়তো ওর এখন মনে হচ্ছে ওর ছোট ভাই হঠাৎ ভয়ানক একটা অপমান করে গেল ওকে। যেন সে দীপার এতদিনের সমস্ত দুর্ব্যবহারের শোধ দিতে দীপার মুখের ওপর একটা চড় বসিয়ে গেল। দীপা সেই অপমানে টেবিলের ওপর ভেঙে পড়ে কেঁদে ফেলল।.... আর কাঁদতে কাঁদতে ওই অপমানের জ্বালাটা একটা শোকের হাহাকারে পরিণত হল। শোকই।

সেই শোকের শূন্যতা দীপাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে খুব দামি একটা জিনিস তুমি হারিয়ে ফেললে দীপা। আর কোনওদিনই এই পাশাপাশি দুটো ঘরের মাঝখানের ওই দরজাটায় দাঁড়িয়ে একটা অবুঝ বেহুঁশ ছেলে বলে উঠবে না, এই দিদি, কিছু ছাড়তে পারবি? পকেট গড়ের মাঠ!

সবদিক বজায় রেখে

পড়ন্ত বিকেলে মেঘলা আকাশের ঘোলাটে ছায়ায় ঘরের মধ্যে প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বুতান তাই জানলার ধার ঘেঁসে বসে শেলেটে ছবি আঁকছে। শেলেটে ছবি আঁকতেই ভালোবাসে বুতান, অপছন্দ হওয়া মাত্রই ডাস্টার ঘষে বিলীন করে ফেলা যায়। আবার নতুন রেখা পড়ে।

মাকে ঘরে ঢুকতেই তাকিয়ে দেখল বুতান, আর চমকে উঠে বলল, মা! তুমি এইমাত্তর আপিস থেকে এসেই আবার বেরোচ্ছ?

তনিমা বলল, হ্যাঁরে, একটু ডাক্তারখানায় যেতে হবে।

ডাক্তারখানায়? কেন? কার অসুখ করেছে?

আরে বাবা অসুখ নয়, কদিন ধরে ভীষণ মাথা ধরছে, চোখটা একটু দেখাতে যেতে হবে।

তোমার তো চশমা রয়েছে। নতুন সুন্দর চশমা।

ওই তো ওইটাই ঠিক লাগছে না। তাই ডাক্তারবাবুকে বলতে যাচ্ছি।

বারে আমি বুঝি একা পড়ে থাকব?

একা আবার কী? মালতীমাসি রয়েছে না?

ও তো পচা।

এই! চুপ! খবরদার এসব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে না। তুমি মালতীমাসির কাছে দুধটা খেয়ে নিও। লক্ষ্মী হয়ে খাবে বুঝলে? মালতীমাসি যেন তোমার নামে নিন্দে দিতে না পারে।...

মার গলার স্বরটা মৃদু হয়ে আসে, দেখেছো তো আমি ফিরে এলেই মালতীমাসি তোমার নামে নিন্দে দেয়। বলে, 'খুকু দুধ ফেলে দিয়েছে।...খুকু ডিম খায়নি, ভেঙে গেলাসের জলে গুলে দিয়েছে।...খুকু আমার একটাও কথা শোনেনি...।

'খুকু' সতেজে বলে, ওকে ছড়িয়ে দিতে পারো না?

এই! আবার! চুপ! ছাড়িয়ে দিলে চলবে কী করে? লোক পাওয়া যায়? নইলে দিতে তো ইচ্ছে করে। দায়ে পড়েই রাখা।

সাড়ে চার বছরের মেয়েটাকে এই জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি আস্বাদন করিয়ে তনিমা, এখন গলা তুলে বলে, গুড্ গার্ল হয়ে থাকবে। মালতীমাসিকে একদম জ্বালাতন করবে না। দুধ খেয়ে নেবে।... আচ্ছা টা টা!

বুতান অনিচ্ছাভরে একবার 'টা টা'র ভঙ্গিতে হাতটা নাড়ে। যেটা দেখলেই মনে হয় 'না না।' পরক্ষণেই চেঁচিয়ে ওঠে, কখন আসবে?

আরে বাবা সে কি ঠিক করে বলা যায়? বাস পাওয়া যায় না, রাস্তা জ্যাম, ডাক্তারখানায় লোকের ভিড় তিন ঘণ্টা বসিয়ে রাখে—

ও। বুঝেছি। তার মানে দেরি করবে। আচ্ছা আচ্ছা আমিও দুধ খাব না। মালতীমাসির কথা শুনবো না।

বুতান, দিন দিন ভারি অসভ্য হয়ে যাচ্ছ তুমি? কেন, তুমি জানো না, এসব হয়? তোমায় নিয়ে বেরোই না? দেখো না? আমাদের কি গাড়ি আছে?

ইস। বাপীটা যা না একখানা। একটা গাড়ি কেনে না!

তনিমা চলে যেতে গিয়েও ফিরে এসে উৎসাহচাপা, চাপাগলায় বলে, বলিস না তোর বাপীকে। খুব করে বলবি।

বললেই যেন শুনবে বাপী! বাপী যা না একখানা! আমাদের ক্লাসের সব মেয়ের বাপীর গাড়ি আছে।

মা থমকে বলে, তারা স্কুলবাসে আসে না? গাড়িতে আসে?

আহা! তা কেন? ওদের বাপীদের বুঝি অপিস যেতে হয় না? তো অন্যসময় তো ওদের মা, গাড়িটা নিয়ে যত ইচ্ছে বেড়ায়। ওরাও বেড়ায়।

একটি দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়ায়। তোর মার ভাগ্যে আর তা হয়েছে। আচ্ছা চলছি। ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। মনে আছে তো? একদম গুড গার্ল হয়ে—

মা অন্যমঞ্চে এসে দাঁড়ায়।

মালতী, তুমি শুধু শুধু বসে আছ কেন? এইসময় রুটি টুটিগুলো করে নিলেই তো হয়।... রোজই তো দেখছ সন্ধে হলেই লোডশেডিং।

মালতী যেমন বসে ছিল সেইভাবেই বসে থেকে, পোজ দিয়ে একটা গা মোচড় দিয়ে বলে, বিকেলের সময় কিচেনে ঢুকতে মন লাগে না! লোডশেডিংয়ের জ্বালায় টি.বি. দেখা তো ঘুচে গেছে। সাততাড়াতাড়ি রান্না সেরে কি সগগো লাভ হবে? দুটো মোমবাতি রেখে যান।

একগোছা মোমবাতি তো চায়ের বাসনের তাকে রাখাই রয়েছে। আর শোনো—দেখছো তো 'ইনভার্টারটা' কদিন খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। কারেন্ট চলে গেলে খুকুর ঘরে একটা কেরোসিন আলো জ্বেলে দিও।

সে অত বলতে হবে না। আপনি আসবে কখন?

তনিমা হঠাৎ ঈষৎ কঠিন সুরে মনিবানীর গলায় বলে, সে আমি তোমায় বাক্যদত্ত হয়ে বলে যেতে পারছি না! দেরি হলে খুকুকে ঠিক সময় খাইয়ে দেবে।

খেলে তো! যা মেয়ে! শুনবে আমার কথা?

আচ্ছা ঠিক আছে। বাচ্চাকে একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে বশ করতে হয় মালতী। যাক কেউ 'বেল্' বাজালেই হুট্ করে দরজা খুলে দেবে না, পাশের দিকের জানলা দিয়ে দেখে নেবে। আর দুম করে বলে বোসো না 'বাড়িতে কেউ নেই।' বলবে বৌদিদি একটুখানির জন্যে বেরিয়েছে, আর দাদাবাবু এক্ষুনি অফিস থেকে আসবে।

মালতী টাইট ফিট ব্লাউস আর পেট বার করা স্টাইলে শাড়ি পরা শরীরটাকে আর একবার মোচড় খাইয়ে বলে, ও কথা তো আপনি রোজই পাখি পড়া বলে যাও বৌদিদি। আবার বলার কি আছে?

'বৌদিদির' মুখটা কালো হয়ে যায়। সেই কালচে স্বরেই বলে, তবু ভুলে যেতেও তো কসুর দেখি না। আচ্ছা, এসে দরজাটা ভালো করে লাগিয়ে দিয়ে যাও।

মালতী একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আপনাদের বাড়ির এই এক ফ্যাচাং। দরজা লাগাও, দরজা খোলো। ফেলাটবাড়ির দরজা কেমন ঠেকিয়ে দিলেই বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ির লোকেরা যে যখন ফেরে নিজের চাবি খুলে ঢুকে আসে। 'কাজের লোকেদের' কোনও ঝামেলা নাই।

হুঁ।

তনিমা রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে যায়। রাগ ওই দুর্বিনীত মেয়েটার ওপর, রাগ বরের ওপর। রাগ 'দেশের বাড়ি বাসিনী' শাশুড়ির ওপর। আশ্চর্য জেদি মহিলা। নিজে 'দেশের বাড়িটা দেখাশুনোর অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে' বলে সেখানেই গিয়ে পড়ে আছেন, (অবিশ্যি 'গেছেন' সেটা তনিমার ওপর ভগবানের দয়া। সর্বদা মাথার ওপর জাঁতা। বাপস।) কলকাতার এই পচা বাড়িখানা বিক্রি করতেও দেবেন না। হলেও আজেবাজে প্যাটার্নের একতলা একটা বাড়ি, তবু রাস্তার ধারে—এতখানি জমিসমেত বাড়ি কি আজকালকার দিনে সোজা দাম মিলবে?...তা নয় ছেলের কাছে কাঁদুনি 'তোর বাবার সাধ ছিল দোতলা তোলবার। বলেছিলেন, 'অলক যদি পারে।' সে যদি তুই নাও পারিস বাবা, আমি বেঁচে থাকতে বেচাবেচি করিসনে। আমি মরলে যা খুশি করিস।'...

...যেন উনি এক্ষুনি মরছেন। ইস্পাতের শরীর। তো মাতৃভক্ত পুত্তুরের তার ওপর আর একটি কথা নয়।...যুক্তির বালাইমাত্র নেই। আমি যদিবা ও বিষয়ে একটু কথা তুলেছি—মুখ চোখের ভাব এমন হয়ে উঠবে, যেন ওনার মাকে খুন করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।...ওনার দিকে যুক্তি কী? না 'যদি কখনও মা অসুস্থ হয়ে পড়েন, কলকাতায় চলে আসতে চান? এ বাড়ির পাট উঠিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাটবাড়িতে গিয়ে থাকলে, মা এসে উঠবেন কোথায়?' যেন ফ্ল্যাটের দরজায় তাঁর 'প্রবেশ নিষেধ' লট্‌কে রাখা হবে।...

আসলে সেকালের বুড়োবুড়িদের স্বভাবই হচ্ছে, একটা কোনো 'সেন্টিমেন্ট' খাড়া করে, পরবর্তীদের হাত পা বেঁধে রাখা। তা সে যে কোনও ব্যাপারেই হোক। এ স্রেফ্ মনস্তত্ত্বের একটি জটিল তত্ত্ব। যেটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারি, তাই প্রয়োগ করেই ওদের সুখের হন্তারক হই।

এই বাড়িটা বেচে দিলেই একটা সুন্দর ফ্ল্যাট আহরণ করা যায়। হয়তো 'উদ্বৃত্তও' কিছু থাকতে পারে, যা মূলধন করে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির স্বপ্ন দেখা যায়।

দূর। কিস্যু হবে না।

উঃ। যা দেরি হয়ে গেল।

অলকই হয়তো আগে এসে পড়বে। মাত্র দু'মিনিট আগে এলেও অনায়াসে বলবে 'একঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি।'

'মুক্তাঙ্গনে' একটা নতুন নাটক এসেছে, বড়দি খুব প্রশংসা করল সেদিন, সেই থেকেই দেখার ইচ্ছে।

কিন্তু তনিমার পক্ষে ইচ্ছেপূরণ কি সহজ?

বরকে জপানো, বাড়িতে ছল-চাতুরি। ওই যা একখানি মেয়ে হয়েছেন। মা কোথাও বেরোচ্ছে দেখলেই যেন হাপসে পড়েন মেয়ে। 'ডাক্তার দেখানো', 'মেজমাসির শরীর খারাপ দেখতে যাওয়া' এমনি যা হোক বানিয়ে তবে রেহাই। সিনেমা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি শুনলে সাড়ে চার বছরের ধাড়ি মেয়ে হাঁ হাঁ করে কাঁদতে বসবে।

আর তার বাপটিও তেমনি।

বলা হবে টিভিতে তো রাতদিনই সিনেমা থিয়েটার নাচ গান সব কিছু দেখছ। হিন্দি বাংলা ইংরিজি। আবার ছুটে ছুটে দূরে যাওয়ার দরকার কী?

এই মানুষকে নিয়ে ঘর করা।

এ দিন আবার বলা হল, কেন সেদিন তোমার বড়দি জামাইবাবুর সঙ্গে দেখে এলেই পারতে? রাতদিন তো ফোনে কথা চলে। কী রকম রাগটা হয়?... যখন মেজাজ দেখিয়ে বললাম, 'কেন? আমি কি একটা আলতু ফালতু বিধবা? যে সব সময়ে পরের নেজুড় হয়ে কোথাও যেতে হবে?' তখন তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে আনল।... তাই কি নিশ্চিন্ত সুখ বলে কিছু আছে? এই যে যাচ্ছি—বাড়ি ফিরে মেয়ের কাছে গপপো বানাতে হবে—'বাস খারাপ হয়ে কিম্বা হঠাৎ কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। নয়তো ডাক্তারের চেম্বারেই তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছিল।' আর সঙ্গে সঙ্গে ওই পাজিটা বলতে বসবে—আপনি যখন যেখানে যাবে, মেয়েকে নিয়ে যেও বৌদিদি। ওকে 'মেনেজ' করা এই মালতী মন্ডলের কর্ম নয়।

'কর্ম নয়।' ইয়ার্কি? যেন শুধু এই আড়াইখানা লোকের রান্নাবান্না করার জন্যে তোকে মাসে মাসে আড়াইশো টাকা মাইনে, চার বেলা রামরাজত্ব করে খাওয়া, আর আরাম আয়েস, সাজসজ্জা, টিভি দেখা, ইত্যাদি দিয়ে রাখা। তার ওপর আবার জল ঘাঁটলে ওনার হাতে হাজা হয় বলে, বাসন মাজা কাপড় কাচার জন্যে আলাদা একটা লোক রাখা। অন্য অন্য বাড়িতে তো দেখি—একটা লোকই জুতো সেলাই চণ্ডী পাঠ সবই করে। ...অবিশ্যি হাজা ফাজা হলে বিশ্রী লাগে। সর্বদা খাবার জিনিসে হাত। তো কাজ কমানোয় একটু কৃতজ্ঞতা আছে?

মিনিবাসটা চট করে পেয়ে গিয়েছিল এই যা ভালো। তবু বাসে বসে তনিমা অবিরত আপন দুর্ভাগ্যে আর জ্বালার হিসেব কষে চলে। আর কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে।

ঠিক তাই। সন্ধে হওয়া মাত্রই ফস করে বিদ্যুৎ বিদায় নিল। সঙ্গে সঙ্গে বুতান তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল, এই মালতীমাসি, শিগগির আলো আনো।...আঃ! দেরি করছ কেন? মালতীমাসি—

মালতী একটা আধখানা ভুশোপড়া চিমনি পরানো জ্বলন্ত কেরোসিন ল্যাম্প সাবধানে হাতে ধরে এনে বলল, বাবাঃ বাবাঃ। উড়ে আসব না কি? এই জন্যেই তো তোমার মাকে বলি, আপনার 'ইনভার্টার' আলো না থাকলে যেদিন সন্ধের মুখে বেরিয়ে যাবে, একটা কেরোসিন বাতি জ্বালিয়ে রেখে যেও।... তো শুনিয়ে দেবে—'কেরোসিন বুঝি খুব সস্তা?' এ দিকে মেয়ে যে ছিঁচকাঁদুনি।

কী? আমায় ছিঁচকাঁদুনি বলা হচ্ছে? তোমার বুঝি ছোটবেলায় বাড়িতে কেউ না থাকলে আলো নিভে গেলে ভয় করত না?

মালতী ল্যাম্পটাকে সাবধানে টেবিলের মাঝখানে বসিয়ে, পলতেটা উস্কে দিয়ে বলে, আমার? হেঃ। আমাদের আবার ঘরে কেউ নাই এমন হত নাকি? সর্বদাই তো ঘরে লোক গিসগিস।...মা বাপ পিসি ঠাকুদ্দা, আর আমরা পাঁচটা ভাইবোন। ছিল না শুধু ঠাকুমা।

পাঁচটা ভাইবোন।। য্যাঃ।

পাঁচটাই তো। দুটো ভাই, তিনটি বুন।

ওঃ। নিজের খুব মজা ছিল কি না। তাই আমায় ছিচকাঁদুনি বলা হচ্ছে। মাকে বলে দেব।

দিবি তো দিবি। তোর মা আমায় ফাঁসি দেবে না কী?

অ্যাই। তুমি আমায় 'তুই' বলছো যে? তুমি কাজের লোক না?

শোনো কথা। কাজের লোক তা কী? এইটুকু একটা পুঁচকে মেয়েকে 'আপনি আজ্ঞে' করতে হবে নাকি?

কেন? 'তুমি' বলতে পারো না? দেখো মাকে বলে দিলে, মা তোমায় ছাড়িয়ে দেবে।

মালতী নিজস্ব ভঙ্গিতে শরীর মোচড় দিয়ে বলে, ওমা। এইটুকু মেয়ে, যেন পাকা ঝিঁকুটি।

ছাড়িয়ে দেবে তো দেবে। আমার যেন আর কাজ জুটবে না। ওই নতুন ফেলাটবাড়িগুলো থেকে তো হরদম ডাকে।

ঝটকা মেরে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে বুতান চেঁচিয়ে ওঠে, আঃ। মালতীমাসি চলে যাবে না বলছি। এই আলোয় আমার বিচ্ছিরি লাগে।

তো আমি কী করব? এখেনে বসে থাকলে আমার চলবে? কাজ নাই? তোমার মা তো এসে মাত্তরই প্যাঁচাল পাড়বে, এটা হয়নি কেনো? ওটা হয়নি কেনো?

চলে যায়।

আর পরক্ষণেই বুতান রান্নাঘরে চলে আসে।

মালতীমাসি, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে।

মালতী ঝাঁজের সঙ্গে বলে, তা এখানে কী? তোমার ঘরে বোতলে ফোটানো জল নাই?

না। আমি এখানের জল খাব। ফ্রীজের জল।

তা আর না। তারপর মা আসা মাত্তরই বলবে, 'মা মালতীমাসি আমায় ফ্রীজের জল দিয়েছে।' তোমায় চিনি না আমি?

তা চিনলেই বা কী। বুতানের যে এখন এখানেই থাকা দরকার। একটা মানুষের সান্নিধ্যে। আর সে সান্নিধ্যটা বিলম্বিত করতে উপায় হচ্ছে কথা চালিয়ে যাওয়া।... সে কথার মধ্যে যে শুধু বুদ্ধির প্রকাশই থাকবে তা তো হয় না।...

তাই মালতীর আরও কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় বুতান, আহা মা বুঝি বলে না, 'মালতী কী কী করেছে এতক্ষণ? তোকে কী খেতে দিয়েছে সব বল?' আচ্ছা মাকে বলে দেব না—আমায় একটু ফ্রীজের জল দাও। মোটেও বলব না।

মালতী চাকি বেলুন পেড়ে বসে মিচকে হেসে বলে, বলবে না। শুধু মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে খুক-খুক কাশবে, আর বলবে, ঠান্ডা জল খেয়েছি কি না তাই কাশি হয়েছে। হাড় বিচ্ছু ঘুঘু মেয়ে। জানি না আমি?

মালতীমাসি। বুতান সতেজে বলে, তুমি আমায় গালাগালি দিচ্ছ?

মালতী ঢোক গিলে বলে, শোনো কথা। গালাগালি আবার কী? ও তো ঠাট্টা।

ঠাট্টা! আহা।

বুতানের মুখে একটু দেবদুর্লভ হাসি ফুটে ওঠে, আমায় যেন বোকা পেয়েছে।...

আচ্ছা আচ্ছা। তুমি এখন বকবক থামাও তো। লেখাপড়া করোগে না।

লেখাপড়া! সেই একা ঘরে! ভুশোপড়া চিমনি ঢাকা আলোর নীচে? আধা ছায়া আধা আলোয়!

এখানেও মোমবাতির শিখার চারদিকে অন্ধকারের ছায়া। তবু এখানে একটা মানুষের উপস্থিতি।

মালতীমাসি। আমি রুটি বেলবো। দাও—

আঃ। খুকু! কাজের সময় দিক্ কোরো না। একে লোডশেডিং এর জ্বালায় মরছি। পড়া লেখা নাই? ভোর না হতেই ইস্কুলে ছুটতে হবে না?

কী? কাল ইস্কুলে যেতে হবে? কাল বুঝি রবিবার নয়? বোকা। বোকা। দাও বেলুনটা।

আঃ। খুকু। বলছি না কাজের সময় ব্যস্ত করো না বাবা। এই মেয়েখানিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে বৌদিদির রোজ সন্ধেবেলা বেড়াতে যাওয়া।

কী?

বুতান আবার মর্যাদাবোধে সচেতন হয়। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ভঙ্গিতে বলে, তুমি আবার আমার মার নামে নিন্দে দিচ্ছ! মা না থাকলেই তুমি মার নামে নিন্দে দাও। রোসো, বলে দিয়ে তোমায় কী মজা দেখাই। মা তোমায় কী করে দেখো।

দেখাস। কে কাকে মজা দেখায় দেখিস। কী করবে তোর মা আমার? মুণ্ডু কেটে নেবে? এখন যাবি? কাজ করতে দিবি? ওই তো—এখান থেকে তো তোর ঘর দেখা যাচ্ছে। কেবল রান্নাঘরে ঘুরঘুর। আচ্ছা জ্বালা।

ওঃ। তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

গটগট করে চলে যায় বুতান। এত অপমানের পর আর থাকা যায় না। চোখ ফেটে বেরিয়ে আসা জলটা ফ্রকের কোণ তুলে মুছতে মুছতে চলে যায়।

আলোর ধারে এসে দাঁড়ায়।

লেখাপড়ার প্রশ্ন ওঠে, শুধু কান্না চাপা!

শেলেট-পেন্সিলটা নিয়েই বসে আবার। কিন্তু কিছু আঁকা আসে না কেন? আলোটা অমন কেঁপে কেঁপে উঠছে কেন? বাতাসে জানলার পর্দাগুলো দুলে দুলে দেয়ালে এমন ছায়া ফেলে কেন? কোথায় কী সব শব্দ হয় কেন...মা এখনও ডাক্তারখানায় বসে আছে কেন? বাবা এখনও আসছে না কেন?...নিজের বুকের মধ্যেই এমন দুমদুম শব্দ হয় কেন?...হঠাৎ রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া গাড়ির শব্দগুলো এমন বিচ্ছিরি লাগে কেন? শব্দগুলো কি অন্ধকারে অন্যরকম হয়ে যায়?...সবচেয়ে স্বস্তির শব্দ শুধু রান্নাঘর থেকে আসা খুন্তির শব্দ। কড়ার ওপর চাটুর ওপর।

সেই স্বস্তির শব্দের কাছেই চলে যাওয়া ছাড়া উপায় কী?

মালতীমাসি! এখনও আলো আসছে না কেন?

সে কথা আলো কোম্পানিদেরই শুধোগে যাও। মুখপোড়াদের জ্বালায় একদিন টিভি দেখার জো নেই।

তোমার খালি টিভি আর টিভি। মা কখন আসবে?

সে কথা আমায় বলে গেছে? যখন থিয়েটার ভাঙবে তখন আসবে।

কী? থিয়েটার মানে?

মানে আবার কী! মা থিয়েটার দেখতে গেছে জানিস না বুঝি?

কখনও না। মিথ্যুক। মা তো চোখ দেখাতে চশমার ডাক্তারবাবুর কাছে গেছে।

তোকে তাই বলে বুঝিয়ে গেছে বুঝি?...মালতীর মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে ওঠে। এ বাড়ির কাজটা তো ছেড়েই দেবে ঠিক করেছে, তবে আবার তোয়াক্কা কীসের? তাই বলে, মা যদি ডাক্তারখানায় গেছে তো, তোর বাপী এখনও আসছে না কেন? এখেন থেকে থিয়েটারে গেছে, বাপী অপিস থেকে এসে সেখানে জুটবে। দেখিস একসঙ্গে ফিরবে।

তোমায় বলেছে?

বুতানের চোখে অগ্নিশিখা।

মালতীর প্রাণে সেই পৈশাচিক সুখস্বাদ, আমার কারুর কিছু বলতে হয় না। দুজনায় ইংরিজি করে কথা বললেও বুঝতে পারি।

তুমি মিথ্যুক। তোমায় আমি মারব।

মার। মার না যত ইচ্ছে।

মালতীমাসী। আমার রুটি খিটে পেয়েছে। এত দেরি হয়ে গেছে আমায় খেতে দিচ্ছ না কেন?

আপাতত এই রুটি পর্বে, রান্নাঘরে উপস্থিতির একটা সম্মানজনক কারণ থাকবে।

মালতী বলে, ও বাবা! এ যে ভূতের মুখে রামনাম। নিজেই তো মা না এলে খেতে চাও না। এসো তালে। দিচ্ছি।

থিয়েটার হল থেকে বেরিয়ে এসে তনিমা অলককে বলে, দেখলে তো? তোমায় বলিনি, বড়দি বলেছিল নাটকটা দারুণ!

অলক বলে, তা দেখলাম অবশ্য। তবে বাড়ি ফিরে কী নিদারুণ নাটক দেখতে হবে তাই ভাবছি। হয়তো দেখা যাবে তোমার মালতীতে আর বুতানেতে কোনও একটা উপলক্ষে খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেছে।

ভয় পাইয়ে দিও না বাপু। বেশ ছিলাম এতক্ষণ। এই, একটা ট্যাক্সি দেখো না গো।

ট্যাক্সি! বাস পেয়ে যাব না?

এখন আর লোকের সঙ্গে গাদাগাদি করে বাসে চড়তে ইচ্ছে করছে না। ভয় নেই, তোমার পকেট ভাঙব না। আজ আমিই তোমায় গাড়ি চড়াই।

দেখি ট্যাক্সি পেলে। এ সময়—

ওই তো। আগে থেকেই 'নেতিবাচক উক্তি'। সত্যি এত ইয়ে তুমি! জামাইবাবুকে দেখেছ? এখনও এ বয়সে সব বিষয়ে কী এনার্জি।

পকেটে এনার্জির রসদ থাকলে সবাই এনার্জিদার হতে পারে।

সেটা মজুত রাখতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় মশাই। শুধু অফিসটি আর বাড়িটি ছাড়া আর কিছু তো জানলে না—ওই ওই তো, এই ট্যাক্সি।

গুছিয়ে বসে তনিমা বলে, জানো, তোমার কন্যে তোমায় খুব হ্যানস্থা করছিল।

অলক বলল, খুবই স্বাভাবিক। শিশু অনুকরণপ্রিয়।

আহা। ইস। তুমি এমন একখানা!

এখন সদ্য একটি ভালো নাটক দেখে আসার আবেশে দুজনে কাছাকাছি বসে নিভৃত কথোপকথন করতে করতে পথচলার সুখস্বাদ, তাই মেজাজের পারা নীচের দিকে।

বলছিল কী জানো? ওর ক্লাসের সব মেয়ের বাপীর গাড়ি আছে, শুধু ওর বাপীটারই গাড়ি কিনতে ইচ্ছে হয় না।

অলক মৃদু হেসে বলে, শুধু এই? এরপর আরও কত বলবে।

আহা বাচ্চা তো। অন্যের দেখে সাধ হয়।

সেটা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হয়।

তনিমা অলকের গায়ের ওপর একটু এলিয়ে পড়ে বলে, বাদে তুমি! তবে সত্যি বাপু গাড়ি একখানা থাকা মানে হাতে স্বর্গের টিকিট থাকা। এই তো দেখ না, গাড়ি থাকলে অনায়াসেই বুতানটাকে নিয়ে আসা যেত। একা রেখে আসতে হত না।

এই নাটক দেখতে? বুতানকে?

আহা নাটকের ও কী বুঝত? মা বাপীর সঙ্গে এলাম, সেটাই আমোদ। আর সত্যি বলতে মালতীর কাছে একা রেখে আসা। ওটি যে 'কী' তোমায় বলে বোঝানো যাবে না। বুতানের সঙ্গে যা রেষারেষি আর চোটপাট করে! এক একদিন তো যা শুনি বুতানের কাছে রাগে মাথা জ্বলে যায়। অথচ বেশি বকাবকির উপায় নেই। তক্ষুনি ঠিকরে উঠে বলবে, 'না পোষায় ছেড়ে দিন'। তখন মনের রাগ মনে চেপে আবার দেঁতো হাসি হেসে তোয়াজ করতে হয়। তোর মেজাজ এমন মিলিটারি কেন রে? তাছাড়া একটা গুণ, চোর ছ্যাঁচোড় নয়। এই যা।

সেটাও কম নয়, বলে অলক মালতী প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে বলে, ভাবছি সামনের শনিবারে একবার শ্যামনগরে চলে গেলে হয়।

হ্যাঁ আজকাল এই ভাষাতেই ইচ্ছে ব্যক্ত করে অলক। আগে আগে তো বলত, সামনের শনিবারে মার কাছে যাব ভাবছি। একদিন বড়শালীর সামনে বড় অপদস্থ হতে হয়েছিল। শালী বলেছিলেন, তোরা কি কুনো বাবা। সাতজন্মে একবার বেড়াতে আসতে পারিস না। বুঝলাম দুজনেই অফিসের বাবু। তবু রবিবারগুলো কী করিস? শুধু ঘুমিয়ে কাটাস?

সঙ্গে সঙ্গে তনিমা বলে উঠেছিল, আর বলিস না বড়দি, শনিবার এল কী, এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটি 'মার কাছে যাবে—' বলে হেদিয়ে পড়বেন। বাস! রবিবারটি খতম।

তদবধিই, ভাষাটার বদল হয়ে গেছে।

'শ্যামনগরে ঘুরে এলে হয়'।

তনিমা চকিত হয়ে বলল, কেন? কোনও ইয়ে—অসুখটসুখের খবর পেয়েছ নাকি?

খবর আর কোথা থেকে পাব? চিঠিপত্র তো—খবর পাইনি বলেই—

কেন তোমার সেই শ্যামনগরের ডেলিপ্যাসেঞ্জার পরেশবাবু?

তিনি তো ছমাস হল রিটায়ার করেছেন।

ও। তাই বুঝি।

তনিমা একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে, আমারও তো একবার যেতে ইচ্ছে করে। বুতানটাও তো এতদিন তার ঠামাকে দেখেনি।

অলক একটু চমকায়। এ আবার কী ভূতের মুখে রামনাম? নাকি একটু সৌজন্যের স্টান্ট? নাকি অন্য কিছু? তবু আস্তে আস্তে আলগা ভাবে বলে, গেলে মা দারুণ খুশি হবেন।

তা তনিমার মধ্যে একটু অন্য কিছু আছে বই কী। তার বিশ্বাস নিজের একবার গিয়ে পড়ে, নিজেদের বহুবিধ অসুবিধের কথা ফেঁদে আর যুক্তির জাল ফেলে, সেই অবুঝ জেদি মহিলাটিকে কব্জা করে নিয়ে বাড়িটা বিক্রি করানোয় রাজি করে ফেলতে পার। ওই উনি একটি সই না ঝাড়লে তো অলকের কিছু করার নেই। তাই তনিমার এই সাধু সংকল্প!

তবে তখনি কী ভেবে বলে উঠল, আচ্ছা—রবিবার সকালে গিয়ে সন্ধের মধ্যে ফিরে আসা যায়, এমন কোনও গাড়ি নেই? বাসেও তো যাওয়া যায় তাই না?

অলক ঈষৎ গম্ভীর হয়ে, সকালে গিয়ে সন্ধেয় ফেরা? সে যাওয়ার মানে কী? মার তো জানাও থাকবে না। আমাদের খাওয়া দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কথা বলার সময়ই থাকবে না। আমি একা যাই, তাতেও ব্যস্ত হয়ে যান। যা কিছু কথা ওই শনিবার রাতটুকুই।

এত ব্যস্ত হবার কী আছে? আমরা তো আর কুটুম নই।

অলকের মুখে আসছিল, 'আপাতত' তো তাই। সেটা সামলে নিল। যত নিরাপদে থাকা যায়। বলল, সেকথা কে বোঝাবে?

কিন্তু রাতে থাকাও তো একটা মস্ত প্রবলেম। এখানে তাহলে মালতীকে একা বাড়িতে রেখে যেতে হয়।

অলক মানল। বলল, তা বটে। ভয় পেতে পারে।

ভয়?

তনিমা ব্যঙ্গে তীব্র হয়, ওই মেয়ের ভয়? ভয় পাবার মেয়েই বটে। জাঁহাবাজের রাজা একখানি।

তবে আর কী? তুমি তো বলো, খুব বিশ্বাসী।

তা ঠিক। আস্পদ্দাবাজরা বড় চোর-ছ্যাঁচোড় হয় না। তনিমা গলার স্বর খাদে নামায়, অন্য অবিশ্বাস আছে। সুযোগ পেয়ে একা বাড়িতে ভাব ভালোবাসার লোক এনে ঢোকাবে না, তার গ্যারান্টি কী?

আঃ। কী যে বলো।

আহা গো! যেন এই মাত্তর পৃথিবীতে পড়লে। হয় না এমন?

অলক গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু হঠাৎ একঘণ্টার নোটিশে ভালোবাসার লোক জোটানো একটু বেশি কল্পনা নয়?

তনিমা ঝুনো গলায় বলে, ওহে মশাই, যা ভাবো তা নয়। আছে 'একটি।' খুকুকে বলে রাখি তো আমরা যখন বাড়ি থাকি না, তখন মালতীমাসি কী করে কোথাও বেরিয়ে যায় কিনা, ওর কাছে কেউ এসে কথা বলে কিনা নজর রাখিস।...তো মেয়েটি তোমার কম ওস্তাদ নয়। ওই তো চুপি চুপি বলেছে, এক একদিন মালতীমাসি জানলা দিয়ে একটা বিচ্ছিরি মতন লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে।

অলক তিক্ত গলায় বলে, তার মানে বুতানকে একটা স্পাই করে তোলা হচ্ছে।

ওঃ। ভারি নীতিবাগীশ এলেন!...কিছুক্ষণ আগের সেই সুখস্বাদ আর থাকল না, তনিমা যথা স্বভাব উত্তেজিত হয়ে উঠল। তুমি আমি দুজনেই তো বেলা নটার মধ্যে বেরিয়ে যাই, খুকুটা সাড়ে দশটার সময় এসে যায় তাই। ওকে নজর রাখতে বলব না তো কাকে বলব? চোর বদমাস কার সঙ্গে কী পরামর্শ করবে ঠিক কী? পেয়ারের লোক হলে তো আরও বিপদ। তোমায় তো আর কোনও জ্বালা পোহাতে হয় না। মহাপুরুষ হওয়া শক্ত কী? আমার যা জ্বালা। কাঁটাতারের ওপর দিয়ে হাঁটা। দেখেছ কী উদ্ধত ভঙ্গি! আমার সঙ্গে কথা কয়, কী তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে! জেরাও করিনি কিছুই নয় 'কে এসেছিল রে?' জিজ্ঞেস করতেই কী ঝঙ্কার। বলে কিনা, 'গরিব বলে কি আমাদের একটা মামা কাকা থাকতে নাই? তাও তো আপনার 'সন্দ' বাতিকের তরে জানলা থেকে কথা বলেই বিদেয় দিই। বাড়ির মধ্যে ঢোকাই না। ও বাড়িতে থাকতে মাসিমা নিজে ডেকে, বসতে বলেছে, চা জলখাবার দিতে বলেছে। মাসিমা বলেছে, 'আহা! কাকা বলে কথা।' আপনার বাড়ির মতো এমন ওঁচা বাড়ি আর দেখি নাই।' বোঝো? এও আমার সয়ে যেতে হয়েছে। তক্ষুনি ইচ্ছে হল দূর করে দিই। কিন্তু কী করব? ওকে ছাড়ালে, নিজেও চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকতে হয়। তাই ওই একখানি সর্বদা ফণা উঁচনো কেউটেকেই পরম পুঁজি করে থাকতে হয়।

অলক কি চেঁচিয়ে উঠে বলবে, 'অথচ সত্যিকার পূজনীয়' কে 'পুজ্যি' করে চলতে তোমার মানে বাধে! অথচ যাতে সব সমস্যার সমাধান আছে। নাকি চেঁচিয়ে উঠবে। তবু ওই কালকেউটের হাতেই জীবনের যথাসর্বস্ব সর্বস্বের সারকে ছেড়ে রেখে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকা হয়? ওই একটা অজ্ঞাতকুলশীল কোথাকার কোন গ্রামের চাষীবাসী ঘরের মেয়ে, পরিচয়ের মধ্যে পাশের বাড়ির কাজের লোকের দেশের মেয়ে। শুধু এই। তবু তার হাতেই—

কিন্তু চেঁচিয়ে উঠলেই তো হয় না? জবাবটা মাথায় রাখতে হবে না? তক্ষুনি শুনতে হবে না, এমন ঘটনা বুঝি অলক জীবনে এই প্রথম দেখছে? আর কারও সংসারে দেখনি এমন? একটা ফ্রক পরা খুকির হাতে সমগ্র সংসার আর বাচ্চার ভার ফেলে রেখে দুজনে সারাদিন বাইরে থাকছে দেখনি?

অতএব চেঁচিয়ে ওঠা হয় না।

এযুগে পুরুষের কণ্ঠস্বর জোর হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে।

নীরবতাই নিশ্চিন্ততা।

গাড়ি বাড়ির মোড়ের কাছে এসে গেছে।

তনিমা বলে উঠল, এই শোনো, তুমি এইখানটায় নেমে পড়ে রাস্তায় দুমিনিট দাঁড়িয়ে থাকো, আমি আগে বাড়ি ঢুকব। তুমি তারপর—

অলক অবাক হয়ে তাকাল।

তনিমা ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে বলল, তোমায় বলা হয়নি বুতানকে বলে এসেছি, ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাতে যাচ্ছি। দুজনে একসঙ্গে ফিরলে সন্দেহ করবে।

অলক স্তব্ধ হয়ে গিয়ে, পাথরের গলায় বলে, এতক্ষণ ডাক্তারের কাছে।

ওঃ সে যা হোক একটা বানিয়ে ফেলা যাবে। তোমার ওই মেয়েটির জন্যে গল্প বানাতে বানাতে গল্প লিখিয়ে হয়ে যাচ্ছি। কীভাবে যে সবদিক বজায় রেখে ম্যানেজ করে চলতে হয়, আমিই জানি।

অলক আরও স্থির গলায় বলে, আর আমি? আমি তাহলে এতক্ষণ কোথায় ছিলাম?

এবার ঝঙ্কারের পালা।

আহা তোমার আবার নতুন কী? অফিসের কাজে ফিরতে রাত দুপুর হয় না কোনও কোনও দিন? এই যে ভাই, গাড়িটা একটু থামিয়ে—ইনি এখানে নেমে যাবেন। আমি আর একটুখানি—

অলক নিঃশব্দে নেমে পড়ে।

এখানেই কি চেঁচিয়ে ওঠা সম্ভব? সম্ভবের মধ্যে শুধু একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তায় পায়চারি করা।

আর ভাবা—

মাকড়সা নিজেকে ঘিরে ঘিরে জাল রচনা করে বোধহয় আপন শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়।

হঠাৎ খেয়াল হল, গোটা তিনেক সিগারেট ধ্বংস করা হয়ে গেছে। বুতানটা ঘুমিয়ে পড়ল না তো? এখন দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল। দরজার ওপর দেহটাকে প্রায় সমর্পণ করে ডোরবেলটা বাজাল। শব্দটা কি বড় বেশি জোরে হল?

দরজা খুলে দিতে এল মালতী নয়, তনিমা।

ওই ঘন্টিটার মতোই ঝনঝনে গলায় বলে উঠল, উঃ। এতক্ষণে আসা হল! আচ্ছা এতোক্ষণ কে তোমার জন্যে অফিসের দরজা খুলে রাখে বলো তো? আশ্চর্য।

আর সঙ্গে সঙ্গে বুতানের আরও তীক্ষ্ণ স্বর তীব্র হয়ে আছড়ে পড়ল, মালতীমাসি! এই মালতীমাসি! এই তো বাপী এতক্ষণে আপিস থেকে এল। বলা হচ্ছিল কিনা—‘মা ডাক্তারখানায় গেছে না কচু। মা তো থিয়েটার দেখতে গেছে। তোর বাপী আপিস থেকে সেখানে আসবে। দুজনে থিয়েটার দেখবে।’ মিথ্যুক। মিথ্যুকের রাজা। তোমায় আমি গুম গুম করে কিল মারব। তোমার মুণ্ডু ভেঙে দেব। তোমার চুল কেটে নেব। তোমার চোখে লঙ্কা দিয়ে দেব। তোমায় তোমায় তোমায় মেরে ফেলব।

একটা ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ শিশুচিত্তের অসহায়তার যন্ত্রণা আর দুর্বল মুহূর্তে বিরোধী পক্ষের কাছেই শরণ নিতে বাধ্য হওয়ার গ্লানি, এই একটা উপলক্ষ পেয়ে ফেটে পড়ে।

আর অন্য একটা চিত্ত, সবদিক বজায় রেখে ম্যানেজ করে ফেলার কৃতিত্বে পুলকিত হয়ে বলে ওঠে, আঃ বুতান। কী পাগলামি হচ্ছে? মালতীমাসি তোমায় ক্ষেপাচ্ছিল বুঝতে পারনি? একের নম্বরের বোকাটা!

সমাধান

সিনেমা ডিরেক্টর অনিরুদ্ধ রায় সারাদিনের শ্রমক্লান্ত শরীর লইয়া স্টুডিও হইতে ফিরিবামাত্র, ভৃত্য রাসবিহারী সবিনয়ে জানাইল একটি ভদ্রমহিলা বহুক্ষণ হইতে অনিরুদ্ধর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন—এবং রাসবিহারীর স্পষ্ট ইঙ্গিত সত্ত্বেও উঠিয়া যাইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই।

'সাধনা ফিল্ম প্রোডাকসানের' নতুন বই 'মণিহারা' ভূমিষ্ঠ হইতে অথবা 'পর্দাস্থ' হইতে মাত্র দুই চারদিন বিলম্ব আছে। বইখানার লেখক এবং পরিচালক দুই-ই অনিরুদ্ধ রায়, কাজেই কয়দিন হইতে তাহার দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ও পরিশ্রমের আর অন্ত ছিল না।

সকাল ছয়টায় বাহির হইয়া এই সন্ধ্যার সময় মাত্র বাড়ি ফিরিয়াছে একাদিক্রমে বারো ঘণ্টাকাল পরিয়া-থাকা অতিরিক্ত পোষাকগুলা যেন সর্বাঙ্গে ছুঁচ বিঁধাইতেছে। জলের ঝাঁজরা কল খুলিয়া দিয়া আপনাকে তাহার নীচে ছাড়িয়া দিবার জন্য দেহ-মন উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে—এখন কিনা ভদ্রমহিলা—

মনে মনে ভদ্রমহিলার অগ্রভাগে একটা 'অ' বসাইয়া অনিরুদ্ধ বিরক্ত ভাবে বলে—তুই চিনিস না?

ছন্নছাড়া অনিরুদ্ধের আত্মীয় স্বজনের বাহুল্য বড় একটা ছিল না ; তবে অর্থের বাহুল্য থাকিলে বন্ধু-বান্ধবের বিশেষ অভাব হয় না বলিয়াই বোধকরি হামেসাই যাহারা আসা যাওয়া করিত, তাহাদের মধ্যে বান্ধবীর সংখ্যাও বিরল নয়। কিন্তু রাসবিহারীর চেনা সকলেই—শুধু চেনা নয়—হাড়ে হাড়ে চেনা।

বাবুর অনুপস্থিতির সুযোগেও ইহারা জটলা করিয়া আসিয়া হাজির হয়, ফুলস্পিডে ফ্যান খুলিয়া দিয়া কৌচ কেদারায় গা এলাইয়া বসে, রাসবিহারীর ব্রহ্মতালু জ্বালাইয়া চায়ের ফরমাস করে, সঙ্গী অথবা সঙ্গিণির সহিত বড় বড় কথা বলে, বাজে বাজে তর্ক করে, কাগজ পড়ে, অর্গ্যানের চাবি টেপে, অবশেষে মিঃ রায়ের সহিত দেখা হইল না বলিয়া সৌখিন দুঃখপ্রকাশ করিয়া চলিয়া যায়। তাহারা প্রায়ই মোটরে আসে মোটরে যায়, ইহার মতো পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া শুষ্কমুখে নীরবে দুইঘণ্টা বসিয়া থাকে না।

চাঁদা চাহিতে আসিয়া অনেকেই নাছোড়বান্দা ভাবে বসিয়া থাকে বটে, তাই বলিয়া এতক্ষণ? তা'ছাড়া ইহার কাছে খাতাও নাই ব্যাগও নাই, শূন্য দুইখানি হাত।

প্রভুর প্রশ্নের বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া রাসবিহারী জানাইল—উক্ত ভদ্রমহিলাকে ইতিপূর্বে সে দেখেও নাই।

অগত্যাই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার পরিবর্তে অর্ধপথেই ফিরিয়া বসিবার ঘরের উদ্দেশে যাইতে হয়। মুশকিল আর কাহাকে বলে?

কিন্তু মুশকিল কি এক রকম? এত সোজা জায়গা পৃথিবীটা নয়—

রাসবিহারী যাহাকে চেয়ারে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে, কে তাহাকে টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে অনুরোধ করিয়াছিল? এখন অনিরুদ্ধ করে কী?

একবার ভাবিল রাসবিহারীকে ডাকিয়া আনে, কিন্তু সেই বা করিবে কী? জুতার মৃদু শব্দ, গলার নকল কাশি, কার্যকরী না হওয়ায় অনিরুদ্ধ বুদ্ধি খাটাইয়া অযথা শব্দ করিয়া একটা চেয়ার সরাইয়া লইয়া বসিল। এবং সেই শব্দেই মেয়েটি মুখ তুলিয়া চাহিল। তবু ভালো যে ঘুমায় নাই—কিন্তু কাঁদিতে ছিল না মেয়েটি?

হাঁ ভদ্রমহিলা না বলিয়া "মেয়েটি" বলাই সঙ্গত তাহাকে, মুখে তাহার একটা ভীত অসহায় ভাব, চোখে এখনও কৈশোরের কমনীয় লাজুকতার ছাপ। মনে হয় এই যেন সে প্রথম বাড়ির বাহির হইয়াছে। অনভ্যস্ত দৃষ্টি, রূঢ় আলোকের সংস্পর্শে দিশাহারা হইয়া যাইতে চায়।

অনিরুদ্ধের নমস্কারের প্রত্যুত্তরে অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার সারিয়া লইয়া অস্ফুটকণ্ঠে কি যে সে বলিল শ্রুতির আগোচর।

ভদ্রতার খাতিরেই হোক অথবা আলাপের পত্তন করিতেই হোক, অনিরুদ্ধ বলে—"আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখতে হ'ল—আশা করি এটা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বলে বুঝবেন।" কথার কায়দায় অনিরুদ্ধকে কেহ হার মানাইতে সক্ষম হইবে না।

কিন্তু মেয়েটি কায়দার ধার দিয়াও গেল না—নিতান্ত অস্বাভাবিক আর খাপ্‌ছাড়া ভাবে বলিয়া বসিল—আমাকে একটা চাকরি দিতে পারেন—আপনার স্টুডিওতে?

চাকরি? কি চাকরি? অনিরুদ্ধ কেমন বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করে। সত্য কথা বলিতে কি, সে আকস্মিক এমন একটা প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। মেয়েটি যেন নিজের মধ্যে বল সঞ্চয় করিয়া লইতে সোজা হইয়া বসে, কণ্ঠতে স্পষ্ট করিয়া বলে—এই—আপনাদের—মানে অ্যাক্‌ট্রেসের—কিন্তু সবটা শেষ করিতে পারে না, থামিয়া যায়। অযথা শাড়ির আঁচলের কোণটা নাড়াচাড়া করিতে থাকে।

অনিরুদ্ধ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে একবার মেয়েটির আগাগোড়া দেখিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে বলে—আগে কোথাও নেমেছিলেন?

"না"।

রং ময়লা সত্ত্বেও মেয়েটির মুখের রক্তিমা অনিরুদ্ধর চোখ এড়ায় না। মুখে ঈষৎ চাপাহাসি খেলিয়া যায়, স্বর হাল্কা করিয়া বলে—রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসেন নি তো?

বাঃ, রাগ করে কেন?

তবে? পরীক্ষায় ফেল করে?

হাসিয়া ফেলিয়া মেয়েটি বলে—"না সে সব কিছু না, এমনিই আমার শখ।" দূর হইতে মানুষকে যত ভয় হয় নিকটে আসিলে তেমন থাকে না দেখে নিতান্তই সহজ একটি মানুষ ডিরেক্টর অনিরুদ্ধ রায়। নির্ভয়ে কথা কওয়া অসম্ভব নয়।

দেখুন ছবির অনুপাতে আর্টিস্টের সংখ্যা অনেক বেশি। নতুন লোকের পক্ষে আশা না থাকাই ধরে রাখুন।

"কিন্তু আমার যে না পেলেই নয়। কত চেষ্টা করে আপনার ঠিকানা জোগাড় করলাম"। মেয়েটির গলায় হতাশার সুর ধ্বনিত হয়।

অনিরুদ্ধের নিশ্চিন্ত ধারণা জন্মে ভদ্র গৃহস্থ ঘরের নিতান্ত সরল মেয়েটি এইমাত্র পথে বাহির হইয়া আসিয়াছে—অভিমানের ঝোঁকে, অথবা অতি আধুনিকতার ঝোঁকে। ফিল্ম অ্যাকট্রেস হইবার মেয়ে এ নয়। তা' ছাড়া এমন কিছু রূপলাবণ্যের আধিক্য নাই, যে চট্ করিয়া কিছু জুটিয়া যাইবে।

সহসা কেমন একটা মমতা জন্মিয়া যায়, অগ্রাহ্য করিয়া পথে ভাসিয়া যাইতে না দিয়া ইহার তদারক করিলে কেমন হয়? পরক্ষণেই হাসি আসে, অদ্ভুত কল্পনা, কে বলিয়াছে এ পথের আগাছা নয়—মঞ্চের তুলসী? জেরা করিয়া দেখা যাক।

দেখুন, কথা আপনাকে আমি কিছু দিতে পারছি না—তবে ঠিকানাটা রেখে যাবেন।

ঠিকানা ? মেয়েটির মুখে বিপন্নভাব ফুটিয়া ওঠে।

হ্যাঁ, ঠিকানাটা থাকলে ভালো হয়, সম্ভব হলে ফোন নম্বরও দিয়ে যেতে পারেন।

নোটবুক ও ফাউন্টেনপেনটা বাহির করিয়া অনিরুদ্ধ জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া থাকে তাহার মুখের পানে।

দেখুন ওসব কিছু নেই আমার।

কি টেলিফোন নেই? আচ্ছা বাড়ির ঠিকানা হলেও চলবে।

হতাশভাবে কিছুক্ষণ টেবিলের উপর হাত বুলাইতে তুলাইতে মেয়েটি মুখ তুলিয়া বলে—ঠিক ঠিকানাটা এখন জানাতে পারছি না আপনাকেকাল—কাল দিয়ে যেতে চেষ্টা করব।

অর্থাৎ নিজের ঠিকানাটা খুঁজে বার করতে আপনার অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা লাগবে? মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিয়া কথার শেষ করে অনিরুদ্ধ।—কিছু মনে করবেন না—একটা চাকরিই যদি আপনার প্রয়োজন থাকে অনেক ভালো কাজ তো রয়েছে? শিক্ষয়িত্রী বা—

না—আমি সিনেমাতেই নামব। একগুঁয়ের মতো উত্তর দেয় মেয়েটি।

এরকম একটা প্রতিজ্ঞাই যদি থাকে আপনার অবিশ্যি কিছু বলবার নেই। মনে রাখব—হ্যাঁ নামটি সম্বন্ধেও কি ঠিকানার মতো অপেক্ষা করবার আছে?

নাম? নাম জানতে চাইছেন আমার? সুমিত্রা—সুমিত্রা চ্যাটার্জি। নমস্কার। আবার হয়তো আসতে পারি কালকে বিরক্ত করতে।

যে বিরক্ত চিত্তে অনিরুদ্ধ দেখা করিতে আসিয়াছিল, সেটা কখন যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, বরং মেয়েটির জন্য একটা সহৃদয় অনুকম্পার ভাব জাগিতেছিল। তাই আন্তরিক স্বরেই কহিল, আসবেন—এই সময়েই আসবেন, আমি থাকব।......

..... এমনি করিয়া অনিরুদ্ধের সহিত সুমিত্রার পরিচয়ের সূত্রপাত। ... রাত্রে ঘুম আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, "মণিহারা"র উত্তেজনার ভিতরও থাকিয়া থাকিয়া মেয়েটির কথা মনে পড়িয়া যায় অনিরুদ্ধর। সত্যই কি নিছক পর্দায় আত্মপ্রকাশ করিবার লোভেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে মেয়েটা? কী ইহার ইতহাস? কিন্তু যাই হোক অনিরুদ্ধর প্রয়োজনই বা কি?

ইহার পর প্রায় উপন্যাসের কাহিনীর মতো "ঘটনাচক্রে" অনিরুদ্ধ রায়ের বাড়ির ঠিকানাটাই হইয়া দাঁড়ায় সুমিত্রার ঠিকানা।

কিন্তু মানুষের জীবন লইয়াই তো উপন্যাসের সৃষ্টি। এমন কত ঘটনাই ঘটে—যাহা লিখিলে—"তাল গাছটি খড়কে"র চাইতে কিছু কম অসম্ভাব্য নয়।

পরদিন সন্ধ্যায় বেচারা সুমিত্রা সন্ধ্যারই মতো ম্লান মুখে আসিয়া জানাইল ; নিতান্তই যদি সহসা প্রয়োজন পড়ে '—' কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী মীনাক্ষী মিত্র—"রোল নম্বর—" কে ফোন্ করিলে সুমিত্রা সংবাদ পাইবে। অল্পমূল্যের ছোটখাটো একটি ফ্ল্যাট সুমিত্রা খুঁজিতেছে—জুটিয়া গেলেই—কিন্তু সর্বাগ্রে একটি কাজেরই বিশেষ আবশ্যক তাহার।

মনে মনে খুব একচোট্ হাসিয়া লইয়া অনিরুদ্ধ কহিল—দুটো জিনিস আপাতত আপনার হাতে নেই—বাড়ি আর চাকরি। ধরুন কিছু দিনের জন্য অস্থায়ীভাবে একটা সাধারণ কাজ যদি নেন? আপনারও অসুবিধে নেই। অন্যেরও মস্ত উপকার। সুমিত্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতে কহিল—এই আমার নিজের জন্যেই বলছিলাম—মানে জানেনই তো স্বার্থপর জগৎ, নিজের সুবিধের সুযোগ পেলে—ছাড়ে না। জানেন হয়তো—লেখা টেখার চর্চা একটা করে থাকি—কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বাংলা হাতের লেখাটা এমনি দুষ্পাঠ্য যে নিজে লিখে নিজেই পড়তে পারি না। ওই ধরনের কাজ অপরের ঘাড়ে চাপাতে না পারলে চলছে না। অবিশ্যি আপনাকেও হাতের লেখার একজামিন দিয়ে পাস হ'তে হবে। বলিয়া হাসিতে থাকে।.....

আর থাকার কথা? সে সুমিত্রা যে কয়দিন পছন্দমতো একটা আস্তানা ঠিক করিতে না পারে কষ্ট স্বীকার করিয়া অনিরুদ্ধের বাড়িতেই কাটাইয়া গেলে ক্ষতি কী?

আসবাবপত্রে ঠাসা, নিখুঁত করিয়া সাজানো বাড়িখানা তো একরকম বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকে। বলিতে গেলে—অনিরুদ্ধ তো এ বাড়ির অতিথি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টাই তাহার বাহিরেই কাটে।

এ বাড়ির যথার্থ মালিক বলিতে রাসবিহারীকেই ধরা উচিত। তা' সে কি আর এমন একটি শান্তশিষ্ট "দিদিমণি" পাইলে আপত্তি করিবে?"....

অবশেষে অনিরুদ্ধ বিদ্রূপ হাস্যে বলে—অত আড়ষ্ট আর অবাক হবার কী আছে? মনে করুন না এ বাড়ির দু'জন আলাদা ভাড়াটে আমরা? ফ্ল্যাটে তো থাকতে যাচ্ছেন—তাঁর চাইতে বেশি কি খারাপ? তা'ছাড়া—নিতান্তই যদি বাঘ ভালুক বলে মনে করে থাকেন আমাকে—ভয় করলে চলবে কেন যে জায়গায় যেতে চাইছেন সেখানেও বাঘ ভালুকের অভাব নেই জানবেন। শুধু তাই-ই নয়—হাঙ্গর কুমীর, সিন্ধুঘোটক, গণ্ডার, অনেক কিছুই চোখে পড়বে। পুরুষের মতো স্বাধীন জীবন যাপন করতে চান তো পুরুষ দেখলে ঘাবড়ান্ কেন? সর্বদাই যারা নিজেকে নিয়ে সশঙ্কিত হয়ে কাল কাটাতে চায়—তাঁদের আবার, "তাঁবে থাকিব না" বলে অত আস্ফালন কীসের? ঘরের কোটরই তা'দের পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান। ঘর ছেড়ে যাদের রাজ্যে হানা দিতে শুরু করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই "নখী দন্তি শৃঙ্গী"র মধ্যে গণ্য কিনা—মিশেই দেখুন না। অবিশ্যি বেশি অনুরোধ করে আপনার সন্দেহ ভাজন হতে চাই না। থাকা না থাকা আপনার অভিরুচির ওপর নির্ভর করে—তবে অসুবিধে হয়তো খুব বেশি হত না।

অনিরুদ্ধের বাক্‌চাতুর্যেই হোক অথবা নিরুপায় অবস্থার জন্যই হোক সুমিত্রা অনিরুদ্ধর বাড়িতেই রহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারির কাজ লইয়া। তা' ছাড়া ভবিষ্যতের আশাও কি কিছু নাই? কে জানে সুদূর —অথবা অদূর ভবিষ্যতে একদিন সারা বাংলায় সুমিত্রা দেবীর নাম ছড়াইয়া পড়িতে পারে কিনা? ঘরে ঘরে সকলের মুখে সুমিত্রার আলোচনা ছাড়া আর কথা নাই।.....

রাসবিহারী প্রথমটা নিদারুণ সন্দেহের বশে সুমিত্রার সঙ্গে প্রায় সতীনের ব্যবহার শুরু করিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—ক্রমশই তাহার দিব্য অনুগত হইয়া উঠিতেছে।

রাসবিহারীর মনিবটিও কি কতকটা নয়? অনিরুদ্ধর সব কিছুর উপর তাহার এমন অবাধ কর্ত্রীত্ব, ইচ্ছামতো স্বাধীনতা জন্মাইল কেমন করিয়া? আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই কি ভিতরকার দাবি গড়িয়া ওঠে না?

কিন্তু অনিরুদ্ধকেই কি যথার্থ সরল সহৃদয় বলা চলে? আন্তরিক ইচ্ছা তাহার কি?—কলেজের মীনাক্ষী মিত্রের কাছে যখন সুমিত্রার তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল, তখনকার মানসিক অবস্থার সহিত এখনকার অবস্থার প্রভেদ ঘটে নাই কি? ইচ্ছা করিলেই কি সে সুমিত্রার পিতাকে সংবাদ দিয়া আনাইতে পারিত না? বুদ্ধিহীনতার দোষে হঠকারিতা করিয়া যে মেয়ে ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে—তাহাকে সসম্মানে ঘরে ফিরাইয়া দিয়া আসিলে কি অধিক মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইত না?

কেন যে তাহা করিল না? সৌন্দর্যের মোহে নয়—আর যাই হোক সুন্দরী বলিয়া ভুল করিবার হেতু সুমিত্রাকে নাই। হাব-ভাব-কলা-কুশলতা—পুরুষের হৃদয় জয় করিবার যে সব অস্ত্র, তাহার কোনওটাই সুমিত্রার আয়ত্তে নাই। হয়তো নাই বলিয়াই—

সদা সর্বদা তীব্র আলোকে চোখ ধাঁধিয়া আসিয়া—প্রদীপ নিভানো ঘরে জানলা দিয়া আসিয়া পড়া মৃদু জ্যোৎস্না রেখাটি পরম রমণীর মনে হয়। সেই স্নিগ্ধতাটুকুর লোভে বিখ্যাত লোক অনিরুদ্ধ রায় অবিরত মিথ্যা যুক্তির সাহায্যে আপনার বিবেককে ফাঁকি দিতে থাকে।

'মণিহারা'র খ্যাতিতে শহর ভরিয়া গিয়াছে। দুইটি চিত্রগৃহে একত্রে দেখিতে পাওয়ার সুযোগ সত্ত্বেও প্রত্যহ বহুলোক টিকিট না পাওয়ায় হতাশ হইয়া ফিরিতেছেন—সাফল্যগর্বে বুক ভরিয়া উঠে ডিরেক্টর মিঃ রায়ের।

সুমিত্রাকে সে একদিন লইয়া গিয়াছিল ; সুমিত্রা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে পূর্ব আবেদন। তাহাকে বাঁশরীর পার্টে নামাইলে সে আরও ভালো করিতে পারিত, এ কথাও জোর গলায় জানাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু অনিরুদ্ধ সম্পূর্ণ হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিয়াছে—ছাই পারতেন, একেবারেই স্টেজ্ ফ্রী নন আপনি।

সে হয়েই যায় মানুষ—অভিমানে মুখ ফিরাইয়া সুমিত্রা বলে—নেবেন কেন বলুন? আমি যে কালো।

নেহাৎ বিনয় প্রকাশ করেন নি—ও কথাটাও একটু ভেবে দেখবার মতো। বলিয়া অনিরুদ্ধ সুমিত্রাকে একদম ডাউন্ করিয়া দিয়া হাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

রাগে অপমানে কয় দিন সুমিত্রা অনিরুদ্ধর সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, তাহার ত্রিসীমানায় আসে নাই।

আজ রাসবিহারীকে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইতে নিঃশব্দে আসিয়া আপনার নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসিতেই—অনিরুদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিল—সেক্রেটারির তিন দিনের মাইনে কাটা যাবে।

সুমিত্রা নীরবে খাতাপত্র লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল কথার উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অনিরুদ্ধ কহিল—একটা ভালো মুড্ এসেছিল দুদিনে একখানা বই শেষ করতে পারতাম—

এতক্ষণে সুমিত্রা মুখ তুলিল, নাঃ, অনিরুদ্ধকে এখন আর সে ভয় করে না, সতেজ গলায় সমানভাবে জবাব দিল—'দুদিনে একখানা বই হত'—আর কি? তবু যদি না একটা লাইন ভাবতে এক টিন সিগারেট উড়ে যেত—তিন বার কাটতে হত?

ভালো লেখকদের ওরকম হয়।

ছাই হয়। কই দেখি আপনার ক'দিনে কী সাংঘাতিক কাজের ক্ষতি হয়েছে? মানুষের যেন একটু শরীর খারাপও হতে নেই—মাইনে কাটা যাবে—চাকরি যাবে—আরো কত কি।

তোমার অসুখ করেছিল সুমিত্রা? অকৃত্রিম স্নেহের সুরে কথা একটি উচ্চারণ করিতে গিয়া "আপনি তুমি"র প্রভেদ কাটিয়া যায়—তা'ছাড়া মিষ্ট করিয়া যাহার উচ্চারণ করিতে সাধ যাধ যায় তাহাকে ক্রমাগত আপনি বলা বড় কষ্টকর নয় কি?

ব্যগ্রভাবে অনিরুদ্ধ বলে—সত্যি আমার ভারি অন্যায় হয়েছিল একবারও তোমার খোঁজ না নেওয়া, ভাবলাম—কিন্তু রাসবিহারীও তো কই কিছু বলল না?

সবাইকে যেন বলে বলে বেড়িয়েছি আমি—যাক্ সে সেরে গেছে, নিন্ আপনার কাজ বার করুন।

থাক্‌গে আজ, ভারি শুকনো দেখাচ্ছে তোমাকে সুমিত্রা—কিন্তু কি আশ্চর্য কখন থেকে 'তুমি বলছি বল তো? বোধ হয় ভাবছো কী অভদ্র লোকটা?

মোটেই না বরং আপনি আজ্ঞে করলেই আমার বরাবর অস্বস্তি হয়। কিন্তু শুধু শুধু বসে থাকব না কি?

থাক না, না হয় এমনিই একটু গল্প করো। আসলে সত্যিই কিছু লিখছিলাম না আমি, বরং একটা প্লটের জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছি।

আচ্ছা ভালো একটা প্লট আমি আপনাকে দেব একদিন। অন্যমনস্কের মতো কথাটা উচ্চারণ করে সুমিত্রা।

একদিন? সে দিনটা আজকেই হোক না কেন?

আজ? নাঃ। সত্যি কিন্তু বলব একদিন, আপনার হাতে পড়ে সেটা নিশ্চয়ই একটা ভালো বই হয়ে দাঁড়াবে কত—লোকে পড়বে—সুমিত্রার মৃদুকণ্ঠ স্তিমিত হইয়া আসে, মনে হয় দুই চোখের দৃষ্টি তাহার জানলার বাহির দিয়া কোন দূর-দূরান্তরে হাতড়াইয়া মরিতেছে। ... হঠাৎ এক সময় মুখ ফিরাইয়া বলে—আচ্ছা শুনুন, কিন্তু গ্যারান্টি দিন হাসবেন না?

হাসব কেন, বাঃ?

একটি মেয়ে—নেহাৎ সাধারণ একটি মেয়ে রূপগুণের এমন কিছুই বাড়াবাড়ি নেই, যাতে অদ্ভুত সুন্দর একটি ছেলের মন আকর্ষণ করতে পারে, তবু আশ্চর্যের বিষয় তেমনি একটা অঘটন ঘটল। লোখাপড়া, খেলাধুলা কথাবার্তা সব কিছুতেই তার জুড়ি মেলা ভার, তা'র উপর বেশ পদস্থ ঘরের ছেলে সে। আর মেয়েটি এক স্কুল মাস্টারের মেয়ে।

কাজেই মেয়েটির পক্ষে তাকে ভালোবাসা বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার মতো, কিন্তু চাঁদ যদি আপনি নেমে এসে হাতে ধরা দিতে চায় সে লোভ কে সংবরণ করতে পারে? প্রথম প্রথম মেয়েটি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইত না—ছেলেটির ভালোবাসার সমস্ত নিদর্শনকে না বোঝার ভান করত, স্পষ্ট প্রেম নিবেদনকে পরিহাস বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করত—কিন্তু কদিন পারে মানুষ? সামান্য একটা মেয়ে? সমস্ত হৃদয় তা'র উদ্বেল হয়ে চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে চায়, কণ্ঠস্বর বিশ্বাসঘাতকতা করে, আপনাকে আপনি আর ধরে রাখতে পারল না সে—ধরা দিল।....

স্বপ্নের মতো কাটে তার দিন রাত্রি অদ্ভুত অনুভূতির ভিতর দিয়ে—সে যেন আর মাটির পৃথিবীর নয়, গরিব স্কুল মাস্টারের মেয়ে নয়, রূপগৌরবহীন সামান্য একটি নারী নয় ; ধূলিমলিন পৃথিবীর অনেক উঁচুতে কোনও এক আনন্দলোকের জীব।......

তারপর...হঠাৎ একদিন তা'র স্বপ্ন ভেঙে গেল, শুনলো তা'র বিয়ের ঠিক হচ্ছে, অতি সাধারণ একটি কেরানির সঙ্গে। আর সে বিয়ের প্রধান ঘটক সেই ছেলেটি। মর্মাহত হয়ে একদিন সে অভিমানে আছড়ে পড়ে তা'র এই নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার কারণ জানতে চাইল।.....

তখন.....তখন সেই ছেলেটি বললে—নির্দয় হাসি হেসে বললে—তার উপযুক্ত পাত্রই সে সংগ্রহ করে দিয়েছে, গরুর গাড়ির চাকায় মোটর গাড়িকে জুড়ে দিলে দুটোই সমান অচল, সে মিথ্যে বিড়ম্বনায় লাভ কী?

তার যে প্রিয়তমা হবে সে সকলের মধ্যে অ-সাধারণ। স্কুল মাস্টারের কালো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা চলতে পারে—চির জীবনের সঙ্গিনী করা চলে না। সমাজে প্রতিষ্ঠা বলে একটা জিনিস আছে তো?

গভীর অপমানে মেয়েটি হয়ে উঠলো মরিয়া—নিঃশব্দে নির্বিবাদে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে, সমগ্র অপমান সয়ে যাবে—এতটা তার উত্তেজিত স্নায়ুতে বরদাস্ত হ'ল না। গভীর রাত্রে একদিন সে ঘর ছাড়ল।

পথে বেরিয়ে আপনার ভুল ধরা পড়ল তার চোখে—কিন্তু তখন আর ফেরা চলে কি? দেখলে সব চেয়ে সোজা রাস্তা হচ্ছে আত্মহত্যা করা.... কিন্তু এমনভাবে নিজেকে পথের ধুলোয় হারিয়ে ফেলবার ইচ্ছে হ'ল না তা'র। যার কাছে আঘাত পেয়েছে তা'কে প্রতিঘাত করবার অনেক মতলব খুঁজতে লাগল।

—কিন্তু কিই বা শক্তি তা'র? চাঁদ যদি আবার আকাশে উঠে যায়—বামনের কি ক্ষমতা আছে তাকে আঘাত করবার?

একটানা এতটা বলিয়া সুমিত্রা হঠাৎ যেন সচকিত হইয়া চোখ ফিরাইয়া লয়, মৃদুস্বরে বলে—শেষটা আর একদিন বলব। কিন্তু লিখবেন তো? খুব ভালো করে?

অনিরুদ্ধ এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া শুনিয়া যাইতেছিল, এইবার কহিল—

বারে বারে নিজেকে বাড়াচ্ছি বলে কিছু মনে কোরো না, তবে সত্যি কথা বলতে কি—ভালো লেখকরা, প্লটের খানিকটা শুনলেই বাকিটা আন্দাজ করে নিতে পারে।

কী আন্দাজ করলেন? ঈষৎ কৌতূহলের স্বরে প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

ধর সেই মেয়েটি, আমাদের সাইকোলজি যা বলে—তখন মনে মনে স্থির করলে ছেলেটিকে দেখাতে হবে সেও নেহাৎ বাজে নয়। কাজেই নিজেকে ফেমাস্ করে তোলবার জন্যে মনে মনে অনেক পন্থা সে ফাওরাতে লাগল—কেমন কিনা? তারপর—দেখলে তার বিদ্যা বুদ্ধি রূপ গুণ কোনোটাই তার পক্ষে খুব বেশি অনুকূল নয়। অতএব—আজকালকার দিনে ফেমাস্ হবার যে একটা বাঁধা বড় রাস্তা তৈরি হয়েছে সেই পথেই পা বাড়াতে চাইল, অর্থাৎ সিনেমা অ্যাকট্রেস হতে গেল।

চমকিয়া উঠিয়া সুমিত্রা অনিরুদ্ধের মুখের পানে চকিত দৃষ্টি ফেলিয়া কহিয়া উঠিল—কক্ষনো না। কই আমি বললাম ও কথা? অ্যাকট্রেস্ হতে যাবে কী দুঃখে সে?

তাহার লজ্জারক্ত মুখের পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া—গভীর স্বরে অনিরুদ্ধ কহিল, আমিও তাই বলি সুমিত্রা—কক্ষনো না। অ্যাকট্রেস হতে যাবে কী দুঃখে—অমন লক্ষ্মী মেয়ে? এ যে চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া। একটা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়ার ওপর মিথ্যে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজেকে গোল্লায় দেবে—এমন পাগল কেন হবে সে?

রুদ্ধবাক্ সুমিত্রা কথার প্রতিবাদ করতে পারে না—চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শোনা ছাড়া কি উপায় আছে তাহার? মুখের সমস্ত রক্ত জমাট হইয়া নাক কান আগুন হইয়া উঠে। মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে না।

অনিরুদ্ধ কিন্তু নির্বিকারভাবে আর একটা সিগারেট ধরাইয়া গম্ভীরভাবে বলিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীখানা তো বিশেষ সুবিধের জায়গা নয়—কাজে কাজেই মেয়েটি বুদ্ধির ভুলে অথবা অসাবধানে এক ভীষণ দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে গেল। সে মেয়েটির নিরুপায়তার সুযোগে তাকে চাকরির লোভ দেখিয়ে এনে, নিজের বাড়িতে বন্দি করে ফেললে। কখনও যে ছাড়তে চাইবে এমন ভরসা হয় না। এখন মেয়েটির কর্তব্য কী? বলো—তোমার গল্পের নায়িকা এখন কী করবে?

আমি কি জানি। অতিকষ্টে উচ্চারণ করে সুমিত্রা।

বাঃ তোমার নায়িকা কী করতে চায় তুমি না জানলে? তিনটি পথ তার খোলা আছে—এক লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়া, দুই—বিদ্রোহ করে বন্দিত্ব মোচনের চেষ্টা করা, তিন—চুপচাপ বসে বসে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করা। এখন—তোমার প্লট কী বলে? কোন পথ বেছে নেবে সে? বলতে পার না? তুমি একটি রাবিশ। ভারি প্লট দিলেন আমাকে—আধখানা। আধ কপালে ধরবে তা' জানো ? হাসছ যে—দেখো তখন আমার কাছেই আসতে হবে ওষুধ নিতে। হ্যাঁ—যদি আমার পরামর্শ চাও তো বলি, মেয়েটি ভাবলে, যাবজ্জীবন কারাবাসই বা এমন কি বেশি খারাপ? বাহিরের জগৎখানাও তো দুর্বৃত্ত দুজনের আড়ত। বেরোলেই বিপদ অনিবার্য, এ লোকটা তবু একরকম পোষা হয়ে গেছে। তা' ছাড়া এই হতভাগাকে যদি সঙ্গগুণে একটু মানুষ করে তুলতে পারি—ধর্ম আছে। পরকালের কাজ হয়। ও কি মুখ নিচু করছ কেন? কী মনে হয় তোমার—ওই ছন্নছাড়া লোকটার ওপর মমতায় পড়ে, লক্ষ্মীমেয়েটি সেই লক্ষ্মীছাড়াটাকে ভুলতে পারবে না?

স্বপ্নভঙ্গ

নেহাৎ যে ভাতের অভাব ঘটিয়াছিল এমন নয়, তবু বেকারত্বের যন্ত্রণা দুঃসহ হইয়া উঠিবার পূর্বেই উপার্জনের চেষ্টায় একদিন মগের মুলুকে আসিয়া হাজির হইলাম।

বলা বাহুল্য আমার এই বীরত্বব্যঞ্জক প্রচেষ্টায় বাড়িতে কাহারও তিলমাত্রও সহানুভূতি ছিল না। একে তো মায়ের 'কোলের ছেলে' হইয়া জন্মানোর অপরাধে চিরকাল সকলে আমার বয়সটাকে হাসিয়া উড়ায়, আজ পর্যন্ত সাবালক বলিয়া স্বীকার করে না, তাহার উপর একেবারে মুলুক ছাড়া হওয়া।

সম্মতি থাকার কথা নয়।

আমি কিন্তু উপার্জনের জন্য যত না হোক, নিজের নাবালকত্ব ঘুচানোর জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলাম। বন্ধু সুরেশ থাকে বর্মায়—বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র বছর দুই আগে "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী"র অনুপ্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, ঈশ্বর জানেন কী করে। চিঠিপত্রের আঁচে মনে হয় যেন 'লাল' হইতে শুরু করিয়াছে। লুকাইয়া তাহাকেই অনুরোধ করিয়াছিলাম আমার 'আখেরে'র চিন্তা করিতে। সে ঢালা হুকুম দিয়াছে, "চলে আয়—যা হয় একটা হবেই।"

অতএব 'কোন বাধা আমি মানি না' গোছের মনোভাব লইয়া জাহাজে চড়িয়া বসিলাম।

মার অশ্রুসজল অভিযোগ, দাদাদের অভিমানব্যঞ্জক গম্ভীর মুখ এবং বৌদিদিদের সস্নেহ অনুনয় অগ্রাহ্য করিয়াও অটল ছিলাম, টলিলাম জাহাজে উঠিয়া। প্রথমে মাথা টলিল, তাহার পর পা, অতঃপর সর্বাঙ্গ এবং অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে হৃদয় সেও রীতিমতো টলিতে লাগিল।

প্রথমে ভাবিলাম—কাজটা ভালো হইলি কি? পরে ভাবিলাম—কাজটা ভালো হয় নাই, শেষ পর্যন্ত ভাবিলাম—কাজটা গর্হিত হইয়াছে। মিথ্যা বলিব না—ফেরত ডাকেই ফিরিয়া আসিব, এমন সাধু সঙ্কল্পেরও উদয় হইয়াছিল।

তবে কথায় বলে 'জলে পড়া'। সেই জলে পড়া অবস্থায় মনের ভাব যতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, ডাঙ্গায় পা ফেলিতে তার অনেকটা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সুরেশের হাস্যোজ্জ্বল মুখ চোখে পড়ায় সমুদ্রপীড়ার গভীর পীড়া ভুলিয়া মুখে হাসি ফুটিল।

—কী রে, এমন 'ডাইনে খাওয়া' চেহারা কেন? সুরেশ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—খুব বুঝি ভুগেছিস 'সী-সিক্‌নেসে'?

—আর বলিস কেন—পাঁচ দিন জন নেই পেটে। তুই এসেছিস তা' হলে? এমন ভাবনা ধরেছিল—

—আসব না মানে? কথার ভূমিকাস্বরূপ চিরপরিচিত থাপ্পড়টির যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া সুরেশ উত্তর দেয়—জ্যান্ত থেকেও আসব না? মরে গেলে প্রেতাত্মা হয়েও আসতাম তোকে রিসিভ করতে!

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ততদূর করতে হ'ল না তোমায়, এখন দেখ আমার জিনিসপত্রগুলো—

—সব ঠিক হয়ে যাবে, তার জন্যে ভাবনা নেই, তোর অনারে কাজে গেলাম না আজ। আয় দেখি—

দেখিলাম সুরেশ ইতিমধ্যে বেশ লায়েক হইয়া উঠিয়াছে। না হইবে কেন! মায়ের 'কোলের ছেলে' তো নয়!

বাসায় যাইবার পথেই সুরেশ জানাইল, এসে পড়েছিস ভালোই হয়েছে—আমাদের বড় সাহেবের আলাপি একটা সাহেব—বার্মিজ সাহেব অবশ্য, খোঁজ করছিল একটা লোকের। ইনসিয়োর আফিস। মাইনেটা মনে হয় খুব খারাপ নয়, কালই একবার 'ইনটারভিউ' দিয়ে আয় না।

আসিতে আসিতেই যাই হোক একটা চাকরির বার্তা পাইয়া মনটা কিঞ্চিৎ খুশি হইল। জ্ঞাতব্য বিষয় দুই চারিটা জানিয়া লইতে লইতে বলি—তুই সঙ্গে যাবি তো?

—আমি? আমি—আমার কী করে যাওয়া সম্ভব হয়? আজ কামাই করলাম! কেন, ভয় খাচ্ছিস নাকি? তুই দেখছি সেই রকম নার্ভাস আছিস এখন। কিছু ভাববার নেই, এখান থেকে বড়সাহেব ফোন্ করবে অখন! সব ঠিক হয়ে যাবে। বিকেলের দিকে যাস বরং, কাজের ভিড় কম থাকে, কথাবার্তার সুবিধে করতে পারবি। সার্টিফিকেটগুলো এনেছিস তো? হ্যাঁ, জায়গাটা একটু ঘিঞ্জিগোছের বটে তা ছাড়া পথঘাট তোর অজানা। আমি বলি কি একটা ট্যাক্সিই নিস, ঠিকানা বলে দিলে ঠিক পৌঁছে দেবে। বুকে বল আনো 'নওজোয়ান'।

পেটেন্ট থাপ্পড়ের জোরে সুরেশ আমায় চাঙ্গা করিয়া তোলে।

পরদিন সুরেশের উপদেশ ও বরাভয় সম্বল করিয়া বাহির হই—মংফু টুংফু কি গ্যাং কো—ঈশ্বর জানেন কাহার উদ্দেশে—একেই তো অজানায় আমার বড় ভয়, তার উপর সারাদিন মেঘ করিয়া থাকার দরুন মনটাও যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

জায়গাটা সুরেশ নিত্যন্ত বিনয় করিয়া "একটু ঘিঞ্জিগোছের" বলিয়াছে। 'একটু' নয়, যৎপরোনাস্তি। 'রাজরাস্তা' বলিতে সরল একটা পথই নাই, মনে হয়—যে যেখানে পাইয়াছে, যথেচ্ছভাবে দোকান গাড়িয়া বসিয়া আছে, রাস্তাই তাহাদের মর্যাদা বজায় রাখিতে ঘুরিয়া বাঁকিয়া যেন-তেন-প্রকারেণ নিজের একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। সেই সঙ্কীর্ণ গলি সঙ্কীর্ণতর হইবার মুখে একটা মোড়ের মাথায় গাড়ি থামাইয়া চালক মহাপ্রভু সসম্ভ্রমে জানাইলেন গাড়ির আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই, অতএব নামা দরকার। বেশি হাঁটিতে হইবে না—ডানহাতি গলিটা পার হইয়া বাঁহাতি আর একটা ধরিলেই খানচারেক বাড়ির পরেই

দোতলা বাড়ি, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সটান উপরে উঠিয়া গেলেই গন্তব্যস্থান মিলিবে। লোকটা ইংরাজি জানে, ভদ্রগোছের চেহারা, ভাড়া মিটাইয়া দিয়াও তাহাকে সেখানেই অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া দুরু দুরু হৃদয়ে অগ্রসর হইলাম। কি জানি বাবা, গাড়িটা ছাড়িয়া দিলে ফিরিতে পারিব কিনা।

পরবর্তী ঘটনার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, এইটুকু বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে—নিজে নিজেই স্বীকার করিলাম যে সাবালক হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে আমার। পূর্ব দক্ষিণ ঈশান নৈঋত কোনও পথেই অভীষ্ট স্থান খুঁজিয়া পাই নাই শেষ পর্যন্ত—একই পথে পাঁচবার ঘোরাঘুরি করিয়া অন্যের সন্দেহভাজন হইবার ভয়ে পূর্বপরিচিত মোড়ে ফিরিয়া আসিলাম, দেখি ট্যাক্সির কোনও চিহ্ন নাই।—কোথায় গেল সেই জানে। অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকিবেই বা কেন সেটা আর মনে পড়িল না। তবে এটা যে সেই মোড়টাই কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া গেল। সব দোকানগুলাই এক ধরনের, সব মুখগুলাই এক ছাঁচের।

ঠিক এই সময়—সারাদিনের বর্ষাণোন্মুখ আকাশ বর্ষণমুখর হইয়া উঠিল। কথাটা শুনিতে কবিত্বের মতো, কিন্তু সত্য বলিতে কি, আসলে মনের অবস্থা যা দাঁড়াইল, তাহাকে ঠিক কবিত্বের কোঠায় ফেলা চলে না।

কোনওরকমে মাথাটা বাঁচাইয়া একটা জুতার দোকানের শেডের নীচে দাঁড়াইলাম .... —বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নাই। পড়ন্তবেলা মেঘের ছুতায় অসময়ে নোটিশ দিয়া গেল, কাজেই সন্ধ্যাদেবী আসিয়া চার্জ বুঝিয়া লইলেন। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেই লাগিলাম।

দোকানদারটার সঙ্গে ইংরাজিতে একটু আলাপ জমাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হই, লোকটা নীরেট ব্রহ্ম।

পাশেই একটা রুমালের দোকান হইতে—ওয়ালা নয়—ওয়ালী বোধ হয় আমার দুরবস্থায় দয়াপরবশ হইয়া ভিতরে গিয়া বসিতে অনুরোধ জানাইতেছিল, ভাষা না বুঝিলেও ভাবে বুঝি। কিন্তু মার সনির্বন্ধ সাবধান-বাণী মনে পড়িল। কাজেই সবিনয়ে তাহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া ভিজিতেই থাকি।

একেই বলে সুখে থাকিতে ভূতের কিল খাওয়া। কি এত প্রয়োজন পড়িয়াছিল সুখের কলিকাতা ছাড়িয়া এই ভাগাড়ে আসিয়া মরিতে? ভদ্রলোকের জায়গা নাকি? সুরেশ চিরকেলে ডাকাবুকো, ওর এসব হতচ্ছাড়া জায়গা পোষায়। কিন্তু আমার? নমস্কার বাবা! আপাত-দৃষ্টিতে এই জলে জলময় নোংরা ঘিঞ্জি পাড়াটাকেই সারা ব্রহ্মদেশের প্রতীক বলিয়া মনে হয়।

বৃষ্টি যখন ধরিল তখন রীতিমতো অন্ধকার। অনেক অনুসন্ধানে একখানা অশ্বযান সংগ্রহ করিয়া চড়িয়া বসি, গাড়োয়ানটার মুখে দুই-একটা বোধগম্য হিন্দি শুনিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল। সুরেশের ঠিকানাটা বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে গাড়ির জানালা বন্ধ করিয়া গুছাইয়া বসিলাম। তখনও টিপি টিপি বৃষ্টির বিরাম নাই, ভিজে পোশাকের উপর জোলো হাওয়া লাগায় দস্তুরমতো শীত করিতেছিল।

গাড়ি চলিতেছে ... আমি ঢুলিতেছি ... পথ ফুরাইবার লক্ষণমাত্র নাই। প্রথমে ভাবি—হাজার হোক ঘোড়ার গাড়ি চল্লিশ মাইল স্পিড্ আশা করাই অন্যায়, ন্যায্য সময়ে পৌঁছাইয়া দিবেই। গাড়োয়ানী করিয়া খায়, ঠিকানা দিলে পথ চিনিবে না?

হায় মূঢ় হৃদয়! কি ভুলই করিয়াছি! এই বিশাল জগতে কোটি কোটি লোক পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, আর এ তো তুচ্ছ একটা ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান।

ভুল যখন ভাঙিল তখন রাত্রি দশটা, হঠাৎ চমক-ভাঙা হইয়া মনে হইল সারারাত বুঝি চলিতেছি ... হয়তো বা ব্রহ্মদেশ হইতে বঙ্গদেশেই আসিয়া পড়িলাম! অগত্যা গাড়ির জানালা খুলিয়া তারস্বরে চেঁচাই। বুদ্ধিমান মহাপুরুষটি আমায় হয়তো মাতাল ঠাওরাইয়া যথেচ্ছ চরিয়া বেড়াইতেছিল, সাড়া পাইয়া গাড়ি থামাইল এবং নামিয়া ভাড়া চাহিল।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সুরেশের বাড়ির চিহ্নমাত্র সেখানে নাই।

কাতর আমি দীন ভাষায় করুণ ভঙ্গিতে বার বার নিজের গন্তব্যস্থানের বিষয় প্রশ্ন করি ... উত্তরে হতভাগা যাহা জানাইল তাহার তাৎপর্য এই—ভুলক্রমে উল্টাপথে আসা হইয়া গিয়াছে। অতএব এই রাত্রে—এই দুর্যোগের রাত্রে ফিরিয়া সে পথ খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। অসঙ্গত বলিলেও নাকি অন্যায় হয় না। ঘোড়া রীতিমতো 'টায়ার্ড' হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই সে বাধ্য হইয়া আমাকে এই অনাথ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া নিজের আস্তানায় যাইতে চায়, শুধু তার আগে চায় তাহার প্রাপ্য ভাড়া—নগদ তিন টাকা বারো আনা মাত্র।

সেই অবর্ণনীয় মানসিক অবস্থাতেও ধৈর্য অবলম্বন করি, চুপ করিয়া থাকি, গালাগাল দিয়া গাত্রদাহ মিটাইব সে সাহস নাই। সরু গলির ঝাপ্‌সা মিটমিটে আলোয় সেই বাঘমুখো মগ গুণ্ডাটার পানে চাহিয়া আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হইবার জোগাড়। ভালমন্দ তো দূরের কথা।

আহাম্মুকির উপর আহাম্মুকি—পকেটে বাড়তি কতকগুলো টাকা।—খরচের সুবিধা করিতে গোটা পঁচিশটা এক টাকার নোটে চেঞ্জ করিয়া লইয়াছিলাম, সেটা পকেটেই রহিয়া গিয়াছে। যদিও কোটের ইন্‌সাইড্ পকেটে লুকানো আছে, তবু ভরসা বলিতে কিছুই নাই। লোকটা যদি একবার আমার হাতটা চাপিয়া ধরে, টাকা তো টাকা, হাতে বাঁধা ঘড়িটা হইতে চোখের চশমাখানা পর্যন্ত খুলিয়া উহার অপর হাতে তুলিয়া দিব নিজের সম্বন্ধে এ বিশ্বাস রাখি।

অতএব তাহা বোকামির জন্য কৈফিয়ত চাহিবার পরিবর্তে নিজের বোকামির খেসারত ধরিয়া দিই। পার্স খুলিয়া নগদ করকরে আস্ত টাকাই চারটে দিই। চার আনা কাটিয়া লইবার কথা মুখেও আনি না।

গুণ্ডাকৃতি হইলেও বোধ হয় নেহাৎ গুণ্ডা নয় লোকটা, আমার বদান্যতায় খুশিই হইল। বাঘমুখে, নেকড়ের হাসি হাসিয়া দিব্য আপ্যায়িতের ভঙ্গিতে সেলাম ঠুকিয়া জানাইল—ভাবনার কারণ কিছুই নাই, যৎসামান্য মূল্যের বিনিময়ে রাত্রিটুকুর মতো আশ্রয় এখানে নাকি বিস্তর মেলে, চাই কি আহারও জুটিতে পারে।

অনির্দিষ্ট ভাবে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া লোকটা খোসমেজাজে গাড়ি হাঁকাইয়া দিল। মিথ্যা বলিব না—চারিদিক চাহিয়া হঠাৎ মনে হইল সারা পৃথিবী কেবলমাত্র সরিষার ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে।

নোংরা অপরিসর গলি, দু'ধারে ইতর বস্তি, বাঁকাচোরা জোড়াতালি দেওয়া কুশ্রী ঘরগুলা যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িতে চায়। গাড়ি ইহার ভিতর আসিল কেমন করিয়া, এই এক আশ্চর্য ব্যাপার।

এখন উপায়?

ও তো বলিয়া গেল রাত্রির মতো আহার ও আশ্রয় মেলে—কোথায় সে? কেমন আশ্রয়? নিশ্চয়ই হোটেল—সস্তার হোটেল। আহার চুলায় যাক্, আশ্রয় একটা অবশ্যই চাই। এই তো—আবার বৃষ্টি নামিল, সারারাত দাঁড়াইয়া কিছু আর ভেজা চলে না। তবে হ্যাঁ, তেমন সন্দেহজনকভাবে পথের কোণে দাঁড়াইয়া থাকিলে রীতিমতো আশ্রয় মিলিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়—রাজার অতিথিশালা, সরকারি আশ্রয়। কিন্তু আপাতত তাহাতে তেমন উৎসাহ বোধ করি না।

'যা থাকে কপালে' গোছ ভাবে সামনের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকি। দুর্যোগের রাত—তাই ইতিমধ্যেই পাড়াটা নিঝুম মরিয়া গিয়াছে, ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ। আমি? মনে মনে কল্পনা করি ... আমি একা এই মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া একটা কুৎসিত পল্লির গোপন পথে বেড়াইয়া বেড়াইতেছি! অসম্ভব ব্যাপার ঘটিতে পারে সহজে, কল্পনা করাই শক্ত।

কিন্তু এই অনির্দিষ্ট যাত্রার সমাপ্তি ঘটে ... সাহস অনুভব করি,পথ অনির্দিষ্ট হইতে পারে, অসীম নয়। বিনা নোটিশে এক জায়গায় থামিয়া বসিয়াছে। ব্লাইণ্ড গলি।

হতভাগা গাড়োয়ানটা যে ইচ্ছা করিয়াই এখানে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে, সে বিষয় আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

ভূতগ্রস্তের মতো আবার উল্টামুখ ধরিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে শুরু করিয়াছি, সহসা পিছনে—নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না—পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন হয়—আপনি কি বাঙালি?

কণ্ঠস্বর মধুর কিনা তলাইয়া দেখি নাই, কিন্তু পথভ্রান্ত নবকুমারের কানে—"পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছো?" এর চাইতে বেশি মধু বর্ষণ করিয়াছিল কি?

চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতেই যেন ধাক্কা খাইলাম। ... অথচ এ ছাড়া এর চাইতে ভালো কি আশা করিবার ছিল—এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে?

তবে হ্যাঁ, সত্যই আশা করিবার মতো নয়। বাঙালির মেয়ে—সমুদ্র ডিঙাইয়া এই শত শত মাইল দূরে আসিয়া, চোখে কাজল আর মুখে খড়ি মাখিয়া কুৎসিত জীবনযাপন করিতেছে—এ দৃশ্য যে কতটা অসহ্য, সে বোধ করি চোখে না দেখিলে বোধগম্য হয় না।

বয়স হয়ত বেশি নয়—হয়তো বেশি, মুখ দেখিয়া সহসা অনুমান করা শক্ত, লালিত্যবর্জিত মুখে অনেক অনাচরের ছাপ সুস্পষ্ট। একটা মোমবাতি উঁচু করিয়া ধরিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ....

গা'টা কেমন ঘিন্‌ঘিন্ করিয়া ওঠে ... তবু—বাংলা কথার মোহ, আর এই বিশ্রী বেঘোর বেপোট অবস্থা। নিতান্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে প্রশ্ন করি—এখানে হোটেল আছে কোথাও?

—হোটেল? কেমন বিমূঢ়ভাবে উত্তর করে—হোটেল এখানে তো নেই, খানিক দূরে আছে কিন্তু সেখানে কি আপনি থাকতে পারবেন? ভদ্রলোক বাঙালি।

—উপায় কি—রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো সারারাত কাটাতে পারি না! আবার তো জোরে বৃষ্টি আসছে।

যে রকম বীর-বিক্রমে কথাটা উচ্চারণ করি, যেন আমার এই নিরতিশয় দুরবস্থা এবং আসন্ন বৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী সেই।

সে কিন্তু নিজের দোষই স্বীকার করিয়া লয় যেন। কুণ্ঠিত ব্যাকুল ভঙ্গিতে বলে—সত্যি বড্ড বিষ্টি আসছে যে—কী হবে বলুন তো? সে তো ঠিক হোটেল নয়—বরং ভাঁটিখানা বলতে

পারেন, খালি মাতাল গুণ্ডা আর ছোটলোকের আড্ডা—গেলে হয়তো বিপদে পড়ে যাবেন। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—

বিরক্তভাবে বলি—এই বা কি সম্পদে পড়েছি? দুর্ভোগ যখন রয়েছে কপালে—

—তাই তো—কিন্তু আপনি—আপনি এদিকে এ সময় কেনই বা এলেন?

—ইচ্ছে করে মোটেই আসিনি, হতভাগা গাড়োয়ানটা পথ ভুল করে এখানে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। রাস্তা-ফাস্তা কিছুই চিনি না—সবে কাল নেমেছি জাহাজ থেকে—

—কাল এসেছেন? কলকাতা থেকে?

বাতির আলোয় ওর খড়িমাখা পাণ্ডাশ মুখখনা যেন উজ্জ্বল দেখায় হঠাৎ।

—হ্যাঁ।

বিরক্ত ভাব বজায় রাখিয়াই উত্তর দিই। দাঁড়াইয়া ইহার সঙ্গে কথা কহিতেছি—মনে করিতেই প্রেস্টিজে রীতিমতো আঘাত লাগে।

—কলকাতায়—কোথায়? কোন্ রাস্তায় বাড়ি আপনার? শ্যামবাজারের দিকে?

কথাটা উচ্চারণ করে কেমন বোকা-বোকা সরল মেয়ের মতো। রাগ করিবার কথা নয়, তবু এই গায়ে-পড়া আলাপে গা জ্বালা করিয়া ওঠে। ভাবি যে পা চালাইয়া চলি—আর কথার উত্তর দিব না।

কিন্তু মধুসূদন নাকি দর্পহারী। ঠিক এই সময় এমন মুষলধারে বৃষ্টি নামে যে চোখে কানে দেখিতে দেয় না, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই ঘৃণ্য জীবটার পিছন পিছন তাহারই কোটরে গিয়া ঢুকি।

হ্যাঁ, কোটর ছাড়া তাহার আর বিশেষণ নাই। ঘর বলিলে ঘর কথাটার অবমাননা করা হয়। জীবনে কোনওদিন—জীবনে কেন—ক্ষণপূর্বেও কি ভাবিয়াছি—এরকম আস্তানায় রাত্রি কাটানো তো দূরের কথা, পা দিব?

মেয়েটা হয়তো তা' বোঝে, আমি যে ভদ্রলোক এবং ওর ঘরটা যে নিতান্তই ভদ্রলোকের অনুপযুক্ত, সে জ্ঞানটা ওর আছে।

অথচ এই দূর-নির্বাসনে অপ্রত্যাশিতভাবে বাঙালিকে—কলিকাতা লোককে—কাছে পাইয়া যেন হাতে চাঁদ পায়। কোথায় বসাইবে, কী করিবে ভাবিয়া দিশাহারা হইয়া ওঠে।

খাতির জিনিসটার এমনই গুণ, অতি বিরূপ চিত্তকেও ঈষৎ নরম করিয়া আনে, কাজেই অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবে বলি—থাক্ থাক্, ব্যস্ত হতে হবে না। এই যে এই চেয়ারটায় বসছি।

গৌরব করিয়া অথবা অন্য নামের অভাবে চেয়ারই বলি, হয়তো, একসময় ছিলই তাই, এখন টুল বলিলেও অন্যায় হয় না।

তাহার উপরই বসি, তা' ছাড়া আছেই বা কি ঘরে? আসবাবের মধ্যে তো এই ময়ূর-সিংহাসন, আর তিনপদবিশিষ্ট একখানি চৌকি, যাহার চতুর্থ চরণের স্থান অধিকার করিয়াছে একটা উপুড়-করা প্যাকিং কেস্।

চৌকির ওপর বিছানা পাতা, তাকাইলে ঘৃণা হয় যেমন ময়লা, তেমনি ছেঁড়া। মেয়েটার শরীরে সাধারণ জ্ঞান কিছু আছে, আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তাড়াতাড়ি সেই দৃষ্টিকটু জিনিসটা গুটাইয়া চৌকির পিছনে ফেলিয়া দেয়, চৌকির তলা হইতে টানিয়া বাহির করে

একখানা ক্যাম্প চেয়ার। ধূলায় ভর্তি হইলেও জিনিসটা আস্ত। আঁচল দিয়া ধুলা ঝড়িয়া সেটা পাতিয়া বসিতে অনুরোধ করে।

ওরই যেন মাথাব্যথা ... এই ভাবেই গিয়া বসি। অথচ না বসিয়াও উপায় ছিল না। পিঠ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। একে গত ক'দিনের সমুদ্রপীড়ার দুর্বলতা, তাহার উপর এই দুর্ভোগ।

মেয়েটা নিরুপায় ম্লানমুখে প্রশ্ন করে—আপনার তো খাবার দরকার ছিল?

এখানে খাওয়া। ভাবতেই গা কেমন করিয়া আসে, তাড়াতাড়ি বলি—না না, খাবার দরকার কিছুমাত্র নেই।

—থাকলেই বা কী করতাম। কণ্ঠস্বরে করুণ একটা হতাশ ভাব ফুটিয়া ওঠে—এখানে এক গ্লাস জল খাবারও প্রবৃত্তি হ'বে না আপনার। কোনও ভদ্রলোকেরই হবে না।

হঠাৎ একটু করুণার সঞ্চার হয়। আহা বেচারা, নামিয়াছে বটে—জাহান্নমের তলায় তলাইয়া গিয়াছে তবু কতখানি নামিয়াছে সে জ্ঞানটা এখনও হারায় নাই।

একটু লঘুভাবে বলি—ভিজে পোশাক গায়ে দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জলের দরকার কিন্তু সত্যিই হয় না।

ও মলিনভাবে একটু হাসে—কিন্তু চা পেলে তো ভালো হ'ত। কোনও ভালো জায়গায় যদি উঠতেন, ভিজে পোষাকও বদলাতে পেতেন, গরম খাবারও খেতে পেতেন।

—কি আর করা যাবে, ভাগ্যে নেই যখন? ... বলিয়া হাসি।

অগত্যাই একটু হাসিতে হয়।

বাতিটা আমারই মুখের সামনে বসানো আছে। ওর মুখটা অন্ধকারে অস্পষ্ট। মুখের সেই কুশ্রী লালিত্যহীনতা, খড়ি কাজলের বিকৃতি, কিছুই আর চোখে পড়ে না।

হয়তো কথা কওয়া সহজ হইয়া আসে সেই জন্যই।

নিতান্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই বা কেমন লাগে! ঘুম আসিবে না—আসা সম্ভব নয়, সারারাত্রি এই অদ্ভুত অস্বস্তিকর অবস্থায় প্রায়ান্ধকার ঘরে এক অস্পষ্ট নারীমূর্তির মুখোমুখি বসিয়া থাকাই বা সম্ভব হয় কেমন করিয়া—চুপচাপ! কথা কওয়াই সহজ বরং। অরুচিকর হইলেও অশান্তিকর নয়, মন্দের ভালো।

নিজেই কথা পাড়ি—আমি যে বাঙালি, জানলে কী করে?

কথা শুনে।

—কথা শুনে? অবাক হইতে হয়—কথা আবার কখন কইলাম? কার সঙ্গে?

—নিজের সঙ্গেই, সেই যে যখন পথ বন্ধ দেখে ফিরলেন? বললেন—"কি সর্বনাশ"!

অসম্ভব নয়, অজ্ঞাতসারেই বলিয়া থাকিব। বলি—রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলে নাকি?

—রাস্তায় নয় জানালায়। এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম—বিষ্টি দেখছিলাম, দেখলাম আপনি যাচ্ছেন। এপাড়ায় এরকম সুট্-পরা ভালো ভদ্রলোকের তো আনাগোনা বিশেষ দেখি না, বর্মি গুণ্ডা আর মুসলমান খালাসির আড্ডা। কৌতূহল হ'ল, বাতি জ্বেলে দরজাটা খুলেছি—দেখি ফিরে আসছেন তাড়াতাড়ি। থাকতে পারলাম না—ডেকে ফেললাম। আপনার গলা শুনে—বাংলা কথা শুনে ইচ্ছে হ'ল পুজো করি।

হাসিয়া ফেলি—কেন, বাংলা কথার এত দুর্ভিক্ষ নাকি? বাঙালি তো এখানে অজস্র আছে।

—আছে তো, কিন্তু এদিকে আসবে কেন তারা? মানুষে কি আসে এখানে? পিশাচপুরী। কারা আসে জানেন? শয়তান আর রাক্ষসের দল। নরকের কীট আর আমাদের মতো আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা।

ওর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শেষের দিকটা হতাশায় ভাঙিয়া পড়ে।

কেমন যেন একটু মমতা জন্মায় মেয়েটার ওপর। ঈষৎ কোমল সুরে প্রশ্ন করি—তা' তুমি এখানে আছ কেন? এত দূরে এসে পড়লেই বা কী করে?

—সে অনেক ইতিহাস। শুনলে হয়তো আপনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আজ সাত বছর ধরে যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি, তা' মনে করলে নিজেই শিউরে উঠি, আশ্চর্য হয়ে যাই যে এত লাঞ্ছনাতেও বেঁচে আছি কী করে। তবু বেঁচেও রয়েছি। আশা হয়, হয়তো আবার কখনও মানুষের মতন করে বাঁচব। এই হীন জঘন্য জীবনই যে আমার একমাত্র জীবন আমি এখনও ভাবতে পারিনে।

আহা বেচারা! হয়তো ভালো ঘরেরই মেয়ে ছিল। কে জানে কী ওর ইতিহাস।

—শ্যামবাজারে তোমার কেউ আছে বুঝি? প্রশ্ন করি।

—কেউ? সব—সব-সবাই আছে আমার সেখানে। আমাদেরই বাড়ি যে। দেখেন নি আপনি? বাজারের দিকে যেতে ডানহাতি গোলাপি রঙের বাড়ি? পাশের দিকে দেওয়াল—একটু একটু শ্যাওলা পড়া? রঙচটা সবুজ জানালা দরজা। মেরামত করা আর হয়ে ওঠে না—দেখেছেন তো সে বাড়ি?

সারা কলিকাতা শহরে নিত্য পথের দুই ধারে ও-রকম বাড়ি অসংখ্য আছে, অজস্র দেখিয়াছি, আলাদা করিয়া মনে রাখার কথা নয়, তবু ওর আগ্রহব্যাকুল ভাবটা দমাইতে ইচ্ছা হয় না, অল্প চিন্তার ভান করিয়া বলি—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে যেন—দেওয়ালের বালিটালিও কতক খসে গেছে, শ্যাওলা তো বিলক্ষণ।

—ঠিক, ঠিক ধরেছেন আপনি—উৎসাহে আর উত্তেজনায় ওর গলায় স্বর যেন বুজিয়া আসে,—সেই বাড়ি। হ্যাঁ, খারাপ হয়ে তো যাবেই আরও, তারপর থেকে সাত বছর হয়ে গেল। বাবার কি আর বাড়ি মেরামত করবার সখ আছে? মুখে চুনকালি পড়ে গেছে। উঃ, আমারই জন্যে।

আচ্ছা জ্ঞানপাপী বটে! অপেক্ষাকৃত কঠিন সুরে প্রশ্ন করি—যাতে চুনকালি পড়ে এমন কাজ করছিলে কেন?

—নিয়তি আমার। বয়স ছিল কম, বুদ্ধি বিবেচনা আরও কম। চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়া মানেই যে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া, এ যদি জানতাম তখন!

গভীর একটা নিশ্বাস ঘরের রুদ্ধ বাতাসকে আরও মন্থর করিয়া তোলে।

নিস্তব্ধতা ভাঙে ও-ই আগে, আপনি রাগ করছেন, কিন্তু যদি শুনতেন আমার জীবনের কাহিনী, বুঝতেন কত অসহায় আমরা। ভেবে দেখুন দিকিন, মাত্র পনেরো-ষোলো বছরের একটা মেয়ে—জ্ঞান বুদ্ধিহীন, বিদ্যে যার ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত—

—ইস্কুলে পড়েছিলে নাকি? কোন ইস্কুলে? বাধা দিয়া প্রশ্ন করি।

—পড়েছি বীণাপাণি স্কুলে। আমার নিজের নামটাও আবার বীণাপাণি ছিল—মেয়েরা এত ক্ষেপাতো—

আমার বড় ভাইঝিটাও বীণাপাণিতে পড়ে, ক্লাস নাইনেই পড়ে। মনে পড়িতেই বিদ্বেষবিমুখ চিত্ত অজ্ঞাতসারেই কেমন যেন স্নেহকোমল হইয়া আসে।...

আন্তরিকতার সঙ্গেই প্রশ্ন করিয়া যাই।...

মমতার সঙ্গে শুনিতে থাকি ওর উৎপীড়িত জীবনের শোচনীয় ইতিবৃত্ত।... ক্ষুধিত বর্বরতার নৃশংস কাহিনী হয়তো এমনিই হয়, হামেশাই এমনিই ঘটে, এ কাহিনীতে মৌলিকত্ব কিছুই নাই। তবু বড় ভয়ঙ্কর, বড় করুণ।

প্রচ্ছন্ন প্রেমের বেদনায় মধুর সুন্দর যে হৃদয় অম্লান ফুলের মতো পাতার অন্তরালে নিঃশব্দে ফুটিয়া থাকিতে পারিত, পশুর দুর্দান্ত লালসা তাহাকে ছিঁড়িয়া দিয়াছে ধূলিধূসর রাজপথে, টানিয়া লইয়া গিয়াছে কঙ্করাকীর্ণ কঠিন প্রান্তরে, ঠেলিয়া দিয়াছে কাঁটার জঙ্গলে। সেখানে কত সংগ্রাম কত ঝড়!

ঝড়ের ঝাপটে তুচ্ছ তৃণখণ্ড কোথা হইতে কোথায় উড়িয়া পড়ে, কে তাহার হিসাব রাখে?

একদা যাহার নাম ছিল বীণাপাণি, অতি সাধারণ এক গৃহস্থঘরের চারিখানি দেওয়ালের অন্তরালে কল্যাণী-মূর্তিতে বেড়াইত, আজ আর তাহাকে মনে রাখিবার দায়িত্ব কাহারও নাই।

জানিতে চাহিলে হয়তো বলিবে—'বীণাপাণি বলিয়া কেহ ছিল না। বীণাপাণি বলিয়া যে ছিল—মরিয়াছে'।

পুরুষমানুষ হইলেও ঘরের বাহিরের যথার্থ পরিচয়টা কি, ছদ্মবেশী দুনিয়াখানার আসল চেহারা কত ভীষণ, সে সম্বন্ধে সত্যই কোনও বোধ ছিল না। মানুষের মুখে উপন্যাসের ঘটনা শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়ি। উপন্যাস বটে, কিন্তু অক্ষম লেখকের কুলিখিত উপন্যাস। আজ আর ফিরাইয়া লেখা চলে না? ফিরাইয়া দেওয়া যায় না ওকে—সুন্দর না হোক—সরল একটি জীবন—নিশ্চিন্ত জীবন?

আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করি—তুমি পালাতে চেষ্টা করো না কেন?

—পালাতে? কী ক্ষমতা আমার? এরা যদি জানতে পারে—কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে না? এদের তো জানেন না আপনি! কথায় কথায় ছোরা দেখিয়ে শাসায়, এতটুকু অবাধ্য হলে লোহা তাতিয়ে ছ্যাঁকা দেয়। মানুষের চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় পিশাচ, রাক্ষস, শয়তান, নরকের কীট। এখন যার অধীনে আছি আমি—বুড়ো চীনেম্যান একটা, ও রকম জঘন্য প্রকৃতির লোক পৃথিবীতে আর আছে কিনা ঈশ্বর বলতে পারেন। শুধু অর্ধেক দিন নেশায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে এই সুবিধে। একটা মগ গুন্ডার কাছে তিরিশ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল আমায়। সে লোকটাই কি কম সাংঘাতিক ছিল! তিনটে খুন করেছিল সে! এই যে আপনি বসে আছেন, তাদের চোখে পড়লে আস্ত রাখত?

অজ্ঞাতসারে কাঁপিয়া উঠি ... সভয়ে পিছনের অন্ধকারপানে তাকাই ... কী জানি কেহ ছোরা উঁচাইয়া নাই তো?

বীণাপাণি আমার অবস্থা বুঝিয়া অল্প হাসে, বলে—নাঃ, আজ আর ভয়ের কিছু নেই। আজ ওরা ডাকাতি করতে যাবে এক জায়গায়, কাল সন্ধের আগে আসবে বলে মনে হয় না।

আশ্বাসের কথা শুনিয়া হাতে-পায়ে খিল ধরিয়া আসে।... কী সব ভয়ঙ্কর কথাবার্তা! দুই হাত ব্যবধানের মধ্যে স্বচ্ছন্দে সহজ ভাষায় যাহার সঙ্গে গল্প করিতেছি, সেই মেয়ে ডাকাতের ঘর করে। ঘরের যাহারা বাসিন্দা, হয়তো এই ঘরে বসিয়া ছোরা শানাইয়াছে মানুষের বুকে

বসাইতে। এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ভিতরটা ছট্‌ফট্‌ করিয়া ওঠে। কিন্তু সকালের এখনও অনেক বাকি, তবু তো ঘরে আছি, পথে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে কেহ এক-ঘা লাঠি বসাইয়া দিবে কি না তাহারই বা নিশ্চয়তা কী!

হতাশভাবে বলি—তা'হলে তোমার দেখছি কোনও আশাই নেই!

ত্রস্তভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া বীণাপাণি চুপিচুপি বলে বসে—চুপ্‌, দেওয়ালের কান আছে জানেন তো? আশা ছিল না—একটু হয়েছে। আপনার কাছে অবশ্য বাধা নেই—বাঙালি, ভদ্রলোক, একরকম বন্ধুই আমার। উপায়টা কী জানেন—স্কুলে যখন পড়তাম, সেলাই শেখাতেন মিশনারি মেম একজন, মিসেস উড্‌। বিপন্ন মেয়েদের উদ্ধার করা বা তাদের সৎপথে চলবার সুযোগ দেওয়াই তাঁর জীবনের ব্রত। অনেক চেষ্টায় তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। সব কথা অবশ্য খুলে বলতে পারি নি, মানুষে পারেও না—বলেছি বিধবা, নিরাশ্রয়। তিনি আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছেন, লিখেছেন—তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলেই আমার ভার নেবেন। তা পৌঁছতে হ'লে চাই টাকা আর সুযোগ। পালাবার সুযোগ। মনে করেছি শেষ চেষ্টা একদিন করবই—প্রাণপণ করে করব। কথায় বলে—"মরার বাড়া গাল নেই"—তা' মরেই তো আছি একরকম। মনে করেছি সরে পড়বো, বাঁচি বাঁচব, মরি মরব। চীনে বুড়োকে জলের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ দিয়ে—দিনের বেলাই পালাতে হবে, বুঝলেন? রাত্রে বেরোলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। এখানকার লোকগুলো নিশাচর কিনা। আঃ, একবার যদি যেতে পারি মিসেস উডের আশ্রয়ে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়, যেখানে অন্তত পুরুষমানুষ নেই। পৃথিবীর বাইরেও যদি এমন কোনও দেশ থাকত—যেখানে পুরুষের মুখ দেখতে হয় না!

ঈষৎ আহতভাবে বলি—সব পুরুষমানুষই কি সমান?

—বেশির ভাগ। বিষাদম্লান কণ্ঠে উত্তর দেয় বীণা—আঁপনার মতন মহৎ আর ক'জন আছে, বলুন?

—মহত্ত্ব তো কত! বিনয় করিয়া বলি।

—আছে, আপনি বুঝবেন না। বয়সে বড় হ'লেও অনেক ছেলেমানুষ আছেন এখনও। সে যাক্‌, কিন্তু একটুও ঘুম হ'ল না আপনার, অসুখ করবে।

হঠাৎ খেয়াল হয়, সত্যই ভারি ঘুম পাইতেছে। কিন্তু ঘুমানো চলে না, তবে শুধু ক্লান্তি দূর করিতে চোখের পাতা দুইটা বুজিয়া চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলেও একটু আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু একে কিছু সাহায্য করিতেই হয়, টাকা সঙ্গে যখন আছেও কিছু।

একটু চুপ করিয়া বলি যাবার জন্যে টাকার কী করেছ?

—টাকা?

হঠাৎ ও চৌকি হইতে উঠিয়া আমার একান্ত কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, অস্বাভাবিক ভীতকণ্ঠে প্রায় ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলে—আপনাকে যখন সবই বললাম তখন বলি, টাকার জোগাড় কতকটা হয়েছে, দু' আনা এক আনা করে আস্তে আস্তে কিছু জমিয়ে ফেলেছি। বস্তির কারো কারো জামা-টামা সেলাই ক'রে দিয়ে, ছেঁড়া রিফু ক'রে, মাঝে মাঝে দু'চার পয়সা পাই—ওখানে একটা নুলো মেয়েমানুষ আছে, কিচ্ছু করতে পারে না তার রান্না করে দিয়ে আসি লুকিয়ে, সেও মাসে মাসে কিছু দেয়, তা' ছাড়া চীনেটার যেদিন মন ভালো থাকে—

একটু ঢোক গিলিয়া চুপ করিয়া যায়।

আবার কিছুক্ষণ পরে পূর্ব কথার জের টানিয়া বলে—তবু এখনও আরও পাঁচ-সাত টাকা হ'লে ভালো হয়, পরে যাবার মতো একটা ভদ্র কাপড়-জামাও নেই। কিন্তু কতদিনে যে হবে ভগবানই জানেন। যদি একবার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে ওরা টাকার কথা, ঠিক কেড়ে নেবে, খুন করে কেড়ে নেবে। এক একটি পয়সা আমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এও তবু একরকম আছি—চীনেটা কী বলে জানেন? একটা খালাসির কাছে নাকি বেচে দেবে! জাহাজের খালাসি—চাট্‌গেঁয়ে মুসলমান। কী ভয়ঙ্কর চেহারা, দেখলে আপনি পুরুষমানুষ—হয়তো তাও মূর্ছা যেতেন। এসেছিল একদিন—দরে বনল না। ওর হাতে পড়ে গেলে আর কোনও ভরসা দেখি না। আগেই যাতে পালাতে পারি, এই দিন-রাত্তিরের প্রার্থনা। ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন না? যখন ভাবি—আবার কলকাতায় যেতে পাব, ভদ্রলোকের মতন দিন কাটাতে পাব, এত যন্ত্রণাও যেন সহ্য হয়ে আসে। স্বর্গের আশায় নরকযন্ত্রণা ভোলা আর কি। আচ্ছা এততেও কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নি আমার?

উত্তর দিবার কথা খুঁজিয়া পাই না বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, বাকি টাকাটাই আমিই রাখিয়া যাইব—কাছেই তো আছে। ওর ব্যাকুলতা ও আসন্ন বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া মনে হয়, এখনি এই দন্ডেই যদি উহাকে এই ক্লেদাক্ত সংস্রব মুক্ত করিয়া লইয়া যাইতে পারিতাম।

নিতান্তই অসম্ভব কি? মনকে প্রশ্ন করি—উত্তর পাই না। আমার নাবালকত্বই বিবেককে মূক করিয়া রাখে।

সাহস কোথায়? সমাজের ভয়—সুনামের ভয়—সংস্কারের ভয়—নামহীন অজানা ভয়।

চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখি রীতিমতো সূর্যালোক। মেঘমুক্ত আকাশ যেন গতরাত্রের সমস্ত দুর্যোগকে ব্যঙ্গ করিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে। হঠাৎ ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

দিনের আলোয় চারিদিকে চাহিয়া ঘৃণায় সর্বশরীর সঙ্কুচিত হইয়া আসে। ময়লা দুর্গন্ধ জামা-কাপড়ের রাশি, ছেঁড়া জুতার পাটি, ভাঙাক সোরাই, ফুটা এনামেলের গ্লাস, ধূমপানের সরঞ্জাম ইতস্তত ছড়ানো। মেঝের ধূলা যে কতদিন ঝাড়া হয় নাই, ঈশ্বর জানেন। পোড়া দেশলাই কাঠির স্তূপ তাহার নীরব সাক্ষী।

একটা ইতর ব্যক্তির রাত্রিবাসের চিহ্নসম্বলিত এই কুৎসিত ঘরখানায় রাত্রিযাপন করিয়াছি, মনে করিতেই যেন বমি আসে।

বীণাপাণি ঘরে নাই।

না বলিয়া চলিয়া যাওয়া যায় না, অথচ তিলার্ধ সময় এখানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে রুচি হয় না। অধৈর্যভাবে মিনিট দুই পায়চারি করি। ডাকিবারই বা সুবিধা কই? কোথাও পাত্তাই নাই।

দূর ছাই, টাকাটা এইখানে রাখিয়া সরিয়া পড়ি। আসিলেই যাহাতে চোখে পড়ে এমনভাবে রাখিতে হইবে। গোটা দশ? না আরও কিছু বেশি?

ভিজা কোটটা খুলিয়া চেয়ারের পিঠে রাখিয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি গায়ে দিয়া ভিতরের পকেটে হাত দিই। ....

টাকা নাই। ...

পঁচিশখানা নোট—একখানাও নাই, চিহ্নমাত্র নাই। অথচ পাশের পকেটে পার্সটি ঠিক আছে। ইহাকেই বলে ধূর্তামি! সহজ যাহাতে ধরা পড়িতে না হয়! ...

প্রভাত-সূর্যের নির্মল আলো যেন নিবিড় অন্ধকারে পরিণত হয় ... মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ... মনে হয় পড়িয়া যাইব বুঝি!

ভাবি—বীণাপাণি! মানুষ যে কত শয়তান হইতে পারে, সে কথা শুধু গল্প করিয়াও ক্ষান্ত হও নাই, প্রকৃষ্ট উদাহরণও দেখাইলে!

আর একবার নিজের নাবালকত্বে ধিক্কার দিই। কত সহজেই অভিভূত হইয়া পাড়ি! দুইটা করুণ কথা—দুই বিন্দু চোখের জল!

অথচ আজীবন শুনিয়া আসিতেছি—উহারা ছলনাময়ীর অভিনেত্রী জাত।

কিন্তু এমনি একটা বাজে মেয়ে—অনায়াসে জিতিয়া যাইবে?

টাকাটা এমন কিছু অগাধ নয়। পকেট মারা গেলে সহিত, কিন্তু এ ক্ষতিটা যেন অসহ্য।

নাঃ, টাকা আমি বাহির করিবই—করিতে হইবেই। দেখি চোরের উপর বাটপাড়ি চলে কি না। ঘৃণা বিসর্জন দিয়া ঘরের জিনিসপত্র ওলট-পালট করিয়া খুঁজি। রাখিবে কোথায়—বাক্স-ফাক্স বালাই তো ঘরে নাই।

অবিশ্বাস্য কথা সত্য হইলেও নাকি গোপন রাখাই রীতি, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের তাই মত, তবু না বলিয়া পারি না, হারানিধি ফিরিয়া পাইলাম। সহসা যেন দৈব-নির্দেশেই চোখে পড়িয়া যায়।

দেওয়ালের গায়ে মহাত্মা গান্ধীর একখানা ধূলিধূসরিত বিবর্ণ ছবি টাঙানো—তাহারই পিছনে পুরোনো খবরের কাগজে মোড়া একটা ছোট বান্ডিল উঁকি মারিতেছে।

সন্দেহ থাকে না—পাড়িয়া লই। দ্বিধা করিবার আছেই বা কি? একটি একটি করিয়া গণিয়া লই পঁচিশখানি নোট। এক টাকার।

নাঃ, একটা কম—বোধ করি এখনি খরচ করিতে লইয়া গিয়াছে। এইবার আসিয়া বুঝিও হে বীণাপাণি, বুদ্ধি তোমার একচেটে সম্পত্তি নয়!

বিনাবাক্যে চুলগুলা হাত চালাইয়া পাট করিয়া টুপিটা মাথায় চাপাই, ট্রাউজারের পা দুইটি টানিয়া চোস্ত করি, রুমাল ঘষিয়া মুখের যতটা উন্নতিসাধন সম্ভব সারিয়া গম্ভীর চালে বাহির হইয়া পড়ি।

ভগবানের কাছে একমাত্র কামনা, যেন পরিচিত কাহারও চোখে পড়িতে না হয়।

কিন্তু পড়িতে হয়—ক্ষণকাল পূর্বে যাহার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম—সে বীণাপাণিই চোখে। দুই হাতে দুইটা জলভরা বালতি কোন্ চুলা হইতে ভরিয়া আনিয়াছে কে জানে!

আমাকে দেখিয়া রীতিমত থমমতো খাইয়া যায়। যাইবারই কথা। বলে—আপনি চলে যাচ্ছেন ? মুখ ধোবার জন্যে ভালো জল আনলাম!

—যাক্, যথেষ্ট হয়েছে—ব্যঙ্গহাস্যে ঠোঁট বাঁকাই—এরপর বোধ হয় চায়ের লোভ দেখাবে? কিন্তু নিজেকে সব সময় অত চালাক ভাবতে নেই, বুঝলে বীণাপাণি! হ্যাঁ ভালো কথা, তোমাদের ঘরে রাত্তির কাটালে দাম দিতে হয়, না? এই নাও—

পার্স খুলিয়া দুইটা টাকা অবহেলাভরে ফেলিয়া দিয়া 'গট্ গট্' করিয়া পথ চলিতে থাকি।

পিছনে চাহিবার প্রয়োজন অনুভব করি না। ...

কোন পথ দিয়া কত পথ ঘুরিয়া কেমন ভাবে যে সুরেশের বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া পৌছাইলাম স্মরণ করিবার ক্ষমতা নাই। শুধু মনে আছে, মাথা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, বোধ হয় জ্বর আসিতেছে।

আসা বিচিত্র নয়। স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত শরীর!

সুরেশ বোধ করি আমারই প্রতীক্ষায় চিন্তিত মুখে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। আমাকে পায়ে হাঁটিয়া সশরীরে আসিতে দেখিয়া বিদ্রূপ বিরক্তির স্বরে বলিয়া ওঠে—কি হে ছোকরা, রাস্তায় বেড়ানো অভ্যাস-টভ্যাস্ ছিল নাকি? না এখানে এসেই হঠাৎ—

ব্যস্তভাবে বলি—ভেতরে চলো সুরেশ, বোধ হয় জ্বর আসছে।

—জ্বর আসছে? বলিস্ কী? চল—চল্—

মুহূর্তে ওর মুখের চেহারার পরিবর্তন ঘটে, উদ্বিগ্ন স্বরে বলে—ব্যাপার কী বল্ তো? কাল সারারাত ভোগান্তির একশেষ, খুঁজে হয়রান। চেহারা দেখে যে ভয় করছে—হ'ল কী?

বলছি ভাই সব, আগে জল খাব এক গ্লাস।

সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া গতরাত্রের কতকটা বিবরণ দিই সুরেশকে। বীণাপাণির কথা অবশেষে বাদ দিই, দিতেই হয়—মুখে আট্‌কায়।

সুরেশ আমার বিছানার ব্যবস্থা করিতে করিতে মৃদুহাস্যে বলে—ওহে বালক, মায়ের আঁচলটি ছেড়ে চলে আসা উচিত হয়নি তোমার। এই শহরে আজ ছ'বছর কাটালাম—গুণ্ডার টিকিও দেখলাম না, তুমি বাবা দেশে পা দিয়েছ আর তার কবলে পড়ে গেছ? হোপলেস্। তাছাড়া—এত কেয়ারলেস্ তুই? এতগুলো টাকাসুদ্ধ কোটটা আলনায় ফেলে চলে গেছিস?

টাকাসুদ্ধ কোট!

বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকি।

—কি, এখনও হুঁশ হচ্ছে না বাবুর? যাই ভাগ্যিস্ চাকরটার চোখে পড়ে নি, পয়লা নম্বরের চোর ওটা। দেখে আবার সরিয়ে রাখি—এই নে—

বিছানা উল্টাইয়া গদির তলা হইতে একগোছা নোট বাহির করিয়া আমার হাতে দেয় সুরেশ। পঁচিশখানি নোট। এক টাকার। খরচের সুবিধার জন্য কাল যেগুলো ভাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম। .... এতক্ষণে খেয়ালে আসে কাল বাহির হইবার আগে গত দুই দিনের ব্যবহৃত কোটটা বদলাইয়া একটা টাট্‌কা ইস্ত্রি-করা কোট গায়ে দিয়াছিলাম। নূতন সাহেব! নূতন চাকরি!

সুরেশ আমার তদারকের জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে। হইবে বই কী—ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বিদেশ-বিভুঁইয়ে আসিয়া পড়িয়াছি। আসন্ন জ্বরের আচ্ছন্নতায় হঠাৎ একসময় মনে হয় .... অন্ধকার গহ্বরের মুখে দাঁড়াইয়া কাহাকে যেন ঠেলিয়া দিলাম ....

ভয়ার্ত একখানা মুখ ... বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি ... মাথা তুলিয়া শ্বাস লইতে চেষ্টা করে—পারে না।

তলাইয়া যাইতে থাকে .... আরও নীচে জাহান্নমের অতল তলায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।

স্টিলের আলমারি

চমৎকার! সক্কাল বেলাই এক ঝামেলা।

চিঁকরে উঠল লতিকা। বলতে যাচ্ছিল 'আপদ', সামলে নিয়ে বলল, 'ঝামেলা'।

তারপর পরিতোষের কাছে চলে এসে তেমনি ঝঙ্কারের সঙ্গেই বলল, সক্কাল বেলাই সুখবর শোনো। তোমাদের নয়নপুর থেকে তোমার প্রাণের বড়দা এসেছেন।

পরিতোষের হাতে সবে এক চুমুক খাওয়া চায়ের কাপ। পরিতোষ সতৃষ্ণ নয়নে জানলার দিকে তাকিয়েছিল কতক্ষণে খবরের কাগজটা এসে পড়ে।

একতলার ঘর, সামনের জানলা দিয়ে কাগজ ফেলে দিয়ে যায়।

বড়দা নয়নপুর থেকে এসেছেন?

পরিতোষের পেয়ালা থেকে একটু চা চলকে পড়ে গেল।

জ্যাঠতুতো ভাই বড়দা সম্পর্কে পরিতোষের যে একদা কিছুটা দুর্বলতা ছিল সে কথা লতিকার জানা বলেই এভাবে ঠোক্কর দিয়ে কথা বলা।

তা নয়নপুরের কথা উঠলে কার সম্পর্কেই না ঠোক্কর দিয়ে ছাড়া কথা বলে লতিকা?

সেই যে বিয়ের পর কবে কোন্ কালে নতুন বৌ হিসেবে দেশের বাড়িতে কটা দিনের জন্যে বাস করতে যেতে হয়েছিল, সেই সূত্রেই নাকি তার নয়নপুর সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। আর সে অভিজ্ঞতা যে মধুর নয় তা লতিকার এযাবৎ কালের সমস্ত কথাবার্তার মধ্যেই ধ্বনিত হয়।

কিন্তু এমন কি সেই অভিজ্ঞতা?

যা সারাজীবন কাল মন বিরূপ করে রাখতে পারে?

আর কিছুই নয়। মূল কারণ হচ্ছে পরিতোষের সেই তুচ্ছ গণ্ডগ্রামটুকুর প্রতি প্রাণের ভলোবাসার খবর। হ্যাঁ, লতিকা যখন ওই গাঁইয়া জায়গাটা সম্পর্কে সমালোচনায় মুখর হয়েছে তখনই ওই 'খবর'টি টের পেয়েছে। পরিতোষের মুখের রেখায় রেখায় সেই ভালোবাসাটির খবর ধরা পড়েছে।

অতএব সতীনের হিংসেতুল্য একটি জ্বালা!

পরিতোষ কি আর তা না বুঝতে পারে? বুঝতে পেরে পেরেই তো সেই একান্ত গভীর সুন্দর ভালোবাসাটুকুকে হৃদয়ে নিভৃত কোটরে কবরিত করে রাখতে রাখতে ক্রমশ তাকে ভুলেই গেছে। অর্থাৎ সত্যিই কবরিত হয়ে গেছে।

এখন আর পরিতোষকে ভবতোষ ভট্টাচার্য সম্বন্ধে তোমার প্রাণের বড়দা বলার কোনও মানে নেই। বছরে ক'বার মনে করে তাঁকে পরিতোষ? চিঠি লিখে খবর দেওয়া-নিইর প্রশ্নও নেই আর। নেহাৎ বিজয়া দশমীর প্রণাম জানানোর সঙ্গে বলা—'আশা করি তোমাদের সব কুশল।'

ভারি সুন্দর একখানি ভাষা চালু আছে আমাদের। কেমন আছ কী বৃত্তান্ত লিখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন মারার পিছনেই তো থাকছে প্রশ্নগুলির উত্তরের আশা। তার মানেই জের টেনে চলার পথ খুলে রাখা।

এ বেশ! 'আশা করছি'। এর জন্যে আর উত্তরের আশা থাকে না।

এইভাবেই অতি নিকটজনেরাও ক্রমশ বৎসরান্তে একবার 'ফুলজল' পাওয়ার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল।

বড়দার সঙ্গেও এখন পরিতোষের সেই রকমই যোগাযোগ।

বড়দার আসাটা অপ্রত্যাশিত।

তাই চায়ের পেয়ালা থেকে একটু চা চলকাল।

শুকনো গলা থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে এল, বড়দা! নয়নপুর থেকে!

পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বিপন্ন গলায় বলল, এখন, এ সময়? কোন্ গাড়িতে?

লতিকা ঠোঁট উল্টে বলল, তা কী করে জানব? তোমাদের নয়নপুরের ট্রেনের টাইম তো আর মুখস্থ করে রাখিনি।

তাড়াতাড়ি কাপটা শেষ করে নামিয়ে রেখে পরিতোষ বলল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?

আমি আবার আগ বাড়িয়ে কী দেখা করতে যাব।

লতিকা আর একবার ঠোঁট ওলটালো, রেখার মা এসে বলল।

পরিতোষ যে ঘরে বসে চা খাচ্ছিল সেটাকে মোটামুটি ভাঁড়ারঘরই বলা যায়। আবার তার মধ্যেই খাবার টেবিল, চায়ের সরঞ্জাম।

বাইরের দিকে একখানা ভালো ঘর আছে যেটাকে লতিকা সুচারু ভাবে ড্রইংরুম রূপে সাজিয়ে রেখেছে। বাড়ির মধ্যে একখানা ঘর অন্তত থাকুক যেখানে সভ্যভব্য অতিথি অভ্যাগতকে বসানো যায়।

সে-ঘরেই টেলিভিশান, সে-ঘরেই বুক-র‍্যাক। এবং নানাবিধ শৌখিন জিনিসের সমবেশ।

সে ঘরে নয়নপুরের বড়দাকে বসাবার কথা নয়। কিন্তু বুদ্ধিহীন রেখার মা আগে সেখানেই বসিয়ে তবে খবর দিতে এসেছে। বসাবে না? শুনলো যখন মেসোমশাইয়ের লোক, দাদা, তখনি তো ভক্তি উথলে উঠছে?

পরিতোষ শুকনো মুখে বলল, এ সময় হঠাৎ, কেন কে জানে।

কেন আবার!

লতিকা আবার নিজস্ব ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টে বলল, মুখে ধান শুকিয়ে ধানাই-পানাই করে দুঃখের গাথা গেয়ে কিছু টু পাইসের ব্যবস্থা করা। শুনবে অখন, গ্রামে গঞ্জে এখন বাস করা দায়। জমিতে ধান নেই পুকুরে মাছ নেই—ইয়ে বাড়িতে চালে খড় নেই। এ তো পড়েই আছে।

কথাগুলো যে পরিতোষের কানে মধুবর্ষণ করল তা নয়, তবে পরিতোষ যে ছিটকে উঠে প্রতিবাদ করল তাও তো নয়।

পরিতোষ শুধু মনে করতে চেষ্টা করল কবে কোন্ সূত্রে বড়দা কাঁদুনি গেয়ে টু পাইস হাতিয়ে গেছে। 'বড়দা' নামক সেই প্রাণখোলা হাসি দীর্ঘকায় মানুষটার সঙ্গে ঠিক ওই বিশেষণগুলো কি মানানো যায়?

অথচ পরিতোষ লতিকার মুখের ওপর বলে উঠতেও তো পারল না, কবে কোন দিন বড়দা আমার কাছে এসে হাত পেতেছেন লতিকা?

নাঃ, বলতে পারল না।

কে জানে কোন্ অমোঘ নিয়মে লতিকার মুখের ওপর স্পষ্ট সত্য কথাটা শুনিয়ে দেবার সাহস নেই পরিতোষের। কোনও ব্যাপারেই নয়।

লতিকা যখন অনায়াসে রেখার মার রেখাটাকে বলে, এই, 'মা আসতে পারবে না' খবরটি দিয়ে পালাচ্ছিস যে? বাসনগুলো মেজে দিয়ে যা।

তখন পরিতোষ বলতে পারে না, কী আশ্চর্য, ওইটুকু মেয়েটা, আমাদের টুকাইয়ের থেকেও ছোট, ও অতগুলো বাসন মাজতে পারে?

বড়জোর হয়তো সাহসে ভর করে বলে, ও যা বাসন মাজবে তা তোমার পছন্দ হবে?

লতিকার অবশ্য কথার মর্মার্থ বুঝতে আটকায় নি। কারণ সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

তাই লতিকা রোদা গলায় বলে, হবে কিনা সে আমি বুঝব। না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ব নাকি?

আবার অন্য দিকেও পরিতোষের পরিচিত কেউ বেড়াতে এলে লতিকা যখন অবলীলায় বলে, চা? চা-ফা হবে না এখন। দুটো মিষ্টি আনিয়ে ফ্রীজের ঠান্ডা জল দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

তখন পরিতোষের এমন সাহস হয় না যে বলে, চা তো তোমাদের সারাক্ষণই হচ্ছে বাবা! আমার একটা বন্ধু এলেই—

নাঃ, তেমন সাহস হয় না পরিতোষের।

লতিকা যদি স্বেচ্ছায় কিছু করে, কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয় এবং বার বার লতিকার তৎপরতার আর বিবেচনার কথা উল্লেখ করে।

তাই বলে উঠতে পারা সম্ভব হল না পরিতোষের, 'কবে আবার বড়দা আমার কাছে...?

কে জানে কেন পরিতোষের মধ্যে এমনই একটা অনধিকারীর আর অপরাধীর ভাব!

বিশেষ করে নয়নপুর সম্পর্কিত কথা উঠলেই পরিতোষ যেন চোর।

তবু এখন পরিতোষকে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করতে হচ্ছে। আর সেটুকু করে ফেলেই সমস্ত সহানুভূতিটুকু লকিতার দিকে ঢেলে বলে উঠতে হল, তা এ সময় যখন এসে হাজির হয়েছেন, তখন তোমার তো বেশ ভালোই কাজ বাড়ল না। না খাইয়ে তো আর—অথচ ইয়ে তোমার তো শুনছি কদিন থেকে গ্যাস ফুরিয়ে বসে আছে।

লতিকা একটু বিদ্রূপের হুল ফোটানোর হাসি হেসে বলে, গ্যাসই ফুরোক আর শ্বাসই ফুরোক তোমার 'দ্যাশের' বড়দা যখন, তখন যোড়শোপচারের নৈবিদ্যি সাজাতেই হবে।

ভবতোষ এসে বসে আছেন।

পরিতোষ মনে মনে রীতিমতোই চাঞ্চল্যবোধ করছে। কিন্তু এদিকটার অবস্থাটি একটু আঁচ করে না গেলেও তো স্বস্তি নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়ে গল্প করতে বসে যাবেন, আর লতিকা হয়তো শুধু চারটি বাজারের খাবার আনিয়ে সাজিয়ে দিয়ে অতিথি সৎকারের পাট মিটোবার তাল করবে।

অথচ ওঁরা গ্রামের মানুষ শহর-বাজারের খাবার'কে খুব ভয়ের এবং অবজ্ঞার চোখে দেখেন।

কদাচ কখনও যখন আসেন, মানে আগে আগে এসেছেন, বেশিরভাগ দুপুরের গাড়িতে এসে বিকেলটা থেকে সন্ধের সময় চলে গেছেন।

তা কখনও কি পরিতোষ মনের জোর করে বলে উঠতে পেরেছে, রাতটা থেকে যাও না বড়দা। সকালের গাড়িতে চলে যাও। রাতে বেশ জমিয়ে গল্প করা যাবে।

না, সে জোর কখন খুঁজে পায়নি পরিতোষ ভট্টাচার্য নামের সরকারি অফিসের একটি মাঝারি অফিসার। শুধু কথাগুলো মনের মধ্যে পাক খেয়েছে।

এমন কি একান্ত বাসনা সত্ত্বেও লতিকার কাছে প্রকাশ করতে পারেনি, দু'খানা লুচিফুচি ভেজে খাইয়ে দিলে হত বোধ হয়। ওঁর আবার বাজারের খাবারে জুজুর ভয়।

না সেসব বলা-টলা হয় না।

আর ভবতোষ নামের মানুষটা জলখাবারের থালাটা হাতে নিয়ে বলেন, নাঃ, তোদের এই এক ফ্যাশান বাবা! গাদা-গুচ্ছির পয়সা খরচ করে একগাদা বাজারের খাবার আনিয়ে খাওয়াতে না পারলে যেন আদরযত্ন করা হয় না। এর থেকে যদি বৌমা তোদের রুটি তরকারি থেকে দুখানা চায়ের সঙ্গে দিয়ে দিত, খেয়ে আরাম হত। এইসব সিঙাড়া কচুরি শুধু অম্বলের কুঠি।

পরিতোষ না তাকিয়েও একখানি বেজার মুখের ছবি দেখেতে পায়।

পরিতোষ আবহাওয়া বদলাতে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, তোমার আবার অম্বল কী গো বড়দা? লোহা খেয়ে লোহা হজম করবার শক্তি ছিল না?

হাহা করে হেসে ওঠেন ভবতোষ। বলেন, 'ছিল'। অর্থাৎ অতীত। এখন আর নেই রে ভাই। একসময় তো লোহার রডও দুহাতে চেপে বাঁকাতে পারতুম। সাঁতরে গঙ্গার এপার ওপার হতুম। এখন আর সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। গঙ্গার যা হাল হয়েছে নাইতে নামতে রুচি হয় না।

তা একদা রাম অযোধ্যা দুইই ছিল।

ভবতোষ ছিলেন পাড়ার হীরো। গ্রামে লাইব্রেরি করেছেন, জিমন্যাস্টিকের ক্লাব খুলেছেন, ফুটবলের টীম গড়েছেন এবং যতটা পেরেছেন পরোপকার করে বেড়িয়েছেন।

পরিতোষের 'ছেলেবেলা'র চোখের সেই উজ্জ্বল ছবিটি পরিতোষের হৃদয়কন্দরে ছিল অনেকদিন পর্যন্ত। তবে এখন দেশের অবস্থা বদলে গেছে, বদলে গেছে সেই সহজ আনন্দের দিনগুলো।

বদলে গেছে পরিতোষও। সে মূল্যবোধও আর নেই।

তবু মানুষটাকে দেখলেই কেমন যেন একটা অস্বস্তিভাব।

যে কতক্ষণে মান বাঁচিয়ে চলে যাবেন সেই চিন্তা।

তবে লতিকা এমন অসভ্য মেয়ে নয় যে গুরুজনের মান না বাঁচিয়ে কথা বলবে। ভাসুর সদর চৌকাঠ পার হয়ে যাবার আগে কোনও দিনই বলে ওঠে না যে এদিকে তো বাজারের খাবারে এত ব্যাখ্যানা। চেটেপুটে খেয়েও তো নেওয়া হল সব।

আর এই এখন, এই যে বলছে, গ্যাস ফুরোক আর শ্বাসই ফুরোক—সে কি আর এমন স্বরে বলছে যে বাইরের দিকের সেই ঘরটা পর্যন্ত স্বরটা পৌঁছবে।

পরিতোষের অবশ্য স্বভাব ঠিকই নিচু স্বরে।

তার কথা দেয়ালের ওপারে যায় না। সেই স্বরে ব্যস্ত হয়ে বলল, আহা অনেক রকম করবার কী দরকার? বাড়িতে যা রান্না হয় তাই দেবে।

হুঁ, এখন তো বলা হচ্ছে। তখন খুঁৎখুৎ করবে। দু'খানা বেগুনি ভেজে দিলে হত। বড়দা বেগুনিটা খুব প্রেফার করেন।

আরে না না, ওসব কিছু করতে হবে না। গ্যাস নেই সেটা জানিয়ে দিলেই হবে।

ঠিক আছে। দয়া করে আবার বাজার ছুটতে যেও না টাটকা মাছ আনতে। ফ্রীজে মাছ রাখা দেখে তো সেবারে তোমার দাদা নাক সিঁটকে ছিলেন—'পয়সা খরচা করে সাত বাসি মাছ

খাবার জন্যে কিনলি তো এটা। জানি। শহরে বাস করলেই শহুরে চাল ছাড়া গতি নেই। পাঁচজনের সামনে মুখ থাকে না।' বলে কি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসি।

বড়দার সঙ্গে পেঁচিয়ে হাসিটা ঠিক মানাতে না পারলেও অভ্যস্ত নিয়মে অপ্রতিবাদেই কথাটা হজম করে পরিতোষ। এবং একটু ব্যস্ত গলায় বলে, যাই।

এই সময় রেখার মা এসে দাঁড়াল।

বলল, মাসিমা, কী হল আপনাদের? উনি আমায় বললেন যে, কী গো বাছা বাড়িতে খবর দাওনি? আর খবর দেবার কী আছে? ঘরের লোক! চল যাই—

রেখার মা একটু ঢোক গিলে বলল, তা পাছে হুটপাট ঢুকে আসে তাই বললুম, হ্যাঁ, খবর দিয়েচি। তো এখন মেসোমশাই বাথরুমে আর মাসিমা ঠাকুরঘরে।

ঠাকুরঘরে!

লতিকা হি-হি করে হেসে ফেলে বলে, খুব বানাতে শিখেছিস তো? কী ভাগ্যি বলিসনি মাসিমা ধ্যানে বসেছেন। যাক বলে ভালো করেছিস।

রেখার মা কিন্তু খুশি না হয়ে বেজার গলায় বলে, তা না বানিয়ে উপায়? একটা মানুষ দেশঘর থেকে এসে হাপিত্যেশি হয়ে বসে রইল, আপনাদের আর দেখাই নাই!

এইমাত্র রেখার মার বুদ্ধির প্রকাশে মনটা যেটুকু প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল, সেটা উপে গেল লতিকার। উঃ, এইসব 'চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী'দের বোলাবোলাও এত বেড়ে যাচ্ছে!

বলল, আচ্ছা যাও। বলোগে আসছেন।

পরিতোষ তাড়াতাড়ি বলে, যাই।

লতিকা গলার স্বর আরো নামিয়ে বলল, গোড়া থেকেই একটু শক্ত হয়ো। ঘরে টি.ভি. দেখে আবার একবার দেখো জ্বলবে। ভাববেন ভাই খুব বড়লোক হয়ে উঠেছে। কলকাতার বাজারদরটা একটু তুলো। আর ওটা যে ইনস্টলমেন্টে কেনা হয়েছে সেটাও কথাচ্ছলে শুনিয়ে দিও। তোমার তো আবার একটু সুখে আরামে থাকতেও অপরাধ বোধ। যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছে। দেখি তো ভাবভঙ্গি!

পরিতোষ মনে মনে বলল, আমার তো সবদিকেই চোরদায়ে ধরা পড়া অপরাধ-বোধ। তা সে তো মনে মনে।

লতিকা ততক্ষণে কথা শেষ করেছে, দেশের জমিজমা বাগানপুকুর সব কিছুতেই তো তোমারও ভাগ আছে, তা সেসবের উপস্বত্ব কিছু পাচ্ছ? সবটাই তো ওঁরা—

সে তো ঠিক।

বলে লতিকার বাক্যমালাকে আর এগোতে না দিয়ে নিজেই এগিয়ে যায় পরিতোষ।

ঢুকে এসে দেখল ভবতোষ জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছেন।

একটা আরাম বোধ হল।

প্রথমেই এতক্ষণ অপেক্ষারত মানুষটার মুখোমুখি হতে হল না।

পিছন থেকে বলে উঠল, কী বড়দা, এ সময়? কোন্ গাড়িতে?

ভবতোষ মুখ ফেরালেন।

নিজস্ব দরাজ গলায় বলে উঠলেন, অবাক হয়ে গেছিস তো? আরে ভারি সুবিধের একটা বাসসার্ভিস নতুন খুলেছে নয়নপুর থেকে। আসলে 'বাজারগাড়ি', তবে চেনাজানা দু'চারজনকে ফড়েরাই নিয়ে নেয়। ভোর পাঁচটায় ছাড়ে আর সাড়ে ছটায় একেবারে এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছয়।

ইতিমধ্যে পরিতোষ একটা প্রণামের মতো করে ফেলেছে এবং ভবতোষ 'থাক থাক' বলে একবার জাপটে ধরে ছেড়ে দিয়েছেন।

যদিও আগের স্বাস্থ্যের এবং শক্তির কিছুই নেই, তবু কাঠামোখানা তো আছে। জাপটানির সময় পরিতোষের মাথাটা ভবতোষের চিবুকের নীচে পর্যন্তও পৌঁছয়নি এবং শরীরটা মালুম পেয়েছে।

ছেড়ে দেবার পর কথা শেষ করলেন ভবতোষ বাসটা হয়ে পর্যন্তই মতলব করছিলাম একটা রবিবার দেখে একবার চলে আসি। ভোরে ভোরে ঠান্ডায় ঠান্ডায়—তো চিঠিফিটি তো দিস না সাতজন্মে, চিরকেলে 'গেঁতো'। আছিস কেমন বল? কতদিন দেখা হয়নি।

পরিতোষ বলল, ওই চলে যাচ্ছে একরকম। তবু তো তোমরা আছ ভালো। কলকাতার যা অবস্থা!

আমরা আছি ভালো?

আবার হা-হা করে হেসে ওঠেন ভবতোষ। বলেন, কথাটা বলেছিস ভালো! সেই যে কবিতা আছে—'নদীর এপার করে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস'-এ তাই। তুই এই বলছিস আর আমরা ভাবি তবু তো তোরা আছিস ভালো।

ভবতোষ কিন্তু পরিতোষের সাজানো ঘর এবং টি.ভি'র দিকে না তাকিয়েই বলেন কথাটা।

বললেন, তোর ছেলেবেলায় দেখা সে নয়নপুর আর নেই রে ভাই। নয়নপুর ঝামোটপুর বাদু সব ধ্বংসপড়া হয়ে গেছে। পলিটিক্স ঢুকে গ্রামগুলোকে শেষ করেছে, মানুষগুলোকে অমানুষ করে তুলেছে। সবাই শুধু ধান্ধার তালে আছে। একদিকে অপারেশন বর্গা একদিকে গ্রামপঞ্চায়েত, তার সঙ্গে পার্টির দলাদলি—শান্তি বলে আর কিছু নেই। দাদারা মদত দেয়, পুলিসে চোখ বুজে থাকে। সেই যে আমাদের দীনু কীর্তুনী গান গাইত মনে আছে তোর, রাজার নন্দিনী প্যারী যা করিস তাই শোভা পায়, এও হয়েছে তাই।

পরিতোষ আর এর উত্তর কী দেবে? তাই প্রসঙ্গ পালটায়। বলে, তোমার ইস্কুলের খবর কী?

ইস্কুল! হায় কপাল! তা জানিস না বুঝি? মাস ছয় হল ষাট বছর বয়েসের ছুতোয় রিটায়ার করিয়ে দিয়েছে তো। এখনকার আইনটাইন কেমন জানিস? 'ভালো করতে জানি না মন্দ করতে জানি।' এদিকে জরাজীর্ণ স্কুলবিল্ডিংখানার দালান ধসে পড়েছে, বর্ষায় ক্লাসরুমে জল পড়ছে, কর্তাদের কাছে বলে বলে হদ্দ, তা সেদিকে কেয়ার নেই। আইন জারি হয়ে গেল, বুড়োহাবড়া মাস্টারদের আর রাখা চলবে না। খেদিয়ে দাও তাদের। ষাট বছর বয়েস হলে নাকি বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যায়। অথচ মনে কর আমাদের শ্যামবাবু? সত্তর বছর পর্যন্ত দাপটে পড়িয়ে গেছেন। কী সেই পড়ানো। এখনও ভাবলে রোমাঞ্চ আসে। নয়নপুর হাই স্কুলের প্রথম থেকে পড়িয়েছেন। তখন তো আর এসব আইন ছিল না?

বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হন ভবতোষ। বলতেই থাকেন, আরে বাবা দেশের ভোটদাতারা যদি হঠাৎ আইন জারি করে বসে, 'বুড়োহাবড়াদের মন্ত্রী থাকা চলবে না'—তা হলে? ক'জন টিকবি তোরা? যত সব ঘাড়-নড়বড়ে বুড়োরাই তো গদি আঁকড়ে বসে আছে. শ্বাস উঠছে তবু নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে। যেন তাঁদের আর বয়েস হলে বুদ্ধি ঘোলাটে হয়ে যায় না, বাহাত্তুরে ধরে না। সবাই ভগবানের বরপুত্তর। হুঁ, আসল কথা হচ্ছে এসব আইন জারির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের পেটোয়া লোকেদের জন্যে জায়গা খালি করা। যাক গে মরুক গে। দিন দিন অ্যাটমোসফিয়ার যা হয়ে উঠেছিল মানমার্যাদা রেখে কাজ করা দায় হয়ে উঠছিল। তবে

'নয়নপুর হাই স্কুলে'র বারোটা বেজে গেছে। আরে বাবা, মাস্টারদের যদি ছেলেদের বিদ্যেসাধ্যি শিক্ষা না দিয়ে উদ্দেশ্য হয় শুধু 'পার্টি পলিটিক্স' শিক্ষা দেওয়া, তা হলে?

ভবতোষ মাস্টারের বাচনভঙ্গিই এই। যদি কোনও প্রসঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, তখন এমনভাবে কথা বলেন যেন প্রতিপক্ষ সামনে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু সত্যি যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার কানের মধ্যে কি এত সব জোরালো কথাগুলো ঢুকছে?

নাঃ ঢুকছে না। তার কানে একটু আগে শোনা যে খবরটা বুকে ঠাঁই করে হাতুড়ি বসিয়েছে, তার ধাক্কাতেই কান আর কাজ করছে না। মনের মধ্যে ঝনঝন করছে সেই হাতুড়ির শব্দটা, 'মাস ছয় আগে রিটায়ার করিয়ে দিয়েছে।'

তার মানে লতিকার অনুমানই সত্যি।

তা হলে? কী ভাবে সেই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

এই সময় লতিকা ঘরে ঢুকল। এক হাতে চায়ের কাপ আর অন্য হাতে একটা রেকাবিতে দুটো গুলি রসগোল্লা আর দু'খানা বিস্কুট।

সেন্টারপীসের ওপর সাবধানে সেটি নামিয়ে রেখে, হেঁট হয়ে একটু প্রণাম করে বলল, ভালো আছেন তো বড়দা?

প্রভাতসূর্যের মতো মুখ।

পরিতোষ হাঁ করে তাকায় সেই মুখের দিকে।

লতিকা বলে চলে, রান্নাঘরে গ্যাস ফুরিয়ে বসে আছে, তাই চা আনতে এত দেরি। তা আপনি তো বাজারের খাবার পছন্দ করেন না, তাই শুধু এই আনলাম। জনতা জেলে কোনওমতে চায়ের জলটা হল। এরপর উনুন জ্বেলে তবে রান্নাবান্না।

ভবতোষ ব্যস্ত হয়ে বলেন, ঠিক আছে ঠিক আছে। এই তো বেশ।

'উনুন জ্বালা' যে একটা ভয়াবহ ঘটনা, সেটা তেমন অনুধাবন করতে পারলেন না বলেই বোধ হয় সে বিষয়ে কিছু বললেন না।

লতিকা আর এক ম্যাজিক দেখাল। পরিতোষের দিকে তাকিয়ে অমায়িক গলায় বলল, ছুটি রয়েছে তো। একবার বাজার যাও দিকি, যদি ভালো ফ্রেশ মাছ পাও। বড়দা তো আবার ফ্রীজের মাছ তেমন—ইয়ে করেন না। ইলিশ পেলে তো খুবই ভালো হয়। অবিশ্যি ষাটের নীচে কিলো হবে না। না হোক, নয়নপুরে বোধ হয় ইলিশটিলিশ পাওয়া যায় না। একদিন আমরাও না হয় বড়দার অনারে ইলিশ খেয়ে নেব।

ভবতোষ খুব ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, না না, আমার জন্যে এসব কিছু করতে হবে না। আমি মানে—

লতিকা বলে, না না। কতদিন পরে এলেন!

পরিতোষ কি স্বপ্ন দেখছে?

নিশ্চয় তাই। না হলে এখনও কেন শুনতে পাচ্ছে, আঃ! ইলিশের মাথা দিয়ে জম্পেস করে পুঁইশাক চচ্চড়ি। কতদিন যে খাওয়া হয়নি! বড়দা, আপনি ইলিশের মাথা দেওয়া পুঁইশাক চচ্চড়ি ভালোবাসেন না?

ও বাবা, বাসি না আবার! তো পাচ্ছি কোথায়? উঠোনে না হয় পুঁইয়ের বৃন্দাবন, কিন্তু ইলিশ? নামই ভুলে গেছি। নয়নপুরের যে কী হাল হয়েছে আজকাল যদি দেখতে!...তা পরিতোষ, তোদের এখানে তো পাওয়া যায় বাবা। বৌমা এত ভালোবাসেন!

বৌমা অভিমানভরে বলে ওঠেন, বলুন না আপনার ভাইকে। দিন দিন এত কিপটে হয়ে যাচ্ছে!

পরিতোষ নিঃশ্বাস ফেলে, কিপটেই বটে! বাজারটি কী পড়েছে, তা যেন জানো না!...কী বলব বড়দা, কী ভাবে যে সংসার চালাতে হচ্ছে তা ভগবানই জানেন। এই যে তোমার বৌমার বড় সাধ মেটাতে ওই টি.ভি.-টি আনা হয়েছে—তার জন্যে খেসারৎ দেওয়া হচ্ছে সবদিকে ছাঁটাই চালিয়ে। এর ওপর আবার একই সঙ্গে দুই ছেলের পরীক্ষার ফী দেবার দিন এসে পড়ল। কোথা থেকে যে দেবো ভেবে কুল পাচ্ছি না!

বলতে বলতে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে পরিতোষ। যাক বাবা, লতিকা পরে বলতে পারবে না তুমি তেমন শক্ত হওনি।

ছেলেদের নাম শুনেই যেন সচকিত হল ভবতোষ। বলে ওঠেন, আরে তাই তো। কই তারা? তিনটের কাউকেই তো দেখছি না।

পরিতোষ এদিকে ওদিক তাকিয়ে বলে, এখনও বোধ হয় ওঠেনি—

অ্যাঁ। সে কি? এখনও ওঠেনি? এতখানি বেলা? না না, ভেরি ব্যাড—এখন বদ অভ্যাস তো ভালো না।

পরিতোষ পরিস্থিতি সামাল দিতে বলে, মানে রবিবার পেয়েছে তো? তাছাড়া রাত জেগে পড়ে পড়ে ভোরের দিকে—

ভবতোষ দরাজ গলায় বললেন, তা হোক। বৌমা, ওদের উঠিয়ে দাওগে মা। বাবা বলতেন—রোদ ওঠার পর ঘুমোলে আয়ুক্ষয় হয়। তা পরীক্ষাটা কার কী?

ওই তো! শুভ ধ্রুব দুটোরই একই সঙ্গে মাধ্যমিক। শুভটা একবার ক্লাসে উঠতে না পারায়—

লতিকা ফোঁস করে উঠে বলে, ক্লাসে উঠতে পারেনি ইচ্ছে করে নয়। অসুখের জন্যেই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই তো। আর টুকাইয়ের তো রোজই পরীক্ষা।

ও বাবা! তিনি আবার এত বড় হয়েছেন। কই বৌমা, ডাকো ডাকো, দেখি। আমার আবার আজ তাড়া আছে।

'তাড়া আছে!'

এ কি স্বর্গীয় ভাষা!

লতিকা তো ভাবলই, হয়তো পরিতোষও ভাবল—সারাদিনব্যাপী একটা 'সামাল দেওয়ার' খাটুনি থেকে রেহাই পাওয়ার আশ্বাসে। দিব্যচক্ষে তো দেখতেই পাচ্ছে, লতিকার বেজার মুখ, ছেলেমেয়েদের অবজ্ঞামিশ্রিত বিদ্রূপ হাস্যরঞ্জিত মুখ, তার সঙ্গে বিরক্তিও। যেটা আগে আগে দেখেছে।

লতিকা এখন যে কোন ভাবভাবনায় এমন গায়েপড়া ভক্তিগদগদ হচ্ছে আর দরাজ হচ্ছে—সেও তো একটা রহস্য! মানে মানে চলে গেলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।

এ তো আর লতিকার মিলিটারি মেজদাটি নয় যে, কদাচ কখনও এসে পড়লে বাড়িতে সাড়া পড়ে যাবে। লতিকা কৃতার্থমনা হবে, ছেলেমেয়েরা মামার মহিমা কাহিনী শুনতে শুনতে বিগলিত হবে, আর রান্নাঘরে জামাই-আদরের সমারোহ পড়ে যাবে। এ পরিতোষের গাঁইয়া দাদা।

তবু ক্ষীণভাবে বলল পরিতোষ, তাড়া আছে মানে? না খেয়েই চলে যাবে নাকি?

ভবতোষ বিপন্ন গলায় বলেন, সেই তো মুশকিল। তোর বৌদির দিদিটি যে অবিরতই

পত্রাঘাত করেন সাতজন্মে আসি না বলে। এবারে একেবারে বাকদত্ত করিয়ে নিয়েছেন কলকাতায় এলে যেন ওনার কাছে উঠি, খাওয়াদাওয়া করি। কথা না রাখলে আবার তোর বৌদির গোঁসা হবে। তাছাড়া ওই দিদির বাড়ি যাওয়ার একটি মোক্ষম কারণও আছে। তোর বৌদির একটি অর্ডার—কী রে? এতক্ষণে জমিদারবাবুদের ঘুম ভাঙল? ওরে বাবা, রাত জেগে পড়ার থেকে ভোরে উঠে পড়া অনেক ভালো। ভোরে মাথা পরিষ্কার থাকে। বলছিলাম তোদের মাকে, আমার বাবা বলতেন রোদ ওঠার পর ঘুমোলে আয়ুক্ষয় হয়। আরে মা-লক্ষ্মী, আয় আয়। কত লম্বা হয়ে গেছিস রে?

পরিতোষের দুই ছেলে এবং মেয়ে হাই তুলতে তুলতে এবং চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে দাঁড়িয়েছে।

পরিতোষ প্রত্যাশা করছিল লতিকা বোধ হয় প্রণাম করতে ইশারা করবে। কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণ হল না। দেখল লতিকাও একটু হাই তুলল। বোধ হয় স্বস্তির হাই।

ছেলেমেয়ে তিনটে কয়েক সেকেন্ড ঠ্যাঙা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ উল্টো পাক খেয়ে যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পায়জামার পা এবং ঝুলে থাকা দড়ির লটপটানি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই অবস্থাতে কী আছাড় না খেয়ে নিরাপদে হেঁটে যেতে পারল?

লতিকা উঠে দাঁড়িয়ে আদুরে অভিযোগের গলায় বলল, বড়দা, তাহলে থাকছেন না তো! আশা করেছিলাম আপনার অনারে একদিন সবাই মিলে একটু ভালোমন্দ খাওয়া যাবে। কপালে নেই। আর একটু চা খাবেন?

ভবতোষ বললেন, না না, বার বার চা খাওয়া ধাতে সয় না।

লতিকা ভিতরে ঢুকে গেল বুক থেকে পাহাড় নামার অনুভূতি নিয়ে। এরপরও কি আর ভাইকে একা পেয়ে কিছু চেয়ে বসতে পারবেন?

কিন্তু লতিকার হিসেবের ভুল। চেয়েই বসলেন ভবতোষ মাস্টার। ভাইয়ের হাতটা ধরে চাপা আবেগের গলায় বললেন, আমার একটা কথা রাখতে হবে পরি।

মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবির ভিতরঘরের বুকপকেট থেকে একগোছা নোট বার করে গভীর নির্বেদের গলায় বললেন, এটা রাখ।

খান আষ্টেক একশো টাকার নোট।

জোর করে ধরিয়ে দিতে যান পরিতোষের হাতে।

হতভম্ব পরিতোষ হাঁ করে বলে, রাখবো মানে?

এতক্ষণে আবেগরুদ্ধ ভবতোষ মাস্টার নিজের 'ফর্মে' চলে এসেছেন। সেই সহজতায় বলেন, রাখবি মানে 'রাখবি'! এর আবার মানে কী রে?

তবু পরিতোষ বোকাটে গলায় বলল, রেখে? তারপর?

হা-হা-হা।

তারপর আবার কী? হা-হা। খরচ করবি।

তোমার রাখা টাকাগুলো আমি খরচা করব?

কী আশ্চর্য! তোমার টাকা আমার টাকা কী রে পরি? দরকারের সময় খরচা করবার জন্যেই তো টাকা!

এখন পরিতোষও ফর্মে আসে, টাকাটা তুমি আমায় দেবে বলে নিয়ে এসেছিলে?

আহা, কী মুশকিল। আমি কি তাই বলেছি? এসেছিলাম একটা ফালতু ব্যাপারের জন্যে, সে

এমন কিছু না। তুই নে তো। চটপট তুলে ফেল্ বাবা। মানী বাবুদের চোখে পড়লে হয়তো মানের হানি হবে। জানি তো আজকালকার ছেলেপুলেকে।

ভবতোষ মাস্টার একটু ফালতু কাজের জন্যে আটশো টাকা নিয়ে কলকাতা সফরে এসেছেন? কথাটা বিশ্বাসযোগ্য?

পরিতোষ ঠান্ডা গলায় বলে, সেই ফালতু কী তাই শুনি।

আরে বাবা, বলিস কেন। তোর বৌদির ওই দিদির বড় ছেলেটা বুঝি চাকরিবাকরি না পেয়ে একটা স্টিলের ফার্নিচারের দোকান করেছে। আর যেই সে খবর কানে গেছে তোর বৌদির, অমনি মনে পড়ে গেছে জীবনভোর নাকি ওঁর একটা লকারওলা স্টিলের আলমারির সাধ। বোঝো ব্যাপার! একেই বলে কিনা, 'শুনলো সাড়া তো নিলো পাড়া'। সারাজীবন মনে পড়ল না, যেই বোনপো দোকান দিল—আসলে খুব নাকি বুঝিয়েছে বিনালাভে দেবে, ভালো জিনিস দেবে। শুনিস কেন ওসব কথা। বরং মাসিকেই বেশি করে ফাঁসিতে লটকাবে। হুঁ, জানা আছে সব তো। ভাবলাম যাকগে, মরুকগে মেটাক সাধ। রিটায়ারের সময় গোটাকতক টাকা পাওয়া গিয়েছিল।

পরিতোষ গম্ভীর গলায় বলে, আমায় মাপ করো বড়দা।

মাপ করব!

ভবতোষ আহত গলায় বলেন, তার মানে তুই আমায় পর ভাবিস!

না না।

পরিতোষের গলাটা হঠাৎ ভাঙা ভাঙা শোনায় বৌদির চিরকালের সাধ—

ছাড় তো। মেয়েজাতটার সাধের কথা বাদ দে। সাধের যদি কোনও মাথামুণ্ডু থাকে। চিরকেলে ইস্কুলমাস্টারের বাড়ি, শুধু দুটো বুড়োবুড়ির সংসার—কী এত রাজঐশ্বর্য আছে রে যে একটা লকারওয়ালা স্টিলের আলমারি না হলে চলবে না! আমাদের যা কিছু সম্পদ সম্পত্তি তা এই আলমারির মধ্যে রাখা থাকে রে পরি, বুঝলি!

বলে সহাস্যে আপন বুকের ওপর একটি চাপড় মারে ভবতোষ।

বড়দা!

আঃ! আবার সেই বাচ্চাবেলার মতন বড়দা বড়দা! বলি তোর এই চারদিকে টানাটানির সময়, ছেলেদের পরীক্ষার ফী লাগবে, দুশ্চিন্তায় সারা হচ্ছিস, এর থেকে তোর বৌদির স্টিলের আলমারিটা জরুরি হল?

হাতিয়ার

যাক্ মিটে গেল এতদিনের লড়াই।
রায় বেরিয়ে গেল হাইকোর্ট থেকে।

থামল উকিল-অ্যাটর্নির কচ্‌কচি! কম দিন তো চলেনি এক কচ্‌কচি। দশ দশটি বছর। কত কত টাকাই ওনাদের পেটে গেছে।

যে যার মক্কেলকে তাতিয়ে তাতিয়ে আর আশ্বাস দিয়ে দিয়ে তুচ্ছ একটা বসতবাড়ি ভাগের মামলাকে জজকোর্ট থেকে হাইকোর্টে তুলিয়াছিলেন তো ওঁরাই।

তা এটাই তো ওনাদের পেশার পবিত্রতম কর্তব্য। মক্কেলের জেদের অগ্নিকে অনির্বাণ রাখা। বিশেষ করে বিষয় সম্পত্তির শরিকি মামলার তা সে সম্পত্তি বড়ই হোক আর ছোটই হোক। সম্পত্তিটা তো আর ক্রমশ প্রধান থাকে না, বিষয়টাই প্রধান হয়ে ওঠে অর্থাৎ জেদটা।

হয়তো বা কখনও ভাগের বাড়ির কোথাও কোনওখানের দেওয়ালের একটা বে-আইনি জানলা ফোটানো নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে, দেওর জে, এমন কি ভাসুর ভাদ্রবৌয়েও দশ বিশ বছর মামলা চালিয়ে চলেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

মক্কেল যদি বা ভাবে, 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি ওনারা মনে মনে বলবেন, ছাড়ব কি বলুন? আপনার পকেটে টাকা থাকতে থাকতে ছেড়ে দেব?

বৈঠকখানা রোডের ঘোষ চৌধুরী বাড়ির রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরী বনাম ইন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরীর বসতবাড়ি ভাগের মামলাটা এইভাবেই এই দশ দশটি বছরে এসে পৌঁছেছিল।,

লড়াইয়ের শুরুর সময় দুপক্ষের আত্মজন কৌতূহলে উদগ্রীব হয়ে থেকেছে, কে হারে কে জেতে। কিন্তু লড়াইয়ের বিলম্বিত দীর্ঘ লয়ের ভঙ্গিতে সে কৌতূহল ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়েছে। ক্রমে লোকে ভুলেই গেছল, কোথায় কোন রণাঙ্গনে একটা যুদ্ধ চলছে।

দৈনন্দিন জীবনে তো যুদ্ধরতদের কারো কোনও ত্রুটি দেখা যায় না। বিধবা রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরী সকালে গাড়ি বার করিয়ে গরদের থান পরে নিত্য গঙ্গাস্নানে যান। কালীঘাটে, ঠনঠনে কালীতলায় পূজা চড়ান আর বিয়ে হয়ে যাওয়া একমাত্র মেয়েটিকে বছরে সাত মাস শ্বশুরবাড়ি থেকে আনিয়ে মেয়ে-জামাই নিয়ে আদার সোহাগ করেন। ব্যাচিলার ইন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী সকালে গাড়ি বার করিয়ে বাপ ঠাকুর্দার আমলের প্রেসটাকে দেখাশুনো করতে যায়, উকিল

অ্যাটর্নির সঙ্গে শলাপরামর্শ করে, আর সন্ধ্যায় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নিয়মিত গান-বাজনার আসর বসায়। এটাই ওর নেশা।

বাপ যোগীন ঘোষ চৌধুরী মরার আগে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন এইভাবে—

তিন পুরুষের ওই প্রেসটার মালিকানা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ইন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরীর, আর সেই বাবদ খেসারতের নগদ টাকা প্রাপ্য হবে প্রথমপক্ষের পুত্রবধূ রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরীর। রাজেশ্বরীর চলে সুদের টাকায়, আর ইন্দ্রনাথের চলে প্রেসের আয়ে।

কিশোর বয়সে ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে একটা মোক্ষম ক্ষত ঘটে যাওয়ায় ইন্দ্রনাথ বিয়ের গররাজি। বলেছিল, জানি, আমাদের সমাজে একটা খোঁড়া ন্যাংড়াকে বিয়ে করতেও মেয়ের অভাব হবে না, তবে, আমি ব্যাটা খুঁড়িয়ে ছাঁদনা তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারব না। অতএব, তার এই একক জীবন।

কিন্তু সুখের কোনও ঘাটতি ছিল না।

জাঁদরেল যোগীন ঘোষ চৌধুরীর কাছে বিধবা রাজেশ্বরী ছিল নম্র নতনয়না ভয়ে ভীত বৌমানুষ মাত্র। যদিও তখন তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। যোগীন যোঘ চৌধুরীর সাধেই সাততাড়াতাড়ি হয়েছিল বিয়েটা।

আর ইন্দ্রনাথ? সে দ্বিতীয়পক্ষের হলে কী হবে সে তো শৈশবে মাতৃহীন। সে তো সাধ্যপক্ষে বাপের ছায়া মাড়াত না, যা কিছু বক্তব্য সমবয়সী সতাতো বৌদির কাছে।

বড়ো যোগীন ঘোষ চৌধুরীর নানাবিধ মুদ্রাদোষ কৃপণতা, সেকেলেপনা—এই সব নিয়ে দ্যাওর ভাজে আড়ালে হাসাহাসি চলত বিলক্ষণ।

কিন্তু পটভূমিতে আশ্চর্য বদল ঘটে গেল যোগীন ঘোষ চৌধুরীর মরার সঙ্গে সঙ্গেই। এতদিনের সখ্যতার সম্পর্কের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে গেল সাপে-নেউলে।

প্রথম আগুনটা জ্বালল অবশ্য রাজেশ্বরী।

বলল, মাথার ওপর থেকে ছাতা সরে গেছে, বাড়িতে ইয়ার-বন্ধু নিয়ে গান-বাজনার আড্ডা বন্ধ করতে হবে।

'ইয়ার' শব্দটা শুনেই অপর পক্ষের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। বলল, মাথার ওপর ছাতা কারো চিরকাল থাকে না। ধরে নিতে হবে এখন আমিই ছাতা। ওসব বন্ধটন্ধ হবে না।

ভাজ বলল, করতেই হবে বন্ধ। আমার অসুবিধে হচ্ছে।

দেওর বলল, গান-বাজনার যার অ্যালার্জি সে কানে তুলো গুঁজে থাকুক গে।

শুধু কানে তুলো গুঁজলেই তো হবে না, বাড়ি থেকে বেরোতে আসতে আমার অসুবিধে। সর্বদা তোমার বৈঠকখানায় লোক। তুমি তাহলে বাড়ির পিছনের অংশে আড্ডা গাড়োগে।

সামনেটায় আমি থাকি। সর্বদা চক্ষুশূল দৃশ্যটা দেখতে হবে না।

বাকযুদ্ধটা চলতে লাগল এই ভঙ্গিতে—

ইন্দ্রনাথ বলল, মামার বাড়ির আদর। উনি মেয়েছেলে, সদর বাড়িতে থাকবেন, আমি পুরুষসিংহ অন্দরে। আমার বাপ-ঠাকুরদার ভিটে, আসল অধিকার আমার। উড়ে এসে জুড়ে বসে আবার ফুটানি। মেয়েমানুষের আবার হরঘড়ি এত বোরোনোই বা কেন?

বেরোব না তো কি হারেমে বসে থাকব? তোমার ফুটানিও তো আর একজন উড়ে এসে জুড়ে বসার দৌলতে। তাও তিনি বেঁচে থাকলে মান্য সৌজন্যের দায় ছিল। এখন তোমায় মান্য

করার দায় আমার কীসের? চিরকাল সবাই জানে জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠভাগ। সামনেটা আমায় ছেড়ে দিতে হবে।

অত আহ্লাদে কাজ নেই। আমি যেখানে আছি থাকব।

আমি একা বিধবা, আমাকে দেখা শুনো করার জন্যে মেয়ে জামাইকে কাছে রাখতে চাই। ডাক্তার জামাই তার একটা চেম্বার খোলা দরকার। আর সেই জন্যেই আমার সামনেটা দরকার।

জামাই এসে দেখ-ভাল করবে? ওই আনন্দেই থাক। কথায় বলে 'যম-জামাই-ভাগনা। তিন হয় না আপনা। ব্যাটা মিত্তিরের পো, ঘোষ চৌধুরীদের ভিটের ঘুঘু চরাতে আসবে। ও সব চলবে না।

তুমি বললেই চলবে না? বাড়িতে অধিকার নেই আমার?

আছে। তোমার ওই রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘরের এলাকায় জামাইয়ের চেম্বার খুলে দাও গে, সদরটদর পাবে না।

রাজেশ্বরী বলল আচ্ছা পাই কিনা দেখি।

নালিশ ঠুকল রাজেশ্বরী। বক্তব্য এই—

বাড়িতে সর্বদা ছোট কর্তার লোকজন, বিধবা রমণী, কালীগঙ্গা করতে, সন্ধ্যায় পাঠবাড়ি যেতে, সদর তো ডিঙোতেই হয়। ঘোরতর অসুবিধে ঘটে সর্বদা বাজে লোকজনের উপস্থিতিতে। আর একা মহিলা একজন অভিভাবক থাকা দরকার জামাই-মেয়েই সেই অভিভাবকের কাজ করবে। আর যেহেতু জামাই ডাক্তার, সেইহেতু ইত্যাদি।

নালিশ ঠুকলে মামলায় নামতেই হবে। ইন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী তো আর সুড়সুড় করে সদর ছেড়ে দিয়ে অন্দরে ঢুকতে যাবে না।

হলেও তার এই সব মামলা মোকদ্দমা দুচক্ষের বিষ।

একবার উকিল-অ্যাটর্নির হাতে গিয়ে পড়লে বিষ আর অমৃত। তখন ডুবেছি না ডুবতে আছি। দেখি পাতাল কতদূর।

প্রথম প্রথম রাজেশ্বরীর তিন কুলের আত্মীয়জন রাজেশ্বরীকেই সমর্থন করেছে। বলেছে সত্যিই তো মাথার ওপর গার্জেন নেই। বাড়িতে সর্বদা বাইরের লোকের হই-হুল্লোড়ে অসুবিধে বই কী? ন্যাংড়া যখন বাইরে ঘোরাফেরার নেই ইন্দ্রনাথ বাড়িতেই আড্ডা তো থাকুক গিয়ে পিছনের অংশ। গ্রীষ্মের দিন রাস্তার ওপর খাড়া হয়ে থাকা দোতলার গাড়িবারান্দায় যত মজলিশ, রাজেশ্বরীকে বাড়িতে ঢুকতে বেরোতে ওদের চোখে পড়তে হয় এটা অন্যায়।

আবার ইন্দ্রনাথের দুই কুলের আত্মীয়জনেরা রাজেশ্বরীর অন্যায় আবদারের নিন্দাবাদ করেছে, এবং ইন্দ্রনাথকেই উৎসাহ জুগিয়েছে।

কিন্তু পরের গোয়ালে কে কতদিন ধোঁয়া দিতে পারে?

ইন্দ্রনাথের তো আবার মাত্র দুটোই কুল। আসল কুলটাই শূন্যি। পুরুষের শ্বশুরকুলটাই তো আসল কুল যারা তার স্বার্থরক্ষায় যথার্থ যত্নবান।

তা সে সবই তো তামাদি কথা।

হাঁড়ি আলাদা হওয়া? সেও তো তামাদি কথা।

মামলা ঠোকার পরই ইন্দ্রনাথের হিতৈষীরা (প্রধানত পড়শিরা। তিন পুরুষের বসবাসের পাড়ায় পড়শিরাই জ্ঞাতি) গলা খাটো করে বলল, কী আশ্চর্য! এখানে এক রান্নঘর। আর তার

তদারকিতে বড় গিন্নী। শত্রুতার বশে কী করে বসতে পারে ঠিক আছে?

ইন্দ্রনাথ অবাক হয়ে বলেছিল মানে?

মানে আর কী বলব? মেয়েমানুষ হচ্ছে কালনাগিনীর জাত, শত্রুতা সাধনে বিষ দিয়ে বসলে?

কী? বিষ?

ইন্দ্রনাথ হো হো করে হেসে বলেছিল, পাগলের মতো কথা বলবেন না। হাঁড়ি আবার এক কী? ওনার তো কোন্ কাল থেকে হাঁড়ি আলাদা। একবেলা আলোচালের একপাক পিণ্ডি গিলতেই তো দেখি।

বলি তোমার ব্যবস্থাটি তো ওরই হাতে?

তো কার হাতে থাকবে শুনি? নিজের হাতে নিতে যাব?

অবুঝে বোঝাব কত, বোঝ নাহি মানে—'

হিতৈষীরা বিরক্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

কিন্তু স্বয়ং আসামিই এসে বলে উঠল, বুঝলেন ছোটবাবু কাল থেকে হাঁড়ি ভেন্ন।

তোমাকে আবার কে এইসব পরামর্শ দিতে এল?

পরামর্শ দেবার লোকের অভাব? দিকে দিকে তোমার শুভানুধ্যায়ী নেই? তাদের প্রাণে ভয় নেই যদি সহজে শত্রু নিপাত করতে খাবারের বিষ দিই?

ইন্দ্রনাথ বলল, তিল তিল করে না খেয়ে মরার থেকে বিষ খেয়ে এক দিনে মরাটাই সুবিধে! কুমতলব ছাড়ো।

কিন্তু 'ছাড়ো' বললেই কি ছাড়া হয়?

দু'পক্ষের সমর্থকরাই চোখ কপালে তুলছেন, গালে হাত দিচ্ছেন। বড় গিন্নি এখনও সাতখানা প্রাণ নিয়ে 'ছোটবাবু'কে কাঁটা মাছ দেওয়া হয়েছে দেখে বামুন ঠাকুরকে তুলো ধুনছেন।

এসব কী? ন্যাকামি, না ঢং, না গভীরতর কোনও মতলব?

ইন্দ্রনাথের দুকুলের মধ্যে পিতৃকুলে এক পিসি, আর মাতৃকুলে দুই মাসি। তাঁরা বড়বৌয়ের এমন আচরণ দেখে শিহরিত হয়ে বললেন, ইন্দ্র এখনও সাবধান হ।

আবার ওদিকে গিয়েও বলে এলেন, এখন আর তোমার ইন্দ্রর খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো কেন বৌমা? ধাষ্টামো বৈ তো নয়!

অতএব পুরোনো ঠাকুর চাকর রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর সমেত সবটাই ইন্দ্রনাথের ভাগে রইল, রাজেশ্বরী দোতলায় পুজোর ঘরের সামনের বারান্দায় নিজের ব্যবস্থা করে নিল।

মেয়ে-জামাই এলে?

রাজেশ্বরী বলে, আমার এখানে তো মাছ-মাংসর পাট নেই। ইচ্ছে না নয়, সাবেকি হেঁসেলে কাকার এলাকায় খাও গে, আর ইচ্ছে না হয় তো হোটেল থেকে মাছ-ভাত আনিয়ে খাও।

মেয়ে বরাবর কাকার ন্যাওটা, এসব দেখেশুনে স্বস্তি পায় না, তবে ভবিষ্যতের রঙিন আশাটির লোভেই এতে সায় দিচ্ছে। বরের একটা ভালোমতো চেম্বার আর নিজের সেই ভাগের সংসারের একখানা ঘরের মালিকানা থেকে ঠাকুর্দার আমলের এই বৃহৎ বনেদি বাড়ির মালিকানা।

মেয়ে ঢোঁক গিলে বলেছিল, কাকার কাছে খেতে যাব কোন্ লজ্জায়?

লজ্জা হলে যাসনি।

কিন্তু লজ্জা নেই ইন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী নামের লোকটার। সে ভাইঝি এসেছে দেখলো অনায়াসে সকাল বেলা ডাক দেয়, এই বেবি, চা হয়েছে চলে আয়। তোর পুণ্যবতী মার ঘরে তো আর চায়ের সঙ্গে ডিমের পোচ্ ফ্রেঞ্চ টোস্ট্ পাবি না।

বাড়ি যতক্ষণ না ভাগ হচ্ছে ততক্ষণ সবই এক।

সেই সাবেকি খাবার ঘর, তাতে সেই যোগীন ঘোষ চৌধুরীর শখের গোলগড়নের মার্বেল পাথরের খাবার টেবিল পাতা। আমিষাহার এখানে ব্যতীত আর কোথায় চলবে?

পুরোনো ঠাকুর রামলাল বলে, খুকি-জামাইবাবুর জন্যে ভালো করে মাছ মাংস আনি, টাকা বার করুন তো বৌমা! জম্পেস করে সব রাঁধি।

রাজেশ্বরী টাকা বার করে দেন।

ইন্দ্রনাথ বলে, এই রামলাল, ওই টাকায় যদি বেবিদের জন্যে মাছ মাংস আনবি, তা তোর হাড়মাস আলাদা করব। নিয়ে যা আমার কাছ থেকে টাকা।

রামলাল হৃষ্টচিত্তে দুজনের কাছ থেকেই হাতায়।

এবং রান্না হলেই, ওদের ঘরে গিয়ে হাঁক পাড়ে—খুকি, জামাইবাবুকে নিয়ে চলে এসো। ছোটবাবু খেতে বসতে পাচ্ছেন না।

সবদিনই যে জামাইবাবু তা নয়। খুকি একাও যায়, বছর দুইয়ের ছেলেটাকে নিয়ে।

অথচ মামলা চলতে থাকে জোর তলবে।

বাড়ি ভাগ না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থার সুরাহা হবার আশা নেই।

তবে চক্ষুলজ্জার বালাই নেই রাজেশ্বরীরও।

তিনি অনায়াসে গলা তুলে বলেন, বেবি, খাবার আগে একটুখানি কিছু তোর কাকার সোহাগের কুকুরটাকে খাওয়াস।

শুনে বেবির মাথা টেবিলে ঠেকতে যায়।

ইন্দ্রনাথ বলে, শুনেছিস বেবি। তোর মার কথাবার্তা আজকাল কী সভ্য হয়েছে?

বেবি অধোবদনে বলে, কী করে যে এইরকম সব কথার্বাতা বলো তোমরা!

'আমরা'? আমি আবার কী? বল্ তোর গুরুভজা 'মা'টি।

ঝগড়া দুজনেই করেছ বাবা! তা যাই বল।

তা করব না তো কি বড়গিন্নি যা হুকুম করবেন শিরোধার্য করতে হবে? নে নে খা! চিতলের পেটিটা ফার্স্টক্লাস রেঁধেছে। জামাই ওবেলা আসবে তো?

বলেছে তো।

ইন্দ্রনাথ হাঁক পাড়ে রামলাল, এবেলার সব রান্না জামাইবাবুর জন্যে ফ্রীজে রেখে দিস।

ও তো আগেই রেখেছি।

তা এসব তো সেই তামাদি হয়ে যাওয়া কালেরই কথা তারপর গঙ্গার কত জল গড়াল। দশ-দশটা বছর তো কম নয়।

রাজেশ্বরীর রগের চুলে পাক ধরল, ইন্দ্রনাথের মাথার মাঝখানটা প্রায় ফর্সা হয়ে এসেছে, টাকের ওপর পাতলা ছাউনি। বেবির আর দুটো ছেলে মেয়ে হয়েছে। আর—জামাই শাশুড়ির

মহিমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তার পাড়ায় একটা আট বাই আট ঘর জোগাড় করে চেম্বার খুলে ফেলেছে।

প্রথম কোর্টে তো রাজেশ্বরীরই হার হয়েছিল।

সেই হারের খবরে ইন্দ্রনাথ গ্রামোফোন রেকর্ডে সাজ্জাদ হোসেনের সানাই বাজাল, লোকজন ডেকে খাওয়াল। বেবি আর তার বরকেও নেমন্তন্ন করেছিল, তারা আসেনি।

বেবি মাকে গঞ্জনা দিয়ে বলল, শুধু শুধু লোক হাসানো। কাকার দাবিই ন্যায্য ছিল। কাকা পুরুষমানুষ।

পুরুষ বলে মাথা কিনেছে? জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ সেটাই কি অন্যায্য কথা?

হেরে তো গেলে।

মায়ের হেরে যাওয়ায় মেয়েরও বরের কাছে মুখ হেঁট। আবার কাকার কাছেও সেই সহজ ভাবটা আসছে না।

মা অম্লানবদনে বলল, হেরে গেলাম বলেই কি ছেড়ে দেব নাকি? দাদারও দাদা আছে। নিচুকোর্ট থেকে হাইকোর্ট।

তা সেই 'দাদার দাদার' ছত্রছায়ার লড়ালড়ি চলেছিল এতদিন। দু কোর্ট মিলিয়ে দশ বছর।

সেই রায় বেরোল।

রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরী বনাম ইন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরীর শরিকি মামলায় রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরীরই জিৎ।

এতদিনে আবার লোকের ঝিমোনো কৌতূহলটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। আজ সকলের চকিত দৃষ্টি ওবাড়ির দিকে।

শেষ পর্যন্ত তাহলে বড় গিন্নিই জিতলেন?

তাই তো দেখা যাচ্ছে, ড্যাং-ডেঙিয়ে বাজনা বাজিয়ে কালীতলায় পুজো দিতে যাচ্ছেন যখন!

কেউ কেউ বিদ্রূপ করে বলল, আহা এক্ষুনি লড়াই ফুরিয়ে গেল? সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গেল না?

ইন্দ্রটার সে ক্যাপাসিটি থাকলে গড়াতো।

যাই বলো দুঁদে মেয়ে বলে একখানা। যতদিন শ্বশুর ছিল, যেন ভিজে বেড়ালটি। শ্বশুর মরতেই পাখা গজাল। তক্ষুনি গুরুদীক্ষা, পাঠ কেত্তন শুনতে যাওয়া নিত্যগঙ্গাস্নান। সবই শখ।

পুরোনো পাড়া। তিন পুরুষের বাস। ভিতরে ভিতরে বেশিরভাগ জনেরই সহানুভূতি ইন্দ্রনাথের দিকে, যতই হোক তারই বাপ-ঠাকুর্দার জিনিস। তারই অধিক অধিকার থাকার কথা। পাড়ার অনেকেই তার একদার খেলুড়ি।

এটা ঠিক ইন্দ্রর বড় ভাই চন্দ্রনাথ যখন বিয়ে করে বৌ নিয়ে এসে ঢুকেছিল, তখন ওই সামনের দিকটাই চন্দ্রনাথের জন্যে সাজানো গোছানো হয়েছিল।

ওই যে বড়রাস্তার উপর ফুটপাতের বুকে লোহার খুঁটি গেড়ে একখানা মার্বেলের মেজেওলা গাড়িবারান্দা বানিয়ে রেখে দিয়েছিলেন ঠাকুর্দা। তাতে তো অধিক রাতে চন্দ্রনাথ চাঁদের আলোয় বৌ নিয়ে এসে বসেছে।

বাপ যোগীন ঘোষ চৌধুরী তখন দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নি আর নাবালক ছেলে নিয়ে অন্দরের ঘরে। সেও এমন কিছু খারাপ নয়। বড় বড় জানলা-দরজার বড় বড় ঘর। সাজানো গোছানো পরিপাটি। পিছনে বারান্দাও আছে, তবে সে বারান্দায় দাঁড়ালে নীচের উঠোনে ঝিয়েদের বাসন মাজার দৃশ্য।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সব ওলটপালট।

বেবি জন্মাবার আগেই বৌ-মরা-কপালে' যোগীন ঘোষ চৌধুরীর দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নিও সিঁথিতে সিঁদুর আর পায়ে আলতা নিয়ে কেটে পড়লেন। আর বেবি জন্মাবার কিছুদিন পরেই চন্দ্রনাথ কেটে পড়লেন। দুদিনের জ্বরে।

যোগীন ঘোষ চৌধুরী একদিন বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে দেখলেন বিধবা বৌটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তাপানে হাঁ করে তাকিয়ে।

পরদিনই ঘর বদল, জায়গা বদল।

পিতাপুত্র এই সামনের দিকের দখলদার হলেন, বিধবা সেই শিশুকন্যা আর দাসী নিয়ে অন্দরের দিকে। অনেকদিনও ছিলেন। সে বেবির বিয়ে হওয়াও দেখে গেছেন তিনি।

তদবধি ইন্দ্রনাথের এদিকেই সন্ধেবেলায় নীচের তলার সামনের ঘরে গান বাজনার আড্ডা বসে। আর সকালে দুপুরে দোতলার মস্তবড় গাড়িবারান্দায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে বসে তাসের আড্ডা।

খোঁড়া ন্যাংড়া মানুষ করবেই বা কী?

পা থাকলে কি আর মাঠ ছেড়ে ঘরে বসতে আসত? ফুটবলই ছিল প্রাণ।

কিন্তু এমনি নির্লজ্জ মেয়েমানুষ রাজেশ্বরী যে, শ্বশুর মারা যেতেই সমবয়সি সতাতো দেওরটার সঙ্গে লড়াইতে নামল। পুরোনো দাবিতে শক্ত হল, 'জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠভাগ'। দাবিটা ছিলই তো এক সময়।

এত ভাব-ভালোবাসা এত গলায় গলায়, বাপকে শ্বশুরকে লুকিয়ে দুজনে কুলপি বরফ খাওয়া, একটা বই দুজনে ধরে গোয়েন্দা গল্প পড়া, আর ডালমুট ভুট্টাপোড়া অখাদ্যের পর্যয়ে পড়ে কিনা তাই নিয়ে তর্ক সব বানের জলে ভেসে গেল।

ভাবই দেখেছে সবাই। হঠাৎ এই সাপে নেউলে। আশ্চয্যি বটে। ভেবেছে পাঁচজনে। এবং এতদিন ধরে মামলার রায় বেরোনোর অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে ওদের কথা ভাবতে ভুলেও গেছে।

আজ সকালে কালীতলায় ড্যাডাং ডাং ড্যাডাং ড্যাং।

পাড়ার লোকেরা বলতে গেলে কেউই খুশি হল না। কেন হবে? একটা জাঁহাবাজ মেয়েমানুষের জয় আবার কে পছন্দ করে? মেয়েমানুষেও করে না। তবে বেবি আর বেবির বর খুশি হয়। বেবির এতদিনে বরের কাছে মুখ থাকল।

বেবি চওড়া লালপাড় গরদ শাড়ি পরে, বর আর ছেলে-মেয়েকে সাজিয়ে নিয়ে মার সঙ্গে পুজো দিতে গেল।

জামাই বলল, মা এখানের ঠাকুর মশাইকে দিয়েই একটা শুভদিন দেখিয়ে রাখলে হত না? মা যেন আকাশ থেকে পড়ল। কীসের জন্যে শুভদিন? তোমার ছেলের হাতে খড়ির?

মেয়ে বলল, কী যে বলো মা, কোন কাল থেকে ইস্কুল যাচ্ছে পিন্টু, হাতে খড়ি আবার কী? ওর চেম্বার খোলার দিনের কথা বলছি।

ও মা। তাই তো।

রাজেশ্বরী বলল, কীসের জন্য কী। তা মনেও ছিল না। ছুটতে নেবেছি, ছুটে চলেছি। থাক এখন এত কী তাড়া। শুভদিন তো পালাচ্ছে না।

পুজো দিয়ে দু'হাঁত ভরে প্রসাদী নির্মাল্য আর প্রসাদ নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন রাজেশ্বরী। গরদের থান ঘামে ভিজে। রুক্ষু চুলের ঢাল কাঁধ পিঠ ঢাকছে। বেবিরও অনেকটা তাই। বেশির মধ্যে ওর কপালের টিপ কপালে মাখামাখি।

গাড়ি থেকে নেমে ওপর দিকে তাকালেন রাজেশ্বরী।

না, বারান্দায় কেউ নেই।

সেকেলে ছাঁচের বাড়ি।

দালানের মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। উঠে পড়লে ডাইনে সদর, বাঁয়ে অন্দর।

রাজেশ্বরী দু'হাতে প্রসাদ নিয়ে বাঁক নিলেন ডাইনে।

বেবি বলল, এক্ষুনি ওদিকে যাচ্ছ মা?

মা বলল, ও মা তোর কাকাকে মা কালীর প্রসাদ দিতে যাব না?

কাকাকে প্রসাদ দিতে যাবে।

বেবির মার ওপর রাগে গা জ্বলে গেল।

নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

বলল, কাকাকে এ পুজোর প্রসাদ দিতে যাবার কী দরকার পড়ল মা?

মা বলল, প্রসাদ আবার এ পুজোর সে পুজোর কী রে বেবি? তাছাড়া আবার মানতের পুজোর প্রথম প্রসাদটা আর কাকে দেব বল? শ্বশুর-কুলে আর কে আছে?

যাও নিয়ে যাও। ছুঁড়ে ফেলে দিলে খুব ভালো হবে তো?

ছুঁড়ে ফেলে দেবে? তো আয় দ্যাখ্ কী করে ফেলে?

রাজেশ্বরী ঘরে এসে ঢুকলেন। দেখলেন, ইন্দ্রনাথ তার বাজনাগুলো এক জায়গায় জড়ো করেছে।

রাজেশ্বরী বললেন, এ মা! এখন তুমি হাত ময়লা করে এই ধুলো ঘাঁটছ? নাও, হাঁ করো মা কালীর প্রসাদ। এখন তো নির্ভয়ে খেতে পারো। আর তো বিষের ভয় নেই। মড়া মেরে খুনের দায়ে পড়তে যাব না তো।

ইন্দ্রনাথ নিঃশব্দে হাঁ করল।

রাজেশ্বরী বললেন, ঘরটা এমন লন্ডভন্ড করেছ যে।

ইন্দ্রনাথ বলল, চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সব খালি করে দিতে পারি।

তা এসব নিয়ে রাখবে কোথায়?

যে দিকটা আমার জন্যে ধার্য হয়েছে।

ও মা! শোনো কথা! সেদিকে আমার সব ছিষ্টি। হুট বলতে খালি করতে বসব? কবে পারবে বলে দাও।

রাজেশ্বরী সামনে এসে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথের দিকে জরিপ করার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে ওঠে খালি গায়ে তো দেখি না আর। চেহারার কী ছিরিই হয়েছে। মরে যাই। রামলাল বোধ হয় দেশে জমিজমা বাগান-পুকুর করে ফেলল।

রামলালের কথা থাক। তোমার কথাটাই বল। কবে তোমার ওদিকটা খালি পাওয়া যাবে?

রাজেশ্বরী গম্ভীরভাবে বললেন, যদি বলি কোনওদিনও না।

ইন্দ্রনাথ অবাক হয়ে বলল, হাইকোর্ট কি পুরো বাড়িটাই তোমার বলে রায় দিয়েছে?

মুখে একটু ভয়েরও ছায়া।

রাজেশ্বরী ছুঁৎমার্গ ভুলে, ওঁর খাটের ওপর বসে পড়ে বলে ওঠেন, এই বুদ্ধি আর এই মুরোদ দয়ে 'লড়কে লেঙ্গে' বলে আস্ফালন। হায়। হায়!

ইন্দ্রনাথ আস্তে বলল, নালিশ প্রথম আমি ঠুকতে যাইনি। তুমিই ঠুকেছিলে।

কেন ঠুকেছিলাম বল দিকি?

রাজেশ্বরীর মুখে ঈষৎ কৌতুকের হাসি।

ইন্দ্রনাথ অবজ্ঞার গলায় বলে, কেন আবার—অহঙ্কার। ওইটিই তো আছে চিরকাল। ষোলোর ওপর আঠারো আনা।

তা বেশ তাই-ই, অহঙ্কার। বলি একটা কিছু সম্বল তো থাকবেই মানুষের। যার কিছু নেই, তার অহঙ্কারটাই সম্বল। তায় আবার একটা উড়ে এসে জুড়ে বসার। বলি একটা বিধবা মেয়েমানুষের মাথাটা খাড়া করে দাঁড়াতে পায়ের তলায় একটা শক্ত মাটি দরকার কিনা? ওই মামলাটিই হয়েছিল রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরীর পায়ের তলার মাটি। ওটি না ধরলে, তোমার এই বেহেড সংসারে সারাদিন পুজোর ঘরে পড়ে থাকলেও কেউ তাকে এমন মান্যসমীহ করত? এমন পুজ্যি করত? ও তুমি বুঝবে না হে। তবে এখন আমার এই সাফ কথা, এখন আর ঠাঁই নাড়ানাড়ি পোষাবে না আমার। দীর্ঘকাল যাবৎ যেখানে শেকড় গেড়ে গেছে সেখানে থেকে নিজেকে উঠিয়ে এনে নতুন করে শেকড় নামাই এত শক্তি নেই। যে যেখানে আছি সে সেখানে থাকব, ব্যস।

যে যেখানে আছি, তাই থাকব?

ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে উঠে চড়াগলায় বলে, আর আমি যদি তা না মানি?

রাজেশ্বরী রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গিতে একটু হেসে বলে, তাহলে তুমি আবার বেআইনি দখলকারিণী রাজেশ্বরী ঘোষ চৌধুরীর নামে উচ্ছেদের নালিশ ঠোকো গে। তাতে আরও পাঁচটা বছর কেটে যাবে।

ইন্দ্রনাথ আবার বসে পড়ে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, তাহলে এত দিনের এত কাণ্ড, সব মিথ্যে?

মিথ্যে কেন? জেতাটা বুঝি কিছু নয়? লড়াইয়ের মজাটা কিছু নয়?

আর তোমার জামাইয়ের চেম্বার?

জামাইয়ের চেম্বার। ওটা আবার সত্যি নাকি। ও তো মামলার একটা হাতিয়ার। খলের তো একটা ছল চাই?

হেসে ওঠেন জোর গলায়।

জামাইকে এনে ভিটেয় প্রতিষ্ঠা করব? এতো আহাম্বক ভাবো আমায়? তাহলে আমার স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে?

বৈরাগ্যের রং

গেরুয়াধারী, তবে জটাজুটধারী নয়।

আধুনিক সন্ন্যাসীরা যেমন হয়ে থাকেন তেমনি আর কি! চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি, পায়ে হরিণের চামড়ার শৌখিন চটি। গেরুয়ার ঔজ্জ্বল্যে ধরা পড়ছে জমিটা রেশমি। বেনারসগামী ট্রেনের একখানি ফার্স্ট ক্লাস কামরার একটা জানালার ধারে বসেছিলেন স্বামীজী।

সঙ্গে একটি চামড়ার সুটকেস, খানা-দুই ইংরেজি ম্যাগাজিন, একটি পাতলা কম্বলে জড়ানো পাতলা ধরনের দুটি মাথার বালিশ।...কৃচ্ছ্রসাধনের কাল এঁদের পার হয়ে গেছে। বিলাসিতা আর কৃচ্ছ্রসাধনের ভেদ লুপ্ত হয়েছে। জ্ঞানী সন্ন্যাসী।

স্বামীজী বেনারসে চলেছেন একটি ধর্মীয় সম্মেলনে যোগ দিতে। তিনদিন ব্যাপী সেই সম্মেলনে নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ত মিলিত হয়ে কীভাবে অধঃপতিত হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার সম্ভব সেই আলোচনা করবেন। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন এখনও ছাড়েনি, তবে ছাড়ে ছাড়ে। চার বার্থের এই কামরাটার একটা বার্থ তাঁর দখলে, বাকি তিনজন দখলদার এখনও এল না দেখে একটু বিস্মিত হচ্ছিলেন স্বামীজী। যদিও সন্ন্যাসীর বিস্ময় বা কৌতূহল নিষেধ, তবু গাড়িটা প্রায় নড়ে উঠতে দেখে স্বামীজী উঠে দাঁড়িয়ে দরজার পাশে ঝোলানো রিজার্ভেশন স্লিপটা আর একবার দেখে নিলেন। হ্যাঁ স্লিপটা এখনও ঝুলছে। আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা রয়েছে মিসেস মুখার্জি, মিসেস ব্যানার্জি, এন্ড মাস্টার চ্যাটার্জি। তিনটি সহযাত্রীর মধ্যে দুটি মহিলা আর একটি বালক দেখে বিশেষ খুশি হননি স্বামীজী। কেবলমাত্র পুরুষ হলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, অবাঙালি হলেই আরও ভালো। কিন্তু এল কই এরা?

যথারীতি ঘণ্টা পড়া শেষ হয়ে গাড়িটা একবার ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠতেই স্বামীজীর বুকটা নিতান্ত স্বার্থপর সংসারী জীবের মতোই একটা স্বস্তির নিশ্বাসে দুলে উঠল। কোন কারণে এরা তাহলে এল না!

মন্দ কি! ভালোই তো!

কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস শেষ হতে না হতেই...দুরন্ত ঝড়! গাড়ি নড়ে ওঠার পর হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল তিনটি প্রাণী, অপর একজন দাঁড়িয়ে থাকল প্লাটফর্মে। "ভাল করে বোস চাঁদু উঃ খুব আসা গেছে!" বলল নীচে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটি।

বালকটি রুমাল নাড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে রুমাল নেড়ে চিৎকার করল, "গুড বাই অনিলদা।"...ফর্সা মোটা-সোটা ছেলে, সন্দেহ নেই ভাগ্যবানের ঘরের। হাফ প্যান্টের নীচে গোল গোল নিটোল পা দুখানি দেখলেই বোঝা যাচ্ছে শুধু আদরেই

মানুষ। স্বামীজী তাকিয়ে না দেখলেও এক নজরে দেখে নিলেন। ভাবলেন তিনজনের মধ্যে কী সম্বন্ধ? যুবকটি বা কে হওয়া সম্ভব? পরক্ষণেই একখানা ম্যাগাজিন তুলে সামনে ধরলেন।

হ্যাঁ, একটু আশ্চর্য তিনি হয়েছেন।

তিনজন সহযাত্রীর একটি বৃদ্ধ, একটি তরুণী এবং একটি বালক, এ দেখে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না, আশ্চর্য হলেন এই দেখে তরুণীটি গেরুয়া-ধারিণী। অথচ সঙ্গের দুজন এবং লটবহরের চেহারায় এটা বেমানান। অবস্য তার গেরুয়াবসনের মধ্যে বেশ ছিমছাম ভাব। গায়ে সুন্দর ফিট করা পরিষ্কার একটি গেরুয়া ব্লাউজ, সিল্কের গেরুয়া থান পিঠে আঁচল ফেলে পরা। পায়ে গেরুয়ায় ছোপানো রবারের চটি। রুক্ষ চুলেও কিছুটা পারিপাট্য। মোমে মাজা হাত দুখানি সম্পূর্ণ নিরাভরণ বটে তবে গলায় একটি উজ্জ্বল লাল প্রবালের মালা। চোখে সোনার ফ্রেমের চৌকো চশমা। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত ঘরের।

'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব?'

না, বিদ্যুৎশিখা?

সবলে আবার মনকে ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করেন স্বামীজী। আশ্চর্য, এরকম অযথা কৌতূহল, অথবা এমন অশোভন তুলনার সাধ তাঁর তো কখনও হয় না। প্রতি নিয়ত হাজারে হাজারে মেয়ে দেখছেন, তাঁদের আশ্রমেই অহরহ আসছে কত সুন্দরী নারী, কত তরুণী কুমারী! তবে? ...মনকে প্রশ্ন করে উত্তর জোটান স্বামীজী। এর কারণ বোধ হয় তরুণীর গৈরিকবাস। তাই হয়তো একটা সমগোত্র ভাব জাগছে। গৈরিকবসনা সন্ন্যাসিনী? সে আলাদা। কিন্তু এমন একটি রঙে রসে উজ্জ্বল ঘরোয়া মেয়ের গৈরিক বাস, আশ্চর্য বই কী!

ফ্যাশন নয় তো?

তা-ই সম্ভব। কত রকম ফ্যাশনই তো আজকাল করছে মেয়েরা।

গাড়ি চলার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি যা দাপাদাপি শুরু করল সেটা দেখবার মতো। জিনিসপত্রগুলো যথাস্থানে রাখবার ছুতোয় বেপরোয়া টানাটানি করে, দু-চারবার লাফিয়ে আপার বার্থে উঠে আর নেমে, এবং আবোল-তাবোল কথার স্রোতে গাড়ির মধ্যে বর্গীর হাঙ্গামা জুড়ে দিল সে।

গেরুয়া রং দেখে অভ্যস্ত বলেই কি তার এই দৃক্‌পাতহীন দুরন্তপনা? নইলে স্বামীজীকে দেখলে—দেখেছেন তো তিনি নিতান্ত অবোধ শিশুও একটু স্থির হয়ে বসে থাকে।

তার কথার স্রোতের মধ্যে থেকে এদের কিছু কিছু তথ্য জেনে ফেলা যায়। স্বামীজী অনুমান করেন, এরাও চলেছেন 'নিখিল ভারত সনাতন ধর্ম সম্মেলনে'। এবং এও অনুমান করা যায় খেয়ালটা তরুণীরই। বৃদ্ধা তার পিতামহী, বালকটি ভাই।

স্বামীজী ভাবেন কুমারী না বিধবা? বালকটি যদি সহোদর হয় তাহলে বিবাহিতা অর্থাৎ বিধবা। কারণ পদবী আলাদা! অন্যরকম ভাই হলে অন্য কথা। আবার বৃথা কৌতূহল! মনকে চোখ রাঙান স্বামীজী।

বৃদ্ধা মহিলাটি নাতিকে নিবৃত্ত করবার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু সে চেষ্টা বালির বাঁধ। তরুণীটি কিন্তু একেবারে স্তব্ধ নীরব। বোধ করি গাড়িতে স্বামীজীর উপস্থিতিই তার নীরবতার কারণ।

কিন্তু ভাইয়ের অদ্ভুত দুরন্তপনায় রীতিমতো বিরক্ত যে হচ্ছিল তা বোঝা যাচ্ছিল ভুরুর কুঞ্চনে, ঠোঁটের আকুঞ্চনে। অবশেষে বোধ করি ধৈর্য রক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

"চাঁদু!"...তীক্ষ্ণ অথচ মৃদু একটি ডাক।

চাঁদু এক মুহূর্ত থামে।

"কাশী যাবার কথায় কী বলেছিলে?"

চাঁদু নীরব।

"বলো কী বলেছিলে?"

চাঁদু গম্ভীরভাবে বলে, "বলেছিলাম নিয়ে গেলে দুষ্টুমি করব না।"

"এটা তাহলে কী হচ্ছে?"

চাঁদু আরও গম্ভীরভাবে বলে, "কী আবার হচ্ছে, খিদে পেয়েছে তাই। মানুষের যেন খিদে পায় না!"

মুখ ফিরিয়ে হাসা গোপন করতে গিয়ে সদরেই হেসে ফেলতে হয়। সন্ন্যাসীর নিয়ম লঙ্ঘন করে স্বামীজীও হেসে ফেলেছেন। সৌম্য শান্ত মুখে হাসিটি কী উজ্জ্বল কী পবিত্র!

"ঠিক বলেছ খোকা! এঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে মানুষের প্রধান ধর্মই হল খিদে পাওয়া।"

খোকা অর্থাৎ চাঁদু অভিযোগের সুরে বলে, "দেখুন তো, আপনি সাধু-সন্নিসী মানুষ, আপনিও যা বোঝেন এরা তা বুঝবে না।"

স্বামীজী তেমনি সৌম্যহাস্যে বলেন, 'এরাও তো সাধু সন্নিসী!"...এই পরিহাসটুকুর লোভ সংবরণ করতে পারলেন না কেন কে জানে।

"ছাই সন্নিসী। জামাইবাবুকে খুঁজবে বলে তাই—"

"চাঁদু!"

এবারের স্বর আরও মৃদু আরও তীক্ষ্ণ।

"আচ্ছা বাবা আচ্ছা, খেতেও চাই না কথা কইতেও চাই না আমি শুচ্ছি।" বলেই অপ্রতিভ চাঁদু বোধ করি লজ্জা ঢাকবার জন্যেই ঝুপ করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে, বলা বাহুল্য গাড়ির দেয়ালের দিকে মুখ করে। জামাইবাবুর প্রসঙ্গ যে অ-বক্তব্য এ তো চাঁদুর অজানা নয়, তবু কেনই যে ছাই বলে ফেলে।...দিদির বিয়ের এক মাস আগে জন্মেছে সে, তবু এমন ভাবে জামাইবাবুর কথা বলে বসে, মনে হয় যেন কতই দেখেছে তাকে।...অবশ্য দোষও নেই বেচারার, ক্রমাগত ঠাকুমার কাছে খেদ আর আক্ষেপোক্তি শুনতে শুনতে এ বিষয়ে পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে সে।...কেউ চাঁদুর দিকে তাকাচ্ছে না, কেউ চাঁদুর কথা ভাবছে না। দিদি একখানা বই নিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

চাঁদুর আর সহ্য হয় না। মুখ ফিরিয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ বলে ওঠে, "বকবার কথা মনে থাকে, আর রেলগাড়ি চড়লেই যে আমার খিদে পায় তা কারুর মনে থাকে না।"

"ক ঘণ্টা আগে খেয়ে বেরিয়েছিস চাঁদু?"

"জানি না।"

"কিন্তু এখন খাবার কোথায় পাই বল?"

অ্যা।" চাদু চমকে উঠে বলে, "কিন্তু খাবার আনো নি?"

"না তো!"

"তাহলে সারাদিন কি এত গোছালে কচুপোড়া?"

তরুণী এতক্ষণ নীরব ছিল তো ছিল, এখন আবার বুঝি কথার খেলায় মাততে চায়। তাই গম্ভীর মুখ করে বলে, "গোছালাম আমার নিজের জিনিসপত্র। তোর খাবারের কথা আমার মনেই ছিল না।"

"মনেই ছিল না? বাঃ। বেশ।"

এতক্ষণ ঠাকুমা সকৌতুকে তাকিয়ে বসেছিলেন, এবার বলেন, "কি হচ্ছে রানি। কেন ক্ষ্যাপাকে আরও ক্ষ্যাপাচ্ছিস?...ভালোও লাগে।...না রে চাঁদু অনেক খাবার এনেছি। খিদে তো পাবেই—তখন স্ফূর্তির চোটে কিছু খেয়েছে নাকি।...বলেই ঠাকুমা সঙ্গে আনীত একটি বোতল

থেকে গঙ্গাজল ঢেলে হাত ধুয়ে একটি বড় পিতলের কৌটো টেনে বার করে হঠাৎ স্বামীজীকে উদ্দেশ করে বলে ওঠেন, "বাবা, অপরাধ না নেন তো একটা কথা বলি—"

স্বামীজী সচকিতে বলেন, "আমায় বলছেন?"

"...হ্যাঁ বাবা, বলছি কি সঙ্গে ভালো সন্দেশ আছে, বাবার সেবা চলবে?"

তরুণীটির কণ্ঠে অস্ফুট একটা প্রতিবাদ।

ঠাকুমার প্রগলভতায় তার অস্বস্তি না হয়ে পারে না। সাধু মানুষের সঙ্গেও ওঁর আত্মীয়তা পাতানো চাই। মুশকিল বা।

স্বামীজী হাতের বই মুয়ে স্মিত মুখে বলেন, "আজ্ঞে না।"

"খুব ভালো করে আনা বাবা—"

"মায়ের হাতের সব জিনিসই ভালো মা, কিন্তু অসময়ে খাওয়ার অভ্যাস নেই।"

বৃদ্ধা দুঃখিত স্বরে বলেন, "সামান্য কিছু খেলেও—"

"আঃ ঠাকুমা, তুমি মানুষকে অত বিরক্ত কর কেন বলো তো?"

স্বামীজী মুহূর্তের জন্য তরুণীর বিব্রত বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে বলেন, "বিরক্ত কীসের? মায়ের জাত—সন্তানকে খাইয়েই খুশি। বিধাতা-প্রদত্ত প্রকৃতি।"

"আপনি জানেন না—আমার ঠাকুমাটিকে বিধাতা ও প্রকৃতিটি ভুলে ভুলে চারবার দিয়ে ফেলেছেন।"

সামান্য কৌতুকের হাসি হাসেন স্বামীজী।

চাঁদুর খাওয়া-পর্ব চলতে থাকে।

ঠাকুমা গল্প জুড়ে দেবার চেষ্টা করেন।

"বাবা বোধ হয় বেলুড় মঠের?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

"বাবার কি বাড়ি পর্যন্তই যাওয়া হবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

"ওখানেই থাকা হয়?"

"আজ্ঞে না। দিন চারেকের জন্যে যাচ্ছি।"

"কোথায় ওঠা হবে?"

"যে কাজে যাচ্ছি, সেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।"

"কোনও প্রচারে যাচ্ছেন বুঝি?"

রানির মুখে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিরক্তির ছাপ। স্বামীজী কিন্তু সমান প্রসন্ন।

"প্রচার? তাও বলতে পারেন। নিজের দলের মত প্রচার।"

"ওই হিন্দু ধর্ম সম্মেলনে না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

রানির মুখে আনন্দ আর বিস্ময়। যা অনুমান করছিল ঠিক তাই।

ঠাকুমা মহোৎসাহে বলেন, "আমরাও তো ওইখানেই যাচ্ছি। আমার এই নাতনির বাতিক। আর বাতিকই বা বলবো কি, দুঃখের বরাত। যেখানে শুনবে সাধু-সন্ন্যাসীর মেলা সেখানে ছুটবে—"

"ঠাকুমা, বৃথা ওঁর শান্তির ব্যাঘাত করছ কেন?"

ঠাকুমা নাতনিকে ভয় করেই থাকেন, কিন্তু আজ সহসা যেন বুকের বল বেড়ে গেছে তাঁর, ধমকের সুরে বলেন, "তুই থাম দিকি! শুধু ছুটে ছুটে দেশে-বিদেশে ধাওয়া করলেই হবে?...

খোঁজ-পত্তর না করলে?... শুনুন বাবা, আমার এই নাতনিটির আজ আট বছর হল বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পরই জামাই নিরুদ্দেশ! কেউ বলে হিমালয়ে তপস্যা করতে গেছে, কেউ বলে 'নিলয়ানন্দ' না কি যেন নাম নিয়ে বেলুড় মঠের শিষ্য হয়েছে—"

স্বামীজী অস্ফুট একটা বিস্ময়ের শব্দ করে বলেন "খোঁজ নেননি ভালো করে?"

"করেছি বই কী বাবা, তবে তেমন করে আর কে করবে? বাপ নেই, শ্বশুর নেই।"

"ঠাকুমা—" রানির কণ্ঠে হতাশ সুর—"আমি শুচ্ছি!"

টক করে আপার বার্থে উঠে পড়ে একেবারে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ে রানি।

"দেখুন—" স্বামীজী মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলেন, "উনি বোধ হয় এসব আলোচনায় ক্লেশ পাচ্ছেন।"

"পাক। ক্লেশ দুঃখ তো ওর সঙ্গের সাথী। আপনাকে যখন পেয়েছি তখন একটু অনুসন্ধান না করে ছাড়ব না। আপনি তো—মানে আপনার—মনে কিছু করবেন না বাবা, নাম?"

"জ্ঞানানন্দ।"

"মা বাপের ঘর শূন্য করেই যে সব চলে আস বাবা?"

"ব্রহ্মাণ্ড জুড়েই তো আমাদের পিতামাতা মা?"

"জানি বাবা—" বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেলে বলেন—"ওসব বড় বড় কথা শুনেছি তো ঢের, মন মানে কই?...সে যাক বলছিলাম কি—আপনাদের খাতাপত্তর দেখে যদি একবার খোঁজ করেন ওই নামে কেউ আছে কি না।"

"কি নাম বললেন?"

"নিলয়ানন্দ!"

"নিলয়ানন্দ?" স্বামীজী মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেন, "আমাদের এলাহাবাদ ব্রাঞ্চে "নিরয়ানন্দ" নামে একজন আছেন, বয়েস কম, শুনেছিলাম বিবাহিত বলে মহারাজ প্রথমে কিছুতেই গেরুয়া দিতে রাজি হননি অবশেষে মিনতিতে পড়ে—"

না দেখলেও বুঝি অনুভব করেন স্বামীজী চাদর ঢাকার অন্তরালে একটি হৃদয় স্পন্দিত হয়ে ওঠে!

ঠাকুমা ব্যগ্রভাবে বলেন, "তাহলে হয়তো ওই নামই হবে। আপনি একটু খোঁজ করবেন বাবা?"

"করতে পারি।" স্বামীজী ঈষৎ ইতস্তত করে বলেন, "কিন্তু তিনি যখন স্বেচ্ছায় এ রকম স্ত্রী সংসার ইত্যাদি ত্যাগ করে বৈরাগ্যের পথে গিয়েছেন, তখন তাঁর খোঁজ করে লাভ কী? তাছাড়া—আমাদের হল জনসেবার ব্রত। ছোট ছোট সংসারের গণ্ডির বাইরে বড় সংসার করছি। আমরাও তো একরকম সংসারী।....আক্ষেপ কীসের?"

"সে কথা তো আমিও বলি। কিন্তু ও হতভাগীকে কে বোঝাবে বাবা! ও বলে একবার দেখা করে জিজ্ঞেস করতে চাই কেন এরকম করলে?"

স্বামীজী রীতিমতো অস্বস্তি অনুভব করেন, এ যেন আড়ালে আড়ি পেতে কারও গোপন কথা শোনা। অথচ এই প্রগলভা বৃদ্ধাকে থামাবেনই বা কী করে। অতএব মৃদু হাস্যে বলেন, "এ কী একটা প্রশ্ন হল মা? ভগবান বুদ্ধ কেন করেছিলেন? শ্রীচৈতন্য কেন করেছিলেন?"

"সেই তো কথা! কিন্তু আমারও যে মস্ত জ্বালা। কোনওদিকে কোনও অভিভাবক নেই, আমি মরলেই সব ফর্সা। নাতনিকে তো দেখলেন, যৌবনে যোগিনী। ও বলে, যদি কখন তাঁর দেখা পাই, যেন তাঁর সামনে দাঁড়াবার যোগ্য হতে পারি। ঘৃণায় না মুখ ফিরিয়ে চলে যান।... তাই এই বেশ! সেই দুদিনের দেখা স্বামী যেন ধ্যান জ্ঞান।..... তার ফটো নিয়ে পুজো করছে, ধূপ জ্বালছে।"

স্বামীজী এ প্রসঙ্গের শেষ করতেই বোধ করি তাড়াতাড়ি বলেন, "আচ্ছা আমি খোঁজ করব। কিন্তু এই একাগ্রতা, এই নিষ্ঠা একজন মানুষের প্রতি আরোপ না করে, আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে পারলে যে উনি নিজেই—'

ঠাকুমা বাধা দিয়ে আক্ষেপের সুরে বলেন, "হায় কপাল! সেই বয়েস কি ওর? না সত্যিই সেই মন? এ শুধু বৈরাগ্যের ছল! আপনার মনকে আপনি ভোলানো!"

"রাত হয়েছে মা শুয়ে পড়ুন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি সন্ধান করব।"

বলে একটা আলো নিভিয়ে দিয়ে নরম নরম দুটো বালিশে মাথা ডুবিয়ে কম্বলখানা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন স্বামীজী।

বরাবরের মতো নিশ্চিন্ত শান্তির ঘুম আসে না।

বৃদ্ধার শেষ কথাটা বারবার মনের মধ্যে উচ্চারিত হতে থাকে।.... "এ শুধু বৈরাগ্যের ছল! আপনার মনকে আপনি ভোলানো!"

জগৎ জুড়ে তা শুধু এই মন-ভোলানোই চলছে!

অপরের চোখেও তাহলে ধরা পড়ে?

স্বামীজীর জন্য অভ্যর্থনার আয়োজন আছে। অদূরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষমাণ পরিচিত ছেলে দুটিকে হাতের ইশারায় আর একটু অপেক্ষা করতে বলে স্বামীজী বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করেন—"মায়ের এখানে থাকার ভালো ব্যবস্থা আছে তো?"

"তা আছে। এখানে বাড়ি আছে আমাদের। কর্তার বাতিক ছিল, সকল বড় বড় তীর্থস্থানে বাড়ি করে রেখে গেছেন। ভোগ করবারই কেউ নেই। শুধু বলছিলাম কি—রাণিই বলছিল, রাণি তুই নিজেই বল না?"

ঠাকুমার গতরাত্রির আলোচনার বহরে রাণির মুখ তোলাই দায় হচ্ছিল, তবু সে যেন কিছু শোনে নি, সে যেন ঘুমোচ্ছিল, এই মনোভাব এনে সপ্রতিভভাবে বলে, "শুনছি নাকি দশ বারো হাজার প্রতিনিধির সমাগম হবে?"

"বেশিই হবে—" স্বামীজী হাসেন—"আমাদের দেশে সম্প্রদায়ের তো সংখ্যা নেই?"

"বড় বড় স্বামীজী মহারাজদের সঙ্গে ছোটখাটোরাও আসবেন তো?"

"মানুষের মধ্যে বড়-ছোটর কি আছে? আসবেন অনেকেই।"

"এসব জায়গায় আমাদের মতো বাজে লোকের তো প্রবেশ-অধিকার নেই—"

"অধিকার অবশ্যই আছে, তবে স্থান-সঙ্কুলানের প্রশ্নই প্রধান।"

রাণি আরও সপ্রতিভভাবে বলে, "সেই জন্যই তো আপনাকে বিরক্ত করা। ঠাকুমার কবলে পড়ে তো কাল অনেক বিব্রত হয়েছেন, আজ আবার আমার—"

বলেই থেমে যায় রাণি, মুখের রঙ রাঙা হয়ে ওঠে।

স্বামীজী সামনের ছেলে দুটির একটিকে ইশারায় ডাকেন, কি দু একটি কথা বলেন, এদের ঠিকানা জেনে নিয়ে মনে রাখতে অনুরোধ করেন তাকে, তারপর এঁদের জানান এই ছেলেটিই গিয়ে তাঁদের নিয়ে আসবে এবং যতটা সম্ভব সুব্যবস্থা করে দেবে।

নমস্কার প্রতি-নমস্কারের পালা চুকে যাবার পরও বৃদ্ধা একটু এগিয়ে এসে বলেন, "নাতনি লজ্জায় বলতে পারে নি বাবা, বলছিল এলাহাবাদ থেকে যে দল আসবেন, তাঁদের একবার দেখতে পাওয়া সম্ভব কি না।"

"চেষ্টা করব মা, খুব চেষ্টা করব।"

তিন দিন ব্যাপী সম্মেলন।

সকালে দুপুরে, সন্ধ্যায় তিন বারে।

বারে বারেই দেখা হয়ে যায়, ব্যস্ত যাতায়াতের পথে, প্যান্ডেলে ঢোকবার গেটে..... হয়তো দুটি একটি কথা, হয়তো শুধু একটি সন্দেহ আর একটি সশ্রদ্ধ দৃষ্টির বিনিময়। হয়তো দ্রুত ভাষায় এলাহাবাদের দলের সন্ধান নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দান।

স্টেশনে ভিড়, পথে ভিড়... কেউ বলছে বিশ হাজার লোক জড়ো হয়েছিল, কেউ বলে পঞ্চাশ হাজার। অনুমানের মা-বাপ নেই। জোয়ারের জলের মতো যে ভিড় এসেছিল, ভাঁটার টানের মতো সরেও গেল সে ভিড়। কাশীর পথ আবার কিছু সহজ হয়েছে। স্বামীজী নিজের প্রয়োজনে দুএকদিন থেকে গেলেন।

জ্যোৎস্নায় একতলার ছাদে বসে আছেন ঠাকুমা আর নাতনি। চাঁদু গেছে বাইরে খেলতে। নতুন বন্ধু জুটেছে! বাইরে দাসী ছিল বসে, তার সঙ্গে স্বামীজী এলেন। "এসেছেন"? ভূলুণ্ঠিতা দুটি নারীর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি সরে স্বামীজী বলেন, "কী করছেন? সন্ন্যাসীর প্রণাম গ্রহণ নিষেধ। শুনুন স্বামী 'নিরয়ানন্দকে' নিয়ে এসেছি, বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করছেন।"

বৃদ্ধা আবেগ-বিগলিত স্বরে বলেন, "নিয়ে এসেছ? অ্যাঁ ! পরিচয় কিছু পেয়েছ বাবা?"

"পেয়েছি। তিনি পরিচয় স্বীকার করেছেন। তিনিই আপনাদের—"

"বাবা! বাবা! তুমি কি স্বয়ং দেবতা? তুমি—"

"শুনুন!..... অত অধীর হবেন না। এদের একবার দেখা সাক্ষাৎ করতে দিন। তিনি কথাচ্ছলে আমার কাছে তাঁর ভিতরের ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন সন্ন্যাস-জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। এঁকে—তিনি সম্মেলনে দেখেছেন, চিনতেও পেরেছেন। হয়তো অনুরোধ করলে তিনি আবার সংসার আশ্রমে ফিরে যেতে পারেন।"

"বাবা! কি কথা শোনালে!"

কৃতজ্ঞ বৃদ্ধার মুখে এর বেশি আর কথা জোগায় না। ব্যস্ত হয়ে ছুটে যেতে চান তিনি নীচের তলায়। কিন্তু তাঁর আঁচল টেনে আটকে রাণি স্থিরস্বরে বলে,

"কিন্তু তেমন অন্যায় অনুরোধ আমরা করব কেন?"

"আহা সে তো নিজেই—"

"থামো ঠাকুমা। আপনি শুনুন—তাঁকে বলবেন তাঁকে উচ্চ মার্গ থেকে নামিয়ে আনবার স্পৃহা আমার নেই।"

"বেশ তো আপনি নিজেই বলবেন সে কথা।"

"আমি দেখা করব না।"

"দেখা করবি না?"

"না"।

"দেখা করবেন না?"

"না!"

"কিন্তু—"

"এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। নিজের মন স্থির করে ফেলেছি আমি। আমি সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা নেব।"

"কিন্তু সে তো শুধু আপনার মনকে আপনি ভোলানো।"

সহসা দুটি কালো চোখে বিদ্যুতের অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে।

"সে তো সবাই ভোলাচ্ছে।"

"ওরে হতভাগী", ডুকরে ওঠেন ঠাকুমা— "একবার দেখা কর?"

"না!"